উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

১৫শ বর্ষ।

১৩১৯ মাঘ হইতে ১৩২০ পৌষ পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

১৫শ বর্ষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

(সাধনার দ্বিতীয় চারি বৎসর)

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন।

সময়—সন ১২৬৮ সাল হইতে ১২৭১ সাল, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

ঠাকুরের বয়স—২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ বৎসর।

বিবাহ করিয়া কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের জীবনে দুইটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়। ঘটনা দুইটি তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল; সেজন্য উহাদের কথাই আমরা এখন পাঠককে বলিব। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হন। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, রাণী ঐ সময়ে একদিন সংজ্ঞা পড়িয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদির সূত্রপাত হইয়া, ক্রমে গ্রহণীরোগের সঞ্চার হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি, অশেষ গুণবতী রাণী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ৩১শে তারিখে বৃহস্পতিবারে দক্ষিণেশ্বরকালীবাটী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং ঐ দেবসেবা আবহমান কাল নির্ব্বিঘ্নে চালাইবার উদ্দেশ্যে ঐ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারী দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।* মনে মনে সঙ্কল্প থাকিলেও, কিন্তু রাণী এতদিন

* Plaint in Suit No. 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of

ঐ সম্পত্তি আইনানুসারে যথাযথ ভাবে দানপত্র-লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে দেবোত্তররূপে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া উহা করিবার জন্য তিনি এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়, শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা দাসীই উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়াছি, কালীবাটীর দেবোত্তর, দানপত্র রাণীর অভিপ্রায়ানুসারে প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ঐ সম্পত্তির নিয়োগ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিবাদ, বিসম্বাদের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার জন্য রাণী নিজ কন্যাদ্বয়কে সম্মতিসূচক অঙ্গীকারপত্রে সহি করিতে বলিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা শ্রীমতী জগদম্বা ঐ পত্রে সহি করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী পদ্মমণি রাণীর মৃত্যুকালীন অনুরোধেও উহাতে সহি করেন নাই। সেজন্য মৃতুশয্যায় শয়ন করিয়াও রাণী শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে, ভাবিয়া, রাণী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে স্বয়ং সহি করিলেন * এবং ঐ

Endowment executed by Rani Rasmoni :- "According to my late husband's desire * * * I on 18th Jaistha 1262 B. S. (June 1855) established and consecrated the Thakurs * * * and for purpose of carrying on the Sheba purchased three lots of Zemindaries in District Dinajpur on 14th Bhadra 1262 B. S. (20th August 1855) for Rs. 2,26,000."

* Deed of Endowment dated 18th. February 1861 executed by Rani Rasmoni and acknowledged her execution before J. F. Watkins, Solicitors, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 47 of 1867, Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni, and in the High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No. 308) was revived after contest on 19th. July 1888.

কার্য্য সমাধা করিবার পর দিনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রিকালে শরীর ত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে রাণী রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গা তীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে, সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা হইয়াছে দেখিয়া, সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোস্‌নাই আর ভাল লাগ্‌ছে না, এখন আমার মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আস্‌ছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক্ আলোকময় হ'য়ে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "মা এলে। পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে মা!"—তাঁহাকে তখন গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইয়াছিল, এবং নিকটেই চতুর্দ্দিকে শিবাকুলের উচ্চ নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল! ঐ কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রাণী স্থির শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন!

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্রগণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদ-বিসম্বাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না রাণী, তাঁহার প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে না বলিয়া, মৃত্যুকালে কেন অত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা সাংঘাতিক ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিন্তার যন্ত্রণা তাঁহার নিকট তীব্রতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজ পত্রে দেখা যায়, ঐ সকল মকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া এখনই কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দেবকীর্ত্তি ঐ বিবাদের ফলে নাম মাত্রে পর্য্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না!

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কালে রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুত

* Debt due on mortgage by the Estate is Rs. 50,000; interest payable quarterly is Rs. 876—0—0, Costs of the Referee already stated to amount to Rs 20,000—0 as yet untaxed.

মথুরানাথ বা মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়-সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার দিন হইতে তিনিই উহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ব্যয় বুঝিয়া রাণীর ইচ্ছামত দেবসেবা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই উহা পূর্ব্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকিলেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবন-প্রভাব মথুরানাথের মনের উপর ইতিপূর্ব্বেই অধিকার বিস্তৃত করায়, দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা যে রাণীর মৃত্যুতে কোন অংশে হীনাঙ্গসম্পন্ন হইল না, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের সহিত মথুরামোহন বা মথুরানাথের বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে অনেকবার বলিয়াছি। অতএব এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধন-সমূহ ঠাকুরের জীবনে যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই রাণী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও কালীবাটী-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরানাথের একাধিপত্য-লাভরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সম্যক্ সহায়তা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে মথুরের এই সময়ে বিষয়াধিকার লাভ ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই কি না, তাহা কে বলিতে পারে? কারণ, দেখা যায়, এখন হইতে আমরণ মথুরানাথ ঠাকুরের বিশেষভাবে সেবা করিতেই আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। বিষয়াধিকার লাভের পর দীর্ঘ দশ বৎসরেরও অধিক কাল ঐরূপে এক ব্যক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উচ্চ ভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। রাণীর বিপুল বিষয়ে প্রায় একাধিপত্য লাভ করিয়া, মথুরানাথ যে উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী না হইয়া ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতেই পূর্ব্বোক্ত কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বিশিষ্ট সাধকভক্ত ভিন্ন অন্য কেহই এখনও পর্য্যন্ত ঠাকুরের উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারে নাই। মানব সাধারণ তাঁহাকে

বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল। তবে বুঝিয়াছিল যে, এ উন্মাদ আপনার হিতাহিত কিছুমাত্র বুঝে না, রূপরসাদি কোন বিষয়েই আকৃষ্ট হয় না, কখন কাহারও অনিষ্টচেষ্টা করে না এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া ইচ্ছামত কখন 'হরি' কখন 'রাম' এবং কখন বা 'কালী কালী' বলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। বুঝিয়াছিল যে, যে রাণী রাসমণির ও মথুর বাবুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে লোকে আপন গণ্ডা বেশ গুছাইয়া লয়, ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সুনয়নে পড়িয়াও এ উন্মাদ আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারে নাই—কখন পারিবে যে, সে সম্ভাবনাও নাই। আর বুঝিয়াছিল যে, সর্ব্বথা অকর্ম্মণ্য হইলেও এ উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপূর্ব্ব চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে, সুললিত বাক্য-বিন্যাসে এবং কখন কখন প্রকাশিত অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে, তাহারা যে সকল ধনী মানী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সে সকল লোকের সম্মুখে এ উন্মাদ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া উপস্থিত হইলেও অচিরে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠে। ইতর সাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্ম্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুর বাবু কিন্তু অন্যরূপ ভাবিতেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি—মথুরানাথ বলিতেন, (ঠাকুরের উপর) "শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই, উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ ভাব উপস্থিত হইয়াছে।"

সে যাহা হউক, রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটি বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিম ভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপরেই বিচিত্র পুষ্পকানন ছিল। সযত্ন-রক্ষিত ঐ কাননে তখন নানাজাতীয় পুষ্প-সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া বৃক্ষলতাদি বিচিত্র শোভা বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক্ আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা না করিলেও, ঠাকুর ঐ কালে নিত্য ঐ কানন হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন এবং মাল্য রচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের দক্ষিণে, গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনী-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে, পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের

জন্ত একটি ক্ষুদ্র বাঁধাঘাট ও কালীবাটীর উত্তরের নহবৎখানা অদ্যাপি বর্ত্তমান। বাঁধা ঘাটটির উপরে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায়, লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

পূর্ব্বোক্ত কাননে ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং উহা হইতে গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা, আলুলায়িত-দীর্ঘ-কেশা, ভৈরবীবেশ-ধারিণী এক সুন্দরী রমণী পুস্তকাদির একটি পুঁটুলি হস্তে অবতরণ করিয়া, দক্ষিণের সুবৃহৎ ঘাটের চাঁদনীর দিকে অগ্রসর হইলেন। যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যাভাস তাঁহার শরীরকে তখনও ত্যাগ না করায়, প্রৌঢ়বয়স্কা হইলেও, ভৈরবীকে দেখিয়া তাহা কেহই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশেব কাছাকাছি হইবে। ভৈরবীর সহিত নিজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা ঠাকুব প্রথম দর্শনে কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার লোক দেখিলে লোকে যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়াই তিনি যে উহা অনুভব করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কারণ, ভৈরবীকে দূর হইতে দেখিয়াই ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ চাঁদনী হইতে উক্ত সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। শুনিয়াছি, হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?"—ঠাকুর তদুত্তরে বলেন, "আমার নাম ক'রে বল্‌গে যা, তা হ'লেই আস্‌বে এখন।" হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক্ হইয়াছিল। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে সে আর কখনও দেখে নাই।

সে যাহা হউক, উন্মাদ মাতুলের বাক্যের অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া, হৃদয় চাঁদনীতে যাইয়া দেখিল, ভৈরবী ঐ স্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঐকথা শুনিয়া

ভৈরবী মনে কোন দ্বিধা বোধ বা প্রশ্নান্তর না করিয়াই, তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া, হৃদয় অধিকতর বিস্মিত হইল।

ঠাকুরের ঘরে আসিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী সহসা আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রয়েছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিনে দেখা পেলাম্!" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কথা কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লে মা?" ভৈরবী বলিলেন,—"তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে, এ কথা জগদম্বার কৃপায় পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলাম। দুই জনের দেখা পূর্ব্ব (বঙ্গ) দেশে পেয়েছি, আজ এখানে তোমার দেখাও পেলাম্।"

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, বালক যেমন জননীর নিকটে সকল কথা সানন্দে বলিতে থাকে, সেই ভাবে আপন অদৃষ্টপূর্ব্ব দর্শনের কথা, ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা প্রভৃতি যোগজ শারীরিক বিকারের কথা, লোকে তাঁহাকে যেজন্য উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছে প্রভৃতি সকল কথা—তাঁহাকে মন খুলিয়া বলিতে ও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"হ্যাগা আমার এ সকল কি হয়?—আমি কি সত্যই পাগল হ'লুম?—মাকে (জগদম্বাকে) মনে প্রাণে ডেকে সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হ'ল?"—ভৈরবীও ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখন উত্তেজিতা, কখনও উল্লসিতা, এবং কখনও বা করুণার্দ্র-হৃদয়া হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিয়া উঠিলেন—"তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার এ ত পাগলামি নয়, তোমার এ যে মহাভাব হ'য়েছে, তাই ঐরূপ হচ্চে! তোমার যা (আধ্যাত্মিক অবস্থা) হ'য়েছে, তা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? তাই ঐ প্রকার বলে। ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীমতী রাধারাণীর; ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর! সে সব কথা (ভক্তি) শাস্ত্রে আছে। আমার নিকটেই এই সব পুঁথি (শাস্ত্রগ্রন্থ) র'য়েছে। আমি তোমাকে প'ড়ে শুনাব; দেখাব যে, ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক যারাই ডেকেছে, তাদেরই ঐরূপ অবস্থা সব হ'য়েছে

ও হয়।”—ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরূপে পূর্ব্বপরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ ও ব্যবহারাদি করিতে দেখিয়া, হৃদয়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর দেবীর প্রসাদ ফল, মূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্রস্বরূপ তাঁহাকে পূর্ব্বে না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া, স্বয়ং ঐ সকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে, ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা ময়দা প্রভৃতির সিধা গ্রহণ করিয়া, পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

অনন্তর রন্ধন শেষ হইলে, ৺রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া, ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইয়া, অভূতপূর্ব্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন! তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তিনি বাহ্যজ্ঞান এককালে হারাইয়া ফেলিলেন! ঠাকুরও ঐ সময়ে পঞ্চবটীতে আসিবার জন্য প্রাণে প্রাণে আকর্ষণানুভব করিয়া, ভাবাবেশে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়, কি করিতেছেন সম্যক্ না বুঝিয়া, অপরের শক্তিবলে প্রযুক্ত নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় ব্রাহ্মণী-নিবেদিত সম্মুখস্থ খাদ্য সকল গ্রহণ করিতে থাকিলেন! কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ প্রকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এবং নিজ দর্শনের সহিত উহা মিলাইয়া পাইয়া, বিস্ময়ে আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন! আবার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর যখন সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিয়া, নিজকৃত কার্য্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, “কে জানে বাবু, কেন এমন বেসামাল হইয়া এইরূপ কার্য্য সকল করিয়া বসি”—তখন ব্রাহ্মণী জননীর ন্যায় তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, “বেশ করিয়াছ বাবা; ঐ কাজ ত তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে যিনি আছেন,

আমি যে মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছি, কীর্ত্তনী তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া বলিলেন, "মা, তবে কি পতিতার—তোমার সেবা করিবার ভাগ্য হইবে না?" এমনি করুণস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে, আমার মনের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। "দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তি হইবে না," না হউক, তবুও আমি এখানেই অন্নগ্রহণ করিব। মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বলিলাম, "মা, আমার জন্য কিছু চাল ও রন্ধন করিবার একটী নির্জ্জন স্থান দিবে। সেখানে আমি রন্ধন করিয়া লইব।"

কীর্ত্তনীর বাড়ীর কাছে একটা পুকুর ছিল, সেখানে স্নান করিয়া আসিলাম। তাহার কাছেই একখানি ছোট ঘর। স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম, সেখানে রন্ধনের দ্রব্যাদি ও একখানি নূতন কাপড় আছে। কাপড় ছাড়িয়া সেই কাপড় পরিলাম। রন্ধন করিয়া যখন শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিতে গেলাম, তখন দেখিলাম, অন্নের ভিতর একগাছি চুল আছে। সে অন্ন আর শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করা হইল না। কীর্ত্তনী জানিতে পারিলে দুঃখিত হইবেন জানিয়া মালসা সহিত অন্ন পুকুরের জলে ডুবাইয়া দিলাম ও তাহার পর কীর্ত্তনীর নিকট বিদায় লইয়া তাহার বাটী হইতে বাহির হইলাম।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি-খণ্ডন।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর দুইটী পরস্পরবিরোধী কথা পাশাপাশি বলিয়া প্রথম কথার উত্তর দিলেন, অপরটীর উত্তর তথায় দেন নাই। এক্ষণে এই বিচারে সেই অংশটীর উত্তর দিতেছেন। পরন্তু ইহার উত্তরটী বিচার করিবার পূর্ব্বে তিনি যে ভাবে ইহার আকৃতি

পরিবর্ত্তন করিলেন, তাহাব প্রতি একটু দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি যে অংশটীর উত্তর দেন নাই, তাহা এই—"জাতেঽপি সর্ব্বস্য সহসৈব ভেদ-জ্ঞানানিবৃত্তি র্ন দোষায়, চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনি-বৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি।" অর্থাৎ "আর অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান হইলেও (ভেদবাসনা-বশতঃ) সহসা সকলের ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে দোষ হয় না, কারণ, এক-চন্দ্র-জ্ঞান থাকিলেও দ্বিচন্দ্র-জ্ঞান হইতে দেখা যায়। ভেদজ্ঞান অনিবৃত্ত হইলেও ছিন্নমূল হইয়া যাওয়ায় বন্ধের নিমিত্ত হয় না।" ইত্যাদি। এখন এইটীকে আচার্য্য উত্তর দিবার কালে যেরূপ আকার প্রদান করিলেন, তাহা এই :—"সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানে অনাদিবাসনয়া মাত্রয়া ভেদজ্ঞানম্ অনুবর্ত্ততে ইতি ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্।" অর্থাৎ "আর ('তত্ত্বমসি' ইত্যাদি) বাক্যের অর্থজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে অনাদি বাসনাবশতঃ কিয়ৎ পরিমাণে ভেদজ্ঞানেব অনুবৃত্তি হয়, ইহাও তুমি বলিতে পাব না।" ইত্যাদি। এইখানে এইটুকু লক্ষ্য করিবার জিনিষ যে, বাসনা শব্দে পূর্ব্বের প্রসঙ্গে কোন বিশেষণ ছিল না, এখন তাহাতে "অনাদি" এই বিশেষণটী আসিয়া বসিল, এবং উপরে "সহসা সকলের ভেদজ্ঞানেব অনিবৃত্তি দোষের নহে" এই কথা ছিল,এস্থলে "কিয়ৎপরিমাণে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়" এই কথাগুলি আসিল। ইহার গূঢ় রহস্য পাঠক ক্রমে বিদিত হইবেন। তবে এস্থলে এইটুকু বলা ভাল যে, বাসনাটীকে অনাদি বলিয়া তিনি পরে বলিবেন যে, "অনাদি বাসনা কখন অল্পদিনের অভ্যাসে ক্ষয় হইতে পারে না" ইত্যাদি। তাহার পর "সহসা সকলের নিবৃত্তি না হওয়া" এই অংশটুকুর পরিবর্ত্তে "কিয়ৎপরিমাণে অনুবৃত্তি হয়," এই কথাটী পরে গ্রহণ করিয়া, তিনি একটু সাবধান হইলেন মাত্র। কারণ, "সহসা নিবৃত্তি না হওয়া" এবং "কিয়ৎপরিমাণে অনুবৃত্তি হওয়া" ইহারা সর্ব্বত্র এক জিনিষ নাও হইতে পারে। কারণ, সহসা শব্দে হঠাৎ বা অকারণ এই অর্থ বোধ হয়, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে শব্দে পরিমাণই বুঝায়, ঠিক হঠাৎ বা অকারণ অর্থ বুঝায় না। তদ্ব্যতীত মূলের "সর্ব্বস্য" পদের অর্থ "সকল লোকের।" বস্তুতঃ ইহাতে প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদীর পক্ষই সমর্থিত হইয়া যায়। কারণ, ওরূপ স্থলে কোন কোন ব্যক্তিরও যদি

ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর মতে দৃষ্টান্তের অভাব হইল না, আর যেখানে ব্যক্তিবিশেষে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না, সে স্থলে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বা অপূর্ণতা স্বীকার করিলেই, বিপক্ষের কোন কথা বলিবার হেতু থাকিতে পারে না। তাহার পর অনুবৃত্তি শব্দে ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াও তাহার পুনরাগমন বুঝায়, কিন্তু ভেদ-জ্ঞানের অনিবৃত্তি শব্দে উহার নিবৃত্তি আদৌ বুঝাইতে পারে না। বলা বাহুল্য, অদ্বৈতবাদীর মতে বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানে ভেদজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু মূল কারণ অবিদ্যার সম্পূর্ণ নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত (উক্ত অবিদ্যানাশক জ্ঞান সত্ত্বেও) মধ্যে মধ্যে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। যেহেতু দেহাদিও উক্ত অবিদ্যারই ভিন্নরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, এসব পরের কথা, ইহা যথাস্থানে সবিস্তারে কথিত হইবে। এখন দেখা যাউক, আচার্য্যের উত্তরটী কিরূপ হইল। ইহার উত্তর আচার্য্য স্তবকে স্তবকে দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম স্তবকটী এই—

"আর বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে অনাদি বাসনাবশতঃ কিয়ৎ-পরিমাণে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়, ইহাও তুমি বলিতে পার না।

"কারণ, ভেদজ্ঞান যখন মিথ্যা, তখন জ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রেই তৎকারণ ভেদবাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে।" ইত্যাদি।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—কথাটা আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভেদজ্ঞানটা মিথ্যা বলিয়া ভেদজ্ঞাননিবারক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই ভেদজ্ঞানের একটী কারণ যে ভেদসংস্কার, তাহাও যে নিবৃত্ত হইবে, ইহার কোন কারণ নাই। কার্য্যনাশের পূর্ব্বে সমুদায় কারণের নাশ না স্বীকার করিলে, একথা ত বলিতে পারা যায় না। অবশ্য কার্য্যনাশে সমবায়ী অথবা অসমবায়ী, অথবা উভয় কারণের নাশ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাই বলিয়া নিমিত্ত কারণের নাশও অবশ্যম্ভাবী হইবে কেন? তন্তু-সংযোগ-নাশে পটনাশ হয়, তন্তু-নাশেও পট নষ্ট হয়, তন্তু এবং তাহার সংযোগ উভয়ের নাশেও পট নষ্ট হয়, কিন্তু তন্তুবায় বা তুরী-ভেরীর নাশ আবশ্যক হয় না। সুতরাং কার্য্যনাশে কারণনাশ—

একথা ওরূপ সাধারণ ভাবে বলা চলে না। তিনি আমাদের মুখ দিয়া যাহা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে ভেদজ্ঞান কার্য্য, ভেদসংস্কার হইল নিমিত্ত কারণ; সুতরাং বেদান্তবাক্য-জন্য জ্ঞানে ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, ভেদসংস্কারও নিবৃত্ত হইতে পারে না। আর একথা অস্বীকার করিলে, ঘট ভাঙ্গিলে কুম্ভকারের দণ্ডচক্র প্রভৃতি পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে, বলিতে হয়। সুতরাং আচার্য্যের একথাগুলির সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারিল না।

তাহার পর, পূর্ব্বে যে কথা আরম্ভ করা হইয়াছে,যথা, "ভেদবাসনায়াম্ অনিরস্তায়াং বাক্যং অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি" তাহাতে ত বেদান্তবাক্যার্থ হইতে অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান হইবারই কথা উঠিয়াছে, ভেদসংস্কারের নিবৃত্তির কথা ত উঠে নাই, ভেদসংস্কারকে তথায় প্রতি-বন্ধক বলাই হইয়াছে। সুতরাং "ভেদজ্ঞান যখন মিথ্যা, তখন জ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রেই তৎকারণ ভেদবাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে," আচার্য্যের এই কথাটী নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে। আর যদি বলা হয়, মিথ্যাসম্বন্ধীয় কথা বলিয়া কার্য্যনাশে কারণের নাশ হওয়া উচিত, তাহাও বলা যায় না; যেহেতু মিথ্যার কারণ যে "মিথ্যা", তাহা তাহার "কার্য্য মিথ্যা" অপেক্ষা নিত্য বা স্থায়ী বলিতে হইবে। "কার্য্য অপেক্ষা কারণ স্থায়ী" এ নিয়মটী মিথ্যার স্থলে অন্যথাভূত হইতে বাধ্য, এমন কোন হেতু নাই। যাহা হউক অদ্বৈতবাদীর এই প্রকার উত্তর আশঙ্কা করিয়া আচার্য্য পরবর্ত্তী বাক্যে তাহারও খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলেন, এস্থলে বেদান্তের বাক্যার্থে অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞানোৎপত্তির কথা হইলেও সেই সঙ্গে উহার প্রতিবন্ধক ভেদসংস্কারের নিবৃত্তির কথাও প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িতেছে। যেহেতু বেদান্তবাক্যার্থ দ্বারা যখন উক্তপ্রকার জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করা হইতেছে, তখন বেদান্তবাক্যকে তাহার উৎপাদ্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধককে নষ্ট করিয়াই সে জ্ঞান উৎপাদন করিতে হইবে। নচেৎ উক্ত জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি তাহার কারণতাই থাকে না।

এ সম্বন্ধে আচার্য্যের নিজের কথাটী এই :—

"জ্ঞানোৎপত্তৌ অপি মিথ্যারূপায়াঃ তস্যা অনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাস্যা বাসনায়াঃ নিবৃত্তিঃ।"

অর্থাৎ—"বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও, যদি মিথ্যাময়ী সেই ভেদবাসনা নিবৃত্ত না হয়, তবে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও নিবারক উপায় না থাকায়, কখনও সেই বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না।" ইত্যাদি। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন—আচার্য্যের একথাটী খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক, কিন্তু তাহা হইলেও উহা প্রকৃত উত্তর-মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কারণ, সংস্কার-নাশে সংস্কারের কারণতা থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। ভেদসংস্কারের নাশে তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কারই আবশ্যক হইবে, আর ভেদজ্ঞান-নাশে তত্ত্বজ্ঞানেরই কারণতা প্রয়োজনীয় হইবে। যে ব্যক্তির ভেদসংস্কার আছে, সে ব্যক্তি যদি তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কার উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তখন তাহার ভেদসংস্কারও নষ্ট হইবে। পরন্তু ভেদজ্ঞান-নিবারক, জ্ঞানে ভেদসংস্কার নষ্ট হইতে পারে না। মোট কথা, তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও, যদি মিথ্যাময়ী সেই ভেদবাসনা নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ এবং মনন-রূপ জ্ঞানানুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কার জন্মে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া আসে, আর তখন সেই ভেদবাসনার নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই বাসনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইতে গেলে দেহনাশ কিংবা সমাধি-সিদ্ধি প্রয়োজন। সমাধি-সিদ্ধি না ঘটিলে, যতদিন দেহ থাকে, ততদিন ভেদ-সংস্কার সম্পূর্ণরূপে যায় না বলিয়া, কখন কখন ভেদজ্ঞান উদয় হয় বটে, কিন্তু তখনই আবার তৎপশ্চাতে উহা যে মিথ্যা, এ জ্ঞানও উদয় হয়; সুতরাং এই ভেদজ্ঞানের ব্যবহারে আর বন্ধন হয় না, অর্থাৎ আর নূতন ভেদজ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। এস্থলে বেদান্তবাক্যার্থ শ্রবণ-জন্য জ্ঞানেরই দৃঢ়তাসাধন ও প্রবাহ রক্ষার জন্য মননাদিরূপ জ্ঞানানুষ্ঠান আবশ্যক হয়। সংশয় প্রভৃতি বিপরীত ভাবনার ক্ষয়ে সেই জ্ঞানই প্রকাশ পায়, অন্য কোন প্রকার জ্ঞান জন্মে না; আর যদি বলা হয়—"এই জ্ঞানা-নুষ্ঠান বা জ্ঞানাভ্যাসই আচার্য্যের মতে কর্ম্ম; কারণ, জানা ও জানা

বিষয়ের আলোচনা এক জিনিষ নহে। সুতরাং আমাদের মতে জ্ঞানসংস্কার দ্বারা ভেদজ্ঞানের সংস্কারনাশে জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদই সিদ্ধ হয়।" তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না। কারণ, জ্ঞানানুষ্ঠান-ক্রিয়াতে "আমি কর্ত্তা বা অধিকারী" এইরূপ জ্ঞান, অথবা অগ্নি-হবিঃ-কাষ্ঠ প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই এবং তজ্জন্য অর্থোপার্জ্জন ও সমুদয় আশ্রমধর্ম্মের জন্য বিবাহাদির প্রয়োজন নাই; কেবল সন্ন্যাসাশ্রমেই এ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। সকলেই জানে—গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম্ম ও সন্ন্যাসাশ্রমের কর্ম্ম কখনই এক নহে। এইজন্য বলি—জ্ঞানাভ্যাস ও যজ্ঞদানাদি যদি এ উভয়কেই কর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এ দুই প্রকার কর্ম্মের মধ্যে যে ভেদ থাকিবে, তাহা আকাশ পাতালের ভেদ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং কথিত যুক্তি দ্বারা আচার্য্য আমাদের মত খণ্ডন করিতে পারিতেছেন না, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

যাহা হউক, কিন্তু আচার্য্যের পরবর্ত্তী কথা শুনিয়া মনে হয়, আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর এই সব কথা ভাবিয়া থাকিবেন এবং তজ্জন্য উক্তপ্রকার উত্তর দিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না এবং তজ্জন্য তিনি পুনরায় অদ্বৈতবাদীর উক্ত কথাটীর অন্য প্রকারে উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই উত্তরটীকে আমরা তাঁহার উত্তরের তৃতীয় স্তবক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

"বাসনাকার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অথচানুবর্ত্তত ইতি বালিশ-ভাষিতম্। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু বাধকসন্নিধাবপি মিথ্যাজ্ঞানহেতোঃ পরমার্থ-তিমিরাদিদোষস্য জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টত্বান্মিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তিরবিরুদ্ধা, প্রবলপ্রমাণবাধিতত্বেন ভয়াদিকার্য্যং তু নিবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ—"ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ তৎকার্য্য ভেদজ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা। দ্বিচন্দ্রাদি দর্শনস্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক (জ্ঞান) সন্নিহিত থাকিলেও, ঐ ভ্রমের যথার্থ কারণ তিমিরাদি (অর্থাৎ রোগবিশেষ) দোষ বিনষ্ট হয় না; কারণ, উহা সত্য, সুতরাং সে ভ্রম তাদৃশ জ্ঞানের নিবার্য্য নহে;

সুতরাংই (সে স্থানে) মিথ্যাজ্ঞানের অনিবৃত্তি, বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরন্তু (সে স্থলেও আপ্তোপদেশাদি) প্রবল (নিঃসংশয়) প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ 'ইহা সত্য নহে—মিথ্যা' এইরূপ নিশ্চয়-বশতঃ ভ্রমসম্ভূত ভয়াদি কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায়।" এতদুত্তরে আমরা বলি, আচার্য্যের কথাগুলি বড়ই বিচিত্র। প্রথমতঃ দেখা যায়, তাঁহার এই বিচারের মূলমন্ত্র এই যে, "কারণনাশে কার্য্যনাশ অবশ্যম্ভাবী।" ইহা যে না স্বীকার করিবে সে, নিশ্চয়ই মূঢ়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, আমরা কোথায় বলিয়াছি যে, ভেদজ্ঞানের মূল কারণ ভেদ-সংস্কার অথবা সেই সংস্কারের নাশ ভেদজ্ঞাননাশের অগ্রে হয়? আমরা বলি, অবিদ্যা হইতে আমি-তুমি-রূপী আত্মা অনাত্মা বোধ হয়, এই আত্মাই দ্রষ্টা, আর এই অনাত্মাই দৃশ্য। এই দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগে জ্ঞান হয়, এজন্য এই জ্ঞানে ভেদই বর্ত্তমান থাকে, আর এইজন্যই বলা হয়—অবিদ্যা হইতে ভেদজ্ঞান হয়। তাহার পর এই ভেদজ্ঞানের ব্যবহারে ভেদসংস্কার হয় এবং এই ভেদসংস্কার হইতে আবার ভেদজ্ঞান হইতে থাকে; প্রভেদ এই যে, অবিদ্যা এই ভেদজ্ঞানের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, কিন্তু ভেদসংস্কারটী উক্ত ভেদজ্ঞানের নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে। তাহার পব এই ভেদজ্ঞানাদি-নাশের সময় বেদান্তবাক্যার্থ হইতে ভেদজ্ঞাননাশক জ্ঞান হয়, এ সময় উভয় জ্ঞানের সংগ্রাম চলিতে থাকে। আর উক্ত জ্ঞানের সংস্কার যত উৎপন্ন হয়, ততই ভেদসংস্কারের নাশ হয় এবং ক্রমে এতদুভয়ের নাশে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়। সুতরাং আমাদের এই কথা হইতে আচার্য্য কি করিয়া বলিতে পারেন যে, "ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ ভেদজ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা" ইত্যাদি। তিনি আমাদের মুখ দিয়া যাহা বাহির করাইয়াছেন, তাহাতে আছে—

"ন চ বাচ্যং ভেদবাসনায়াম্ অনিবৃত্তায়াং বাক্যম্ অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি, জাতেঽপি সর্ব্বজ্ঞ সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়; চন্দ্রৈকত্বে জাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় কল্পতে।"

অর্থাৎ—"ভেদবাসনা নিরস্ত না হইলে বাক্য অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, একথাও বলা যায় না। আর উক্ত জ্ঞান জন্মিলেও, সকলের সহসা ভেদজ্ঞানের অনিবৃত্তি দোষাবহ নহে, যেমন চন্দ্র এক জানিলেও দ্বিচন্দ্রজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। আর অনিবৃত্ত হইলেও, ছিন্নমূল হওয়ায়, বন্ধের কারণ হয় না।" ইত্যাদি।

এখানে দেখা যায়, "জাতেঽপি সর্ব্বস্য সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়" অর্থাৎ "অবিদ্যানিবারক জ্ঞান হইলেও, সকলের সহসা ভেদজ্ঞানের অনিবৃত্তি দোষের নয়" এই কথা বলায় অবিদ্যানিবারক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যার নিবৃত্তি বুঝায় না, অথবা ভেদজ্ঞাননাশের পূর্ব্বে যে ভেদবাসনা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাও বুঝায় না; অথচ উত্তর দিবার কালে এই ভেদবাসনা নিবৃত্তি হইল, অথচ ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি হইল না, একথা যাহারা বলে, তাহারা মূঢ, ইহা বলা হইল। অবিদ্যানিবারক জ্ঞান হইলেও অবিদ্যা থাকিতে পারে, ইহার কারণ ইহাদের উভয়ের মাত্রাভেদ। ইহারই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা একচন্দ্র ও দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি। আর ভেদজ্ঞান হইতে ভেদসংস্কারটী সূক্ষ্ম বলিয়া, ভেদজ্ঞাননাশেও ভেদসংস্কারনাশ সম্ভব নহে। ইহা সকলেই নিজে নিজে অনুভব করিতে পারেন, সুতরাং এজন্য যুক্তি বা দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা নাই। ফলে এই জন্যই বলি, আচার্য্যের এই উত্তরটী সঙ্গত হইতে পারে না।

আর যদি বলা হয়, "জাতেঽপি" এই শব্দে ভেদবাসনা নিবৃত্তিপূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তির কথাই আচার্য্যের অভিপ্রেত, যেহেতু "জাতেঽপি" এই শব্দের পূর্ব্বেই "ভেদবাসনায়াম্ অনিরস্তায়াং" অর্থাৎ "ভেদবাসনা নিরস্ত না হইলে জ্ঞান হয় না" এই কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং অগ্রে বাসনানাশ, পরে ভেদজ্ঞানের নাশ মনে উদয় হইবার কথা, তাহা হইলে বলিব, "বাসনা নাশ হইল, অথচ ভেদজ্ঞান নাশ হইল না, ইহা মূঢ়ের কথা"—আচার্য্যের এই বাক্যটী সে স্থলে সঙ্গত বটে, কিন্তু তাহা হইলে সে স্থলেও "জ্ঞান হয় না" একথা আমরা বলি না,

প্রত্যুত সে স্থলে "জ্ঞান হয়ই" ইহাই আমরা বলিব। অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যার্থ দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তিকারক জ্ঞানোৎপত্তি এবং তাহার অভ্যাস-দ্বারা ভেদসংস্কার নিবৃত্তি হইলে ভেদজ্ঞান আর থাকে না এবং তাহার অনুবৃত্তিও হয় না। ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হইতে গেলে ভেদজ্ঞানের কারণ অবিদ্যা বা অবিদ্যাজাত দেহ এবং ভেদসংস্কার থাকা দরকার। যেহেতু কারণ বিনা কার্য্য হয় না, একথা আমরাও বলি। পরন্তু আচার্য্য-বাক্যের এরূপ অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে, আচার্য্য প্রতি-পক্ষকে মূঢ় বলিবেন বলিয়াই "ভেদবাসনা থাকিতে জ্ঞান হয় না" বলিয়াই তাহার পার্শ্বেই আবার বলিলেন, "আর হইলেও ভেদজ্ঞানের অনিবৃত্তি দোষাবহ নহে" ইত্যাদি, নচেৎ এরূপ দুইটী বাক্যের একত্র সমাবেশের কোন আবশ্যকতা নাই। ফলে ইহা যেমন আচার্য্যের অত্যুত্তম সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচায়ক, তদ্রূপ তাহার অপূর্ব্ব অপব্যবহারেরও দৃষ্টান্ত। তাহার পর 'ভেদবাসনায়াম্ অনিরস্তায়াং বাক্যম্ অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি' এই কথায় ভেদবাসনা, ভেদজ্ঞানের মূল কারণ হইতেছে না। মূল কারণ হইতে গেলে সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হওয়াই উচিত। সুতরাং ভেদবাসনানাশের পর বেদান্তবাক্য অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি করে বলিয়া, ভেদবাসনা ভেদজ্ঞানের নিমিত্তকারণই হইতে বাধ্য। এখন জিজ্ঞাসা করি, ভেদজ্ঞানরূপ কার্য্যনাশের জন্য ভেদজ্ঞানের পূর্ব্বে ভেদজ্ঞানের এই নিমিত্ত কারণ ভেদবাসনাটীরও কি নাশ হওয়া আবশ্যক হইবে? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বের কথা আবার বলিব—ঘট নষ্ট হইবার পূর্ব্বে কুম্ভকার ও তাহার দণ্ডচক্রের নাশ হওয়া আবশ্যক নহে কি?

যদি বলা হয়, অবিদ্যা যখন ভেদজ্ঞান ও ভেদসংস্কার এই উভয়েরই মূল কারণ, তখন বেদান্তবাক্যদ্বারা অবিদ্যার নাশ স্বীকার করিলে, উহা ভেদসংস্কারকে নাশ করিয়াই ভেদজ্ঞানকে নষ্ট করিবে, তাহাতে বাধা কি? সত্য। কিন্তু আমরা ত তাহা স্বীকার করি না। আমরা বলি, বেদান্তবাক্য দ্বারা অবিদ্যানিবারক জ্ঞান জন্মে, এই জ্ঞানের সময়ও অবিদ্যা থাকে, ক্রমে ভোগ দ্বারা যতই প্রারব্ধ প্রতিবন্ধক ক্ষয় হয়

ততই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে থাকে। ইহার প্রমাণ আচার্য্যেরই কথা। তিনি পূর্ব্বপক্ষে আমাদের মত বর্ণনকালে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি যদি দৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে সেখানে দেখা যাইবে যে, আচার্য্য আমাদের কথা ঠিক ঠিক বলিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় খণ্ডনকালে উহা অন্যরূপ হইয়া গেল। যথা—

শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানি আত্মৈক্যবিদ্যাপ্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণম্। এবং আচার্য্যোপদিষ্টস্য অর্থস্য স্বাত্মনি এবমেব যুক্তম্ ইতি হেতুতঃ প্রতিষ্ঠাপনং মননম্। এতদ্বিরোধি-অনাদিভেদবাসনা-নিরসনায় অস্য অর্থস্য অনবরতভাবনা নিদিধ্যাসনম্। এবং শ্রবণমননাদিভিঃ নিরস্ত-সমস্ত-ভেদবাসনস্য বাক্যার্থজ্ঞানম্ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি ইতি।

অর্থাৎ—"তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে 'বেদান্তবাক্য সকল আত্মৈকত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক,' এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যার্থের গ্রহণকে শ্রবণ বলে। এইরূপ আচার্য্যোপদিষ্ট বিষয়ের, এই এই কারণে ইহা নিশ্চিতই যুক্তিযুক্ত, এইরূপ বিচার দ্বারা নিজ হৃদয়ে দৃঢ় রূপে ধারণ করার নাম মনন। এই একত্বজ্ঞানের প্রতিপক্ষ অনাদি ভেদবুদ্ধি ও তৎসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত অনবরত ঐ বিষয়ের ভাবনার নাম নিদিধ্যাসন। এই রূপে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা যাহার সমস্ত ভেদবাসনা অপনীত হইয়াছে, ('তত্ত্বমসি' ইত্যাদি) বাক্যজনিত জ্ঞান তাহারই অবিদ্যা-নিবৃত্তি করে।" এখানে ভেদসংস্কার নাশ হইলে অবিদ্যা নিবৃত্তির কথা রহিয়াছে, অবিদ্যানিবৃত্তির পর ভেদজ্ঞানের নাশের কথা হইতেছে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের মত খণ্ডনকালে তিনি ভেদবাসনার নিবৃত্তিতে ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তির কথা বলিয়া, আমাদিগকে মূঢ় বলিয়া ফেলিলেন। এস্থলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কথা বলিলে, আমাদের এত কথা বলিবার আবশ্যকতা হইত না।

আর যদি বলা হয়, আচার্য্য ভেদসংস্কার ও অবিদ্যাকে এস্থলে এক করিয়া উক্ত কথা বলিতেছেন, তাহা হইলে বলিব, তাঁহার পূর্ব্ববাক্যই অসঙ্গত হইল অর্থাৎ "ভেদবাসনায়াম্ অনিয়ন্তায়াং বাক্যং অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি" এই কথাটী নিরর্থক হয়। কারণ, এই বাক্যে

ভেদবাসনারূপ প্রতিবন্ধক ও অবিদ্যারূপ মূল কারণটী পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে। আর যদি বলা হয়, পূর্ব্ব বাক্যের সঙ্গে একথার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং অবিদ্যা ও ভেদবাসনা এস্থলে একই ভাবিয়া আচার্য্য প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিতেছেন, তাহা হইলে বলিব :—না, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ সে স্থলেব দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনের দৃষ্টান্তের খণ্ডন, এই স্থলেই আচার্য্য করিতেছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, এস্থলে আচার্য্য অবিদ্যাকে ভেদবাসনা বলিয়া বুঝিতেছেন না, আর তজ্জন্য কারণনাশে কার্য্যনাশ এই নিয়ম বলে তাঁহার এই উত্তরটীও ব্যর্থ হইয়া যাইল। ভেদ-সংস্কার নিমিত্তকারণ, সুতরাং তাহার নাশে ভেদজ্ঞান নষ্ট হইতে পারে না।

আব যদি পূর্ব্বোক্ত দোষ স্বীকার করিয়া ভেদবাসনাকেই আচার্য্য এস্থলে অবিদ্যা বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বেদান্তবাক্য দ্বারা ভেদবাসনা অর্থাৎ অবিদ্যা নষ্ট হয়, কিন্তু তখনও ভেদজ্ঞান অনুবৃত্ত হয়, এই কথাই আমাদের মুখ দিয়া বাহির করিয়া আমাদের কথা খণ্ডন করিতে চাহেন; তাহা হইলে বলিব, আচার্য্য আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে চাহেন না। যেহেতু আমরা বলি, ভেদবাসনা, ভেদজ্ঞানের নিমিত্তকারণ, এবং এই নিমিত্তকারণ বিনষ্ট হইলেও "কার্য্য" থাকিতে পারে, যেমন যে দণ্ড দ্বারা কুম্ভকারের চক্র ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, সেই দণ্ড তুলিয়া লইলেও চক্র কিয়ৎপরিমাণে ঘুরিতে থাকে। আর যদি বলা হয়, আচার্য্যমতে অবিদ্যা ও ভেদবাসনা এক বলিয়া, এই ভেদবাসনা ভেদজ্ঞানের উপাদান কারণ, সুতরাং ভেদবাসনার নাশে ভেদজ্ঞান থাকে বলিলে কারণনাশে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করা হইল, অগত্যা এ প্রকার মতবাদীকে মূঢ় বলা অসঙ্গত নহে, তাহা হইলে বলিব, আচার্য্য ঠিক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তখন আর আমরা ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়—ইহা স্বীকার করি না। কারণ, সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যা নাশ হইতে গেলে দেহনাশ আবশ্যক। কারণ, দেহাদি অবিদ্যারই কার্য্য, এজন্য সাধক যাবজ্জীবন শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠান করিয়া বা সমাধিস্থ হইয়া দেহনাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। আর এই নিদিধ্যাসনাদি অনুষ্ঠানকে কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষ স্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, কর্ম্ম-

বলিতে এমন কর্ম্মও বুঝায়, যাহা শ্রবণমননাদির বিপরীত। যেহেতু শ্রবণ-মননে সর্ব্ববিধ অভিমান পরিত্যাজ্য, এবং যাগ-যজ্ঞাদিতে আমি কর্ত্তা, আমি অধিকারী ইত্যাকার অভিমান আবশ্যক। তবে অবশ্য যতদিন অবিদ্যার কার্য্য ভেদজ্ঞানজাত ভেদসংস্কার এবং দেহ থাকে, ততদিন বেদান্তবাক্য দ্বারা অবিদ্যার অংশতঃ নাশ হয়। আর তজ্জন্য ভেদ-সংস্কারবশে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়। এ সময় অবিদ্যার নাশ সম্পূর্ণ নাশ-পদবাচ্য হয় না। ইহারই দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা দিগ্‌ভ্রম ও দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি। এ সময় ভেদজ্ঞান অনুবৃত্ত হইলেও, উহা যে মিথ্যা, সে জ্ঞানটী বিলুপ্ত হয় না; সুতরাং ভ্রষ্ট বীজের অঙ্কুরোদ্গম-সম্ভাবনা যেমন থাকে না, তদ্রূপ উহা বন্ধনের কারণ হয় না। যাহা হউক, আচার্য্য আমাদের এই দ্বিচন্দ্রদর্শন দৃষ্টান্তটীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলেন, তাহাই এইবার আমাদের বিচার্য্য। আচার্য্য বলেন—অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞান সত্ত্বেও যে অবিদ্যা থাকিতে পারে, তাহার জন্য এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। কারণ, অদ্বৈতবাদীর মতে একচন্দ্রজ্ঞানরূপ বাধকজ্ঞান সত্ত্বেও, দ্বিচন্দ্রজ্ঞান অনুবৃত্ত হয়, সুতরাং অবিদ্যানিবারক জ্ঞানসত্ত্বেও অবিদ্যার কার্য্য ভেদজ্ঞান অনুবৃত্ত হয় ইত্যাদি। আচার্য্য বলেন—এ দৃষ্টান্তে দোষ রহিয়াছে। দেখ, এস্থলে দ্বিচন্দ্র দর্শনের হেতু তিমিররোগ, ঐ তিমিররোগ সত্য পদার্থ, আর সত্য বলিয়া একত্বজ্ঞান সত্ত্বেও দ্বিত্বজ্ঞান হয়। উহা যদি সত্য রোগ না হইত, তাহা হইলে একদিন বলা যাইতে পারিত যে, একত্বজ্ঞান হইলেও ভেদজ্ঞানের উদয় ঘটিতে পারে। অথচ এই অবস্থায় আপ্তোপদেশাদির দ্বারা দ্বিচন্দ্রজ্ঞানজনিত ভ্রান্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞান হইলেও, ভেদজ্ঞান থাকিবে, তবে তাহার জন্য শোকমোহ থাকিবে না ইত্যাদি। (মূল ও অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।)

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—আচার্য্য আমাদের অভিপ্রায়ের সন্নিহিত প্রদেশেও পদার্পণ করিতে চাহেন না, অথচ আমাদের মত খণ্ডন করিতে চাহেন। কারণ, এস্থলে দৃষ্টান্ত হইতেছে, একত্বজ্ঞানরূপ সত্য বাধকজ্ঞান সত্ত্বেও ভ্রমরূপ ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়, এইটুকু অংশে,

উহার "হেতু" বা উহার জ্ঞানত্ব-অংশ দৃষ্টান্তের অংশ নহে। আমরা বলি,— তিমিররোগবশতঃ দ্বিচন্দ্রকে সত্য যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি একচন্দ্র সত্য এই জ্ঞান সত্ত্বেও প্রথম প্রথম দ্বিচন্দ্র সত্য মনে করিয়া ফেলে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তদ্রূপ ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হয়, এ জ্ঞান সত্ত্বেও জগৎকে ব্রহ্ম ভিন্ন সত্য বলিয়া মধ্যে মধ্যে বোধ হয়। তাহার পর আসল কথা এই যে, তিমিররোগটা "দ্বিচন্দ্র সত্য" এই মিথ্যা জ্ঞানের হেতুই হইতে পারে না। তিমিররোগ দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের "হেতু" হইতে পাবে, পরন্তু "উহা সত্য" এ জ্ঞানের "হেতু" হইতে পারে না। কারণ, জন্মাবধি তিমিররোগাক্রান্ত ব্যক্তি লোকমুখে "দ্বিচন্দ্র মিথ্যা" না শুনা পর্য্যন্ত দ্বিচন্দ্রকে সত্য মনে করিতে পারে; কারণ, মানুষের স্বভাবই এই যে, জ্ঞান বাধিত না হইলে তাহা সে সত্যই মনে করে। কিন্তু একবার লোকমুখে "দ্বিচন্দ্র মিথ্যা" একথা শুনিলে, আবার তাহাকে যদি সত্য বোধ করে, তাহা হইলে তাহা কি কারণে হয়, বলিতে হইবে। তাহা কি তিমিররোগবশতঃ হয় অথবা যে কারণে লোকের ভ্রম হয়, সেই কারণেই হয়—বলিবে? উত্তরে নিশ্চয়ই এস্থলে বলিতে হইবে, ইহা মনের দোষে হয় অর্থাৎ মনে যে দ্বিচন্দ্রের সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারের অপ-প্রয়োগবশতঃ হয়; তিমিররোগটী পরম্পরায় কারণ হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে সত্য তিমিররোগকে হেতু বলিয়া আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর কথা খণ্ডন করিতে পারেন না। তিমিররোগ চক্ষুরিন্দ্রিয়ে হয়; ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মনের নিকট বিষয়ের আকৃতি বহন করা, অথবা মতান্তরে নিজে পথস্বরূপ হইয়া বিষয়ে মনকে পতিত হইতে দেওয়া; সুতরাং বাধক জ্ঞান সত্ত্বেও যে ভ্রম-হেতু তাহা ইন্দ্রিয়ে থাকিতে পারে না, তাহা স্মৃতির স্থান মনে থাকে। সুতরাং আচার্য্যের এই বিপুলায়তন বিচারটী ব্যর্থ।

আর যদি কেহ এস্থলে বলিতে চাহেন যে, আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর এই দ্বিচন্দ্রদর্শন দৃষ্টান্তটী অবলম্বন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞানের মিথ্যাত্ব অংশে নহে, পরন্তু তাহা জ্ঞানের জ্ঞানাংশকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া-ছেন, তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী বলেন,—আমরা তাহাতেও পশ্চাৎপদ

নহি; আমরা এস্থলেও ইহার সমুচিত উত্তর দিতে সক্ষম। তাঁহারা যে বলেন—তিমিররোগটী সত্য বলিয়া তিমিররোগাক্রান্ত ব্যক্তির দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়, ইহা আমরাও স্বীকার কবি, এবং সে স্থলে দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণই তিমিররোগ, তাহাও বলিতে সম্মত আছি; কিন্তু যদি "ভাবনার বিষয়টী স্থূল চক্ষে পরিদৃষ্ট না হইলেও ভাবনার প্রাবল্যে তাহা তদ্রূপে প্রত্যক্ষ হয়" একথা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বিচন্দ্রদর্শনস্থলে একচন্দ্রের ভাবনাকে প্রবল করিয়া তুলিতে পারিলে সে স্থলে একচন্দ্রজ্ঞান হইবেনা কেন? দ্বিচন্দ্রজ্ঞানটী উহার দ্বারা চাপা পড়িয়া যাইবে না কেন? ভাবনার প্রাবল্যে ভাবনার বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, একথা আচার্য্যই স্বয়ং কিছু পরে স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং এ আপত্তি তাঁহার অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িতেছে। আমরা সাধারণতঃও দেখিয়া থাকি, অভ্যাসবশে কৃত কর্ম্ম অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাত-সারে সাধিত হয়; এমন কি, কেহ উহা প্রত্যক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও লোকে কখন কখন তাহা অস্বীকার করে। ইহার দৃষ্টান্ত "পা নাচান," কথার মাত্রা যেমন "বুঝলে কি না," "জান" ইত্যাদি। সুতরাং দ্বিচন্দ্র-জ্ঞান হইলেও, একচন্দ্রজ্ঞানের অভ্যাসের প্রাবল্যে দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের অনুবৃত্তি পর্য্যন্ত এক সময়ে চাপা পড়িয়া যায়, অবশ্য অভ্যাসের প্রাবল্য না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিচন্দ্রজ্ঞানটীর অনুবৃত্তি হয়, আর এ অভ্যাস "কর্ম্ম" নহে।

তাহার পর কারণের সত্যতা প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি কথন—এ প্রসঙ্গে নিরর্থক; কারণ, কারণ মাত্রই কার্য্য অপেক্ষা সত্য, এবং ভ্রমজ্ঞানই হউক বা যথার্থ জ্ঞানই হউক, সকল স্থলেই জ্ঞানোৎপত্তির একটা কারণ থাকে; সুতরাং "তিমিররোগ সত্য, তাই দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়" আচার্য্যের একথার কোন সার্থকতা নাই। যে কোন জ্ঞানটী যে পরিমাণে দৃঢ় বা বদ্ধমূল থাকে, তাহার বাধকজ্ঞান সেই পরিমাণ দৃঢ় বা বদ্ধমূল হইলে, বাধ্য জ্ঞানটী নষ্ট হইতে বাধ্য, এবং যতক্ষণ সমান দৃঢ় বা বদ্ধমূল না হয়, ততক্ষণ তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং এই কথার ভিতর আচার্য্য যে কোথায় খণ্ডনের বিষয় পাইলেন, অদ্বৈতবাদী বলেন, তাহা আমরা বুঝি না।

এইবার আচার্য্যের এই প্রসঙ্গে শেষ কথা। যথা—

অপি চ ভেদবাসনা-নিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তি র্ন সেৎস্যতি, ভেদবাসনায়া অনাদিকালোপচিতত্বেনাপরিমিতত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধভাবনায়াশ্চাল্পত্বাদনয়া তন্নিরাসানুপপত্তেঃ। অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যজ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতম্ ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ—"আর এক কথা, যাঁহারা ভেদবাসনা অপনয়নের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতে কখনও জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ভেদবাসনা অনন্তকালসঞ্চিত, সুতরাং অপরিমিত; আর, তাহার বিপক্ষ জ্ঞানবাসনা (অল্পকালের বলিয়াই) অল্প, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই (প্রবল) ভেদবাসনার নিরাস হইতে পারে না, অতএব নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দগম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্তবাক্যের বিধিৎসিত, অর্থাৎ বিধান করিতে অভীপ্সিত অর্থ—বাক্যার্থ নহে"। প্রত্যুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ভেদবাসনার অনাদিত্ব আমরা স্বীকার করি না। আমরা সত্য ব্রহ্ম এবং মিথ্যা অবিদ্যার অনাদিত্ব স্বীকার করি। কারণ, ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ভেদজ্ঞানের ব্যবহারে ভেদসংস্কার জন্মে। সুতরাং আচার্য্য কি করিয়া এস্থলে একথা লইয়া আমাদের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন? অবশ্য ভেদবাসনাকে অবিদ্যা বলিলে, উহাকেও অনাদি বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ভেদবাসনা ও অবিদ্যা যে এক, একথা আমরা বলি না। তাহার পর "সুদীর্ঘকালসঞ্চিত ভেদবাসনা অল্পকালের জ্ঞানবাসনার নাশ্য হইতে পারে না" আচার্য্যের একথায় আমাদের মতের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ইহার উত্তর পরে দিতেছি।

আর যদি আচার্য্যের কথা মানিয়া লইয়া ভেদবাসনাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে বলিব যে, ভেদসংস্কার যদি অনাদি হইতে পারে, তবে জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রবৃত্তিটীও কি অনাদি হইতে পারে না? আমরা না হয় বলিব, উভয় সংস্কারের যুদ্ধ চলিতে চলিতে যে জন্মে ভেদসংস্কার পরাভূত হয়, সেই জন্মেই জ্ঞান পূর্ণ হইল, উক্ত জ্ঞানবিকাশের কারণ কর্ম্ম নহে, উহা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠান। তুলার স্তূপে অগ্নিকণা পতিত হইয়া বহু বিলম্বে যদি তাহা তুলাস্তূপকে প্রজ্বলিত

করে, তাহা হইলে কি তাহাতে পুনঃ অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে বলিতে হইবে? কিম্বা, যদি ভেদসংস্কার অনাদিই হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানটী অল্প-দিনের সম্পত্তি হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? ভেদসংস্কার মিথ্যা বলিয়া সাদি সত্য তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইতে বাধা কি? যদি বলা হয়—অনাদিকে সাদি কেমন করিয়া বিনষ্ট করিবে? তাহা হইলে বলিব—উহা যে, কোন স্থলেই করিতে পারিবে না, এমন নিয়ম আচার্য্য কোথায় পাইয়াছেন? আমাদের দৃষ্টান্ত এজন্য জ্ঞান ও অজ্ঞান। আচার্য্য ইহা অনুভব করুন, করিয়া বলুন, অনাদি অজ্ঞান সাদি জ্ঞানের নাশ্য কি না? যাহা প্রত্যক্ষীকৃত সত্য, তাহাকে শত অনুমান হটাইতে পারে না।

ফলতঃ দেখা যাইতেছে, আচার্য্য রামানুজ অশেষগুণালঙ্কৃত সুবুদ্ধি-মান্ এবং ঈশ্বরশক্তিসমন্বিত হইলেও, তিনি আমাদের অদ্বৈতবাদের বিপক্ষে বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি নিজ মত বর্ণন করিয়া লোককে ভগবদ্দাস্যে নিয়োজিত করুন, উপাসনা-পদবাচ্য জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমুচ্চয় সঙ্গত বলিয়া প্রচার করুন। কারণ, শ্রুতিমধ্যে কোন কোন স্থলে উপাসনাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, প্রত্যুত আমরা তাহাতে উৎসাহই প্রদান করিব; কিন্তু তিনি বস্তুজ্ঞানরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত উপাসনা-পদবাচ্য জ্ঞান বা কর্ম্মের সমুচ্চয়-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে এবং তজ্জন্য অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া সার সত্যের অপলাপে প্রয়াসী হইলে, অগত্যা আমাদিগকে সেই সত্যরক্ষার্থ আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে।

এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদসংক্রান্ত আচার্য্য রামা-নুজের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। বারান্তরে এই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদের সপক্ষে আচার্য্যগৃহীত শ্রুতিপ্রমাণ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

তিনিই করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কে ঐরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি যে, আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় পূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা করা এতদিনের পরে সার্থক হইয়াছে!"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণী মনে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, ঠাকুরের ভোজনাবশিষ্ট দেবপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৺রঘুবীরের জীবন্ত দর্শন স্থায়িভাবে লাভ করিয়া প্রেমগদ্গদ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালের পূজিত রঘুবীর শিলাটিকে সযত্নে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিলেন!

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়া সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। পরস্পরের দর্শন ও আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে পঞ্চবটীতে দিনের পর দিন যে কোথা দিয়া যাইতে লাগিল, তদ্বিষয় উভয়ের মধ্যে কাহারও অনুভবে আসিল না। ঠাকুর নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধীয় রহস্য কথা সকল অকপটে ব্রাহ্মণী মাতাকে বলিয়া সর্ব্বদা নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী, নানা তন্ত্রগ্রন্থ-সমূহ হইতে ঐ সকলের সমাধান করিয়া এবং কখন বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে অবতার পুরুষের দেহ-মনে ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগ কিরূপ লক্ষণ সকলের আবির্ভাব করে, তদ্বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইয়া, ঠাকুরের সংশয় সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীতে ঐরূপে দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিল।

ছয় সাত দিন ঐরূপে কাটিবার পর, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ঠাকুরের মনে হইল, দোষসম্পর্ক না থাকিলেও, ব্রাহ্মণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কামকাঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে না পারিয়া, পবিত্রা রমণীর চরিত্র-সম্বন্ধে নানা কথা রটনার অবসর পাইবে। মনে ঐ কথার উদয় হইবামাত্র তিনি ব্রাহ্মণীকে উহা ইঙ্গিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণীও মনে মনে উহার যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং নিকটেই গ্রামমধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছু কালের জন্য আসিয়া ঠাকুরের সহিত

দেখা করিয়া যাইবার সংকল্প স্থির করিয়া, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

কালীবাটীর অনতিদূরে উত্তরে ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের মধ্যে দেবমণ্ডলের ঘাট—ব্রাহ্মণী এই স্থানে আসিয়া আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন* এবং গ্রামমধ্যে যথা তথা পরিভ্রমণ করিয়া, নিজগুণে গ্রামস্থ রমণীকুলের শীঘ্রই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বাসস্থান ও ভিক্ষা কোন বিষয়েরই এখানে তাঁহার আর অসুবিধা রহিল না এবং লোকনিন্দার ভয়ে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভেও তাঁহাকে একদিনের জন্যও আর বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালীবাটীতে আসিয়া, ঠাকুরের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইতে লাগিলেন এবং গ্রামস্থ পরিচিত রমণীকুলের নিকট হইতে নানাপ্রকার খাদ্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিয়া, ঠাকুরকে ভোজন করাইতেও লাগিলেন।†

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভব, দর্শন ও অবস্থাদির কথা শুনিয়া, বিশিষ্ট সাধিকা ব্রাহ্মণীর নিশ্চিত ধারণা হইল—ঐ সকল অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেম হইতে উপস্থিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরালাপে ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে বাহ্য চৈতন্যের লোপ ও কীর্ত্তনে পরমানন্দ দেখিয়া, তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল—ইনি সামান্য সাধক মাত্র নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতাদি গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া আগমনের কথার যে সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর

---

* হৃদয় বলিতেন, দেব মণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই ব্রাহ্মণীকে প্রদান করিয়া, তাঁহাকে মণ্ডলদের বাটী পাঠাইয়া দেন এবং তথায় যাইবামাত্র ৺নবীনচন্দ্র নিয়োগীর ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, কেবলমাত্র ঐ ঘাটের ঘরে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, কিন্তু একখানি তক্তাপোষ, এক মণ চাল, ডাল, ঘি ও অন্যান্য ভোজনসামগ্রীও তৎসহ প্রদান করিয়াছিলেন।

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৮ম অধ্যায় ২ . পৃষ্ঠা হইতে ২:৬ পৃষ্ঠা দেখ।

স্মৃতিপথে সেই সকল কথাই পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। সুপণ্ডিতা ব্রাহ্মণী, ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চালচলন আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সে সকলের সহিত ঠাকুরের চালচলনাদি তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইয়া উহাদের সৌসাদৃশ্যও দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার, ঈশ্বরবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্যদেবের নিরন্তর গাত্রদাহ, স্রক্‌-চন্দনাদি যে সকল পদার্থের ব্যবহারে প্রশমিত হইবার কথা গ্রন্থনিবদ্ধ আছে, ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব গাত্রদাহ প্রশমনের জন্য ঐ সকলেব প্রয়োগ করিয়া তদ্রূপ ফলও পাইলেন।* সুতরাং পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণীর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় প্রথম দিনের দিব্যদর্শন, পূর্ব্বোক্ত কথা সকলের সহিত একযোগে সমুদিত হইয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিল, ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে এ যুগে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দেব উভয়ে ঈশ্বরপ্রেম প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরাগমন করিয়াছেন। সিহড় গ্রামে যাইবার কালে, ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবয়স্ক দুই জনকে বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন—একথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি—ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাস-বতী হইলেন এবং বলিলেন "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব!"

সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না; শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা অপরের নিকট প্রকাশে নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইবার শঙ্কাও রাখিতেন না। সুতরাং আপন মীমাংসা প্রথমে ঠাকুর ও হৃদয়ের নিকটে এবং পরে জিজ্ঞাসিতা হইলে অপর সকলের নিকটেও বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। শুনিয়াছি এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুর বাবুর সহিত বসিয়া-

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় ৪—৬ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরানাথকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে।* তার অনেক (শাস্ত্রগ্রন্থ) দেখা শুনা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে যাই বলুক্ না বাবা, অবতার ত আর দশটির অধিক নাই? তবে তার কথা সত্য হবে কেমন ক'রে? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হ'য়েছে, একথা সত্য।"

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি?—যাঁহার কথা আপনি বলিতেছিলেন?" ঠাকুর স্বীকার করিলেন এবং দেখিলেন—ব্রাহ্মণী কোথা হইতে এক থাল মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরাণী যশোদা যে ভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে যেন ভাবাবিষ্টা হইয়া, তাঁহাদিগের দিকে অন্যমনে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুর বাবুকে দেখিতে পাইয়াই ব্রাহ্মণী সযত্নে আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নথালটি প্রদান করিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর, মথুর বাবুকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "ওগো! তুমি আমাকে যা বল, সে সব কথা আজ ইঁহাকে ব'ল্‌ছিলাম, তা ইনি বল্‌ছেন্ 'অবতার ত দশটি ছাড়া আর নাই।'" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কেন? শ্রীমদ্ভাগবত বাইশটী প্রধান প্রধান অবতারের কথা বলিয়া, পরে অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছেন ত? তা ছাড়া বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথায় স্পষ্ট

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় ৪—৬ পৃষ্ঠা।

উল্লেখ আছে এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার প্রধান প্রধান সকল বিষয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।". ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে ঐ বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ যে কোন ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, মথুরানাথ নীরব রহিলেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর ছোট বড সকল মানবই জানিতে পারিল এবং উহা তাহাদের মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিল। ঐ আন্দোলনের ফলাফল আমরা অন্যত্র সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* সুতরাং এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সহসা দেব-পদবীতে আরূঢ করাইয়া, সকলের সমক্ষে তাঁহাকে দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও, অহঙ্কার-প্রবৃদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তবে, তাঁহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াই যে, তিনি ঐ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ সকলের মতামত জানিতে উৎসুক হইয়াছিলেন এবং বালকের ন্যায় মথুরানাথকে ঐরূপ পুরুষ সকলকে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন—একথা সত্য। ঐ অনুরোধের ফলেই পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পুনরাগমন হয়। বৈষ্ণবচরণের সহিত সম্মিলনে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে নিজ মতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল কথাও আমরা অন্যত্র পাঠককে বলিয়াছি।†

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম অধ্যায় (১৫৩—১৫৫ পৃষ্ঠা), ৬ষ্ঠ অধ্যায় (১৭১—১৭৩) ও উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় দেখ।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় ১৯—২০ পৃষ্ঠা।

সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

একদিন বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

সন্ন্যাসীদের কার্য্যে—যথা মঠ ও মণ্ডলী পরিচালনা, জনসমাজে ধর্ম্মপ্রচার ও অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রবর্ত্তন, ত্যাগ ও ধর্ম্ম মতামত সম্বন্ধীয় স্বাধীন চিন্তার সীমানিরূপণ ইত্যাদিতে—সংসারী বা কামকাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মতামত দিবার কিছুমাত্র অবসর থাকা উচিত নহে। সন্ন্যাসী ধনী লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না—তাহার কাজ গরিবকে লইয়া। সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য—গরিবদের পরম যত্নের সহিত প্রাণপণে সেবা—আর এইরূপ সেবা করিতে পাইলে পরমানন্দ অনুভব করা। আমাদের দেশের সমুদয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভিতর ধনী লোকের তোষামোদ করা ও তাহাদের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করার ভাব প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি, তাঁহার কায়মনোবাক্যে ইহা ত্যাগ করা উচিত। এরূপভাবে ধনী লোকের পেছনে ঘোরা বেশ্যারই উপযুক্ত, সংসারত্যাগীর পক্ষে নহে। কাম-কাঞ্চনত্যাগ—ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূলমন্ত্র—সুতরাং ঘোর কামকাঞ্চনে মগ্নব্যক্তি কি করিয়া তাঁহার শিষ্য বা ভক্তরূপে পরিগণিত হইতে পারে? তিনি ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মা, আমার কাছে এমন একজন লোক কথা কয়বার জন্য এনে দে, যার ভিতর কামকাঞ্চনের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই, সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ জলে গেল।" তিনি আরও বলিতেন, "সংসারী ও অপবিত্র লোকের স্পর্শ আমি সহ্য কর্‌তে পারি না।" তিনি "ত্যাগীর বাদশা" ছিলেন—সংসারী লোকে কখন তাঁহাকে প্রচার

করিতে পারে না। সংসারী গৃহস্থ লোক কখন সম্পূর্ণ অকপট হইতে পারে না—কারণ, তাহার কিছু না কিছু স্বার্থপর উদ্দেশ্য থাকিবেই। ভগবান্ স্বয়ং যদি গৃহস্থরূপে অবতীর্ণ হন, আমি তাঁহাকে কখন অকপট বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। গৃহস্থলোক যদি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা হয়, তবে সে ধর্ম্মের নামে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করিতে থাকে, আর তাঁহার ফল এই হয় যে, সম্প্রদায়টী একেবারে আগাগোড়া গলদে পূর্ণ হইয়া যায়। গৃহস্থগণ যে সকল ধর্ম্ম আন্দোলনের নেতা হইয়াছেন, তাহার সকলগুলিরই ঐ এক দশা হইয়াছে। ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না।

একজন সন্ন্যাসী শিষ্য জিজ্ঞাসিলেন,

স্বামীজি, কাঞ্চন ত্যাগ কাকে বলা যায়?

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন,—

হাঁ, তোর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিছি। সংসারত্যাগ করে এসেই আমার ও মঠের টাকাকড়ি রাখ্‌বার ভার তোর উপর পড়েছে কিনা—তাই তোর মনে এই সন্দেহ হয়েছে। এখন এর মধ্যে বুঝ্‌তে হবে এইটুকু যে—উপায় আর উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, উদ্দেশ্য একই, কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য—নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের হিত করা "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" আর ঐ উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান উপায়—কামকাঞ্চন ত্যাগ। কিন্তু এটী বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্যাগ অর্থে মনের আসক্তি ত্যাগ—সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের ভাব ত্যাগ। নহিলে আমি অপরের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিলাম—হাতে টাকা ছুঁইলাম না—কিন্তু টাকা দ্বারা যে সব সুবিধা হয় সব ভোগ করিতে লাগিলাম—তাহাকে কি আর ত্যাগ বলা যায়? যে সময়ে গৃহস্থেরা মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকারগণের উপদেশ মানিয়া সন্ন্যাসী অতিথিদিগের জন্য তাঁহাদের খাদ্যের কিয়দংশ পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিতেন, সে সময় সন্ন্যাসীর পক্ষে কাছে

পয়সা কড়ি কিছু না রাখিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিলে কাঞ্চন ত্যাগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। এখন কিন্তু কালধর্ম্মে গৃহস্থের সে ভাব বড়ই কম—বিশেষতঃ, বাঙ্গালাদেশে ত মাধুকরী ভিক্ষার প্রথাই নাই। এখন মাধুকরী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিলে অনর্থক শক্তিক্ষয়ই হইবে,* কিছু লাভ হইবে না। ভিক্ষার বিধান কেবল সন্ন্যাসীর পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয় সিদ্ধির জন্য—কিন্তু ঐ উপায়ে এখন আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এ অবস্থায় যদি কোন সন্ন্যাসী নিজের জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র অর্থের সংগ্রহ করিয়া যে উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তাহার সিদ্ধির জন্য সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতাচরণ হয় না। অনেক সময় লোকে অজ্ঞতাবশতঃ উপায়কেই উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। দুই একটা দৃষ্টান্ত ভাবিয়া দেখ। অনেক লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়সুখভোগ। তাহার উপায়-স্বরূপে সে টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এখানেও উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায়ের প্রতি এতদূর আসক্ত হয় যে, টাকা সঞ্চয়ই করিতে থাকে, উহা ব্যয় করিয়া যে ভোগ করিবে, তাহার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার থাকে না। আরও দেখ, কাপড় চোপড় কাচিবার উদ্দেশ্য—শুচি ও শুদ্ধ হওয়া। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে কাপড় চোপড় শুধু একবার জলে ফেলিয়া নিংড়াইয়া লইলেই শুচি হইলাম মনে করি। এই সব জায়গায় আমরা উপায়কে উদ্দেশ্যের আসনে বসাইয়া গোলমাল করিয়া ফেলি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কখনই ভুলা উচিত নহে।

---

* অবশ্য ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, স্বামীজি মাধুকরী ভিক্ষার বিপক্ষ ছিলেন। তিনি অনেক সন্ন্যাসী শিষ্যকে মাধুকরী ভিক্ষা করাইয়াছেন এবং স্বয়ংও অনেক দিন উহা করিয়াছেন। এখানে তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কাঞ্চন ত্যাগ বলিলে উহার অর্থ সকল সময়ে সকল অবস্থায়ই যে অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। ইতি লেখক।

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)।

(ইনি যোগিনী মা নামে পরিচিতা ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জীবনকাহিনীর কতক কতক অংশ তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি, তদবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।)

১

আজ যথার্থই পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যখন গৃহে ছিলাম, তখন এই পথটী বড় লোভনীয় বলিয়া মনে হইত। পাখী যেমন খাঁচার পথ খুঁজে, তেমনি মন দিবানিশি পথের চিন্তাই করিত। কেবলই মনে হইত, "কবে আমি পথে বাহির হইব ?" আজ এতদিনের সেই সাধ পূর্ণ হইয়াছে, যথার্থই আমি পথে বাহির হইয়াছি।

আমি আজ পথে বাহির হইয়াছি! ভাবিলে যেন আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু জগতে "আশ্চর্য্য" বলিয়া কোন কথা নাই। আমি যে পথে বাহির হইয়াছি, একথা যেন আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু এই তো তারকেশ্বরের রাজপথ, চৈত্রের গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসীর দল পথে ভিড করিয়া চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে গগনভেদী স্বরে "বম্ বম্ মহাদেব" ধ্বনি উঠিতেছে। সেই পথেরই একপ্রান্তে আমি দাঁড়াইয়া আছি। দাঁড়াইয়া আছি কেন, না, সন্ন্যাসীর ভিড়ে পথে চলিতে পারিতেছিনা, নহিলে আমার অতি উৎকণ্ঠিত মন কখনও এমন ভাবে পথপ্রান্তে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিত না।

মনের এই দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি যে কতদিন হইতে হইয়াছে, ভাবিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। মনে হয় যেন আমার জ্ঞানের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই এই উৎকণ্ঠারও সঞ্চার হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহা নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে আর এই পূর্ণ একবিংশতি বৎসরে সেই উৎকণ্ঠা আর

সকল ভাবের আশ্রয়ই পরিহার করিয়া কেবলমাত্র একই ভাবে একাগ্র হইয়া এতই বলশালী হইয়াছে যে,—আমি কুলকন্যা, কুলবধূ—আজ আমাকে পথের বাহির করিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসরে বিবাহান্তে প্রথমে শ্বশুরগৃহে গিয়া রুগ্ন স্বামীর শুশ্রূষার ভার পাইয়াছিলাম। পুতুল খেলায় যেমন আমার তন্ময়তা ছিল, দেখিলাম পীড়িতের শুশ্রূষায়ও মন ঠিক সেই রকমই লাগিয়া গিয়াছে। তখন কি চিন্তা ছিল? কখন্ স্বামীকে পথ্য দিতে হইবে, কখন্ ঔষধ খাওয়ার সময়, কোন্‌টী ত্রুটি হইল, এই সকল বিষয় গুলিই তখন আমার চিন্তার বিষয় ছিল। আমি প্রায় সর্ব্বদাই স্বামীর প্রয়োজন মত তাঁহাব নিকটে উপস্থিত থাকিতাম। নববধূর এরূপ আচরণ অনেকে পছন্দ করিতেন না। এইরূপ আচরণে যে আমাব নিন্দা হইত না তাহা নহে। কতবার স্বকর্ণে নিন্দা শুনিয়াছি,—কিন্তু কি যে বিচিত্র স্বভাব, নিন্দা হইবে এজন্যও কিছুমাত্র শঙ্কা হইত না।

পিত্রালয়ে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "চুরি করিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন, মিথ্যা কথা বলিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন।" কিন্তু আমি মাঝে মাঝে চুরি করিয়া—ঘরে চাল আলু আর পোস্ত থাকিত তাহাই লইয়া—ভিখারীদের দিতাম।—"শ্যামসুন্দর যদি পাপ দেন?" তখনই শ্যামসুন্দরের কাছে যাইতাম, বার বার প্রণাম করিয়া বলিতাম, "শ্যামসুন্দর পাপ দিওনা" "শ্যামসুন্দর পাপ দিওনা"। শ্যামসুন্দরের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি হাসিতেছেন, "নাঃ, শ্যামসুন্দর আমায় কখনো পাপ দেবেন না। না হলে হাস্‌ছেন্ কেন?"—আমাদের সেই শ্যামসুন্দব! যে কাজটায় বিপদে পড়ি,—শ্যামসুন্দর সহায় আছেন। দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে বলি, "শ্যামসুন্দর, দুধ যেন উৎলে পড়ে না।" কড়ি খেলতে বসে বলি, "শ্যামসুন্দর, আমার যেন ভাল দান পড়ে।"

আমাদের সেই শ্যামসুন্দর! স্কুলে গিয়া শুনিলাম—মেম্ বলিতেছে, "মাটীর ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা; একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। তোমরা বল, প্রতিমা পূজা করিব না।" মেয়েরা সমস্বরে বলিত, "প্রতিমা পূজা করিব না।" শুনিয়া রাগে আমার শরীর জ্বলিতে লাগিল। শ্যামসুন্দর

তো মাটীর ঠাকুর, শ্যামসুন্দর নাকি মিথ্যা? স্কুলের ছুটি হইলে সকল মেয়েদের একত্র করিয়া বলিলাম, "ভাই, তোমরা বল তো শ্যামসুন্দর সত্য না মিথ্যা?" আমার কথায় সকল মেয়ের মুখ শুখাইয়া গেল, তাহারা একথা মোটেই ভাবে নাই। আমি বলিলাম,—খুব রাগিয়াই বলিলাম, "শ্যামসুন্দর সত্য, সত্য, সত্য, কখনও মিথ্যা নয়। কাল স্কুলে গিয়া মেমের সম্মুখে এই কথা বলিবে।" তখনই মেমের হস্তস্থিত সেই সুগোল লম্বা বেতগাছটী সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে বেতকে কে না ভয় করে? আবার আমার রাগকেও ভয় আছে। কয়েকজন সকাতরে বলিল, "মেম্, ভাই তা হলে মারবে।" মার খাবার ভয়? শঙ্কা কাহাকে বলে, সে জ্ঞান বিধাতা আমায় দেন নাই। কেন? না, সকল মেয়েই প্রহার যে কেমন মধুর তাহা বেশ জানে, কেবল আমিই জানিনা। প্রহারের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত কোন পরিচয় নাই। আমি বলিলাম, "আমি সকলের আগে দাঁড়াইব। মেম যদি মারে, আমি মার খাইব, বলিব যে আমিই সকলকে শিখাইয়াছি।"—মেয়েরা আমার উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আবার ভয়ও পাইতে লাগিল। যাহা হউক শেষে তাহাদের ভয় সারিয়া গেল।

পরদিন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের সময় আমি সকলের আগে দাঁড়াইয়াছি, মেয়েরা আমার কিছুদূরে পিছনে। মেমের হাতের কাছে সেই সুগোল লম্বা চক্‌চকে বেতগাছটী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া আমার ভয় হইবে কি, "শ্যামসুন্দরকে মিথ্যা বলিয়াছে?" তাহাই মনে করিয়া রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল। যাই মেম্ বলিল, "মাটীর ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা," তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "মাটীর ঠাকুর সত্য, সত্য, সত্য"। আমার পিছন হইতে মেয়েরাও সেই সঙ্গে যোগ দিল। মেম একেবারে নির্ব্বাক্; রাগ করিবে কিনা তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, অবশেষে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে আমাকে নিকটে ডাকিয়া মৃদু মিনতির স্বরে বলিল, "শরৎ, বালিকা নষ্ট করিও না।"

মেয়েরা ভাবিয়াছিল, আমাকে খুব মার খাইতে হইবে, কিন্তু ঠিক

তাহার বিপরীত হইল। সেইদিন হইতে মেমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইয়া গেল। আমি তুপুর বেলায় জল খাবারের ছুটীর সময় বাড়ী হইতে কোঁচড়ে করিয়া কাঁচা পেয়ারা আনিয়া সকল মেয়েদের সঙ্গে একত্রে যখন খাইতাম, মেমকেও তুটী একটী দিতাম। অবশেষে মেমের পেয়ারার উপর অতিশয় লোভ দেখিয়া একদিন এক ঝুড়ি পেয়ারা আনিয়া দিয়াছিলাম।

শ্যামসুন্দরের কথা যখন উঠিল, তখন সেই গোয়ালার ছেলের কথা আরও তুএকটী বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। মা কথায় কথায় বলিতেন, "শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে।" মার কথায় প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য হইতাম, ভাবিতাম—ব্রাহ্মণ হইয়া আমরা গোয়ালার ছেলের প্রসাদ কেমন করিয়া খাই? তার পরে দেখিলাম, শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে হইলে কি হয়, শ্যামসুন্দরই বাড়ীর রাজা। যখন ধানভানা হইতেছে, তখন শুনি যে, শ্যামসুন্দরের জন্য চাল হইতেছে; যখন ডাল ভাঙ্গা হইতেছে, তখন শুনি যে, শ্যামসুন্দরের ডাল, হাত দিতে নাই, এই রকম তরী-তরকারি দই সবই শ্যামসুন্দরের; বেশী কথা কি, খাবার জিনিষ মাত্রই শ্যামসুন্দরের। তবে আর শ্যামসুন্দরের প্রসাদ না খাইয়া উপায় কি, প্রসাদ না খাইলে কি উপবাস করিয়া মরিব? মাকে যখন বলিলাম, "মা, শ্যামসুন্দর যে গোয়ালার ছেলে, প্রসাদ খাইলে জাত যায় না?" মা শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন, "এখনও কি আর গোয়ালাই আছে, বামুন বাড়ী থেকে থেকে বামুন হয়ে গিয়েছে।" মা আমাদের চেয়েও শ্যামসুন্দরকে বেশী ভালবাসিতেন। একদিন ভোগ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মা স্নান করিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, ঘুম ভাঙ্গিবা-মাত্র উঠিয়াই বলিলেন, "ভোগে চুল আছে, আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়া হয় নাই। আমায় হাত দিয়ে দেখিয়ে গেল যে, ভোগে এই এত বড় এক গাছি চুল আছে, আমার খাওয়া হয় নাই।" ভোগ আনিয়া ভাঙ্গিয়া দেখিলেন, যথার্থই ভোগের ভিতর চুল, দেখিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন— "বেলা কি কম হয়েছে, শ্যামসুন্দর উপবাসী আছেন।" আমাদের যদি কোনদিন খাওয়া না হয়, মা কি তাহলে কাঁদেন? জ্বর হয়ে যে কতদিন

উপবাস করে থাকি, মা একদিনও তো কাঁদেন না। আর আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়ার বেলা হয়ে গেল বলে মার এত কান্না।

শ্যামসুন্দরকে আমরা যখন তখন গিয়া প্রণাম করিতাম। বাবা মাকে কখনও প্রণাম করি নাই; ঠাকুরের নিকট বাবা মা যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, কেবল সেই রকম প্রণাম করিতে শিখিয়াছিলাম। শ্বশুরবাড়ী গিয়া প্রণাম করিতে হয়, মা অনেক করিয়া বলিয়াছেন। কেমন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, আমি তো জানি না, সকলের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, সকলে দেখিয়া হাসিয়া খুন, "এ আবার কি প্রণাম?" আবাব কেহ বা "এত বড় মেয়ে প্রণাম করিতেও জানে না?" বলিয়া নিন্দা করে।

কথায় কথায় অনেক দূব আসিয়া পড়িয়াছি।—নিন্দা হইবে এ ভয় আমার কোন কালে ছিল না, সেজন্য অনেকের প্রিয় হইতাম আবার অনেকের অপ্রিয় হইতাম। স্বামী কিছুদিন ভুগিয়া সেবাব আরাম হইলেন, মনে হইল যেন বেশ সুস্থ হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "তুমি এবার আমায় বাঁচাইলে।" আমি হাসিতে লাগিলাম, "আমি বাঁচাইলাম! বেশ তো কথা! আমি কি শ্যামসুন্দর নাকি?" স্বামী আরাম হইলেন, কিন্তু ভাল করিয়া খাইতে পারিতেন না। আমার উপর রাঁধিবার ভার ছিল। রাঁধিতে গিয়া আমার কান্না আসিত, এত অল্প তেল ঘিয়ে কেমন করিয়া রাঁধিব? স্বামী রান্না ঘরে আসিয়া দেখেন, আমি কাঁদিতেছি, কান্নার কারণ জানিয়া ভাঁড়ার হইতে লুকাইয়া তেল ঘি আনিয়া দিতেন। সকলে রান্নার খুব সুখ্যাতি করিত, কিন্তু যিনি লুকাইয়া তেল ঘি আনিয়া দিতেন, অর্দ্ধেক সুখ্যাতি তাঁহার হওয়া উচিত ছিল।

ছয়মাস কাটিয়া গেল। ছয়মাস পরে আমি একখানি পত্র পাইলাম, সেখানি আমার স্বামীর কোন ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম, আমার স্বামী ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। আরও তিনি আমায় লিখিয়াছেন, আপনার স্বামীর জীবনের স্থায়িত্বের অনেকটা আপনারই উপর নির্ভর করিতেছে। কেন, তিনি তাহা একবারে খুলিয়া লেখেন নাই, তবে তাহার কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

আমার বয়স তখন ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। আকস্মিক বজ্র-পাতের তুল্য এই পত্রখানি পাইয়া সহসা আমি বালিকাকাল হইতে একেবারে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইলাম। বৈধব্যই যে আমার অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় বিধিলিপি, সেইদিন তাহা বুঝিলাম। সে বিধিলিপি কতদিনে পূর্ণ হইবে, স্বামীর আয়ু—আর কতদিন তাহা আমি জানি না, শ্যামসুন্দর জানেন; কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটিতেও যেন তাঁহার এই অল্পাবশিষ্ট দিন আরও হ্রাস না হইয়া যায়, সেজন্য আমি সেইদিন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। একটী একটী দিন যাইত, আর ভাবিতাম, জানি না আর কতদিন '—সে কি দারুণ উৎকণ্ঠা? প্রতি মুহূর্ত্ত সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের প্রতীক্ষায় রহিতাম। আমি যে এই অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন করিতাম, স্বামী তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না। তখন আমি এতই কপটতা শিখিয়াছিলাম।

যে দিনের প্রতীক্ষায় দিনে দিনে পলে পলে এই দারুণ উৎকণ্ঠা বহন করিতেছিলাম—সে দিন আসিল, আবার সে দিন অতীতও হইয়া গেল। কিন্তু আমার কি উৎকণ্ঠার শেষ হইল? তাহা তো নয়! মন যখন শোকের জড়তা হইতে কিছু পরিমাণে মুক্ত হইল, তখন প্রথমেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল, "এ জীবন কিসের জন্য?" কেন যে বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া থাকিয়া যে কি লাভ হইবে, এইরূপ প্রশ্নের অঙ্কুশে মন দিবানিশি আহত হইতে থাকিল। গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা লইব, তখন এই আবার এক নূতন কামনা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা পাইব, এই এক নূতন উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল।

এ জীবন এই ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। অতিশয় বেগবতী নদী যেমন উপলখণ্ডের বাধা মানেনা, মন সেইরূপ নিন্দা প্রশংসার বাধা মানে নাই, সামাজিক নিয়মেরও বাধা কখনও মানিয়া চলে নাই। কিন্তু একটু বিশেষত্ব ছিল—মন যাহা মনে করিত "ইহাই বিধি", প্রাণপণে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিত। তখন কেবল এই দিকেই লক্ষ্য থাকিত, যাহা নিয়ম তাহা যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়। এইজন্য দীক্ষা লইবার

পর পূজার্চ্চনায় যখন মন নিবিষ্ট হইল, তখন সে এক বিষম রাজসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। পূজায় ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি ষোড়শোপচারের কোন অঙ্গহানি হইত না। পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে দিবা অবসানপ্রায় হইত। মা আমার, আমার জন্য অনাহারে প্রসাদ লইয়া বসিয়া থাকিতেন, কোনদিন একটুও অনুযোগ করিতেন না। কিন্তু আর, সকলেই, এমন কি, পিতা পর্য্যন্ত আমার এই বিষম বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইতেন।

তবুও তো মনের সেই উৎকণ্ঠার অনলদাহ নিবিল না! তৃপ্তি কোথায়?—কিছুদিন মন মন্ত্রদীক্ষা পাইয়া "একটা কিছু পাইয়াছি"—বলিয়া যেন কতক শান্ত ছিল, কিন্তু আবার যত দিন যাইতে লাগিল, "দীক্ষা লইয়া কি পাইলাম" মনে ক্রমশঃ এই বিচার উঠিতে লাগিল। পূজার্চ্চনার নিরূপিত সময় ক্রমেই যত বাড়াই, ব্যাকুলতাও তত বাড়িয়া যায়। "কোথায় তুমি হে উপাস্য, আমার আকাঙ্ক্ষার নিধি! এ জীবনে ধরা তো দিলে না। তবে আর এ বৃথা জীবন বহন করিয়া ফল কি? প্রতিদিন এই সকাল, এই সন্ধ্যা, এই আহার নিদ্রা নিত্যকর্ম্ম—ইহা ভিন্ন জীবনে আর কি আছে? পূজার্চ্চনা,—সেও তো নিয়মিত নিত্য কর্ম্ম মাত্র! এমন জীবন আর আমার সহ্য হয় না।" একদিন স্নান করিতে গিয়া মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলাম, "এ জীবন আর রাখিব না।" দুর্দ্দম মনোবেগ আজ আমাকে আত্মহত্যারূপ পাপের পথে প্রবৃত্ত করিল।—সাঁতার দিতে আমি মৎস্যের মত পটু, তবে কেমন করিয়া ডুবিব? জল লইবার জন্য যে কলসী আনিয়াছিলাম, তাহাই গাত্রমার্জ্জনী সাহায্যে দৃঢ় করিয়া গলায় বাঁধিলাম, বাঁধিয়া ধীরে ধীরে নদীতে নামিয়া নিশ্চিন্তমনে জলে ডুবিলাম। জলে ডুবিতেছি বলিয়া মনে কোনও বিশেষ ভাবের উদয় হইল না।

জলে ডুবিয়াই প্রথমে সমস্ত শরীরে কি যেন এক ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল, আমার সমস্ত লোমকূপ দিয়া তড়িৎপ্রবাহ নির্গত হইতেছে, আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন শত শত তারা জ্বলিতেছে, পদতল হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত কি যেন এক তড়িৎ-

প্রবাহ ছুটাছুটী করিতেছে। আমার নিজের অনিচ্ছাতেও গলার কলসী খুলিয়া ফেলিবার জন্য কতই চেষ্টা করিলাম। তখন জলে ডুবিয়া মরিতেছি অথবা কি করিতেছি তাহা কিছুই বোধ ছিল না; তখন সেই দুঃসহ অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা—ইহাই কেবল অনুভবের আয়ত্তে ছিল।

কিন্তু সে যন্ত্রণা আর অধিকক্ষণ রহিল না, তাহার পরেই যেন স্বপ্নের আবেশের মত একটা ভাবের শীতলস্পর্শে সকল যন্ত্রণা জুড়াইয়া গেল। মনে হইল যেন অগাধ স্বপ্নসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছি। জীবনের প্রতিদিনের কত শত ঘটনা ধীরে ধীরে স্বপ্নের মত আমার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, কোন ঘটনা সুখের রাগে রঞ্জিত ও কোনটী দুঃখাশ্রুতে অভিষিক্ত। কিন্তু সে সকল অতীত সুখ দুঃখ এখন আর মনকে স্পর্শ করিতেছে না, অতি লঘু মেঘের মত কেবল মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে মাত্র। কেবল এক অপূর্ব্ব শান্তি-প্রবাহ এই সলিলপ্রবাহের মত অথবা জননীর বাহুবেষ্টনের মত আমার প্রাণ মন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আঃ সে কি শান্তি! যেন আমি বহুদিনের পরিশ্রান্ত, আমার চক্ষে আজ মধুময় নিদ্রার আবেশ আসিয়াছে। ক্রমশঃ সেই সুষুপ্তিসমুদ্রে আমি একেবারে ডুবিয়া গেলাম। ডুবিয়া গিয়া এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। সে কি স্বপ্ন, না প্রত্যক্ষ দর্শন? তাহা আমি এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। স্বপ্নই হউক অথবা সত্যই হউক যাহা দেখিলাম, সোহাগা যেমন স্বর্ণের সঙ্গে একেবারে গলিয়া মিশিয়া যায়, আমার জীবনের সঙ্গে তাহা যেন একেবারে মিশিয়া গেল। সে স্বপ্ন নিবিড় আনন্দতুলিকায় চিত্রিত; এমন আনন্দ, যে, সে কেবল অনুভবের সামগ্রী, বাক্য তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না।

গভীর স্বপ্নে ডুবিয়া আমি যে কোথায় ছিলাম, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি জলের উপর ভাসিতেছি; গলার কলসী কি জানি কেমন করিয়া খুলিয়া গিয়াছে। এত দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিলাম, তাহা কেমন করিয়া খুলিল

ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক সেদিন আত্মহত্যার বাসনা একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিলাম।

তাহার পর জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমার কোন আত্মীয় কাশীধামে গিয়া কিছুদিন যোগ অভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি গৃহে আসিলে কেহ কেহ তাঁহার নিকট "ক্রিয়া" লইবার জন্য উৎসুক হইল। এই "ক্রিয়া" পদার্থটী কি জানিবার জন্য আমারও মন কিছু উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা "ক্রিয়া" লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, তাহারা যখন কেহই প্রার্থনা করিয়া প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হইল না, তখন অগত্যা আমারও সে বিষয়ে ঔৎসুক্য পরিহার করিতে হইল। কিন্তু একদিন, কেন জানিনা তিনি নিজেই আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "তুমি ক্রিয়া লইবে?" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাতে ফল কি হইবে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "বাহ্য বিষয় হইতে মন বিনিবৃত্ত হইয়া যাহাতে ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হয়, এই 'ক্রিয়া'র ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।" অনেকে প্রার্থনা করিয়াও যাহা পায় নাই, আমি শ্যামসুন্দরের কৃপায় অযাচিতভাবে তাহাই পাইলাম ভাবিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইল। যে অবধি তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইলাম, নিদ্রা সেই অবধি একেবারে আমাকে পরিত্যাগ করিল। পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিদ্যার্থী যে ভাবে রজনী যাপন করে, সমস্ত রজনী "ক্রিয়া" লইয়া আমি সেই ভাবেই যাপন করিতাম। কখনও বা গুরুদেবের চরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য মনে প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইত। রাত্রিকালে—আমি রমণী—আমার পক্ষে এরূপভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া নিতান্তই অবিধেয় ভাবিয়া মনকে সংযত করিতাম। কিন্তু আমি যে রমণী, তাহা তো সকল সময় স্মরণ থাকিত না। আমার এই ক্রিয়া লইবার কথা কেবল আমার মা ও ছোট ভাই চণ্ডী জানিতেন। মাকে বলিতাম, "মা, তুমি আমার ঘরের দরজায় শিকল দিয়া রাখিও। কি জানি হঠাৎ যদি আমি মনের ভুলে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাই, তবে লোকে তোমাদের নিন্দা করিবে।"

আমার সে সময়ের মনের অবস্থা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ঘরে আগুন লাগিলে গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য লোকের যেমন আগ্রহ হয়, আমারও গৃহত্যাগ করিবার জন্য সেইরূপ মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সংসার যেন দাবানলের মত মনে হইত; লোকে যে সকল সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিত, তাহা যেন আমার কর্ণরন্ধ্র দগ্ধ করিত। নিদ্রা তো পূর্ব্বেই গিয়াছিল, তখন আহারেও বিষম বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। লোকেব সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। একবাটী ঘি আমার সমস্ত দিনের আহাব ছিল, কিন্তু ঘি পুষ্টিকর দ্রব্য বলিয়া শরীর বিন্দুমাত্র দুর্ব্বল হয় নাই। মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন সহসা একদিন একখানি মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটী প্রবন্ধ চোখে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধটীর নাম "করমেতি বাই"। প্রবন্ধটী পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না। ক্রমশঃ যখন পড়িলাম, কৃষ্ণেব উদ্দেশে গৃহত্যাগিনী বালিকা করমেতি আত্মীয় স্বজনের চক্ষে পড়িবার ভয়ে গলিত উষ্ট্রের উদরগহ্বরে কেবল কৃষ্ণ-নামামৃত পান করিয়া তিন দিন যাপন করিলেন, তখন আমাব সমস্ত শরীব যেন অবশ হইয়া আসিল, হাত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল ইহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তাহার পর আর বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল না।

সাতদিন সেইরূপ অচৈতন্য অবস্থায় চলিয়া গিয়াছিল। বাবা সপরিবারে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, বাড়ীতে কেবল একা আমি ছিলাম। আমি কাহারও সহিত মিশিতে ভালবাসিনা বলিয়া কেহ আমার বড় একটা উদ্দেশ লইতেন না। কেবল একজন—(তাঁহাকে আমি মাসিমা বলিতাম) তিনিই মাঝে মাঝে আমার খোঁজ লইতেন। সাতদিন পরে তিনিই আসিয়া আমার উদ্দেশ লইয়াছিলেন।

গৃহে আর কিছুতেই থাকিব না। এতদিনে সমুদায় দ্বিধা একেবারেই ছিন্ন হইয়া গেল। এবার কৃষ্ণের উদ্দেশে চলিলাম। সে কোথায়? কোথায় তাঁহার উদ্দেশ পাইব? তখনই মনের ভিতর হইতে উত্তর পাইলাম, করমেতি যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে—সেই বৃন্দাবনে!

শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহির হইলাম। শ্যামসুন্দর!

তুমি তো এই ঘরেই ছিলে, তবে ঘর ছাড়িয়া আবার কোথায় তোমাকে খুঁজিতে চলিলাম? আমি তাহা জানি না। ঘরে যখন ছিলাম, তুমিই আমাকে গৃহে রাখিয়াছিলে, আজ যে পথে বাহির হইয়াছি, তুমিই আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছ। কোথায় লইয়া যাইতেছ, তুমিই তাহা জান।

আজ আমি রাজপথে দাঁড়াইয়া আছি। আমার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, সঙ্গীও কেহ নাই! একি আনন্দ, একি মুক্তি! এই যে বিচিত্র লোকপ্রবাহ রাজপথ দিয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে আমি নিঃসঙ্গ, আমি একক। সঙ্গের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিঃসঙ্গের পরিপূর্ণতায় আমার চিত্ত আজ ভরিয়া উঠিয়াছে।

আমি পথের একধারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটী ছোট ছেলে আসিয়া আমার আঁচল ধরিয়া টানিল। ছেলেটীর বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে। কি যে তাহার সুন্দর মুখ খানি—যেন ভালবাসায় মাখা। আঁচল ধরিয়া টানিয়া সে আমাকে কি যেন বলিতেছিল, কিন্তু আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না,—কেবল "বম্ বম্ মহাদেব" "জয় শিব শঙ্কর!" ধ্বনিই কাণে আসিতেছিল। আমি তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি না দেখিয়া সে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। অল্প দূরে দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট একখানি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীর দরজায় নিয়া আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বাবা, তুমি আমাকে এখানে আনিলে?" সে হাসিয়া বলিল, "মা তোমায় ডাক্‌ছেন, ঐ দেখ মা আস্‌ছেন।" তাহার নির্দ্দেশ মত চাহিয়া দেখিলাম, দরমা-ঘেরা উঠান দিয়া মা আসিতেছেন, মাই বটে, মুখের দিকে চাহিলেই মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। মা আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি ঐ জানেলা দিয়া দেখিলাম, আপনি ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আমার মনে হইল, যেন আপনার আজ-কালের ভিতর কিছুই আহার হয় নাই। তাই খোকাকে দিয়া আপনাকে ডাকাইয়াছি। দয়া করিয়া আমার গৃহে ভিক্ষা করিবেন কি?" আমি মায়ের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে

চাহিলাম। "যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি," আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম, "ইনি তাহা কি করিয়া জানিলেন। রাজপথ দিয়া তো কত লোক যাতায়াত করে, কে কাহাকে দেখে, কেই বা কাহার উদ্দেশ লয়? এমন কে আছে, যে পথের লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, 'তুমি কি অনাহারে আছ?'—এই বিশাল জনতার একপার্শ্বে যে একজন গৈরিকবস্ত্রধারিণী দাঁড়াইয়া আছে, গৃহস্থবধূর তাহার দিকেই বা দৃষ্টি পড়িল কেন?" শ্যামসুন্দরের এই বিচিত্র লীলার কথা ভাবিতেছি, এমন সময় শিশুর জননী আমাকে পুনরায় বলিলেন, "মা, গৃহী বলিয়া কি আপনি আমার গৃহে ভিক্ষা লইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন?—মা, আজ দশমী, আপনি বোধ হয় দুই তিন দিন অনাহারে আছেন, আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আজ আপনি এই গৃহে ভিক্ষা লইয়া কৃতার্থ করুন।" তিনি এই কথা বলিয়া যোড়-হাতে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও যোড়হাত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। বলিলাম, "মা, তোমার অন্ন গ্রহণ করিলে আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি। তুমি তোমার সন্তানকে যাহা খাইতে দিবে দাও।"

বাড়ীর উঠানের একপাশে ঢেঁকিশালা, সেখানে ছোট একটী উনান ছিল। শিশুর জননী অতি সত্বর সেইস্থান মার্জ্জন করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। একটা ছোট ঘড়ায় এক ঘড়া জল, পিত্তলের একটী জলপাত্র, একটী মালসা, আতপ চাল, কাঁচকলা ও কিছু মাখন, রন্ধনের এই সকল উপকরণ আনিয়া দিলেন। আমি সেই পবিত্র অন্ন রন্ধন করিয়া শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিলাম। সে অন্নে যেন অমৃতের আস্বাদ ছিল। সেই অন্ন আহার করিয়া আমার শরীর ও মনের সমস্ত জড়তা দূর হইয়া গেল।

আহার শেষ হইলে গৃহস্থবধূ আবার আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, যদি তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ না কর, তবে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম, "আমি পশ্চিমের পথে চলিয়াছি, যেদিন যতদূর পারি চলিব।"

গৃহস্থবধূ বলিলেন, "তবে মা, তুমি আজ রাত্রি এখানে যাপন কর। কাল আমাদের একজন পরিচিত লোক বর্দ্ধমান যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে তুমি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যদি যাও, তাহা হইলে তোমার পথ চলার অপেক্ষা একটু শীঘ্র যাওয়া হইবে।"

সে রাত্রি সেই গৃহেই থাকিলাম। পরদিন যখন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া যেখানে কাঁকরঢালা পথে পাদচারীরা চলিতেছে, সেখানে একটী আলোকস্তম্ভের কাছে আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া লোকের ব্যস্তগতি আর যাওয়া-আসা দেখিতেছিলাম। কেবলি কি যাওয়া আর আসা! আর কিছু নয়? আমাকে এখন কোথায় যাইতে হইবে? যাওয়া আসা দেখিয়া সে কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

দিনের আলো ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। একজন আসিয়া আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে আর একটী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে অনেকক্ষণ হইতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি একটু সঙ্কোচের সহিত আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি কোথায় যাইবেন?" প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য্য আমি প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি অনেকক্ষণ এখানে একা দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। বর্দ্ধমানে কি কেহ আপনার আত্মীয় আছেন?"

আমি বলিলাম, "আমি আজ প্রথম বর্দ্ধমানে আসিয়াছি। এখানে আমার পরিচিত কেহ নাই।"

তিনি বলিলেন, "তবে আপনি রাত্রে কোথায় থাকিবেন, তাহা বোধ হয় এখনও স্থির করেন নাই। যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আমি আমার কোন পরিচিতের গৃহে যাহাতে আপনি রাত্রি যাপন করিতে পাবেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি। সেখানে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কোথায়? ষ্টেশন হইতে কতদূর?"

তিনি বলিলেন "বেশী দূর নয়।"

আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। যিনি "মা" বলিয়া ডাকিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যাইতে আমার কিছুই দ্বিধা হইল না। কিছুদূর চলিয়া অবশেষে একটী বাড়ীর নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, "এই বাড়ী";—বলিয়া দরজার কড়া নাড়িলে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তিনি আমাকে দুয়ারে রাখিয়া আগে ভিতরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ডাকিল, "আসুন মা, উপরে আসুন।"

আমি তাহার সহিত উপরে গিয়া দেখিলাম, দ্বিতলের বারণ্ডায় একখানি আসন পাতা আছে। স্ত্রীলোকটী আমাকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া—নিজে মাটীতে বসিল।

আমি তখন তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার হাতে দুগাছি সোণার বালা, পরিধান একখানি রেশমী বোম্বাই শাড়ী, কিন্তু সধবার চিহ্ন সিন্দূর অথবা লৌহ কিছুই নাই। দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। কোন বিধবা যে এইরূপ প্রৌঢ় বয়সে অলঙ্কার ধারণ করিবেন অথবা বোম্বাই শাড়ী পরিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, অথচ এ রমণীর সধবার চিহ্ন সিঁথিতে সিঁদুর অথবা হাতে লোহাও নাই! এ তবে আমি কোথায় আসিলাম?

আমি সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটী আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?" রমণী বলিল, "তিনি ষ্টেশনে কাজ করেন, তাঁহার সময় নাই বলিয়া আপনাকে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ী কার?"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "আপনি বর্দ্ধমানের বামা কীর্ত্তনীর কি নাম শুনিয়াছেন? আমি সেই বামা কীর্ত্তনী, এ বাড়ী আমার।"

স্ত্রীলোকটী এই কথা বলিবামাত্র আমার সম্মুখবর্ত্তী গৃহ ও গৃহসজ্জার দিকে দৃষ্টি পড়িল। আমি যে কোথায় আসিয়াছি, এতক্ষণে তাহা বুঝিলাম।

আমি বলিলাম, "মা, তোমার কল্যাণ হউক। আমি চলিলাম। তোমার গৃহে রাত্রিবাস করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইও না।" বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কীর্ত্তনী আসিয়া আমার সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর যোড়হাত করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিল, "তুমি যে আমার গৃহে একরাত্রি বাস করিবে, এ আশা আমার নিতান্ত দুরাশা। আমি তোমাকে সে অনুরোধও করিতাম না। কিন্তু মা, আমি শুনিলাম বর্দ্ধমানে তুমি আজ নূতন আসিয়াছ, এখানে তোমার চেনা লোকও কেহ নাই। আজ একাদশী, তুমি সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছ। এইজন্য আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আজিকার রাত্রি তুমি এখানে থাকিয়া আমার গৃহ পবিত্র ও আমাকে উদ্ধার কর। মা, তুমি যাঁর পূজা কর, তিনি তো পতিতপাবন; তবে তোমার পতিতকে এত ঘৃণা কেন মা?"

কীর্ত্তনী এমন আন্তরিক ভাবে করুণস্বরে এই কথাগুলি বলিল যে, শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আমি তাহা নিবারণ করিতে পারিলাম না।

কীর্ত্তনী আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিলাম, তাহার চোখেও জল আসিয়াছে। গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিল, "মা, আমি নিতান্ত হীনা, কি দিয়া তোমার আতিথ্য সৎকার করিব জানিনা। তুমি যদি দয়া করিয়া আজ এ গৃহে থাক তবে আমি রাত্রে তোমাকে কীর্ত্তন গাহিয়া শুনাইয়া আমার জীবন সার্থক করিব--ইহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।"

পিপাসায় আমার প্রাণে দাবানল জ্বলিতেছে, কে তুমি মা তাহাতে শীতল বারি ঢালিবার আশা দিতেছ? আর আমি কোথায় যাইব? সেই শীতল বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া সারারাত্রি কীর্ত্তনসুধা পান করিয়া শীতল হইলাম। সে যে কি মধুর কীর্ত্তন আমি জীবনে আর ভুলিতে পারিবনা। কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তনী কখনও চোখের জলে ভাসিতেছে, আবার কখনও তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুরের ঝঙ্কারে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে। ক্রমে যেন সমস্তই নিস্তরঙ্গ

একাকার হইয়া গেল। কোথায় আছি তাহা আর মনে রহিল না। কোথা দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। যেন এক নিমেষে রাত্রি ফুরাইয়া গেল।

প্রভাতের অরুণালোকে চারিদিক্ যখন আলোকিত হইল, তখন কীর্ত্তনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কীর্ত্তন শেষ করিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও রোদনে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার মুখের যে কি শোভা, আমার তখন তাহাকে দেখিয়া আর মানবী বলিয়া মনে হইল না। যেন কোন ব্রজবালা ছলনা করিয়া এই বেশ ধারণ করিয়াছেন। কীর্ত্তনী আমাকে বলিল, "মা, কাল তুমি উপবাসী আছ, আজ অনাহারে কেমন করিয়া তোমাকে বিদায় দিব। যদি কীর্ত্তন শুনিয়া আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে দয়া করিয়া আজ এখানে অন্নগ্রহণ কর।"

কীর্ত্তনীর কথা শুনিয়া সহসা আমার জননীর কথা মনে পড়িল। মা বার বার বলিতেন, "বেশ্যার ও বিষয়ীর অন্নগ্রহণ করিলে দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না।" মা যাহা বলিতেন, তাহা আমি ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিতাম। জানিতাম—মার কথা কখনও মিথ্যা হয় না।

কিন্তু এখন আমি কি করিব? আজ যিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আমাকে এই কীর্ত্তনসুধা পান করাইলেন, তাঁহার সকাতর অনুনয় আমি কেমন করিয়া উপেক্ষা করিব? কেমন করিয়া বলিব, "তুমি পতিতা, তোমার গৃহে আমি অন্নগ্রহণ করিতে পারিব না।" ইনি পতিতা?—একথা যে আমি মনেও ধারণ করিতে পারি না। আমার এখন মনে হইতেছে যে, ইহার পদধূলিতে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিলে বুঝি বা আমাব শ্মশানহৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেমমন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে। কৃষ্ণলীলামৃতসমুদ্রে যার চিত্ত দিবানিশি মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সে কি আবার পতিতা হয়? তার কি আবার পাপ পুণ্য থাকে?

তবুও জননীর কথা বার বার মনে বাজিতে লাগিল। তাহাও ভুলিতে পারি না। মা যখন এ কথা বলিতেন, তখন তো কোন দিন মন দিয়া সে কথা শুনি নাই। এতদিন পরে আজ সহসাই বা কেন সে কথা মনে পড়িল! শ্যামসুন্দর, আজ তুমি আমাকে একি বিষম পরীক্ষায় ফেলিলে!

উদ্বোধন।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।)

জাগো উদ্বোধন-মন্ত্রে, প্রাণ,
মোহের রজনী অবসান!
শোন কি গম্ভীর স্বর উঠে ভরি চরাচর,
উঠে ভরি অসীম বিমান।
শোন সে অমৃত বাণী,— যে বাণী বহিয়া আনি
পবন জীবন করে দান।
শোন সেই সিন্ধুরব,— প্রাণ যাহে পায় শব,
মূর্চ্ছিত ফিরিয়া পায় জ্ঞান।
শোন সেই বজ্রনাদ, যাহে দৃঢ় শিলাবাঁধ
চূর্ণ হ'য়ে হয় শতখান,—
কারামুক্ত নেত্র আগে তরুণ অরুণ জাগে,
অন্ধ নিশা হয় অবসান!
জাগো, সেই মন্ত্রে জাগো প্রাণ!

"বাসনা স্বপনে হায়! র'বে কি শবের প্রায়?
"জাগো আজি, জাগো মহাপ্রাণ!
"মৃত্যুরে বরণ করি অমৃতের অধিকারি,
"রহিবে কি শ্মশানে শয়ান?
"এই দেহ, এই গেহ, পুত্র পরিজনে স্নেহ,
"ভোগসুখ, সম্পদ, সম্মান,
"এই জয় পরাজয়, এই যে উদয়, লয়,
"সুখ, দুঃখ, মান, অপমান,—
"রচিয়া এ তন্তুজাল ঊর্ণনাভ, চিরকাল
"আপনারে বাঁধিছ কেবল,

"বাসনা-প্রাচীর দিয়া অন্ধকূপ নিরমিয়া,
"নিজে গড়ি পরিছ শৃঙ্খল!
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"
এই উদ্বোধন-মন্ত্রে নিদ্রাজয়ী হে সন্ন্যাসি
জাগাও এ নিদ্রিত ভারত!
ঈশানের করধৃত প্রলয় পিনাক-নাদে
জগমায়া ঘুচিল যেমন,
তোমার বিষাণ-রবে তেমনি বিলয় হবে
ভারতের মোহের স্বপন!

"জাগো আজি, জাগো বীর্য্যবান্!
"মায়ার রজনী অবসান!
"খোল আঁখি, হের আগে দীপ্তিময় রবি জাগে,
"জ্যোতিঃ-রাগে উজল বিমান।
"সংসারের সুখ দুঃখ! উদ্বেগে আকুল বুক,
"প্রতিপদে চকিত শঙ্কায়—
রজ্জুতে সর্পের ভান তাহে সন্ত্রাসিত প্রাণ,—
"এ কভু তোমারে শোভা পায়?
"স্বপন-সাগর-পারে সাঁতারি যেতে কি পারে
"নিদ্রাঘোরে অবশ যে জন?
"বারেক মেলিলে আঁখি মিলাবে সংসার ফাঁকি
"মায়ার এ মরীচি সৃজন।
"তোল অবনত শির, উঠ আত্মজয়ী বীর,
"ভাঙ্গ দৃঢ় বাসনা-শৃঙ্খল।
"আপনারে লও জিনি আপনারে লও চিনি
"লও কিনি আপন সম্বল।
"উত্তিষ্ঠত জাগত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

এই উদ্বোধন-মন্ত্রে নিদ্রাজয়ী হে সন্ন্যাসি,
জাগাও এ নিদ্রিত ভারত!
ঈশানের করধৃত প্রলয়-পিনাক-নাদে
জগমায়া ঘুচিল যেমন,
তোমার বিষাণ-রবে তেমনি বিলয় হবে
ভারতের মোহের স্বপন।

"জাগো জাগো কল্যাণরূপিণি,
"মৃত্যুঞ্জিতা বীরপ্রসবিনি!
"এখনো বালিকা হ'য়ে খেলিস্ খেলানা ল'য়ে,
"একি ভাব তোমার জননি!
"মা, তোরে দেখেছি আগে ভূষিতা ভস্মের রাগে,
"উদাসিনী সর্ব্ব-তেয়াগিনী,
"মা, তোরে দেখেছি আগে ত্যাগ-অলক্তক-রাগে
শক্তিময়ী দেবতা-জননী।
"দেখিয়াছি হাসি-মুখে চিতায় অনল-বুকে
"দেহ-দান দিতে আপনার;
"সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বময়ী— সর্ব্বস্বরূপিণি অয়ি,
"কতরূপ দেখেছি তোমার!
"কখনো জননী হ'য়ে নীলমণি কোলে লয়ে,
"স্নেহময়ী করুণা-নিলয়া,
"কখনো দীনের দ্বারে অন্নপূর্ণা একেবারে,
"যেন তুমি মূর্ত্তিমতী দয়া।
"পতি পুত্র পরিজন প্রতিবাসী দীনজন
"স্বজন দুর্জ্জন যেবা আছে,
"মা, তোমার স্নেহ আশে যে তোমার পাশে আসে,
"কে কবে বঞ্চিত তোর কাছে?
"দিয়াছ আপনা ঢালি সর্ব্বময়-পদে ডালি,
দানের কি আছে তোর সীমা?

"যেবা চায় তারে দাও, প্রতিদান নাহি চাও,
"জান না মা আপন মহিমা।
"জগত কল্যাণ আশে কভু মুক্ত কেশপাশে
"অপরূপ রূপ মা তোমার,
"কত রূপ নাহি সীমা! স্থন্দরে জড়িতা ভীমা,
"নয়নে দেখেছি কতবার!
"কভু ভীমমাতা হ'য়ে নিজ প্রাণ-পুত্র ল'য়ে,
"ধরি দাও অসুরের মুখে,
"কখনো অর্জ্জুন-রথে স্থভদ্রা সারথি তুমি
ত্যজি ভয় পরম কৌতুকে।
"—আজি এ কি খেলা তোর? তোর চক্ষে মায়া-ঘোর!
"অচেতনা চৈতন্যরূপিণী।
"আপনা ভুলিয়া আজ একি বেশ, একি সাজ
"ধরেছিস্ জগ-প্রসবিনি।
"তোর এ কি ভ্রান্তি মাগো! জাগো মা আবার জাগো,
"জাগো, জাগো, নিখিল কল্যাণে,
"জাগো, জাগো আত্ম-বিসর্জ্জনে!
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"
এই উদ্বোধন-মন্ত্রে আত্মত্যাগী হে সন্ন্যাসি,
জাগাও এ নিদ্রিত ভারত!
ঈশানের করধৃত প্রলয়-পিনাক-নাদে
জগমায়া ঘুচিল যেমন,
তোমার বিষাণ-রবে তেমনি বিলয় হবে
ভারতের মোহের স্বপন!

জাগো উদ্বোধন-মন্ত্রে, প্রাণ!
মোহের রজনী অবসান!

"কে পীড়িত শয্যাতলে, কে শোকার্ত্ত অশ্রুজলে
"নিয়ত মরণ কর ধ্যান?
"কে মত্ত সম্পদ-মদে? কে দলিত রিপু-পদে?
"কে করিছ আত্ম-অপমান?
"ভয়ার্ত্ত কে মৃত্যু-ভয়ে? হিংসা কালফণী ল'য়ে—
"কে পুষিছ হৃদে আপনার?
"তৃণ যেন স্রোতোমুখে,— খ্যাতি নিন্দা সুখে দুঃখে
"ভেসে কে যেতেছ বারবার?
"এই সুখ-দুঃখ-মালা বিষয়-বিষের জ্বালা,—
"অস্তিত্ব কোথায় বল তার?
"হে আত্মা, আনন্দময়, এ কভু সম্ভব হয়—
"মুক্ত তুমি, বন্ধন তোমার?
"চৈতন্য কি অচেতন? কলঙ্কিত নিরঞ্জন?
"নিত্যের কি আছে মৃত্যুভয়?
"মেল আঁখি একবার, এ কুহেলি অন্ধকার
"নয়ন-নিমেষে পাবে লয়।
"শুধু এক আনন্দ পাথার,
"সেই এক প্রেম-পারাবার।
"নাহিক মায়ার বেলা উর্ম্মি নাহি করে খেলা
"নিস্তরঙ্গ মহাপারাবার!
"জন্ম মৃত্যু দেহ গেহ, কিছু নাই, নাই কেহ,
"এক শুধু কিছু নাই আর!
"জাগো সেই আত্মবোধরূপে,
"জাগো জাগো আপন স্বরূপে!"

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"
এই উদ্বোধন-মন্ত্রে মোহজয়ী হে সন্ন্যাসি
জাগাও এ নিদ্রিত ভারত!

ঈশানের করধৃত প্রলয়-পিনাক-নাদে
জগমায়া ঘুচিল যেমন,
তোমার বিষাণরবে তেমনি বিলয় হবে
ভারতের মোহের স্বপন।

কাশীর পথে শঙ্কর।

যোগিবর শঙ্কর আজ কাশীর পথের পথিক। সঙ্গে তাঁহার কতিপয় সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসিগণ গোবিন্দপাদের আদেশে তাঁহার অদর্শনের পর হইতে শঙ্করকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাই তাঁহারা কাশীর পথে আজ শঙ্করের অনুগমন করিতেছেন।

কাশীযাত্রী এই সন্ন্যাসীদের দৃশ্যটী অতি সুন্দর হইয়াছে। সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, পরিধানে গৈরিক বসন, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। এক হস্তে দণ্ড, অপর হস্তে কমণ্ডলু, কক্ষদেশে কুশাসন ও মৃগচর্ম্ম অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্ম রক্ষিত। মস্তক এবং পদদ্বয় সকলেরই অনাবৃত। সকলে একটী বালক সন্ন্যাসীকে অগ্রগামী করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন।

এ সময় যোগিবর শঙ্করের অবস্থা বড়ই মনোহর। তিনি যেন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাতে চপলতার লেশ নাই। তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তিতে গাম্ভীর্য্যের পূর্ণবিকাশ। পথ ভ্রমণে ক্লান্তি বা বিরক্তি নাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি কাতর হন না, বিশ্রাম বা আহারাদির জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। শিষ্যগণের অনুরোধেই প্রায় দিনান্তে একবার যৎসামান্য ফল মূল, অথবা কখন পল্লীবাসীর প্রদত্ত আহারীয় দ্রব্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন মাত্র। চলিতে চলিতে যখন কোন শিষ্য ক্লান্ত হইয়া যোগিবরের নিকট বিশ্রামের জন্য প্রস্তাব করেন, তখনই তিনি বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যাসমাগমে কোনও দেবালয় অথবা বৃক্ষমূলে তাঁহারা নিশা যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, যোগী শঙ্কর তথায় সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকেন। রাত্রে সামান্য নিদ্রা,ধ্যান, কখন বা আত্মচিন্তনে নিশি অতিবাহিত করেন। পথিমধ্যে কতই অরণ্যজাত বিবিধ অভিনব-

পদার্থ তাঁহার বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে বা দূরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, যোগী-শ্বরের কিন্তু কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহার পদ্মপলাশসদৃশ নয়ন যেন অর্দ্ধ-নিমীলিতভাবে কেবলমাত্র সম্মুখস্থ অনন্তের শোভা-সাগরে নিমগ্ন। তাঁহার এই আনন্দময় সৌম্যমূর্ত্তি যে দেখে, সে যেন মনে মনে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে থাকে। কেহই তাঁহাকে ভক্তি বা স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, যেহেতু যোগিবরের গাম্ভীর্য্যই এস্থলে অন্তরায় হইয়া উঠে। সন্ন্যাসিগণের অবস্থাও শঙ্করের আদর্শে কতকটা যেন শঙ্করের মতই হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তথাপি গোবিন্দপাদের অদর্শনজনিত শোক এখনও তাঁহাদের হৃদয়কন্দর পরি-ত্যাগ করে নাই, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের দর্শন পাইবার আশায় অথবা যোগীশ্বর শঙ্করের আশ্রয় লাভে উৎফুল্ল হন, আবার কখন বা সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোরতা অনুভব করিয়া, হতাশার অবসাদে অবসন্ন হন। তাঁহারা এই সুদীর্ঘ পথের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে যেন নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। অবশ্য এরূপ না হওয়াই বিচিত্র, কারণ, একে তাঁহাদিগের বয়সাধিক্য, তাহাতে তাঁহারা গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গের আশায় বহুকাল ধরিয়া গুহামধ্যে বাস করিয়া ভ্রমণে একেবারেই অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যেন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন, কেহ বা নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া গোবিন্দপাদের আদেশ স্মরণ করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

বিচক্ষণ শঙ্কর শিষ্যগণের এই অবস্থা বুঝিলেন। তিনি নানা উপ-দেশপূর্ণ কথায় তাঁহাদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিলেন। কখন বা তিনি তাঁহাদের নিকট যোগের গুহ্য রহস্য, কখন বা কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে তিনি এক দিন শাস্ত্রোক্ত কাশীমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া একটী সুন্দর কাশীস্তোত্র রচনা করিলেন এবং শিষ্যদিগকে শুনাইলেন। কাশীর পথে এই স্তোত্রটী শিষ্যদিগের বড়ই মধুর লাগিয়া-ছিল। তাঁহারা পথ চলিবার সময় মধ্যে মধ্যে এই স্তোত্রটী সমস্বরে গান করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। স্তোত্রটী এই ;—

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ১
জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ২
পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্‌ভিরহর্নিশম্।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৩
পাপরাশি-সমাক্রান্তা যে দারিদ্র-পরাজিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৪
সংসার-ভয়ভীতা যে যে বদ্ধাঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৫
শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচার-বিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৬
যে চ যোগপরিভ্রষ্টাস্তপোদানবিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭
মধ্যে বন্ধুজনং যেষামপমানঃ পদে পদে।
আনন্দবর্দ্ধকং তেষাং শম্ভোরানন্দকাননম্ ॥ ৮
আনন্দকাননে যেষাং সততং বসতিঃ সতাম্।
বিশেষাহ্নুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥ ৯

অর্থাৎ যাহারা পিতামাতা এবং নিজ বন্ধুজনদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা বার্দ্ধক্যের দ্বারা অভিভূত, যাহারা ব্যাধির কবলে পতিত, যাহাদিগের কোথায়ও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা বিপদের দ্বারা পদে পদে অহর্নিশি আক্রান্ত, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা পাপরাশিতে আক্রান্ত, দরিদ্রতা যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা সংসারভয়ে ভীত, যাহারা কর্ম্মরূপ বন্ধনে আবদ্ধ, যাহাদিগের কোথায়ও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র-বিহীন এবং শুদ্ধাচারবর্জ্জিত, যাহাদিগের কোথায়ও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তপস্যা ও দানধর্ম্মে বর্জ্জিত, যাহাদিগেব কোথায়ও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

বন্ধুগণ মধ্যে যাহাদিগের পদে পদে অপমান হয়, শম্ভুর আনন্দ-কানন কাশী তাহাদিগের আনন্দবর্দ্ধক।

যে সাধুগণ সর্ব্বদা আনন্দ-কাননে বাস করে, তাহারা (ঈশ্বরের) বিশেষ অনুগৃহীত, তাহাদিগের আনন্দ উদয় নিশ্চয়ই হইবে।

পথিমধ্যে এই কাশীমাহাত্ম্যটী গান করিয়া শিষ্যগণ এখন হইতে পথক্লেশে আব তত পরিশ্রান্ত বোধ করিলেন না। তাঁহারা নব উৎসাহে অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগি লন। এইরূপে সশিষ্য শঙ্কর কাশীর প্রায় অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিলেন। কাশীর পথ বড় অল্প নহে। আবার ওঙ্কারনাথ হইতে বারাণসী যাইতে হইলে লোকে সাধারণতঃ উজ্জয়িনী হইয়া সাঞ্চি ও প্রয়াগের ভিতর দিয়া গমন করে। এজন্য ইহার দূরত্ব আরও দীর্ঘ হইয়া উঠে। যোগিবর শঙ্কর অবশ্য এ পথে গমন করিতেছেন না, তিনি একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পরামর্শ-মত নর্ম্মদার তীর ধরিয়া কিছুদূর পূর্ব্বমুখে আসিয়া, প্রাচীন হৈহয় রাজ্যের মধ্য দিয়া উত্তব মুখে কাশীর পথ ধরিয়াছেন। ইহা সর্ব্বপরিচিত প্রসিদ্ধ পথ নহে। কারণ, হৈহয় রাজ্য অনেক দিন হইতে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে এবং বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবে উজ্জয়িনীর পথই এসময় প্রসিদ্ধ পথে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এ পথে প্রধান প্রধান নগর অথবা বড় বড় গ্রাম প্রায় নাই। এই হেতু, যদিও তদবলম্বিত পথ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, তথাপি উহা কঠিনতর পথ, কারণ, এ পথে কখন দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমির মধ্য দিয়া, কখন বা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথের ন্যায় পথ ধরিয়া যাইতে হয়। এ পথে মনুষ্য-শিল্প-রচিত শিল্পসমূহের কৃত্রিম শোভার পরিবর্ত্তে, বিশ্ব-শিল্পীর সৃষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই অধিক। কিন্তু নির্দ্দয় পথ-ক্লেশ সন্ন্যাসী-দিগের এই শোভা সম্ভোগের শক্তি অপহরণ করিল। তাঁহারা অল্পদিনের পরই আর এ শোভা দেখিয়া মোহিত হইলেন না, এবং কাশীস্তোত্র

গান করিয়াও আর সুখ পাইলেন না। শঙ্কর শিষ্যগণের অবস্থা বুঝিলেন এবং এইবার সন্ন্যাসীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া একটি মধুর কবিতা রচনা করিলেন। আচার্য্যমুখে সন্ন্যাসিগণ এই কবিতা শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। হইবারই কথা, কারণ, ইহা ত কবির কল্পনা নহে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শনও নহে, ইহা আদর্শ সন্ন্যাসীর মুখে আদর্শ সন্ন্যাসীর লক্ষণ বর্ণন। ইহা শুনিয়া কাহার না শরীর মন পুলকিত হয়? তাঁহারা আচার্য্যমুখে এই কবিতা শুনিয়া যথার্থই নবজীবন পাইলেন, এবং পথ চলিবার সময় এই কবিতাটী গান করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। আচার্য্যরচিত সন্ন্যাসীদিগের সৌভাগ্যবর্ণনসূচক সে কবিতাটী এই :—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥" ৫

যাঁহারা বেদান্ত-বাক্যেতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া শোকবিহীন অন্তরে বিচরণ করেন, সেই কৌপীনবান্ সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

একমাত্র বৃক্ষমূলই যাঁহাদের আশ্রয়, যাঁহাদের হস্তদ্বয় কেবল ভোজ্যবস্তু আহরণের জন্য নহে, ছিন্ন কন্থার ন্যায় যাঁহারা ধন ঐশ্বর্য্যের নিন্দা করেন, কৌপীনবান্ সেই সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

যাঁহারা নিজানন্দে পরিতুষ্ট, যাঁহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা দিবারাত্রি পরমব্রহ্মেতে নিমগ্ন, কৌপীনবান্ সেই সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

যাঁহারা দেহাদিভাব অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহারা নিজ আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন,' যাঁহারা আদি অন্ত ও বহির্দ্দেশ জ্ঞানবিহীন, কৌপীনবান্ সেই সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

যাঁহারা পবিত্র প্রণব উচ্চারণে নিযুক্ত, 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাবনায় নিমগ্ন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আহার করিয়া চারিদিক্ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেই কৌপীনবান্ সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

ইহাই সেই আচার্য্য শঙ্কর-রচিত প্রসিদ্ধ কৌপীনপঞ্চকম্। সন্ন্যাসিগণ এই মহাভাবযুক্ত শ্রুতিমধুর কবিতা গান করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, তাঁহারা এখন হইতে মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কাশীস্তোত্র এবং প্রায়ই এই কৌপীনপঞ্চক গান করিতে করিতে কাশীর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শ্রীমতী——

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহার বর্ত্তমান কয়েকটী অভাবের দিকে সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। যাহাতে আশ্রম আরও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য ইহার ভিতর আরও অন্ততঃ তিনটী ওয়ার্ডের প্রয়োজন। ১ম, গৃহস্থ রোগিগণের জন্য একটী পৃথক্ হাঁসপাতাল, ২য়, কলেরা রোগীর পৃথক ওয়ার্ড এবং ৩য়, অন্যান্য সংক্রামক রোগিগণের জন্য পৃথক্ ওয়ার্ড।

১ম—এপর্য্যন্ত আশ্রমের হাঁসপাতালে প্রধানতঃ সাধুগণই আশ্রয় পাইয়াছেন। কারণ, হরিদ্বার কনখলের ন্যায় সাধুপ্রধান স্থানে সাধুরোগীর সংখ্যাই অধিক—ইঁহারা আবার একেবারে নিঃসম্বল। আর সেই জন্যই সাধুগণের চিকিৎসা করাই প্রথম হইতে এই আশ্রমের একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কার্য্য যতই বাড়িতেছে, ততই দেখা যাইতেছে, দরিদ্র গৃহস্থ তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয় অধিবাসিগণেরও আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার দাবী আর উপেক্ষা করা চলে না। অনেক গৃহস্থ আশ্রমের হাঁসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসার্থ

আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য পৃথক্ হাঁসপাতাল-বাটীর অভাবে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ফেরত দিতে হইতেছে। কারণ, বর্ত্তমান হাঁসপাতালটীতে ৮টীর অধিক স্থান নাই এবং উহাও প্রায় সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে। আর এক কথা, লোকের ধর্ম্মসংস্কারে বাধা প্রদান না করিয়া সেবা করাই আশ্রমের উদ্দেশ্য, কিন্তু গৃহিগণকে সাধুগণের সহিত এক হাঁসপাতালে রাখিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই কারণেই গৃহস্থদের জন্য একটী পৃথক্ হাঁসপাতালের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উহার সম্ভাবিত ব্যয়—৫০০০৲ টাকা।

২য়—চিকিৎসা ও শুশ্রূষাপ্রার্থী কলেরা রোগীর সংখ্যাও বড় কম নহে। বিশেষতঃ মেলা প্রভৃতির সময় এই সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগকেও বর্ত্তমান হাঁসপাতালে অন্যান্য রোগীর সহিত রাখিতে পারা যায় না, সুতরাং অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদিগকে ঔষধ পথ্য দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন হয় যে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় না দিলে আর চলে না, তখন তাঁহাদের জন্য পৃথক্ অস্থায়ী কুটীর বাঁধিয়া কাজ চালাইতে হয়, সুতরাং ইহারও বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভাবিত ব্যয়—৩০০০৲ টাকা।

৩য়—এতদ্ব্যতীত প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি অন্যান্য সংক্রামক রোগীও অনেক সময় আসিয়া থাকে, তাহাদের জন্যও একটা স্বতন্ত্র ওয়ার্ড করিয়া রাখিলে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। সম্ভাবিত ব্যয়—৩০০০৲ টাকা।

আর এক কথা, এক্ষণেই প্রতি মাসে আশ্রমে প্রায় ২০০৲ টাকার উপর খরচ হইতেছে। সম্প্রতি নির্ম্মিত ক্ষয়রোগ-চিকিৎসালয়ে রোগী লওয়া আরম্ভ হইলে, এই খরচ অন্ততঃ দেড় গুণ বাড়িয়া যাইবে। অথচ আশ্রম-তহবিলে মাত্র ৫৮৪॥৫ জমা এবং আশ্রমের কার্য্য প্রধানতঃ এককালীন দাতাগণের অনিশ্চিত দানের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আশ্রমের কার্য্য স্থায়িভাবে চালাইতে গেলে, প্রথমতঃ নিয়মিত মাসিক চাঁদাদাতৃগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন এবং তৎপরে আশ্রমের স্থায়ী তহবিলের চেষ্টা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

অনেকে হরিদ্বারের ন্যায় তীর্থস্থানে নিজ নিজ প্রিয় আত্মীয় স্বজনের

স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, এই-বার তাঁহাদের অতি শুভ অবসর উপস্থিত। যে তিনটী বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে, যদি কেহ তাহার এক একটীর সমুদয় ব্যয় প্রদান করেন, তবে তাহাদের এক এক জনের নামেই ঐরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইতে পারে। অথবা কেহ ইচ্ছা করিলে, উক্ত বাটীগুলির এক একটী ঘরের ব্যয়-স্বরূপ ১০০০৲ টাকা দিলেও কেবল উক্ত ঘরটী তাঁহার আত্মীয়ের স্মৃতিমন্দিররূপে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। আর যাঁহারা এক একটী রোগীর সমুদয় খরচ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ঐ হিসাবে মাসিক দশ টাকা করিয়া দিলেই চলিবে, অথবা ৪০০০৲ টাকার স্থায়ী ফণ্ড করিয়া দিলে তাহার সুদ হইতে উক্ত রোগীর ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। এতদ্ব্যতীত গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অথবা আশ্রমের সাধারণ খর-চের জন্য যিনি যাহা কিছু দিবেন, তাহাই ধন্যবাদ-সহকারে গৃহীত হইবে। টাকা কড়ি (১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা (২) স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল পোঃ, (সাহারানপুর) (৩) বা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১২ ও ১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

এই তিনটী ঠিকানার যে কোনটীতে পাঠাইলেই চলিবে।

উপসংহারে বক্তব্য, এই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম যে কার্য্য করিতেছেন, উহা বাস্তবিক এক বিরাট্ জাতীয় যজ্ঞ-স্বরূপ। সেবকগণ ইহার পরি-চারক মাত্র। পূজা—সর্ব্বসাধারণের, সুতরাং তাহার সাফল্য বা বৈকল্যের দোষ-গুণও তাঁহাদেরই। আজ তাঁহাদের নিকট, বিশেষতঃ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট আমরা ইহার কয়েকটী অভাবের কথা জানাই-লাম। আশা করি, তাঁহাদের সহযোগিতায় আমরা উত্তরোত্তর এই পূজা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইব। বিশেষ, স্মরণ রাখা উচিত—কাজটী বাঙ্গালীর। বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূরে এই কার্য্যের দ্বারা ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িয়াছে,—সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ ও স্থায়ী করিবার চেষ্টা কি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য নহে?

যাঁহারা সৎকার্য্য মাত্রেই দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলা বাহুল্য। কিন্তু যাঁহারা এটীকে স্থানীয় কার্য্য মনে করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণেরই ইহাতে সাহায্য করা উচিত মনে করেন, তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে বলি, এ কার্য্যকে বাস্তবিক স্থানীয় কার্য্য বলিতে পারা যায় না। কারণ, এটী তীর্থস্থান—এ স্থানে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতেই যাত্রিগণ সমবেত হইয়া থাকেন—বিশেষতঃ, রেলের কল্যাণে এই সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাঠক মহাশয়, ভাবিয়া দেখুন যে, আশ্রমের সূত্রপাত হইতে এ পর্য্যন্ত যে ৫৮৯৭৪ সংখ্যক রোগী এখানে চিকিৎসিত হইয়াছে, এই আশ্রম না থাকিলে, তাহাদের কি ভীষণ অবস্থা হইত। কল্পনাসহায়ে ভাবুন দেখি, আপনার কোন বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজন তীর্থগমন করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন—তাহা হইলেই এই আশ্রমের উপকারিতা আপনার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আর এই আশ্রমের উপকারিতা বুঝিয়া, দরিদ্র নারায়ণগণের সেবার উদ্দেশে আপনি যাহা কিছু দিবেন, তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

আগামী ২০শে মাঘ ২রা ফেব্রুয়ারি রবিবার, পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজির একপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব তদীয় শিষ্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক বেলুড় ও তাহার শাখা মঠ সমূহে অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ "দরিদ্র নারায়ণ" গণের সেবাও ঐদিন অনুষ্ঠিত হইবে। আশা করি, উদ্বোধনের পাঠকগণ উহাতে যথাসম্ভব যোগদান করিবেন।

সমালোচনা।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনূদিত। প্রকাশক—জি, পি, বসু, শ্যামপুকুর, ২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

যোগবাশিষ্ঠের প্রথম প্রকরণ ও দ্বিতীয় প্রকরণের কতকাংশমাত্র—

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বাবুর জীবদ্দশায় অনূদিত হইয়াছিল। নানা কারণে তিনি আর অধিক প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, তাঁহার পুত্রগণ সেই অসমাপ্ত কার্য্য উৎসাহের সহিত সম্পূর্ণ করিয়া, বেদোক্ত পূরণার্থক পুত্রশব্দের যথার্থ মর্য্যাদা এ ক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছেন।

অনুবাদ উপস্থিতমত ভালই হইয়াছে, নিঃসংশয়ে ইহা বলা যায়। কারণ, অনুবাদের ভাষা আরও সহজ ও সুললিত করিতে পারেন, এরূপ অনুবাদক বঙ্গসাহিত্যে এখনও সুদুর্ল্লভ, অর্থাৎ থাকিলেও এ সব কাজে পাওয়া দায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক অনূদিত শাস্ত্রগ্রন্থ অপেক্ষা আলোচ্য গ্রন্থে যে ভাষার উন্নতি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু "যোগবাশিষ্ঠে"র মত জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় একটী আদরের গ্রন্থ মূলশ্লোকবর্জ্জিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইলে, উহার মূল্য কতটা কমিয়া যায়, তাহা ভাবিবার কথা। মূল শ্লোকগুলি পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিলে, গ্রন্থের কলেবর হয় ত আরও সিকিভাগ বাড়িয়া যাইত এবং দরও কাজে কাজেই কিছু বেশী হইত। কিন্তু তথাপি কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য অধিক দিয়া গ্রাহক ও ক্রেতাগণ যাহা ঘরে আনিতেন, তাহার মূল্য যে এক হিসাবে ঢের বেশী ও তাহার স্থায়িত্বও যে অধিক, তাহা সহজেই বুঝান যায়। যাহা হউক, এখন উপায় নাই; তবে অন্ততঃ পরিশিষ্ট নাম দিয়াও যদি মূলগ্রন্থখানি গ্রাহক ও ক্রেতাদের ইচ্ছামত গ্রহণার্থ প্রকাশকগণ প্রস্তুত রাখেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না।

অশোক বা প্রিয়দর্শী। শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত, সিটি-বুক সোসাইটী (৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল ব্যাপিয়া ভারতীয় বৌদ্ধযুগসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার সংবাদ ও ফলাফল বঙ্গসাহিত্যের পাঠকের জন্য সর্ব্বদা আহরণ করা সাহিত্য-

সেবীদের একটী কর্ত্তব্যবিশেষ, সন্দেহ নাই। সে কর্ত্তব্য মাসিক-পত্রাদির স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখিয়া কথঞ্চিৎ পূরণ করা হইতেছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু চারুবাবুকে অজস্র সাধুবাদ করি যে, তিনি সংক্ষেপে, সুললিত ভাষায়, অশোকসম্বন্ধীয় নানা গবেষণাকে পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া. বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে একটী প্রকৃত মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিয়াছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় এরূপ উদ্যোগে তাঁহার অগ্রগামী, কিন্তু উভয়ের পুস্তকদ্বয় পাঠ করিলে, স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আলোচ্য পুস্তকখানির যথার্থ প্রয়োজন আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে উদ্ভূত হইয়াছিল; কারণ, আজকালকার তুলনায় স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের সম্মুখে যে উপকরণ প্রস্তুত ছিল, তাহা খুবই বিরল।

বৌদ্ধযুগ ও অশোকযুগ-সম্বন্ধে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, গ্রন্থকার বেশ দক্ষতার সহিত সে সমস্ত ব্যবহার করিয়া পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারত সিংহল প্রভৃতি দেশের প্রচলিত কাহিনী ও বৌদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিও লেখক মহাশয় যথাসম্ভব অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে, আমাদের দেশের স্কুলকলেজে পুস্তকখানি যদি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়, তবে শিক্ষার্থিগণ বৌদ্ধযুগসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণায় এই পুস্তকসাহায্যে একটা যথাযোগ্য প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু বৌদ্ধযুগ আদিতে ও অন্তে (অথবা অশোকযুগ উদয়কালে) ভারতীয় সাধনার ধারার সহিত সর্ব্বাংশে কিরূপ যোগ রক্ষা করিয়াছে, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া না দিলে, ভগবান্ বুদ্ধ অথবা প্রিয়দর্শী অশোকের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। সে যোগ এখনও সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, ভারতের সনাতন সাধনার মধ্যে বৌদ্ধ সাধনাকে এখনও আমাদের ঐতিহাসিকগণ সম্যক্‌রূপে অঙ্গীভূত করিতে পারেন নাই। যতদিন না সে কাজ সম্পূর্ণ হইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা বুদ্ধচরিত বা অশোকচরিতের মধ্যে একটা অভাব থাকিয়া যাইবেই।

কিন্তু সে অভাব আলোচ্য "অশোক" গ্রন্থের গৌরবহানি করে না, কারণ, উহা কোন স্থলেই গবেষণার গতি রুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে নাই,—কোনস্থলেই শেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে যায় নাই—কেবল বঙ্গীয় পাঠকদের জন্য গবেষণার এতাবল্লব্ধ ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য সফল হইবে, বঙ্গীয় পাঠকবর্গ ইহার উপযুক্ত আদর করিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

সাধনার দ্বিতীয় চারি বৎসর।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।

(স্বামী সারদানন্দ।)

কেবলমাত্র তর্কযুক্তি-সহায়েই যে, ব্রাহ্মণী, ঠাকুরের অলৌকিকত্ব-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীতা হইয়াছিলেন, তাহা নহে। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ তিন ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে—একথা, তিনি ৺জগদম্বার কৃপায় কিছুকাল পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। ঐ কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন ও ঠাকুরকে বুঝিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। সুতরাং ঠাকুরের দর্শন লাভের পর এখন যতই দিন যাইতে লাগিল এবং যতই তিনি ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধা হইতে লাগিলেন, ততই সাধনপথে ঠাকুরকে কতদূর কি ভাবে সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয় তাঁহার মনে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অতএব বৈষ্ণবচরণাদি পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া, ঠাকুরের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমধারণা দূর করিবার চেষ্টাতেই তিনি যে এখন কেবলমাত্র কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা নহে; কিন্তু ঠাকুর যাহাতে শাস্ত্রপথাবলম্বনে সাধনক্রিয়া সকলের যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার পূর্ণ কৃপা ও প্রসন্নতার অধিকারী হইয়া স্বস্বরূপে, নিজ দিব্যশক্তিতে অবিচলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইলেন।

ঠাকুরকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, বিশিষ্ট-সাধিকা ব্রাহ্মণীর একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, গুরুপরম্পরাগত

সাধনপথ সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন না করিয়া, কেবলমাত্র নিজ অসাধারণ অনুরাগ-সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনলাভে এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই, ঠাকুর নিজ মনোগত সংশয় সকলের হস্ত হইতে এককালে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন নাই এবং সেজন্যই মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উদয় হইতেছে যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার যে সকল দর্শন এ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, তাহা নিজ মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল কি না, অথবা তাঁহার অপূর্ব্ব শারীরিক ও মানসিক বিকার সকল কোনরূপ উৎকট ব্যাধির লক্ষণ কি না, ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত বিষয় অনুধাবন করিয়াই যে, ব্রাহ্মণী এখন ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত প্রাচীন সাধনমার্গাবলম্বনে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয়। ব্রাহ্মণী বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণানুষ্ঠিত তন্ত্রোক্ত মার্গে প্রবর্ত্তিত হইয়া, তাঁহাদিগের অনুরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা সকল প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ঐ সকল অবস্থা ব্যাধিপ্রসূত নহে। সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় সকল পূর্ব্ব হইতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বয়ং ঐরূপ ফলসমূহ লাভ করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, সাধনা-সহায়ে মানব উচ্চ—উচ্চতর মানসিক ভূমিসমূহে আরোহণ করিয়া সত্যই অসাধারণ প্রত্যক্ষ সকল করিয়া থাকে এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহ ঐরূপেই উপস্থিত হইয়াছে। ফলে দাঁড়াইবে এই যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষ সকলই উপস্থিত হউক না কেন, তিনি উহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, ঐ সকলকে সত্য জানিয়া, নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র ঐজন্যই সাধককে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ জীবনের অনুভব সকলকে সর্ব্বদা মিলাইয়া অনুরূপ হইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতার মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া, ব্রাহ্মণী কোন্ যুক্তিবলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে উদ্যতা হইলেন? অবতার-মহিমা যিনি বুঝেন, তিনি ত ঐরূপ পুরুষকে পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার অনাবশ্যকতাই

সর্ব্বথা স্বীকার করেন? উত্তরে বলিতে হয়, ঠাকুরের ঐপ্রকার আধ্যাত্মিক মহিমা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ব্রাহ্মণীর মনে সর্ব্বদা সমুদিত থাকিলে, তাঁহার মানসিক ভাবও ঐরূপ হইত নিশ্চয়, কিন্তু তাহা হয় নাই, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতেই ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে অপত্যনির্ব্বিশেষে ভালবাসিয়াছিলেন, এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভুলাইয়া অপরের কল্যাণ-চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে ভালবাসার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে আর নাই! দেব-মানব, অবতার-পুরুষ সকলের জীবনে আমরা সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই যে, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তি সকল তাঁহাদিগের অলৌকিক আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইলেও, পরক্ষণেই তাঁহাদিগের অভূতপূর্ব্ব প্রেমাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া, উহা ভুলিয়া, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের ভালবাসা ও সেবাদি অর্পণমাত্র করিয়াই কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন। অতএব ঠাকুরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রকাশাদি দেখিয়া সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম মাতৃভাব, বালকের ন্যায় নির্ভরতা এবং অসীম বিশ্বাস যে, তাঁহার হৃদয়নিহিত কোমল-কঠোর মাতৃস্নেহকে সর্ব্বদা উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়া, ঠাকুরকে বিন্দুমাত্র সুখী করিবার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে, অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে, এবং সকল বিষয়ে সহায়তা করিতেই তাঁহাকে সর্ব্বথা নিযুক্তা রাখিত, একথা বলা বাহুল্য।

বিশিষ্ট অধিকারীকে শিক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের স্বতঃই উদয় হয়। আধ্যাত্মিক জগতে, বর্ত্তমানকালে ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধিকারী যে জন্মিতে পারে, ব্রাহ্মণী একথা পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। সুতরাং ঠাকুরকে শিক্ষাদানের অবসর প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় কিরূপ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা আমরা বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম পুত্রবাৎসল্য। অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী যে, নিজ স্বাধ্যায় ও তপস্যার সমগ্র ফল স্বল্পকালের মধ্যে ঠাকুরকে অনুভব করাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্রা হইয়া উঠিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

আবার তন্ত্রোক্ত সাধন সকল অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ঠাকুর ঐ সকলের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া যে উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—একথা আমরা তাঁহারই শ্রীমুখে কখন কখন শ্রবণ করিয়াছি। অতএব কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনাই তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই; সাধন-প্রসূত তাঁহার নিজ দিব্যদৃষ্টি তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়াছিল—শাস্ত্রীয় প্রণালী সকলের অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন এখন ব্রাহ্মণী-নির্দ্দিষ্ট সাধন-পথে পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব করা আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ, নানাদিকে নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও এক-লক্ষ্যতা কোথায়?—অন্তঃ-সমুদ্রের উপরিগত উর্ম্মিমালার রঙ্গভঙ্গে মোহিত হইয়া না থাকিয়া, উহার তলস্পর্শ করিবার জন্য এককালে হাত পা ছাড়িয়া ঝম্প প্রদানের অসীম সাহস আমাদিগের কোথায়?—'একেবারে ডুবে যা, আপনাতে আপনি ডুবে যা' বলিয়া, ঠাকুর আমাদিগকে বারম্বার যে ভাবে উত্তেজিত করিতেন, জগতের সকল পদার্থ এবং নিজ শরীরের মায়া মমতা পর্য্যন্ত এককালে উচ্ছিন্ন করিয়া, সে ভাবে আধ্যাত্মিক অন্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা দেখা দে' বলিয়া গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও তাঁহার ঐভাবের বিরাম হইত না—তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। হইবেই বা কেন? শ্রীশ্রীজগন্মাতা যথার্থই আছেন এবং সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহার দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর—একথায় কি আমরা ঠাকুরের ন্যায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি?

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ আভাষ ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া

স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তৎকালে আমরা যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার ছায়ামাত্র পাঠককে প্রদানে সমর্থ হইব কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটির এখানে উল্লেখ করিব ঃ—

ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্দ্ধারিত টাকা (ফি) জমা দিতে যাইয়া, কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি এক-বস্ত্রে নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় সহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনো-বেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, ঐ সময় হইতে কেমন করিয়া প্রায় আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তিনি দিবারাত্র ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্রকঠোর-ভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল, এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি মাসের অন্তেই নির্ব্বিকল্প সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন—সৌভাগ্যক্রমে ঐ সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে এককালে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুরও তখন পরমানন্দে স্বামীজির ঐরূপ অপূর্ব্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও সাধনোৎ-সাহের নিত্য ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন। ঐ সময় ঠাকুর একদিন, নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামীজির ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"নরেন্দ্রের অনুরাগোৎসাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) এখানে তখন (সাধনকালে) যে (অনুরাগোৎসাহের) তোড়্ আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহা যৎ-সামান্য—ইহা তাহার সিকিও হইবে না।"—ঠাকুরের ঐ কথায় আমাদিগের মনে তখন কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, হে পাঠক, পার ত কল্পনাসহায়ে তাহা স্বয়ং অনুভব কর।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সকল ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্ম্মকুশলা ব্রাহ্মণী নানা দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়োপযোগী পদার্থসকলের সংগ্রহে এবং সাধনকালে উহাদিগের প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করিয়া ঠাকুরকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে লাগিলেন। চণ্ডালজাতীয় মনুষ্যপ্রমুখ পঞ্চজীবের মস্তক-কঙ্কাল গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযত্নে সমাহৃত হইয়া, ঠাকুরবাটীর উদ্যানের উত্তরসীমাপ্রান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনানুকূল দুইটি বেদিকা* নির্ম্মিত হইল এবং প্রয়োজনমত ঐ পঞ্চমুণ্ডীসম্পন্ন বেদিকাদ্বয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল। দিবারাত্র, কয়েক মাস কোথা দিয়া কিরূপে আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এ অদ্ভুত সাধক বা উত্তরসাধিকা, কাহারই জ্ঞানগোচর রহিল না। ঠাকুর বলিতেন†—"ব্রাহ্মণী দিবাভাগে কালীবাটীর উদ্যান হইতে বহুদূরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট নানা দুষ্প্রাপ্য পদার্থ সকল সংগ্রহ করিত এবং রাত্রিকালে ঐ সকল বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে আনয়ন করত আমাকে আহ্বান করিত, এবং ঐ সকলের সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া, জপ বা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত। আমিও তদ্রূপ

---

* সচরাচর পঞ্চমুণ্ড সংযুক্ত একটি বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়াই সাধকেরা তদাশ্রয়ে জপ ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঠাকুর কিন্তু দুইটি ঐরূপ আসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন; দুইটি আসন কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তদ্বিষয় জিজ্ঞাসায় আমাদের অবসর হয় নাই। হইতে পারে, বিল্বমূল তৎকালে একান্তে নির্জ্জন ছিল বলিয়া, দিবাভাগে অনুষ্ঠিত সাধন সকলের তথায় অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছিল। অথবা বিল্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানির বারুদখানা বিদ্যমান থাকায়, তথায় হোমাদির জন্য সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত করার অসুবিধার জন্য ঐরূপ হইয়াছিল।

† ঠাকুরের শ্রীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই এখানে সম্বদ্ধভাবে দেওয়া গেল।

অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতাম, কিন্তু জপ আর বড় একটা করিতে হইত না, একবার মালা ফিরাইতে না ফিরাইতে একেবারে সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িতাম এবং ঐ ক্রিয়াসকলের তন্ত্রে লিপিবদ্ধ ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম! ঐরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব, কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই! চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, তাহার সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল! কঠিন কঠিন সব সাধন!—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি!

"একদিন দেখি কি?—কোথা হইতে ব্রাহ্মণী নিশাভাগে এক পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং আমাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, 'বাবা, ইঁহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর!' পরে পূজা সাঙ্গ হইলে, রমণীকে বিবস্ত্রা করিয়া বলিল, 'বাবা, ইঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জপ কর!'—তখন আতঙ্কে অস্থির হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে করিতে মাকে বলিতে লাগিলাম, 'মা, তোর একান্ত শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস্? তোর দুর্ব্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?'—ঐরূপ বলিবামাত্র কিন্তু কাহার দ্বারা যেন আবিষ্ট হইলাম এবং কোথা হইতে অপূর্ব্ব বলে হৃদয় এককালে পূর্ণ হইল! তখন নিদ্রিতের ন্যায়, কি করিতেছি সম্যক্ না জানিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি, ব্রাহ্মণী চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সযত্নে শুশ্রূষা করিতেছে এবং বলিতেছে, 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা; অপরে কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ!'—শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া, ঐ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিবার জন্য মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলাম!

"আর একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে

বলিল। তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘৃণার উদয় হইল না।

"কিন্তু যে দিন সে (ব্রাহ্মণী) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে দিন ঘৃণায় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা কি কখন করা যায় ?'—শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি !'—বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া 'ঘৃণা করিতে নাই' বলিয়া, পুনরায় উহা আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্ত্তির উদ্দীপনা হইয়া গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। তখন ব্রাহ্মণী ঐ দ্রব্যের কিয়দংশ মুখে প্রদান করিলেও, আর ঘৃণার উদয় হইল না।

"ঐরূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাহ্মণী নিত্য কতই যে তান্ত্রিকী ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণেও আসে না। তবে মনে আছে, মার কৃপায় প্রণয়ি-যুগলের চরমানন্দ যে দিন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং তাহাদিগের ঐরূপ ক্রিয়ায় সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির বিন্দুমাত্র উদয় না হইয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় যে দিন সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন বাহ্যচৈতন্য লাভের পর ব্রাহ্মণীকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধকাম হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন !' উহার কিছুকাল পরে অন্য একজন ভৈরবীকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দিয়া প্রসন্না করিয়া, তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্ব্বজনসমক্ষে তন্ত্রোক্ত কুলাগার-পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া, তন্ত্রোক্ত বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রেই মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, বিন্দুমাত্র কারণ-গ্রহণও তদ্রূপ কখন করিতে পারি নাই !—কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে যেমন আত্মহারা হইয়া পড়িতাম, 'যোনি' শব্দ শ্রবণমাত্রেই তেমনি জগদ্‌যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতাম।"

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে চিরকাল মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া একটি পৌরাণিক গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটীতে সিদ্ধজ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্রীগণপতিদেবের হৃদয়ে রমণী-মাত্রে মাতৃভাব কিরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত হই-য়াছে। মদস্রাবী গজতুণ্ডাস্ফালিত-বদন লম্বোদর দেবতাটির উপর ইতিপূর্ব্বে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার বড় একটা আতিশয্য ছিল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ঐ গল্পটী শুনিয়া পর্য্যন্ত শুদ্ধ যে তাহাই হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু ধারণা হইয়াছে, শ্রীগণপতি, বাস্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য! গল্পটী এই:—

কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াপ্রদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে, গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন,— 'কেন বাবা, তুমিই ত আমার এরূপ দুরবস্থা করিয়াছ?' মাতৃভক্ত গণেশ ঐকথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলিলেন,—'সে কি কথা মা, আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোনও দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার দুরন্ত অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে ঐরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে?' জগন্ময়ী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী তখন বালককে বলিলেন,—'ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি না?' গণেশ বলিলেন,—'তাহা করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল, একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।' যাহার বিড়াল সে-ই, মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সান্ত্বনার জন্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন,—'তাহা নহে বাবা, আমাকে অন্য কেহই মারে নাই, কিন্তু

আমিই বিড়ালরূপ পরিগ্রহ করিয়াছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ; তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ করিও না; কিন্তু অদ্যাবধি একথা স্মরণ রাখিও, জগতে স্ত্রীমূর্ত্তিবিশিষ্ট সকল জীব আমারই অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্ত্তি-ধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই!' গণেশ মাতার ঐকথা শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া, উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে গণেশ চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্ব্বদা দৃঢ় ধারণা করিয়া থাকায়, জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন!

পূর্ব্বোক্ত গল্পটী বলিয়া ঠাকুর, শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমাসূচক নিম্নলিখিত কথাটিও বলিয়াছিলেন,—কোন সময়ে শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী নিজ গলদেশে লম্বিত বহুমূল্য রত্নমালা দেখাইয়া, গণেশ ও কার্ত্তিককে বলেন যে, চতুর্দ্দশভুবনান্বিত জগৎ পরিক্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। দেবসেনানী শিখিবাহন কার্ত্তিক অগ্রজের লম্বোদর স্থূল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন মূষিকের স্বল্পশক্তি ও মন্দগতি স্মরণ করিয়া, বিদ্রূপ হাস্য হাসিলেন এবং 'রত্নমালা আমারই হইয়াছে' স্থির করিয়া, ময়ূরারোহণে জগৎ পরিক্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্ত্তিক ঐরূপে চলিয়া যাইবার পর, স্থিরবুদ্ধি গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে তাঁহাদের শরীরেই অবস্থিত দেখিয়া, ধীরপদে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীকে পরিক্রমণ ও বন্দনা করত পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিলে, জগন্ময়ী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী গণপতির জ্ঞান ও ভক্তিতে পরম পরিতুষ্টা হইয়া প্রসাদা রত্নমালা তাঁহারই গলদেশে সস্নেহে লম্বিত করিলেন।

ঐরূপে শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানমহিমা এবং রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিলেন,—"আমারও রমণীমাত্রেই ঐরূপ ভাব;

সে জন্যই বিবাহিতা স্ত্রীর ভিতরেও শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া পূজা ও পাদবন্দনা করিয়াছিলাম।”

রমণীমাত্রে মাতৃভাব সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তন্ত্রোক্ত বীরভাবের সাধন সকলের অবলম্বন ও যথাযথ অনুষ্ঠান করিবার কথা কোন যুগে কোন সাধকের সম্বন্ধেই আমরা শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া সাধকমাত্রেই যে সাধনকালে একাল পর্য্যন্ত শক্তিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, এবিষয় সুনিশ্চিত এবং বীরধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি সকলকে অনুষ্ঠানকালে একাল পর্য্যন্ত উহার ব্যতিক্রম করিতে না দেখিয়াই লোকের মনে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে যে, ঐরূপ না করিলে, সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতা লাভ একান্ত অসম্ভব। প্রধানতঃ ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই যে, লোকে তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

যুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজ সম্বন্ধে একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন যে, আজীবন স্বপ্নেও তিনি কখন স্ত্রীগ্রহণ করেন নাই! অতএব পূর্ব্ব হইতে পূর্ণরূপে মাতৃভাবাবলম্বন করাইয়া, ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিতে ঐরূপে প্রবৃত্ত করাতে, শ্রীশ্রীজগদম্বার গূঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ সম্পন্ন করাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

ঠাকুর বলিতেন, সাধন সকলের কোনটিতে সাফল্য লাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় কখনও লাগে নাই। ‘সাধন-বিশেষ গ্রহণ করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ধরিয়া বসিলে, তিন দিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম।’ শক্তিগ্রহণ না করিয়াও, সাধন সকলে তাঁহার ঐরূপে স্বল্পকালে সাফল্য লাভ করাতে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীগ্রহণ ঐ সকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গবিশেষ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন দুর্ব্বল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়াই সর্ব্বথা ঐরূপ করিয়া থাকে। প্রকৃত্যধীন হইয়া সাধক ঐরূপ করিয়া বসিলেও যে, তন্ত্র তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কালে সে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে—এ

কথার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ শাস্ত্রের পরম কারুণিকত্বই উপলব্ধ হয়।

অতএব রূপরসাদি যে সকল পদার্থ মানব সাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযত হইয়া বারম্বার উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা ঐ সকলকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করাই তান্ত্রিকী ক্রিয়া সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম এবং পূর্ব্বোক্ত ধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র, পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা কবিযাছেন এবং তাহাকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তি স্বরূপে অবলম্বন করিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে, তবেই উহাদেব ফল করগত হইবে—একথা, কালধর্ম্মে লোকে প্রায় বিস্মৃত হইযাছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়া সকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রকেই দায়ী স্থির করিয়া, অপরে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রেই সর্ব্বদা মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয ঠাকুরের এই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া,—যথার্থ সাধককুল, কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া—যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইযা ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।

ঠাকুর, তন্ত্রোক্ত রহস্য সাধনসমূহের তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত যথাযথ অনুষ্ঠান করিলেও, উহাদিগের পারম্পর্য্য ও সবিস্তার বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখন বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সাধনপথে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐ সকল কথার অল্প বিস্তর আমাদিগের অনেককেই সময়ে সময়ে বলিয়াছেন; অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া, বিরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও করাইয়াছেন। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠানে নানা প্রকারের অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে, উত্তরকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর করাইয়া দিতে

পারিবেন না বলিয়াই যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুরকে এসময় এই পথের সহিত সম্যক্ পরিচিত করিয়াছিলেন—একথা, বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমীপাগত শরণাগত ভক্তদিগকে, কি ভাবে কত রূপে ঠাকুর সাধনপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন,তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা অন্যত্র* প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুর, সাধনক্রিয়া সকল পূর্ব্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন, তাঁহার তন্ত্রোক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন বা অনুভবের কথাবও আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমরা এখন উহাদিগেরই কয়েকটি এখানে পাঠককে বলিব :—

ঠাকুর বলিতেন, তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাঁহার পূর্ব্বস্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন শুনিয়া এবং কুক্কুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া, ঠাকুর ঐকালে তাহাদেব উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন! মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইত না!

শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ—নিজ সর্ব্বস্ব, অন্তরের সহিত আহুতি প্রদান করিয়া, ঠাকুর ঐকালে আপনাকে অন্তরে বাহিরে নিরন্তব জ্ঞানাগ্নিপরিব্যাপ্ত দেখিতেন।

কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া মস্তকে উঠিতেছে এবং মূলাধারাদি সহস্রার পর্য্যন্ত পদ্মসকল উর্দ্ধমুখ ও পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতেছে, এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হইতেছে†—এবিষয় ঠাকুর এই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য পুরুষমূর্ত্তি সুষুম্নার মধ্য দিয়া ঐ সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিতেছেন!

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—১ম অধ্যায় ১৯—৩৮ পৃষ্ঠা ও ২য় অধ্যায় ৮১—৯২ পৃষ্ঠা।

† গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায় ৬৩—৬৭ পৃষ্ঠা।

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে বসিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ম্ময় একটি ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত হইত এবং ঐ ত্রিকোণকে জীবন্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত! একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয় বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন,—"বেশ, বেশ, তোর ব্রহ্মযোনি দর্শন হইয়াছে; বিল্বমূলে সাধনকালে আমিও ঐরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম।"

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ যাবতীয় ধ্বনি একত্রিত হইয়া এক বিরাট্ প্রণবধ্বনি প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের সর্ব্বত্র স্বতঃই উদিত হইতেছে—এবিষয় ঠাকুর এই কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদিগেব কেহ কেহ বলেন, এই কালে তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগেব ধ্বনি-সকলের যথাযথ অর্থবোধ যে করিতে পারিতেন—একথা তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন।

স্ত্রীযোনির মধ্যে ঠাকুর এই কালে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছিলেন।

এই কালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভূতির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় হৃদয়েব পরামর্শে ঐ সকলের প্রয়োগের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট একদিন জানিতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন, উহারা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হেয় ও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ঠাকুর বলিতেন,—ঐরূপ দর্শন করিয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে তাঁহার ঘৃণার উদয় হয়!

ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিসকলের অনুভব-প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটী-তলে নির্জ্জনে একদিন আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—'ছাখ্, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি ঐ সকলের কখন প্রয়োগ করিব না, একথা বহুপূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি—উহাদিগের প্রয়োগ করিবার কোনরূপ আবশ্যকতাও দেখি না; তোকে ধর্ম্মপ্রচারাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে, তোকেই ঐ সকল দান করিব,স্থির করিয়াছি

—গ্রহণ কর্।' স্বামীজি তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন,—'মহাশয়, ঐ সকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি?' পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্ম্মপ্রচারাদি কার্য্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও, ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে না, তখন তিনি ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামীজি বলিতেন,—তাঁহার ঐরূপ আচরণে ঠাকুর তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনী-মায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছা মনে সমুদিত হইয়া ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়াছিলেন—এক অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি—গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া, ধীরপদবিক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন। ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা, পরে দেখিলেন, ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া, তাহাকে কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন, পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া উঠিয়া, ঐ শিশুকে মুখমধ্যে গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ ও গ্রাস করিলেন এবং পরে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন!

পূর্ব্বোক্ত দর্শন সকল ভিন্ন ঠাকুর এই কালে দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্য্যন্ত কত যে দেবীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি আবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্তা হইয়া, তাঁহাকে নানাভাবে উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন—একথা আমরা তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঐ মূর্ত্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্ব্ব স্বরূপা হইলেও, শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা ষোড়শীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের সহিত তাহাদিগের যে তুলনাই হয় না—একথাও আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—'ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্ত্তির অঙ্গ হইতে রূপসৌন্দর্য্য যেন গলিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতিত ও ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম!' এতদ্ভিন্ন ভৈরবাদি দেবযোনি-সম্ভব নানা পুরুষ সকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

অলৌকিক দর্শন ও অনুভব সকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধন-কাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি

হইয়াছে। অতএব ঐ নিষ্ফল উদ্যমে আর আমরা এখানে কালক্ষেপ করিব না।

তন্ত্রোক্ত সাধন কাল হইতে ঠাকুরের সুষুম্নাদ্বার পূর্ণ উন্মোচিত হইয়া, বালকবৎ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এই কালের শেষভাগ হইতেই তিনি আর পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি, চেষ্টা করিলেও, সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঐ সকল কখন কোথায় যে পড়িয়া যাইত, তাহার অনুভব হইত না। শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার শরীর-বোধ না থাকাই যে উহার হেতু, তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিনি যে কখন ঐরূপ করেন নাই, বা অন্যত্রদৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা, আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—ঐসকল সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহা পবিত্র বস্তু সকলের সহিত তুল্য দেখিতেন! বলিতেন,—"তুলসীগাছ ও সজ্‌নে খাড়া এক বোধ হইত!"

আবার, এই কাল হইতে ঠাকুরেব অঙ্গকান্তি কযেক বৎসর পর্য্যন্ত এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র লোকনযনের আকর্ষণের বিষয় হইযাছিলেন। নিরভিমান ঠাকুরের উহাতে নিরন্তর এতই বিবক্তির উদয় হইত যে, তিনি দিব্যকান্তি পরিহারের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন,—'মা, আমার ঐ বাহ্য রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর্!' তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনা যে কালে পূর্ণ হইয়াছিল, একথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তদ্রূপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করিতে উত্তরকালে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, সপ্তম অধ্যায়—১৯৪—১৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ না করিলে, ব্রাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, একথার আভাষও আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।† অতএব ব্রাহ্মণীর নাম যে যোগেশ্বরী ছিল, এবং ঠাকুর যে তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, এই কথামাত্র এখানে বলিয়াই আমরা ঠাকুরের পরবর্ত্তী কালের সাধনকথা সকল পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অধিকারি-বাদের দোষ।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

[বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের নিকট কথিত।]

প্রাচীন ঋষিগণের উপর আমি অসীম শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন—কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের দোহাই দিয়া যে ভাবে লোকশিক্ষা জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শিক্ষাপ্রণালী আমি বিশেষ আপত্তিকর জ্ঞান করি। ঐ সময় হইতে স্মৃতিকারেরা সর্ব্বদাই 'ইহা কর', 'উহা করিও না', ইত্যাদিরূপে লোককে বিধি নিষেধ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'কেন এই কাজ করিতে হইবে,' 'কেন ইহা করিব না'—বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাঁহারা কখনই দেন নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া বড়ই অনিষ্টকর—ইহাতে যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া লোকের ঘাড়ে কতকগুলি অনর্থক বোঝা চাপান হয় মাত্র। ঐ বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য সাধারণ লোকের নিকট গোপন করিয়া রাখিবার এই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, তাহারা ঐ উদ্দেশ্য বুঝিবার যথার্থ অধিকারী নহে—সেইজন্য উহা তাহাদের নিকট বলিলেও, তাহারা উহা বুঝিবে

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, অষ্টম অধ্যায়, ২৪৩—২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

না। এই অধিকারিবাদের অনেকটা খাঁটি স্বার্থপ্রসূত বই আর কিছুই নহে। তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহারা যে বিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, লোককে তাহা যদি জানাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা আর তাঁহাদিগকে আচার্য্যের উচ্চ আসনে বসাইবে না। এই কারণেই তাঁহারা অধিকারিবাদ মতটা বিশেষভাবে সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। সামর্থ্যরহিত বলিয়া যদি কোন লোককে তোমরা উচ্চ বিষয় জানিবার অনধিকারী বা অনুপযুক্ত মনে কর, তবে ত তোমাদের তাহাকে অধিক পরিমাণে শিক্ষা দিয়া, যাহাতে সে ঐ তত্ত্বসকল বুঝিবার শক্তি লাভ করিয়া উপযুক্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত—তাহার বুদ্ধি যাহাতে মার্জ্জিত ও সবল হয়, সে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ যাহাতে ধারণা করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে অল্প শিক্ষা না দিয়া বরং বেশী শিক্ষা দেওয়াই ত উচিত। এই অধিকারিবাদমতাবলম্বিগণ—মানবাত্মার মধ্যে যে গূঢ়-ভাবে সমুদয় শক্তি রহিয়াছে, এ কথাটা যেন একেবারে ভুলিয়া যান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, যদি তাহাকে উহা তাহার ভাষায়—তাহার উপযোগী ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। যে আচার্য্য অপরকে জ্ঞানদানে অসমর্থ, তিনি তাঁহার শিষ্যগণের নিন্দা না করিয়া এবং উচ্চতর জ্ঞান তাহাদের জন্য নহে, এই বৃথা হেতু-বাদে তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ফেলিয়া না রাখিয়া, তিনি যে তাহাদিগকে তাহাদের ভাষায়—তাহাদের উপযোগী ভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য তাঁহার নিজেরই বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। সত্য যাহা, তাহা নির্ভয়ে সকলের সমক্ষে উচ্চস্বরে প্রকাশ করিয়া বল—দুর্ব্বল অধিকারিগণের ইহাতে বুদ্ধিভেদ হইবে, এ আশঙ্কা করিও না। মানব নিজে ঘোর স্বার্থপর কি না—তাই সে চায় না যে, সে যতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অপরেও তাহা লাভ করুক—তাহার ভয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে মানিবে না—সে অপরের নিকট হইতে যে সকল ভোগ আদা-য়ের সুবিধা পাইত, লোকের নিকট হইতে যে বিশেষ সম্মান পাইত, তাহা আর পাইবে না। সেই জন্যই সে তর্ক করিয়া থাকে যে, দুর্ব্বল-

চিত্ত লোকের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলিলে, তাহাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যাইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকটীও ঐ ভাবেরই পরিচায়ক :—

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
> যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥　গীতা।

"জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মে আসক্ত,অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়া তাহাদের বুদ্ধিভেদ করিবেন না। কিন্তু তিনি যুক্তভাবে কর্ম্মসমুদয় স্বয়ং আচরণ করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন।"

কিন্তু আমার এই স্ববিরোধী বাক্যে বিশ্বাস হয় না যে, আলোকের দ্বারা অন্ধকার দূর না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অমৃতস্বরূপ সচ্চিদানন্দসমুদ্রে ডুবিলে মানুষ মরে, একথা যেমন, পূর্ব্বোক্ত বাক্যও তদ্রূপ। কি অসম্ভব কথা! জ্ঞানের অর্থ এই যে, অজ্ঞানজ ভ্রমসমূহ হইতে মুক্ত হওয়া। সেই জ্ঞানের দ্বারা ভ্রম আসিবে —জ্ঞানালোক আসিলে মাথা গুলাইয়া যাইবে!! ইহা কি কখন সম্ভব! এইরূপ মতবাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ এই যে, লোকে সাধারণ লোকের নিকট হইতে সম্মান হারাইবার ভয়ে খাঁটি সত্য যাহা, তাহা প্রচার করিতে সাহসী হয় না। তাহারা সনাতন সত্যের সহিত ভ্রমপূর্ণ কুসংস্কারসমূহের একটা আপোষ করিতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য এই মতবাদের পোষকতা করে যে, লোকাচার ও দেশাচার মানিতেই হইবে। খবরদার, তোমরা কখন এরূপ আপোষ করিতে যাইও না; খবরদার, এরূপে পুরাতন ভাঙ্গাঘরের উপর এক পোঁচ চূণকাম করিয়া উহাকে নূতন বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিও না। মড়াটার উপর কতকগুলো ফুলচাপা দিয়া উহার বীভৎস দৃশ্য ঢাকিতে যাইও না। "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ"—এ সব বাক্য গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও। এইরূপ আপোষ করিতে গেলে, তাহার ফল এই হয় যে, মহান্ সত্যগুলি অতি শীঘ্রই নানা কুসংস্কাররূপ আবর্জ্জনাস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া যায়, আর লোকে ঐগুলিকেই পরম আগ্রহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নির্ভীকভাবে যে মহান্ সত্যসমূহের প্রচার করিলেন, ভবিষ্যদ্বংশীয় শিষ্যগণ তাহার উপরেও অনেক বাজে জিনিষ

জুড়িয়া দিল; তাহার ফল এই হইল যে, জগতের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্রের মধ্যেও এমন অনেক কথা ঢুকিয়াছে, যাহাতে লোককে বিপথগামী করিয়া থাকে।

এই আপোষের চেষ্টা আসে ঘোর কাপুরুষতা হইতে, লোকভয় হইতে। তোমরা নির্ভীক হও। আমার শিষ্যগণের, সর্ব্বোপরি, খুব নির্ভীক হওয়া চাই। কোন কারণে কাহারও সহিত কোনরূপ আপোষ করা হইবে না। উচ্চতম সত্যসমূহ অধিকারিনির্ব্বিশেষে প্রচার করিতে থাক। লোকে তোমাকে মানিবে না, অথবা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ বাধিবে, এ ভয় করিও না। এটী নিশ্চিত জানিও যে, যদি সত্যকে পরিত্যাগ করিবার শত শত প্রলোভন সত্ত্বেও তোমরা সত্যকে ধরিয়া থাকিতে পার, তোমাদের ভিতর এমন এক দৈববল আসিবে, যাহার সম্মুখে লোকে—তোমরা যাহা বিশ্বাস কর না—তাহা বলিতে সাহসী হইবে না। যদি তোমরা চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া সত্যপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, ক্রমাগত সত্যের যথার্থ সেবা করিতে পার, তবে তোমরা লোককে যাহা বলিবে, তাহাকে তাহার সত্যতা বুঝিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপে তোমরা সর্ব্বসাধারণের মহা কল্যাণ করিতে পারিবে, তোমাদের দ্বারা লোকের বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, তোমরা সমুদয় জাতিকে উন্নত করিতে পারিবে।

———

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক্ দর্শন।

প্লেটো।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীকানাইলাল পাল এম এ।

গ্রীসের প্রাচীন মহত্ত্ব প্রায় সবই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্লেটোর অক্ষয়কীর্ত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ গৌরবে বর্ত্তমান। তাঁহার দর্শন-মত-মধ্যে কোন কোন কূট সমালোচক ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শনে প্রয়াসী হইলেও, এবং উহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য বলিয়া গ্রাহ্য না হইলেও, আজি পর্য্যন্ত সেই দর্শন তাঁহার পরবর্ত্তী কালের সকল দার্শনিকেরই উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। তাঁহার তিরোভাবের পর এমন কোন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ, যিনি তাঁহার ভাবে কথঞ্চিৎও অনুপ্রাণিত হন নাই! একটু প্রণিধান করিলেই, ইহার কারণ কি, বুঝা যাইতে পারে।

সত্যজ্ঞান লাভের সম্ভাব্যতায় সংশয় উত্থাপন করিয়া সোফিষ্টগণ দর্শন-চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হন। সেই সংশয় নিরাকরণ-মানসে মহাত্মা সক্রেটীস্ দার্শনিক চিন্তার নূতন বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া দর্শনের মূল ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হন, এবং সেই প্রণালী অবলম্বনে প্লেটোই প্রথমে দর্শনশাস্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়েন। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হেগেল্ বলেন,—"With Plato ,philosophy begins to be a science."—প্লেটোর সময় হইতেই দর্শন বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে।

সক্রেটীস্ প্রচার করিয়াছিলেন, সত্যজ্ঞান লাভই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হইয়া প্লেটো সেই উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া জীবনপথে চলিয়াছিলেন। দেশের কল্যাণসাধন-মানসে তাঁহাকে রাষ্ট্রব্যাপারে দুই একবার লিপ্ত হইতে হইলেও, তাঁহার সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও দার্শনিক চর্চ্চার আগ্রহ কোন দিন হ্রাস প্রাপ্ত

হয় নাই। সক্রেটীস্ উদ্ভাবিত চিন্তাপ্রণালীর সাহায্যে, সত্য লাভের চেষ্টায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং সেই চিন্তার ফলে পাশ্চাত্য জগৎকে অক্ষয় ধনে ধনী করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিক গুরু সেই প্লেটোই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়। পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী আমরা প্রথমে প্লেটোর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া, তাঁহার দার্শনিক মত আলোচনায় অগ্রসর হইব।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সমসাময়িক গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ মানবজাতির চিন্তাপ্রণালীর গতি-নিয়ামক এই মহাদার্শনিকেরও জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই। এ কারণ তাঁহার গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে তাঁহার জীবনের অনেকাংশ অনুমান করিয়া ও সেই সকল গ্রন্থসাহায্যে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পকথা ও প্রবাদ-বাক্যকে বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জীবন-চরিত সঙ্কলন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে, এস্থলে সম্পূর্ণ অনুমান বা কল্পনার উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন হইবে না, কারণ, তাঁহার শিষ্যমধ্যে কেহ কেহ যথা এরিষ্টটল্ (Aristotle) ও হার্‌মোডোরাস্ (Hermodorus) তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং প্লেটোর কোন কোন পুস্তক হইতেও তাঁহার জীবনচরিতের কোন কোন ঘটনা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

পেরিক্লিসের (Pericles) অধিনায়কত্বে, এথেন্স (Athens) যখন গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তৎকালে গ্রীসের কালস্বরূপ পিলপনিসিয়ান্ যুদ্ধ সূচিত হয়, এবং সেই যুদ্ধ হইতেই গ্রীসের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর ঐ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায়, প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকগণের মধ্যে সামান্য মতভেদ আছে। প্লেটোর শিষ্য হার্‌মোডোরাস্ (Hermodorus) বলেন,—৩৯৯ খৃঃ পূঃ অব্দে সক্রেটীসের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই প্লেটো মেগারায় (Magara) গমন করেন, এবং তখন তাঁহার বয়স অষ্টাবিংশতি বর্ষ ছিল; সুতরাং তাঁহার মতে ৪২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে প্লেটোর জন্ম। কেহ কেহ পেরিক্লিসের (Pericles)

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ ৪২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার আবির্ভাব-কাল স্থির করেন। অপর সকলের মতে ৪২৮ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কত বর্ষ জীবিত ছিলেন, এবং ঠিক কোন্ সময়েই বা ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যান, এ বিষয়েও সকলে একমত নন—একথা বলা বাহুল্য; কারণ, ঐগুলি নিশ্চিতরূপে জানা থাকিলে, তাঁহার ঠিক আবির্ভাবকালও নিশ্চয় করিয়া স্থির করা সম্ভব হইত। যাহা হউক, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের সহিত এইরূপ সূক্ষ্মভাবে সময় নিরূপণের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক, আমরা প্লেটো-শিষ্য হার্মোডোরাসের (Hermodorus) কথার উপর নির্ভর করাই যুক্তি-সঙ্গত মনে করি। জেলার্ (Zeller), গ্রোট্ (Grote), ইউবারভেগ্ (Uberweg) প্রভৃতি বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখকগণও এই মত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। তাঁহার জন্ম-স্থান সম্বন্ধে মতদ্বৈত দেখা যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এথেন্সে তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দেশ করেন; কেহ কেহ আবার বলেন, তিনি ইজাইনা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম-ব্যাপার লইয়া যে একটী অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে, সেটীও উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ আছে, তদীয় পিতা এরিষ্টোর (Aristo) সহিত তাঁহার মাতা পেরিটিওসিনির (Peritiocene) বিবাহের পূর্ব্বে ২১এ মে, এপোলো দেবের (Apollo) জন্মোৎসবের দিন প্লেটোর জন্ম হয়। অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস না করিলেও, তাঁহার গ্রীক দেবতা এপোলোর পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইবার একটী কারণ অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। এপোলো গ্রীক্ জাতির বাহ্য ও অন্তঃসৌন্দর্য্যের আদর্শ দেবতা। প্লেটোও বিশেষরূপে এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং কোন কোন পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক তাঁহাকে এপোলোর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই উচ্চবংশ-সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার পিতা এরিষ্টো (Aristo) কড্রাসের (Codrus) বংশধর; এবং তাঁহার মাতা ৩০ জন অধিনায়কের (30 Tyrants) অন্যতম নেতা কারমাইডিসের (Charmides) ভগিনী, এবং বিখ্যাত

জ্ঞানী সোলনের (Solon) আত্মীয় ড্রেপিডীসের (Drapides) প্রপৌত্রী ছিলেন। এইরূপ উচ্চবংশসম্ভূত হইলেও, তিনি ঐশ্বর্য্যসম্পদের অধিকারী ছিলেন কি না, এ বিষয়েও ঐতিহাসিকগণমধ্যে মতদ্বৈত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, তিনি এক সময়ে অর্থাভাবে সামান্য সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করিবেন স্থির করেন, এবং মিশরদেশে যাত্রাকালে তৈল বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করেন। কিন্তু যখন প্রায় সকল ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেন, যে, তিনি সক্রেটীসের প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে উপযুক্ত অর্থদণ্ড প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অল্পবয়সেই রাষ্ট্রব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দেশের সংস্কার সাধন করিয়া প্রাধান্যলাভের প্রয়াসী ছিলেন, এবং সক্রেটীসের মৃত্যুর পরই নানাদেশ ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি যে দরিদ্র ছিলেন বা দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, একথা বিশ্বাস করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

পিতামাতা তাঁহার এরিষ্টক্লিস (Aristocles) এই নামকরণ করেন। পরে তাঁহার ব্যায়াম-শিক্ষক তাঁহার সুদৃঢ় শারীরিক গঠনের জন্য তাঁহাকে প্লেটো নামে অভিহিত করেন (গ্রীকভাষায় 'প্লেটো' এই শব্দের অর্থ—প্রশস্ত-ললাট ও বৃষস্কন্ধ)। শুনা যায়, তাঁহার দুই সহোদর ও দুই সহোদরা ছিলেন। তন্মধ্যে একজন জ্যেষ্ঠ সহোদর থাকা যদি সত্য হয়, (যেমন কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন), তবে প্লেটোর অলৌকিক জন্মকথা কতকাংশ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু একথারও নিশ্চয় প্রমাণ কিছু নাই। কনিষ্ঠা ভগিনী পোটনীর (Potone) পুত্র স্পিউসিপাস্ (Speusippus) প্লেটোর জীবনান্তে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একাডেমি (Academy) বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন।

মানব যে সমাজে, যে সময়ে, যে বংশে জন্মগ্রহণ করে ও বাল্যকালে যে অবস্থায় প্রতিপালিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রভাব তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে পরিলক্ষিত হয়। উচ্চবংশে ধনিগৃহে জন্মগ্রহণ করায়, তাঁহার বাল্যশিক্ষার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল এবং তিনিও অনুকূল অবস্থায় আপন প্রতিভা বিকাশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শুনা যায়, বিখ্যাত শিক্ষকগণ তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দান করেন। তিনি

ডাইয়োনিসাসের (Dionysus) নিকট লিখন পঠন, এরিষ্টোর (Aristo) নিকট ব্যায়াম, ড্রাকো (Draco) ও মেটেলাসের (Metellus) নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল, একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শারীরিক উন্নতিসাধনেও উদাসীন ছিলেন না; বরং তিনি বলিতেন,—মানসিক উন্নতির জন্য যেমন জ্ঞানার্জ্জন আবশ্যক, শারীরিক উন্নতির জন্য তেমনি ব্যায়ামচর্চ্চা কর্ত্তব্য। প্রবাদ আছে, ইস্‌থমিয়ানের দ্বন্দ্বযুদ্ধে (Isthmian contests) দুই একবার যোগদান করিয়া তিনি জয়মাল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও, উক্ত প্রবাদ হইতে তাঁহার শারীরিক উন্নতি লাভে যে বিশেষ যত্ন ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়।

কথিত আছে, প্লেটো বাল্যকালে কবিতা, গান, এমন কি, একখানি নাটক পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যচর্চ্চা তাঁহার ভাববিকাশের সহায় হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। তিনি শুধু অলস উপভোগের নিমিত্ত কবিতা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন না। এই চর্চ্চা কিপ্রকারে তাঁহার দার্শনিক চিন্তার সহায় হইয়াছিল,একথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সক্রেটীস্ প্রচার করিয়াছিলেন,--কোন বস্তুর "জাতীয় ভাবটী" (concept) উপলব্ধি করিলে তাহার স্বরূপ জানা যায়—ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ভ্রমসঙ্কুল। সক্রেটীসের শিষ্য হইয়া প্লেটো (Plato) একথা সম্পূর্ণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং সেই মহাত্মার সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেও তাঁহার ভাবপ্রবণ কবিহৃদয় তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে লইয়া চলিয়াছিল, এখানে মনে রাখা উচিত, ভাবুকতা ও কল্পনা এক কথা নয়—কল্পনায় মানুষ আকাশ-কুসুমও রচনা করিতে সক্ষম—কিন্তু আকাশ-কুসুম অলীক পদার্থ মাত্র, ঐরূপ কল্পনাশক্তির সহায়তায় সত্যলাভ অসম্ভব; কিন্তু ভাবুকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—উহা সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই মানবহৃদয়ে প্রকাশ পায়। তাঁহার কবিতা-চর্চ্চা, তাঁহার এই ভাবুকতারই পরিচায়ক এবং তাঁহার জীবন ও দর্শন-মধ্যে উহার প্রভাব বেশ লক্ষিত হয়। তাঁহার দার্শনিক

প্রবন্ধ কূট তর্কজালে পরিপূর্ণ, হইলেও, একেবারে কবিত্ববর্জ্জিত ছিল না।

ঐতিহাসিক পাঠকগণ অবগত আছেন, ৪১৩ খৃঃ পূঃ অব্দে সিসিলিতে এথেন্সবাসিগণ পরাজিত হওয়ার পর, গ্রীসে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। তৎকালে প্রচলিত প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী দূষিত হইয়া পড়ায়, স্বার্থসাধনই অধিনায়কের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ঈগপটেমির (Aegpotami) যুদ্ধে এথেন্সের পতনের পর সেই শাসনপ্রণালী আর স্থান পাইল না। তখন ৩০ জন অধিনায়ক (Thirty tyrants) একসঙ্গে দেশের কর্ত্তা হইলেন। প্লেটোর (Plato) বাল্যজীবন এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তিনিও দেশসংস্কারকার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন, কিন্তু শীঘ্রই সে কার্য্য অসম্ভব মনে করিয়া, রাষ্ট্রব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হন। এদিকে পিলেপোনিসিয়ান্ যুদ্ধে দেশে সর্ব্বদাই একটা আতঙ্কের বিভীষিকা বিরাজ করিত এবং দেশবাসিগণকে দেশরক্ষার জন্য সদা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইত; কারণ, বৃত্তিভোগী সৈন্যদলরক্ষার প্রথা তখন চলিত ছিল না, এবং সে কারণ অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, কিছুকাল সকলকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। কথিত আছে, প্লেটোও যথাসময়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং প্রয়োজনানুসারে কয়েকটী যুদ্ধে যোগদানও করিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধে যোগদান বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও, তিনি যে দেশরক্ষাকার্য্যে একেবারে উদাসীন ছিলেন না, এবিষয়ের অনেক প্রমাণ আছে।

শুভক্ষণে সক্রেটীসের সহিত প্লেটোর মিলন ঘটিয়াছিল; এবং সেই সময় হইতে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যে নবজীবন তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি জগতে অমর কীর্ত্তি লাভ করেন। তিনি সক্রেটীসের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই ক্রাটিলাসের (Cratylus) নিকট হেরক্লাইটিস্-প্রবর্ত্তিত দর্শন অধ্যয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, তৎকালে তিনি জেনো ও পারমিনাইডিসের মতামতও জ্ঞাত ছিলেন। সক্রেটীসের সহিত প্লেটোর প্রথম মিলন সম্বন্ধে একটা প্রবাদবাক্য শুনা যায়। কথিত আছে, উক্ত মিলনের পূর্ব্বরাত্রে

সক্রেটীস্ স্বপ্ন দেখেন, একটী রাজহংস (এপোলোর বাহন) মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে তাঁহার দিকে উড়িয়া আসিতেছে; ঐ স্বপ্ন তাঁহার নিকট প্লেটোর আগমনেরই সূচনামাত্র।

হার্মোডোরাসের মতে তিনি সক্রেটীসের সহিত বিশ বৎসর বয়সে পরিচিত হন। সেই সময় হইতে তিনি তাঁহার সহিত জ্ঞানচর্চ্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। সক্রেটীসের জীবনকালে জন্মগ্রহণ করায়, প্লেটো আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। ৪০৭ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ৩৯৯ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত অষ্টবর্ষব্যাপী কঠোর অধ্যবসায়-সহকারে জ্ঞানচর্চ্চার ফলে তিনি সক্রেটীসের দার্শনিক মত সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হন। উক্ত দর্শনই তাঁহার নিজ দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সময় সক্রেটীসের "বিজ্ঞানবাদ" (Idealism) তাঁহার প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু তাঁহার ন্যায় সত্যজ্ঞানপিপাসু ধীসম্পন্ন যুবক যে সেই সময় অন্যান্য দার্শনিকের মতামত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না; বিশেষতঃ যখন শুনা যায় যে, সক্রেটীসের সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হয়, তখন ইহাই স্বাভাবিক যে, প্লেটো অপরাপর দার্শনিকের মতামতও অল্পবিস্তর পরিজ্ঞাত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ অনেকেই স্থির করিয়াছেন যে, তিনি পিথাগোরাস্ (Pythagoras), এনাক্সাগোরাস্ (Anaxagoras), সোফিষ্ট (Sophist), জেনো (Zeno), পার্মিনাইডিস্ (Parminædes) প্রভৃতি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় সকল দার্শনিকেরই মতামত মোটামুটি জ্ঞাত ছিলেন। তবে সক্রেটীসের দর্শন বিশেষভাবে আলোচনায় রত থাকায়, সেই সকল দর্শন বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা বা অবসর না হইয়া থাকিতে পারে।

মানবগণ যাহাতে নিজ নিজ অজ্ঞানের পরিমাণ কত, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সক্রেটীস্ সাধারণের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইতেন ও প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি অবলম্বনে তাহাদের সহিত বিচার করিয়া শৃঙ্খলার সহিত বিচার-প্রণালী শিক্ষাদানই ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে অবলম্বন করিতেন। যদি উক্তপ্রকার তর্কপ্রণালী

অবলম্বনে সক্রেটীস্ তাঁহার ভাবরাশিকে সংযত করিতে প্রয়াসী না হইতেন, তবে প্লেটো পাশ্চাত্য জগতে দার্শনিক গুরুরূপে বরণীয় হইতেন কি না সন্দেহ। সক্রেটীসের প্রাণপণ সত্যানুরাগ, অদ্ভুত অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা, আদর্শ স্বার্থত্যাগ এবং একান্ত স্বদেশপ্রিয়তা দেখিয়া, প্লেটো মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই আদর্শগুরুর অন্যায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় তিনি একেবারে বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি গুরুর বিচার-কালে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু গুরু তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন গুরুর মৃত্যু-কালে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু প্রাণস্পর্শী ভাষায় 'ফিডো' নামক গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহাকে না উদ্দীপিত করে?

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

(২)

গেরুয়া কাপড় পরিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। গেরুয়া রং দিয়া ছোপান কাপড়খানিকে আমার বর্ম্ম বলিয়া মনে হইত। পথে বাহির হইয়া শত শত লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে কখনও নিমেষের জন্য মনে যদি কোন সঙ্কোচ উপস্থিত হইত, পরিধানের গেরুয়া কাপড়খানির দিকে দৃষ্টি পড়িলে, সেই মুহূর্ত্তেই সকল সঙ্কোচ কাটিয়া যাইত। এই সংসারের সঙ্গে পূর্ব্বে আমার যে সম্বন্ধ ছিল, এখন ত আর সে সম্বন্ধ নাই। যেদিন আমি গেরুয়া কাপড় পরিয়াছি, সেই দিন হইতে আমার নিকট জগৎ ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়াছে। এখন আর ভাই বোন্ স্বামী পুত্র পিতা মাতা কিছুই আমার নাই, এখন জগৎ আমার নীলমণিময়! মায়ের কি আর সন্তানের কাছে সঙ্কোচ থাকে? মনে আছে, গেরুয়া পরিবার বহুদিন পরে, একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, স্বামী আসিয়াছেন।

স্বামী যেন কত দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য আমি দিবানিশি কাঁদিয়াছি, আজ বহুদিন পরে তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার খুবই আনন্দ হইতেছে, কিন্তু গেরুয়া কাপড় যে পরিয়াছি, তাহাও বেশ মনে আছে। একবার ভাবিতেছি, স্বামী ত আসিয়াছেন, এখন কি আবার আমি হাতে বালা পরিয়া, সেই বৌ বৌ খেলা করিব?—তাহা ত কিছুতেই হইবে না। তাই স্বামীকে—খুব যেন আমি জ্ঞানী—এই রকম ভাবের বড় বড় কথা বলিতেছি। বলিতেছি—"তুমি এসেছ বলে যে আবার হাতে বালা পরিয়া বৌ হইব, তাহা ত আর হবে না। আমি যে এখন মা। আমাব ত স্বামী পুত্র পিতা ভ্রাতা নাই, সকলেই আমার সন্তান। তোমাকে আমি ত আর কিছুই ভাবিতে পারিব না!" বলিতে বলিতে আবার লজ্জাও করিতেছে, তিনি আমার মুখে এই সব বড় বড় কথা শুনিয়া কি না জানি ভাবিতেছেন!—দেখিলাম, তিনি যেন আশ্চর্য্য হইয়া নির্ব্বাক্‌-ভাবে আমার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার মুখ যেন বড়ই ম্লান। বোধ হয়, তিনি মনে দুঃখ পাইয়াছেন, দেখিয়া আমারও দুঃখ হইল। কিন্তু কি করিব, উপায় ত নাই! গেরুয়া কাপড় যখন পরিয়াছি, আর কি আমি ঘর সংসার করিতে পারি? এখন মনে হয়, সে যেন খেলাব ঘর! তা আমি কিছুতেই পারিব না। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখি—তাঁহার মুখ আর ম্লান নাই, তিনি যেন হাসিতেছেন। তাঁহাব হাসি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঘরসংসার পাতিয়া খেলা করার, আর তাঁর ইচ্ছা নাই।

এখন অনেকবার মনে হয়, এ গেরুয়া কাপড়ের বিড়ম্বনা কেন? পথে বাহির হইলে যখন "মাতাজী" বলিয়া কেহ নির্দ্দেশ করে, কেহ "ভৈরবী" বলে, কেহ বা আসিয়া প্রণাম করে, তখন গেরুয়া কাপড়ের উপর রাগ হয়; কিন্তু তবুও আমি এই গৈরিক বস্ত্র বড় ভালবাসি, এ আমার বর্ম্ম! আমার রাগ বিরাগ, শোক দুঃখ কিছুই মনে আসিয়া বাজিতে পারে না, আমি যে গেরুয়া কাপড়ের বর্ম্ম পরিয়া আছি!—আজ পথে বাহির হইয়া কি যেন অভাব মনে হইতে লাগিল।

পথ যে গৃহ নহে—পথ,—এ বোধ ত এতক্ষণ ছিল না; এখন যেন পথে বাহির হইয়া সহসা আপনাকে দিশাহারা মনে হইল। নিমেষের জন্য যেন খেই হারাইয়া গেল; কি করিব, কোথায় যাইব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। এক নিমিষমাত্র! তাহার পরেই পথে চলিলাম। এমন সময় দেখি—কীর্ত্তনী আমার গেরুয়া কাপড়খানি হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। "মা, তুমি কাপড়খানি ফেলিয়া আসিয়াছ" বলিয়া সে আমার হাতে কাপড় দিল। তাই বটে! আমার পরিহিত বস্ত্রখানি ত গেরুয়া কাপড় নয়! আবার আমি কীর্ত্তনীর গৃহে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলাম।

ষ্টেশন কোন্ দিকে, তাহা মনে ছিল না; কিন্তু পথে দুই এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই, তাহারা ষ্টেশনের পথ দেখাইয়া দিল। কিন্তু ষ্টেশনে কেন আসিলাম? আসিয়াই এই কথা আমার মনে হইল। ষ্টেশনে যাত্রীরা সকলেই ব্যস্ত, পোঁটলা পুঁটলি, স্ত্রী পুত্র লইয়া উদ্বিগ্ন, ও ট্রেণ ধরিতে পারিবে না—এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত। পশ্চিমে যাইবার হাঁটাপথ কোন্ দিকে, দু' একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বিশেষ কোন উত্তর দিল না। তাহারা যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে তাহাদের পক্ষে উত্তর দিবার সময়ও ছিল না। আমি আর বেশী লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না; কেননা, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; অন্ধকার রাত্রি, হয়তো পথ চিনিয়া চলিতে পারিব না। বরং এখানেই কোন এক স্থানে বসিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া ভোর হইলেই পথ চলিতে আরম্ভ করিব। আবার ভাবিলাম, অনর্থক বসিয়া রাত্রি কাটানো অপেক্ষা চলিলে বরং অনেকটা পথ চলা হইবে। যদি বাঁধা রাস্তা হয়, পথে গর্ত্ত না থাকে, অন্ধকারে চলিবার আর বিশেষ কি ব্যাঘাত হইবে? এত কথা যে মনে হইল, ইহার কারণ এই যে, অস্থির মন চলিবার জন্যই ব্যগ্র, কিন্তু শরীর—মনের সে কথায় কিছুতেই সায় দিতে চাহে না। আচ্ছা, এই দেয়ালের কাছে হেলান দিয়া একটু বসি, ভিড় কমিলে কাহারও নিকট পথ জানিয়া লইব। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া, ষ্টেশনের কোণের দিকে যেখানে বেশী লোক-চলাচল নাই, সেখানে গিয়া দেয়াল ঠেস্ দিয়া

বসিলাম। বসিবামাত্র পিঠের কাছে কি একটা শক্ত জিনিষের মত বোধ হইল, আঁচলে যেন কি বাঁধা আছে। খুলিয়া দেখিলাম, কয়েক আনা পয়সা!

শ্যামসুন্দর, আমি যে আর চলিতে পারিতেছি না, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিয়াছ!

মনে হইল—এই ট্রেণেই উঠিয়া চলিয়া যাই; কিন্তু কোথায় যে টিকিট কিনিতে হয়, জানি না। তখন প্রথম ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে, ট্রেণ ছাড়িবার আর বেশী সময় ছিল না। টিকিটের ঘর খুঁজিতে খুঁজিতেই গাড়ী চলিয়া গেল, সে ট্রেণে আর যাওয়া হইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পশ্চিমের গাড়ী আবার কিছুক্ষণ পরে আসিবে। যেখানে টিকিট বিক্রয় হয় খুঁজিয়া লইলাম, সেখানে গিয়া সেই কয়েক আনা পয়সা দিলাম। টিকিট-বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথাকার টিকিট?" বলিলাম, "এই পয়সায় পশ্চিমের পথে যে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ভাড়া হয়, তাহারই একখানি টিকিট দাও।" শুনিয়া সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়া আমার দিকে চাহিল; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া আমার হাতে টিকিট দিয়া ষ্টেশনের একজন লোককে ডাকিয়া বলিল,—"ভিড় কম এমন একটা গাড়ী দেখে এঁকে উঠিয়ে দিস্।"

যে গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে একটীও লোক ছিল না। ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় একদল ছেলে আসিয়া উঠিল। তাহাদের বয়স উনিশ, কুড়ি, বাইশ, তেইশ এই রকম হইবে। তাহাদের সঙ্গে বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কি কিছুই ছিল না; কাহারও হাতে ছড়ি, কাহারও হাতে ছাতা, একজনের সঙ্গে হুঁকা আর তামাক সাজিবার সরঞ্জাম ছিল। সে ট্রেণে উঠিয়াই তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। আমি এক পাশে গিয়া বসিয়াছিলাম; আমাকে প্রথমে তাহারা দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া "বাঃ রে বাঃ! এ যে দেখ্‌ছি ভৈরবী ঠাকৃরুণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গীরা 'হো হো' করিয়া শিয়ালের মত সেই চীৎকারে যোগ দিল। তাহার পর খুব জোরে হাততালি পড়িতে লাগিল। আমি নিস্তব্ধ

হইয়া কোণে বসিয়া তাহাদের এই কাণ্ড দেখিতেছি, আর মনে মনে "তৃণাদপি সুনীচেন" "তৃণাদপি সুনীচেন' ঘন ঘন জপ করিতেছি। আগ্নেয়গিরি যেমন ফাটিয়া যায়, তেমনি আমাব মনের ভিতর রাগ ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে—আমি "তৃণাদপি সুনীচেন" মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে থামাইয়া রাখিতে চাহিতেছি। কিন্তু শুধু শিয়ালের মত চেঁচাইয়াই তাহারা নিরস্ত হইল না। একজন তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে করিয়া "ভৈরবী ঠাকৃরুণ্! তামাক ইচ্ছে করুন" বলিয়া আমার হাতে দিতে আসিল। যথাসম্ভব সংযতভাবে উত্তর দিলাম,—"আমি ভৈরবী নই।" কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, তাহাতে সংযম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে একজন যখন আমার গৈরিক বস্ত্রাঞ্চলে হাত দিল, তখন "তৃণাদপি" মন্ত্র স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল!—আমি তাহাদের কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাহারা খুবই রাগিয়া গিয়াছিল। একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"তোর ত বড়ই সাহস দেখ্‌ছি, আমরা এগারো জন, আর তুই একা,—তোর গার্জ্জেন্ কে আছে? যদি আমরা তোর উপর অত্যাচার করি, কে তোকে রক্ষা কর্‌তে পারে?" এই কথা শুনিবামাত্র আমার সমস্ত শরীর দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, সম্মুখে নৃমুণ্ডমালিনী অট্ট অট্ট হাসি মুক্তকেশা রণরঙ্গিণী কালীমূর্ত্তি। আমার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছিল, চুল খুলিয়া গিয়াছিল, কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। কেবল মনে পড়ে—দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—"আমাকে কে রক্ষা করিবে? আয়, তোরা আয়,—দ্যাখ্, আমি তোদের কত জনকে খেতে পারি?" ইহার পর যে কি হইয়াছিল, তাহা আমার কিছুই মনে পড়ে না।

যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম,—আমি বেঞ্চের উপর শুইয়া আছি। একজন আমার মাথায় জল দিতেছে, আর একজন বাতাস করিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিবামাত্র "মা! মা! মা!" বলিয়া সেই এগারটী ছেলে আমার পায়ের কাছে

উপুড় হইয়া পড়িল। কক্ষের যে বাতাস কিছু আগে অশ্রাব্য বাক্যের দুর্গন্ধে দূষিত হইয়াছিল, তাহাই আবার "মা! মা! মা!" এই স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুরভিতে পরিপূর্ণ হইল। আমি যে কোথায় আছি, কিছুক্ষণ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেই "মা, মা, মা" ধ্বনিতে কাণ ও প্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল।—ঠাকুর, কি শীতল জল দিয়াই তুমি কি দাবানল নিবাইলে! এ জল না হলে ত সে আগুন কিছুতেই নিবিত না! তাহারা আমার পায়ে পড়িয়া আছে, আমি তখনও কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।—যোড়হাতে তাহারা কেবল বলিতেছে,—"মা! ক্ষমা কর; —মা, অধম সন্তানের দোষ ক্ষমা কর।" আমি বলিলাম,—"উঠ বাবা গোপাল, আর আমার তোমাদের উপর রাগ নাই।" কিন্তু আমার শরীর এত দুর্ব্বল যে, আমি যেন পড়িয়া যাই, কোন রকমে কাঠে ভর রাখিয়া বসিয়া আছি। তাহারা বলিল,—"মা, এই তুমি—তোমায় কি মূর্ত্তিই দেখেছিলাম! কালীমূর্ত্তি দেখেছি, কিন্তু কালী যে কেমন, তাহা আজ জীবন্ত দেখেছিলাম। তোমার সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি এখনও ভাব্‌তে ভয় হচ্ছে। তোমার সে মূর্ত্তি দেখে আমাদের আর জীবনের আশা ছিল না।" এই রকম তাহারা কত কথা বলিল। শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শ্যামসুন্দর আমার, আজ মা কালী হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। মা নহিলে আর কে সন্তানকে রক্ষা করে? মা, মা, মা! শক্তিরূপা মায়ের চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম!

ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল; তাহারা সকলে একই ষ্টেশনে নামিবে। সকলের একই গ্রামে বাড়ী। আমাকেও তাহাদের সঙ্গে নামিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। বলিল,—"মা, অপরাধী সন্তানগণের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়া যদি পবিত্র কর, তবে নিশ্চয়ই জানিব—তুমি আমাদের মার্জ্জনা করিয়াছ।" আমি বলিলাম,—"বাবা, আমি অন্তরের সঙ্গে তোমাদের ক্ষমা করিয়াছি; সন্তানের উপর কি মার রাগ থাকে?" কিন্তু তাহারা কোন মতেই বুঝে না। অবশেষে বলিল,—"মা; তুমি রাত্রে একা এই গাড়ীতে যাবে, পথে নানা ভয়। বরং রাত্রি কাটাইয়া সকালে তোমার স্নানাহার হইলে, আমরা ট্রেণে তুলিয়া দিয়া যাইব।"

আমি বলিলাম,—"বাবা, রাত্রে আমার ভয় কি? তোমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,—'তুমি অসহায়া, তোমার অভিভাবক কে আছে?' এখন দেখ—তোমরাই আমার অভিভাবক হইয়াছ, আমার পাছে কোন অনিষ্ট হয়, সেজন্য ভাবিতেছ। তোমরা স্বচ্ছন্দমনে বাড়ী যাও, আমার অভিভাবক আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আমার কোন খানেই কোন ভয় নাই।" আমি যখন কিছুতেই নামিলাম না, তখন তাহারা আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

এই ছেলেগুলির সঙ্গে বহুকাল পরে আর একবার দেখা হইয়াছিল। তখন আমি মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ডের নিকটে থাকিতাম। সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন, গৃহীও অনেক আসিতেন। ঐ এগারো জনও একত্রে, বোধ হয় আমোদ করিবার উদ্দেশ্যে, সেই সময় একবার মুঙ্গেরে আসিয়াছিল। তাহারা সীতাকুণ্ড দর্শনে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। আমার তাহাদের কথা স্মরণ ছিল না, তাহাদের চিনিতেও পারি নাই। কিন্তু তাহারা প্রত্যহই আসিয়া আমার কাছে বসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিত। একদিন কতকগুলি লেখা কাগজ আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল,—"মা, ইহাতে এক অপূর্ব্ব সতীর কাহিনী আছে, দয়া করিয়া পড়িয়া দেখিবেন।" কিছুদূর পড়িয়াই আমার সেই রেলগাড়ীর কথা স্মরণ হইল; দেখিলাম—সেই ঘটনাটীকে সাজাইয়া গুছাইয়া ও অতিরঞ্জিত করিয়া উপন্যাসের মত লেখা হইয়াছে। তখন তাহাদের চিনিতে পারিলাম, এবং কি জানি, তাহারা মুঙ্গেরে হয়তো এইরূপ অতিরঞ্জিত ভাবে কত কি বলিয়া বেড়াইবে—তাহাদের পক্ষে সেইরূপ ভাবে বলিয়া বেড়াইবারই সম্ভব—ভাবিয়া, সেই রাত্রে সীতাকুণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম।

যাহা হউক, ষ্টেশনে ছেলের দল নামিয়া গেলে, আমি আর বসিতে পারিলাম না; অবসন্নভাবে বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। শরীর এতই অবশ হইয়াছে যে, হাতখানি যে তুলি, এমন ক্ষমতাও আর আমার নাই; পিপাসায় কণ্ঠতালু হইতে বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, মাথা তুলিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই, কিন্তু ইহার পরের ষ্টেশনেই আমাকে

নামিতে হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমার টিকিট। পরের ষ্টেশনে যখন গাড়ী আসিয়া থামিল, তখন বেশ সহজভাবেই উঠিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। ষ্টেশনটী ছোট, দুটী একটী আলো টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি, ষ্টেশনে লোকের মধ্যে কেবল ষ্টেশন মাষ্টার ও একটী কুলীকে দেখিতে পাইলাম। যাত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র আমি একা নামিলাম। নামিয়া এই রাত্রে আর কোথায় যাইব, ষ্টেশনেই এক পার্শ্বে বসিয়া রাত্রি কাটাইব ভাবিলাম, ভাবিয়া, ষ্টেশনের একপার্শ্বে গিয়া আবার দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার দুই একবার লণ্ঠন হাতে করিয়া আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলেন। অবশেষে একবার আমার কাছে আসিয়া, হাতের লণ্ঠনটী তুলিয়া ধরিয়া আমাকে দেখিলেন, দেখিয়া চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি রাত্রে ষ্টেশনেই থাকিবেন?" আমি কোন উত্তর দিলাম না। পিপাসায় আমার গলা এত শুকাইয়া গিয়াছিল যে, উত্তর দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের আশায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন; অবশেষে, কি ভাবিয়া জানি না, আমাকে বলিলেন,—"আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—আপনার বড় পিপাসা হয়েছে, এই জমাদার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, এ মাজা ঘটীতে জল এনে দিলে আপনি খাবেন কি?" প্রশ্ন শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম, অতি কষ্টে উত্তর দিলাম—"হাঁ।" ষ্টেশন মাষ্টার দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে জমাদারকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। জমাদারের হাতে খুব বড় একটা ঘটী, তাহাতে এক ঘটী জল; জল খাইয়া দেখিলাম—জল নহে, অতি সুশীতল সরবৎ।

এ কথা এতদিন পরেও বলিতে গিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে! শ্যামসুন্দরের লীলা আমি ভাবিতে গেলে সবই ভুলিয়া যাই, বলিয়া কি বুঝাইব? এ কি অপরূপ লীলা! সেই রাত্রি, সেই ষ্টেশন, আর সেই জলের ঘটীর কথা ভাবিলে, আমার মনে যে কি তরঙ্গ উথলিয়া উঠে, সে কি বলিয়া বুঝাইতে পারি? এমন একবার নয়, কত শত বার ঠিক এই রকমই হইয়াছে। একবস্ত্রে পথে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু জীবনে, অভাব কাহাকে বলে, তাহা জানি না।

মনে করিতে গেলে, কত কথা মনে পড়ে। একবার এলাহাবাদে ওপারে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক সাধু মহারাজ থাকিতেন। আমি ভিক্ষার্থে কোথাও যাই না, অন্নের জন্য কোন চেষ্টা করি না দেখিয়া, একজন দয়ার্দ্র হইয়া প্রতিদিন একটী লোটায় করিয়া ডালে চালে মিশাইয়া চুলায় বসাইয়া রাখিয়া যাইতেন। আমার সকল দিন সমানভাবে যাইত না। যেদিন উঠিতাম, উঠিয়া চুলায় আগুন দিয়া খিচুড়ী করিয়া লইতাম। যেদিন না উঠিতাম, সেদিন চাল ডাল সহিত লোটা চুলায় বসানো থাকিত, চুলা জ্বালা হইত না।—একদিন দশমী, সেদিন আমি আর উঠি নাই, পরদিন প্রাতে স্নানে গিয়া শুনিলাম, আজ একাদশী, শুনিয়া নিশ্চিন্তভাবে আসিয়া যথাস্থানে বসিলাম।—তাহার পরদিন প্রাতে দেখি—ভয়ানক ক্ষুধা, উদরে যেন আগুন জ্বলিতেছে। তত সকালে কি খাইব, কোথায়ই বা খাইতে পাইব? ভাবিলাম—গঙ্গায় যাই, স্নান করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল খাইলেই ক্ষুধার শান্তি হইবে। কিন্তু স্নান করিয়া ক্ষুধা আরও বাড়িয়া গেল, অঞ্জলি ভরিয়া যত জল খাই, জঠরানল যেন ততই জ্বলিয়া উঠে।—সে যে কি ক্ষুধা, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। মনে হইল—কিছু না খাইলে আর আমি গঙ্গার গর্ভ হইতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু গঙ্গার গর্ভে আহার্য্য কোথায় পাইব? পানীয়—সুস্বাদু গঙ্গাবারি আছে,—যত ইচ্ছা খাইবার বাধা নাই, কিন্তু তাহাতে ত আমার ক্ষুধার শান্তি হয় না! দেখি যে, জলের উপর একটী আমলকী ফল ভাসিতেছে। ফলটী খুব সুপক্ক ও খুব বড়, এত বড় আমলকী ফল আর কখনও দেখি নাই। গঙ্গাগর্ভে দাঁড়াইয়াই ফলটী নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলাম।—ফলে যেন অমৃতের আস্বাদ! আমলকী ফল যে এত রসভরা ও মিষ্ট হয়, আগে তাহা জানিতাম না।

ফল খাইয়া তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িলাম।—কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আবার সেই ক্ষুধানল জ্বলিয়া উঠিল। কি আর করি, "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা—" এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়া দেখি, পথের ধারে প্রকাণ্ড এক বটগাছ, তাহার আপাদ-

মস্তক লাল লাল ফলে ভরা। এমন সুন্দর লাল লাল ফল, কত পাখী খাইতেছে, আমিও কেন খাই না? এই কথা যেমন মনে হইল, অমনি বটগাছের উপর উঠিলাম। শাখা প্রশাখার জালে আচ্ছন্ন, ঘনপল্লবাবৃত বটগাছে উঠিয়া মনে হইল—কে যেন এই পল্লবদল দিয়া আমার বিশ্রামের জন্য শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছে। দুটী একটী বটফল মুখে দিয়া গাছের ডালের উপর দেহভার রাখিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এত গভীর নিদ্রা যে, কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি, কিছুই মনে নাই। আমার পা ধরিয়া কে যেন ধীরে ধীরে ঝাঁকাইতেছিল—তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম—গাছের নীচে আমার পূর্ব্বপরিচিত একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, সেই আমার পা ধরিয়া নাড়া দিতেছিল। এলাহাবাদে একজন ভদ্রলোকের বাড়ী আমি কখনও কখনও যাইতাম, মেয়েটী সেই বাটীর বিধবা বধূ। আমাকে "সন্ন্যাসিনী দিদি" বলিয়া ডাকিত, কিন্তু এত লজ্জাশীলা যে, কখনও মুখ ফুটিয়া আমার সঙ্গে কথা বলিত না। আজ তাহাকে এই ভাবে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। গাছ হইতে নামিয়া বলিলাম,—"এ কি; তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে?" আমার কথা শুনিয়া সে একটু সলজ্জ হাসি হাসিল।—দেখিলাম—সে এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে, পিঠময় ভিজা চুল, পরিধান গরদের কাপড়, একহাতে একটী জলের ঘটী, আর এক হাতে গামছা দিয়া বাঁধী একখানি পিতলের রেকাবি; গাছতলায় রেকাবি খানি নামাইয়া রাখিয়া সে আমার পা ধরিয়া নাড়া দিতেছিল। আমার কথার কিছু উত্তর না দিয়া সে রেকাবি বাঁধা গামছা খুলিল। দেখি যে, ছানা, মুগের ডাল ভিজান, আখ, সন্দেশ এই সমস্ত রেকাবিতে সাজানো, তাহার উপর তুলসীমঞ্জরী। আমি দেখিয়া হাসিলাম, বলিলাম,—"পাগ্‌লী, কোথা থেকে এই সমস্ত নিয়ে এখানে এলি, আমি এখানে আছি; তাই বা কি করে জান্‌লি?"—সে আনন্দপূর্ণ মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"মা, জ্যাঠাইমা গঙ্গাস্নানে এসেছেন—আমিও সেই সঙ্গে এসেছি। চুপি চুপি পুল পার হয়ে তোমার জন্যে ঠাকুরের নৈবেদ্য নিয়ে

এপারে তোমাকে খুঁজ্‌তে এলুম।—এখানে এসেই বটগাছের পাতার ভিতর থেকে তোমার পা ঝুল্‌ছে দেখ্‌তে পেলুম। ভাগ্যে এখানে এসেছিলাম!" আমি তাহার কথা শুনিয়া অবাক্, বলিলাম, "করেছিস্ কি? এতক্ষণ সকলে তোকে খুঁজ্‌ছেন, আর না দেখ্‌তে পেয়ে কত ভাব্‌ছেন। শাশুড়ীর আঁচল না ধরে পথ চল্‌তে পারিস্ না, এখন একা একা কি করে চলে এলি? এ কি সাহস তোর!" সে আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল,—"কে জানে, কেন আমার মনে হল যে, এধারে এলেই তোমাকে দেখ্‌তে পাব।—যদি দেখ্‌তে না পেতাম, তা হলে কি কষ্ট হোতো, আর ভয়ও খুব হোতো। সকালে মা যখন বল্‌লেন,—"গঙ্গা নাইতে যাব," আমার তখনি তোমার কথা মনে হল, ভাব্‌লাম—কাল তুমি উপোষ করে আছ,—মা এই যে আমার জন্য কত কি গুছিয়ে রেখেছেন, ভোরে উঠে ফল সাজিয়ে ঠাকুরের ভোগ দিয়েছেন,—তোমায় কে খেতে দেবে? একটু সরবৎও হয়তো তুমি পাবে না।—তাই ভেবে মাকে বল্‌লুম,—আমিও গঙ্গায় যাব। মনে হলো—নাইতে গেলেই তোমাকে দেখ্‌তে পাব। কোথায় তুমি আছ, কি করে তোমার দেখা পাব—এসব কথা মনেই হল না, মনে মনে জান্‌তুম—নিশ্চয় তোমাকে দেখ্‌তে পাব। তাই চুপি চুপি নৈবেদ্যের থালা আর সরবতের ঘটী সঙ্গে নিয়ে এসেছি, মাকে কিছু বলিনি। পথে মা দেখে বক্‌তে লাগ্‌লেন। তখন 'ঘাটে জপ করে জল খাব' বলে তবে তাঁকে শান্ত করেছি। তোমাকে যদি না দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে কি যে হোতো!"

আমি অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম, আর হাসিমাখা মুখ দেখিতে লাগিলাম। বাড়ীতে থাকিতে সে কখনও আমার সঙ্গে কথা বলিত না, কেবল হাসিত। তাহার সেই লজ্জামাখা হাসি আমার বড় মিষ্ট লাগিত; আমি কেবল তাহার হাসিই দেখিতাম, কথা কখনো শুনি নাই।—ও যে এত কথা বলিতে পারে, তাহাও জানিতাম না। তাহার হাসি দেখিয়া, আর কথা শুনিয়া আমার যেন অর্দ্ধেক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল।—গাছের তলায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া

প্রসাদ পাইতে বসিলাম। সেখানে যে দু'একজন উপস্থিত ছিল, তাহারাও প্রসাদ পাইল, আমরাও পাইলাম। তবুও সে প্রসাদ যেন অফুরান। আমার উদর একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার শাশুড়ীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম—তাঁহারা এত ব্যস্ত হইয়াছেন যে, সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে মনে করিয়া পাগলের মত হইয়াছেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া, আর আমাকে তাহার সঙ্গে দেখিয়া, তাঁহারা আনন্দে তিরস্কার করিবার কথাও ভুলিয়া গেলেন। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহারা অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমাতে ত আর আমি ছিল না, কেমন করিয়া যাইব? সে দিন কোথা দিয়া যে দিবারাত্র গিয়াছে, সে জ্ঞান আমার ছিল না, কেবল সেই একটী মাত্র কথাই মনে ছিল,—সেই তাঁর হাতে করে প্রসাদ বহিয়া আনিবার কথা!—তুমি,—তুমি আমার কত যত্নের নিধি,—তুমি কিনা হাতে করে খাবার বয়ে আন্‌লে! তা তোমার বহিবার অভ্যাস কিছু নূতন নয়—গোয়ালার ছেলে, দুধের ভার ত চিরদিনই বহিয়াছ। দুধের ভার কেন, কোন্ ভার্ বা না বহিয়া থাক? নদীতে যেমন একই জলে ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠে, তেমনি সেই একই কথার নূতন নূতন করে ঢেউ উঠ্‌ছে আর সকল অঙ্গে কদম ফুলের মত কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে। দুই চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়্‌ছে,—কেন কাঁদি, কিসের জন্য কাঁদি, সে বুদ্ধি তখন হারিয়ে গেছে। শেষে সব বুদ্ধিই হারিয়ে গেল, দিন রাত্রির জ্ঞান হারিয়ে গেল, কেবল জড়ের মত পড়েছিলাম। আজ আমি বল্‌তে বল্‌তে আবার সব ভুলে যাচ্ছি।—কি বল্‌বো, কার কথা বল্‌বো? জীবনের কথা বল্‌তে গেলে, সেই এক কথাই বার বার আবৃত্তি কর্‌তে হয়। কেবল শ্যামসুন্দর! শ্যামসুন্দর!! শ্যামসুন্দর!!! এ ছাড়া আর আমার বল্‌বার কোন কথাই নাই।—আমার কথা আমি কেমন করে বুঝিয়ে বল্‌বো, সে যে আমাকে একেবারে পাগল করে দেয়, বুঝিয়ে বল্‌বার মত বুদ্ধি আর আমার থাকে না।

কাশীতে আর একদিন,—সে বেশী দিনের কথা নয়—আমার জর

হয়ে ভারী অরুচি হয়েছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি,—"একটু যদি লেবুর আচার পাই, তবে দুটী ভাত খেতে পারি। হিন্দুস্থানীরা বেশ আচার করে, এখন অরুচির মুখে বোধ হয় ভাল লাগ্‌তো।" ভোর বেলায়—তখনও রৌদ্র উঠে নাই, দেখি যে শ্যামবিহারী খালি পায়ে একটা ভাঁড় হাতে করে দুয়ারে এসে উপস্থিত। শ্যামবিহারী জাতিতে ক্ষত্রিয়, কাশীতে ডাক্তারী করে, প্রণবাশ্রমে যাওয়া আসা করিত, সেখানে তাহার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এই ভোরে, খালি পায়ে ভাঁড় হাতে করে শ্যামবিহারী আমার দুয়ারে কেন, এই কথা মনে কর্‌ছি, এমন সময় শ্যামবিহারী ভাঁড় নিয়ে এসে আমার কাছে রাখ্‌লে, ভাঁড়ে লেবুর আচার, জারক লেবু, আরও নানা রকম আচার। শ্যামবিহারী ভাঁড় নামিয়ে খুব বিনয় করে বল্‌লে,—"মাতাজি, আমি শোলিতে (শুদ্ধবস্ত্রে) এই আচার এনেছি, আপনি দয়া করে গ্রহণ কর্‌বেন।" আমি আচার দেখে কি যেন হয়ে গেলাম, শ্যামবিহারীকে আর দেখ্‌তে পেলাম না, দেখ্‌লাম—যেন শ্যামসুন্দর নিজে ভাঁড হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন।

একথা বল্‌লে লোকে আমাকে পাগল বলে মনে কর্‌বে। ছেলে-বেলায় একবার মেয়ের কাছে বলেছিলাম,—"মাটির ঠাকুর সত্য, সত্য, সত্য;" আজ আবার বল্‌ছি—শ্যামসুন্দর যে নিজে হাতে করে আচার এনেছিলেন, একথাও তেমনি সত্য, সত্য, সত্য! এখন যখন বেদান্ত পড়ি, আর ভাবি—ভাঁড়ও নাই, আচারও নাই, শ্যামবিহারীও নাই, কেবল শ্যামসুন্দর আছেন; আমিও নাই, তুমিও নাই, এক ছাড়া দুই কিছুই নাই—তখন সৃষ্টিপ্রপঞ্চ কুয়াসার মত সূর্য্যালোকে মিলিয়ে যায়; কিন্তু তখনই যদি শ্যামসুন্দরের সেই আচারের ভাঁড হাতে করে নিয়ে আসার কথা মনে পড়ে, সে কি মিথ্যা বলে, মায়া বলে মনে হয়? সে যে প্রত্যক্ষ সত্য। সেই এক ছাড়া দুই আর কিছু নাই—এ যেমন সত্য, সে আচারের ভাঁড় নিজে হাতে নিয়ে এসেছিল, সেও তেমনি সত্য, দুইই এক সঙ্গে সত্য। এর কোন খানে মায়ার নামগন্ধ নাই।

জৈনসম্প্রদায়।

২

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের জনসমষ্টিকে মোটামুটি তিনটী সমাজ-স্তরে বিভক্ত করিয়াছি। একটী ঋষিপরিচালিত যজ্ঞাচার-বিশিষ্ট বৈদিক সমাজ, দ্বিতীয়টী—যাহারা ত্রিবর্ণের শুদ্ধ আভিজাত্য লাভ করে নাই, অথবা হারাইয়াছে এইরূপ সঙ্কর বা ব্রাত্য প্রভৃতির সমাজ, এবং তৃতীয়টী ভারতখণ্ডে পূর্ব্বাবস্থিত বা নবাগত অনার্য্যদিগের সমাজ। কুরুক্ষেত্রের যুগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ কলির প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বাবধি ঋষিপরিচালিত বৈদিক সমাজের যে একরূপ সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অবৈদিক সমাজগুলির ভিতরেও বহুল-পরিমাণে বৈদিক জীবনাদর্শই উচ্চস্থান অধিকার করিত এবং মানুষ গড়িয়া তুলিত। এই সকল সমাজ বৈদিক ত্রৈবর্ণ্যমূলক আভিজাত্য হইতে বঞ্চিত হইলেও, ত্রৈবর্ণ্যমূলক উচ্চভাব ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত ও পরিস্ফুট হইত; ব্রাহ্মণতুল্য পরমার্থলিপ্সা, ক্ষত্রিয়তুল্য বীরত্ব ও আর্জব, বৈশ্যতুল্য অর্জ্জন-নৈপুণ্য ও দানশীলতা—সমস্তই ইহাদের মধ্যে অনুশীলিত ও প্রাদুর্ভূত হইতে পারিত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যাহারা বৈদিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে, বৈদিক যজ্ঞাদির পরিবর্ত্তে তাহাদের জন্য কিরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল?

শাস্ত্র হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক সমাজেরই যজ্ঞাধিকার ছিল; যাহাদের শুদ্ধ বৈদিক আভিজাত্য নাই, তাহাদের যজ্ঞাধিকারও নাই। আমরা দেখিতেছি যে, সেই প্রাচীন ভারতে যাহারা বৈদিক আচারগ্রহণে অনধিকারী, তাঁহাদের সংখ্যা বড় সামান্য নহে, এবং উত্তরোত্তর কালে সে সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব বহু প্রাচীন কাল হইতেই, অর্থাৎ কলিযুগের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে এমন একটী প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল, যে ক্ষেত্রে যজ্ঞকর্ম্ম ভিন্ন অন্য

প্রকারের ধর্ম্মকর্ম্ম উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হইতেছিল। বিশুদ্ধ বৈদিক সমাজের উপকণ্ঠে এইরূপ একটী প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, যাজ্ঞিক পূজার পশ্চাতে তান্ত্রিক পূজার অভিব্যক্তি ঘটিতেছিল এবং বৈদিক দেবতাবাদের পার্শ্বে পঞ্চোপাসনা সমাজে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সর্ব্বপ্রকার অভিব্যক্তির পশ্চাতে প্রয়োজনের প্রেরণা থাকে; এক্ষেত্রেও বৈদিক যজ্ঞাচার হইতে বঞ্চিত, অথচ বৈদিক জীবনাদর্শে গঠিত, ভারতীয় জনসমাজের প্রয়োজনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচীনকালে তান্ত্রিক পূজা ও পঞ্চোপাসনার প্রবর্ত্তনা ঘটিয়াছিল। কিরূপে বৈদিক ভাব ও তত্ত্বকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ও বৈদিক যজ্ঞাচারের সহিত পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া এই সমস্ত অভিনব পূজা-পদ্ধতি ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছিল, তাহা বিচার করা এস্থলে প্রাসঙ্গিক হইবে না। কেবল এইমাত্র আমাদের জানা আবশ্যক যে, বিশুদ্ধ বৈদিক সমাজেরই উপকণ্ঠে একটী বর্দ্ধিষ্ণু সমাজের ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত নূতন নূতন উপাসনার প্রবর্ত্তন হইতেছিল এবং সেই সকল উপাসনার প্রবর্ত্তক বৈদিক-যজ্ঞনিরত, বৈদিক সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণবৃন্দ নহেন। অবশ্য প্রথম প্রথম যখন বৈদিক দেবতাবাদ পরিণমিত হইয়া পঞ্চদেবতার উদ্ভব হইতেছিল, তখন সেই পরিণমনে অরণ্যবাসী ঋষি ও যতি উভয়েরই প্রভাব অনুমিত হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঐরূপ পরিণমনের কথা রহিয়াছে, উপনিষদেও রহিয়াছে। কিন্তু সমাজের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য, ঐ সমস্ত নূতন উপাসনা যাঁহারা সমাজের আয়ত্তীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী কালের বৈদিক ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী কালের সন্ন্যাসী।

বৈদিক ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ বৈদিক সমাজের বাহিরে যাজন করিলে, পতিত হইতেন। সেইজন্য যজ্ঞকর্ম্মে অনধিকারী সমাজ সকল স্বভাবতঃই বৈদিক ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী হইত না; সন্ন্যাসিগণই সেই সকল সমাজে, অধিকাংশ স্থলে, ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা যে বৈদিক সমাজের ভিতরেও বিচরণ করিতেন না বা উপদেশ দিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু তদিতর সমাজের গৃহস্থ যেমন তাঁহার

উপদেশ ও উপাসনাদির নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখিত, বৈদিক সমাজের গৃহস্থকে সেরূপ অপেক্ষা রাখিতে হইত না। বৈদিক সমাজের গৃহস্থ তাঁহাকে মোক্ষসাধকের উচ্চ সম্মান ও পূজা দিত এবং তাঁহার অলৌকিকত্বের আদর করিত। কিন্তু বৈদিক সমাজের বাহিরে আর্য্য গৃহস্থ আপনার একটী গুরুতর অভাব পূরণের জন্য সন্ন্যাসীর শরণাগত হইত। এইরূপ একটী গুরুতর সামাজিক অভাব পূরণ করিবার জন্য অরণ্যচর যতিগণকে ভারতীয় সমাজের আসরে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল।

সমাজের আসরে প্রাচীন যতিগণের পূর্ব্বোক্ত অবতরণের একটা বিশেষ কাল নির্দ্দেশ করা যায় না। যখন প্রাচীন পরমর্ষিগণ আর্য্য-সমাজকে নানা কেন্দ্র হইতে গড়িয়া তুলিতেছেন, যখন জন্মগত আভিজাত্য মাথা তুলিতে পারে নাই এবং বৈদিক সমাজের দ্বারে প্রহরী হইয়া দাঁড়ায় নাই, যখন বৈদিক সমাজের উপকণ্ঠে কেবলই রেখা টানিয়া টানিয়া নানা অর্দ্ধ-বৈদিক সমাজের জন্য স্থান করিতে হয় নাই, তখন সামাজিক ধর্ম্মজীবন সাধারণতঃ যাজক ঋষিদের দ্বারাই সাক্ষাৎভাবে নিয়মিত ও পরিচালিত হইত; সাগ্নিক গৃহস্থ নিরগ্নি যতির দ্বারা কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে দীক্ষিত বা শিক্ষিত হইতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল ছিল। কচিৎ কোনও রাজার সম্বন্ধে ঐরূপ দীক্ষা বা শিক্ষার কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু ক্রমশঃ যতই বৈদিক আভিজাত্যহীন, অথচ আর্য্যাদর্শগ্রাহী ছোট বড় সমাজ চারি-দিকে সমুত্থিত হইয়াছে, যতই বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য প্রকারের ধর্ম্মকর্ম্ম সমাজে প্রবর্ত্তিত করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, ততই সেই প্রয়োজনপূরণার্থে নিরগ্নি সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক অরণ্যে উদ্ভাবিত নানা উপাসনা সাধারণ্যে প্রচলিত করিবার জন্য সন্ন্যাসীকে সমাজের আসরে নামিতে হইয়াছে। কলিযুগে এই সকল উপাসনার প্রচলন এমন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল যে, যদি যজ্ঞাচারের প্রসারবৃদ্ধি হইবার একটী নূতন পথ উদ্ঘাটিত না হইত, তবে বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে ভারতে বিশেষ যজ্ঞঘটা দেখা যাইত কি না, সন্দেহ। সে নূতন পথ এই যে,

বিশুদ্ধ বৈদিক সমাজের বাহিরেও, ক্রমাগত নূতন নূতন রাজা ক্ষাত্র-প্রতাপে বলবান্ হইয়া অবাধে বৈদিক ক্ষত্রিয়ের আচার অবলম্বন করিতেছিল এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের মধ্যে যজ্ঞাচার প্রচলিত করিতেছিল। কলিযুগে নব্য ক্ষত্রিয়গণ যদি এইরূপে বৈদিক আভিজাত্যে প্রায়ই উন্নীত না হইতেন, তবে বিশুদ্ধ প্রাচীন বৈদিক সমাজ সংকীর্ণ হইতে হইতে এককালে বোধ হয় লোপ পাইত। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ও পরে রাজশক্তির অগণ্য ছোট বড় তরঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র উত্থিত হইয়া, আমাদের পূর্ব্বোক্ত সামাজিক স্তরবিভাগ বিলুপ্ত করিয়া, ভারতীয় জনসমষ্টিকে সমতাপন্ন করিতে বহুলপরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। এই সমতাবিধানে ধর্ম্মের দিক্ হইতে বৌদ্ধ-বিপ্লব এবং সমাজের দিক্ হইতে অসংখ্য রাজ্যবিপ্লব একসঙ্গে ভারত-ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছে।

যাহা হউক, স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বিশুদ্ধ বৈদিক সমাজ হীনবল হইয়া যখন চতুষ্পার্শ্বস্থ আর্য্যাদর্শসম্পন্ন সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিতে পারিতেছিলেন না, যখন বৈদিক আভিজাত্য যজ্ঞাচারকে কুক্ষিগত করিয়া, যথাযোগ্য প্রসারলাভে সঞ্জীবিত না হইয়া ব্যর্থগৌরবভারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় যথার্থ অধিকারসম্পন্ন নানা উন্নত সমাজকে আর্য্যাদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতীয় অরণ্যের যতিগণ উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় সমাজক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই অরণ্যমধ্যে নির্গুণ মোক্ষতত্ত্বের সহিত সগুণ উপাসনাকে যুক্ত করিয়াছিলেন; উপনিষদের পাঠক জানেন, প্রণবের সাধনার সহিত সমস্ত বৈদিক দেবতা ও পঞ্চদেবতার উপাসনাকে নানা উপনিষদে কেমন সংযুক্ত করা হইয়াছে। সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উদ্ভব উপনিষদ্ গুলির মধ্যে সুন্দরভাবে সূচিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সাধনা যখন সন্ন্যাসীদের দ্বারা সমাজে প্রচলিত হইতেছিল, তখন জৈন যতিগণও সমাজে জৈনাচার প্রবর্ত্তিত করিবার সম্যক্ উদ্যোগ করেন, ইহাই আমাদের অনুমান।

জৈনপুরাণে পাওয়া যায় যে, উত্তরভারতের পূর্ব্বাংশে অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের দিকেই জৈন সাধুদের প্রভাব কলির পূর্ব্বেও অত্যন্ত বাড়িয়াছিলেন। কলির পূর্ব্বেও যে সমস্ত দেশে বৈদিক সমাজ নাই, বা লোপ পাইয়াছে, অথবা ঋষির নেতৃত্বের অভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সে সমস্ত দেশে যদি জৈনসাধুর সহিত সমাজের যোগস্থাপন প্রমাণিত হয়, তবে উহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি ভারতের পশ্চিমাংশে বৈদিক আচার ও কর্ম্মকাণ্ডের যেমন আদর ছিল, বঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব্বাংশে সেরূপ আদর কখনও ছিল না। বর্ব্বরতা এ অনাদরের প্রকৃত কারণ নহে; কাশীর পূর্ব্বাংশে কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণের আভিজাত্য অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ড ও যতির সম্মান এককালে অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গালাদেশ প্রায় চিরকালই স্বাধীন মতপ্রতিষ্ঠাতাদের কেন্দ্রস্বরূপ। অতএব জৈনসাধুগণ যদি উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে কলিরও পূর্ব্বে স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে তুলাধার ও জাজলির উপাখ্যান আছে। (জাজলি) ঋষি কোন্ সময়ের ঋষি, তাহা বলা কঠিন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্যপরম্পরামধ্যে ঐ নামের যে ঋষি আছেন, তিনি উপাখ্যানের ঋষির মত মস্তকজটায় পাখী পুষিবেন কি না, সন্দেহ। মহাভারতের অনেক উপাখ্যানে পরবর্ত্তী কলিযুগের সমকালীন ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কথকমহাশয়গণের হাতে বল্মীকস্তূপের মত মহাভারত যে অল্প অল্প বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ তাঁহারাই রাখেন নাই। যাহা হউক, তুলাধারের জৈনাচারসমর্থন যে কালের প্রসঙ্গ, সে কালে জৈনদিগের প্রতি বৈদিক ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধভাব বিশেষ প্রবল ছিল না; থাকিলে, জৈনাচারসম্পন্ন বণিক্ তুলাধারের উপদেশ মূল্যবান্ জ্ঞানে সন্নিবেশিত হইত না। অহিংসার উপদেশ দান করিবার বহুবিধ ভূমিকা সহজলভ্য ছিল। তুলাধারের বা তৎপ্রসঙ্গোত্থাপনের যুগে জৈনগণ বিরোধী সম্প্রদায়রূপে, এমন কি, পুরাণকথকগণের নিকটও অবধারিত হন নাই।

প্রাচীন মোক্ষপন্থী জৈনসাধুর সহিত প্রকৃতপক্ষেই বৈদিক আর্য্য-সমাজের বিরোধ ছিল না। যাঁহাকে আমরা আজ জৈনাচার ও জৈনদর্শন বলিয়া অভিহিত করি, তাহা নিশ্চয়ই সেই প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিল না। জৈনসাধু সে কালে মোক্ষসাধকই ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন না; সেইজন্য মহাবীরের পূর্ব্বেকার জৈনসাহিত্য নাই। দার্শনিক সম্প্রদায় হইলে, জৈন মোক্ষপন্থীদের সূত্র বা উপনিষৎ গ্রন্থ থাকিত। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শাকটায়ন জৈন-সাধু ছিলেন। জৈনসম্প্রদায়ের ধারাবাহিক অস্তিত্ব যখন বিবিধ শাস্ত্রান্তর্গত উল্লেখ-সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, এবং প্রাচীন জৈনসম্প্রদায়ের ভিতর হইতে যখন বৈয়াকরণিক ও কথাশাস্ত্রকার আর্য্যসাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, তখন ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, জৈনসম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও দার্শনিক মত সেই বহু প্রাচীন কাল হইতে সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলে, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নিদর্শন-রূপে কোনও সূত্রগ্রন্থ অথবা আর কিছু থাকিয়া যাইত। কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে আমরা প্রাকৃত ভাষায় জৈনসাহিত্যের সূত্রপাত দেখিতে পাইতেছি এবং জৈনসাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পাইতেছি, তাহা প্রাকৃতভাষালিখিত গ্রন্থাদির পরবর্ত্তী। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি যে, জৈনসম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার উপায় নাই। জিনদিগকে আদর্শস্থানীয় করিয়া যে একটী মোক্ষ-সাধক সম্প্রদায় বহু পুরাকাল হইতে এদেশে সমাজের অন্তরালে বিদ্যমান ছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে কথা এই যে, মহাবীর স্বামীর বা পার্শ্বনাথ স্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালে এই সম্প্রদায়ে দার্শনিক বিচার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল না। এ সম্প্রদায় সেই প্রাচীন কালে তত্ত্বাঙ্গের উপর বিশেষ ঝোঁক দেন নাই, সাধনাঙ্গের উপরই ইঁহাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল। জৈনসাধুসম্প্রদায় যে সেকালে তত্ত্ববিচারে উদাসীন হইয়া practical discipline অর্থাৎ ব্রত-নিয়মাদির উপরই আপনাদিগের সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া-ছিলেন, তাহার একটী প্রমাণ—তদুদ্ভাবিত স্যাদ্বাদ। এই স্যাদ্বাদ বা

সপ্তভঙ্গী ন্যায় যে সম্প্রদায়ের দ্বারা উদ্ভাবিত, সে সম্প্রদায় যে তত্ত্ববিচারে বৃথা কালক্ষেপ করিবেন না, ইহাই অধিক সম্ভবপর। কর্ম্ম শত্রু হইয়া আমাদের চিত্তকে মলিন করিয়াছে, সেই কর্ম্মশত্রুকে জয় করিয়া কিরূপে আমরা মোক্ষাবস্থা লাভ করিব, ইহাই এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিচার্য্য বিষয় ছিল। সেই কর্ম্মশত্রুকে জয় করিবার জন্য তাঁহারা যে সমস্ত ব্রতনিয়মাদিরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেইগুলিই তাঁহাদের পক্ষে প্রধান জ্ঞাতব্য ও অনুষ্ঠেয় বিষয় ছিল। তাহা ছাড়া কর্ম্মকে যে দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার সহিত যুঝিবার সুবিধা হয়, জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখিলে পূর্ণ উদ্যম ও আত্মনির্ভর উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ দৃষ্টিসম্মত তত্ত্বোপদেশ, হয়ত, সেই প্রাচীন সাধুগণ কখনও কখনও প্রদান করিতেন। কর্ম্ম যেন সত্য পদার্থের মত, উহা আমাদের চিত্তে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য চিত্ত গুরুতা প্রাপ্ত হইয়া নীচ বিষয়ে ধাবমান হইতেছে; কর্ম্মপদার্থ যাহাতে চিত্তে না লাগিয়া যায়, সেইরূপ উদ্যোগ করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্ম্মশত্রুর সহিত যে সাধক যুঝিতে চায়, সে যদি উক্তপ্রকার দৃষ্টিতে কর্ম্মের স্বরূপ বুঝে, তবে তাহার সে দৃষ্টিকে দার্শনিক মত বলা যায় না। নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধানকে দর্শন বলে; জৈনসাধু স্যাদ্বাদের দ্বারা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, বুদ্ধির সাহায্যে নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান করা বিড়ম্বনা। অতএব যে সাধনার দ্বারা কর্ম্মশত্রুকে জয় করিয়া আমরা মুক্ত হইতে পারি, সেই সাধনাই একমাত্র অবলম্বনীয় এবং সেই সাধনায় সমারূঢ় হইয়া যেরূপ দৃষ্টিতে কর্ম্ম, জীব ও জগৎকে দেখিলে সাধনার সুবিধা হইবে, সেইরূপ দৃষ্টি কি, তাহাই জৈনসম্প্রদায় প্রাচীনকালে সাধকদের প্রয়োজনমত উপদেশ করিতেন। সে কালে সম্যক দর্শন সম্যক্ চারিত্রেরই একটী সহায়ক ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার ছিল। সম্যক্ চারিত্রের উপরই জৈনসম্প্রদায় দাঁড়াইয়াছিল, সম্যক্ দর্শনকে যেন যষ্টির মত ব্যবহার করিত। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের সাধনা ইহার বিপরীত; তিনি চারিত্রের (সাধন-চতুষ্টয়) দ্বারা সম্যক্ দর্শনের উপর দাঁড়াইতে চাহিতেছেন; কেননা, সম্যক্ দৃষ্টি পাইলেই মনন ও নিদিধ্যা-

সনের দ্বারা তিনি লক্ষ্যে উপনীত হইবেন। প্রাচীন জৈনসাধু তত্ত্বদৃষ্টিকে তাঁহার চারিত্রের সহায়করূপে গ্রহণ করিতেন এবং চারিত্রের দ্বারা কর্ম্ম-শত্রুকে জয় করিয়া জিন হইবার উদ্যম করিতেন। জৈনসম্প্রদায়ের এই তত্ত্বদৃষ্টি বা সম্যক্ দর্শন মহাবীর স্বামীর পরে ক্রমেই পূর্ব্বতারল্য পরিহারপূর্ব্বক মতবাদের দার্ঢ্য লাভ করে এবং শেষে জৈনদর্শনরূপে পরিচিত হয়। কেবল স্যাদ্বাদ পূর্ব্ব হইতেই সুধীজনগোচর হইয়া একটী বিশেষ জৈনমত বলিয়া প্রচলিত ছিল। সেইজন্য প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলে মতামতের পরিচয়ে জৈনের পরিচয় দিতে স্যাদ্বাদী শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতএব কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও বহুকাল জৈনসাধু এক প্রকার মোক্ষপন্থিরূপে পরিগণিত হইয়া সমাজের মধ্যে দেখা দিতেন ও উপযুক্ত সম্মান পাইতেন। সম্মান পাইবার প্রকৃষ্ট হেতু এই যে, তিনি মোক্ষসাধক; এবং এমন কি, বৈদিক সমাজও বহুকাল পর্য্যন্ত বুঝিত যে, বৈদিক মোক্ষসাধনার ধারা এই নগ্ন সাধুদের দ্বারাও কথঞ্চিৎ সংরক্ষিত হইতেছে। এই রকম একটা বোঝা-পড়ার ভাব যতকাল বৈদিক সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল, ততকাল উহার সহিত কোনও প্রাচীন যতি-সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত হয় নাই। বেদমন্ত্রের মধ্যে পরমপদ বা ব্রহ্মপদের কথা নিশ্চয়ই বার-ম্বার রহিয়াছে,—"যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি"; এবং সেই মোক্ষপদের সাধনায় সন্ন্যাসও বেদে বিহিত রহিয়াছে—"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্ব-মানশুঃ"। অতএব মোক্ষসাধনার ধারাকে নিশ্চয়ই বৈদিক বলা যায়। বেদ বলিতে শুধুই যজ্ঞাচারকে বুঝায় না, মোক্ষসাধনাকেও বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এক সময়ে বেদ বলিতে শুধু যজ্ঞাচারই বুঝাইত; শুধু বেদের মন্ত্রভাগই বেদ বলিয়া পরিচিত হইত। "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"—এইরূপ নানাস্থান হইতেও অনুমিত হয় যে, এককালে বেদ বলিতে অনেকস্থলে যাহা বুঝাইত, তাহার মধ্যে মোক্ষসাধনার স্থান নাই। সাংখ্যও বেদ বলিতে যজ্ঞা-চার বুঝিয়াছেন। কিন্তু ঔপনিষদ সম্প্রদায়ের মোক্ষসাধকগণ বেদশব্দে

এরূপ একদেশ ইঙ্গিত করেন নাই; তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের যতই নিন্দা করুন, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"—এই বেদসম্বন্ধীয় ধারণা তাঁহাদের সর্ব্বদাই বজায় আছে। গীতায়ও যজ্ঞাদির মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। আসল কথা এই যে, বেদসম্বন্ধে সংকীর্ণ ও প্রশস্ত, দুইরকম ধারণাই প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের প্রতি যাঁহারা সমন্বয়দৃষ্টি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তাঁহারা চিরকালই বেদশব্দের প্রশস্ত অর্থটী গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ক্রমশঃই যখন আশ্রমী ঋষির পদবী সামাজিক যাজক ব্রাহ্মণ ও অরণ্যচারী সন্ন্যাসীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া লোপ পাইতেছিল, তখন হইতেই প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের প্রতি সমন্বয় দৃষ্টি সর্ব্বত্রই বিরলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সমাজে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ, বেদধর্ম্ম যে যজ্ঞকর্ম্মেই পর্য্যবসিত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য উচ্চরোল তুলিলেন; তাঁহাদের গৃহীত সংকীর্ণ অর্থটী গ্রহণ করিয়া মোক্ষপন্থী অনেক সন্ন্যাসী বেদের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কেবল এই উভয় পক্ষের অন্তরালে প্রাচীন ঔপনিষদ সম্প্রদায়েরই উত্তরসাধক কতকগুলি ভিক্ষু বা যতিসম্প্রদায় ভারতের অরণ্যে বিদ্যমান ছিলেন, যাঁহারা মোক্ষসাধন ও যজ্ঞাচার, নির্গুণ ও সগুণ উপাসনা, নিবৃত্তিধর্ম্ম ও প্রবৃত্তিধর্ম্মের মধ্যে একটা সোপানপরম্পরা—একটা সাধনক্রম, লক্ষ্য করিতেন এবং যজ্ঞাচারগর্ব্বিত ব্রাহ্মণ ও বেদসংস্রবত্যাগী সন্ন্যাসী—উভয়ের পক্ষপাতী না হইয়া, প্রকৃত মীমাংসাশাস্ত্র ও প্রকৃত বেদজ্ঞান সম্প্রদায়ক্রমে রক্ষা করিতেন। কালে ইঁহাদেরই সম্প্রদায়কাননে শঙ্কররূপ অমৃতফল ফলিয়াছিল।

যজ্ঞাধিকারবঞ্চিত প্রশস্ত আর্য্যসমাজক্ষেত্রে যখন নূতন নূতন উপাসনার প্রচারক সন্ন্যাসিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন জৈনসাধুগণও গৃহস্থদিগকে মোক্ষতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়া শ্রাবকশ্রেণীভুক্ত করিতেছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানপ্রিয় গৃহস্থ ধর্ম্মজীবনে ধর্ম্মকর্ম্মের আড়ম্বর পরিহার করিতে পারে না, সেইজন্য শ্রাবকের জন্য পৃথক্ চারিত্রের বিধান দেওয়া জৈনসাধুদের পক্ষে অনিবার্য্য হইল।

গৃহস্থের ধর্ম্মজীবন শুধু মোক্ষতত্ত্ব ও মোক্ষসাধন লইয়া পরিতৃপ্ত হয় না, সেইজন্য জিনদিগের পূজা প্রচলিত হইল। কিন্তু যজ্ঞাচারের সহিত আপোষ করিয়া লওয়া জৈনসাধুগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই; কারণ, বেদভিত্তি হইতে তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাংখ্যসম্প্রদায়ের প্রকৃতিতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব বৈদিকসমাজ প্রথম হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং দর্শনরূপ সংযোগসূত্রের দ্বারা বেদ ও সাংখ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়িয়া গিয়াছিল। সেরূপ একটা দার্শনিক বিশেষত্ব না থাকাতে, বেদ ও জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে; এমন কি, জৈনসম্প্রদায় নিজেদের জন্য পৃথক্ বেদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। হয়ত কোনও কোনও বৈদিক শান্তিবচন বা নমস্কারমন্ত্রাদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচার করিয়াছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রাচীন উপদেশাদিও অঙ্গ বা উপাঙ্গ বলিয়া স্মরণ করিতেন। পরবর্ত্তী কালে জৈনগণ বলিয়াছেন যে, বহুপ্রাচীন যুগ হইতেই হিংসক বেদ পরিহার করিয়া তাঁহারা অহিংসক বেদের পরিচর্য্যা করিতেন, অর্থাৎ তাঁহাদের অহিংসা-পরায়ণতাকেই বেদভিত্তি ত্যাগ করিবার প্রকৃষ্ট কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ঋষভ-দেবের যে সকল পুত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কোন্ বেদ অধ্যয়ন করিতেন? সে সমস্ত যুগের সন্ন্যাসীদের বেদসংস্কার করিবাব কি আবশ্যকতা ছিল? বৈদিক মন্ত্র ও যজ্ঞের সহিত সমাজেরই সম্বন্ধ আছে; সন্ন্যাসীর সহিত উহাদের এমন কি সম্বন্ধ ছিল যে, প্রাচীন জৈনসাধুগণ 'সংস্কৃত' অহিংসক বেদ প্রচার করিয়াছিলেন? মুনি-চারিত্রের অহিংসাকে গৃহস্থদের মধ্যে প্রচার করিবার প্রসঙ্গ সেই বহু প্রাচীন যুগ হইতে নিশ্চয়ই জৈনসাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে উত্থাপিত হয় নাই। সমস্ত সাধুসম্প্রদায়ই জৈনদিগের ন্যায় অহিংসা পালন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই ব্রত গৃহস্থদের স্কন্ধে চাপাইবার ঔৎ-সুক্য নিশ্চয়ই কলিযুগের পূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় নাই। অহিংসার উপদেশ দান করা এক কথা, আর সমাজ-প্রচলিত বলিপ্রথা রহিত

করিবার চেষ্টা আর এক কথা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমাজের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করা অথবা গৃহস্থদের মধ্যে অহিংসামূলক উপাসনাবিধি প্রচলিত করা জৈনসাধুদের পক্ষে কলিযুগের পূর্ব্বে আবশ্যক হইয়া উঠে নাই। তখন তাঁহারা বেদ বা কর্ম্মকাণ্ডসম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন; কারণ, উহা তাঁহাদের সাধনভজনের এলাকার মধ্যে ছিল না।

কিন্তু যখন সমাজের আসরে তাঁহারা শ্রাবক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তখন বেদ ও যজ্ঞাচার-সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা মতামত প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। যজ্ঞাধিকারবঞ্চিত অথচ যজ্ঞাচারের পক্ষপাতী গৃহস্থদের দ্বারা তাঁহাদের শ্রাবকগণ সমাজক্ষেত্রে সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত, অতএব বেদসম্বন্ধে একটা স্পষ্ট মত প্রকাশ করা অপরিহার্য্য। আর্য্যসমাজে চিরকালই বেদসম্বন্ধীয় মতামত আর সমস্ত মতামত অপেক্ষা গুরুতর; আর্য্যসমাজে বেদ না মানিলেই নাস্তিক হইতে হয়, ঈশ্বর মান আর না মান, তত আসে যায় না। এইরূপ প্রাণান্ত উদ্যমসহকারে বেদভিত্তি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল বলিয়াই, আর্য্যসমাজ চিরকাল আর্য্যসমাজ থাকিয়াই বিকশিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। এক জৈনসম্প্রদায় ব্যতীত আর প্রায় সমস্ত প্রাচীন যতিসম্প্রদায়ই, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, আর্য্যসমাজের এই বিবর্ত্তন-রহস্যের আকর্ষণে সেই প্রাচীন যুগে গৃহস্থগণকে বেদভিত্তি হইতে অপসারিত করেন নাই; বরং অভিনব সংযোগে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, জৈনসম্প্রদায় যেমন বেদ হইতে আপনাদিগের ব্যবধানের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিয়াছেন, আর কোনও যতিসম্প্রদায়ই সেরূপ করেন নাই। আর সমস্ত সম্প্রদায়েই তত্ত্ববিচারের প্রাধান্য ছিল এবং বৈদিক প্রণবতত্ত্ব ও দেবতাতত্ত্বাদি বাদ দিয়া তত্ত্ববিচার করা সম্ভবপর ছিল না। ফলে, সমস্ত সম্প্রদায়ই বেদের সহিত একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু জৈনসম্প্রদায় তত্ত্ববিচার বা সেরূপ সামঞ্জস্যবিধানে এতাবৎকাল মনোযোগী হন নাই। অতএব যখন বেদের সহিত

তাঁহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, তখন সাধারণ্যে প্রচলিত বেদের সংকীর্ণ অর্থটী গ্রহণ করিয়া, এবং যজ্ঞাচারের সহিত মোক্ষসাধনের অসামঞ্জস্য চিরপ্রথানুসারে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা বেদের বিরুদ্ধে মতপ্রচার করিলেন। মতপ্রচারে প্রধান যুক্তি অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

যজ্ঞাচারই যদি বেদ হয়, তবে বেদবিরোধী হওয়া ছাড়া জৈন প্রচারকের গত্যন্তর ছিল না। যজ্ঞাচারে দেবতা কেন্দ্রস্থানীয় জৈন কর্ম্মবাদে দেবতার স্থান নাই, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে নাশ করিতে হইবে, শরণাগতির অবকাশ নাই। তবে গৃহস্থ নাকি উপাস্যদেবতা না পাইলে, চিত্তের পরিতৃপ্তি কোনমতেই পান না, তাই জিনপূজার প্রচলন ঘটিয়াছিল। কিন্তু জিন—মনুষ্য অথবা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতেন, জিন দেবতা নহেন, ফলদাতা নহেন, অতএব জৈন মতবাদের সহিত যজ্ঞাচারের খাপ খাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। এইজন্য জৈনমত যজ্ঞাচার বা বেদের বিরোধী। অহিংসার দোহাই দিয়া বেদের বিরুদ্ধবাদী হওয়ার পথ এত প্রশস্ত নহে। পিষ্টকপশুর বলিতে অহিংসা রক্ষা পাইতে পারে, অহিংসাব্রতের সহিত যজ্ঞাচারের সামঞ্জস্য হয়, কিন্তু দেবতাহীন মতবাদ যজ্ঞের অনুকূল হইতে পারে না। জৈনরাজার পক্ষে অহিংসাব্রতের কঠোরতা বর্জ্জন করা হইয়াছিল, রাজ্যপালনে অসিব্যবহার ও শত্রুনাশ জৈনরাজার জন্য বিহিত হইয়াছিল। তবে বেদভিত্তি বর্জ্জন করিবার পক্ষে অহিংসাই কি প্রকৃষ্ট কারণ?

প্রকৃত কথা পূর্ব্বেই আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি। যজ্ঞাচারের আনুকূল্যে উপাসনার বিধান দিয়া বৈদিকসমাজের বহির্ভূত সমস্ত উপাসকসম্প্রদায়ই বৈদিকসমাজের সহিত ক্রমশঃ অঙ্গীভূত হইতেছিল এবং বৈদিক ব্রাহ্মণের যজনযাজনার আশ্রয়ভাগী হইতেছিল। কিন্তু জৈন উপাসকসম্প্রদায়ের সম্মুখে সে পথ প্রসারিত ছিল না। তাঁহারা আপনাদিগের পার্থক্য ও বিশেষত্বের পক্ষে প্রবলতম যুক্তির সন্ধানে অহিংসার ধ্বজা উড্ডীন করিলেন এবং সন্ন্যাসের অহিংসাব্রতকে গার্হস্থ্যধর্ম্মেরও শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর এই অহিংসাধর্ম্মের দোহাই দিয়া

তাঁহারা বেদ ও বৈদিকসমাজের সহিত আপনাদিগের অনিবার্য্য বিরোধকে স্পষ্টীকৃত করিয়া তুলিলেন।

কলিযুগ যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন এই বিরোধের ধূম্রা সমাজ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। যে যুগে নূতন নূতন উপাসনার সহায়ে বৈদিক আভিজাত্যহীন সমাজনিচয় বৈদিকতার আশ্রয় লাভ করিতে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল, সেই যুগে জৈন শ্রাবকসমাজকে অল্পে অল্পে বেদের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতে হইল; নতুবা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিরোধের লক্ষণ তেমন স্পষ্টীকৃত হয় নাই, মোক্ষসাধনার নানা ধারার মধ্যে জৈনসাধুসম্প্রদায় একরূপ বিনা আপত্তিতে ও নিরুদ্বেগে আপনার গতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সেকালে তাঁহাদের সমতুল্য নিরগ্নি যজ্ঞাচারবিমুখ যতিসম্প্রদায় আরও অনেক ছিলেন,বেদবিরোধিতাব সামাজিক কষ্টিপাথরে তাঁহাদের পরীক্ষা হইবার সময় আসে নাই। উপাখ্যানের তুলাধারের মধ্যে ভারতকথক বিরোধের লক্ষণ দেখিতে পান নাই; জিনের আদর্শ শ্রীরামচন্দ্রেরও উপাদেয় বলিয়া যোগবাশিষ্ঠকার বর্ণনা করিতেছেন। তখনও পূজার্হ অর্হৎদিগের চরিত্র আবশ্যকস্থলে নিঃসন্দেহে প্রশংসিত হইতেছে। জৈনসম্প্রদায়কে যদি সমাজের আসরে নামিয়া শ্রাবকদিগের অভিভাবকতা না করিতে হইত, *তবে বৈদিকসমাজের সহিত কখনও তাঁহাদের বিরোধ হইত কি না,* সন্দেহ।

কিন্তু বৈদিকতার সামাজিক মানদণ্ডে একবার পরীক্ষিত হইয়া যখন জৈনসম্প্রদায়ের সহিত বেদের বিরোধ সমাজে প্রতিপন্ন হইল, তখন বিরোধের আরও হেতুস্থান প্রকটিত হইতে লাগিল। নগ্নতা ও কেশলুঞ্চনও সমাজের চক্ষে বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। একদিকে জৈনগণও যেমন অহিংসামূলক যুক্তির অস্ত্রকে যথাসাধ্য শাণাইতে লাগিলেন, অপরদিকে বৈদিক, রক্ষণশীল ও বেদাশ্রয়প্রয়াসী সমাজের মধ্যে জৈনাচারও একটা বিষম সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর বহুকাল পর্য্যন্ত সমাজের উচ্চস্তর হইতে জৈনসাধুসম্প্রদায়ে অতি অল্পই লোক প্রবেশার্থী হইয়াছে এবং আর্য্যা-

বর্ত্তের একরূপ সীমান্তভাগেই জৈনসাধুদিগের প্রতিপত্তির কথা শুনা গিয়াছে। যদি ভগবান্ পার্শ্বনাথ ও মহাবীব স্বামী আবির্ভূত হইয়া আবার জৈনসম্প্রদায়ে জীবনীশক্তি ও সম্ভ্রম সঞ্চারিত না করিতেন, তবে সমাজের উপরিতন স্তরে আর জৈনমতের প্রতিধ্বনি শুনা যাইত কি না, সন্দেহ।

বেদের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াও যে, সেই নূতন বৈদিকতা-সঞ্চারের যুগে জৈনসম্প্রদায় জীবিত থাকিয়া লোকসংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার একটী কারণ—জৈনসাধনপথের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ও অপর কারণ—নূতন নূতন অবৈদিক ক্ষত্রিয়সমাজ ও বৈশ্যসমাজের প্রাদুর্ভাব। বৌদ্ধযুগের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই একদিকে নূতন নূতন উপাসনাব সহায়ে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বৈদিব আভিজাত্যহীন সমাজ যেমন বৈদিকতার আশ্রয়ভাগী হইতেছিল, অপবদিকে ক্ষত্রিয়শক্তি ও বৈশ্যশক্তির জোরে নূতন নূতন সমাজ বৈদিক সমাজের চারিপার্শ্বে মাথা তুলিতেছিল। বৈদিক সমাজ বা বৈদিকতা যে পরিমাণে বৈদিক ধর্ম্ম-ভাবের মধ্য দিয়া নূতন নূতন সমাজকে absorb বা আত্মসাৎ করিতে পারে, সে পরিমাণেরও অধিক নূতন সমাজের অভ্যুদয় চারিদিকে ঘটিতেছিল। উত্তরভারতেই এই ব্যাপার অধিকতর ঘটিতেছিল বলিয়া, বৈদিকতাব প্রভাব ক্রমশঃ দক্ষিণভারতের দিকে অপসৃত হইতেছিল। কথিত আছে, রাজপুতানায় নূতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী সমাজসকলকে ব্রাহ্মণগণ কৌশলে হস্তগত করিয়া আর্য্যেতর অবৈদিক ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলকে পরা-ভূত করিয়াছিলেন। কর্ণেল টডের রাজস্থানে এইরূপ একটী কিংবদ-ন্তীর উল্লেখ আছে যে, জৈনসাধুদের দ্বাবা প্রবল অবৈদিক সমাজসকলের সৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ রাজপুতানাব নূতন ক্ষত্রিয়জাতিদের সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের সাহায্যে জৈনপ্রভাব বিধ্বস্ত করেন। রাজ-পুতানার উত্তরে ভারতসীমান্তভাগে সেকন্দর সাহের আগমনকালে আমরা জৈনসাধুদের প্রবল প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, জৈনসাধুদিগকেই গ্রীকগণ Gymno-sophists নামে অভিহিত করিয়াছেন, গ্রীকভাষায় Gymnos শব্দের অর্থ নগ্ন।

মনুসংহিতায় আছে যে, ক্ষত্রিয়-ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই; সেইজন্য দেখিতে পাই যে, উত্তরভারতে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে বেদমর্য্যাদা-নভিজ্ঞ নূতন নূতন ক্ষত্রিয়সমাজের অভ্যুদয় অত্যধিক হওয়াতে বৈদিকতার স্রোত বহুপরিমাণে রুদ্ধগতি হইয়াছিল এবং দক্ষিণভারতের দিকে নূতন নূতন ক্ষত্রিয়সমাজের দিকে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হইতেছিল। উত্তরভারতের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়-সম্বন্ধে আমরা বুদ্ধদেবের একটী শ্লেষ-বাক্য পাইয়াছি; তিনি একস্থলে বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের ঘরে কন্যাদান করিতে পারিলে, আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন! উত্তরভারতের অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নবাভ্যুদিত ক্ষত্রিয়গণের সামাজিক মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছিল। এইরূপ নবোদীয়-মান অনার্য্যভাবাপন্ন সমাজসমূহের আনুকূল্যেই জৈনগণ আত্মপ্রভাব বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সমাজে সহজে আত্মবিস্তার ঘটাইয়াছিল।

জৈন মোক্ষসাধনারও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহা সেই প্রাচীনকালে জৈনসম্প্রদায়ে লোকবল অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। কর্ম্মিষ্ঠ ও কর্ম্মপ্রবণ মানুষ স্থূলকর্ম্মের ভিতর না হইলে আত্মোৎকর্ষের একটা গতি অনুভব করিতে পারে না; তাহাদের হৃদয় সুস্থতার জন্য সর্ব্বদা "হাতে-নাতে" করিবার কাজ চায়, উচ্চভাবের তন্ময়তা বা তত্ত্বনিবিষ্ট-চিত্তত্বার আস্বাদে তাহারা সহজে আকৃষ্ট হয় না। জৈন মোক্ষসাধনা এইরূপ অনুষ্ঠানপ্রিয় (practical) লোকদের পক্ষে অনেকাংশে উপযোগী। বৈরাগ্য হইলে, অর্থাৎ সংসারনিবৃত্তির বাসনা জাগিলে, এইরূপ কর্ম্মপ্রবণ লোক এইরূপ কতকগুলি কর্ম্মের বিধান চায়,যাহাদ্বারা সে সংসারনিবৃত্তির পথে পথ মাপিয়া মাপিয়া অগ্রসর হইতে পারে। জৈন মোক্ষসাধনা একশ্রেণীর পর আর এক শ্রেণীর ব্রত-নিয়মাদির দ্বারা এইরূপ বৈরাগ্যবান্ সাধককে উপযুক্তভাবে ব্যাপৃত রাখিতে পারে। বেশী বিচার করিবার দরকার নাই; কর্ম্মে তোমার আত্মা লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, খাটিয়া যাও, উহা ক্রমশঃ স্খলিত হইবে। স্থূলকর্ম্মপ্রবণ মানুষ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে স্থূল পদার্থের মত কল্পনা করিতে পারিলেই, উহার সহিত উপযুক্ত-

ভাবে বুঝিতে উদ্যোগী হইবে, সন্দেহ নাই। বিষম বিরক্তিতে মানুষ চুল ছেঁড়ে; জৈনগণ চুল-ছেঁড়াকে বৈরাগ্যের একটা অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। নগ্নতা দেহের প্রতি ঔদাসীন্যের পরাকাষ্ঠা; দেহের প্রতি উদাসীন হইবার জন্য নগ্নতা অবলম্বন করা most practical discipline অর্থাৎ একটা স্থূল কায়দা বা শিক্ষার চূড়ান্ত। শরণাগতির ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্যম ও পুরুষকারের ক্ষতি হইতে পারে; জৈন-শিক্ষায় শরণাগতি নাই, আপনার হাতে-পায়ে খাটিয়া যাও। যদি খাটিতে খাটিতে মোক্ষসম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়া মনকে দোলায়, তীর্থঙ্কর-দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাঁহারা মোক্ষের অকাট্য প্রমাণ; তদপেক্ষা আর কি প্রত্যক্ষ (practical) প্রমাণ হইতে পারে? এমন কে স্থূলবুদ্ধি সাধক আছে যে, সে প্রমাণও অগ্রাহ্য করিবে? কায়িক ব্রততপস্যাদি ছাড়া যে সকল মানসিক অনুপ্রেক্ষণ জৈনসাধনায় রহিয়াছে, সেগুলির জন্য সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচারের কোনও আবশ্যকতা নাই; অনিত্যাদি অনু-প্রেক্ষণ বা ভাবনা যে কোনও শ্রেণীর সাধুই করিতে সক্ষম। সেই বৌদ্ধপূর্ব্বযুগে তুমি যে কোন সাধুসম্প্রদায়ে প্রবেশার্থী হও, তোমাকে হয় একটা দেবতাবাদ, না হয় একটা দার্শনিক মতবাদ, না হয় একটা সূক্ষ্ম যোগতত্ত্ব,—যাহা হউক একটা গঠিত বিশ্বাসের উপর অগ্রে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেই আর্য্যভাব ও অনার্য্যভাবের অনবচ্ছিন্ন সংঘর্ষের যুগে, এমন সংসারবিরাগী লোকের অভাব ছিল না, যাহারা উক্ত প্রকারের কোনও একটা বিশ্বাসের মধ্যে লালিত-পালিত বা মানুষ হইয়া উঠে নাই এবং এমন মানুষও দেশের সর্ব্বত্র বিরল ছিল না, যাহারা কর্ম্মাসক্তবুদ্ধিতে সংসারে খাটিতে খাটিতে বিষম ধাক্কা পাইয়া, অথবা মনের অনুকূল কর্ম্মপথ না পাইয়া, সন্ন্যাসা-শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তদানীন্তন উত্তরভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বেদ বা প্রাচীন মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সাধুসম্প্রদায় অপেক্ষা জৈনসম্প্রদায়ের প্রভাবই সে দেশসমূহে অধিক হইবার কথা; বাস্তবিকই বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে বৈদিক মোক্ষসাধকদের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

জৈনদিগের মধ্যে প্রবাদ এই যে, বুদ্ধদেব প্রথমে জৈনসাধু হইয়াছিলেন। খুব সম্ভব প্রবাদটী সত্য, তবে জৈনগ্রন্থাদিতে বুদ্ধদেবের জৈনসম্প্রদায়ত্যাগের যে কারণ উক্ত হইয়াছে, উহা বিদ্বেষপ্রসূত। সম্বৎ ৯৯০এ লিখিত একখানি জৈনগ্রন্থ বলেন যে, তিনি সরযূ-সলিলে ভাসমান একটী মৃত মৎস্য খাইয়া তপস্যা ভঙ্গ করেন ও সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। গৌতমবুদ্ধের পক্ষে জৈন শিক্ষানবীশী ত্যাগ করিবার প্রকৃত কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। নির্ব্বিষয় তুরীয়পদের আকর্ষণে আকৃষ্ট শাক্যসিংহের অনন্যসাধারণ হৃদয় জৈনগুরুর উপদিষ্ট মোক্ষতত্বে তৃপ্তিলাভ করে নাই। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল লইয়া জৈনমতে লোক ব্যাপ্ত এবং তদূর্দ্ধে অলোক। এই অলোকসম্বন্ধে সেকালে জৈনসম্প্রদায়ে কিরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইত, অথবা গৌতমবুদ্ধকে কিরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেব অলোকতত্বকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অসম্পূর্ণ অলোকতত্ব অপেক্ষা গভীরতা দান করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বতন অলোকতত্বকে আরও সমুত্থিত করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের পরে জৈনগণ যে মোক্ষতত্বের বিচার করিয়াছেন, তাহা আমরা পাইতেছি। আমরা ঐ সম্বন্ধে জৈনদিগের মধ্যে কোনও একটা অবিরোধী মতবাদ পাইলাম না। মোক্ষাবস্থায়, কখনও শুনিতেছি, মুক্তপুরুষগণ পরমাত্মায় যুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু প্রত্যেকের individuality বা পৃথক্ স্বরূপ বজায় থাকে, আবার কখনও শুনিতেছি, মোক্ষ একটা ধাম বা সিদ্ধশিলা, সেখানে জীব মুক্তাবস্থায় একরূপ বিশুদ্ধ দেহে বর্ত্তমান থাকে। আমরা চেষ্টা করিয়া এই বুঝিলাম যে, negative বা নেতির দিক্ হইতে জৈনসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে মোক্ষতত্ব সাধনযোগ্য আদর্শরূপে প্রচলিত থাকিত। উহা সংসার নহে, বাসনা নহে, কর্ম্ম নহে, কর্ম্মভাগী জীব নহে; উহা চতুর্দ্দশ গুণস্থানের অতীত। উহা আশ্রব বন্ধের ত অতীতই, তা' ছাড়া সম্বর ও নির্জ্জরেরও অতীত, সেই শুদ্ধাতিশুদ্ধ অবস্থা। সে অবস্থায় কর্ম্ম বা কর্ম্মফল পৌঁছিতে

পারে না। জিনদিগের অবস্থা তাঁহাদের স্তবে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সে বর্ণনায় বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ও উপনিষদের ব্রহ্মনির্ব্বাণই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দর্শনের "কচকচি"তে পড়িলেই জিনমোক্ষ আর একরূপ ধারণ করেন, যেন জৈনদের দার্শনিক বিচারের উপর একটা অভিসম্পাত আছে, যেন স্যাদ্বাদ সেই অভিসম্পাতেরই প্রতিধ্বনি। জৈনমতের মূলভাব বা attitude কর্ম্মলিপ্ত বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববিচারের বিরুদ্ধে; জৈনমত সাধনাঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত, জৈনমত জগৎকে সাধক ও মুক্তপুরুষ দিতে পারে, দার্শনিক দিতে পারে না। তবে একযুগে জৈনসাধু যে ভারতের নানাস্থানে তর্কযুদ্ধে জিতিত, সে পরপক্ষ ভাঙ্গিবার নীতিতে এবং স্যাদ্বাদের অস্ত্রচালনায়।

শাক্যসিংহের জ্ঞানপিপাসা জৈন মতবাদে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। জৈন কর্ম্মবাদ তিনি একরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহার মীমাংসা জৈনসম্প্রদায়ে তিনি খুঁজিয়া পান নাই। পরে ন্যগ্রোধমূলে তিনি অবিদ্যাতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, অহংতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া পঞ্চস্কন্ধমাত্রে পর্য্যবসিত দেখিয়াছিলেন এবং অবিদ্যার পারে নির্ব্বাণতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি দেখিতে পান নাই। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রতনিয়মাদির উপর কেবলমাত্র নির্ভর করিলে, মানুষের একটা নূতন বন্ধন জুটিতে পারে এবং যে চিত্তকে নিয়ত ধ্যানসোপানে উন্নীত করিয়া সত্য সাক্ষাৎকারের দিকে অগ্রসর করাইতে হইবে, সে চিত্ত সেরূপ উন্নয়নের পরিবর্ত্তে নিম্নতন সোপানে ব্রতনিয়মাদির কঠোরতা বিধানেই ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। এ বিপদ্ জৈনসম্প্রদায়ে চিরকালই ঘটিয়াছে, তাই বিশেষ ব্রতনিয়মাদির অত্যধিক কঠোরতা সমর্থন করিয়া ঢুণ্ডিয়াপন্থীদের মত নূতন নূতন শাখাসম্প্রদায়ের উদ্ভব জৈন ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়। বিশেষতঃ যে অহিংসাব্রতের উপর বেদবিরোধিতার আবেগে জৈনসম্প্রদায় এককালে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সেই অহিংসাপালনের বাড়াবাড়ি পরবর্ত্তী কালে জৈনসম্প্রদায়ের প্রধান বিশেষত্ব হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। স্থূলজগতে অহিংসার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব; এ জগতে প্রাণ প্রাণ লইয়া বাঁচে, life lives upon life; উপনিষদে অশনায়া ও মৃত্যুকে একই তত্ত্বের এপিঠ আর ওপিঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব অহিংসার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মনকে স্থূলসূক্ষ্ম অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু জৈন-সম্প্রদায় স্থূলজগতেই অহিংসার প্রতিষ্ঠা করিতে অত্যধিক ব্যস্ত, সে ব্যস্ততাব অধিকাংশই স্থূলজগৎ হইতে মনকে তুলিবার কার্য্যে লাগানই তত্ত্বদর্শীর পক্ষে সঙ্গত।

অহিংসা-সম্বন্ধে আর একটী চমৎকার কথা উপনিষদে রহিয়াছে। একবার দেবতা, মানুষ ও অসুর সাধনবিধি জানিবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়। প্রজাপতি দেবতাকে বলিলেন,—"দ"; "দ" শব্দে দেবতা বুঝিল—দমই সাধনপথ; প্রজাপতি বলিলেন,—"বেশ বুঝিয়াছ।" মানুষকেও প্রজাপতি বলিলেন,—"দ"; মানুষ বুঝিল—দান। প্রজাপতি বলিলেন, "তথাস্তু"। অসুরকেও প্রজাপতি বলিলেন,—"দ" অসুর বুঝিল, দয়াই সাধনপথ। প্রজাপতি বলিলেন,"তথাস্তু"। প্রজাপতির সেই তিনবার "দ" উচ্চারণেব দ্বারা ত্রিবিধ প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের জন্য সাধন নির্দ্দেশ করার ব্যাপারটী আজও নাকি মেঘনিঃস্বনের দ্বারা বারম্বার অভিনীত হইয়া থাকে। উপনিষৎ এই উপাখ্যানের দ্বারা একটী psychological law অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব উদঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। যে মানুষের দৈবী প্রকৃতি, তাহার পক্ষে দমসাধনাই প্রকৃত সাধনপথ, অর্থাৎ সে কেবল বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়াদিকে অন্তর্মুখীন করিলেই সত্যবস্তু লাভ করিবে, তাহার পক্ষে আর কোনও হাঙ্গামা নাই। যে মানুষের প্রকৃতি মানব-স্বভাবসুলভ আসক্তিরাজির দ্বারা বিকৃত, তাহার পক্ষে দানশীলতাই পরম ঔষধ; দানের ভাব চিত্তে জাগ্রত করিয়া রাখিলেই, তাহার আসক্তি দমন হইবে এবং উন্নত সাধনসোপানে সে উন্নীত হইবে। যে মানুষের প্রকৃতি আসুরী অর্থাৎ দ্বেষ-হিংসাপরায়ণ, তাহার পক্ষে দয়া বা অহিংসার সাধনাই প্রকৃষ্ট পথ। আর একটা বিষয় প্রণিধান করা আবশ্যক এই যে, প্রত্যেকেই প্রজাপতির রহস্তবাক্যের সাহায্যে নিজ

নিজ প্রকৃতিগত ত্রুটির প্রতীকার নিজেই বুঝিয়া লইল, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের স্বভাবের মধ্যে যেরূপ প্রবৃত্তির আকর্ষণ অনুভব করিতেছে, ঠিক সেই আকর্ষণের বিপরীত দিকে সাধনোপায় খুঁজিয়া লইতেছে। অহিংসাপালন লইয়া জৈনেরা যে ব্রতনিয়মের আড়ম্বর আরম্ভ করিতেছিল, আমাদের বোধ হয়, উপনিষৎ* উপাখ্যানচ্ছলে তাহারই সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন। জৈনধর্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম্ম বলিয়া এককালে প্রসিদ্ধ ছিল; বাস্তবিকই জৈনসম্প্রদায়ের অধিকাংশ কেন, প্রায় সমস্ত তীর্থঙ্করই ক্ষত্রিয়। এরূপ-স্থলে অহিংসার উপর যে জৈনসম্প্রদায়ের একটা প্রতিক্রিয়ামূলক আবেগ বরাবরই থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, অহিংসাকে আপনাদিগের বেদবিরোধিতা ও বিশেষত্বের একমাত্র স্তম্ভ-রূপে দাঁড় করাইবার প্রবল উদ্যোগে, জৈনসম্প্রদায় আপনাদিগের প্রাচীন মোক্ষসাধনার প্রবাহকে কথঞ্চিৎ গতিভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে জৈনসম্প্রদায় বৈদিক সম্প্রদায়সমূহের অন্তরালে শ্রাবকসমাজ স্থাপন করিতেছিলেন, বিপক্ষের ব্যূহভেদ করিবার প্রবল উদ্যম তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ সেই উদ্যম প্রথম হইতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একদিকে যেমন ভারতীয় সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তেমনি আবার উচ্চতর স্তরগুলির মধ্যেও নবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ফলে কি হইল? বৈদিক সমাজের উচ্চতম স্তরে যজ্ঞাচার প্রচলিত ছিল; সে স্তরটী বৌদ্ধ আক্রমণে ভগ্নপ্রায় হইতে লাগিল, কিন্তু নিম্নতর স্তরগুলি নবোদ্ভূত তান্ত্রিকপূজা, পঞ্চোপাসনা প্রভৃতির সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্মকে পরিপাক করিয়া বৌদ্ধদিগের স্কন্ধে মহাযানধর্ম্ম চাপাইয়া দিল। এই মধ্যবর্ত্তী সমাজস্তরগুলিই নূতন ধর্ম্মজীবনে সঞ্জীবিত ছিল; বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজেই রূপান্তরিত হইয়া গেল। অবশেষে কতিপয় শতাব্দীর শেষে দেখা গেল যে, সেই তান্ত্রিক ও পঞ্চোপাসনামূলক বৈদিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে একরূপ হজম করিয়া ফেলি-

* বৃহদারণ্যক ৫ম অধ্যায়।

য়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম উহার ব্যূহ ভেদ করিতে যাইয়া, এই দশা প্রাপ্ত হইল; জৈনধর্ম্ম সেরূপ ব্যূহভেদ করিতে যায় নাই, তাই আজও বাঁচিয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন প্রথম উদ্যমের পর প্রচলিত বেদমূলক ধর্ম্মের মধ্যে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন জৈনসম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের নবপ্রতাপের ধাক্কা সামলাইয়া আত্মবিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বৌদ্ধদের সহিত সেই কলহের যুগে, জৈনসম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি বাগ্‌বিতণ্ডাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। সে যুগের ক্ষণিক অভ্যুদয় স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই। ভারতের সেই দার্শনিক যুগের অন্তরালে সমগ্র সমাজকে বিধাতা আকর্ষণ করিয়া,আবার বৈদিক ভিত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেই ব্রতোদ্‌যাপন করিতে অবতীর্ণ হইলেন। তার পর হইতে জৈনসম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও অবস্থান্তর ঘটে নাই।

এখন প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান যুগে জৈনসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য কি? একটী কর্ত্তব্য এই মনে হয় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সাময়িক প্রয়োজনবশে জৈন-মতের মধ্যে যে সমস্ত আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে, সে সমস্ত উপযুক্ত তত্ত্বদর্শিতার সাহায্যে বিদূরিত করা। অহিংসা একটা সূক্ষ্মভাব, স্থূল কর্ম্ম নহে; অতএব স্থূল কাজে অহিংসা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনর্থক যে সমস্ত বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা কমাইয়া যাহাতে মানসিক দ্বেষভাবরাহিত্যের প্রতি সাধক অধিক মনোযোগী হয়, তাহা চেষ্টা করা আবশ্যক। রাতদিন কখন্ বুঝি কি অদৃশ্য প্রাণিবধ হল—এই আশঙ্কা ও উদ্বেগে মনকে ব্যস্ত না করিয়া, যাহাতে মনে দ্বেষভাব না স্থান পায়, সেইদিকে সমগ্র সম্প্রদায়কে উদ্যোগী করিতে হইবে। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একসময় জৈন ও বৌদ্ধ, বেদের সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া, বেদবিরোধের ধ্বজা উড়াইয়াছিল। বেদের সংকীর্ণ অর্থ আজ হিন্দুসমাজও স্বীকার করে না। বেদ বলিতে, বরং আজ ব্রহ্মবিদ্যার কথাই মনে অধিক স্থান অধিকার করে। বৈদিক মোক্ষসাধনারূপ বৃক্ষকাণ্ড হইতেই জৈন ও বৌদ্ধ সাধনা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আজ যখন বেদের প্রকৃত অর্থই সর্ব্বত্র গৃহীত হইতেছে, তখন

জৈন ও বৌদ্ধ আপনাদিগকে অবৈদিক বলিয়া ভারতীয় সনাতন সমাজের নেপথ্যে সরিয়া দাঁড়াইবার কেন চেষ্টা করিবেন? "হিন্দু," জৈন ও বৌদ্ধ একই মোক্ষতত্ত্বের সাধক, একই পরমপদের প্রতি সকলেরই সাধারণ গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। জগতে আর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় এরূপ গতি নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে নাই। গতি একই দিকে হইলেই হইল, পথের বিভিন্নতায় কি আসিয়া যায়? গতি একই দিকে হইলে বরং ভাগাভাগি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ উদ্ভাবন করাই শ্রেয়স্কর; কারণ, সাধকের রুচিবৈচিত্র্য আছে, অতএব পথবৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। অতএব একই বৈদিক মোক্ষসাধনার সাধকরূপে সনাতন ধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম পরস্পর বিরোধভাব বর্জ্জন করিয়া জগতের কল্যাণে সম্মিলিত হউক, ইহাই প্রত্যেকের পক্ষে এখন প্রধান কর্ত্তব্য।

জৈন মোক্ষসাধনার বিশেষত্ব বজায় রাখিতে হইবে। আমরা স্বীকার করি, এই বিশেষত্ব জগতের পক্ষে অমূল্য। যেমন একদিকে এই মূল্যবত্তা জৈন সাধকদিগকে সাধনার সিদ্ধির দ্বারা জগতে আজ প্রমাণিত করিতে হইবে, তেমনি বৈদিক মোক্ষসাধনার অপরাপর ধারাগুলির অপরিহার্য্য বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া, তাহাদের সহিত এক-লক্ষ্যের সমন্বয়সূত্রে সম্মিলিত হইতে হইবে। জৈনসমাজে নূতন উদ্দীপনার আভাস দেখা যাইতেছে, কিন্তু কেবল সাম্প্রদায়িক ইতিহাস খুঁজিলেই চলিবে না, জৈন মোক্ষসাধনার অব্যর্থতা প্রমাণিত করিতে হইবে—দার্শনিক প্রমাণ নহে, সেরূপ প্রমাণসংগ্রহে তীর্থঙ্করদিগের আশীর্ব্বাদ নাই, তাঁহাদের মত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইবার সময় আসিয়াছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত শুধু জিনগণের পূজার দ্বারা জৈনসম্প্রদায় চিরদিন টিকিবে না, অথবা শুধু বুদ্ধের পূজা দ্বারা বৌদ্ধসম্প্রদায় চিরদিন টিকিবে না; কারণ, সেরূপ পূজা আজ সাম্প্রদায়িক গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, বিশ্ব-মানবের অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে যাইতেছে। কিন্তু যে সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে জিন-মোক্ষ বা নির্ব্বাণ আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরিণত হইবে, জিনগণ বা বুদ্ধ আজ সেই সম্প্রদায়েই আবির্ভূত হইবেন; কারণ, জিন জৈন

ছিলেন না বা বুদ্ধ বৌদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা মোক্ষস্বরূপ ছিলেন।

সমালোচনা।

পুনরাগমন (সামাজিক উপন্যাস)। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, প্রণীত। ২০১ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

আমরা সাগ্রহে ক্ষীরোদ বাবুর এই নূতন ধরণের উপন্যাসখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। জড়বাদপ্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্মপ্রাণ সনাতন হিন্দুসমাজের মধ্যে যে ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছে, এবং পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত, ও অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও ধর্ম্মপ্রাণতার অভাবই যে সর্ব্ববিধ অশান্তির হেতুভূত, এবং মূর্খ, দরিদ্র ও অসভ্যপদবাচ্য হইলেও ধর্ম্মপ্রাণতাই যে জীবনের পরম শান্তি ও মহত্ত্বের নিদান, তাহাই এই গ্রন্থে এক ইংরাজীশিক্ষিত পুরোহিত-সন্তানের আত্মকাহিনীবর্ণনচ্ছলে সরল প্রাণের ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক অকপট শ্রদ্ধা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকটিত। পাশ্চাত্যশিক্ষাগর্ব্বিত সংশয়াত্মা বঙ্গীয় যুবক—পাণ্ডিত্যগর্ব্বিত ধনমদান্ধ ঈর্ষ্যাপরায়ণ পতি—হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা সনাতনধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি-স্বরূপিণী তেজস্বিনী সতী—নিরক্ষর, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত অথচ নিজ চরিত্র-মহিমায় মহীয়ান্, অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পদের পরম অধিকারী, সতত ক্ষমাশীল মহাপুরুষ প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের অঙ্কনে ক্ষীরোদ বাবু অতি নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপাখ্যানটীও আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক—পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকা যায় না। অথচ সাধারণ উপন্যাসপাঠের ন্যায় ক্ষণিক উত্তেজনায়ই উহার অবসান হয় না; উহাতে, অন্তরে সনাতন

ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও হৃদয়ের একটা উচ্চভাব জাগাইয়া দেয়। সুতরাং আমরা অসঙ্কুচিতচিত্তে সকল বাঙ্গালী পাঠককেই এই উপন্যাস-খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে, গ্রন্থের যাহা দোষ-বলিয়া বোধ হয়, তাহারও উল্লেখ করা উচিত। তাই বলি, আমাদের মনে হয়, গ্রন্থের প্রথম দোষ—ইহাতে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ঘটিয়াছে। জীবনে অলৌকিক ঘটনার সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী হইলেও বলি—কথায় কথায় স্বপ্নদর্শন, চলিতে ফিরিতে 'আদেশ',—এগুলিতে যেন মানুষকে বাস্তবরাজ্য হইতে একটা রহস্যপূর্ণ কল্পনার রাজ্যে লইয়া যায়। আমাদের মনে হয়, হিন্দুর ধর্ম্মকে এই অলৌকিকতার আবরণবিমুক্ত করিয়া দেখাইতে পারিলে, ইহার সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিত।

আর এক কথা, গ্রন্থখানি পড়িয়া স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আইসে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার কি সবই দোষ এবং প্রাচীন শিক্ষার কি সবই গুণ? অবশ্য আমরা একথা বলি না যে, ক্ষীরোদ বাবু আধুনিক সভ্যতার একেবারে বিরোধী—তবে তিনি এই গ্রন্থে আমাদের প্রাচীন সমুদয় ব্যাপারকে যেরূপ উজ্জ্বল তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে যেন পাঠকের মনে সেই সংস্কারই আনিয়া দেয়। সুতরাং এই অতিরিক্ত প্রাচীন-পক্ষপাতিতাই আমাদের মতে গ্রন্থের দ্বিতীয় দোষ। আমরা স্বামীজির ভাষায় বলি,—

"আমাদের দুই পথের মাঝামাঝি চলিতে হইবে। একদিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপর দিকে জড়বাদ, ইউরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার—যাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল-ভিত্তিতে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। এই দুইটী হইতেই সাবধান হইতে হইবে।"

—ভারতে বিবেকানন্দ, ৮৮ পৃঃ।

যাহা হউক, গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকই যে উপকৃত হইবেন ও আনন্দলাভ করিবেন, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

———

ভক্ত গিরিশচন্দ্র।

(১)

(শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল।)

(স্বামী শ্রীসারদানন্দের দ্বারা সম্যক্ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

কথায় বলে, 'মরিলে এবং দূরে যাইলেই মানুষের দর বুঝিতে পারা যায়।' মদ-মাৎসর্য্য-মোহিত মানব-মন তত্তদবকাশেই অন্যের প্রতি হিংসা-দ্বেষাদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভুলিয়া স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে সমর্থ হয়, ঐ ব্যক্তি নিজগুণে বিচারকর্ত্তার জীবনে কত পরিমাণ সুখ বা দুঃখ ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত করিতেছিল। কথাটি সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেকটা সত্য, এবং সেইজন্যই সুচতুর লেখক কোন ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহার জীবনীপ্রকাশে সহসা অগ্রসর হন না; অথবা মানব-সমাজ মৃত-ব্যক্তির অদর্শনের পর অভাব বোধ করিয়া তাহার জীবন-কাহিনী যতদিন না ঐরূপে নিরপেক্ষভাবে বিচারে সমর্থ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তৎপ্রকাশে বিরত থাকে।

মাত্র এক বৎসর হইল মহাকবি গিরিশচন্দ্রের তিরোভাব হইয়াছে। এই স্বল্পকালে তাঁহার অভাব আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেও এখনও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তাঁহার অশেষ গুণাবলী অন্তরের কতটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা ধারণা করিবার মানব-সমাজ এখনও যথেষ্ট সময় পায় নাই। তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ, তাঁহার বাসপল্লীস্থ জনসাধারণ এবং রঙ্গালয়-সংক্রান্ত ব্যক্তি সকলে ঐ বিষয় অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে এখনই সক্ষম হইলেও গিরিশচন্দ্রের দৈনন্দিন-জীবনের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ না থাকিয়া দূরে অবস্থান করতঃ যাঁহারা তৎকৃত কার্য্য-কলাপ ও রচনাবলীর পর্য্যালোচনা করিতেন, তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত

অভাব-বোধ সম্যক্ পরিস্ফুট হইবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। অতএব গিরিশচন্দ্রের মহজ্জীবনের বিস্তৃতালোচনা এখনও সম্ভবপর নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন—তবে এ সামান্য উদ্যমই বা কেন? কবিবর গিরিশচন্দ্র যে দরের লোকই হউন না কেন এবং নিজগুণে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকটে যেরূপ উচ্চাসনই প্রাপ্ত হউন না কেন, তাঁহার কথা এখনই তুলিবার প্রয়োজন কি? উত্তরে আমরা বলিব—ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের বিচার-শক্তি যাহাতে সত্যপথে চালিত হয়, সেজন্যই আমাদিগের এ সামান্য উদ্যম। শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত গিরিশ-চন্দ্রের গুরু-ভ্রাতৃবর্গের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। শ্রীযুত গিরিশের আধ্যাত্মিক গভীরতার কথা তাঁহাদিগের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সংগ্রহ করিয়া কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিলে পরে ঐ বিষয় লইয়া গোলযোগের আর সম্ভাবনা থাকিবে না।

তেজস্বী গিরিশচন্দ্র সৎ বা অসৎ কোন কার্য্যই লুক্কায়িত ভাবে করিতে জানিতেন না। উহা এক প্রকার তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। নিজ-কৃত কার্য্য-কলাপের মন্দাংশ গোপন করিয়া কেবলমাত্র উত্তমাংশের ঘোষণা করা মনুষ্য সাধারণের স্বভাব হইলেও তিনি কখন ঐপথে চলিতে আপনাকে অভ্যস্ত করাইতে পারেন নাই। ফলে, সাধারণে তাঁহার স্বভাব না বুঝিয়া এতকাল ভাবিয়া আসিয়াছে—যাহার বাহিরে এতটা কুকৃত-প্রকাশ, তাহার ভিতরে না জানি আরও কত কি গুপ্ত রহিয়াছে। যৌবনের প্রাক্কালেই তিনি ঐরূপে যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে অনুষ্ঠিত নানা সুকার্য্য, অসীম ঈশ্বর-বিশ্বাস, অলৌকিক গুরুগতপ্রাণতা, জলন্ত ভক্তি, ত্যাগ বা তপস্যা কিছুই তাহার সম্পূর্ণ অপলাপে সমর্থ হয় নাই। বাহিরে ঐরূপ ফল লাভ করিলেও কিন্তু ভিতরে তিনি ঐ সুনামের প্রভাবে মহারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'মন ও মুখ এক করাই সর্ব্ব সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধন'—পূর্ব্বোক্ত সুনাম গিরিশচন্দ্রকে ঐ সাধনে সিদ্ধি-লাভ করাইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অন্তর্বাহ্য

তুলনায় আলোচনা করিয়া সংসারের ভাল মন্দ মতামতে তিনি ঐ সুনাম প্রভাবেই চিরকালের জন্য উদাসীন হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'মান (লোক-মান্য) হজম করা বড কঠিন, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা না থাকিলে কেহই উহা করিতে পারে না'—জীবনের উত্তরকালে সংসারের নিকট হইতে লব্ধ প্রভূত মান যশে নিরপেক্ষ রাখিবার জন্যই কি বিধাতা গিরিশচন্দ্রকে পূর্ব্বজীবনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ?—কে বলিবে !

গিরিশচন্দ্রের জীবনে পূর্ব্বোক্ত সুনামের জন্য প্রবন্ধোক্ত বিষয় যে এক শ্রেণীর লোকের অরুচিকর বোধ হইবে এবং উহার আলোচনার জন্য তাঁহারা যে আমাদিগকেও মিথ্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন, তাহা আমরা জানি। কিন্তু কি করিব, আমরা উপায়হীন। যে সকল কারণে গিরিশচন্দ্রের জীবনে ঐরূপ সুনাম উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকলের আমরা তন্ন তন্নরূপে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছি এবং অন্য পক্ষে যে সকল কারণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্ঘে 'মহাবিশ্বাসী শূরভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, সে সকলেরও ঐরূপে অন্বেষণ ও গবেষণা করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক গভীরতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। শুদ্ধ তাহাই নহে, আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে পাঠককে বলিয়াছি, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং কবিতাদি ভিন্ন প্রহসন, গীতিনাট্য ও নাটকে গিরিশচন্দ্র সর্ব্বসমেত ৭৯ খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন—ঐ সকল পুস্তকগত গভীর আধ্যাত্মিক ভাব, তাঁহার জীবনগত গভীরতম আধ্যাত্মিক প্রবাহ হইতেই যে, নির্গত হইয়াছিল, একথার আমরা সবিশেষ প্রমাণ লাভ করিয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোক এখনও বোধ হয় আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আপত্তি উঠাইয়া বলিবেন, বাপু হে, তোমাদের গিরিশচন্দ্রকে তোমরা পণ্ডিত বল, বুদ্ধিমান্ বল, তেজীয়ান্ বল, কবি, নট বা নাট্যকার বলিয়া উচ্চাসন প্রদান কর, তাহাতে ত আমরা আপত্তি করিতেছি না, আমাদের আপত্তি কেবল তোমাদের ঐ কথার প্রয়োগে,—গিরিশচন্দ্রকে আধ্যাত্মিকগভীরতাসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ

করায়—যৌবনে যাহার নৈতিক জীবনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত, তাহাকে উচ্চ আধ্যাত্মিকজীবনসম্পন্ন বলায়; তোমরা কি বুঝ না, নীতি ও আধ্যাত্মিকতা একই পদার্থ, উহার একটির অভাবে অপরটি কখন মানব-জীবনে উপস্থিত হইতে পারে না?

ঐরূপ আপত্তিতে আমাদিগের বিনীত উত্তর এই যে, জীবনে আধ্যাত্মিকতা থাকিলে—ক্রমে নীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী হইলেও, নীতি থাকিলেই যে আধ্যাত্মিকতা আসিবে, ইহার অর্থ নাই। আজীবন নীতির অনুষ্ঠান করিয়াও আধ্যাত্মিকতাশূন্য জীবনভাব বহন করিতে অনেক পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন পুরুষকে প্রথম জীবনে ঘোর দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া থাকিতে দেখিলেও কিছুকাল পরে তাহাকে সুনীতি ও সদাচার-পরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম-ধনে ধনী হইতে বহুশঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলেও শেষোক্তপুরুষ সকলের শ্রীভগবানের কৃপা-লাভের বহুল দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে। উহার কারণ, আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন পুরুষ সংসারের রূপরসাদির মোহ অতিক্রম করিয়া জীবনে একবার প্রবুদ্ধ হইলে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব-ত্যাগ রূপ লক্ষ্যেই অগ্রসর হয় এবং ঐ ত্যাগ-রূপ ব্রতের অনুষ্ঠানেই তাহার জীবনে ক্রমশঃ নীতি সদাচারাদির উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসহীন হইয়া রাজভয়, সমাজ-ভয় এবং লোক-মান্যের জন্য অনেক সময়ে নীতির অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। ঐরূপ অনুষ্ঠান যে, পুরুষকে ঈশ্বরভক্তি এবং তদর্থ-ত্যাগ রূপ ব্রতে কখন প্রযুক্ত করিবে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব আধ্যাত্মিকতা ও যাহা সচরাচর নীতি বলিয়া কথিত হয়, তাহা যে এক পদার্থ, ইহা কেমনে বলিতে পারি। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের প্রথম জীবনে নীতিপরায়ণতার অভাব স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হইলেও আধ্যাত্মিকতার একান্তাভাব কখনই পরিলক্ষিত হয় না। পরে ঐ আধ্যাত্মিকতার পরিপুষ্টিতে তাঁহার মন যখন একবার প্রবুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইল, তখন সে কেবলমাত্র তাঁহাকে সুনীতি ও সদাচারপরায়ণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে নাই, কিন্তু ভক্তিরও উচ্চ-শিখরে আরূঢ় করাইয়া তাঁহার প্রতি চিন্তা ও

কার্য্য তাঁহাকে আমরণ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল। ঐ কথারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠককে বর্ত্তমান প্রবন্ধে দিতে বসিয়াছি।

'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'—শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি, শ্রীযুত গিরিশ শৈশব ও বাল্যে তাঁহার বিধবা খুল্লপিতামহীর নিকটে বসিয়া প্রতি সন্ধ্যায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি পুরাণ সকলের গল্প শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন। সন্ধ্যার তিমির-চ্ছায়া ঘন হইয়া বাহ্যবস্তু সকলকে যতই আবৃত করিয়া ফেলিত, বালকেব কল্পনানয়ন উন্মীলিত হইয়া সুদূর অতীতকে ততই বর্ত্তমানে পরিণত করিত, এবং কখন নিবিড় বনমধ্যে তাপসের শান্তিকুটীরের, কখন বহুলোকাকীর্ণ উজ্জ্বল বাজসভার, কখন হিংসাতাণ্ডবপূর্ণ ভীষণ রণস্থলের, আবার কখন বা জন্ম-জরা-রহিত দেবতাগণেব লীলাভূমি সকলের জীবন্ত চিত্র তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিয়া তাঁহাকে হাসাইত, কাঁদাইত অথবা অপূর্ব্ব তেজস্বিতায় তাঁহার অন্তর পূর্ণ করিত। আমবা শুনিয়াছি, তাঁহাব খুল্লপিতামহী—একদিন ঐরূপে অক্রূর-সংবাদ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন চিবদিনেব মত ত্যাগ করিয়া মথুবা গমনের বিষয় গল্পচ্ছলে বলিতেছিলেন। মোহিত বালক বৃন্দাবনেব রাখাল বালক এবং গোপিকাগণের দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কবিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র আবার ত বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন ?' বৃদ্ধা বলিলেন, 'না'। বালক গিরিশ মনে বিষমা-ঘাত প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি—তিনি আর রাখাল বালকদের নিকটে আসিলেন না ?' বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, 'না, তিনি মথুরায় বাস কবিতে লাগিলেন।' বালক বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি তাহাদের সহিত আর দেখা করিলেন না ?' বৃদ্ধা পুনরায় 'না' বলিলে বালক অশান্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 'আমি আর ঐ গল্প শুনিব না।' অতএব আধ্যাত্মিকতার প্রথম উন্মেষ তাঁহার জীবনে, ঐ সময় হইতে বলিতে পারা যায়। বাল্যে শ্রুত ঐ সকল দেব এবং আদর্শ মানব-কাহিনী তাঁহাব ভাবপ্রবণ মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া যে সুফল প্রসব করিয়াছিল,

তাহার পরিচয়ও আমরা কিছু কিছু পাইয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বদা তেজস্বী এবং অনাশ্রব হইলেও তিনি সত্য-পরায়ণ হইয়া উঠেন। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া সর্ব্বদা স্নেহ-প্রদর্শন করিলেও মাতা কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিলে বিশেষভাবে দণ্ড প্রদান করিতেন—কিন্তু জননীর দণ্ডের আশঙ্কাতেও তিনি কখন নিজ-কৃত অন্যায় গোপন করেন নাই। জিজ্ঞাসিত হইলেই সকল কথা অকপটে বলিয়া জননীর তাড়না নীরবে সহ্য করিয়াছেন। শুনিয়াছি, ঐ সময়ে একদিন কাহাকে গালি দিয়া মাতার নিকট উহা স্বীকার করায় জননী তাঁহাকে প্রহার করিয়া মুখের ভিতর গোময় গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপে লাঞ্ছিত হইবেন জানিয়াও কিন্তু গিরিশ-চন্দ্র মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। মিথ্যা কহিলে পাপ হয় জানিয়া তিনি উহা কহিতে পারেন নাই। বাল্যের ঐ সত্যানুরাগ শ্রীযুত গিরিশের জীবনে তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত নিরন্তর পরিদৃষ্ট হইত। আমরা তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, যৌবনের প্রারম্ভে মকদ্দমায় মিথ্যা কহিয়া কোন একটি বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করিতে পশ্চাৎপদ হওয়ায় তিনি আত্মীয়-বন্ধুবর্গের নিকট নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাসাস্পদ হয়েন। তিনি বলিতেন, ঐরূপে সত্যানুরাগের জন্য প্রশংসার পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তাঁহার জীবনে স্বল্পকাল পরে দারুণ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। কপট সংসারের কাহারও অপেক্ষা তিনি যে অল্প বুদ্ধিমান্ নহেন, এই পরিচয় দিবার জন্য তিনি এখন হইতে ব্যস্ত হইয়া উঠেন, পরবর্ত্তী কালে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতার উহাই অন্যতম কারণ।

বাল্যে শ্রুত পুরাণাদি হইতে গিরিশচন্দ্রের মনে অন্য এক ভাবও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। নিজ ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের উপর তিনি বিশেষ স্নেহ-পরায়ণ হয়েন। রামায়ণে বর্ণিত অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের কথা শুনিয়া বাল্য হইতেই তিনি তাহাদিগকে সুখী করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ জন্যই দেখা যায়, তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়সে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে* পিতৃ-

* 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে ভ্রমক্রমে গিরিশচন্দ্রের জন্ম ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নির্ণীত হইয়াছে। ঐ স্থলে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হইবে।

বিয়োগ হইলে তিনি তাঁহার শিশু ভ্রাতাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় কোথা হইতে জুটিবে ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছেন এবং সংসারের অভিভাবিকা নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরাকে বলিতেছেন, 'দিদি, এখন হইতে সকালে ও বৈকালে আমাদিগের জলযোগের জন্য মুড়ি-মুড়কির বন্দোবস্ত কর!' ভাবী জীবনে নিত্য-পরিদৃষ্ট গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা ও ভগিনী-বর্গের প্রতি অদ্ভুত ভালবাসা আমাদিগকে অনেক সময় মোহিত করিয়াছে। উহার বীজ যে, পূর্ব্বোক্তভাবে বাল্যে পুরাণ-কথা শ্রবণে উপ্ত হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ হইতে একত্রিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শিত্ব-লাভের জন্য নিত্য নানা গ্রন্থ সানুরাগে অধ্যয়ন করিলেও তিনি বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ ঐ কালের প্রারম্ভেই পরিত্যাগ করেন, নাস্তিক্য-সমর্থনকারী গ্রন্থাবলী বহুল পাঠ করিতে থাকেন এবং ঐ কালের নবীন বিদ্যাভিমানীদিগের ভিতর জড়বাদের পক্ষপোষকতার ও ইতর-সাধারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিত-গণের মধ্যে ধর্ম্মহীনতার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া নাস্তিক্যের করাল-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া ঐহিক ভোগ-সুখ লাভকেই কিছু কালের জন্য মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়া বসেন। তখন অভি-ভাবকশূন্য নির্ভীক গিরিশচন্দ্রের ইন্দ্রিয়গ্রাম সবল ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—বুদ্ধি, সংসারের সকল কার্য্যের তুলনায় আলোচনা ও মূল্যান্বেষণে উন্মুখ হইয়াছে—এবং মন, নানা বাসনায় নিরন্তর বিক্ষিপ্ত হইলেও আশা ও উদ্যমে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মকুশলী গিরিশচন্দ্র বুককিপারি শিখিলেন, অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, পুত্র-কন্যার পিতা হইলেন, এবং অন্তর্নিহিত নিজ অসাধারণ শক্তি-সমূহের দিন দিন পরিচয় লাভ্ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে শিখিলেন! বাগবাজার পল্লীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে হাপ্ আখড়াই গানের আসরে সামান্য পরিচ্ছদধারী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে সমবেত লক্ষপতি সকলের অপেক্ষাও অধিক

সম্মানলাভ করিতে দেখিয়া কবি হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে ইতিপূর্ব্বেই জাগরিত হইয়াছিল—ঐ উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় কবিতা ও গীত রচনা করিয়া এখন তিনি অনেকস্থলে যশোলাভ করিলেন, এবং বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া থিয়েটার খুলিয়া চতুর্বিংশ-বর্ষ বয়সে নিমচাঁদের ভূমিকায় বিশেষ খ্যাতি-লাভও করিলেন। এইরূপে ঐকালে গিরিশচন্দ্রের জীবনে অন্য সকল বিষয়ের উন্নতি দেখিতে পাইলেও তাঁহাতে, বাল্যে, কৈশোরে এবং যৌবনের প্রারম্ভে পরিদৃষ্ট আধ্যাত্মিকতার কিছুমাত্র উন্নতি দেখা যায় না। কিন্তু বিলাস ও জড়বাদের প্রবল তরঙ্গে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা—এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। উহা এখন, প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা, পীড়িতের সেবা, মৃত ব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক সংস্কার, বন্ধুবর্গের সহিত নিত্য সত্যপালন ও তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্যাদি প্রদান প্রভৃতি নানাভাবে প্রকাশিত হইত।

ঐরূপে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইলেও গিরিশচন্দ্র যৌবনে বিকশিত আপন প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতা-মদে মত্ত থাকিয়া ঐহিক সুখলাভেই মনোনিবেশ করিয়া রহিলেন। ঐকালে নিজ বয়স্যগণের সহিত আলাপে কখন ঈশ্বর-প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি অকপটে হিন্দুর দেবদেবী সকলে এবং ঈশ্বরাস্তিত্বে পর্য্যন্ত নিজ অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা প্রকাশ ও সমর্থন করিতেন! কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা-প্রভাবে পল্লীস্থ ব্রাহ্মসমাজ, আদিসমাজ প্রভৃতি নানা স্থানে উপাসনাদিতে যোগদান করিয়া ঐ সন্দেহাবিশ্বাস দূরীকরণের চেষ্টাও করিতেন। কিন্তু বুদ্ধি তখন বিদ্যা-দম্ভে সমাচ্ছন্ন; যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণিত না করিয়া দিতে পারিলে সে কাহারও কথা গ্রাহ্য করিয়া উন্নত-শীর্ষ অবনত করিতে স্বীকৃত নহে। অতএব পূর্ব্বোক্ত অবিশ্বাস ও সন্দেহ তাঁহার কোথাও যাইয়া নিবৃত্ত হইল না। ফলে, হৃদয় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ঈশ্বর ও শান্তির অন্বেষণে প্রযুক্ত করিলেও বুদ্ধি সর্ব্বত্র ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের দোষ দর্শন করাইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি প্রদান করিত। বুদ্ধি বলিত, জল, বায়ু, আলোক প্রভৃতি

ইহজীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুনিচয় মানব সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত পাইতেছে, তবে তাহার অনন্ত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ধর্ম্মবস্তু এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন?—অতএব মানব-জীবনে ধর্ম্মবিশ্বাসের আবশ্যকতা নাই, দুর্ব্বল মানব দুর্দ্দিনে পড়িয়া একজন রক্ষাকর্ত্তার কল্পনা করে মাত্র।

আমরা শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের নিজ মুখে শুনিয়াছি, ঐরূপে ঐকালে বুদ্ধি, তাঁহার হৃদয়ের প্রতিযোগিস্বরূপে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকিলেও অনেক সময়ে হৃদয়ই জয়লাভ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইত। তিনি বলিতেন—নাস্তিকতার ঘোর দুর্দ্দিনেও তিনি গঙ্গাস্নানে যাইয়া রাম-তর্পণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৃত পিতামাতার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেন। তাঁহার মনে হইত, 'আমি (দেবদেবী, পরলোক প্রভৃতির নাস্তিত্ব সম্বন্ধে) যাহা বুঝিতেছি, তাহা যদি ভ্রম হয় এবং সন্তানের নিকট হইতে ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ জলাঞ্জলি পাইয়া মৃত পিতামাতার যদিই কোনরূপ তৃপ্তি হয়, তবে ত তর্পণ না করায় অপরাধী হইব!—সেজন্য ঐরূপ করিতাম।' অতএব ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীনতায় তিনি যে সুখী ছিলেন না এবং প্রাণে নিরন্তর একটা অভাববোধ করিতেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

নানা অবস্থার দাস, দুর্ব্বল মানব কয়টা দিনই বা ইহজগতে অক্ষুন্ন সাংসারিক সুখ উপভোগ করে—প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া কতক্ষণই বা তাহার বুদ্ধির দম্ভ থাকে! ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের উন্নতিশীল সংসারে মৃত্যু প্রবেশ করিল। এক ভগিনী ও এক ভ্রাতার মৃত্যু হইল। অনন্তর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার পত্নী একটি পুত্র ও একটি কন্যা মাত্র রাখিয়া পরলোকগামিনী হইলেন এবং তিনিও উহার অনতি-কাল পরে নিজ অনাশ্রবতার প্রেরণায় বিবেচনারহিত কর্ম্মফলে আপনাকে জড়িত করিয়া ফেলিলেন! কর্ম্মস্থলেও গিরিশচন্দ্রের এই সময়ে নানা গোলযোগ ও পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল এবং কর্ম্মান্তর-স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কিছু কালের জন্য ভাগলপুর সহরে যাইতে হইল। প্রতি-কূলাবস্থায় পড়িয়া উদ্যম ও কর্ম্মকুশলতা সহায়ে তিনি সংগ্রামে অটল

থাকিলেও তাঁহার বুদ্ধির দাম্ভিকতা অনেকাংশে খর্ব্ব হইল এবং হৃদয়ও অবসর-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মহীনতার অভাববোধ অধিকতর অনুভব করাইতে লাগিল। সেজন্যই দেখা যায়, পত্নী-বিয়োগের পর তাঁহার হৃদয় যখন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন, তাঁহার প্রাণ তখন ধর্ম্মালোকের জন্য পিপাসার্ত্ত হইয়া কাতরভাবে সংসার-বিলাস-বর্জ্জিতা যোগিনী 'ধুতুরা'কে ছন্দোবন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"যাঁর লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
দেখিতে কি পাও তাঁর বাঞ্ছিত বয়ান?"

'গিরি'কে প্রশ্ন করিতেছে—

"উন্মত্ত, কি তত্ত্বে যাও ভেদিয়া অম্বর?"

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"।—গিরিশচন্দ্রের এখনকার দ্বন্দ্ব-সমাকুল মনের অবস্থা তাঁহাকে ঐকথা এইকালে প্রাণে প্রাণে অনুভব করাইয়াছিল, তাঁহার প্রাণ পিপাসিত, কিন্তু বুদ্ধি দম্ভের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিয়াও উহা ত্যাগে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বিপরীতগামী করিতে সচেষ্ট! এই সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠক তাঁহার এই কালের প্রকৃতাবস্থা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। ঘটনা সামান্য হইলেও তাঁহার মনে উহা বিশেষ আঘাত প্রদান করিয়াছিল।

ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বতে গিরিশচন্দ্র এই সময়ে একদিন কয়েক জন বন্ধুবান্ধবের সহিত বেড়াইতে যান এবং যৌবন-সুলভ-চপলতায় কৌতূহল-পরবশ হইয়া একাকী, একটি গহ্বরে নামিয়া পড়েন। ঐ গভীর গহ্বরে প্রবেশলাভ অনায়াসে করিতে পারিলেও উহা হইতে পুনরায় উপরে উঠা সহজসাধ্য ছিল না। গিরিশচন্দ্র উহাতে নামিবার পর ঐকথা বুঝিতে পারিলেন এবং বন্ধুগণের সাহায্যে নানারূপে চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই পুনরায় উপরে বন্ধুগণের নিকটে আসিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আনন্দের পরিবর্ত্তে ভীতি আসিয়া সকলের প্রাণ অধিকার করিল এবং গিরিশচন্দ্রের বন্ধুগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে বলিয়া উঠিলেন—'তুমি নাস্তিক বলিয়াই আমরা এইরূপ মহাবিপদে পতিত

হইয়াছি, ঈশ্বর ব্যতীত এ বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই, অতএব আমাদের সহিত মিলিত হইয়া তুমি এখন তাঁহাকে একবার স্মরণ কর, এ বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নাস্তিক হইতে হয়, হইও।' বন্ধুগণের কাতর অনুরোধে গিরিশ ঈশ্বরকে ডাকিলেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয়—ডাকিবার পরেই গহ্বর হইতে উঠিবার একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায় তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল! তিনি ঐ উপায়াবলম্বনে উপরে উঠিয়া বন্ধুগণকে বলিলেন—"আজ ভয়ে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিলাম, অতঃপর প্রেমে যদি কখন তাঁহাকে ডাকিতে পারি ত ডাকিব, নচেৎ নহে—জীবনরক্ষার্থও নহে।"

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা গিরিশচন্দ্রের দম্ভে কিছু আঘাত প্রদান করিলেও কর্ম্মজীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী উহার তীব্রতা শীঘ্রই তাঁহার মন হইতে অপসৃত করিয়া লইল এবং তিনিও পূর্ব্বের ন্যায়ই জীবনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাগলপুরে প্রায় পাঁচ মাস কাটাইয়া গিরিশচন্দ্র কর্ম্মোপলক্ষে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং উহার অনতিকাল পরে আত্মীয়বর্গের অনুরোধে তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। সেটা অনুমান ১৮৭৫।৭৬ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁহার বয়ঃক্রম তখন একত্রিশ বা বত্রিশ বর্ষ হইবে।

দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের ছয় মাস আন্দাজ পরে গিরিশচন্দ্রের জীবনে এমন একটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়, যাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস পুনরায় সজীব হইয়া উঠে। ঘটনাটি স্বসংবেদ্য অথবা কেবল মাত্র তাঁহার নিজ মন বুদ্ধিরই গোচরীভূত হইলেও আজীবন তাঁহার অন্তরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাঁহার পরলোক-বিশ্বাস বিশেষ-ভাবে প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল। ঘটনাটি এই,—

বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া গিরিশচন্দ্র ঐকালে মৃত্যু-মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। অশেষ চিকিৎসাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হইয়া উহা উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল যে, ডাক্তার বৈদ্য এবং রোগীর আত্মীয়বর্গ তাঁহার জীবনাশায় হতাশ হইয়া তাঁহার আসন্ন-মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রোগীর অন্তশ্চক্ষুঃ

প্রস্ফুটিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সুদূরে সুনীল অম্বরপথে অদৃষ্ট-পূর্ব্বা এক করুণাময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই সমীপে আগমন করিতেছেন!—তাঁহার পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে শাটি, ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুররাগ এবং দক্ষিণ হস্তে কি এক বস্তু তিনি সযত্নে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মূর্ত্তি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঐ দেবী-মানবী গিরিশচন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন এবং হস্তস্থিত পদার্থ তাঁহার মুখে অর্পণ করিয়া বলিলেন, 'এই মহাপ্রসাদ খাও, ইহাতে তোমার রোগের শান্তি হইবে।' অনন্তর গিরিশচন্দ্র উহা ভক্ষণ করিলে দেবী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার দিকে সস্নেহে দেখিতে দেখিতে পুনরায় শূন্যপথে উর্দ্ধগমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন! ঐ অপূর্ব্ব-দর্শনের পর রোগীর পুনরায় সংজ্ঞালাভ হইল এবং ডাক্তারও সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, 'রোগীর অবস্থা ফিরিয়াছে, নাড়ী আসিয়াছে!' ডাক্তার ও আত্মীয়বর্গ স্থির করিলেন, ঔষধের গুণে রোগী প্রাণ পাইলেন—রোগী নিজে কিন্তু জানিলেন, জননীসদৃশা দেবী-মানবীই অহেতুক-কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিয়া যাইলেন! ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "মুমূর্ষু অবস্থায় রোগশয্যায় পড়িয়া তখন নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলাম, এ করুণাময়ী কে? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, নিশ্চিত ইনি আমার সেই বহুকাল হইল পরলোকগতা জননী, নতুবা অন্য কোন্ দেবী আর এ দুর্দ্দান্তকে দুদ্দিনে কৃপা করিতে আসিবেন? আবার ভাবিলাম, আমার একাদশবর্ষে পরলোকগতা জননীর চেহারা ত আমি ভুলি নাই, এ চেহারায় ও সে চেহারায় ত কিছুমাত্র মিল নাই, তবে ইনি কে? ঐ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া ভাবিলাম, নিশ্চিত ইনি আমার সেই স্নেহময়ী জননী, বহুকাল দেবীলোক-বাসিনী হওয়ায় ঐরূপে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। ঐ ভাবিয়া তখন চিত্তের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেও আরোগ্যলাভ করিয়া ঐ কথা যখন তখন প্রাণে উদিত হইত এবং অধীর হইয়া ভাবিতাম, কে আমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন ও আসন্ন-মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন?

পরে ঐ ঘটনার কিঞ্চিদধিক আট বৎসর কাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করিয়া ভাবিলাম, শ্রীগুরুই ঐ দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, করুণাময় শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব নিত্য সঙ্গে থাকিয়া নিজ শক্তিপ্রভাবে এ দুর্দ্দান্ত দানবকে আবাল্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের কিছুকাল পরে জয়রামবাটীতে গমন করিয়া যখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিলাম, তখনই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল—নিঃসংশয় বুঝিতে পারিলাম, বিসূচিকা-রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার কালে কাহার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম এবং কেই বা আমাকে ঐ দুর্দ্দিনে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন!" ঘটনাটি বলিতে বলিতে গিরিশ বাবু বলি-তেন, "সে মহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ এখনও আমার স্মরণে আছে।"

সে যাহা হউক, সংসারে মৃত্যুর ছায়া, কঠিন প্রতিকূলাবস্থার কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রোগের ভীষণ তাড়না এবং পূর্ব্বোক্ত দর্শন গিরিশচন্দ্রের দম্ভকে এখন অনেকাংশে যে, খর্ব্ব করিয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কারণ, রোগমুক্ত হইবার পরে শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের জীবন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এই কালে বিপজ্জালে এতই সমাকুল হইয়া উঠে যে, উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি মনে মনে ঈশ্বরের শরণ-গ্রহণ করিয়া অকূলে কূল পাইবার চেষ্টা করেন এবং সিদ্ধ-কাম হয়েন। ভাগলপুরের পর্ব্বত-গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া তিনি যে দম্ভ করিয়া বন্ধুবর্গকে বলিয়াছিলেন, ভয়ে আর কখন ঈশ্বরের নাম লইবেন না, গিরিশের সে দম্ভ বিপদে পড়িয়া এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়! গিরিশ উহাতেই বুঝিয়াছিলেন, সংসারের প্রবল-স্রোতের সম্মুখে দুর্ব্বল অসহায় মানবের দম্ভ কি তৃণতুল্য, কতদূর তুচ্ছ ও হেয়। কিন্তু ঈশ্বরের নাম-গ্রহণে বিপদ্ হইতে ঐরূপে উদ্ধার পাইবার পরেও যে, গিরিশচন্দ্রের দম্ভ আর কখনও মস্তক তুলিতে চেষ্টা করে নাই তাহা বলিতে পারি না, তবে এখন হইতে তিনি আর কখনও 'ঈশ্বর নাই' একথা জোর করিয়া বলিতে সাহসী হয়েন নাই। গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনে নবীন এক অধ্যায় অতঃপর আরম্ভ

হইয়াছিল। সেই সকল কথাই আমরা পাঠককে এখন বলিতে আরম্ভ করিব।

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী।

(৩)

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।)

সেদিন রাত্রে ষ্টেশনে যে মিছরীর সরবতে আমার পিপাসা-শান্তি হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট অমৃত বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাহার আস্বাদও যেন অমৃতের মত, আর অমৃতের মতই - এতক্ষণ যে শরীর আমার বোঝা হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে আবার নূতন শক্তি আনিয়া দিল। সরবৎ খাইয়া আমার মনে হইল যে, এখন আমি অনায়াসে দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইতে পারি। সরবতের ঘটী আমার কাছে রাখিয়া ষ্টেশনমাষ্টার চলিয়া গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা, তুমি এমনভাবে একা পথে বাহির হয়েছ?" এমনভাবে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার সেই বাৎসল্য-মাখা-স্বরে আমার আবার ছেলেবেলার কথা, বাবার কথা মনে পড়িয়া গেল। ষ্টেশনমাষ্টারের নাম হরিবাবু, পরে তাঁহার নাম জানিয়াছিলাম, এখনও আমার সে নাম মনে আছে।

ষ্টেশনমাষ্টার যে টিকিট দিয়াছিলেন, তাঁহাতে অনেকদূর পর্য্যন্ত পথ চলিবার ভাবনা আর ভাবিতে হয় নাই। পথে মাঝে মাঝে হাঁটিয়া চলিবার কথা ভাবিয়াছি, কিন্তু আমাকে এক পাও হাঁটিয়া চলিতে হয় নাই। বৃন্দাবনের কাছাকাছি একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয়, সেখান হইতে ভাড়া দশ আনা কি বারো আনা পয়সা। সেখানে যখন আসিয়া পৌছিলাম, তখন আর হাঁটিয়া যাইবার কথা মনে স্থান

পাইল না, তখন মনে হইল, আমি যেন পাখীর মত এই মুহূর্ত্তেই উড়িয়া বৃন্দাবনে যাইতে পারি। ট্রেণ আসিয়া এখনই চলিয়া যাইবে; আমার টিকিট নাই, টিকিট কিনিবার মূল্যও নাই। এইটুকু পথ মাত্র, এতদূর আসিয়া এখানে আর বিলম্ব আমার কোন মতেই সহিল না। জীবনে আমি সেই প্রথম ভিক্ষার্থিনী হইলাম। প্রথম ভিক্ষার্থিনীও বটে, শেষ ভিক্ষার্থিনীও বটে, আব কখনও আমাকে ভিক্ষা চাহিতে হয় নাই। ষ্টেশনে অগণ্য লোক যাতায়াত করিতেছে—তাহাদের সকলের নিকটেই আমি আজ ভিক্ষার্থিনী, কে এমন দয়ালু আছে যে, আজ আমার বৃন্দাবন পৌঁছিবার পাথেয় দিয়া প্রাণ বাঁচাইবে? আমার সম্মুখ দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইবে, আমি যদি যাইতে না পাবি, তবে—মনে হইতেছিল, তবে গাড়ীর চাকার তলায় পড়িয়া এখনই শরীরের ভার হইতে মুক্ত হইব। আমি সেই জনসঙ্ঘের নিকটে যোড়হাতে বলিলাম, "বাবা, দয়া করিয়া তোমরা কেহ আমার টিকিট কিনিয়া দাও, আমি বৃন্দাবন যাইব।" আমার কথা শুনিয়া সেই লোকের ভিড়ের ভিতর হইতে একজন হিন্দুস্থানী যুবক আসিয়া তখনই ভাড়ার কয়েক আনা পয়সা আমার হাতে দিল। সেই যে কয়েক আনা পয়সা,—তখন আমার কাছে তাহার যে মূল্য, দরিদ্রের নিকট মহামূল্য রত্নের মূল্যও তাহা অপেক্ষা অধিক নয়। ভিক্ষাদাতাকে যেন আমার বরদাতা দেবকুমার বলিয়া মনে হইল।

আমাকে পয়সা দিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৃন্দাবনে তোমার কে আছে? সেখানে কি তোমার কোন পীড়িত আত্মীয়কে দেখিতে যাইতেছ?" আমি বলিলাম, "না বাবা, আমি কানাইলালের দর্শনে যাইতেছি।" সে আমার কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে. "কানাইলাল? সেই নন্দ গোয়ালার ছেলে? সে ত চোর আর লম্পট। মূর্খেরাই তাহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে। তাহার জন্য কেন এত কষ্ট করিতেছ?" তাহার এই কথা শুনিয়া আমার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যেন আগুন ছুটিয়া গেল। "এই নাও তোমার পয়সা" বলিয়া তাহার পয়সাগুলি তাহার দিকে

ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। তখন চারিধারে বেশ একটু ভিড় জমিয়া গেল, গোলমাল হইতে লাগিল। এই সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক "মা, তোমার টিকিট নাও" বলিয়া একখানি টিকিট আনিয়া আমার হাতে দিলেন। দিয়া বলিলেন, "কেন মা, অবোধের উপর রাগ করিতেছ? ওরা মূর্ত্তি-পূজাদ্বেষী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তর্ক করিবার স্থবিধা পাইলে ওরা আর সহজে ছাড়ে না। ওদের স্বভাবই ঐ রকম।" যিনি টিকিট দিলেন, লজ্জায় আমি আর তাঁহার মুখের দিকে যেন চাহিতে পারিলাম না। গাড়ীতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। কেন আমি লোকের কাছে হাত পাতিয়াছিলাম! আমার নিজের যে কি প্রয়োজন আমি তারই বা কি জানি? তুমি যদি না নিযা যাইতে, বৃন্দাবনে কি আমি নিজের চেষ্টায় আসিতে পারিতাম? এতদিন আমি যে কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করি নাই, তাহাতে কবে আমার কি অভাব হইয়াছে? আজ এমনই পাগল হইয়াছিলাম যে, তোমাকেও ভুলিয়া গেলাম? আমার এ শাস্তি হইবে না কেন? ও ব্যক্তির কি দোষ, আমি যখন তাহার নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছি, তখন সে ত আমায় তাহার যাহা ইচ্ছা বলিতেই পাবে।" সেই দিন গাড়ীতে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, "এ জীবনে আর লোকের নিকট আঁচল পাতিব না।" ঠাকুর আমার সে প্রতিজ্ঞা আজ পর্য্যন্ত অটুট রাখিয়াছেন।

বৃন্দাবনে পৌছিলাম। পথে চলিতেছি আর পথের ধূলায় পড়িয়া প্রণাম করিতেছি। পথের ধূলা সকল গায়ে মাখিতেছি, আর চোখের জলে কেবলই ধূলা ভিজিয়া যাইতেছে। "জয় জয় বৃন্দাবন, জয় জয় গোবর্দ্ধন, জয় জয় যমুনা," পাগলের মত এই সব কত কি বলিতেছি, আর পথে চলিয়াছি। সে যে আমার কি দিন,—সে আনন্দ কি আর পাইব? কোথায় যাইতেছি—কোথায় যাইব, সে সব কিছুই মনে নাই, কেবল চলিয়াছি। যত গাছ দেখি, সবই তমাল-তরু মনে হয়; পাতা দেখি আর মনে হয়—এ ব্রজের নব-কিশলয়। এক একবার গাছের তলায় গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি,—তখন ভাবি, আমার নন্দদুলাল বুঝি

এই গাছে উঠিয়া খেলা করিতেছেন। যেন পাতার ভিতর হইতে রাঙ্গা নূপুরপরা পা দুখানি ঝুলিতেছে। এই যে সব পথ হয়ত ব্রজদুলাল বাঁশী হাতে করে গোরুর পাল নিয়ে এই পথ দিয়াই গিয়াছেন। পথে বোধ হয় এখনও গোরুর ক্ষুরের চিহ্ন আছে। এই সেই বৃন্দাবন, সত্য সত্য বৃন্দাবন, আজ আর আমার স্বপ্ন নয়। "চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম।"

গোবিন্দের মন্দির কোথায় সে কথা আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। মনে জানি, ঠাকুর যখন বৃন্দাবনে আনিয়াছেন, নিজেই ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। দুই দিন কিছুই খাই নাই, জানি, নিশ্চয়ই ঠাকুর ডাকিয়া নিয়া গিয়া প্রসাদ দিবেন। "তুমি যদি নিজে ডাকিয়া প্রসাদ না দাও, আমি আর কিছুই খাব না, না খাইয়া মরি সেও ভাল।" ভাবিয়া একটী নির্জ্জন-স্থানে গিয়া বসিয়া রহিলাম। সে জায়গাটীর নাম ষষ্ঠীর বন। ক্রমে সেই নির্জ্জন-বনে অনেক লোক-সমাগম হইতে লাগিল, সবই প্রায় যাত্রীর দল। কত আসিতেছে, কত যাইতেছে। কেহ আসিয়া দুটী একটী পয়সা দিয়া প্রণাম করিতেছে। আমি নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া আছি। আবার কেহ কেহ আসিয়া আমার সঙ্গে শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি মূর্খ, কোন প্রশ্নের অর্থই বুঝি না, কিন্তু তখন যে কেমন করিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছি, নিজেই কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একজন, দুইজন, ক্রমে অনেকে আসিয়া দাঁড়াইল, শেষে যেন একটী বিচারসভা বসিয়া গেল। যে যাহা বলিতেছে, আমি তাহারই উত্তর দিতেছি। আমি যে নিজে কিছু বলিতেছি না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কে যেন আমাকে বলাইতেছে, আমি কেবল মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই বলিয়া যাইতেছি।

দিন যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, লোকের সংখ্যাও ততই কমিতে লাগিল, শেষে সে স্থান প্রায় নির্জ্জন হইয়া আসিল। আমি প্রথমে যেখানে আসিয়া বসিয়াছিলাম, এখনও সেই একই স্থানে বসিয়া আছি। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আমার কাছে আসিলেন। তাঁহার কাপড় ফের দিয়া পরা। গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা যে, ফের দিয়া কাপড়

পরেন, আমি তাহা জানিতাম না, কিন্তু তাঁহার মুখে চোখে এমন একটী ভাব ছিল যে, তাঁহাকে পতিতা বলিয়া আমার কিছুতেই মনে হইল না। রমণী আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "মা, সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, রাত্রে আপনি কোথায় থাকিবেন?" আমি বলিলাম, "ঠাকুর যেখানে রাখেন, সেখানে থাকিব।" তখন রমণী বলিলেন, "মা, এই নির্জ্জন স্থানে রাত্রিবাস করা সম্ভব নয়, আপনি যদি দয়া করিয়া আমার গৃহে আসেন, তবে আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়া যাই।" রমণীর কথার উচ্চারণ ও স্বরের টান শুনিয়া মনে হইল, তাহার বাড়ী আমাদের দেশে নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, তুমি কে ও কোথায় তোমার বাড়ী, ফের দিয়া কেন কাপড় পরিয়াছ, এই সকল কথার উত্তর পাইলে আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।" আমার কথা শুনিয়া রমণী একটু লজ্জিত ভাবে হাসিলেন, বলিলেন, "আমাদের বাড়ী ঢাকায়, আমি স্বামীর সহিত তীর্থ দর্শনে আসিয়াছি, আমার স্বামী ঐ গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদেব দেশে এই রকম কাপড় পরে। বৃন্দাবনে আমাদের বাসাবাড়ী করা হইয়াছে, আপনি যদি সঙ্গে যান, সেখান হইতে গোবিন্দ দর্শনেরও স্থবিধা হইবে।" আমি তাঁহার সেই সরল কথাগুলি শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম ও বিনাবাক্যে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলাম।

পথে চলিতে চলিতে ভদ্রলোকটী ক্রমশঃ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী এমন সম্ভ্রমসূচক যে, তাহাতে আমার মনে বড়ই তৃপ্তি হইল। আমি যে আজই বৃন্দাবন আসিয়াছি, এখনও গোবিন্দ-দর্শন অথবা স্নানাহার কিছুই হয় নাই, তাহাও ক্রমশঃ তিনি জানিয়া লইলেন। গৃহিণী আমাকে বাসায় লইয়া গিয়াই ফল মূল মিষ্ট ইত্যাদি দিয়া জলযোগের আয়োজন করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, "মা, আমি এখনও গোবিন্দ-দর্শন পাই নাই আর তাঁহার প্রসাদও পাই নাই, কেমন করিয়া খাইব।" গৃহিণী আমার কথা শুনিয়া লোক সঙ্গে দিয়া আমাকে গোবিন্দ দর্শনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

যখন মন্দিরে গেলাম, তখন ঠাকুরের আরতি হইতেছে। খুবই ভিড়, কিন্তু ভিড়ে আর আমার কি করিবে, সমস্ত ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম—শ্রীমুখের সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপ নৃত্য করিতেছে, মুহুর্মুহুঃ প্রদীপালোকে যেন রূপতরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে। নাকে নোলক দুলিতেছে। আমি জ্ঞান হারাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের—

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো!!

শ্লোক পড়িতেছি, আর একদৃষ্টে মুখচন্দ্রমা দেখিতেছি। কি করিতেছি, কোথায় আছি, এ কোন্ স্থান, কিছুই আমার মনে নাই। লোক আছে কি নির্জ্জন স্থান, সে বোধও আমার নাই। আমার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, আমি তাহা জানি না। ঠাকুরের সম্মুখে নগ্নমস্তকে দাঁড়াইতে নাই, বৃন্দাবনের এই নিয়ম। আমার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া চারিপাশ হইতে অনেকেই "নঙ্গা শির" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ কেহ বা আমাকে গালিও দিতেছে, কিন্তু সে সকল শব্দের একবর্ণও আমাব কাণে যাইতেছে না। অবশেষে একজন আমার পিছন হইতে সজোরে আমাকে এক ধাক্কা দিল। আমি "নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণু" পড়িতেছি, আর নাকে সেই নোলক দুলিতেছে দেখিতেছি, জগৎ আছে কি না আছে যেন তাহারও ধার ধারি না,—সহসা সেই প্রবল ধাক্কায় সচেতন হইলাম। সচেতন হইয়া আমার মত স্বভাবের পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই হইল, অর্থাৎ আমার ভয়ানক রাগ হইল। আমার সেই ক্রুদ্ধ নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া যে ধাক্কা দিয়াছিল, সে একটু অপ্রস্তত হইয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, "ঠাকুরের সম্মুখে খালি মাথায় থাকার জন্যই সে আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। অনেকে আমার মাথায় কাপড় দিবার জন্য চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, আমি শুনি নাই, তাই সে আমাকে ধাক্কা দিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে।" যে ধাক্কা দিয়াছিল, সে গোবিন্দজীর পূজারী। আমি রাগিয়া তাহাকে বলিলাম, "আমি খালি মাথায়

আছি বলিয়া তুমি আমাকে সাবধান করিতেছ, কিন্তু তোমার মাথায় কাপড় কই? স্বামীর সম্মুখে রমণীর বিনা অবগুণ্ঠনে থাকিতে নাই, এজন্য যদি মাথায় কাপড় দিবার দরকার হয়, তবে তুমি কেন বিনা অবগুণ্ঠনে আছ? এ বৃন্দাবন, ললিতা দেবীর রাজ্য, এখানে নন্দের নন্দন ছাড়া আবার অন্য পুরুষ কে আছে যে, সে বিনা অবগুণ্ঠনে থাকিবে?" আমার কথা শুনিয়া পূজারী প্রথমে যেন থতমত খাইয়া গেল, কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া ঠাকুরের গলা হইতে একছড়া মালা লইয়া আমার দিকে ছুড়িয়া দিল। মালাগাছি আসিয়া আমার মাথায় পড়িল, আমি মালা লইয়া তখনই কুটী কুটী করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি খণ্ডন।

(৬)

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।)

মহামুনি ব্যাসদেব-প্রণীত বেদান্তদর্শন নামক গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া আচার্য্য রামানুজ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উত্থাপিত অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহের মধ্যে সার ও অকাট্য বলিয়া আচার্য্য রামানুজ-সম্প্রদায় মধ্যে বিবেচিত হয়। এজন্য অদ্বৈতবাদীর পক্ষ হইতে আমরা আচার্য্যের শ্রীভাষ্য-অবলম্বনে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তিসমূহের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, আচার্য্যের শ্রীভাষ্য উক্ত বেদান্ত-দর্শনেরই ভাষ্য।

এই বেদান্তদর্শন গ্রন্থের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"; এই সূত্রের প্রথম পদ "অথ" শব্দ। এই "অথ" শব্দের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে

আচার্য্য রামানুজ যুক্তি-সাহায্যে যে ভাবে অদ্বৈতবাদীর জ্ঞানকর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদ নামক মতবাদটী খণ্ডন করিয়াছেন এবং অদ্বৈতবাদী তাহার উত্তর যে ভাবে দিয়া থাকেন, তাহা আমরা ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে তিনি শ্রুতি-প্রমাণ-সাহায্যে, যে ভাবে অদ্বৈতবাদীর উক্ত মতটী খণ্ডন করেন, এবং অদ্বৈতবাদী তাহার যেরূপ উত্তর দিতে পারেন, আমরা অদ্বৈতবাদীর পক্ষ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করিব।

বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার বিচারের বিষয়টী স্মরণ করিলে উভয়পক্ষের কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না, এজন্য প্রস্তাবিত বিচারের বিষয়টী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

আচার্য্য রামানুজ বলেন, উক্ত "অথ" শব্দের অর্থ অনন্তর অর্থাৎ কর্ম্ম বা পূর্ব্বমীমাংসা পড়িয়া কর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের পর। অদ্বৈত-বাদী আচার্য্য শঙ্কর বলেন—না—উহার অর্থ—অনন্তর, অর্থাৎ বেদান্তোক্ত চারি প্রকার বিশেষ সাধনের * পর। এরূপ অর্থ-বিরোধের কারণ—আচার্য্য রামানুজ জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী, অর্থাৎ তিনি বলেন, "জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই একত্র অনুষ্ঠান করিতে করিতে মুক্তি হয়। এই

---

* সাধনচতুষ্টয়:—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমাদি-ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু, আর সকলই অনিত্য—এইরূপ সদা সর্ব্বদা বিচার। ইহামুত্রফলভোগবিরাগ—ইহ-লোকের কামিনীকাঞ্চন ও পরলোকের স্বর্গ-অপ্সরাদি ভোগ্য বস্তুতে বৈরাগ্য। শমাদি ষট্‌সম্পত্তি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। শম অর্থে মনঃ-সংযম। দম অর্থে ইন্দ্রিয়সংযম, উপরতি অর্থে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক লৌকিক ও বৈদিক সর্ব্বাবধ কর্ম্ম যথাসম্ভব ত্যাগ, তিতিক্ষা অর্থে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ শান্তচিত্তে সহ্য করা, শ্রদ্ধা অর্থে গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, সমাধান অর্থে ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা। মুমুক্ষুত্ব—সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য একান্ত ব্যাকুলতা।

এই কয়েকটি সাধন অভ্যস্ত হইলে তবে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হয়, তবেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

মুক্তির কারণ—জ্ঞানের ফল, 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও কর্ম্মের ফল 'ভগবৎপ্রসাদ' উভয়ই, এককালে যখন সমুচ্চিত অর্থাৎ মিলিত হয়, তখন মুক্তিলাভ ঘটে। বেদান্ত-শাস্ত্রে এই মুক্তির জন্য যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে জীব ও ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ আবশ্যক, আর সেই জন্য বেদান্তে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে বেদান্তের বাক্যার্থ হইতে যে জ্ঞান হয় তাহাই, এবং কর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রমবিহিত যজ্ঞ, দান ও হোমরূপ কর্ম্ম বুঝায়। এই কর্ম্ম আবার দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। সকামের ফল—ভোগ ও বন্ধন, নিষ্কামের ফল—ভগবৎপ্রসাদ-লাভ। উপাসনা ও ধ্যান—যজ্ঞেরই অন্তর্গত।"

আচার্য্য শঙ্কর বলেন—জ্ঞানের ফলই মুক্তি। মুক্তিতে একই কালে একই ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত জ্ঞানকর্ম্মের ফল সমুচ্চিত অর্থাৎ মিলিত হইবার আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় মাত্র, তৎপরে জ্ঞানের ফলে জীবব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান হয়, এবং তখন মুক্তিলাভ ঘটে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ, তাহার সে কর্ম্মেরও প্রয়োজন নাই। তাহার কেবল জ্ঞানের ফলেই মুক্তি ঘটে। তবে যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, তাহার নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইয়া বেদান্তের বাক্যার্থ হইতে জ্ঞান হয়। এইরূপে তাহাদের পক্ষে দুইই প্রয়োজন হইতে পারে। ইঁহার মতে জ্ঞান বলিতে বেদান্তের বাক্যার্থ হইতে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য জীবব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান বুঝায়। ইহা সাধারণতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রম-বিহিত যজ্ঞ, দান ও হোম বুঝায়। ইহা দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। সকামের ফল—ভোগ ও বন্ধন, নিষ্কামের ফল চিত্ত-শুদ্ধি, ইহার ফল জ্ঞান নহে; অথবা আচার্য্যরামানুজ মতের ন্যায় ইহার ফল ভগবৎপ্রসাদও নহে; যেহেতু নির্গুণের প্রসন্নতা বা ফলদান-সামর্থ্য অসঙ্গত, আর থাকিলে নির্গুণত্বেরই হানি হয়। যজ্ঞ বলিতে যদিও দ্রব্যযজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ, জপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞ বুঝায়, তথাপি কর্ম্মপদবাচ্য যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, জ্ঞানযজ্ঞের

ফল ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি,কিন্তু কর্ম্মপদবাচ্য যজ্ঞে উক্ত ফল ভিন্ন অন্য একটা না একটা ফল হইয়া থাকে। উপাসনাও ধ্যানযজ্ঞের অন্তর্গত, কিন্তু নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা ও ধ্যান কর্ম্মপদবাচ্য নহে, উহা তখন জ্ঞানানুষ্ঠানের অন্তর্গত। ধ্যান বলিতে নিদিধ্যাসন বুঝায় ও উপাসনা তখন মননের স্থানীয় হয়। মুক্তির জন্য বেদান্তে এই জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণিত হইতে দেখা যায় মাত্র, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের মত বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কোন বিধান দেওয়া হয় নাই। জীব যখন ঘটনার চক্রে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে স্বভাববশে 'ব্রহ্ম কি' জানিবার জন্য অভিলাষী হয়, তখন তাহার জিজ্ঞাসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বেদান্তে ব্রহ্মের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মকে 'জান' বলিয়া আদেশ করা হয় নাই। ইহাতে জিজ্ঞাসার উত্তর আছে, জিজ্ঞাসার বিধি নাই।

যাহা হউক, মোটামুটি এই প্রকার মতভেদের ফলে উভয় বাদীর মধ্যে বিচারের বিষয়টী এইরূপ সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিয়াছে ;—

১। উভয়েই বলেন, অবিদ্যা-নিবৃত্তিতে মোক্ষ হয়।

২। আচার্য্য রামানুজ বলেন, বেদান্তের বাক্যার্থজ্ঞানমূলক উপাসনা হইতে মোক্ষ হয়।

৩। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, বেদান্তের বাক্যার্থজ্ঞানেই মোক্ষ হয়।

এতদনুসারে আচার্য্য রামানুজ লৌকিক যুক্তি অবলম্বনে যাহা বলেন এবং অদ্বৈতবাদী তাহার যেরূপ উত্তর দিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রুতিসাহায্যে তিনি যাহা বলেন এবং অদ্বৈতবাদীর পক্ষ হইতে তাহার যেরূপ উত্তর হইতে পারে, তাহাই আলোচ্য। .

যাহা হউক আচার্য্য রামানুজ এতদুদ্দেশ্যে প্রথমে, "ধ্যানের উদ্দেশ্যে বেদান্তে ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করা. হইয়াছে," ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎপরে "উপাসনার উদ্দেশ্যে বেদান্তে ব্রহ্মের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে" তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অপর কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এমন ধ্যানের উদ্দেশ্যে বেদান্তে ব্রহ্মের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য আচার্য্য রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই,—

"তথা চ শ্রুতয়ঃ—বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২১), অনুবিদ্য বিজানাতি (ছান্দোগ্য ৮।৭।১); ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্ (মুণ্ডক ২।২।৬), নিচায্য তন্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে (কঠ ৩।১৫), আত্মানমেব লোকম্ উপাসীত (বৃহদারণ্যক ১।৪।১৫) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬), সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (ছান্দোগ্য ৮।৭।১), ইত্যেবমাদ্যাঃ।"

অর্থাৎ "এতদর্থে শ্রুতিসমূহ যথা,—(ধীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে) উত্তমরূপে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা (অর্থাৎ ধ্যান) করিবে (বৃঃ ৪।৪।২১); অনুবেদন অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যের ভূয়োভূয়ঃ আলোচনা করিয়া জানিবে অর্থাৎ চিন্তা করিবে (ছাঃ ৮।৭।১), তুমি আত্মাকে ওঁকাররূপেই ধ্যান কর (মুঃ২।২।৬); জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তিলাভ করে (কঠ ৩।১৫), আত্মারূপ লোককেই উপাসনা করিবে (বৃঃ ১।৪।১৫), অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে (বৃঃ ২।৪।৫ এবং ১।৫।৬); তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি।"

ইহার পর আচার্য্য ইহা হইতে যেরূপে বেদান্তের মধ্যে ধ্যানের বিধান করা হইয়াছে প্রমাণিত হয়, তাহাই বলিয়াছেন। যথা আচার্য্যবাক্য,—

"অত্র 'নিদিধ্যাসিতব্য' ইত্যাদিনা ঐকার্থ্যাৎ 'অনুবিদ্য বিজানাতি' 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' ইত্যেবমাদিভিঃ বাক্যার্থজ্ঞানস্য ধ্যানোপকারকত্বাৎ তদনুবিদ্য বিজ্ঞায়েত্যনূদ্য প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত বিজানাতীতি ধ্যানং বিধীয়তে। শ্রোতব্য ইতি চ অনুবাদঃ, স্বাধ্যায়স্য অর্থপরত্বেন অধীতবেদঃ পুরুষঃ প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্ব-দর্শনাৎ তন্নির্ণয়ায় স্বয়মেব শ্রবণে প্রবর্ত্ততে, ইতি শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাৎ। শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থত্বাৎ মননস্য মন্তব্য ইতি চানুবাদঃ তস্মাদ্ ধ্যানমেব বিধীয়তে। বক্ষ্যতি চ "আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ" ইতি (ব্রহ্মসূত্রং ৪।১।১)।"

"অর্থাৎ এস্থলে নিদিধ্যাসনের সহিত ধ্যানের অর্থগত ঐক্য রহিয়াছে, এবং বাক্যার্থজ্ঞানও ধ্যানেরই উপকারক; এই কারণে বুঝিতে হইবে যে 'অনুবিদ্য বিজানাতি' 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অনুবেদন অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুবাদ (অর্থাৎ

অবধারিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ) করিয়া 'প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' ও 'বিজানাতি' কথায় ধ্যানই বিহিত হইয়াছে। আর "শ্রোতব্য" কথাটীও পূর্ব্ববৎ অনুবাদ। কারণ, স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ (কেবল বেদের শব্দরাশির পাঠ মাত্র নহে') পঠিত বিষয়ের অর্থজ্ঞানই ঐ শব্দের দ্বারা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং যে পুরুষ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি উহাতে প্রয়োজনীয় অর্থ কিছু বুঝাইতেছে দেখিয়া সেই অর্থ নির্ণয়ের জন্য আপনা আপনিই শ্রবণে প্রবৃত্ত হন। অতএব (স্বাধ্যায় যেখানে বিহিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই) শ্রবণের বিধানও পাওয়া গিয়াছে (এখানে সেই পূর্ব্বপ্রাপ্ত বিধির পুনরুল্লেখমাত্র করা হইয়াছে)। শ্রুতার্থকে স্থিরতর করাই মননের প্রয়োজন, সুতরাং মননও শ্রবণের অধীন বা অপেক্ষিত।) অতএব 'মন্তব্যঃ' অর্থাৎ মনন করিবে, একথাটীও অনুবাদ। ফলে এখানে একমাত্র ধ্যানই বিহিত বা প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। সূত্রকারও "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ" এই সূত্রে ধ্যানেরই পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিবেন।"

যাহা হউক এই শ্রুতিগুলি হইতে আচার্য্য রামানুজ দেখাইলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের পর আরও কিছু "করিবার" ব্যবস্থা রহিয়াছে। যদি বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞানই লক্ষ্যরূপে কথিত হইত, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের পর আবার উক্ত "করিবার" ব্যবস্থা দেখা যাইত না। এই করিবার ব্যবস্থার মধ্যে যে ধ্যান ও উপাসনা ব্যাপার নিহিত, তাহাও কাহাকেও কষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে না, কারণ, "ধ্যায়থ আত্মানম্‌" ও "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" এই শ্রুতিদ্বয়ে ধ্যান ও উপাসনার কথা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, অদ্বৈতবাদী এতদুত্তরে কি বলিতে পারেন। অদ্বৈতবাদী বলিবেন—আচার্য্য রামানুজ নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ যেমন শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ শ্রুতি প্রমাণ দিতে পারি, অধিকন্তু আমাদের শ্রুতিপ্রমাণগুলি আচার্য্য রামানুজ-উদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণগুলি হইতে বলবত্তর এবং স্পষ্টতর; আর এইজন্য আমাদের মতই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায়; এবং আচার্য্য রামানুজের মত শ্রুতির প্রকৃত

অভিপ্রায় নহে। দ্বিতীয় কথা এই যে, আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত শ্রুতিগুলিরও আমরা আমাদের মতে যেরূপ সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে পারি, তিনি আমাদের উদ্ধৃত শ্রুতিগুলির সেরূপ সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। আমাদের মতের শ্রুতিগুলি এই ;—

১। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮) অর্থাৎ তাঁহাকেই জানিয়া অতিমৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া যায়, অয়নের (মুক্তির) অন্য পথ নাই। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়,—অন্য উপায়ে মুক্তি হয় না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

২। জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ। (শ্বেতাশ্বতর ১।১১) অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানিয়া সকল বন্ধন ক্ষয় হয়। এতদ্দ্বারা জ্ঞানের পরই মুক্তি বলা হইল।

৩। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। (মুণ্ডক ৩।২।৯) ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হয়।

এতদ্দ্বারা জ্ঞানের পর মুক্তি হয় বলা হইল এবং জ্ঞান ও ব্রহ্ম হওয়ার ভিতর অন্য কোন উপায় থাকিতে পারে না, তাহাও বেশ স্পষ্ট-ভাবে কথিত হইল।

৪। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে (মুণ্ডক ২।২।৮) সেই পরাবর (অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ ও কার্য্যরূপে নিকৃষ্ট) পরমাত্মাকে দেখিলে তাহার কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হয়। এতদ্দ্বারা পরমাত্মদর্শনের পরই কর্ম্ম-ক্ষয়ের কথা কথিত হইল। বস্তুতঃ পূর্ব্বকর্ম্ম পরবর্ত্তী কর্ম্মের একটা হেতু হইয়া থাকে, এবং এই পরমাত্মদর্শনও মনশ্চক্ষে দর্শনের মত দর্শন নহে; কারণ, স্থূল চক্ষেই হউক অথবা মনশ্চক্ষেই হউক উভয় চক্ষেই রূপ দর্শন হয়। পরমাত্মা কিন্তু "অরূপ"—সুতরাং ইঁহার দর্শন অর্থ পরমাত্মা হইয়া যাওয়া, অন্য কিছু নহে। এজন্য কর্ম্মক্ষয়ে কর্ম্মের অভাবই কথিত হইল এবং পরমাত্মদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলা হইল। সুতরাং এ শ্রুতি হইতে জ্ঞানের পর কর্ম্ম থাকে না, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

৫। অভয়ং বৈ প্রাপ্তোঽসি জনক।—(বৃহদারণ্যক ৪।২।৪।)

হে জনক! তুমি অভয় অর্থাৎ পরমাত্মবস্তুই প্রাপ্ত হইয়াছ। এখানেও পরমাত্মার স্বরূপ শ্রবণের পর জনককে এই কথা বলা হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানের পরই ব্রহ্মলাভ হয়, প্রমাণিত হইতেছে।

৬। তদাত্মানমেব অবেদ্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তিনি (জীবভাবাপন্ন ব্রহ্ম) আপনাকে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আমি ও ব্রহ্ম অভিন্ন হয়, প্রমাণিত হইতেছে এবং তাহার ফলে তখন "আমি ব্রহ্মকে ধ্যান করি" বা "উপাসনা করিতেছি" ইত্যাকার দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যভাব অথবা জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় ভাব থাকে না, তাহাই সিদ্ধ হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত "ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি," "ব্রহ্মকে জানিবে" ইত্যাদি ভাবের এবং কেবল ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনাত্মক অসংখ্য শ্রুতি আছে, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। আচার্য্য রামানুজ যেমন তাঁহার মতানুকূল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিবার জন্য কয়েকটী মুখ্য শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ এস্থলে আমাদের মতানুকূল কতিপয় মুখ্য শ্রুতি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

এই সব শ্রুতি হইতে দুইটী বিষয় প্রমাণিত হইতেছে যথা,—প্রথম জ্ঞানের পরই মুক্তি অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বের সাধন জ্ঞান, এবং দ্বিতীয়, উক্ত মুক্তিতে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পথ নাই, তাহার উল্লেখ। সুতরাং আচার্য্য রামানুজের ধ্যান ও উপাসনা যদি জ্ঞানের অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কিছু হয়, তাহা হইলে তাহা বেদান্তের উপদেশ হইতে পারে না বলিতে হইবে।

এইবার দেখা যাউক, আমাদের উদ্ধৃত শ্রুতিগুলি আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত শ্রুতিগুলি হইতে বলবত্তরা কিসে?—আমরা "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" অর্থাৎ "তাঁহাকেই জানিয়া অতিমৃত্যু লাভ করা যায়, অয়নের আর অন্য পথ নাই" এই যে শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিয়াছি, ইহাতে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পথ নাই এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহা সাধারণতঃ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়-বর্ণন-বিষয়ক যত শ্রুতি আছে তাহা অপেক্ষা বলবত্তর হইতে বাধ্য। যেমন যদি কেহ বলে, "অন্নে

পুষ্টি হয়,” তাহা হইলে এই বুঝায় যে অন্নে পুষ্টি হয় এবং গোধুমাদি অন্য খাদ্যেও পুষ্টি অল্পবিস্তব হইতে পারে, অথবা নাও হইতে পারে। কিন্তু যদি বলা যায়, “অন্ন ব্যতীত পুষ্টি হয় না,” তাহা হইলে “অন্নে পুষ্টি হয়” ইহাও যেমন বলা হইল, তদ্রূপ “গোধুমাদি অন্য খাদ্যে অল্পবিস্তর *কোন প্রকার পুষ্টি হয় না” ইহাও বলা হইল। আমাদের উদ্ধৃত শ্রুতি* মধ্যে এই প্রকার ইতবনিরাসের (অন্য পক্ষকে নিরস্ত করিবার) কথা রহিয়াছে, পক্ষান্তরে আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত শ্রুতিতে সেরূপ ইতর-নিরাসের কথা নাই। তিনি যদি এমন কোন শ্রুতি দেখাইতে পারিতেন যে, ব্রহ্মেব ধ্যানোপাসনাদি ভিন্ন মুক্তিব অন্য পথ নাই, তাহা হইলে তাঁহাব মতটী আমাদেব মতের সহিত সমান বলবান্ হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই এবং অপরেও পারিবেন না। কারণ, উভযবাদিস্বীকৃত সমগ্র বেদান্তের ভিতবই এমন কোন কথা নাই। এইজন্য বলিয়াছি, আমাদের উদ্ধৃত শ্রুতিগুলি আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত শ্রুতিগুলি হইতে বলবত্তরা। যদি বলা হয়, “তমেব বিদিত্বা” এই শ্রুতিতে এমন কোন কথা নাই, যাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিব পথ নাই। কারণ, “তমেব বিদিত্বা” অর্থাৎ তাঁহাকেই জানিয়া এই কথায় “তম্” পদের পর “এব” শব্দ থাকায়,—ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মুক্তি লাভ করিতে হইলে “তাঁহাকেই” জানিতে হইবে, “অন্য কিছু” জানিলে চলিবে না। কারণ, “এব” শব্দের দ্বারা যে ইতর-নিরাস-সূচক একটা জোর দেওয়া হইল, তাহা ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হইতেছে, “বিদিত্বা” পদ লক্ষিত জ্ঞানে প্রযুক্ত হইতেছে না। সুতরাং জানিয়া মুক্তি, কি জানিবার পর ধ্যানোপাসনাদির পর মুক্তি, তাহা এ বাক্যের লক্ষ্যীভূত বিষয় নহে।

উত্তর।—সত্য। কিন্তু “নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়” অর্থাৎ “মুক্তির অন্য পথ নাই” এ কথার দ্বারা “বিদিত্বা” পদ লক্ষিত জ্ঞানের উপরও উক্ত প্রকার ইতর-নিরাস-সূচক একটা জোর আসিয়া পড়িতেছে। কারণ, উক্ত বাক্যে পন্থা শব্দ দ্বারা জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইতেছে; যেহেতু উহার পূর্ব্বে “বিদিত্বা” শব্দের দ্বারা উপায়ভূত জ্ঞানের কথাই

রহিয়াছে এবং জ্ঞানকে বাস্তবিক পক্ষে সকলে পথই বলিয়া থাকে, যথা,—জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ, যোগপথ ইত্যাদি। সুতরাং "নান্যঃ পন্থা" বাক্যে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পথ নাই ইহাই কথিত হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যদি 'নান্যঃ পন্থা' বাক্যে "বিদিত্বা" পদ লক্ষিত জ্ঞানকে না বুঝাইয়া 'তম্' পদ লক্ষিত ব্রহ্মকে বুঝায় এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে শ্রুতিমধ্যে বৃথা পুনরুক্তি দোষ স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু 'তম্' শব্দের পর 'এব' শব্দ দ্বারা সে ইতরনিরাস কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

যদি বল এস্থলে পুনরুক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, শিষ্যবুদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যেও শ্রুতিমধ্যেও পুনরুক্তি আছে দেখা যায়। তাহা হইলে বলিব যে, অন্য কারণেও ব্রহ্মের জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিয়া সিদ্ধ হয়। দেখ—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই বাক্যে অন্য পথের নিষেধ করা হইতেছে, ইহা কাহারো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন এই পথটী কি? এতদুত্তরে বলিতে হইবে, "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ "ব্রহ্মকেই জানিয়া অতিমৃত্যু লাভ করা যায়," অন্য কিছু জানিয়া নহে। এস্থলে "অতিমৃত্যু" হইতেছে লক্ষ্য এবং "ব্রহ্মকেই জানা" হইতেছে উপায় বা পথ। যদি শ্রুতিদেবী এই জানার প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া ব্রহ্মের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি পথের পরিচয় পূর্ণরূপে দিলেনই না—বলিতে হইবে। কারণ, এই পথের অবয়ব দুইটী, একটী—ব্রহ্ম, অপরটী—জানা। ব্রহ্মবুদ্ধি ও জানাবুদ্ধি একত্র হইলে তবে পথবুদ্ধি জন্মিবে। সুতরাং "অন্য পথ নাই" বলায় এবং "তম্" পদের পর "এব" শব্দ থাকায় ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই। ইতরনিরাস ব্যাপারটী ব্রহ্ম এবং জ্ঞান উভয় পক্ষেই করা হইয়াছে। তাহার পর আরও এক কথা এই যে, এই শ্রুতিমধ্যে "এব" পদদ্বারা ব্রহ্মের ইতরনিরাস করা হইয়াছে বলিলে যে ব্রহ্মের জ্ঞানের ইতরনিরাস করা হয় নাই তাহা বলিবার উপায় নাই, কারণ, "এব" পদটী না থাকিলেও "অন্য পথ নাই" এই বাক্যাংশে কেবল জ্ঞানেরই ইতরনিরাস করা হইয়া যাইত, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আদৌ হইত না। ইহার

কারণ,—"তাঁহাকে জানিয়া" এই বাক্যের মধ্যে বিধেয় বা বাক্যের বক্তব্যাংশ "জানিয়া" অংশটী, "তাঁহাকে" এই অংশটীকে বিধেয় বলা চলে না। এই অবস্থায় শ্রুতিদেবী ব্রহ্মের ইতরনিরাসের জন্য "এব" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, ব্রহ্মের জ্ঞানের ইতরনিরাস কার্য্য "অন্য পথ নাই" এই বাক্যে পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই শ্রুতির দ্বারা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, "ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন" মুক্তির অন্য পথ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

অথবা এরূপও বলা যায় যে "ব্রহ্মকেই জানিয়া অতিমৃত্যু লাভ করা যায়" এই কথায় জানাই যে সর্ব্ববাদিসম্মত, সর্ব্বজনবিদিত উপায় এবং তাহাতে যে শ্রুতিদেবীর কোন উপদেশের অপেক্ষা নাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি যাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, তাহারা জানাকেই উপায় বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছে, সেই জন্য 'কি জানিলে' উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এস্থলে তাহাই বলিতেছেন। সুতরাং জানার প্রতি শ্রুতির লক্ষ্য কম হওয়া দূরে থাকুক বরং কিছু বেশী বলিতে হইবে। "ব্রহ্মকেই জানা একমাত্র পথ" তদ্ভিন্ন পথ নাই, ইহাই যদি 'বিদিত্বা' শ্রুতির বাক্যার্থ হয়, তাহা হইলে যাঁহারা এই জানাকে জানা ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা যে অত্যধিক আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অগত্যা এই শ্রুতিবাক্যে মুক্তিতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য পথ নাই, ইহাই বলা হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতের সাধনা।
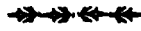
(৯) শিক্ষাকেন্দ্র।

"* * সমগ্র দেশে পরা ও অপরা বিদ্যাদির প্রচার আমাদিগকে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। কথাটা আপনারা বুঝিতেছেন কি? আপনাদের আন্তরিক আশা, আপনাদের কথাবার্ত্তা, আপনাদের চিন্তা, সমস্তই এই মহৎ কর্ত্তব্যটি অধিকার করুক; কারণ, এ ব্রত আপনাদিগকে উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন এ জাতির উদ্ধার নাই। আজকাল যে শিক্ষা আপনারা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার কতকগুলি সদ্‌গুণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার একটী প্রচণ্ড দোষ আছে—সে দোষ এমনই বিষম যে, আর সমস্ত গুণ তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ পরাভূত। প্রথমেই দেখুন, আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতেই জানে। এইরূপ অনবস্থামূলক বা অস্থিরতা-বিধায়ক শিক্ষা,—কিম্বা যে শিক্ষা কেবল 'নেতি'-ভাবই প্রবর্ত্তিত করায়, সে শিক্ষা,—মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। * * * মস্তিষ্কের মধ্যে নানা বিষয়ের বহু বহু তথ্য বোঝাই করিয়া, সে গুলিকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারাজীবন হট্টগোল বাঁধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষালাভ করা বলে না। সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমন ভাবে সুপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠিত করিতে পারে। পাঁচটী সৎভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে যিনি কেবলই একটী পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষাও তোমার শিক্ষা অনেক বেশী। * * * অতএব আমাদের লক্ষ্য এই যে, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয়

শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে ও যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।"

—মান্দ্রাজে প্রদত্ত "ভারতের ভবিষ্যৎ" নামক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি, ভারতে সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, কারণ, বহুর ভাব ও শক্তিকে আবশ্যকমত কেন্দ্রীভূত করিয়া একযোগে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার যে সমস্ত সদুপায় আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে সমস্ত সদুপায়ের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি। ইংরাজীতে যাহাকে organisation of thought and activity বলে, তাহা যথাযোগ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরাও এদেশে গড়িয়া তুলিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সমষ্টির সম্মুখে সর্ব্ববিধ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার অবারিত হইয়াছে, উহাকে বন্ধ করিবার আর উপায় নাই। সমষ্টির এই যোগ্য মর্য্যাদা সংকীর্ণ অধিকারিবাদের দ্বারা আর রহিত করা যাইবে না; সমষ্টিশক্তির বিকাশের পক্ষে এ মর্য্যাদা নিতান্ত আবশ্যক।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি ও প্রকৃতি কিরূপ এবং কিরূপ শিক্ষাকেন্দ্র সে শিক্ষার পক্ষে পরম উপযোগী। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভারতের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন নহে। ভারতের আদিযুগেই ভারতের ভাগ্যবিধাতা আর্য্যঋষি উহার ঐতিহাসিক লক্ষ্য ও জীবনাদর্শ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। অগণ্য রাজশক্তির উত্থানপতন, অগণ্য ধর্ম্মমূলক ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া আর্য্যসমাজ সেই জীবনাদর্শ ও লক্ষ্যের সাধনায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। উহাদের সনাতনত্বের উপরই ভারতীয় সর্ব্ববিধ আদর্শ ও সাধনার সনাতনত্ব আজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, নচেৎ ভারতীয় "জাতীয়তা"র অন্য প্রকার কোনও অর্থ নাই। ঐ সনাতন লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের আশ্রয় লইয়াই, আজ আমা-

দিগকে ভারতের বিশেষত্ব, জাতীয়তা বা national lines নিরূপিত করিতে হইবে। নূতন করিয়া আবার ভারতের লক্ষ্যনির্ব্বাচন করিবার আর উপায় নাই। মানুষের পক্ষে, নিজের পক্ষে "পরম অর্থ" কি, তাহা প্রাচীন ভারত চিরকালের মত নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে ও সেই নির্দ্দেশ অনুসারে সহস্র সহস্র বৎসর জীবনপথে ধাবমান হইয়াছে। এই বহুযুগের সংস্কার দিব্য প্রেরণার আকারে আমাদের জীবনের নেপথ্যে আজ বিরাজমান; প্রাচীন ভারতের চিরনির্দ্দিষ্ট—"পরম অর্থ" আজ বহুযুগ ধরিয়া ভারতে মনুষ্যোচিত সকল আদর্শ ও সাধনার স্থান-নির্দ্দেশ ও গতিনির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছে। আজ অভিনব পাশ্চাত্য তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা আমরা তাহাদের তাৎপর্য্য বা আমাদের ইতিহাসের মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ভারতের সেই প্রাচীন লক্ষ্য নির্ব্বাচন ও ব্যবস্থাকে অবহেলা করিতে পারি?

এক "পরমার্থ" শব্দের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। পরম অর্থ কি তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হইলেই মনুষ্যজীবনের সকল প্রকার প্রয়োজন ও সাধনার স্থাননির্দ্দেশ ও গতিনির্দ্দেশ হইয়া গেল। যদি বল, আধ্যাত্মিক উন্নতির পরম প্রয়োজনীয়তা পাশ্চাত্যরাও স্বীকার করে; তাহা হইলে বলিব, তাহারা মুখে এক কাজে আর এক, তাহারা তাহাদের সমষ্টিগত জীবনে ও সমবেত সাধনাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারে নাই, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা অন্যরূপ লক্ষ্য-নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ভারতের কথা স্বতন্ত্র; সহস্র প্রলোভনে বারবার আকৃষ্ট হইয়াও ভারতীয় সনাতন সমাজ ঋষিনির্ণীত পরমার্থকেই পরম অর্থরূপে আঁকড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে সমবেত শক্তি, যে অধ্যবসায়, যে ক্ষতিস্বীকার ও স্বার্থত্যাগ, সেই সমাজ অতীতে স্বলক্ষ্য-নিষ্ঠা বা পরমার্থপরায়ণতার খাতিরে দেখাইতে পারিয়াছে, তাহার দশমাংশও যদি কোনও সমাজ, রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনার খাতিরে দেখাইতে পারে, তবে সে আধুনিক রাজনৈতিক জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধি-কার করিতে পারে। সে লক্ষ্যনিষ্ঠার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই, সে গৌরবের কথা আমাদের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বুঝিতে বা দেখিতে

পান নাই, কারণ, তাঁহারা ইতিহাস বলিতে এইমাত্র বুঝেন যে, একটা দেশ রাজনৈতিক লক্ষ্যের অনুগমনে কিরূপ ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক এখনও বিকৃত হইয়া রহিয়াছে; ভারতীয় শিক্ষার (culture) সনাতন গতি ও প্রকৃতি বুঝিলেও কি তাঁহারা আজ সে শিক্ষার প্রচারকল্পে বদ্ধপরিকর হইবেন? বিষম সন্দেহ। তাঁহারা অতীত ভারতের প্রকৃত পরিচয় লাভ করেন নাই, বর্ত্তমান ভারতকে রাজনীতির মঞ্চ হইতে চিনিবার চেষ্টা করেন; তাঁহারা আধুনিক জগতের "সস্তা ভব্যতাকে" শিক্ষা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন,—নানা দেশের নানা সমাচারে মস্তিষ্ক বোঝাই করাকেই বিদ্যাবত্তার পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করেন। পরমার্থকে পরম অর্থ বলিয়া যদিই বা তাঁহারা স্বীকার করেন, তথাপি আপনাদিগকে ও সমগ্র দেশের শিক্ষাকে সেই পরমার্থের নিয়ন্তৃস্বাধীনে স্থাপিত করিতে কি তাঁহারা রাজি হইবেন?

পরমার্থের মুখ্য অর্থ হইল পরম প্রয়োজন। সেই পরম প্রয়োজন যে কি, সে সম্বন্ধে বৈদিক কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কখনও সন্দিহান হয় নাই। সেই পরম প্রয়োজনকে একমাত্র লক্ষ্যরূপে সাধন করিয়া ভারতবর্ষ এতাবৎকাল জীবনধারণ করিয়া আছে। মনুষ্যজীবনের আর সকল প্রয়োজন, এবং যখনই যে সমস্ত নূতন নূতন প্রয়োজন কাল-প্রভাবে উদ্ভূত হইয়াছে সে সমস্ত প্রয়োজন, ঐ পরম প্রয়োজনেরই অনুকূল গতি লাভ করিয়া উহারই সিদ্ধির দিকে নিয়মিত হইয়াছে। অতীতে এরূপ চেষ্টা কখনও সফল হইয়াছে, কখনও বা বিফল হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থরূপ লক্ষ্য হইতে ভারতের সনাতন সমাজ কখনও বিচ্যুত হয় নাই। দীর্ঘ বৈদিকযুগের বিপুল সংস্কার—অভাবনীয়, আকস্মিক উদ্দীপনারূপে বারম্বার সেই সমাজকে স্বীয় সনাতন লক্ষ্যের সাধনায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছে। আমরা "ভারতের সাধনায়" অতীত ইতিহাসের এ সমস্ত কৌশল আলোচনা করিয়াছি।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়মূলক পরমার্থের সাধনা, সংরক্ষণ ও প্রচারই যদি

ভারতের সনাতন লক্ষ্য হয়, তবে ভারতীয় শিক্ষার মূলপ্রকৃতি যে পরমার্থনিষ্ঠ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন বৈদিককালের ব্রহ্ম-বিদ্‌গণ বলিতেন যে, "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে"—"পরা চৈবাপরা চ"। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অর্থ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" অতএব সেই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে আমরা পরাবিদ্যাকে দেখিতে পাই। সে যুগে শিক্ষার (culture) এই কেন্দ্র যিনি অধিকার করিয়াছেন, তিনি প্রকৃতভাবে সুশিক্ষিত (cultured), তদ্ব্যতীত অপরে পল্লবগ্রাহী মাত্র। তার পর আর এক কথা এই যে, পরাবিদ্যা লাভ করা মানে প্রত্যক্ষ পরমার্থলাভ বুঝাইত,—"তত্ত্ব"লাভ করা বুঝাইত, তথ্যলাভ করা বুঝাইত না, (শ্বেতকেতু পরমার্থতত্ত্ব, অর্থাৎ পরমার্থ যাহা ঠিক ঠিক তাহাই, লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় নানা সূক্ষ্ম গবেষণা শিখিয়া আয়ত্ত করেন নাই)। অতএব শিক্ষা বলিতে সেকালে শুধুই একটা তল্পিদারী বুঝাইত না—"যথা খরশ্চন্দনভার-বাহী," শিক্ষা বলিতে কিছু "হওয়া", চিত্ত ও চরিত্রের একটা প্রত্যক্ষ, স্থায়ী, উন্নত পরিণাম বুঝাইত। সকল শিক্ষার ইহাই প্রকৃষ্ট ফল হওয়া উচিত। সেই বহু প্রাচীন বৈদিক যুগেই ভারতীয় শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল; উহা পরমার্থমূলক ও প্রকৃষ্ট-ফলপ্রদ। পরাবিদ্যারূপ শিক্ষার চরমসোপানে উন্নীত হইবার জন্য যখন দেবর্ষি নারদ যতিরাজ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া-ছেন, তখন তিনি যে সমস্ত অধীত অপরাবিদ্যার পরিচয় দিলেন, তাহাতে প্রায় সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু সনৎকুমার বলিলেন যে, সে সমস্তই নামমাত্রে পর্য্যবসিত (Classification and generalisation of phenomena attaching names to genera and species—ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানেরও কাজ, তবে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদিসাহায্যে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ [phenomena] লক্ষ্য করার পরিবর্ত্তে প্রাচীনকালে অনুমান ও প্রমাণের রীতি অনুরূপ ছিল।) এমার্সন সাহেবও একস্থলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রকৃতি ঐরূপ

ভাষায় বর্ণিত করিয়াছেন। নারদসনৎকুমারসংবাদে ভারতীয় শিক্ষার পরমার্থমূলকতা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

পরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভেও ভারতীয় শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যখন অষ্টাদশবিদ্যার প্রচলন ছিল, তখনও বেদই সর্ব্ববাদিসম্মত শিক্ষাভিত্তিরূপে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করিত। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্ব্বে, চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তি বেদের প্রয়োজনরূপে উক্ত হইলেও, মোক্ষফলই পরমার্থরূপে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইত এবং ছয় অঙ্গ, চার উপাঙ্গ ও চার উপবেদের প্রয়োজন পরমার্থের সহিত বিযুক্তভাবে বর্ণিত হইত না। ভারতীয় শিক্ষার এইরূপ সনাতন প্রকৃতি পরবর্ত্তী কালের বৈদিক সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে বরাবর অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ব্ব হইতেই বেদকে কর্ম্মকাণ্ডের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা বৈদিক সমাজকে কর্ম্মকাণ্ডের উপর স্থাপিত করিয়া সকল দিকেই উহার সংকীর্ণতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল এবং সেই উদ্যোগে বেদগুপ্তিরূপ সাধনায় এবং ষড়ঙ্গ, পুরাণ, কর্ম্মমীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ন্যায়, দর্শন বা মীমাংসা-শাস্ত্র, ও উপবেদগুলি কর্ম্মকাণ্ডপ্রধান সংকীর্ণ বৈদিকসমাজে অনুকূল আশ্রয় লাভ না করিয়া, অনেকাংশে প্রাচীনকেন্দ্রবিচ্যুত ও নানা বৈদিক ও অবৈদিক সম্প্রদায়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে বৈদিক অষ্টাদশবিদ্যা বহুলপরিমাণে বিলুপ্তাঙ্গ ও বিচ্ছিন্নাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। ন্যায় ও দর্শনের বৈদিক ও পারমার্থিক ভিত্তি অনেকস্থলে অদৃশ্য ও অনির্দ্দেশ্য হইয়া গেল; আয়ুর্ব্বেদও ঐ দশা প্রাপ্ত হইয়া নানা অবৈদিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নূতনভাবে গৃহীত ও অনুশীলিত হইতে লাগিল, গান্ধর্ব্ববেদও ঐ ভাবে বিক্ষিপ্ত ও পরমার্থের সহিত বিযুক্ত হইতে লাগিল, ধনুর্ব্বেদ একরূপ বিলুপ্ত হইল এবং অর্থশাস্ত্র নূতনভাবে নূতন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য পরমার্থবিচ্যুত হইয়া নূতন গতি লাভ করিল।

অষ্টাদশবিদ্যা যখন এইরূপে অসংহত ও বিকলাঙ্গ হইতেছে ও নানা বিদ্যা প্রাচীন কেন্দ্র ও কক্ষ হারাইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সেই সময় তক্ষশিলাব নাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ভারতীয় নানা প্রাচীন বিদ্যাকে সংগৃহীত করিয়া ভারতেতর দেশে নিক্ষিপ্ত করাতেই তক্ষশিলার ঐতিহাসিক সার্থকতা। তক্ষশিলায় যে পারমার্থিক ভিত্তির উপর নানা বিদ্যার অনুশীলন হইত, তাহা অনুমান হয় না। বৈদিক-সমাজকেন্দ্র তখন আত্মরক্ষার্থ সসঙ্কোচে দক্ষিণ-ভারতাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। তক্ষশিলায় সে যুগে বৈদিক প্রভাব উচ্চাসন অধিকার করিত না। তখন নানাপ্রদেশে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে ঘোর সমাজবিপ্লব চলিয়াছে, নূতন নূতন ক্ষত্রিয়জাতির উদ্ভব হইতেছে; যজ্ঞনিষ্ঠ বৈদিকসমাজ ব্রাহ্মণসেবক ক্ষত্রিয় রাজার সন্ধানে সসঙ্কোচে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, প্রাচীন বেদভিত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল অর্দ্ধবৈদিক আর্য্যসমাজে বেদানুগত সন্ন্যাসিগণ যজ্ঞাতিরিক্ত নূতন নূতন উপাসনাপদ্ধতির প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারাও উত্তরভারতের নব নব সমাজবিপ্লবে সচকিত ও স্তব্ধ হইয়াছেন, ভারতীয় সনাতন পরমার্থলক্ষ্য সমাজের পথ রুদ্ধ দেখিয়া অরণ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রয়ভাগী হইয়াছে। নবোত্থিত নানা সমাজের মধ্যে সে সময় তক্ষশিলা প্রসিদ্ধি লাভ করিল; সেই সকল সমাজের ক্ষত্রিয় বা ধনাঢ্য কুমারগণ তক্ষশিলায় বিদ্যার্থী হইতেছেন, কেন না পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ভারতীয় নানা বিক্ষিপ্ত বিদ্যা তক্ষশিলায় একত্রিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী কালে পারস্য প্রভৃতি দেশে ভারতীয় বিদ্যাদির নূতন একদফা প্রচার দেখা যায়। ঐ সকল বিদ্যার তরঙ্গ ভারতীয় পরমার্থসাধনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং তক্ষশিলায় অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া বিক্ষিপ্তভাবে নানাস্থান হইতে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, তারপর সে স্থল হইতে ঘাতপ্রতিঘাতে দূরবর্ত্তী অনার্য্যদেশসমূহে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

অষ্টাদশবিদ্যার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি সাক্ষাৎভাবেই বেদবিদ্যা হইতে উৎসারিত, অতএব উহাদের

পরমার্থমূলকতা একরূপ অনুস্যূত। উপবেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন মানবীয় সর্ব্ববিধ সাধনারই পক্ষে সর্ব্বাগ্রে অবধানযোগ্য—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। যে বলের কথায় শ্রুতি বলিতেছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—সনৎকুমার যাহার সম্বন্ধে বলিতেছেন, বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে—বিদ্যাচর্চ্চা, বাক্য, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান ও বিজ্ঞান অপেক্ষাও যে বলকে উচ্চস্থান দেওয়া হইতেছে—সেই বল রুগ্ন, অতএব ক্লিষ্টচিত্ত, ব্যক্তির আয়ত্তীভূত হয় না। সেই জন্য "চিকিৎসা-শাস্ত্রস্য চ রোগতৎসাধনরোগনিবৃত্তিতৎসাধনজ্ঞানং প্রয়োজনং" (মধুসূদন সরস্বতী)। এমন কি, আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত কামশাস্ত্রের প্রয়োজন কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সন্ন্যাসিপ্রবর লিখিতেছেন, "তস্য চ বিষয়বৈরাগ্যমেব প্রয়োজনং, শাস্ত্রোদ্দীপিতমার্গেণাপি বিষয়ভোগে দুঃখমাত্রপর্য্যবসানাৎ"। গান্ধর্ব্ববেদের প্রয়োজন কি? "দেবতারাধননির্ব্বিকল্পসমাধ্যাদিসিদ্ধিশ্চ গান্ধর্ব্ববেদস্য প্রয়োজনং"। আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্রের মত ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজনও সাক্ষাৎভাবে পরমার্থমূলক নহে, কিন্তু যে সমাজ পরমার্থসাধনায় মূলতঃ ব্যাপৃত থাকিবে, বিশেষ কতকগুলি বিঘ্ননিরাকরণরূপ একটা আনুষঙ্গিক প্রয়োজন তাহার আছে, সে প্রয়োজনসিদ্ধির ভার ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত এবং "ক্ষত্রিয়ানাং স্বধর্ম্মাচরণং যুদ্ধং দুষ্টদস্যুচৌরাদিভ্যঃ প্রজাপালনং চ ধনুর্ব্বেদস্য প্রয়োজনং"। কিন্তু এই ধনুর্ব্বেদের শিক্ষা রজোগুণাবলম্বনে হয় না, কারণ, যে মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত আয়ুধসকলকে ধনুর্ব্বেদে ধনু বলা হইয়াছে, তাহাদের অধিদেবতা ও মন্ত্র আছে, অতএব দেবতাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করা আজকালকার রজঃসর্ব্বস্ব যোদ্ধাদের কর্ম্ম নহে। ভারতীয় প্রাচীন পরমার্থসাধক সমাজের ক্ষত্রিয়গণই ধনুর্ব্বেদের অধিকারী ছিলেন, তাই কলিযুগের ক্ষত্রিয়ম্মন্য নূতন যোদ্ধাদের সময়ে ধনুর্ব্বেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কতদূর চিত্তজয়ী হইলে তবে প্রকৃত ক্ষাত্রিয় হওয়া যায়, কতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে তবে

ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, আর ভুলিয়া গিয়াছি যে, পরমার্থরূপ প্রয়োজনের নিকট দাস্য গ্রহণ করে বলিয়াই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করা,—ক্ষত্রিয় রাজনৈতিক উচ্চাশার দাস নহে। চতুর্থ উপবেদ "অর্থশাস্ত্রং চ বহুবিধং নীতিশাস্ত্রং অশ্বশাস্ত্রং গজশাস্ত্রং শিল্প-শাস্ত্রং সূপকারশাস্ত্রং চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্রং চেতি।" যখন সকলপ্রকার অর্থ বা প্রয়োজনের সাধনা নির্ব্বেদদ্বারের মধ্য দিয়া মানুষকে ক্রমাগত পরমার্থের দিকে ধাবিত করে, তখনই সমাজের সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থা; আর্য্যসমাজ সে অবস্থা লাভ করিয়া একসময় সর্ব্ববিধ অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিত। যে সমাজ পরমার্থকেই লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়া পরমার্থপথের পথিক হইয়াছে, সকল লৌকিক অর্থের যথার্থ উৎকর্ষ ও সামঞ্জস্য তাহার পক্ষেই সম্ভব,—তাহাদের প্রকৃত ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা তাহার পক্ষেই সম্ভব,—যে সমাজ পরমার্থ-পথের পথিক হয় নাই, লৌকিক অর্থসমূহ তাহার অনর্থই ঘটাইতে থাকে এবং পরস্পর বিরোধভাবাপন্ন হইয়া অশান্তি উৎপন্ন করে। আজকাল পাশ্চাত্য জগতে এরূপ অনর্থ ও অশান্তি তুমুল আকার ধারণ করিতেছে।

কিন্তু অষ্টাদশবিদ্যার সুদিন বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বেই অস্তমিত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে দেখা যায়, অষ্টাদশবিদ্যা পরমার্থসূত্রে সুসম্বদ্ধ ও সুসংহত না হইয়া সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত ও বিসদৃশভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থা আমরা পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছি। ভারতীয় শিক্ষার (culture) এই সর্ব্বাঙ্গ-বিচ্ছিন্ন (disorganised) ও ভগ্নাবয়ব (dismantled) অবস্থার মধ্যে বৌদ্ধযুগের আবির্ভাব ঘটিল। সাক্ষাৎভাবে বেদভিত্তিহীন হইলেও যে পরমার্থদৃষ্টির দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় সমাজে নূতন সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিল, সেই পরমার্থদৃষ্টির তাড়িতসম্পাতে ভারতীয় শিক্ষায় আবার নূতনভাবে প্রাণসঞ্চার ও অঙ্গযোজনা হইতে লাগিল। পরমার্থভিত্তি লাভ করিবামাত্র ভারতীয় শিক্ষা (culture) আবার সর্ব্বাঙ্গসংহত (reorganised) হইতে লাগিল। ভারতীয় শিক্ষার ইহাই একটী মৌলিক

রহস্য, বর্ত্তমানযুগে শিক্ষাসমস্যা লইয়া যাঁহাদের মস্তিষ্ক ঘর্ম্মাক্ত, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া এই রহস্যটী হৃদয়ঙ্গম করিতে বলি। যদি আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা বা cultureকে পুনর্ব্বার আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া সর্ব্বাঙ্গসংহত ও সুসমন্বিত (organised) করিতে হয়, তবে পরমার্থসাধনার পুনরভ্যুদয়কে সর্ব্বাগ্রে উহার ভিত্তি-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাকে "জাতীয় শিক্ষা" নাম দিয়া আমরা উচ্চ কলরব করিতেছি, সে শিক্ষার "জাতীয়ত্ব" এই রহস্যের মধ্যে নিহিত।

ভারতীয় শিক্ষার পঙ্কিল, রুদ্ধগতি প্রবাহ বৌদ্ধযুগে যেন একটী নূতন খাত প্রাপ্ত হইল, সে খাত পরমার্থসাধনাদ্বারা কর্ত্তিত, অতএব ভারতীয় শিক্ষা সেই খাত আশ্রয় করিয়া ভারতকে প্লাবিত করিল। কিন্তু প্রাচীন খাতের সহিত এই নূতন খাতের সম্যক্ যোগ স্থাপিত হয় নাই, সেইজন্য অদীর্ঘকালেই প্রবাহ মন্দীভূত হইল,—শিক্ষা, গতি হারাইয়া আবার পঙ্কিল হইয়া উঠিল। শঙ্করাবির্ভাবের পর এই শিক্ষার প্রবাহ আবার প্রাচীন খাতে পরিচালিত হইল। সে সময় ভারতীয় সনাতন সমাজ সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে*; প্রায় কলিযুগের সূচনা হইতেই, অজস্র নব নব জাতির আবির্ভাব ও অভ্যুদয়ে, বৈদিক আর্য্যসমাজের আদর্শ ক্রমাগত সামাজিক বিপ্লবের সহিত চতুর্দ্দিকে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে বিজয়লাভের জন্য যুঝিতেছিল, শঙ্করাবি-র্ভাবের পর দেখা গেল যে, সেই আদর্শ সমগ্র ভারতকে আত্মসাৎ করিয়াছে।

কিন্তু একই পারমার্থিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও, সে যুগের এই বিশাল ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা সনাতন শিক্ষা বা cultureএর প্রকৃত সমন্বয় ও পুনরভ্যুদয়ের পক্ষে অনুকূল ছিল না। যাহা উদরস্থ করা যায়, তাহাকে সম্যক্‌রূপে পরিপাক করা একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; ভারত-প্রচলিত অনেক অনার্য্যসেবিত অবৈদিক ভাব ও আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্মরূপ পাকযজ্ঞে নূতন পরিণাম লাভ করিয়া উহার

* "ভারতের সাধনা"—সমাজ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধদ্বয়।

অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল; সেগুলি দুষ্পাচ্য হইলেও, বৈদিক সনাতন আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত উহাদিগকেও আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। সে সমস্ত হজম করা যে সময়-সাপেক্ষ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু অধিক সময় লাগিলেও, ঐরূপ পরিশ্রমের ফলে বৈদিক পরমার্থসাধনার মধ্যে যে অত্যদ্ভুত সমন্বয়শক্তির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহা একটী অমূল্য লাভের বিষয়, এই সমন্বয়শক্তিব প্রয়োগে ভাবতের সর্ব্বত্র পবমার্থসাধনায় বহুবিধ ক্রম, সোপান ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং বর্ত্তমানযুগে স্বামী বিবেকানন্দ জগতে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন যে, ভারতীয় পরমার্থসাধনাব সমন্বয়-শক্তি অসীম, উহা বসুন্ধরার মত পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মকে ক্রোড়ে স্থান দিতে পাবে।

বাস্তবিকই ঐ সমন্বয়শক্তি প্রাদেশিক ভাষাগত ও আচারগত সমস্ত ভেদকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া, শাঙ্করযুগের পব হইতে এ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে বহুবিধ উপধর্ম্ম ও সাধনপদ্ধতির ভিতর দিয়া কিরূপে সনাতন বৈদিক, পরমার্থ-সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া আসিয়াছে, তাহা ভাবিলে চিত্ত বিস্ময়াপ্লুত হয়। এই অত্যদ্ভুত কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক সাহিত্য ও কাব্যাদির সাহায্যে লোকশিক্ষার কাজও অগ্রসর হইয়াছে, এবং সে শিক্ষায় ভাবতীয় শিক্ষার সনাতন গতি ও প্রকৃতি স্বভাবতঃই রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের সমন্বয়শক্তির পূর্ব্বোক্ত ভারতব্যাপী লীলাবিস্তারেব একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ এই যে, সমস্ত ব্যাপারটী স্বতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, প্রত্যক্ষ কোনও কেন্দ্রশক্তি ভারতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নানাস্থানে একযোগে ঐ ব্রত সাধন করায় নাই; নানা প্রদেশে অনেক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ঐ ভাবতব্যাপী অনুষ্ঠানে নিয়ন্তৃত্ব করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে কখনও একজোট হইয়া কার্য্য করেন নাই বা সে ভাব প্রদর্শন করেন নাই। প্রত্যক্ষক্ষেত্রে এই সংহতি ও একযোগিতার অভাব বৌদ্ধযুগের পর হইতে ভারতীয় সনাতন সমাজে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহার প্রকৃষ্ট হেতুও বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বোক্ত এক পারমার্থিক সমন্বয়শক্তি ব্যতীত প্রত্যক্ষক্ষেত্রে আর কোনও শক্তি ঐ

সমাজে বা জনসমষ্টির মধ্যে একত্ব বা সমতা বিধান করিবার পক্ষে কার্য্য করিতেছিল না। বেদভিত্তিতে পুনঃস্থাপিত ঐ ভারতব্যাপী বিশাল সমাজ আপনাকে আপনি বুঝিত না, কারণ, মুসলমানাগমনের পূর্ব্বে অপরের তুলনায় আত্মদৃষ্টি উদ্রিক্ত হইবার অবসর হয় নাই। আবার ভাষা ও আচারব্যবহারের ভেদ সেই বিশাল সমাজের সর্ব্বত্র একটা খণ্ডিতভাবকে জাগ্রত করিয়া রাখিত এবং নানা প্রদেশখণ্ডের লৌকিক জীবনলীলা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সূত্রে গ্রথিত থাকায়, লোকের আত্মদৃষ্টি ক্রমাগতই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইতেছিল। তাহারা একটা ভারতব্যাপ্ত আত্মদৃষ্টি আরোপ করিবাব খুবই অল্প অবসর লাভ করিত। তাহারা কেবল একই পরমার্থরূপ প্রয়োজনসূত্রে পরস্পরের সহিত গ্রথিত ছিল এবং ইহারই আনুষঙ্গিকরূপে কতকটা এক রকম শিক্ষা বা বিদ্যানুশীলনের সূত্রেও সম্বদ্ধ ছিল, কিন্তু এই দ্বিবিধ প্রয়োজনসূত্রের বিরুদ্ধে শত প্রকারের প্রয়োজনসূত্র তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত বিশ্লিষ্ট করিবার পক্ষে কার্য্যকবী হইতেছিল।

একটা আত্মদৃষ্টিবিরল বিশাল সমাজে যখন এইরূপ অনৈক্যবিধায়িনী শক্তিরই অধিক প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আশা করা যায় না যে, উহার প্রাচীন শিক্ষা (culture) পুনরভ্যুদিত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া নূতন উন্নতিপথে ধাবমান হইবে। একটা দেশের জীবনলীলা সমসূত্রে গ্রথিত ও সুসংহত (organised) না হইলে, সে দেশের শিক্ষা (culture) সুসংহতভাবে (organised) উন্নতিপথে ধাবিত হয় না। যখন সেই বহুপ্রাচীন অল্পায়তন বৈদিক সমাজে অষ্টাদশ-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তখন সেই সমাজের জীবনজাল ঋষিদের দ্বারা এক ছাঁচে নিয়ন্ত্রিত হইত। অতএব যখন সনাতন আর্য্যসমাজ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সেই সময় হইতে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা সুসমন্বিতভাবে পুনরভ্যুদিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে দেশের নানাস্থানে প্রাচীন বিদ্যাদির অনুশীলন যে উপায়ে ও যে পরিমাণে হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু reorganisation of national culture বলিতে সনাতন শিক্ষার যে সর্ব্বাঙ্গীণ প্রাণ

সঞ্চার, কেন্দ্রসন্নিবেশ ও অব্যাহত অভ্যুদয় বুঝায়, তাহা, কতিপয় বৌদ্ধ শতাব্দীর উদ্দীপনা বাদ দিলে, কলিযুগের পর ভারতে আর দেখা যায় নাই। বৌদ্ধযুগের উদ্দীপনাতেও সনাতনত্বের হানি ঘটিয়াছিল এবং উহাতে ভারতীয় সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা (culture) আত্মপ্রকাশ করে নাই।

কিন্তু নৈরাশ্যের বা দুঃখের কোনও কারণ নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, চতুর্যুগবিভাগ কেবল ভারতেব পক্ষেই খাটে, অন্যদেশের পক্ষে নহে, এ নিগূঢ়তত্ত্বের অর্থ এই যে, ভারতেই কেবল অমর আদর্শ ইতিহাস গড়ে ও মানুষ গড়ে, অন্য দেশে মরণশীল মানুষই আদর্শ গড়ে ও ইতিহাস গড়ে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদিক আদর্শ বারম্বার আপনার অভিব্যক্তির অনুরোধে মানুষসমষ্টি গড়িয়াছে,—ইতিহাস গড়িয়াছে,—এবং কালধর্ম্মবশে গড়া জিনিস পচিলেই আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সেই অমর আদর্শ কলিযুগে ভারতকে আপনার লীলাক্ষেত্র রূপে আবার ব্যবহার করিবে, তাই বৌদ্ধযুগের অবসানাবধি সমগ্র ভারতে নূতন সাধকসমাজের পত্তন করিয়া লইল; তার পর উহার অদ্ভুত সমন্বয়শক্তির বিকাশ করিতে করিতে, উহাকে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বহির্জগৎ হইতে ভারতে আনয়ন করিল এবং অধুনা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ মহাসমস্যার সমাধান করিয়া, organisation-রূপ পাশ্চাত্য কৌশলের সাহায্যে ভারত যাহাতে প্রাচীন শিক্ষা ও সম্পদের পরমগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহারই বিপুল আয়োজন চলিয়াছে। অতএব হে আর্য্যসন্তান, তোমার অতীত নৈরাশ্যময় নহে,—প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হইয়া অতুল গৌরবে গৌরবান্বিত তোমার সুনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য আজ কৃতসঙ্কল্প হও।

ভারতীয় সনাতন শিক্ষা (culture)-কে নবোদ্ভাসিত পরমার্থ-দৃষ্টির দ্বারা re-organise করিবার জন্য আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগে উদ্যোগী হইতে হইবে; ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা পূরণ করিবার একমাত্র নির্দ্দিষ্ট পথ। নবোদ্ভাসিত পরমার্থদৃষ্টি কাহাকে বলে, তাহা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি! যে উপচীয়মান পারমার্থিক শক্তিভাণ্ডার আমাদের জন্য উদ্ঘাটিত করিতে পরমহংসদেব

অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শক্তিভাণ্ডারে অধিকার পাইয়া স্বামীজি পরমার্থদৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন; যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাসমস্যা পূরণে নেতৃত্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের নির্ব্বাণ যে পরমার্থদৃষ্টির সঞ্চার করিয়া শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় ঘটাইয়াছিল, বর্ত্তমানযুগে আবার সেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, এই পুনঃস্থাপিত পরমার্থকেন্দ্র হইতে মহাশক্তিপুঞ্জ বারম্বার বিচ্ছুরিত হইয়া, কালোচিত সুকৌশলে ভারতের সর্ব্ববিধ অতীতসাধনা ও সিদ্ধিকে নবজীবন দান করিবে।

কালোচিত সুকৌশলের অর্থ সমষ্টিশক্তির পরমার্থনিষ্ঠ বিকাশ ও উহার চিন্তা ও সাধনার কেন্দ্রৈকাবর্ত্তিত, সুসমন্বিত উন্নতিবিধান। (ইংরাজীতে বলা যায়—growth of collective life on a spiritual basis and progressive organisation of its thought and activity)। আমরা দেখিয়াছি, ভারতবর্ষে পরমার্থসাধনার কেন্দ্রই প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের উপযুক্ত ও সনাতন কেন্দ্র। অতএব এই কেন্দ্র হইতে আধুনিক যুগে কিরূপ আচার্য্যগণের দ্বারা সমষ্টিগঠন-যোগ্য শিক্ষা কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্ববিধ বিদ্যার পরমার্থমূলক তাৎপর্য্য ও গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, তাহাই আমরা আগামী বারে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, শিক্ষাকেন্দ্র যাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থাকে, শিক্ষা বা culture প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদেরই আয়ত্তাধীন।

কাশীতে শঙ্কর।

১

ক্রমে শঙ্কব দুর্গম অরণ্যানীপূর্ণ বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিলেন এবং দেখিলেন, সম্মুখে বহুদূরবিস্তৃত বিপুলায়তন শস্যশ্যামল সমতলক্ষেত্র যেন হাসিতেছে। এখানে আর দূরবর্ত্তী দিগ্বিদিগ্‌বিশ্রান্ত উন্নত শৈল-শ্রেণী অথবা গিরিসঙ্কটসমূহ অখণ্ড নভোমণ্ডলকে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারে পরিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে নাই, এখানে অনন্ত গগনমণ্ডল যেন তাঁহাব অনন্তমূর্ত্তি প্রকাশের সম্যক্ অবসর পাইয়াছেন। বিধাতা যেন এই সন্ন্যাসীদিগকে বিন্ধ্যারণ্যেব পবই এই পবিমুক্ত ক্ষেত্রে আনিয়া তাঁহাদিগকে বন্ধন ও মুক্তিব বিরুদ্ধভাবটী হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন।

ক্রমে তাঁহারা কলিকলুষনাশিনী তরলতরঙ্গায়িত তোয়মূর্ত্তি ভগবতী গঙ্গাদেবীকে দেখিতে পাইলেন। অনন্ততলে চক্রবালরেখা বিদীর্ণ কবিয়া জাহ্নবীদেবীকে প্রবাহিতা দেখিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দের মনে হইল, যেন ভগবতী সুবধাম পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কবিবার জন্য ঐ বুঝি আসিতেছেন।

শঙ্কর দূব হইতে গঙ্গাদেবীকে প্রণিপাত করিলেন। শিষ্যগণ সমস্বরে "গঙ্গামায়ীকি জয়" বলিয়া পুনঃ পুন আনন্দধ্বনি করিতে করিতে দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শারীরিক মানসিক অবসাদ যেন তৎক্ষণাৎ অপগত হইল, বহুদিনের পথশ্রম যেন তাঁহারা এককালে বিস্মৃত হইয়া গেলেন, তাঁহাদিগের হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। গঙ্গাদেবীর পূতবারিরাশি স্পর্শ কবিবার জন্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে এরূপ আগ্রহ উপস্থিত হইল যে, সেই পথশ্রমক্লিষ্ট প্রৌঢবয়স্ক সন্ন্যাসিগণ যেন বালকভাব প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহারা চঞ্চল বালকের ন্যায় ত্বরিতগতিতে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন কবিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা নয়নাভিরাম উন্মুক্ত হরিৎক্ষেত্র-মধ্য দিয়া কলনিনাদিনী ভাগীরথীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রিভুবনতারিণী জননী জাহ্নবীদেবীকে সম্মুখে দেখিয়া যোগিবর

শঙ্করের হৃদয়ে নানা পূর্ব্বসংস্কার জাগরূক হইল। তিনি গঙ্গামাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন।

ভক্ত শঙ্কর ভাবিলেন, "আহা, এই ঘোর কলিকালে মানব মোক্ষের জন্য সর্ব্বপাতকসংহন্ত্রী ভগবতী গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে কেন? কেনই বা সর্ব্বতীর্থসার গঙ্গাতীর অবহেলা পূর্ব্বক অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়? হায়! অবোধ মানব জানে না যে, এই গঙ্গাতীরে বাস করিয়াই তাহারা সর্ব্ববিধ পুণ্য লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে বাস করিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান এবং গঙ্গার বিমল বারি পান করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সৌভাগ্যবান্ আর কে আছে? সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িণী দেবী ভাগীরথী তাহার সর্ব্বদুর্ভাগ্য হরণ করিয়া তাহাকে পরম সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাকেন, এবং অন্তে সেই ব্যক্তি পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু হায়, মানবের কি দুর্ভাগ্য! এই গঙ্গাকে তাহারা সাক্ষাৎ মুক্তিদায়িনী গঙ্গা বলিয়া ভাবে না! তাঁহাকে তাহারা সামান্য নদী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। তাই গঙ্গাতীরে এখনও মনুষ্যের বসতি দেখা যাই-তেছে। না—না—তাহা নহে—পৃথিবীর নানা খণ্ডের মানবকুল মোক্ষ-লাভের পূর্ব্বজন্মে এই গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করে, তাই এখনও তীরদেশে মনুষ্যের বসতি দেখা যাইতেছে। নচেৎ এখানে দেবলোকের বসতি থাকাই উচিত। গঙ্গাতীরে বাস, তাঁহার দর্শন স্পর্শন ত দূরের কথা, শতযোজন দূর হইতে গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডাকিলে যখন মুক্তি-লাভ ঘটে, সেই গঙ্গার তীরে কি মনুষ্যের বসতি সম্ভব? না, কখনই নহে। তীরে বাস করিয়াও লোকের দুর্গতি দূর হয় না, ইহা কি সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয়! আহা, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গা দর্শন ও স্পর্শনকালে ভক্তিভরে গঙ্গার মাহাত্ম্য স্তোত্র পাঠ করিতে পারে, তাহার কি কোনও বাসনা অপূর্ণ থাকিতে পারে?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যোগিবর শঙ্করের গঙ্গামাহাত্ম্যসূচক একটি স্তোত্র রচনা করিবার বাসনা হইল। তিনি তখন মনে মনে একটি গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিলেন এবং গঙ্গাকে ভক্তিভাবে নিরীক্ষণ করিতে

করিতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে সেই স্তোত্রটী পাঠ করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার সুললিত স্বরলহরী পরিস্ফুট হইতে লাগিল, শিষ্যগণ নির্ব্বাক্ ভাবে উৎকর্ণ হইয়া তাহাই শুনিতে লাগিলেন। যোগিশিরোমণি শঙ্করের শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তিস্তোত্র যেন গঙ্গার তীরভূমিকে অমিয় সাগরে প্লাবিত করিয়া দিল। ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গাদেবীও যেন সেই স্বরে স্বর মিলাইয়া কুলু কুলু রবে নাচিতে নাচিতে প্রবাহিতা হইতে লাগিলেন।

শঙ্কর গাহিলেন—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥২
হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩
তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥৪
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে
দুরিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে
বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭
পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণিরাজিতচরণে
সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮
রোগং শোকং তাপং পাপং
হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপং।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯
অলকানন্দে পরমানন্দে
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীনঃ
ন চ তব দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে
দেবি দ্রবময়ি মুনিবর-কন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ
তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।

মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ॥ ১৩

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং
বাঞ্ছিতফলদং বিগলিতভারম্।

শঙ্করসেবকশঙ্করবরচিতং
পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্॥ ১৪

দেবি গঙ্গে! তুমি অমরবৃন্দেরও ঈশ্বরী, ভগবতি! তুমি ত্রিভুবন পরিত্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বিহার করিতেছ, তোমাতে কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই। জননি! তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিরত থাকুক॥ ১॥

দেবি! ভগীরথ তোমাকে ব্রহ্মধাম হইতে ভূলোকে আনিয়াছিলেন, তুমি সর্ব্বপ্রাণিগণকে সুখ প্রদান করিয়া থাক। মাতঃ! বেদে তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছুই জানিনা, তুমি এ অজ্ঞানকে পরিত্রাণ কর॥ ২॥

গঙ্গে! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মে তবঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিলে। দেবি! তোমার তরঙ্গসকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কৃপাময়ি! তুমি আমার পাপরাশি দূরীকৃত করিয়া আমাকে সংসার-সাগরের পারে উত্তীর্ণ কর॥ ৩॥

দেবি! যে ব্যক্তি তোমার জল পান করিয়াছে, সে পরমপদ পাইয়াছে। গঙ্গে। যে মনুষ্য তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে না যাইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়া থাকে॥ ৪॥

দেবি গঙ্গে! তুমি পতিত জনকে পরিত্রাণ কর, তুমি পর্ব্বতপতি হিমালয়কে খণ্ডন করিয়াছ এবং তদ্দ্বারা তোমার তরঙ্গরাজি সুশোভিত হইয়াছে। তুমি ভীষ্মের জননী এবং জহ্নুমুনির কন্যা। তুমি সকলের

পাপ দূর করিয়া থাক এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—এই ত্রিলোকে তোমার মহিমা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

দেবি! তুমি কল্পলতার ন্যায় ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্তবৃন্দ তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। যে তোমাকে প্রণাম করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না। দেবি! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, তোমার ভক্তগণ কদাচ নারীগণের চঞ্চল কটাক্ষে বিমুগ্ধ হয় না ॥ ৬ ॥

গঙ্গে! যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে, পুনরায় সে জননীজঠরে প্রবেশ করে না। হে জাহ্নবি! তুমি ভক্তগণের নরক নিবারণ কর এবং পাপরাশি নিবারণ করিয়া থাক, কেহই তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারে না ॥ ৭ ॥

দেবি! তোমার আবার দেহ নাই, তোমার তরঙ্গ সকল অতিপুণ্য প্রদান করে; জাহ্নবি! তোমার দর্শন কৃপাপূর্ণ, তোমা হইতে কাহারও উৎকর্ষ নাই। মাতঃ, তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়, তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

হে ভগবতি! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ ও কুমতি-কলাপ হরণ কর। তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং অবনীর হারস্বরূপ বিদ্যমান আছ। দেবি! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯ ॥

দেবি! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা; আমি কাতর হইয়া তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। মাতঃ! যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে বাস হয় ॥ ১০ ॥

দেবি! তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া, তোমার তীরে ক্ষীণতর কৃকলাস হইয়া অথবা ক্রোশদ্বয় মধ্যে অতি দীন চণ্ডালকুলে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকিতে বাসনা করি, তথাপি দূরদেশে কুলীন নরপতি হইতে বাসনা করি না ॥ ১১ ॥

দেবি! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা হইতে কাহারও প্রাধান্য নাই, তুমি জলময়ী ওঁমুনিবরের নন্দিনী। যে মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই সকলজয় করিতে পারে ॥১২॥

যাহার মনে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিয়ত সুখভোগ করিয়া থাকে। অতি মধুর ও কোমল পজ্ঝটিকা ছন্দে বিরচিত এই গঙ্গাস্তব পরমানন্দপ্রদ ও অতি সুললিত ॥ ১৩ ॥

এই অসার সংসার মধ্যে উক্ত গঙ্গাস্তবই সারবান্ পদার্থ, ইহা ভক্ত-বৃন্দের অভিলষিত ফল প্রদান করে এবং ইহা দ্বারা সমুদয় পাপভার দূর হইয়া যায়। মহেশ্বরসেবক শঙ্করাচার্য্যকৃত এই স্তব সমাপ্ত হইল, বিষয়ী ব্যক্তি ইহা পাঠ করুন ॥ ১৪ ॥

স্তোত্র সমাপন করিয়া শঙ্কর শিষ্যগণসহ গঙ্গাতে অবতরণ করিয়া অবগাহন স্নান করিলেন। গঙ্গার পূতবারিপ্রবাহে বহুদিনের পথশ্রম অপনীত হইয়া তাঁহাদিগের দেহ সুশীতল হইল। স্নানান্তে সকলে গঙ্গাতীরেই সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শিষ্যগণের ইচ্ছানু-সারে যোগী শঙ্কর সে রাত্রি গঙ্গাতীরেই অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তাঁহারা নৌকাযোগে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া গমন করিতে করিতে চারি পাঁচ দিন পরে শঙ্কর বারাণসীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

এই কি সেই পবিত্র ধাম বারাণসী, যথায় শিবশিরোবিহারিণী সুরেশ্বরী শশাঙ্কশির হইতে পতিতা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন? এই কি সেই কাশী, যে পুণ্যভূমির সংস্পর্শে কলহকুশলা জহ্নুতনয়া জাহ্নবী দেবীও সপত্নীহিংসা বিস্মৃত হইয়া হরপার্ব্বতীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া অসি ও বরুণাসহ সংমিলিতা হইয়া উত্তরবাহিনী হইয়াছেন? এই কি সেই দিব্যধাম কাশী, যাহা নির্ধন, নিগৃহীত, নির্ব্বান্ধব, অনাথ মানবমণ্ডলীর একমাত্র আশ্রয়স্থল? আত্মীয় জন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অনাথ বৃদ্ধগণকে সনাথ করিবার জন্য অনাথনাথ মহাদেব যথায় বিশ্বনাথরূপে অধিষ্ঠিত, এই কি সেই কাশী? যথায় পতিত জনের কালভয় নিবারণ করিতে স্বয়ং বিশ্বপতি মহাকালরূপে বিরাজমান,

যেখানে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ক্ষুধাতুর জীবকে অন্নদানের জন্য অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিতা, এই কি সেই কাশী? যাঁহার মহিমায় জীবের কালভয় নিবারিত, যাঁহার পদচ্ছায়া লাভে মহাপাপীও নির্ভয়, প্রবলপ্রতাপ ধর্ম্মরাজের বলও যেখানে সঙ্কুচিত, বিশ্বনাথের লীলাক্ষেত্র, এই কি সেই কাশী? যেস্থানে মৃত্যু ঘটিলে মহাপাতকীরও শিবত্ব লাভ হয়, যে স্থান-মাহাত্ম্যে পতিব্রতা শৈব্যা মৃতপুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রোগে শোকে জর্জ্জরীভূত মানব যেস্থানে আসিয়া শান্তিলাভ করে, এই কি সেই পুণ্যভূমি পঞ্চক্রোশী বারাণসী?

কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সশিষ্য শঙ্কর উদ্দেশে বিশ্বনাথকে প্রণিপাত করিলেন। সন্ন্যাসিগণ তখন আনন্দে অভিভূত হইয়া উচ্চনিনাদে *'বিশ্বনাথজীকি জয়' 'অন্নপূর্ণা মায়ীকি জয়'* রবে কাশী নগরীতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুদিনের অভীপ্সিত প্রিয় বস্তুর আশু দর্শন লাভ হইবে ভাবিয়া তাঁহাদের দেহে যেন দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইল, তাঁহারা অতি দ্রুত-বেগে পথ চলিতে লাগিলেন। এতদিন দেশকালের দূরত্বজনিত ব্যবধান তাঁহাদের নিকট সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাঞ্ছিত অভীষ্ট দর্শনে ক্ষণমাত্র বিলম্বও যেন তাঁহাদের অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

তাঁহারা পথ চলিতে চলিতে দেখিলেন, গঙ্গাতীরে দুই পার্শ্বে অসংখ্য ঘনবিন্যস্ত দেবালয়শ্রেণী, কোথাও নানাচিত্রে চিত্রিত বিচিত্র অভ্রভেদী মন্দিরচূড়া, সারি সারি সৌধাবলী পরিশোভিত বিপুলজনসমাগম-পূর্ণ কাশী নগরী গঙ্গাতটে যেন আলেখ্যবৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে। সন্ন্যাসি-গণ কিন্তু এ সকলে দৃষ্টিপাত মাত্র করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় বিশ্বনাথ দর্শনের জন্যই ব্যাকুল সুতরাং এ সমুদায় দেখিবার অবসর কোথায়? কিন্তু যোগীশ্বর শঙ্করের হৃদয় যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। তাহাতে কখনই কোনও কারণে তরঙ্গজনিত লয়বিক্ষেপ উপস্থিত হয় না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই সমগতিতে পথ চলিতেছেন, অন্তরে আগ্রহ বা ব্যাকুলতা কিছুই নাই। তবে আশ্রিতবৎসল শঙ্কর শিষ্যগণের আগ্রহ এবং চঞ্চলতা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন।

ক্রমে তাঁহারা গঙ্গাতীর পশ্চাৎ করিয়া মণিকর্ণিকাতীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কারণ, কাশীধামে আসিয়া প্রথমে মণিকর্ণিকায় স্নান, পরে বিশ্বেশ্বর দর্শনই বিধি, তাই শঙ্কর প্রথমেই মণিকর্ণিকাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মণিকর্ণিকা দর্শনমাত্র যোগিবর শঙ্করের অন্তরে অভিনব ভাবের উদয় হইল। মণিকর্ণিকার অসীম মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া তিনি যেন পবম পুলকিত হইলেন। একটী স্তোত্রকুসুমদ্বারা মণিকর্ণিকার অর্চ্চনা করিবাব জন্য তাঁহার অন্তরে যেন বাসনা হইল। তিনি তখন তীরে অবতরণ পূর্ব্বক অবনত হইয়া ভক্তিভরে মণিকর্ণিকার পূতবারি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ কবিয়া স্বীয় মস্তকে প্রদান করিলেন। বারি স্পর্শমাত্র যোগী শঙ্করের দেহ যেন ভক্তি ও মহাভাবে কণ্টকিত হইল এবং তাঁহাব হৃদয়কানন হইতে একটী মনোহর স্তোত্রকুসুম যেন প্রস্ফুটিত হইয়া মণিকর্ণিকাদেবীর অর্চ্চনার জন্য তৎক্ষণাৎ রচিত হইল। যোগী শঙ্কর সেই ভক্তিবচিত স্তোত্রকুসুম লইয়া মণিকর্ণিকাচবণে অঞ্জলি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন এবং যুগলকরে দণ্ডায়মান হইয়া গদগদ স্বরে ধীরে ধীরে উক্ত স্তোত্র পাঠ কবিতে লাগিলেন।

সে সময় মণিকর্ণিকাতীর বহুজনকোলাহলে মুখরিত, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে নিরত, কেহ বা স্বকার্য্য সাধনে শশব্যস্ত, স্নানার্থী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র উচ্চারণেই সমাহিতচিত্ত; তথাপি শঙ্করের কিশোর কণ্ঠের সুমিষ্ট স্তোত্রধ্বনি অনেকেরই কর্ণে প্রবেশ করিল এবং তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিল। সহসা কোথা হইতে বালককণ্ঠে কে গীত গাহিতেছে ভাবিয়া কেহ কেহ গায়কের অনুসন্ধান করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল, মণিকর্ণিকাতীরে একটী কিশোর সন্ন্যাসী অথবা সুকুমারকায় বালক বলিলেও হয়, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কয়েকটী বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান এবং মধ্যস্থলে সেই কিশোর সন্ন্যাসী করজোড়ে এই স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ

বাদং তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে।

মদ্রূপো মনুজোহয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎক্ষণাৎ

তন্মধ্যাদ্ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ॥ ১

ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে যে পুন-

র্জায়ন্তে মনুজাস্ততোহপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ।

যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ

সাযুজ্যেহপি কিরীটকৌস্তুভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ॥ ২

কাশী ধন্যতমাবিমুক্তনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া

তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।

স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা

কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ॥ ৩

গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা

তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ।

দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং

পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জনৈঃ প্রাপ্যতে॥ ৪

দুঃখাম্ভোনিধিমগ্নজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-

র্জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা।

লোকাঃ স্বর্গমুখাস্ততোপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ

কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা॥ ৫

একো বেণুধরো ধরাধবধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরঃ

সোহপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরোমাধবঃ।

যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা

রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্॥ ৬

ত্বত্তীরে মরণন্তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে

শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ।

আয়ান্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদ্গতোহভূৎ সদা

পুণ্যোহসৌ বৃষগোহথবা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি॥ ৭

মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ
স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্ম্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ।
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গত-
স্তত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্॥ ৮
কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং
তৎ সর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ।
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং
তীর্ত্বা পল্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ॥ ৯

হে মণিকর্ণিকে! তোমাব তীরে কোন জন্তু প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ হয়। হরি বলেন, 'আমি ইহাকে মুক্তি প্রদান করিব' এবং হরও বলেন, 'ইহার মুক্তি প্রদানে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার।' এইরূপে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে হরি হরকে বলেন, 'এই মনুষ্য আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক।' তৎক্ষণাৎ সেই মৃত দেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্নিত পীতাম্বরধারী গরুড়-বাহন পুরুষ নির্গত হয়॥ ১॥

যাহাবা তপোবলে ইন্দ্রত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহারাও আপন আপন ভোগকালের অবসান হইলে পতিত হয়, পুনর্ব্বার মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কালান্তরে কর্ম্মবশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, পরে কীট পতঙ্গাদি হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে! যে সকল মনুষ্য তোমার জলে একবার মাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও কিরীট ও কৌস্তভধারী নারায়ণ হইয়া থাকে॥ ২॥

কাশীপুরী অতি ধন্যা অর্থাৎ সকলের প্রধান, ইহাকেই অবিমুক্ত-নগরী (হরগৌরী যে স্থান কখন ত্যাগ করেন না) বলিয়া থাকে, ইনি গঙ্গাদ্বারা অলঙ্কৃতা, সেই কাশীতেই মণিকর্ণিকা আছেন, ইনি সকলের সুখ প্রদান করেন আর মুক্তিও এই মণিকর্ণিকার আজ্ঞাবহা কিঙ্করী অর্থাৎ মণিকর্ণিকার আদেশেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। একদিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কাশী ও স্বর্গ এই উভয়কে তুলাদণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর

গুরুতা প্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতলে অবস্থিতা হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা উর্দ্ধদেশে গমন করিল॥ ৩॥

গঙ্গাতীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই গঙ্গাতীর হইতেও কাশীকে উত্তমা বলিয়া জানিবে, আর কাশী হইতে মণিকর্ণিকার প্রাধান্য আছে, যেহেতু এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিলেই স্বয়ং ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। আর এই মণিকর্ণিকাস্থান দেবগণেরও দুর্ল্লভ এবং সর্ব্বপ্রকার পাপবিনাশে দক্ষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বহুপুণ্যবলেই এই মণিকর্ণিকাস্থানে গমন করিতে পারে এবং যাহারা অতি পুণ্যাত্মা, তাহারাই ইহাকে লাভ কবিয়া থাকে॥ ৪॥

যে সকল জন্তু নিবন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তুগণের সুখসম্ভোগার্থ এই বারাণসীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্বর্গাদি লোকসমূহ, সেই কাশী হইতে নিকৃষ্টতবা, যেহেতু, ভোগকালের অবসান হইলেই স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু কাশীপুরী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রদান কবিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকে, সুতরাং বারাণসী যে জন্তুগণেব সর্ব্বদা মঙ্গল সাধন কবে, তাহাতে সংশয় নাই॥ ৫॥

যিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষণরূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুবলীধর হরিও এক, আর যিনি শিবোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতেছেন, সেই নীলকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করও এক, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে, যাহারা তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা সকলেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ হইয়া থাকে; তবে কিরূপে ইহাদিগের বহুত্ব হইতে পারে? অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্যবলে এক হরি ও এক শঙ্করও অনেক হইয়া থাকেন।॥ ৬॥

দেবি মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের গৌরব পূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণত্যাগ করে, দেবরাজ সহস্র নয়নদ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক থাকেন; তোমার তীরে

মৃতব্যক্তি যখন আগমন করিতে থাকে, তখন সূর্য্যদেব তাহাকে সহস্র কিরণ দ্বারা প্রত্যুদ্গমন করেন। আহা, তিনি যে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা আর কি বলিব ॥ ৭ ॥

চতুরানন বেদার্থের দীক্ষাগুরু, ইনি স্বীয় পরিমাণে শতবৎসরেও মধ্যাহ্নকালীন মণিকর্ণিকা-স্নানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল একমাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাস বলে তোমার পুণ্যমাহাত্ম্য জানিতে পারেন। যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রসুপ্ত হয়, তাহাদিগের বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বহু বহু ক্লেশকর তপস্যা ও শত শত কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যেরূপ পাপ বিনাশ হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হয়, একবার মাত্র মণিকর্ণিকাতে স্নান করিলে সেইরূপ পাপবিনাশ ও পুণ্যসঞ্চয় হইতে পাবে। আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় সংসারসাগর পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

স্তোত্র পাঠ সমাপ্ত হইল। শঙ্করকে দেখিবার জন্য কেহ কেহ তাঁহাব নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, কেহ বা তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য উৎসুক হইল; কিন্তু যোগীশ্বর শঙ্করের যোগিজনোচিত গাম্ভীর্য্য, বাক্‌সংযম, এবং তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল, দর্শকের হৃদয় অধিকতর ভক্তিবিস্ময় ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ করিল, কেহই যেন বাক্যস্ফুরণে সক্ষম হইল না। সুতরাং দর্শকেরা অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

যোগিবর শঙ্করের আনতদৃষ্টি কোন দিকেই ছিল না, তিনি এসমস্ত কিছুই দেখিতেছিলেন না, তাঁহার চিত্ত এতক্ষণ মণিকর্ণিকার মহিমা স্মরণেই নিমগ্ন ছিল। এক্ষণে তিনি সশিষ্যে মণিকর্ণিকাজলে স্নান করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তীরে উঠিয়া সিক্ত বস্ত্রেই বিশ্বনাথের মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কেহ কেহ বা কৌতূহলী হইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিল, আবার কেহ বা কতক দূর যাইয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।　　　শ্রীমতী—

স্বামী বিবেকানন্দের একপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলুড়মঠে যথারীতি স্বামীজির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামীজির প্রতিকৃতি লতায় পাতায় ফলে ফুলে সুশোভিত করিয়া মঠের ভিতরদিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গনের উত্তরদিকে রক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মঠের দক্ষিণদিকে অবস্থিত স্বামীজির অসম্পূর্ণ মন্দিরে রক্ষিত জয়পুরের নূতননির্ম্মিত প্রস্তরমূর্ত্তি এবং মঠভবনের দ্বিতলস্থ সযত্নে রক্ষিত স্বামীজির বাসগৃহ অতি উত্তম-রূপে সজ্জিত হইয়াছিল ও এই সকল স্থানেই ভক্তগণের ভক্তিসহকৃত সাগ্রহ পূজায় যেন স্বামীজি সশরীরে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিলেন। বহুদিন পরে একত্র সম্মিলিত ভক্তগণের আনন্দ-সম্মিলনে, সমস্তদিনব্যাপী ভজনানন্দে এবং সমাগত ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণগণের সেবায় সারাদিন পরম আনন্দেই কাটিয়াছিল। মায়াবতী হইতে নবপ্রকাশিত স্বামীজির মনোহর জীবনচরিত, স্বামীজির মন্দির-নির্ম্মাণকল্পে উৎসর্গীকৃত,শিষ্য শরচ্চন্দ্রের 'স্বামিশিষ্যসংবাদ' এবং বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রকাশিত গুরুগতপ্রাণা নিবেদিতার 'স্বামীজির সহিত অমরনাথ ভ্রমণ' গ্রন্থে স্বামীজির অপূর্ব্ব জীবন ও উপদেশালোচনার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া সমাগত ভক্তগণের আনন্দ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে সকলের আগ্রহে বহু উৎসুক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে সাহিত্যসম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও নায়কসম্পাদক শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজির জীবন ও উপদেশকথা অতি সুললিত ভাষায় বিবৃত করেন।

তৎপরের রবিবার কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি বেলুড় মঠে উক্ত সমিতির সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, স্বামীজির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেন। স্বামী সারদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত, সমিতির গতবর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ, স্বামীজির পুস্তক হইতে আবৃত্তি ও মার্কিনদেশবাসী ফ্রাঙ্ক আলেকজান্দারের স্বামীজির জীবন-

বিষয়িনী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বামীজির সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাবসানে সভাভঙ্গ হয়। পরে রামনামকীর্ত্তন এবং প্রসাদ বিতরণ হইলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

ইহার পরের রবিবারে শালকিয়া রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতির উৎসব শালকিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণ, দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা সমুদয়ই যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ২রা ফেব্রুয়ারি উক্ত উৎসব উপলক্ষে আহূত সভায় সমাগত প্রায় পাঁচশত ভদ্রলোকের সমক্ষে শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ পরমেশ নামক কলেজের জনৈক ছাত্র স্বামীজির জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করেন। পরে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত অঘোর নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়েব সঙ্গীত এবং ঐক্যতানবাদন হয়। পরে প্রসাদ বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হয়। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা চলিয়াছিল।

বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক স্বামীজিব উৎসব উপলক্ষে মিশনগৃহে কঠোপনিষৎ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ, হাঁসপাতালের রোগীদিগকে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ, সঙ্গীত ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা হয় এংব স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহে শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বিএল কর্ত্তৃক ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধপাঠ, শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত এমএ বিএল ওনিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত এমএ বি এল কর্ত্তৃক বক্তৃতা এবং স্বামীজির গ্রন্থপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন হয়।

চট্টগ্রামের অদূরবর্ত্তী গোঁসাইডাঙ্গা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সুহৃৎসঙ্ঘ' নামক ধর্ম্মাশ্রমেও স্বামীজির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রেঙ্গুন হিন্দু সোসিয়াল ক্লাব গৃহে তথাকার বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী ও গুজরাটি ভক্ত ও শিষ্যগণ কর্ত্তৃক স্বামীজির উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যথারীতি পূজা, ভজন এবং দরিদ্র নারায়ণগণকে মিষ্টান্ন ও চাউল বিতরণ

করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীযুত সত্যচরণ গাঙ্গুলি বিএ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয়। সভাভঙ্গের পর উপস্থিত তিন চারিশত ভক্তকে প্রসাদ বিতরিত হয়।

মান্দ্রাজ মঠে স্বামীজির জন্মোৎসব দিবসে 'দরিদ্র নারায়ণ'গণের সেবা যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে মিঃ কে, কে, তাতাচার স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে তামিল ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মিঃ এস, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার "হিন্দুধর্ম্মে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,—

"স্বামী বিবেকানন্দকে নিঃসংশয়ে নব যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। তিনি দেখিলেন, হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীনকাল হইতে স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল—এখন যেন তাহার সেই স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং তিনি উহাতে নবজীবনীশক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মহামনীষা, মহোচ্চহৃদয়, এবং আর্যদৃষ্টি তাঁহাকে এই 'নূতন হিন্দুধর্ম্ম' প্রচারে সমর্থ করিয়াছিল। কিন্তু নূতন হইলেও তৎপ্রচারিত হিন্দুধর্ম্ম সেই সনাতন ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে, কারণ, উপনিষদ্ ও গীতাই তাহার মূল ভিত্তিস্বরূপ। কেবল তিনি উহা হইতে পরবর্ত্তী যুগের সঙ্কীর্ণতা বাদ দিয়া উহাকে উদারতর ও উন্নতিশীল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমগ্র জগতে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার তাঁহার প্রধান জীবনব্রত ছিল। তাঁহাতে শঙ্করের প্রবল বুদ্ধিমত্তা ও রামানুজের অদ্ভুত হৃদয়বত্তার অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল এবং তিনি আচণ্ডালে ধর্ম্মের উচ্চতম ভাবসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। স্বামীজি ধর্ম্মের ভিতর গুপ্ত রহস্য আছে, একথা একেবারে বিশ্বাস করিতেন না।"

বক্তৃতান্তে উক্ত মঠাধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, স্বামীজির প্রধান শিক্ষা—ধর্ম্ম সাক্ষাৎ উপলব্ধির বস্তু, কেবল বিচার বা মতবাদের বস্তু নহে। অবশেষে স্তোত্রাদি পাঠান্তে প্রসাদ বিতরণ হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সমালোচনা।

স্বাস্থ্য ও শতায়ু। শ্রীসতীশ চন্দ্র লাহিড়ী বি এ প্রণীত, মূল্য ১৲ একটাকা।

স্বাস্থ্য রক্ষার সমস্যা আমাদের দেশে ক্রমশঃই তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। এ সমস্যাসম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামতই উপেক্ষা করা যায় না, এবং "স্বাস্থ্য ও শতায়ু"র প্রণেতা সতীশ বাবু গ্রন্থাদিচর্চ্চা ও অভিজ্ঞতার ফলে এই সমস্যাসম্বন্ধে মত প্রকাশ কবিবার অধিকারী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সুযুক্তি-সহকারে দেখাইয়াছেন যে, মানসিক অবস্থা, অর্থাৎ মনেব বিক্ষিপ্তভাব ও শান্তভাব, এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, "কারণ, মনের স্বরূপই দেহে নানাভাবে প্রতিফলিত হইতেছে।" যাহাব মন সংযত, তাহার ব্রহ্মচর্য্য ও জীবনীশক্তির উৎকর্ষ হয়, "তজ্জন্য মনকে সর্ব্বদা হৃদয়ে অথবা ললাটে, অথবা হৃদয় ও ললাট এই দুইয়ের মধ্যে নিবদ্ধ বাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাতে যে শান্তি লাভ হইবে, সেরূপ আর কিছুতেই হইবে না" ইত্যাদি। অবশ্য ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ীটা না বাঁধিয়া, গাড়ীর সম্মুখেই ঘোড়াটা বাঁধা উচিত, অর্থাৎ স্বাস্থ্যসাধনাকে লক্ষ্য ও ধর্ম্মসাধনকে উপলক্ষ্য না করিয়া উহার বিপরীতই করা উচিত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে লোকের মানসিক বিক্ষিপ্ততা ও তরলতাই যে দৈহিক রক্ত ও স্নায়ু প্রভৃতিকে অপ্রতিষ্ঠ ও চ'ল করিয়া উহাদিগকে রোগবীজের সহিত সংগ্রামে অনেকটা অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে লেখকের সহিত আমরা একমত। মন যাহার অপ্রতিষ্ঠ, তাহার দৈহিক ধাতুও অপ্রতিষ্ঠ হইবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম।

গ্রন্থকারের আর একটি প্রধান কথা—প্রপঞ্চের সহিত পাঞ্চভৌতিক দেহের অবিরোধভাব রক্ষা করার আবশ্যকতা। লেখক বলিয়াছেন, "মানুষ কি তাহার নিজেব হাতে গড়া একটা কৃত্রিম পদার্থ যে, প্রকৃতির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে যেমন ইচ্ছা ভাঙ্গচুর করিয়া গড়া

যাইতে পারে? মার ছেলে মার হাতে ফিরাইয়া দাও; প্রকৃতির শিশু প্রকৃতির ফল, মূল, শস্য ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইয়া খেলাধূলা করুক, তাহার কোন রোগবালাই থাকিবে না। অস্বাভাবিকতাই রোগ, এবং স্বাভাবিক সহজ অবস্থাই স্বাস্থ্যসুখের নিদান।" কথাটায় সত্যও কতকটা আছে, আবার একদেশদর্শিতাও আছে। যেমন বাহিরের প্রকৃতি আছেন, তেমন আবার ভিতরের প্রকৃতিও আছেন; মানুষ এই দ্বিবিধরূপা প্রকৃতির শিশু, অতএব মানুষকে বনের পাখী বা মাঠের পশু করা যায় না। মানুষ বুদ্ধির পাকের উপর পাক চড়াইবেই, আর সেটা প্রকৃতিরই খেলা। তবে লেখকের বোধ হয় ভাব এই যে, প্রকৃতি যখন মূলে এক,—বাহিরেও যিনি, ভিতরেও যখন তিনি,—তখন আমরা যেন বাহির ও ভিতর, বুদ্ধির ফেরে পড়িয়া কেবলই তফাৎ না করিয়া ফেলি, অর্থাৎ—মার দুটী ক্রোড়ই যেন না ছাড়ি। বহিঃপ্রকৃতির জলবায়ু প্রভৃতির সঙ্গেও মাখামাখি রাখা চাই, বিলাসিতার কুহকে যেন দেহকে কেবলই কৃত্রিমতার বেষ্টনে বহিঃপ্রকৃতি হইতে ছিনাইয়া না লই। বেশ কথা, কিন্তু লেখক তাপসম্বন্ধে এরকম মতটি প্রয়োগ করেন নাই, সে ক্ষেত্রে কৃত্রিম গরম কাপড়ের হাত থেকে কোন মতেই নিস্তার নাই। তাপসম্বন্ধে শরীরকে যে কতদূর বহিঃপ্রকৃতির সুরে বাঁধা যায়, তাহা লেখকের জানা নাই। জলসম্বন্ধেও ধারণাটা গোলমেলে আছে। পশুজীবনকে আদর্শ ধরাতে এই সমস্ত দোষ আসিয়া পড়িয়াছে; পশুর চেয়ে মানুষের অনেকগুণে প্রকৃতির সঙ্গে বেশী মিল ও মাখামাখি হওয়া সম্ভবপর। কেবল মানুষসম্বন্ধেই বলা যায়—"শরীর হলেন মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।" আশা করি, লেখক অভিজ্ঞতার ফলে আরো বুঝিবেন—ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।

প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র। (টীকা ও অনুবাদ সমেত)। শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু; হোয়াইট লোটাস্ পাব্লিসিং কোং, ২নং কৈলাস দাসের লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲টাকা।

এই উৎকৃষ্ট সুখপাঠ্য ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথমেই পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিত একটী সুলিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সন্নিবেশিত।

'প্রজ্ঞাপারমিতা' মহাযান নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পাঁচখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ সাধারণতঃ প্রজ্ঞাপারমিতা নামে অভিহিত হয়। উহার মধ্যে পঞ্চম গ্রন্থখানিতে আট সহস্র শ্লোক আছে। এই প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রটী ঐ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবন্ধ মাত্র। উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ একুশটী শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। যদিও এগুলি কেবল প্রজ্ঞাপারমিতার স্তুতিমাত্র, কিন্তু উহাদের মধ্যেই বৌদ্ধশাস্ত্রের সার সত্য সকল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিশোরীবাবু আবার উহার ব্যাখ্যায় হিন্দুদিগের উপনিষদ্, পুরাণ, চণ্ডী প্রভৃতি, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্যান্য গ্রন্থ, বাইবেল, এমন কি বর্ত্তমান কালের থিওসফিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মাদাম ব্লাভাট্স্কির গ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ সমূহ হইতে স্থলে স্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তত্ত্বতঃ অন্যান্য ধর্ম্মে কোন প্রভেদ নাই। তিনি অতি সরস ভাষায় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই ব্যাখ্যাটি লিখিয়াছেন—বহু তথ্যের সমাবেশ থাকিলেও উহা এমন সুখপাঠ্য হইয়াছে যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকা যায় যায় না। ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সহিত সনাতন হিন্দুসম্প্রদায়ের দার্শনিকতা এবং উপাসনা এই দুইটি বিষয়ে মতভেদ নিতান্ত অল্প; এমন কি, বহুস্থলে এই উভয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্যও অবলম্বন করিয়াছেন; এই অত্যাবশ্যক তত্ত্বটী যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা সুবিস্তৃতভাবে সংস্থাপিত করিয়া শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন বাবু আমাদের দেশের শিক্ষিতবৃন্দের একটী নূতন চিন্তার স্রোত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; ইহাই হইল শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বাবুর প্রজ্ঞা-পারমিতা ব্যাখ্যার বিশেষত্ব"—আমরা একথারও সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

উপসংহারে আমরা বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণকে কিশোরী বাবুর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পবিত্র বিমলানন্দ উপভোগ করিতে অনুরোধ করি আর কিশোরীবাবুকেও বলি, তাঁহার ভক্তিপূর্ণ অমিয় লেখনী ইহার ন্যায় আরও বহু গ্রন্থরত্ন প্রসব করুক।

সাধনা। শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম এ (অধ্যাপক—রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা) প্রণীত ও চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক ১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের যে শুভফলগুলি ফলিয়াছে, বিনয়

বাবুর এই গ্রন্থখানিকে তাহার অন্যতম বলা যাইতে পারে। সর্ব্ব বিষয়ে জাতীয় উন্নতি কিরূপে হইতে পাবে, এই গ্রন্থে নানাদিক্ হইতে তদ্বিষয়ের আলোচনা আছে। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেইগুলি একত্রিত কবিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণেব সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বিনয় বাবু ভালই করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে যুবাব অদম্য উৎসাহ অথচ বৃদ্ধোচিত বিজ্ঞতাব অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত হইলেও কোথাও ভাবের গাম্ভীর্য্য হানি হয় নাই। প্রাচীন সুলেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গ্রন্থারম্ভেই একটী ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে গ্রন্থের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থকার জাতীয় উন্নতির উপায সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন. তৎসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ঐ সম্বন্ধে অনেক মতের সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গ্রন্থখানিতে আগাগোড়া চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। গ্রন্থকার কার্য্যপ্রণালীর যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেইগুলি অনুসরণ করিলে যে আমাদের দেশের সমূহ কল্যাণ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শুনিতেছি, অনেক যুবক আগ্রহেব সহিত এই গ্রন্থখানি পড়িতেছেন। কিন্তু শুধু যুবকগণের নহে, ইহাতে তাহাদেব অভিভাবক বৃদ্ধগণেরও ভাবিবাব ও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। গ্রন্থকাবেব বিভিন্ন মতেব সঙ্গে কাহাবও মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে আন্তরিকতার সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আলোচনা কবিযাছেন, যে অদম্য কর্ম্মপ্রাণতাব ভাব গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ঢালিয়া দিয়াছেন, পাঠকবর্গ সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশেব উন্নতিব উপায় নিজে নিজে ভাবিতে শিখেন এবং সাধ্যমত কার্য্যে তাহা পরিণত করেন, তবেই এই গ্রন্থপ্রণয়নের সার্থকতা হইবে মনে কবি। আর গ্রন্থকাবকেও বলি, তিনি যে মহান্ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—এই গ্রন্থখানি যাহার সামান্য পরিচয় মাত্র—ভগবান্ তাঁহাকে ঐ ব্রতসাধনের দিন দিন অধিকতর উপযুক্ত করুন। তিনি যে সাধনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিরভিমানে দৃঢ়পদে সেইপথে অগ্রসর হইতে পারিলে অনেক নূতন নূতন আলোক পাইবেন ও পরিণামে ঈশ্বরকৃপায় তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিবেন।

ভক্ত গিরিশচন্দ্র।

(২).

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল।

(স্বামী শ্রীসারদানন্দ কর্ত্তৃক সম্যক্ সংশোধিত,
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

আমরা বলিয়াছি, বিসূচিকা রোগ হইতে মুক্তিলাভের পরেই গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদোষে বিষম বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়া পড়েন এবং পদে পদে অপরাধী দুর্ব্বল মানবের কাতর প্রার্থনা শ্রীভগবানের কর্ণগোচর হয় কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন তাঁহার শ্রীপদে শরণ গ্রহণ করেন। বিসূচিকা রোগকালের অপূর্ব্ব দর্শনই যে তাঁহার পরলোক এবং ধর্ম্মবিশ্বাসকে সজীব করিয়া তুলে এবং তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির দম্ভ ও যৌবনসুলভ হঠকারিতাকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে এখন ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মনের এই কালের অবস্থা এবং যেরূপে তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন তদ্বিষয় তিনি স্বয়ং 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' এবং 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' নামক প্রবন্ধদ্বয়ে* লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উহাদিগের মধ্যে শেষোক্ত হইতে কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন—

"দুর্দ্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপদ্মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে ৺তারক-নাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও ত কঠিন বিপদ্, একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য; এ সময়ে ৺তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয়

---

* ১৩১২ সালের ১লা বৈশাখ সংখ্যায় 'উদ্বোধন' পত্রে প্রথমটী এবং ১৩১৬ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় দ্বিতীয়টী মুদ্রিত হইয়াছিল।

কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, দেবতা মিথ্যা নয়।”—(জন্মভূমি হইতে উদ্ধৃত।)

কিন্তু রোগ ও বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গিরিশচন্দ্র যখন কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার প্রবল হইয়া উঠিয়া তাঁহার মনে নানা আন্দোলন উপস্থিত করিল। তাঁহার দাম্ভিক বুদ্ধি পুনরায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ আলোচনা করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, উহারই প্রভাবে তিনি বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। গিরিশের সজীব ধর্ম্মবিশ্বাস তখন তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাইয়া বলিল, ‘কিন্তু হে দাম্ভিক, ঐ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ কি তোমার প্রভাবে উপস্থিত হইয়াছিল? তবে তখন আপনাকে এককালে অসহায় ও নিরুপায় ভাবিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়াছিলে কেন?’ তিরস্কৃত বুদ্ধি লজ্জিত হইলেও বলিল, ‘হইতে পারে দেবতা প্রসন্ন হইয়া ঐ কার্য্যকারণের শৃঙ্খল উপস্থিত করিয়া বিপদ্ হইতে মুক্তি দিয়াছেন, কিন্তু একথাও সত্য যে, চিত্তের একাগ্রতা অনেক সময়ে বহির্বিষয়সকলকে নিয়মিত করে, সুতরাং এক্ষেত্রে বিপন্মুক্তিরূপ কর্ম্মফল উৎপন্ন করিতে দেবতা কতটা করিয়াছেন এবং চিত্তের একাগ্রতাই বা কতটা করিয়াছে, তাহা ত বিচার করা কর্ত্তব্য; ঐরূপ বিচারের ফলে যাহা প্রমাণিত হইবে, তাহাই কি এস্থলে গ্রাহ্য নহে? অতএব উভয় বিষয়ই অনুসন্ধান কর, দেবতার অস্তিত্বের অভ্রান্ত প্রমাণ পাইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস কর এবং চিত্তের একাগ্রতা অধিকতর অভ্যাস করিয়া দেখ, উহা দ্বারাই বা মানব কতটা কি করিতে পারে।’ ধর্ম্মবিশ্বাস তদুত্তরে বলিল, ‘হে দাম্ভিক, ঐরূপ করিতে হয় কর, কিন্তু দেখিও যেন আবার ফাঁদে পা দিও না, জানিও— দেবতার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতীত মানব কখন শান্তিলাভ করে না।’

ঐরূপ আন্তরিক দ্বন্দ্বের ফলে গিরিশচন্দ্র এখন যে বিকল হইয়াছিলেন,

এ বিষয় তিনি 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—"কিন্তু সন্দেহের বিষম তাড়না—হৃদয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত, সে অবস্থা বর্ণনাতীত; সহসা চক্ষুবন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া জনশূন্য অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেরূপ অবস্থা হয়, আমার তাৎকালিক অবস্থার সহিত সে অবস্থার কতক তুলনা হইতে পারে। চিন্তার তাড়নায় কখন কখন শ্বাসরোধ হইয়া যায়। দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি মুহুর্মুহুঃ জ্বলিয়া উঠে ও হৃদয়ান্ধকার আরও গাঢ় করিয়া তোলে।"

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত মানসিক দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য গিরিশচন্দ্রের উদ্যম এখন শতমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল। তিনি রঙ্গালয়সংক্রান্ত কার্য্যে পরিশ্রম করা ভিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক সুনিশ্চিত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু উহা করিতে যাইয়া তাঁহার গর্ব্বিত বুদ্ধি এখন এক বিষম প্রহেলিকায় পতিত হইয়াছিল। মানবের মৃত্যুতেই যে, সব শেষ হয় না এবং তাহার সুকৃত-দুষ্কৃত যে, ঐ ঘটনায় ইন্ধনরহিত অগ্নির ন্যায় শান্ত হইয়া তাহাকে ফলভোগ করাইতে বিরত থাকে না, এবিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি ইতিমধ্যে অভ্রান্ত প্রমাণ সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রমাণ সংগ্রহ শান্তির পরিবর্ত্তে গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তি প্রদান করিয়াছিল। কারণ, গিরিশচন্দ্রের বিবেক এখন উহার প্রভাবে অধিকতর প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভ্রান্ত ভাষায় নিরন্তর বলিতেছিল, "পরকাল আছে জানিয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি কি ঐ জ্ঞানে নিজকৃত কর্ম্মফলের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলে, অথবা মঙ্গলময় করুণাময় এমন কোন পুরুষের সন্ধান পাইলে, যিনি মানবকৃত সকল কার্য্য নিয়মিত করিয়া অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদয় করেন এবং নিজ অহেতুক করুণায় তাহার দুষ্কৃতসকল মুছিয়া দিয়া মানবকে চিরশান্তির অধিকারী করেন? অতএব উঠ, জাগ, তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও।" ঐরূপ প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুত গিরিশ যখন নানা স্থানে নানা ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ পুরুষকে সাক্ষাৎ

জানিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গুরূপদিষ্ট মার্গের অনুসরণ করিতে বলিলেন। চিরদাম্ভিক গিরিশের বুদ্ধি, উহাতে যে বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া আপনাকে এককালে নিরুপায় জ্ঞান করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে লিপিবদ্ধ তাঁহার নিজের ভাষাতেই পাঠকের শ্রবণ করা ভাল।

"কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব, কোন্ পথ অবলম্বন করি। ৺তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি।" "ঘটনাস্রোতে কখন বিশ্বাস আনে, কখন সন্দেহ আনে, এ বিষয়ে যাঁহাদের সহিত আলোচনা করি, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, গুরু-উপদেশ ব্যতীত কিছুই হইবে না। কিন্তু মানুষকে গুরু বলিতে তর্কবুদ্ধি সম্মত হইল না।"

"কিন্তু সকলেই বলে যে, গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই ত ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করিতে হয়—কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তিপূর্ণ হইল। মনুষ্যকে গুরু করিতে পারি না।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়!—সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব? যাক্, আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন্। শুনিয়াছিলাম, নরবেশ ধরিয়া কখন কখন মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই, নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু ৺তারকনাথের ত কই দেখা পাই না,

তবে আর কি করিব? প্রাতে একবার করিয়া ঈশ্বরের (৺তারক-নাথের) নাম করিব, তাহাতে যাহা হয় হইবে।"

পূর্ব্বোক্ত সংকল্প করিয়া অবধি গিরিশচন্দ্র প্রত্যহ প্রাতে ৺তারক-নাথের নিকট সকাতরে নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে সকল অভীপ্সিত কার্য্যে তাঁহার যে অসাধারণ উৎসাহ উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এ বিষয়ে এখন তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা যে করিয়াছিল, একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, শ্রীযুত গিরিশ এখন উহাদের প্রেরণায় কেবলমাত্র প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম লইয়াই নিরস্ত ছিলেন না, কিন্তু শ্রীগুরুর দর্শন ও পদাশ্রয় লাভের জন্য সত্যসত্যই একাগ্র মনে তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিয়মপূর্ব্বক এই সময়ে নিত্য গঙ্গাস্নান ও হবিষ্যান্ন গ্রহণের বহুকাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং এখন হইতে প্রতি বৎসর শিবরাত্রি ব্রতকালে ৺তারকেশ্বরে পদব্রজে গমন করতঃ সংযতমনে উপবাস, জাগরণ ও পূজাদি করিয়া ব্রত রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, 'হে ভগবান্, তুমি তোমার সমগ্র শক্তি নিজ নামের দ্বারা বহুধা বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছ, অর্থাৎ ঈশ্বরের অনন্ত নামের প্রত্যেকটিই শক্তিপূর্ণ; দুর্ব্বল মানব সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাপন্ন হইয়া উহার যেটিকেই গ্রহণ করুক্ না কেন, তাহার প্রভাবে তাহার মলিন মন প্রাণ আশু শুদ্ধ হইয়া সে ধর্ম্মাত্মা হয় ও ক্রমে নিত্য শান্তি লাভ করে!" ৺তারকনাথের শরণ গ্রহণ করিয়া নিত্য তাঁহার নাম লইতে লইতে যতই দিন যাইতে লাগিল, গিরিশ-চন্দ্রের প্রাণে ততই অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ, অনুরাগ ও শান্তির উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার কোন এক বিশেষ বন্ধুকে তিনি এই সময়ে বলিয়া-ছিলেন—"বাবা তারকনাথের মহিমায় আমার এক এক দিনে এক এক শতাব্দীর উন্নতি হইতেছে, এরূপ বোধ করিতেছি!"

আপনাকেই আপনার পরম শত্রু জানিয়া, আন্তরিক দ্বন্দ্বে বিকল হইয়া যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা লোকনয়নের অন্তরালে যতদূর সম্ভব নিভৃতেই উহা করিয়া থাকে। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বোক্তরূপ

তপস্যার কথা সাধারণে বিদিত থাকা সম্ভবপর নহে। আবার, সংস্কারাধীন মানবমন, সংসারে যাহার সম্বন্ধে যে ধারণা একবার করিয়া বসে, তাহার সম্বন্ধে সে ধারণা সহজে ছাড়িতে চাহে না। সুতরাং বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহে আমরা সমর্থ হইয়াছি, সে সকল অবিশ্বাস করিয়া অনেকে হয়ত আমাদিগের কথা বিষম পক্ষপাতদোষদুষ্ট বিবেচনা করিবে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাই অকপটে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতেছি বলিয়া তাহাতে আমাদিগের চিত্তপ্রসাদের অভাব হইবে না। আমরা বুঝিয়াছি, তুলনায় আলোচনা করিয়া সংসার শীঘ্রই গিরিশচন্দ্রকে মহাকবির উচ্চাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, কিন্তু যে জটিল আধ্যাত্মিক ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহাকে পরম ভক্ত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে মানব সাধারণের বিলম্ব হইবে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, অনুমান ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র পার্কার সাহেবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গালয়ে বেতনভোগী কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রথম গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে আরব্ধ হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'ষ্টার থিয়েটারের' প্রথম প্রতিষ্ঠা এবং স্বল্পকাল পরে উহার সত্ত্বাধিকারী পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্রের কর্ম্ম-জীবনের ঘটনাবলীও আমরা উহাতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অতঃপর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের শ্রীগুরুর কৃপালাভের কথাই আমরা এখন পাঠককে বলিতে অগ্রসর হই।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত ষ্টার থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী পরিবর্ত্তন গিরিশচন্দ্রের পরামর্শেই হইয়াছিল এবং দলস্থ কতিপয় ব্যক্তিই উহার সত্ত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। অভিনয় করায়, থিয়েটারের উপযোগী গ্রন্থ সকলের রচনায়, দেশ কাল ও রঙ্গালয়ের অবস্থার বিচার করিয়া উহার রক্ষার্থ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের কল্যাণের জন্য অসীম সাহসে প্রাণপণ চেষ্টা করা প্রভৃতিতে শ্রীযুত গিরিশের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে লাভ

করাতেই যে, ঐ সকল দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়া ঐ কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা অনেকেই বিদিত আছেন। সুতরাং ঐ রঙ্গালয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত কিছু দায়িত্ব সমস্তই শ্রীযুক্ত গিরিশের উপরে পড়িল এবং তাঁহার একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ঐ দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিলে ঐ সকল ব্যক্তি সর্ব্বস্ব হারাইয়া এককালে পথে দাঁড়াইবে। কিন্তু যথার্থ নেতা নিজ কার্য্য-কুশলতা সম্বন্ধে অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে অদ্ভুত বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন এবং বিপদ্ ও দায়িত্বের সংঘর্ষই তাঁহাতে অপূর্ব্ব শক্তিপ্রকাশ আনয়ন করিয়া থাকে। এক্ষেত্রেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। দলস্থ ব্যক্তিবর্গ শ্রীযুত গিরিশের উপর যতই বিশ্বাস নির্ভর করিয়াছিল, তাঁহার অন্তরের অসাধারণ শক্তিও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে তত অপূর্ব্বভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, এই সময় হইতেই গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক বিষয়সমূহ অবলম্বনে নাটক প্রণয়নে অগ্রসর হন এবং নিজ অসাধারণ প্রতিভাপ্রভাবে স্বল্প কালেই সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পূর্ব্বকথিত তপস্যাদি প্রভাবে শ্রীযুত গিরিশ আধ্যাত্মিক জগতে এখন কত শীঘ্র কি পরিমাণ উন্নতি লাভ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার এই কালের নাটক সকল পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। উহার আলোচনা অন্য এক প্রবন্ধে আমাদের করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে তাঁহার এই কালের একটি অপূর্ব্ব দর্শনের কথামাত্র পাঠককে বলিয়াই আমরা আরব্ধ বিষয়ের অনুসরণ করিব। ঐ দর্শন তাঁহার সুলেখক বলিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। ঘটনাটি শ্রীযুত গিরিশের নিজমুখ হইতে আমরা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি, মানুষকে গুরু করিতে পারিবেন না বলিয়া গিরিশচন্দ্র ৺তারকনাথকে ধরিয়া বসিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি কোনরূপে আবির্ভূত হইয়া মন্ত্রদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। শুধু তাহাই নহে, ঐ বিষয়ে আশু ফললাভের জন্য এখন হইতে

তিনি সিদ্ধপীঠ ৺কালীঘাটে প্রায় প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে গমন করতঃ শ্রীশ্রীজগন্মাতাকেও সকাতরে নিবেদন করিতেছিলেন—'মা, অকিঞ্চন দীন সন্তানকে কৃপা করিয়া দেখা দাও, সন্তান যেরূপই হউক না কেন, মাতার অপার করুণা লাভে সে কখনও বঞ্চিত হয় না, তবে কেন আমায় দেখা দিবে না? মা, লোকে বলে, গুরূপদেশ গ্রহণ না করিলে জগৎপিতা ও তোমার দেখা পাওয়া যায় না—তাহাই যদি সত্য হয়, তবে উপযুক্ত গুরু জুটাইয়া আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, আমি মানুষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুতেই পারিতেছি না! ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছা হইলে তুমি ত সকলই করিতে পার—গুরুলাভ করাইয়া আমাকে দর্শন দাও অথবা অমনিই আমাকে দেখা দাও!'

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'সিদ্ধপীঠে যাইয়া ঐরূপে প্রার্থনায় রাত্রি অতিবাহিত করিতাম, কেননা শুনিয়াছিলাম—করুণাময়ী জগজ্জননী ঐ স্থানে সতত জাগ্রতা থাকিয়া সকলের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করেন। আবার, যূপকাষ্ঠের পার্শ্বে বসিয়া মাকে ঐরূপে ডাকিতাম, কেন না মনে হইত, ঐ স্থান হইতে অনেক প্রাণী জীবনের জন্য কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া মাতার করুণায় অনন্ত জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।—শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রতি, প্রাণে তখন এমনি একটা দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল।'

কৃতকর্ম্ম, অনুষ্ঠাতাকে ফলদান করিবেই করিবে, শীঘ্র বা কিঞ্চিৎ বিলম্বে। এই কালে অনুষ্ঠিত ঐ সকল কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল গিরিশচন্দ্র কিছু বিলম্বে প্রাপ্ত হইলেও উহাদিগের দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস এবং অনুরাগপ্রসূত দর্শন-পিপাসা যে, দিন দিন বিশেষরূপে প্রবৃদ্ধ হইতেছিল একথা, তিনি নিত্য অনুভব করিতেছিলেন। ক্রমে ঐ দর্শনাকাঙ্ক্ষা যখন বিশেষ প্রবল হইল, তখন তাঁহার প্রাণে নিরন্তর একটা ব্যাকুল প্রার্থনা সতত উদিত থাকিত। নির্জ্জনে একাকী থাকিবার কালের কথাই নাই, রঙ্গালয়ের দৈনন্দিন কর্ম্মপরিদর্শন এবং অভিনয় করিবার কালেও তিনি উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন।

শ্রীযুত গিরিশ এইসময়ে অভিনয়ান্তে একদিন নির্জ্জনে অন্ধকারে বসিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকাতরে ডাকিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মনে

হইল, ঘর যেন দিব্য আবেশে পূর্ণ হইতেছে এবং দূর হইতে কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "গিরিশ, তুই আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিস্, আমি আসিয়াছি, ত্যাখ! ইহ জীবনের যত কিছু আশা, ভরসা, আনন্দ, উল্লাস,—সর্ব্বস্ব অন্তর হইতে পরিত্যাগ করিয়া দ্যাখ্, কারণ, নিজে শব না হইলে কেহ কখন শবশিবাকে দেখিতে পায় না এবং আমার দর্শনলাভের পর সংসারে আবার কেহ কখন ফিরিয়া আসে না! অতএব শব হইয়া আমাকে দেখিতে প্রস্তুত হ, মুহূর্ত্ত মাত্র পরেই আমি তোর সম্মুখে আসিতেছি!"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"ঐরূপ শুনিবামাত্র প্রাণভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং এখনি মরিলে আমার পুত্রকন্যার এবং আমার মুখাপেক্ষী আমার দরিদ্র বন্ধুবর্গের কি দশা হইবে, সে সকল কথা যুগপৎ মনে উদিত হইল। তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলাম, 'না,আমি ঐরূপে তোমাকে এখন দেখিতে পারিব না।' তখন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—'আচ্ছা, না দেখিবি ত আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর্, আমার আগমন কখনও ব্যর্থ হয় না, ইহ সংসারে লভ্য যাহা কিছু তোর ইচ্ছা হয়, তাহাই চাহিয়া নে!' তখন রূপরসাদিবিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থ সকলের যে কোনটি চাহিয়া লইব বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, জাগ্রত বিবেকবুদ্ধি তদুপভোগেরই ভীষণ পরিণাম-ছবি জলন্ত বর্ণে অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত হৃদয়ের সম্মুখে ধারণ করিতে লাগিল! তখন সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, 'আমি বর লইব না!' ধীর গম্ভীর স্বরে পুনরায় উত্তর আসিল—'আমার আগমন কখনই ব্যর্থ হইবে না, যদি বরও না লইবি ত আমায় ডাকিয়া আনিলি কেন—আমার অভিসম্পাত গ্রহণ কর্, আমার এ উদ্যত খড়্গ তোর কিসের উপর পাতিত করিয়া বিনষ্ট করিব, তাহা বল্!' শুনিয়া, মনে ভীষণ ভয় হইল; কিন্তু ভয় হইলেও বিবেকবুদ্ধি বলিয়া উঠিল—দেবতাকে মন্দ দ্রব্য দিতে নাই! তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—'মা, সুনট বলিয়া আমার যে সুনাম আছে, তাহার উপরে তোমার খড়্গ পতিত হউক।' উত্তর আসিল—'তথাস্তু!'—পরে আর কিছু দেখিলাম না, শুনিতেও

পাইলাম না। শাস্ত্রে যে বলিতে শুনিয়াছি, দেবতার ক্রোধও বরের তুল্য—'ক্রোধোপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ'—আমি তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কারণ, ঐ দর্শনের পর হইতে সত্য সত্যই আমার নটত্বের যশকে আমার সুলেখক বলিয়া খ্যাতি ক্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।"

পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রীযুত গিরিশের মনে এমন দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি পরজীবনে উহার প্রভাব সর্ব্বদা অনুভব করিতেন এবং প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন, ইহ সংসারের সমস্ত বাসনা কামনা মন হইতে ত্যাগ না হইলে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে কেহ কখন সমর্থ হয় না। বুঝিয়াছিলেন যে, অসদভিসন্ধি তাঁহার মন হইতে অনেকাংশে দূর হইলেও বাসনাসমূহের হস্ত হইতে একবালে মুক্ত হইতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি এখন ৺দেবীর দর্শন লাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ দর্শনের কথা তাঁহার নিকটে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহুবার শ্রবণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমরা উহা তাঁহার নিজ মনেরই বিচিত্র কল্পনা বলিয়া ধারণা করিলেও তিনি কখন তৎসম্বন্ধে ঐরূপ ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকটে উহা মানসিক কল্পনা জল্পনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত, শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপাপ্রসূত এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াই সর্ব্বথা প্রতীয়মান হইত। কিন্তু উহা যাহাই হউক না কেন, উহাতে যে তাঁহার মনে ঈশ্বরবিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কালে তাঁহার দর্শন তিনিও লাভ করিবেন এরূপ ধারণায় উদয় হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ঈশ্বরাবতার ঈশা বলিয়াছেন, "একটি সরিষার মত কণা-প্রমাণ বিশ্বাস যদি তোমার প্রাণে থাকে ত তোমার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইবে—তুমি বৃহৎকায় পাহাড়কে 'এখান হইতে ওখানে সরিয়া যা' বলিলে তোমার কথায় সে নিশ্চয় ঐরূপ করিবে।" সত্যই ধর্ম্মবল ও ঈশ্বরবিশ্বাস এমনি অপূর্ব্ব পদার্থ! শ্রীশ্রীতারকনাথ ও ৺জগন্মাতার উপর গিরিশচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বোক্তভাবে উদিত হইবামাত্র তিনি এখন হইতে নূতন জীবনের অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক নিশ্চিত প্রমাণ সংগ্রহে ১৮৭৮।৭৯ খৃষ্টাব্দে

প্রথম প্রবৃত্ত হওয়াবধি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীগুরুর দর্শন ও কৃপালাভ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে কর্ম্ম করা ভিন্ন নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেয়ঃ-সাধনের জন্য অবসর মত প্রসিদ্ধ দেবস্থান সকলে গমন করতঃ তপস্যা-নুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভাবে তপস্যানুষ্ঠানে শ্রীযুত গিরিশের বিশ্বাসবল ক্রমে এত প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে যে, আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বের ন্যায় ঔষধের সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র বিশ্বাস ও একাগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে অনেক দরিদ্র রোগীকে এইকালে তিনি নিত্য রোগমুক্ত করিতেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অনুমান ভাদ্র মাসে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনীত হইয়া কলিকাতার জনসাধারণকে মোহিত করিয়াছিল। পুস্তকের রচনা এবং অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শকগণের ভগবদ্ভক্তি বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইয়া তাঁহারা যে, থিয়েটার দেখিতেছেন, একথা অনেক সময় ভুলিয়া যাইতেছিলেন। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কুস্থান বলিয়া রঙ্গালয়ের দিক্ মাড়াইতেন্ না, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেও এখন ঐ পুস্তকের অভিনয় দেখিতে আকৃষ্ট হইলেন এবং গ্রন্থকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভায় রঙ্গালয় এখন সাধারণের ভিতর সুভাব ও সুরুচির বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে নানা ভাবে শিক্ষা দিয়া নিজ অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল।

কলিকাতার তিন চারি মাইল উত্তরে, ভাগীরথীতীরে অবস্থিত, প্রথিতযশা রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বাস করতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইতিপূর্ব্বে উপদেশাদি প্রদান করিয়া কলিকাতা নগরীর বহুলোকের চিত্তে ধর্ম্মলাভের বিশেষ পিপাসা উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। প্রতিনিয়তই এই সময়ে বহুব্যক্তি ঐস্থানে তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বালকবৎ সরলতায়, অপূর্ব্ব দীনতায়, সর্ব্বধর্ম্মমতসমন্বয়কারী মর্ম্মস্পর্শী কথায়, মধুময় ভজন সঙ্গীতে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরানুরাগ প্রসূত অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব ও মুহুর্মুহুঃ সমাধিতে এবং দুর্ব্বল মানবের প্রতি অপার করুণায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্ত, মহাপুরুষ বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া ধারণা করিয়া তাঁহার পুণ্য

দর্শন লাভে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিল। ঐরূপে কলিকাতা হইতে নিত্য বহু জনসমাগমে ঐ নগরীর ভাল বা মন্দ সমস্ত তৎকাল-প্রচলিত সংবাদ ও আন্দোলন এইকালে তাহাদের প্রমুখাৎ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত। 'চৈতন্য লীলা' নাটকের অভিনয়সুখ্যাতি ঐরূপে এখন তিনি শুনিতে পাইলেন এবং উহার দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করায় কয়েক-জন বিশিষ্ট ভক্ত দিন স্থির করিয়া তাঁহাকে উহা দেখিতে লইয়া আসিলেন। সে দিন ৫ই আশ্বিন, ইংরাজী ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তগণপরিবৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গাড়ী, ষ্টার থিয়েটারের (৬৮নং বিডন্ ষ্ট্রীট) সম্মুখে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ভক্ত শশব্যস্তে গাড়ী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রঙ্গালয়ের বহিঃ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন এবং গিরিশচন্দ্রকে তথায় দেখিতে পাইয়া সমীপে আসিয়া বলিলেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে (টিকিটের মূল্য না গ্রহণ করিয়া) বসিতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।" গিরিশচন্দ্রের বাসপল্লীতে শ্রীযুত মহেন্দ্রের আবাস থাকায় তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। গিরিশ তাঁহার কথার উত্তরে বলিলেন, "তাঁহার (পরমহংসদেবের) টিকিট লাগিবে না, কিন্তু অপর সকলের টিকিট লাগিবে।" গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি, দেখিলাম—তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের Compound (বহিঃপ্রাঙ্গণ) মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, আমি না নমস্কার করিতে করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন; আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই ত দেখিতেছি চলিবে। আমি (তখন) মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি boxএ (পৃথক্ স্থানে) বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতাবশতঃ বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই আমার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) তৃতীয় দর্শন।"*

* জন্মভূমি পত্রিকা, ১৩১৬ সালের আষাঢ়ের সংখ্যা।

গিরিশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দুইবার দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ দর্শনকালে তাঁহার মনে যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাও তিনি তাঁহার 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত গিরিশচন্দ্রের জীবন ঘনসম্বন্ধ থাকায় ঐ দুই দর্শনের কথাও পাঠকের এখানে জানা ভাল।

"বহুদিন পূর্ব্বে Indian Mirrorএ দেখিয়াছিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন 'হরি' 'মা' প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক 'পরমহংস'ও খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন্। তাহাব কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বস্থপাডায় ৺দীননাথ বসুব বাড়ীতে সেই পবমহংস আসিযাছেন, কৌতূহলবশতঃ দেখিতে যাইলাম—কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথ বসুর বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশব বাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পবমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে?' আমি এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা হইয়াছে, কি—না।' আর কি দেখিব, চলিয়া আসিলাম।

"ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৺বলরাম বসুর ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম, পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরাম বাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোকসমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম,

যাহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনার পরিচয় দেয়, তাহারা কাহারো সহিত কথা কয় না, কাহাকেও নমস্কার করে না, তবে কেহ যদি অতি সাধ্য সাধনা করে, পদসেবা কবিতে দেয়। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমি স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি আমাব পূর্ব্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য কবিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্চে।' কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পবমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, 'চল, আর কি দেখ্‌বে?' আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ্ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।"

গিরিশচন্দ্র স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবেব প্রথম দর্শনকালে তাঁহার মহিমা তিনি কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। গভীর সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনে ঐকালে বাহ্যবস্তুর স্মৃতিমাত্রের যে, এককালে লোপ হয় এবং সমাধিভঙ্গ হইবাব কালে (বাহ্য) জগতের নাম রূপ সকলের জ্ঞান যে, তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় আনয়ন করিতে হয়—একথা, শ্রীযুত গিরিশ তখন বুঝিবেনই বা কিরূপে! কিন্তু পরমহংসদেবেব অদৃষ্টপূর্ব্ব দীনতা যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দর্শনকালে ৺গিরিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির হস্ত অতিক্রম করিতে পাবে নাই, তাহার কারণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি ইতিপূর্ব্বে নিজ দম্ভের জন্য নানাভাবে অশান্তি পাইয়াও উহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। জীবনে যথার্থ দীনতালাভের জন্য সচেষ্ট গিরিশ সেজন্যই উহার মূল্য ইতিপূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন এবং যে পুরুষে ঐ গুণের প্রকাশ দেখিতেছিলেন, তাহাকেই শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিতেছিলেন। অভাববোধেই গিরিশের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল এবং ঐ শ্রদ্ধাই তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আচরণে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রীযুত গিরিশ যে এখন নিজ অন্তরের দম্ভ

পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ দীনতা লাভের জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নের ঘটনাটি হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঘটনাটি তাঁহার তৃতীয়বার দর্শনলাভের কিছু পূর্ব্বে বা পরে উপস্থিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি, 'চৈতন্য-লীলা' রচনার সময়ে তিনি একজন প্রাচীন চিত্রকরকে নিযুক্ত করিয়া ঐ পুস্তকাভিনয়ের উপযোগী দৃশ্যপটসমূহ অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। কর্ম্মানুরোধে তাঁহাকে তখন ঐ চিত্রকরের নিকট অনেক সময় থাকিতে হইত, সুতরাং কর্ম্মাবসরে তাহার সহিত তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তাও হইত। চিত্রকর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিল, এবং তাহার অভীষ্টদেব শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলাভিনয় হইবে জানিয়া বিশেষ আনন্দের সহিত চিত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ সরলবিশ্বাসী ভক্তের সহিত গিরিশচন্দ্র একদিন শ্রীগৌরচন্দ্রের মহিমাসূচক কথার অবতারণা করিলেন। চিত্রকর আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিল—'মহাশয়, পতিতপাবন গৌরের মহিমার কথা আপনাকে কি আর বলিব!—এ অধমের প্রতিও তাঁহার এত কৃপা যে, পরিশ্রম করিয়া যাইয়া দিনান্তে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে ভোগ দিবার পর যখন মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে বসি, তখন দেখিতে পাই, সত্য সত্যই গৌর আমার, ঐসকল খাদ্যের কিঞ্চিদংশ গ্রহণ করিয়াছেন—রুটি, লুচি নিবেদন করিয়া উহাতে তাঁহার দাঁতের স্পষ্ট দাগ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। শ্রীগুরুর কৃপাতেই আমার ঐ সৌভাগ্য হইয়াছে! এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে কখনই হইত না।"

চিত্রকর সরলভাবে তাহার সামান্য কথাগুলি বলিল, গিরিশের প্রাণে কিন্তু উহা বিষমাঘাত প্রদান করিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, হায়, এই নগণ্য ব্যক্তির প্রাণে ধর্ম্মবিশ্বাস যে শান্তি আনয়ন করিয়াছে, তাহা হইতে আমি এখনও কতদূরে রহিয়াছি!' প্রবল ব্যাকুলতার তাড়নায় গিরিশচন্দ্র আর কথা কহিতে পারিলেন না, অন্য গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাতর ক্রন্দনে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিজ মনোবেদনা জানাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাব অল্পকাল পরেই গিরিশের ভাগ্যে চতুর্থবাব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ হয় এবং এতদিনে কালপূর্ণ হওয়ায় তিনি শ্রীগুরুর কৃপালাভে ক্রমে ক্রমে শাস্তিলাভ করিতে থাকেন। ঐ সকল কথা তাঁহাব নিজ মুখ হইতেই পাঠকের শুনা ভাল।

"(চিত্রকরের সহিত পূর্ব্বকথিত) ঐ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণ বশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তার একটি রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম, চৌরাস্তাব পূর্ব্বদিক্ হইতে নারায়ণ * ও আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সে দিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার নমস্কাব করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথাব দক্ষিণদিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন—কে, আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, 'পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।' আমি চলিলাম, পরমহংসদেব বলবাম বাবুব বাটীতে উঠিলেন, আমি তাঁহাব পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম।

"বলরামবাবু বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরামবাবুর সহিত দুই একটী কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া, 'বাবু আমি ভাল আছি, বাবু আমি ভাল আছি' বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহাব পর বলিতে লাগিলেন—'না, না, ঢং নয়—ঢং নয়।' অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'গুরু কি?' তিনি বলিলেন, 'গুরু কি জানো—যেন ঘটক।' আমি

* ইঁহার আবাস বাগবাজার বসুপল্লীতে থাকায় শ্রীযুত গিরিশ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ভক্তটির সহিত পরিচিত ছিলেন।

ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন, 'তোমার গুরু হয়ে গেছে'। 'মন্ত্র কি'? জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'ঈশ্বরের নাম।' দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'রামানন্দ প্রত্যহই প্রাতঃস্নান কবিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে কবীর নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামানন্দ নামিতে নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই রামনাম কবীরের মন্ত্র হইল। আর সেই নাম জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।' থিয়েটারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন—'আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখাইও'। আমি উত্তর করিলাম, 'যে আজ্ঞে, যেদিন ইচ্ছা দেখিবেন।' তিনি বলিলেন, 'কিছু নিও'। বলিলাম, 'ভাল, আট আনা দিবেন।' পরমহংসদেব বলিলেন—'সে বড় র‍্যাঞ্জলা জায়গা।' আমি উত্তর করিলাম, 'না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসিবেন'। তিনি বলিলেন, 'না, একটী টাকা নিও।' আমি 'যে আজ্ঞে' বলায় একথা শেষ হইল।

"বলরামবাবু তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটী সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। আমারও ইচ্ছা ছিল, কে কি বলিবে লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলরামবাবুর বাটী হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন দেখিলেন?' আমি বলিলাম—'বেশ ভক্ত।' তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্য হতাশ আর নাই। ভাবিতেছি—গুরু করিতে হয় মূর্খে বলে। এই ত পরমহংসদেব বলিলেন, 'আমার গুরু হয়ে গিয়েছে, তবে আর কার কথা শুনি?'

"যে কারণ মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, যে আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম—এত কেন? গুরুও

মানুষ, শিষ্যও মানুষ; তাঁহার নিকট জোড়হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ্ জোটান মাত্র। পরমহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন দিন উঠে। বলরামবাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, 'পরমহংসদেব আসিয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'ভাল, Boxএ লইয়া গিয়া বসান'। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না!' আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নাম্‌তে পার্‌বেন না!' কিন্তু গেলাম। আমি পৌঁছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, আমি একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল লইয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন—'ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব?'

"Dress circle এর দর্শকের concertএর সময় বসিবার জন্য Star Theatreএর দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটী কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর একখানি চৌকিতে

বসিলাম। কিন্তু দেবেন বাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। দেবেন বাবুর সহিত আমার আলাপ ছিল। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম, 'বসুন না'। কিন্তু তিনি অসম্মত, কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাবনিমগ্ন হইলেন। একটি বালক ভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুপূর্ব্বে আমি এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম, এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল। পরমহংসদেবের ভাবভঙ্গ হইল। তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'তোমার মনে বাঁক আছে।' আমি ভাবিলাম, অনেক প্রকার বাঁক ত আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাঁক যায় কিসে?' পরমহংসদেব বলিলেন—'বিশ্বাস করো'।"

"আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেলা তিনটায় সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, একটু চিরকুট পাইলাম যে, মধুরায়ের গলি রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌ-রাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথ বাবুর বাজারের নিকটে গিয়া ভাবিলাম, 'যাইব না'। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রাম বাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আমি তথায় গিয়াছি? আমি বলিলাম,

'পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে।' রামবাবুর বাটীর নিকটেই সুরেশ (সুরেন্দ্র) বাবুর বাটী। তিনি তথায় আমায় লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সে সব কথা ভাল লাগিল না। আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে, রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে—'নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।' আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামবাবুর আঙ্গিনা টল্‌মল্‌ করিতেছে! আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম, তাঁহার নিকট গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণ স্পর্শের বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সংকীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার মনের বাঁক যাইবে ত?' তিনি বলিলেন, 'যাইবে'। আমি আবার ঐ কথা বলিলাম। তিনি ঐ উত্তর দিলেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ় স্বরে আমায় বলিলেন,—'যাওনা, উনি বল্‌লেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত করছ?' এরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে কখন ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহন বাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম, ইনি সত্যই বলিয়াছেন; যাহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার

বলিলেও ত তাঁহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম। দেবেনবাবু কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।"*

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তিখণ্ডন। †

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।)

(৭)

পুনরায় যদি বলা হয়, পূর্ব্বে যেমন আচার্য্য রামানুজ মতে "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি শ্রুতির "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" বাক্যে জ্ঞানাতিরিক্ত ধ্যানেই লক্ষ্য, তদ্রূপ এখানেও "বিদিত্বা" পদেও ধ্যানোপাসনাদি লক্ষ্য। আর তাহা হইলে জ্ঞানের পরই মুক্তি হয়, ইহা স্বীকারের কোন প্রয়োজন হয় না, পরন্তু জ্ঞানের পর ধ্যানোপাসনাদির ফলে মুক্তি হয় ইহাই সিদ্ধ হইল। আর এরূপ অর্থ করিলে "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্" এবং "আত্মানমেব লোকমুপাসীত"

---

* "জন্মভূমি, ১৩১৬ সাল আষাঢ় 'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব' শীর্ষক প্রবন্ধ।

† এই প্রবন্ধে আমরা অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আচার্য্য রামানুজের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের অদ্বৈতবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি এবং এজন্য আমরা আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্য অবলম্বন করিয়াছি। পরন্তু এই শ্রীভাষ্যখানি বিচারবহুল বিপুল গ্রন্থ বলিয়া আমরা ইহার প্রারম্ভ হইতে ইহার এক একটী বিচার্য্যবিষয় অবলম্বন করিয়া এক একটী স্বাধীন প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। পরন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধটী দীর্ঘ হইয়া পড়ায় ইহার পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। সুতরাং এই প্রবন্ধটী পড়িবার কালে ইহার পূর্ব্বার্দ্ধটী স্মরণ করা একান্ত আবশ্যক।

ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ধ্যানোপাসনাদি কর্ম্মেরও সার্থকতা থাকে। কারণ, "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন "বিজ্ঞায়" পদ লক্ষিত জ্ঞানের পর জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু করিবার বিধান দেখা যাইতেছে এবং "ধ্যায়থ" ও "উপাসীত" শ্রুতিতে যখন ধ্যান উপাসনার বিধান রহিয়াছে এবং ধ্যানোপাসনাদি যখন জ্ঞাত বিষয়েরই সম্ভব এবং জ্ঞানাতিরিক্ত হইতেছে, তখন এই উভয় শ্রুতির মর্য্যাদা-রক্ষার্থ জ্ঞানের পর ধ্যানোপাসনাদি করিতে হইবে, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। আর জ্ঞানের পর ধ্যানোপাসনাদি কর্ম্ম বিহিত হওয়ায় জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদও ভঙ্গ হয় না, কারণ, বেদান্তবাক্য অবলম্বন করিয়া ভগবানের স্বরূপ স্মরণ করিয়াই তাঁহার উপাসনাদি করিতে হয়। সুতরাং একই কালে একই ব্যক্তি বেদান্তবাক্যার্থ জন্য জ্ঞান অবলম্বন ও উপাসনা করিয়া থাকে। এইজন্য বলিতে হয়, "বিদিত্বা" পদে জ্ঞান নহে, উহার অর্থ ধ্যানোপাসনাদি এবং তাহার ফলে অদ্বৈতবাদীর উদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণ বলবত্তর নহে।

উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন—না—একথা ঠিক নহে। কারণ, "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানের পর জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু করিবার বিধান আছে, ইহা কে বলিল? আমরা ইহা স্বীকার করি না। দ্বিতীয়, জ্ঞানের পর কিছু করিবার বিধি থাকাতেই যে তাহা ধ্যান উপাসনাকে লক্ষ্য করিবে, তাহার কোন ঐকান্তিক প্রমাণ নাই। কারণ, ইহারা এক প্রকরণের কথা নহে। যাহা হউক এ সব কথা ক্রমে বলিতেছি। তাহার পর আচার্য্য যদি "বিদিত্বা" শব্দের অর্থ ধ্যান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরাও উপাসনা ও ধ্যানের অর্থ কি জ্ঞান করিতে পারি না? স্থলবিশেষে একই শব্দ ভিন্ন অর্থবোধক হইয়া থাকে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন ধনের উপাসনা এবং ধনীর উপাসনা, কখনই এক হইতে পারে না, তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম বা দেবতা প্রভৃতির উপাসনা যে একই হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। কিন্তু তাহাও আমরা করিতে চাহি না। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি, ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন কালে বা নিতান্ত নিঃশ্রেয়সলাভোপায়

বর্ণনকালে বেদান্ত মধ্যে কোথাও ধ্যান ও উপাসনার্থক ধাতুনিষ্পন্ন পদ প্রযুক্ত হয় নাই। যেখানে ধ্যান ও উপাসনার্থক ধাতুনিষ্পন্ন পদসাহায্যে ব্রহ্মলাভ, বা ব্রহ্মের অবগতির কথা বলা হইয়াছে, সেইখানেই আরোপ-বুদ্ধির কথা আছে, সেইখানেই আত্মাকে 'কোন কিছু' বা 'কোন কিছুকে' আত্মা বলিয়া ভাবিবার কথা আছে; অর্থাৎ সেইখানেই প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। আর ইহার ফল তথায় যশঃ, ঐশ্বর্য্য, বলবীর্য্য প্রভৃতি অভ্যুদয়ের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি এই আরোপবুদ্ধি কর্ত্তৃতন্ত্র-ব্যাপার। ইহাতে বস্তুতন্ত্র ভাবের নামগন্ধ নাই। অর্থাৎ ইহা কর্ত্তার ইচ্ছাসাধ্য ব্যাপার—কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মকে ওরূপভাবে নাও ভাবিতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুতন্ত্র হওয়ায়, সর্প দেখিলে যেমন লোকের সর্পজ্ঞান হইতে বাধ্য, ঘট দেখিলে যেমন লোকের ঘটজ্ঞান হইতে বাধ্য, তদ্রূপই হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের পক্ষে জ্ঞা ও বিদ্ প্রভৃতি জ্ঞানার্থক ধাতুনিষ্পন্ন পদকে যেমন ধাতুর নিজের অর্থে রক্ষা করা যায়, আচার্য্য রামানুজমতে তাহা করা যায় না। আমরা ধ্যান উপাসনাকে ধ্যান-উপাসনাই বলিব ও জ্ঞানকে জ্ঞানই বলিব। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ ধ্যান-উপাসনাকে ধ্যান-উপাসনাও বলিবেন অধিকন্তু নিজমত সমর্থনার্থ জ্ঞানকেও ধ্যান-উপাসনা পদবাচ্য করিবেন। দেখ না কেন,—আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত আত্মার ধ্যান ও উপাসনা-কর্ত্তব্য-বোধক যে দুইটী শ্রুতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যথা "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" এবং "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্," তাহাতে "ওকার" ও "লোক" শব্দবাচ্য পদার্থদ্বয় প্রতীক ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং এরূপে আমাদের পক্ষ যেরূপ নির্দ্দোষ, আচার্য্যপক্ষ সেরূপ নির্দ্দোষ হইতে পারিল না।

যদি বলা হয়, জানিবার পরও যখন বিধান দেখা যাইতেছে, তখন "বিজ্ঞায়" ও "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" এই বাক্যদ্বয়ের জ্ঞানার্থ করিলে জানিবার পর আবার জানারই ব্যবস্থা অর্থাৎ পিষ্টপেষণ (একবার যাহা পিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে আবার পেষণ করা যেমন নিরর্থক, তদ্রূপ বৃথা পুনরুক্তিদোষ) হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং ইহা অসঙ্গত।

তাহা হইলে এতদুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ইহাতে সে দোষ হইতে পারে না। কারণ, আমরা এস্থলে প্রথম জানার অর্থ সামান্যভাবে জানা এবং দ্বিতীয় জানার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বা বিশেষভাবে জানা এইরূপ বলিতে পারি। সকলেই আমরা দেখিতে পাই, কোন নূতন বিষয় অবগত হইবার সময় আমাদের কত ভুল ভ্রান্তি ঘটে, আমাদের কত সংশয় ও বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয় এবং সেই সকল ভুল ভ্রান্তি, সংশয় ও বিপরীত-বুদ্ধি দূর করিবার জন্য আমাদের তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ ও আলোচনা করিতে হয়, সুতরাং জানা ব্যাপারের মধ্যে যে সামান্য বিশেষভাব বিদ্যমান থাকে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। এখন জ্ঞানের এই সামান্য বিশেষ বা উন্মেষ ও প্রকাশ ভাবটীকে লক্ষ্য করিয়া আমরা যদি "বিদিত্বা" শ্রুতিকে বিশেষভাবে জানা বলি, তাহা হইলে আর কোন দোষ থাকিতে পারে না।

তাহার পর আচার্য্যমতে "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত", "ধ্যায়থ আত্মানম্", "উপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ যেমন জ্ঞানের পর ধ্যানোপাসনাদি সিদ্ধ করা হয়, আমাদের মতেও তদ্রূপ "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ", "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষার্থ জ্ঞানের পর আর কিছুই নাই ইহাই প্রমাণিত হয়, ইহা আমরা বলিয়া থাকি। এ সকল স্থলে জ্ঞানার্থক "জ্ঞা" ও "বিদ্" ধাতুরই একার্থতা রক্ষিত হয় পক্ষান্তরে আচার্য্য রামানুজ মতে যে একবাক্যতা করা হয়, তাহাতে জ্ঞানার্থক ধাতুকে ধ্যানোপাসনার্থে পরিণত করা হয়।

আর যদি বলা হয়, এই দোষ তাহা হইলে আমাদের মতেও হইবে, কারণ, আমাদের মতে "আত্মাকে ধ্যান করিবে" এবম্বিধ বাক্যের অর্থ হইবে "আত্মাকে জানিবে", সুতরাং আমাদের মতেও জ্ঞানার্থক ও উপাসনার্থক ধাতুকে জ্ঞানার্থে পরিণত করা হইল। নচেৎ "ধ্যায়থ আত্মানম্" "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" শ্রুতির অর্থ হইবে না। তাহা হইলে বলিব, না,তাহা নহে। কারণ,প্রথমতঃ ইহা ঠিক নিতান্ত নিঃশ্রেয়স লাভার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই নহে। যেহেতু এখানে ওঙ্কার ও লোক প্রভৃতি প্রতীকের সাহায্যে যশঃ বল বীর্য্য প্রভৃতি অভ্যুদয়ের কথা আছে।

আর যদি ঐ অভ্যুদয়ের পর প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয় বলিয়া উহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বলিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই ধ্যান উপাসনাকে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞানের উপায় অথবা জ্ঞানের বিঘ্ননিবারক বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। ঠিক এক অর্থ করিব না। কারণ, আমাদের মতে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ হইয়া যায়, দেহাদি সবই এই স্থলেই বিলীন হয়, তাহার আর কোনও ক্রিয়া থাকে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতিতেও আছে, যথা, "ইহৈব প্রবিলীয়ন্তে", "তদা কেন কং পশ্যেৎ", "একীভবন্তি" ইত্যাদি। ধ্যানাদিকে জ্ঞানের উপায় বা বিঘ্ননিবারক বলিলে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, বেদান্তবাক্যার্থ হইতে যে জ্ঞান হয়, ধ্যানাদি তাহার প্রতিবন্ধক প্রভৃতি নিবারণ করে মাত্র, কিন্তু অন্য কোন ফল প্রসব করে না। কিন্তু আচার্য্য রামানুজের মতে ইহা অন্য ফল প্রসব করে। তাহার পর এই প্রতিবন্ধক যদি কাহারও আদৌ না থাকে, তাহা হইলে এই ধ্যানাদির আদৌ প্রয়োজনই হইল না, সুতরাং দেখা যায়, বেদান্তের বাক্যার্থজ্ঞানেই মুক্তি হয়, ধ্যানোপাসনাদিদ্বারা নহে। অগত্যা বলিতে হয়, "ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই" একথা যুক্তিযুক্তই হইল এবং "বিদিত্বা" শ্রুতির অর্থ ধ্যানোপাসনাদি নহে পরন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ বিশেষ জ্ঞান, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এই জন্যই বলি, আমাদের শ্রুতিপ্রমাণই বলবত্তরা হইতেছে।

এখন যদি বলা হয়, "ধ্যায়থ", "উপাসীত" "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ধ্যান ও উপাসনার বিধি রহিয়াছে এবং "তমেব বিদিত্বা" শ্রুতিতে কোনও বিধি নাই, পরন্তু মুক্তির পথবিষয়ক বর্ণনমাত্র রহিয়াছে। এখন গুরু যদি শিষ্যের নিকট কোনও পথবিশেষের বর্ণন করেন এবং অন্য সময়ে অন্য পথবিশেষের অনুসরণ করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে শিষ্য সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারে যে, শেষোক্ত পথই সমীচীন পথ এবং তাহাই তাহার অনুসরণীয়। সুতরাং বিধিবোধক শ্রুতির নিকট বর্ণনবিষয়ক শ্রুতি কখন বলবত্তরা হইতে পারে না, আর তজ্জন্য "বিদিত্বা" শ্রুতি বলবত্তরা নহে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—না, তাহা হইতে পারে না। আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত উক্ত বিধিবোধক শ্রুতি অপেক্ষা আমাদের এই "বিদিত্বা" শ্রুতি নিশ্চয়ই বলবত্তরা। কারণ,—এই বিধি ঠিক বিধি নহে—ইহা বিধিচ্ছায়া। এখন দেখা যাউক, আমরা পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলিকে বিধি না বলিয়া বিধিচ্ছায়া অর্থাৎ "আপাততঃ দেখিতে বিধির মত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিধি নহে",—একথা বলিতেছি কেন? বেদের কর্ম্মকাণ্ড আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহাতে যে সকল বিধি রহিয়াছে, তাহাতে মনুষ্যের যুক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ, তথায় দেখা যায়, 'এই মন্ত্রটী বলিয়া এই কার্য্য কর তোমার এইরূপ ফল হইবে', এই ভাবেই সমুদয় কর্ম্ম বিহিত রহিয়াছে, এবং তাহার ব্যতিক্রম করিলে অভীষ্ট ফললাভ হয় না, ইহাও কথিত হইয়াছে। কেন এরূপ করিলে এই ফল হয়, এবং কেন এরূপ না করিলে সে ফল হইবে না, ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য বিষয়। কিন্তু যদি এই বিধি কোন সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিদ্যমান বস্তু-জ্ঞানবিষয়ক হয়, তাহা হইলে তাহার হেতু বুঝিতে বাকী থাকেনা। ইহার কারণ এই যে, কর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধিটীর বিষয় ভব্যবস্তু, উহা অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত থাকে এবং সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞানটী ভূতবস্তু, উহা তখন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্য কর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি ও বিদ্যমান বস্তুজ্ঞানবিষয়ক বিধি কখনই একরূপ হইতে পারে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, ব্রহ্মসম্বন্ধেও সেই কথা। ব্রহ্ম—স্বরূপতঃ ভূত অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান বস্তু। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুর অন্বেষণে সকলেই ইহার অস্তিত্ব বিষয় কল্পনা করিতে সক্ষম হয়,—এই নশ্বর জগতের আদি কারণ অনুসন্ধানে উৎসুক হইয়া সকলেই ইহার অভিমুখে চিন্তা করিতে অগ্রসর হয়। সুতরাং ইহার জ্ঞানলাভার্থ যে বিধি, তাহা কর্ম্মবিধির ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধির অগম্যা বিধি নহে, আর এই জন্যই এই বিধিকে বিধির ছায়া বলা হয়, ইহা ঠিক বিধিপদবাচ্য হইতে পারে না।

তাহার পর, যাহা অনুভব করিবার বিষয় তাহার সম্বন্ধে যখন অভিজ্ঞের

মুখে শুনিয়া একটা জ্ঞান লাভ করা যায়, তখন তাহার সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট জ্ঞানলাভের জন্য যে, সে সম্বন্ধে ধ্যান বা গভীর চিন্তা করিতে হয়, তাহাও কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। ইহা মানব নিজ নিজ সহজ বুদ্ধিতেই আপনা আপনিই বুঝিতে পারে। বাস্তবিক ব্রহ্মবস্তুও আমাদের অনুভবের জিনিষ, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে স্পষ্ট বা পূর্ণজ্ঞানের জন্য যে, গুরুবাক্য ও শ্রুতি-বাক্য পুনঃ পুনঃ আলোচনা এবং গভীর চিন্তা করা আবশ্যক, তাহা এ পথের পথিকমাত্রেই নিজে নিজেই বুঝিয়া থাকে; এজন্য আর বিধির আবশ্যকতা নাই। তবে এক্ষেত্রেও যে, গুরু বা মাতৃস্থানীয়া শ্রুতিদেবী আদেশ বা বিধি দেন, তাহা শিষ্য ও সন্তানের প্রতি স্নেহাতিশয্যের ফল, তাহা প্রকৃত বিধি হইতে পারে না, তাহা বিধির ছায়াবিশেষ। এখন প্রতিপক্ষ বলুন দেখি, তাঁহার "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ও "ধ্যায়থ" প্রভৃতি শ্রুতি বলবত্তরা, কি, আমাদের "বিদিত্বা" শ্রুতি বলবত্তরা? আমরা এই জন্যই আচার্য্য-রামানুজের উদ্ধৃত "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" প্রভৃতি শ্রুতিগুলিকে আমাদের উদ্ধৃত "বিদিত্বা" প্রভৃতি শ্রুতির অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। আর তাহা হইলে আচার্য্যের "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ও "বিজ্ঞানাতি" শ্রুতির অর্থ হইবে বিশেষ করিয়া জানা;—লোকে যেমন অপরের মুখের কথা শুনিয়া জানে, ইহা সে রকমের জানা নহে, পরন্তু ইহা নিজের অনুভূত বিষয় জানার ন্যায় জানা, এ জানার ভিতর কোন সংশয় বা অজ্ঞানলেশ থাকে না। আর এইরূপ করিতে হইলে বেদান্তবাক্য শ্রবণের পর মনন ও তৎপরে নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" বলিলে যে ভাবের জানার কথা বলা হয়, মনন, নিদিধ্যাসন তাহার উপায়-স্বরূপ। আরও দেখ, এইরূপ অর্থ করিলে "প্রজ্ঞা" শব্দের ধাতু ও "নিদিধ্যাসন" শব্দের ধাতুকে একার্থক করা হইল না, পক্ষান্তরে আচার্য্য রামানুজ-মতে তাহা করিতে হইয়াছে; সুতরাং দেখা গেল, আমাদের মতে শ্রুতি-বাক্যের মর্য্যাদা অধিক রক্ষিত হয়।

যদি বল লৌকিক যুক্তিতে দেখা যায়, যাহাকে জানা হয় তাহারই

ধ্যানোপাসনাদি সম্ভব—যাহার বিষয় জানা নাই, তাহার ধ্যানোপাসনাদি হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানের পর ধ্যানোপাসনাদি কর্ত্তব্য এবং তাহাই মুক্তির অব্যবহিত সাধন।

উত্তরে বলিব, না, একথাও ঠিক নহে। কারণ, লোকমধ্যেও দেখা যায়, জ্ঞানের পর যেমন ধ্যানের সম্ভাবনা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ ধ্যানের পরও আবার জ্ঞানের সম্ভাবনা সিদ্ধ হয়, এখন জ্ঞানের পর ধ্যান ও ধ্যানের পর জ্ঞান সম্ভব হওয়ায়, উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ প্রতীত হয় যে, চিন্তাসম্ভূত অস্পষ্ট বা সামান্য জ্ঞানের পর স্পষ্ট বা বিশেষ জ্ঞানের জন্য ধ্যান আবশ্যক, অস্পষ্ট বা সামান্য জ্ঞানের জন্য ধ্যানের উপযোগিতা নাই, ইহার কারণ—শ্রবণ। সুতরাং আচার্য্য রামানুজ— ধ্যানের ফল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবং তখন তাঁহার উপাসনায় তাঁহার প্রসাদলাভ ঘটে এবং তাহার ফলে অজ্ঞাননিবৃত্তিসূচক মুক্তি হয়, সুতরাং জ্ঞানের পর ধ্যান বিহিত—ইহা বলিতে পারেন না। আসল কথা, জ্ঞানের পর ধ্যান হইতে আমাদের আপত্তি নাই, যদি ঐ জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জ্ঞান বলা হয়, এবং এই ধ্যানের ফলে জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু যদি না হয়। যদি বলা হয় এই ধ্যানের ফল—ভগবৎসাক্ষাৎকার, কিন্তু জ্ঞান নহে, তাহা হইলেই আমাদের আপত্তি। কারণ, আমরা এই সাক্ষাৎকারকে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা বলি। লোকমধ্যেও দেখা যায়, যাহার সাক্ষাৎকার হয়, তাহার জ্ঞান স্পষ্টতর হইয়া থাকে। সুতরাং ধ্যানের ফল জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। আচার্য্য রামানুজ এই সাক্ষাৎকারের পর তাঁহার উপাসনা করিয়া ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয় এবং তৎপরে মুক্তি হয়, ইহা বলেন। ইহা কিন্তু আমাদের স্বীকার্য্য নহে। ভগবৎ-প্রসাদলাভ ও সাক্ষাৎকার এবং মুক্তি, আমাদের মতে একই জিনিস। কারণ, ভগবান্ই আমাদের আত্মা; আমাদের মতে ভগবানে ও আমাদের আত্মায় কোন ভেদ নাই। উপাসনা হইলে ভেদ থাকা আবশ্যক, সুতরাং এস্থলে উপাসনা সম্ভব নহে এবং এই উপাসনার ফলে মুক্তি, ইহাও সুতরাং ঠিক নহে।

যদি বল, সাক্ষাৎকারকে আমরা জ্ঞান বলিতেছি কেন? তাহা

হইলে বলি, ভগবান্ সম্বন্ধে অন্য প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, তিনি অরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, ইত্যাদি। অধিকন্তু "তাঁহাকে জানিলে কে কি দিয়া দেখিবে, কে কি দিয়া শুনিবে ও জানিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ঐ কথাই প্রমাণ করিয়া দেয়, অধিকন্তু যে শ্রুতিতে নিদিধ্যাসনের কথা আছে, সেই শ্রুতিতেই নিদিধ্যাসনের ফল যে বিজ্ঞান তাহাও বলা হইয়াছে। যথা—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আচার্য্য রামানুজ এই শ্রুতির "নিদিধ্যাসিতব্যো" পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া অবশিষ্টাংশের উদ্ধার করেন নাই। এই শেষাংশ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, নিদিধ্যাসনের ফল বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। সুতরাং সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া অথবা ব্রহ্মজ্ঞান—এসব একই কথা। অগত্যা বলিতে হইবে, লৌকিক যুক্তিতেও আমাদের অভীপ্সিত জ্ঞানের পর ধ্যানের স্থান নাই এবং এই ধ্যানোপাসনাদি মুক্তির প্রকৃত পূর্ব্ববর্ত্তী সাধন বা কারণ নহে। আচার্য্য শঙ্কর, বেদান্তদর্শনের চতুর্থ-সূত্রের ভাষ্যে এ কথা অতি স্পষ্ট ভাষায় অতি উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।†

তাহার পর আরও এক কথা এই যে, বেদান্তের বাক্যার্থ শ্রবণের পর মনন নিদিধ্যাসনের কথা আছে, ইহাও সকল অধিকারীর পক্ষে সঙ্গত হইবে না। যাহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক আছে, তাহারই এসব প্রয়োজন। কারণ, লোকমধ্যে ইহাও দেখা যায় যে, গুরু শিষ্যের মধ্যে যখন গুরু শক্তিসম্পন্ন হয়েন, তখন সেই গুরুবাক্যে এমন একটা সামর্থ্য থাকে যে, শিষ্য উহা শুনিবামাত্র উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বাধ্য হয়। আর যদি উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হয়—শিষ্যের চিত্ত যদি সমাহিতস্বভাব হয়, তাহা হইলে নিতান্ত দুরবগাহ বিষয়ও শিষ্যকে একাধিকবার শুনিতে হয় না। শুকদেব শুকপক্ষী জন্মে বৃক্ষে থাকিয়া হরপার্ব্বতীর কথা

† এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কৃত সানুবাদ বেদান্তদর্শন ৮৮।৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শাঙ্কর অদ্বৈত মত বুঝিবার পক্ষে এই সংস্করণটি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

শুনিবামাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন. কেবল প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য একটা মনুষ্যজন্ম অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আচার্য্য রামানুজও গোষ্ঠি-পূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিবামাত্র এমন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা অপরকে দিবার জন্য গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও উচ্চ মন্দির-শিখরে উঠিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে বলিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্য্য উক্ত "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" প্রভৃতি শ্রুতি-সাহায্যে যে জ্ঞানের পর ধ্যানের কর্ত্তব্যতা প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহা নিশ্চয়ই মধ্যম অধিকারীর জন্য, উত্তম অধিকারীর জন্য নহে।

যদি বলা হয়, "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ও "অনুবিদ্য বিজানাতি" ইত্যাদি শ্রুতির "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ও "বিজানাতি" শব্দসমূহের অর্থ যখন বিশেষ করিয়া জানা এবং এই বিশেষ করিয়া জানিবার উপায় যখন নিদিধ্যাসন-শব্দ-লক্ষিত ধ্যান হইতেছে, তখন ইহাকে জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম বলিতে আপত্তি কি? আর তাহার ফলে জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদই ত সিদ্ধ হইতেছে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন,—এই নিদিধ্যাসনকে কর্ম্ম বলা সঙ্গত নহে। কারণ, কর্ম্মশব্দে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের কর্ম্মকে বুঝিয়া থাকেন, এবং ঐ কর্ম্মে কর্ম্মকর্ত্তার দ্বৈতবুদ্ধি থাকা আবশ্যক হয়, নচেৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়াই অসম্ভব হয়। পক্ষান্তরে এই নিদিধ্যাসনে দ্বৈত-বুদ্ধি বিলোপ করিয়া জীবব্রহ্মের অভেদ ভাবই হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে হয়। এখন যদি এইরূপ দুইটী বিসদৃশ পদার্থকে এক-"কর্ম্ম" শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা বুদ্ধিমোহের কারণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

দেখ, এই নিদিধ্যাসনের ফল—জ্ঞান, অন্য কিছু নহে, কিন্তু উক্ত প্রকার কর্ম্মের ফল জ্ঞান নহে, পরন্তু স্বর্গ, পুণ্য, চিত্তশুদ্ধি ও ভগবৎ-প্রসাদ ইত্যাদি। এখন এই নিদিধ্যাসনকে কর্ম্ম নামে অভিহিত করিলে কর্ম্মের ফল জ্ঞান, স্বর্গ, পুণ্য, চিত্তশুদ্ধি ও ভগবৎ-প্রসাদ সবই বুঝাইবে। তাহার ফলে লোকে জ্ঞানের জন্য হয়ত স্বর্গোৎপাদক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে—অর্থাৎ ইহাদের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দুর্ব্বোধ্য হইবে, সুতরাং ইহাদিগকে পৃথক্

আখ্যায় আখ্যাত করিলে লাভ বই লোকসান নাই। এইজন্ত নিদি-ধ্যাসনকে আমরা জ্ঞানানুষ্ঠান বলিয়া থাকি, কর্ম্ম বলি না। জ্ঞানের জন্ত যাহা জ্ঞানোৎপাদক তাহাই করা উচিত, লোকে যাহাতে তদ্বিয়ের অনুষ্ঠান না করে, সেই জন্ত আমাদের এই প্রযত্ন।

এইবার এই ধ্যান-প্রসঙ্গে আর দুই একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার বিষয় আলোচনায় বিরত হইব। আচার্য্য রামানুজ-মতে এস্থলে আর একটী প্রয়োজনীয় আপত্তি উত্থাপন করা চলে। আচার্য্য-মতে বলা যায় যে, ধ্যান শব্দটী যখন কর্ম্ম-বিধির মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন কর্ম্ম করিবার বিধি দিবার সময় যখন "ধ্যান করিবে," এবংবিধ শব্দের দ্বারা সেই বিধি দেওয়া হয়, তখন বেদান্ত মধ্যে যথায় আত্মা সম্বন্ধে "ধ্যান করিবে" এইরূপ বাক্য পাওয়া যাইবে, সেস্থলে "আত্মধ্যান" ব্যাপারটীকে কর্ম্ম কেন বলা হইবে না? দেখ, এস্থলে এই "ধ্যায়থ" শব্দটী কর্ম্মের বিধির বোধক, আবার "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্" এস্থলে "ধ্যায়থ" শব্দটী আত্মার ধ্যান সম্বন্ধীয় বিধির বোধক হইতেছে। সুতরাং ধ্যানকে একস্থলে কর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়া জ্ঞানানুষ্ঠানের বোধক এবং অপর স্থলে কর্ম্মবোধক বলা ঠিক নহে। কারণ, এক বেদের ভিতর এক শব্দের নানা অর্থ করিয়া বেদের অর্থ করা ভাল? কিম্বা তাহার একটী মাত্র অর্থ অবলম্বনে তাহার অর্থ করা ভাল? এইজন্ত বলি, ব্রহ্ম-ধ্যানকে কর্ম্ম বলাই সঙ্গত।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন, না—আমরা ওরূপে বেদের অর্থ করি না। আমরা বেদের স্পষ্টভাবে কথিত অংশের তাৎপর্য্য সাহায্যে বেদের অস্পষ্ট বা সংশয়-সংকুল অংশের যুক্তিযুক্ত অর্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকি। অধিক কি, বেদ যে মনুষ্যবুদ্ধির বিপরীত কিছু উপদেশ করেন, তাহাও আমরা বলি না। সত্য বটে, ধ্যান শব্দটী কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গ উভয় স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে আত্মধ্যানে কর্ম্মলক্ষণ আনিতে হইবে, তাহার ত কোন হেতু দেখি না। দেখ, ধ্যান শব্দে অনবচ্ছিন্ন একপ্রত্যয়প্রবাহ বুঝায়। আচার্য্য রামানুজ ধ্যান শব্দে তৈলধারাবৎ অনবচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানপ্রবাহ

বলিয়াছেন। এখন এই একপ্রত্যয়প্রবাহব্যাপারটী কর্ম্মকাণ্ডের একটী যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যেরূপ হইবে, অদ্বয়ব্রহ্মকে জ্ঞাতাজ্ঞানজ্ঞেয় ভাবের অতীত বলিয়া ধ্যান করিলে কি তাহাই হইতে পারে? একটী যজ্ঞকালে "যে দেবতার উদ্দেশে ঘৃত গৃহীত হইবে, 'বষট্' এই শব্দটী উচ্চারণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই দেবতার স্বরূপ ধ্যান করিবে," অথবা "সন্ধ্যাকে মনে মনে ধ্যান করিবে," এইরূপ ধ্যানের বিধান আছে এবং বেদান্ত মধ্যে আত্মাকে ওঙ্কার বলিয়াও ধ্যানের বিধান আছে। এই ওঙ্কার সম্বন্ধে কঠ ও মাণ্ডুক্যে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। এখন এই উভয় ধ্যানকে এক জিনিষ বলা কি আগ্রহের পরিচয় হইবে না? সুতরাং আত্মধ্যানকে কর্ম্ম বলা কথনই সঙ্গত হইতে পারে না। আত্মধ্যানে জ্ঞানস্বরূপের প্রকাশ, এবং কর্ম্মাঙ্গ ধ্যানে কর্ত্তা করণ ও দ্রব্য প্রভৃতির প্রকাশ অনিবার্য্য, সুতরাং দেখা যাইতেছে, আচার্য্য রামানুজ অদ্বৈতবাদীর মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই—কারণ, বেদান্তে আমাদের অভীপ্সিত জ্ঞানের পর ধ্যানের স্থান নাই এবং এই ধ্যানের (কর্ম্মজ্ঞানের মত) বিধানও নাই।

তাহার পর, আচার্য্য রামানুজ যে শ্রবণ ও মননকে অনুবাদ বলিয়া এস্থলে ধ্যানকেই বিহিত বলিতে চাহেন, ইহাতেও নিরপেক্ষ পাঠকের মনে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে বাধ্য। কারণ, শ্রুতি যখন একই ভাবে, একই সুরে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধি দিতেছেন, তখন আচার্য্য রামানুজ শ্রবণ মননকে অনুবাদ (অর্থাৎ অবধারিত অর্থের পুনরুল্লেখ) বলিয়া কেবল নিদিধ্যাসনকে বিধি বলেন কিরূপে? তিনি যে শ্রবণ ও মননে প্রবৃত্তির প্রতি হেতু দেখাইয়াছেন, তাহা ত সকলের পক্ষে নাও সঙ্গত হইতে পারে। কারণ, স্বাধ্যায় বলিতে বেদের অক্ষর রাশির গ্রহণ—ইহা আচার্য্য পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন, এখন এই স্বাধ্যায়ের ফল একটা আছে আর সেই ফল যখন লক্ষ্য হয়, তখন ইহার অর্থের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক নহে। এজন্য বেদের অর্থ বুঝিবার বিবিধ আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে এরূপ সম্প্রদায়ই ছিল, যাহারা বেদমন্ত্রের উচ্চারণের ফলেই উদ্দেশ্য

সিদ্ধি স্বীকার করিত। দেখা যায়, সাপের মন্ত্র পড়িলে বিষ ঝাড়া যায়; যাহারা এই বিষ ঝাড়া কর্ম্ম করে, তাহারা কি সকলেই উক্ত মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া থাকে? কখনই নহে। সুতরাং বেদের অর্থবোধের বিধি নিষ্প্রয়োজন নহে। অবশ্য এ বিধি যে কিরূপ বিধি, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাহার পর আচার্য্য যে অদ্বৈতবাদীর মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও শ্রবণ মননকে অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করেন না, ইহা আচার্য্যই তাঁহাদের মতবর্ণনকালে পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন, * সুতরাং তাঁহারা যতক্ষণ ইহা স্বীকার না করেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগের নিকট ইহাকে এক কথায় (ইহার প্রতি একটা তুচ্ছ হেতু দেখাইয়া) অনুবাদ বলিয়া নিজ মত কথনে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যগ্রতার পরিচয় মাত্র। সুতরাং আচার্য্যের উদ্ধৃত শ্রুতিগুলির দ্বারা বেদান্তে ধ্যানই যে বিহিত ইহা প্রমাণ করা হইল না। ধ্যান বিহিত বলিতে গেলে শ্রবণ মননও বিহিত, বলিতে হইবে। আগামী বারে 'আচার্য্যমতানুযায়ী ভক্তিমিশ্রিত উপাসনা, বেদান্তে বিহিত হইয়াছে কি না—বিচার্য্য।

নবযুগের গান।

আমি চাহিনা তোমারে দেখিতে।
শুধু মলয় বাতাসে, কুসুম সুবাসে
জোছনা মাখান নিশিতে॥
শুধু—রূপসী অঙ্গে, সুখ তরঙ্গে
অলস-মধুর সঙ্গীতে।
শুধু—শেফালিকুঞ্জে, ভ্রমর গুঞ্জে
সন্ধ্যার মেঘপুঞ্জেতে॥

---

* একজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সানুবাদ শ্রীভাষ্য ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চাহি—প্রলয় আকাশে, রুদ্র বিকাশে
তোমারি মূরতি আঁকিতে।
চাহি—ভৈরবতানে, কাল ভেরী সনে
তোমারি গাথা গাহিতে॥
চাহি—শ্মশানে মশানে, রোদনে বেদনে
তব মন্দির রচিতে।
চাহি—দীনকুটীরে, আর্ত্তশিয়রে
তোমারি চরণ সেবিতে॥

শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী।

(৪)

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।)

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সেই মালার জন্য কতই কাঁদিলাম। "গোবিন্দ আমাকে নিজের গলার প্রসাদী মালা দিলেন, আমি সেই মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম"—এই কথা ভাবিতেই আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গোবিন্দ দর্শনের পর বৃন্দাবনে প্রথম রাত্রি আমার এইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কাটিল।

তার পর দিন সকালবেলায় বৃন্দাবনে প্রথম প্রভাত। সারারাত্রি জাগিয়া যে এত কাঁদিয়াছি, সে কথা আর আমার একটুও মনে নাই, বরং মনে হইতেছে, যেন অনেক দুঃখের পর চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত নিধি পাইয়া সুখের স্বপ্নে রজনী কাটাইয়াছি। দর্শন মিলিয়াছে, আর আমার কিসের অভাব, দুঃখই বা কি আছে। শিশুকাল হইতে

এ জীবনপ্রবাহ কত পথেই না বহিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এইটুকু জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য কত ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, কতই না আয়োজন! আজ মনে হইতেছে, যে উদ্দেশ্যে এত আয়োজন, আজ তাহা সার্থক হইয়াছে, আজ সাগরের আশ্রয় পাইয়া অবিরাম গতিধারা বিরাম লাভ করিয়াছে। আজ যেন আর আমার কিছু চাহিবার নাই, কিছু পাইবারও নাই। আমার চিরদিনের সকল বাসনা সকল কামনা কুড়াইয়া আজ গোবিন্দেব পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

সকালে ঘরের বাহিরে আসিয়াই প্রথমে কুমারকে দেখিতে পাইলাম। কুমার সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস গ্রহণের সময় পূর্ব্বনাম ত্যাগ করিয়া "কুমার ভিক্ষু" এই নাম লইয়াছিল, এইজন্য "কুমাব" এই নামই তাহার পরিচয়। জীবনে বহুদেশ ভ্রমণে, বহুলোকেব সঙ্গে পরিচয়ে—মানবপ্রকৃতিতে নানা বিচিত্রভাব দেখিয়াছি, কিন্তু সেই বহুলোকের ভিতরও কুমারের মত এমন নিতান্ত শিশুস্বভাব আমি আর কাহারও দেখি নাই। বারাণ্ডার এক কোণে বসিয়া কুমার একখানি ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িতেছিল, আমাকে দেখিয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, আবার নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিল। সেই একবার দৃষ্টিতেই আমি তাহার চোখেব চাহনি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, সে ঠিক পাঁচবৎসরের ছেলের আলাভোলা সরল চাহনি। কুমারের বেশভূষায় তাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া চিনিতে পারিবার উপায় ছিল না। আমি কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম, সে তখন একমনে কাগজ পড়িতেছিল, আমি যে দাঁড়াইয়া আছি, সে খেয়ালও তাহার ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া যেন নিতান্ত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ইংরাজী জান?" "তুমি!" অন্য কেহ এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত আমি রাগ করিতাম, কিন্তু কুমারের কথায় রাগ হইল না। আমি উত্তর দিলাম, "না"। কুমার আবার কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিল, "জান্‌লে বেশ হতো।"

কুমারের সঙ্গে এইরূপে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তাহার পর

কতদিন তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার যে সেই বিচিত্র বালক-স্বভাব—তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই। কুমারের নিকট তাহার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে—জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সংসারাশ্রমে সে যেমন দুঃখ পাইয়াছিল, তেমন দুঃখ অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু তাহার সেই সদানন্দভাব দেখিলে সে কথা কেহ মনেও করিতে পারিত না। কুমার কখনও আমাকে মান্য করিয়া কথা বলে নাই, কখনও—মা বলিয়াও ডাকে নাই—"মা" এই শব্দ একদিনও আমি তাহার মুখে উচ্চারিত হইতে শুনি নাই, কিন্তু মায়ের নিকট সন্তানের দাবী আবদার সে যেমন মিটাইয়া লইতে জানিত, অতি বড় দুষ্ট দুরন্ত ছেলেও তাহা পারে না। যে ছেলে এমনই আলাভোলা যে, নিজ শরীরের শীত রোগ ক্ষুধা তৃষ্ণা—কোন বিষয়েই খেয়াল নাই, জননীকে সর্ব্বক্ষণই তাহার জন্য সচেতন থাকিতে হয়। কুমারের ভাব দেখিয়া মনে হইত, জগতই যেন তাহার মায়ের কোল, কাজেই নিজের অভাব অসুবিধার কথা ভাবিবার তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

কুমারের কথা বলিতে গিয়া আর একটী ছেলের কথা মনে পড়িল—কুমারকে দেখিবার দুই তিন দিন পরেই তাহাকে দেখিতে পাই। ছেলেটীর নাম অসিতনাথ, পদ্মাতীরের দেশের কোন জমীদারের ছেলে। কুমার যেমন সদানন্দ, সে তেমনি সদাই মলিন। তাহার মুখ এত মলিন যে, দেখিলে মনে হয়, সে যেন চিরদিন কেবল দুঃখই পাইয়া আসিয়াছে, অথচ, সে জমীদারের এক ছেলে,—কত আদরের ছেলে, তাহার দুঃখের কোন কারণই নাই। কুমার কোন সঙ্কোচ সম্ভ্রমের ধার ধারে না, পাঁচ বৎসরের ছেলের মত সকলের কাছেই তার নিঃসঙ্কোচ সরলভাব। অসিতনাথ এত লাজুক যে, মুখ তুলিয়াও মুখের দিকে চাহিতে পারে না। আমি প্রতিদিন গোবিন্দ-দর্শন করিতে যাইবার সময় মন্দিরের দ্বারে তাহাকে দেখিতে পাইতাম। আসিবার সময়ও দেখিতাম, সে দাঁড়াইয়া আছে। তিন চারি দিন

প্রতিদিনই তাহাকে এইভাবে দেখিতাম। অবশেষে একদিন মন্দিরের বাহিরে আসিতেই সে আমাকে প্রণাম করিল, "গোপাল, গোপাল" বলিয়া আমিও তাহাকে করযোড়ে নমস্কার করিলাম। সে তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। কি যে সে মলিন মুখ—কেবল চোখের জলে ভাসিতেছে! তেমন মলিন মুখ দেখিলে নিতান্ত নিষ্ঠুরেরও হৃদয় গলিয়া যায়। আদর করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাঁদ কেন বাবা, নীলমণি আমার!" তখন তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না, একেবারে শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল। কি কথা আমাকে বলিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার এই ভাব দেখিয়া মন্দিরের দুয়ারে অনেক লোক আসিয়া জড় হইল, সে তখন অনেক কষ্টে সংযত হইয়া আবার আমাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি তাহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সেদিন রাত্রে বিশ্রাম ঘাটে যমুনা আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। আরতি হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে লোকের ভিড়ও কমিয়া গেল, ক্রমশঃ ঘাট নির্জ্জন হইয়া গেল। আমি বাড়ী না ফিরিয়া যমুনার ঘাটেই বসিয়া রহিলাম। বসিয়া বসিয়া যে কত সময় চলিয়া যাইতেছে,—কত রাত্রি হইতেছে, সে কথা একেবারেই মনে ছিল না। অন্ধকার নির্জ্জন রাত্রে ঘাটে বসিয়া আমার চণ্ডীর কথা মনে পড়িল। চণ্ডী আমার দিদিগতপ্রাণ ছোটভাই, সর্ব্বদা কেবল দিদিকে আগ্‌লাইয়া বেড়ানোই তাহার কাজ ছিল। পাছে কেহ দিদিকে বকে, পাছে কেহ দিদির উপর রাগ করে, দিদিকে দোষ দেয়, সর্ব্বদাই তাহার এই ভয়। যেদিন রাত্রে প্রথম ক্রিয়া লইতে যাই,—আমি যে ক্রিয়ার দীক্ষা লইতে যাইতেছি কেহ জানিতে পারে, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না—চণ্ডী আমাকে বলিল, "দিদি, তুমি আমার কাপড় পরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারিবে না।" দুই ভাইবোনে এই পরামর্শ করিয়া আমি চণ্ডীর কাপড় পরিয়া বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় যদি বাবার সম্মুখে আসিয়া পড়ি

এই জন্য চণ্ডী দুয়ারে পাহারা দিতেছিল, তবুও আমি আসিয়াই বাবার সম্মুখে পড়িলাম। তখন চণ্ডীর যে ভয়! বাবা পাছে আমাকে বকেন, এই ভয়ে চণ্ডীর মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়াছিলে?" ভাবিয়াছিলাম—"সত্য কথা কিছুতেই বলিব না" কিন্তু উত্তর দিবার সময় মুখে বাহির হইল—"দীক্ষা নিতে।" বাবার রাগ কিছু বেশী ছিল বলিয়া অনেক সময় আমি—যদি বাবা রাগ করেন এই ভয়ে তাঁহার কথার উত্তরে খুব বড় গোছের একটা মিথ্যা কথা বলিব ভাবিয়াছি, কিন্তু বলিবার সময় ঠিক কথাটাই বলিয়া ফেলিতাম, কখনও মিথ্যা বলিতে পারি নাই। বাবা শুনিয়া বলিলেন, "দীক্ষা নিতে? আবার কি দীক্ষা নেবার খেয়াল হ'ল?" এই কথা বলিয়া যখন আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, তখন চণ্ডী একেবারে আমার বুকের ভিতর আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "বাবা যদি তোমার কাপড় দেখ্‌তে পেতেন,—যদি জিজ্ঞাসা কর্‌তেন, 'তুই কেন কালপেড়ে কাপড় পরেছিস্?' আমার এমন ভয় হয়েছিল! ঠাকুরকে কেবল বল্‌ছিলাম, 'হে ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, বাবা যেন দিদির কাপড় দেখ্‌তে না পান।"—আর এক রাত্রের কথাও মনে পড়িল, যে রাত্রে চণ্ডীর দেহ বুকে লইয়া সংকারের জন্য শ্মশানে গিয়াছিলাম। বিশ্রাম ঘাটে অন্ধকার রাত্রে আবার সেই অন্ধকার রাত্রে গঙ্গাতীরের শ্মশান মনে পড়িল।—আমার সংসারের যত কিছু বন্ধন সেই রাত্রে চণ্ডীর চিতায় সবই পুড়িয়া গিয়াছিল। আজ যে আমি পথে বাহির হইয়াছি—চণ্ডী যদি তেমন করিয়া আমাকে সকল সংস্কারের বাহির না করিত, তবে আমি এমন ভাবে পথে বাহির হইতে পারিতাম কি না কে জানে। পিতার দেহত্যাগের অতি অল্পদিন পরেই চণ্ডীও দেহত্যাগ করিয়া যায়।—সংক্রামক রোগী বলিয়া, সে রাত্রে—চণ্ডীর সংকারের জন্য পাছে অনুরোধ করি—এই ভয়ে একটী লোকও আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন নাই, বাড়ীতে কেবল পুত্রশোকে উন্মাদিনী আমার মা ও অভিভাবকের মধ্যে আমি। মায়ের করুণবিলাপ শুনিতে শুনিতে

কি জানি কি অমানুষিক বলে বলী হইয়া ষোল বৎসরের বালকের মৃতদেহ বুকে করিয়া অন্ধকার রাত্রে একা শ্মশানে গিয়াছিলাম। যখন চিতা জলিয়া উঠিল,—যে দেহ, যে মুখ, যে চোখ, এত প্রাণের প্রিয় ছিল, সেই দেহ যখন আমারই সম্মুখে ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন মনের যে ভাব হইয়াছিল—যে ভাব একদিন আমার সংসারমোহ ঘুচাইয়া দিয়াছিল—চণ্ডীর কথা মনে পড়িয়া আজ আবার সহসা সেই ভাব মনে জাগিয়া উঠিল।

নৌকারোহী যেমন নিতান্ত নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে নদীর দুইধারের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যায়, সেইরূপ গত জীবনের কত কথা মনের উপব দিয়া ভাসিয়া গেল, কিন্তু মনকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না। মায়ের কথা মনে পড়িল। যদি যথার্থই স্নেহ দিয়া কোন শরীর গঠন সম্ভব হয়, তবে আমি বলিতে পারি, মা আমার সেই স্নেহের প্রতিমা। ছেলেবেলায় যদি কেহ আমাকে 'কালো মেয়ে' বলিত, মা অমনি আমাকে বুকে করিয়া কত আদর করিতেন, কতবার আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, যেন সে নিন্দা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিতেন। আবার যদি কেহ বলিত, "মেয়ের কি সুন্দর চুল, যেন শ্যামা ঠাকরুণ"—তাহা হইলে এক দিকে আনন্দ আবার শ্যামা মার সহিত তুলনার জন্য ভয় দুই একসঙ্গে হইয়া মাকে যে তখন কি সুন্দর দেখাইত। তাড়াতাড়ি যোড়হাতে মা প্রণাম করিতেন, বলিতেন, "ও আমার শ্যামা মায়ের দাসী।" সেই চুল আর কালো রঙের জন্য মার আবার এক নূতন বিপদ্ হইত। দুর্গোৎসবে কি অন্য কোন ব্রতোপলক্ষে কুমারী পূজার সময় আমাকে কুমারী করিবার জন্য সকলেরই ভারী আগ্রহ ছিল। মার দৃঢ় বিশ্বাস—যাহাকে কুমারীপূজা করা হয়, সে কুমারী নিশ্চয়ই বিবাহের পর বিধবা হইবে। আমাকে মা কত আব সাবধান করিয়া রাখিবেন, যখন পথে খেলা করিতেছি, তখন হয় ত কুমারী করিবার জন্য কেহ কোলে করিয়া তুলিয়া নিয়া যাইত। টাটের উপর পা রাখিয়া ঠাকুর হইয়া পূজা লইতে আমার বড়ই আমোদ হইত।—যখন পরণে রাঙ্গা কাপড়, হাতে লাল শাঁখা, কপালে সিঁদুরের

ফোঁটা পরিয়া বাড়ী আসিতাম, মা দেখিয়াই কপালে করাঘাত করিতেন—"এই আমার সর্ব্বনাশ করে এসেছে!" মা এখনও বলেন যে, "যখনই টাটে পা রেখে পূজা করেছে, তখনই জানি আমার কপাল ভেঙ্গেছে। তাই কি যে সে পূজা করেছে? যাঁরা ডাক্‌লে মা জাগ্রত হয়ে সাড়া দেন, তাঁরাই কিনা আমার দুধের মেয়ের পা পূজা করে আমার এই সর্ব্বনাশ কর্‌লেন।" মায়ের বিশ্বাস যে, আমার যে বৈধব্য—সে কেবল সেই কুমারী পূজার জন্যই হইয়াছে, না হইলে মায়ের যে এমন সুলক্ষণা মেয়ে, তাহার বৈধব্য কখনই সম্ভব নয়।

মা এ দিকে এত স্নেহপরায়ণা, বালিকার মত অল্পেই শঙ্কিতা, বালিকার মত সকল বিষয়ে সরলবুদ্ধি অথচ কর্ত্তব্যে একেবারে পাথরের মত দৃঢ়চিত্তা। আমার বয়স যখন নয় দশ বৎসর, তখনই মা আমাকে এক পীড়িতা বৃদ্ধার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মায়ের আদেশে সমস্ত দিন, এমন কি, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে তাহার নিকট থাকিয়া সেবা করিতে হইত, কেবল স্নানাহারের জন্য কিছুক্ষণ বাড়ী আসিতাম।

বালিকাকাল হইতেই আমি সকল বিষয়ে শঙ্কাহীন, আবার শরীরে এত সামর্থ্য যে, লোকে সে কথা শুনিলে বিস্মিত হইয়া থাকে। পথে বাহির হইবার পরে কতবার নিজেই নিজের শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। একবার হাঁটাপথে খণ্ডগিরি দর্শনে যাইতে যাইতে পথে একজন রমণীর পায়ে আঘাত লাগিয়া তিনি আর চলিতে পারিলেন না, সেই যাত্রিদলের আমিও একজন সঙ্গী। নির্জ্জন পথের মধ্যে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সকলেই তাঁহাকে লইয়া বিপন্ন হইলেন। সেখানে গাড়ীও পাইবার উপায় নাই। অগত্যা আমি সেই রমণীটীকে কাঁধে করিয়া চড়াই উৎরাইয়ের পথে আড়াই ক্রোশ চলিয়াছিলাম। বহিয়া চলিবার সময় বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নাই, কিন্তু পরে উরুতে ফোড়া হইয়া কিছুদিন ভুগিতে হইয়াছিল। আর একবার মথুরা ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক পরিবার লইয়া নিতান্ত বিপন্ন, কোন গাড়ীতেই তিলমাত্র স্থান নাই, তিনি কেবল একবার এদিক্ একবার ওদিক্ স্ত্রী পুত্র বোঁচকা

বুঁচকি সঙ্গে লইয়া ক্রমাগত ছুটাছুটী করিতেছেন। একটা গাড়ীতে কিছু জায়গা ছিল কিন্তু সে গাড়ীর দুয়ারে তিনটী গুণ্ডা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাহাকেও গাড়ীতে উঠিতে দিতেছে না। তাহাদের যেমন অসুরের মত আকৃতি, প্রকৃতিও সেইরূপ। যদিও লোক তিনটীর বেশভূষা ভদ্রলোকের মত কিন্তু আচরণ নিতান্ত অভদ্র। ভদ্রলোকটী সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুয়ার খুলিয়া দিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "আজ রাত্রে ট্রেণ না পাইলে আমায় স্ত্রী পুত্র লইয়া ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইতে হইবে। আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি।" কিন্তু লোকগুলি সে কথায় কর্ণপাতও করিতেছে না। ট্রেণ ছাড়িবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ব্যাপার দেখিয়া আর আমার সহ্য হইল না। আমি গিয়া সে লোক তিনটীকে খুব জোরে এক ধাক্কা দিলাম। সেই এক ধাক্কাতেই তিনটী অসুরতুল্য লোক তিন দিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। তখন ভদ্রলোকটী বিনা বাধায় পরিবার লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

এই যে আমার এত সাহস ও বল,—এমন সময়ও আসিয়াছে, যে সে সাহস ও বল কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই, কিন্তু মা—তখন শান্ত প্রসন্নভাবে সে বিপদে কর্ণধার হইয়াছেন। প্রসব হইবার সময় প্রসূতি যদি কষ্ট পায়, মা দিন কি রাত্রি যে সময় অথবা যে কোন জাতির বাড়ী হউক না কেন, শুনিবামাত্র সেখানে উপস্থিত হইতেন। সুপ্রসব করাইতে মায়ের দৈবী ক্ষমতা ছিল, লোকে বলিত, মা গায়ে হাত দিলেই প্রসূতির আর কোন ভয় নাই। কথাপ্রসঙ্গে আমার মনে পড়িল, ঘরের বাহির হইবার অনেক দিন পরে একবার মাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে আসিয়াছিলাম। কোন এক ষ্টেশনে নামিয়া আর গাড়ী ধরিতে পারি নাই। রাত্রিটুকুর মত আশ্রয়ের জন্য ষ্টেশনমাষ্টারের বাড়ী গিয়া শুনিলাম, তাহাদের বড় বিপদ, ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রীর প্রসববেদনা হইয়া সকাল হইতে শিশুর পা বাহির হইয়া এপর্য্যন্তও প্রসব হইতে পারে নাই; শুনিয়া আমার চক্ষুস্থির হইল। কিন্তু মা তখনই সেই বিপন্না প্রসূতিকে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বিঘ্নে

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, আমি বারাণ্ডায় বসিয়া কেবল জপ করিয়াছি। কি রকম একটা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য আসিল—প্রসূতির ঘরের ত্রিসীমানা-তেও আমি পা দিতে পারি নাই।

চণ্ডীর কথা, মার কথা—আরও কত জনের কথা স্মৃতিবায়ুতে চালিত হইয়া মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। মনে পড়িল—ক্রিয়া লইবার পর যখন দক্ষিণা কি দিব গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার শুচি অশুচি বোধের সংস্কারটী আমাকে দক্ষিণা দাও।" পূজা অর্চ্চনায় সর্ব্ববিষয়ে শুচিতা রক্ষা করিবার একান্ত চেষ্টায় আমার শুচিবাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার জন্য কত সময় অনর্থক গিয়াছে, কত কষ্টও পাইয়াছি। গুরুদেব বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ শুনিয়া আমার ভয় হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের ভয় দূর করিয়া এই ভাবিয়া মনকে দৃঢ় করিলাম, "আমি যদি দিতে না পারিতাম, গুরুদেব তবে কখন তাহা চাহিতেন না। তিনি যখন চাহিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দিবার শক্তিও আমি পাইব।" সেই দিন—সেই দিনই বা বলি কেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমার শুচি অশুচির সংস্কার দূর হইয়া গেল। কিন্তু শুচিতারক্ষাকল্পে দিনে ও রাত্রে অনেকবার স্নান করিয়া ভিজা চুলে থাকিয়া চক্ষু দুটী নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, ক্রমে একেবারে সমস্তই অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। গুরুদেব তখন গৃহে ছিলেন না, পত্রদ্বারা তাঁহাকে জানাইলাম, "আমি অন্ধ হইতে বসিয়াছি।" দুটী মাত্র ছত্র লিখিয়া তিনি সে পত্রের উত্তর দিলেন, প্রথম ছত্রটী এই—"অন্ধ হইলেই চক্ষুষ্মান্ হয়।" দ্বিতীয় ছত্রে একটী টোট্‌কা ঔষধের কথা লেখা ছিল। সেই ঔষধ ব্যবহার করিয়াই আমার চক্ষু আরাম হইয়া গিয়াছিল। আর একবার আমাকে সাপে কামড়াইয়াছিল, গুরুদেব যখন এ সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য আমিই খিচুড়ী রাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। সংবাদ শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খিচুড়ীটা না খেয়ে আর যাচ্ছিনা, সে যদি না বাঁচে তবে কাল ত আর এমন রান্না খাইতে পাইব না।" তাহার পর আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে না

কি সাপে কামড়াইয়াছে? সাপ কি তোমাকে কামড়াইতে পারে? কেমন করিয়া কামড়াইবে, তোমার কাছে আসিলে যে সাপ সাপই থাকিবে না, তখনি সে তার হিংসা করা স্বভাব ভুলিয়া যাইবে।" লোকে বলিত, গুরুদেব সর্পাঘাতের চিকিৎসা খুব ভাল জানিতেন। তাঁহারই চিকিৎসায় আমি সুস্থ হইয়াছিলাম।

এসব যেন এক একটা ঢেউ, যেমন জলের ঢেউ জলে উঠিয়া জলেই মিশায়, তেমনি অনন্ত কালসাগরের ঢেউ তাহাতে উঠিয়া তাহাতেই মিশাইতেছে। এই যমুনার বুকে কত ঢেউ উঠিয়াছে, সে ঢেউ এখন কোথায়? জলের ঢেউ জলে মিশিয়া গিয়াছে।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া উঠিব মনে করিতেছি, এমন সময় কে একজন আসিয়া "মা!" বলিয়া আমার পায়ের তলায় পড়িল। সে "মা," ডাক কি ব্যাকুল, কি আর্ত্তস্বরেই উচ্চারিত হইয়াছিল! "আহা বাছারে আমার! কার এত দুঃখ?"—আমি প্রথমে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, চিনিতেও পারি নাই, তাহার পর লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সে অসিতনাথ। অসিতনাথ আমাকে সেদিন যত কথা বলিল, তাহার তিনভাগ কেবল "মা! মা! মা!" তাহার জীবনে যে কত অপরাধ, সেই কথাই সে যেন শতমুখে বলিতে চায়, কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না। কেবলই বলে, "মা, আমি যে কত পাপী তা ত তুমি জাননা। আমি যে মনে মনে তোমার কাছেও অপরাধী হ'য়েছিলাম!" এই তার কথা, আর কেবল সেই এক কথা—"মা! মা!" মাটিতে পড়ে আছে, আমি যত আদর করি, "ওঠ বাপ আমার, গোপাল আমার!" ততই আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলে, "ওমা আমায় আদর করো না মা, আর আমায় আদর করো না। তুমি জাননা আমি কেমন ছেলে। আমি তোমার মাতৃদ্রোহী ছেলে। তোমার পা ছুঁয়ে যে পায়ের ধুলো নেব, সে সাহসও আমার হয় না, এমনই নরক আমার মন।" একে ত তার এই পাগলামী, সেই সময় আবার নদীর ধারের জঙ্গলের ভিতর হইতে আর একজন লোক বাহির হইয়া আসিয়া "মা, আমার অপরাধও ক্ষমা কর" বলিয়া

উপস্থিত। সে সেই গোবিন্দের পূজারী। তাহার নিকট শুনিলাম, অনেক দিন হইতে গোপনে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, আজ রাত্রে একা যমুনার ঘাটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, কিন্তু অসিতনাথের "মা মা" জপ শুনিয়া সে ভাব সে ভুলিয়া গিয়াছে। "মা" বলিয়া সে আমার পায়ের ধূলা লইল, অন্ধকার রাত্রে এমনভাবে আর যেন আমি নির্জ্জন স্থানে না থাকি, সে জন্যও বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া চলিয়া গেল।

"চিন্ময় ভূমি বৃন্দাবন, তোমাকে আমি প্রণাম করি" বলিয়া তখন সেই যমুনাপুলিনে আমি বারবার প্রণাম করিলাম। এই বৃন্দাবন গোবিন্দের লীলানিকেতন, এখানে কি আবার শঙ্কা ভয় আছে? যে বৃন্দাবনের প্রতি বেণুও কৃষ্ণময়, সেখানে কি আবার নির্জ্জন সজন আছে, সেখানে কি অন্ধকার আলোক, দিবা রজনীর কোন বিভেদসীমা আছে! ব্রজবাসীর মনেও কি গোবিন্দচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার উদয় হয়? এ যে একেবারেই অসম্ভব। তখনই বুঝিতে পারিলাম, না, এ আর কিছু নয়, ঠাকুরের এ আর এক নূতন খেলা। তোমার এ খেলায় কি আর আমি ভয় পাই? তুমি যত কেন মুখোষ পরিয়া এসনা, আমি তোমাকে ভাল করিয়াই চিনিয়া নিয়াছি।

তার পর দিন শ্রীমন্দিরে গিয়া আবার আমি গোবিন্দের প্রসাদী-মালা পাইলাম। সেই পূজারীই "মালা নাও মা" বলিয়া আমাকে মালা আনিয়া দিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে কাশীতেও একবার এই রকম ধরণের ঘটনা ঘটিয়াছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা বাড়ীতে আমি থাকিতাম, কুমারও সেই বাড়ীতে থাকিত। কুমার দিনরাত্রি তাহার গ্রন্থরাশি লইয়া থাকিত, আমি কুমারকে রাঁধিয়া দিতাম। গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার সময় প্রতিদিনই একটী লোক আমার অনুসরণ করিত, যতক্ষণ স্নান করিতাম, ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত, আবার স্নান শেষে বাড়ী ফিরিবার সময়ও বাড়ী পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিত। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম, বুঝি তাহার অন্য কিছু কাজ আছে;

কিন্তু শেষে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অনুসরণ করা ভিন্ন তাহার অন্য কিছুই কাজ নাই। তাহাকে যখন দেখিতাম, সাপ দেখিলে লোকের শরীর যেমন শিহরিয়া উঠে, আমার শরীরও সেইরূপ শিহরিয়া উঠিত। এত একমনে "গোপাল, গোপাল" জপ করিতাম, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে গোপাল ভাবিতে পারিতাম না। সে আমার কিছু দূরে থাকিলেও আমার মনে হইত, তাহার গায়ের বাতাস লাগিয়া যেন আমার গা পুড়িয়া যাইতেছে। তাহার সঙ্গ এড়াইবার জন্য আমি প্রাতঃস্নান ছাড়িয়া দিলাম, মধ্যাহ্নেও স্নানের সময় বাড়ীর বাহির হইয়া দেখি, সে যেন আমারই জন্য বাড়ীর বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, আমি যেই ঘাটের দিকে চলিলাম, সেও আমার সঙ্গে চলিতে লাগিল। প্রতিদিনই আমি স্নানের সময় পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্গ এড়াইতে পারিলাম না। অবশেষে আমার এমনই বিরক্ত বোধ হইল, মনে হইল যে এ যন্ত্রণা অপেক্ষা কাশী ছাড়িয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু আবার একটু লজ্জাও হইল, এতদিন আমি একদিনের জন্যও কাহাকে ভয় করি নাই, আজ কি এই লোকটার ভয়ে কাশী ছাড়িতে হইবে? সে যা খুসী তাই করুক, আমার তাহাতে কি আসে যায়, এই ভাবিয়া মন স্থির করিলাম।

কিন্তু ইহার পর আবার এক নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইল। একজন অপরিচিতা রমণী গঙ্গাস্নানের সময় নানা কথায় আমার সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন আরম্ভ করিল। শাস্ত্রে লেখা আছে, চক্ষু মনের দর্পণ, আমি একথা খুবই সত্য বলিয়া মানি। যাই আমি তাহার চোখের দিকে চাহিলাম, অমনি সেই দর্পণে তাহার মনের ভাবের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। এমন অনেক দিন ঘটিয়াছে,—অনেকের চক্ষুতেই তাহার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, এবং সে দেখা কখনই ভুল হয় নাই। সে রমণী যে উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিয়াছিল, সে যখন তাহার মনের কথা আমার নিকট খুলিয়া বলিল, তখন বুঝিতে পারিলাম, চোখে আমি যে মনের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, তাহা ভুল দেখি নাই।

এবার আমার যথার্থই রাগ হইল। খুব রাগিয়া বিশ্বনাথকে বলিলাম, "বিশ্বনাথ, এই সব কি তোমার ভূত প্রেতের দল? থাকুক তোমার সোনার কাশী, আমি আর কাশীতে বাস করিতে চাহি না। কালই আমি কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" তার পর দিন সকালে গঙ্গাস্নানে গিয়াছি,—যথানিয়মে সে লোকটীও সঙ্গে আসিয়া ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে। গঙ্গার জলে স্নান করিতে নামিয়াছি, এমন সময় দেখি—মৃতদেহের মত কি যেন স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে। "যদি কোন নৌকাডুবী লোক হয়?" বিদ্যুতের মত এই কথা যাই আমার মনে উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ আমি সেই দেহ ধরিবার জন্য সাঁতার দিলাম। সাঁতারে আমি মাছের মত পটু, দেখিতে দেখিতে সেই দেহের নিকটবর্ত্তী হইলাম। তীরে যাহারা ছিল,—যাহারা স্নানের জন্য গঙ্গাগর্ভে নামিয়াছিল, সকলেই আমার এই কীর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ছি, ছি, কর কি? ও যে মড়া ভেসে যাচ্ছে।—মড়া ধর্‌তে যাচ্ছ কেন?" সে কথা আমার কাণেও গেল না। আমি দুই হাতে সেই দেহ জড়াইয়া বুকে ধরিয়া স্রোতের প্রতিকূলে আবার কূলের দিকে আসিতে লাগিলাম। এত স্রোত যে, অনেক কষ্টে একটুখানি যদি অগ্রসর হই, আবার অনেকটা পিছনে সরিয়া যাইতে হয়। তীরের লোকেরা ভাবিয়াছিল, আমি ডুবিয়া মরিব, আর ভাবিয়াছিল, হয়ত আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। বাস্তবিক আমার মত শরীরের শক্তি না থাকিলে ও আমার মত সন্তরণপটু না হইলে আর কেহ বোধ হয় কূলে পৌছিতে পারিত না। যখন কূলের নিকট আসিয়া পৌছিলাম, তখনও কেহ মড়া ছুঁইবার ভয়ে আমাকে সাহায্য করিল না। কূলে উঠিয়া সিঁড়ির উপর দেহটিকে শোয়াইলাম। একটি ১৮।১৯ বৎসরের ছেলে, সরল সুন্দর মুখ, যেন চোখ বুজাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে, এ দেহে প্রাণ নাই। সে মুখ দেখিয়া আমার প্রাণের মধ্যে কি যে করিয়া উঠিল,—আমি জগতের লোককে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। "বাবারে ও নীলমণি!" বলিয়া

আমি একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম। আমার কান্না শুনিয়া সেখানে চারিদিক্ হইতে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। "কি হইয়াছে, কি হইয়াছে" জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমশঃ "একটী ছেলে জলে ডুবিয়া গিয়াছে" এই কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল। আমি সিঁড়ির উপর শায়িত দেহের মাথার নিকট বসিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছি। কেন যে কাঁদিতেছি, তাহাও জানি না, কেবল "বাবারে নীলমণি আমার!" এই কথা ছাড়া আর কোন কথা আমার মুখে আসিতেছে না। আমার সেই উন্মাদের মত ভাব দেখিয়া যাহাতে ছেলেটীর প্রাণরক্ষা হয়, অনেকেই সে চেষ্টায় উদ্যোগী হইল।—কোথা হইতে যে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল, আগুন, গরম কাপড়, দুধ এ সমস্ত সামগ্রী কে যে কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল, কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। সকলেই ছেলেটীকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি কেবল বসিয়া কাঁদিতেছি, চোখের জলের বিরাম নাই।

কোথায় আছি, কি করিতেছি, সবই ভুলিয়া গিয়াছি, সেই মুখখানির দিকে চাহিতেছি আর আমার বুকের ভিতর সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে। ৩।৪ ঘণ্টা চিকিৎসার পর যখন ছেলেটী একবার চোখ মেলিল, তখন চারিধারে "চোখ চাহিয়াছে—চোখ চাহিয়াছে" বলিয়া একটী আনন্দধ্বনি উঠিল। ডাক্তার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর কেন মা কাঁদ, তোমার ছেলে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।" গরম দুধ ও উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ক্রমশঃ ছেলেটীর কথা বলিবার শক্তি হইল, তখন সে অতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল, "আমার বাড়ী নেপালের কাছে, সেখানে আমার বৃদ্ধ বাপ মা আছেন। আমি শিক্ষার্থী হইয়া বারাণসীতে আসিয়াছি। আমার গতরাত্রে বিসূচিকা হয়। যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীর লোক আমি মরিয়া গিয়াছি ভাবিয়া আমাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল।" তাহার সেই পরিচয়ে সকলে স্তম্ভিত হইল। সে যখন বলিল, "বাড়ীতে আমার বৃদ্ধ বাপ মা আছেন", তখন অনেকেরই চোখে জল আসিল।

ছেলেটী প্রাণ পাইল কিন্তু এখনও তাহার চিকিৎসার দরকার, সুস্থ হইয়া বল পাইতে এখনও তাহার ৩।৪ দিন লাগিবে। আমি কি উপায় করিব, আকুল হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কোন ভাবনা নাই, যাহাতে হাঁসপাতালে ছেলেটী যত্নে থাকিতে পারে, সে চেষ্টা আমি করিব।" তাহার পর লোক পাঠাইয়া ছেলেটীর জন্য খাটুলী আনাইয়া তাহাতে করিয়া তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া চলিলেন, আমিও সেই আর্দ্র বস্ত্রেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়া ছেলেটীকে শয্যায় শয়ন করানো হইল, ডাক্তার তাহার ঔষধ পথ্যের ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আমার মনে পড়িয়া গেল যে, আমি স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। মনে পড়িয়া গেল যে, কুমারকে আমি রাঁধিয়া দিলে তবে সে খাইতে পাইবে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়াই রাঁধিবার ঘরে গেলাম। ভাত নিয়া যখন কুমারকে খাইতে দিলাম, কুমার স্বচ্ছন্দে বসিয়া খাইতে লাগিল। কেন যে আমার এত দেরী হইয়াছে, সে কথা একবারও জিজ্ঞাসা করিল না। আমি যখন বলিলাম, "কুমার, আজ বড় দেরী হয়ে গিয়েছে।" কুমার বলিল, "দেরী হয়ে গিযেছে? ওঃ, তাই আমার এত ক্ষিধে লেগেছে।" কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করিল না—কেন দেরী হয়েছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার পরদিন হইতে আর আমার সেই অনুসরণকারী লোকটী কোন দিন আমার অনুসরণ করে নাই। যদি দৈবাৎ পথে কখনও তাহাকে দেখিতে পাইতাম, সে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত।

তীর্থ।

(শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

একটা পুণ্যক্ষেত্র বা পুণ্যস্মৃতিপূতস্থান—যাহা সংসারের সাধারণ কোলাহলময়, জঞ্জাল-আবর্জ্জনাপূর্ণ এলাকার বহির্ভূত থাকিয়া ভক্তদের চিত্তে শান্তিধারা ঢালিয়া দিবার জন্য প্রস্রবণ রূপে বিরাজ করিবে—এরূপ একটা পবিত্ররাজ্যের আবশ্যকতা সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানিয়া আসিতেছে। তীর্থ মানুষের খাড়া করা জিনিষ, সুতরাং মানুষের মনোভাবের তারতম্যের সহিত তীর্থের সংজ্ঞার ও সংখ্যাব তারতম্য। অধ্যাত্মবাদী হিন্দুর তীর্থ আধ্যাত্মিকভাবদ্যোতক। যে স্থান ভগবান্ বা ভগবৎকল্প দেবতা বা দেবকল্প মহাপুরুষের কোন স্মৃতি বা লীলা দ্বারা সুরভিত, সেইখানেই হিন্দুর তীর্থ। ভগবানের নানা অবতারে বিশ্বাসী, তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজক ধর্ম্মপ্রাণ, হিন্দুর তীর্থও বহু, ও ধর্ম্মের রঙ্গে ফলান। একমাত্র যীশুখ্রীষ্টের ভক্ত খ্রীষ্টীয়ানের আদি তীর্থ, একমাত্র জেরুজিলাম; একমাত্র মহম্মদের ভক্ত মুসলমানের তীর্থ, একমাত্র মেক্কা।

'তীর্থে'র জন্মতত্ত্ব কি? অর্থাৎ কেন 'তীর্থ' বলিয়া একটা জিনিষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিল? কেনই বা মানুষের চিরন্তন সম্বলের মধ্যে অন্যতম হইয়া ভূমণ্ডলে টিকিয়া গেল? গ্রাম-নগর যেমন বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, ক্ষেত-ময়দানের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, উহারা যেমন মানুষের ঐহিক উদ্যমের পরিচায়ক, এবং জীবন ধারণের ও ঐহিক উন্নতির পক্ষে আবশ্যক, তেমনি তীর্থগুলিও পথ-ঘাট-পুর-জনপদের মধ্য হইতে সেই মানুষেরই আধ্যাত্মিক ভাবের বাহ্য বিকাশ স্বরূপ, ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে আবশ্যক বলিয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে।

সকল জিনিষেরই একটা স্বাভাবিক পর্য্যবসান বা পরিণতি আছে। উদ্ভিদ্ জগতের পরিণতি ফলফুলে, জীব জগতের পরিণতি মানুষে,

মানুষের পরিণতি এই আধ্যাত্মিকতায়। গাছটা সমস্ত মাটিটার মধ্যে সূক্ষ্ম বীজাকারে ওতপ্রোতভাবে ছড়ান থাকে, কিন্তু প্রকৃতি দেবী তা থাকিতে দেন কই? মাটি-কাঁকর-পঙ্ক-কর্দ্দম-ময় ধরিত্রীকে মন্থন করিয়া গাছটী বাহির করিলেন। তাতেও নিশ্চিন্ত নন্, আবার তার ডাল-পাতা-কাঁটা-ময় দেহটী মন্থন করিয়া তাহার সারটী তাহার অগ্রভাগে ফুলরূপে ফুটাইয়া বা ফলরূপে ফলাইয়া তবে তাঁহার তৃপ্তি। আবার জীবজগৎ মন্থন করিয়া তার সার মানুষকে ছানিয়া লইলেন, ও মানুষের মনঃসমুদ্র মন্থন করিয়া আধ্যাত্মিকভাবরূপ অমৃতটী বাহির করিয়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাকা সেতু বাঁধাইয়া তবে নিশ্চিন্ত। তীর্থটী এই আধ্যাত্মিকতার বহির্বিকাশের একটা অঙ্গ—ঐ সেতুর *একটা স্তম্ভ মাত্র। এই যে হিন্দুজাতি—ইহার* ত শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, মানসিক, বাচনিক, কায়িক সকল রকম উদ্যমে আধ্যাত্মিকতা মাখান ও ছড়ান আছে, কিন্তু তথাপি সেই প্রাকৃতিক মন্থনের বলে তাহার সর্ব্বতঃপরিব্যাপ্ত ও অনুস্যূত আধ্যাত্মিক রসটী মধ্যে মধ্যে গাভীর দুগ্ধের ন্যায় এক বিশেষ স্থানে সঞ্চিত হইয়া ঠেল মারে ও সদাই আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। তীর্থ সেই আধ্যাত্মিক প্রকাশ চেষ্টার অন্যতম ও তাহারই বহির্জগতস্থ অবয়ব-বিশেষ।

এই আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ একেবারেই কিছু দেশে হয় না—প্রথমে কালে হয়। আমরা দেশগত তীর্থেরই ত অস্তিত্ব দেখি, কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে কালগত তীর্থও ছিল, সেটা মনে রাখিতে হইবে। দেশহিসাবে বারাণসী, হরিদ্বার, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, ৺পুরী, গয়া, নবদ্বীপ, মেক্কা, জেরুজিলাম যেমন তীর্থ, কালহিসাবে আবার রামাবতারের যুগ, কুরুক্ষেত্র সমরের যুগ, বৌদ্ধযুগ, চৈতন্য যুগ, খ্রীষ্ট যুগ, মহম্মদ যুগ একই তীর্থ। দেশতীর্থের ভিত্তি ধরিত্রীর অংশ-বিশেষ; কালতীর্থের ভিত্তি অনন্ত কালসমুদ্রের অংশবিশেষ, যাহাকে আমরা যুগ বলি। আধ্যাত্মিক প্রকাশ চেষ্টা প্রথমে কালের উপর এক এক পবিত্রযুগরূপ ছাপ দিয়া যায়, কালও আবার দেশের

উপর বিশেষ বিশেষ ছাপ দিয়া যায়। এইরূপে দেশে ও কালে আদান প্রদান, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। আগে এক কালস্রোত আসে, যখন মন একটা উচ্চভাবের আবেশে ভরিয়া যায়, যখন দেশের সকলের অন্তর হইতে,—তা জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক,—ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উত্থান দূর করিবার নিমিত্ত—ভগবানের আবির্ভাবের জন্য আবাহন উঠিতে থাকে, সেই আবাহন আবার অনন্তসমুদ্র হইতে সাধু-পরিত্রাণকারী, দুষ্কৃত-বিনাশকারী এক অবতার মথিত করিয়া তুলিয়া জগতে আনিয়া দেয়—সেই অবতারের কথাবার্ত্তায়, কার্য্যলীলায়, প্রভাবপ্রেরণায় যুগটা ভরিয়া যায়—এইটা হইল কালতীর্থ। আবার কাল সেই অবতারের লীলাপূত স্থানবিশেষকে এমন জমাটবাঁধা স্মৃতি দ্বারা গাঁথিয়া তুলে যে, সে নিজে দূরে সরিয়া গেলেও তার কায ঐ স্থান দ্বারাই সাধিত হয়। অনন্তপ্রবহমান কালবারিধিতে এইরূপ কতশত তীর্থযুগের প্লাবন আসিয়া এক একটী তীর্থধামরূপী দ্বীপ সেই অনন্ত বারিধিবক্ষে রাখিয়া যায় ও সেগুলি প্লাবনের সাক্ষি-স্বরূপ থাকিয়া যায়। এই স্থানই দেশতীর্থ বা সাধারণতঃ আমরা যাহাকে তীর্থধাম বলি।

আমাদের—অধ্যাত্মবাদী হিন্দুদের—তীর্থ না হইলে চলে না—তা সমষ্টি-ভাবেই ধর বা ব্যষ্টি-ভাবেই ধর। জাতীয় ইতিহাসে যেমন এক এক তীর্থযুগ আইসে, পারিবারিক ইতিহাসেও এক এক তীর্থ-যুগ আইসে—যখন পরিবারের মধ্যে কোন এক ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ আসিয়া পারিবারিক জীবনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ধারা এক নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়া যান। সে পরিবারের আদর্শ চিন্তা তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উঁচুসুরে গাঁথা হয়, কার্য্যকলাপও অধিকতর পরোপকারে, জীবসেবায়, ও দেবার্চ্চনায় পর্য্যবসিত হয়। আবার ব্যক্তিগত জীবনেও এইরূপ। অনেক লোকের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন তাহার মনটা হঠাৎ যেন সাধারণ সাংসারিকতার স্তর হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া এক শান্ত পবিত্র রাজ্যের রজে

পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়—হয়ত ক্ষণিকের তরেও সাংসারিক তামসিকতা ভেদ করিয়া কোন এক জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের রশ্মিছটার ২।১টা তার মনোমধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। এটা হইল ব্যক্তিগত জীবনের তীর্থযুগ। সকলে হয়ত বুঝিতে পারেন না, বুঝিলেও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারেন না—কিন্তু আসে প্রায় সকলের জীবনে ও সকলের জীবনের পক্ষেই উহা আলো, বায়ু, জলের ন্যায় আবশ্যক। এই গেল কালগত তীর্থের কথা।

তার পর দেশগত তীর্থের কথা। এখানেও তীর্থ ত্রিবিধ বলা যাইতে পারে—জাতীয় তীর্থ, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বা আত্মগত। সাধারণ তীর্থ-ধামগুলিই জাতীয় তীর্থেব উদাহরণ। তাব পর তার প্রসার ক্ষুদ্রতর, ক্রিয়া হয়ত গভীরতর হইয়া আসে। জাতীয় তীর্থের পরেই পারিবারিক তীর্থ। এই পারিবারিক তীর্থ কি? হিন্দুমাত্রেই জানেন—সকল গৃহস্থের ঘবেই একটী কবিয়া ঠাকুর ঘর আছে—সেই হইল পাবিবারিক তীর্থ। যাব ২।৩টী কুঠারিও আছে, তারও একটী ছোট ঠাকুরঘর—নিদেন তুলসী তলা বা হরির তলা আছে। যিনি কখনও বাড়ীর বাহিব হন নাই বা হইতে পারেন নাই, তাঁর তীর্থের সকল কায এই খানেই হয়। শুচি-শুদ্ধি, শান্তি-সংযম, ভক্তি-শ্রদ্ধা যা কিছু আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের পক্ষে আবশ্যক—সে সকলের শিক্ষার আগার হিন্দুর এই ঠাকুর ঘর। প্রতিদিন, প্রতিবেলা এই ঠাকুর ঘর, কত না ভাবে, কত না উপায়ে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতেছে। চক্ষের নিমেষেব মত, নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত, রক্ত চলাচলের মত, তার কায নিঃশব্দে অহরহ চলিতেছে—এই জন্য হঠাৎ লোকের ঠাহর হয় না। কিন্তু ঠাহর হয় না বলিয়া তার ক্রিয়া তেমনি অসাধারণ ও অনির্ব্বচনীয় ও তাহা আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে তেমনি আবশ্যকীয়। সে স্থান বাড়ীর ঠাকুরমা, মা, পিসিমা, মাসিমা, খুড়িমা, জেঠাইমা দিবারাত্রি মার্জ্জনা ও সংস্কার করিতে ব্যস্ত ও পূজা-ধ্যান-মালাজপে ঠিক ধূপধূনারই মত সুরভিত। স্নান না করিয়া মেয়ে-ছেলে-বৌ কেহই ঢুকিতে পারেন না। বাড়ীর

কচি ছেলেরাও জুতা পরিয়া ঢুকে না। সেখানে অর্দ্ধ-সংসারত্যাগী বয়োবৃদ্ধ ভক্ত আকুল প্রাণে ডাকেন—

"হরি দিন যে গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে"।

সেখানে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধক যোগ ধ্যানাদি করিয়া আত্মার ভিতরে পরমাত্মাকে দেখিবার, অনন্তবিশ্বরূপকে সান্ত হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎকট সাধনা করেন। সেখানে আর্ত্ত ব্যাকুল হইয়া বিপন্মুক্তি বা কষ্টমোচনের আন্তরিক প্রার্থনা করেন। ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা প্রার্থনা করেন, "ঠাকুর, আমার সময় হ'য়েচে—আমাকে ঐ পারে টেনে নেও, আমার বাছাদের দেখো"। ছেলের অসুখ,—মা এই থানেই এসে মাথা খুঁড়েন ও বলেন, "ঠাকুর, আমার খোকার অসুখ সারিয়ে দেও, ষোড়শোপচারে পূজা দেব"। প্রবাসী স্বামীর সংবাদ অনেক দিন আসিল না—বধূ অন্তরে অন্তরে ঠাকুর প্রণামের সঙ্গে প্রার্থনা করেন—"দেখ অনাথের নাথ—তাঁর খবর দাও—তাঁকে ভাল রেখো"। অনূঢ়া কন্যা শিবপূজা ও বর প্রার্থনা করে—বালক আসিয়া প্রণাম করে আর বলে, "ঠাকুর, এবার যেন পরীক্ষায় প্রথম হই"। এইরূপে ভক্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, আর্ত্ত,—আবালবৃদ্ধবনিতা,—সর্ব্ব রকম লোকের সকাম-নিষ্কাম সর্ব্ব রকম প্রার্থনা প্রত্যহ ঠাকুরের পূজার ফুলেরই মত থরে থরে পুঞ্জীভূত হইয়া ঠাকুরের পায়ের তলায় পৌঁছিতে থাকে। কে বলিবে, এই ছোট ঠাকুর ঘরের কোন্‌টী হইতে কত সাধকের দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিঃ, কত ভক্তের শ্রদ্ধাভক্তির সুরভি, কত আকুল প্রাণের মর্ম্মবন্ধন-চ্ছেদী ক্রন্দন উত্থিত হয়? স্বর্গ মর্ত্ত্যের সঙ্গমস্থল এই ঠাকুর ঘর। এখানে যদি তীর্থ নয়, ত তীর্থ কোথায়?

তার পর ব্যক্তিগত তীর্থ অর্থাৎ আত্মতীর্থ। প্রত্যেক মানুষের অন্তর হইতে অন্তরতম একটী নিভৃত কোণ আছে, যেখানটি তীর্থেরই মত পবিত্র, শান্তিপ্রদ ও ভগবানের অধিষ্ঠানপূত। এই জন্য শাস্ত্রে দেহকে দেবালয় বা ব্রহ্মপুর বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"—১৫।১৫

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"—১৮।৬১

আবার মৈত্রেয়ী উপনিষদ্ বলেন—

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ"—২।১

বাইবেলেও এই মানবদেহকে "Temple of God" বা ভগবানের মন্দির এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই ব্রহ্মপুর বা দেবালয়কে সর্ব্বদাই শুদ্ধ, পবিত্র, শুচি রাখিতে হয়। কোনরূপ কুচিন্তা, অসদ-ভিপ্রায়, দৌর্ব্বল্য, চাঞ্চল্য প্রভৃতি রূপ আবর্জ্জনা বা মলিনতা রাখিতে নাই। যাহাতে উহা সততই দেবভাবে পরিপূর্ণ, সর্ব্ব রকমে দেবতার ঠাঁই হইবার উপযুক্ত হয়, তাহাই করিতে হয়। সর্ব্বদাই যেন ইহা ভক্তি-বারিতে ধৌত, সংস্কৃত থাকে, আত্মনিবেদনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শিখা যেন ইহার মধ্যে সর্ব্বদাই জ্বলিতে থাকে, প্রীতি-সদ্ভাবের চন্দনকুসুম যেন অহরহঃ ইহাকে সুরভিত করিতে থাকে।

সকলে হয়ত এই তীর্থের সন্ধান পান না, বা প্রস্তুত হইয়া এই তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেন না; কিন্তু তাহা হইলেও এই তীর্থ সকলের অন্তর মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ইহার মধ্যস্থিত ভগবন্মন্দিরের স্বর্ণচূড়া কাহারও কাহারও পক্ষে জ্ঞানসূর্য্যের বিমল জ্যোতিতে বা ভক্তি-চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মিতে ঝক্ঝক্ করিতেছে, আর কাহারও পক্ষে হয়ত মাটির নীচে চাপা আছে,—যাত্রী কখন্ আসিয়া ইহাকে খুঁড়িয়া বাহির করিবে এই প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। যে ভক্ত, সে মধ্যে মধ্যে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণাপূর্ণ, পাপতাপময় কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইয়া ছুটিয়া এক একবার এই শান্তিপ্রদ রাজ্যে প্রবেশ করে ও সেখানে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিজের মানত করা পূজা অর্চ্চনা করিয়া ও সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা-বাসনা প্রভৃতির অঞ্জলি দিয়া আবার কতকটা নবজীবন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসে। আবার কর্ম্মজীবনের অবসানে কত সংসারবিরাগী ঐ তীর্থেই কল্পবাস কিম্বা জীবনের অবশিষ্টটা অতিবাহিত করেন। পৌঁছিয়াই কিছু বাস করা হয় না—প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে অন্ততঃ এই অন্তরতম তীর্থটি

দেখিয়া আসিতে হয়, সেই দেবতার মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিতে হয় ও "দ্বার খোল হে দেখা দাও"—এই বলিয়া ডাকিতে হয়, তাহা হইলেই দ্বার খুলিয়া যায় ও দেবতা দেখা দেন ও পদ্মহস্ত বুলাইয়া দুর্ব্বলতা-চঞ্চলতা, শোক-তাপ ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া দেন; পাপপঙ্ক, মলা মলিনতা ধুইয়া মুছিয়া দেন; ও নিজের চরণামৃত পান করাইয়া শান্ত শুদ্ধ সংযত দৃঢ় করিয়া ছাড়িয়া দেন। মধ্যে মধ্যে এইরূপ তীর্থের বাতাস লাগাইয়া সুস্থ সবল হইয়া না আসিলে আবার তাঁর কায করিতে পারা যাবে কেন?

এ তীর্থ দর্শনে অর্থব্যয় নাই, পাণ্ডার হাঙ্গাম নাই। প্রথমে খুঁজিয়া পাইতে সাধনার আবশ্যক হয়। পথ কিছু দীর্ঘ ও দুর্গম, কিন্তু একবার খুঁজিয়া পাইলে আর কোন গোল থাকে না। সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই তীর্থের যাত্রী। যে ভক্তযাত্রী, সে জ্ঞাতসারে কত কষ্ট সহিয়া, কত মানত করিয়া যাত্রা করে, গণ্ডী খাটিয়া খাটিয়া যায়। একটা আদর্শের বা উচ্চ লক্ষ্যের গণ্ডী দিয়া পড়ে, যতদূর তাহার নাগাল তত দূরে গণ্ডী দেয়, তাহাব পর সেই অবধি পৌঁছিয়া আবার আরও দূরে গণ্ডী দেয়। এইরূপে যাত্রাস্থল হইতে আদর্শ, দূর হইতে দূরে যাইতে থাকে ও তীর্থও নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। জগদ্ব্রহ্মাণ্ড, সচরাচর সৃষ্টিও এইরূপে গণ্ডী খাটিয়া—আদর্শকে দূর হইতে দূরতর রাখিয়া এক মহা তীর্থের দিকে চলিয়াছে। পথ সুদীর্ঘ, তবে এইরূপে গণ্ডী খাটিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে যাত্রা শেষ হইবে।

উৎসব ও অন্যান্য সংবাদ।

বিগত ৩রা চৈত্র বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টাশী-তিতম জন্মমহোৎসব আনন্দসহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তি অতি মনোহরভাবে লতা পাতায় সজ্জিত হইয়া ভক্তবৃন্দের ভক্তি উদ্দীপনার সাহায্য করিতেছিল। আঁতুলের কালী-কীর্ত্তন, বৈষ্ণবচরণের কৃষ্ণ কীর্ত্তন, অন্যান্য বিভিন্ন দলের নানাবিধ ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন, দক্ষিণারঞ্জন বাবুর সুবিখ্যাত ব্যাণ্ড প্রভৃতি সারাদিন সমাগত দর্শক ও ভক্তবৃন্দের ভক্তি ও আনন্দ জাগ্রত রাখিয়াছিল। অপরাহ্নে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচারক স্বামী দয়ানন্দ বহু শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে সুললিত ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। সারাদিন প্রসাদ, সরবত, জল প্রভৃতি বিতরিত হইয়াছিল এবং প্রায় আট দশ সহস্র ভক্তকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রভৃতি প্রসাদ খাওয়ানো হইয়াছিল। হোরমিলার কোম্পানি প্রাতে ৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কলিকাতা আহিরিটোলার ঘাট হইতে মঠ পর্য্যন্ত ৪ খানি ষ্টিমার যোগে উৎসবদর্শনার্থিগণের যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এবার একটি উঠিবার ও আর একটি নামিবার উত্তম জেটি প্রস্তুত হওয়াতে আরোহিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নৌকা ও রেলযোগে এবং পদব্রজে যে কত লোকে আসিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই।

বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে এগারটার সময় সহরের নানা স্থান হইতে সঙ্কীর্ত্তন দল সমবেত হইয়া আশ্রমে ভজন করিতে লাগিল। পরে মঙ্গলারতি হইবার পর অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হরিকথা হইল। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অসংখ্য শ্রোতৃ-বর্গের সমক্ষে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার "স্বামী বিবেকানন্দ ও

ও আধুনিক বিজ্ঞান" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। অবশেষে প্রসাদ বিতরিত হইয়া উৎসব সমাপ্ত হইল।

উক্ত মঠে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবও আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। বেলা দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত শ্রীযুত কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক হরিকথা (প্রহ্লাদচরিত্র) হয়। বিদ্যাভূষণ মহাভাগবত ও কৃষ্ণ আয়েঙ্গার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অতি মনোহারিণী বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীনিবাসরাও মহাশয় বলিলেন, পরমহংসদেবের উপদেশ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য, কারণ, উহা বর্ত্তমান কালের বিশেষ উপযোগী। প্রায় এক সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্ব্বক সেবা করান হয় এবং ভক্তগণকেও প্রসাদ বিতরিত হয়।

বাঙ্গালোর বেদান্ত সমিতিতে বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের উৎসব উপলক্ষে এক হাজার দরিদ্রের সেবা, নানাবিধ যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত, ইংরাজী তামিল ও কানারিজ ভাষায় বক্তৃতা, সংকীর্ত্তনসহকারে স্বামীজির প্রতিকৃতিকে সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আনা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা, সঙ্গীত, প্রায় শতাধিক সাধু ভোজন ও প্রসাদ বিতরণাদি হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন হয়। পরে প্রায় দুই শত ভক্ত প্রসাদ পাইলেন, আর ৮০০০ দরিদ্র নারায়ণের সেবা করান হইল। বেলা ৩টা হইতে ৫।টা পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন অবলম্বন করিয়া অতি মনোহারিণী হরিকথা হইল। পরে মাননীয় পি, এস, শিবস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে মাননীয় জজ সদাশিব আয়ার

"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সারাংশ" সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ভগবৎপ্রেম এবং নারায়ণ জ্ঞানে সর্ব্বভূতের প্রতি ভালবাসাই তাঁহার প্রধান শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে যে যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হউক না, ঈশ্বরকে নির্গুণ, সগুণ বা সাকার নিরাকার যাহা বলিয়াই বিশ্বাস করুক, কিছুতে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু কে কতদূর ঈশ্বরানুভূতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার পরীক্ষা এই যে, সে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সাকার বিগ্রহস্বরূপ জীবের প্রতি কতদূর প্রেমসম্পন্ন হইতেছে। এই প্রেম যখন সার্ব্বজনীন না হইয়া সীমাবদ্ধ ভাবে থাকে, অর্থাৎ নিজ আত্মীয় স্বরূপ স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধবের ভিতর আবদ্ধ থাকে, তখন তাহাকে আসক্তি বলে। এই আসক্তি বর্জ্জন করিয়া, রাগদ্বেষঘৃণাবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটন করিতে পারিলেই সর্ব্বভূতের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে পারা যায়। উপসংহারে বক্তা বলেন, প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্মান্দোলন করিতে হইলে তাহার আধুনিক ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি উদার ধর্ম্মান্দোলন সমূহের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে যুবকগণের ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন এবং অসাম্প্রদায়িক ভাব বজায় রাখিয়া যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব, তৎসম্বন্ধেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন।

অবশেষে আরাত্রিক ও প্রসাদ বিতরণান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

সারগাছি মুর্শিদাবাদ রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে বহরমপুরের জজ পাণ্টন মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং মুর্শিদাবাদে মিশনের লোকহিতকর কার্য্য সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত কীর্ত্তনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহরমপুর হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তথাকার কলেজের বহু ছাত্র মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার ভদ্র ও

দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইয়াছিল। এ বৎসর আশ্রমের নিজ জমিতেই মহোৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৭ই চৈত্র সিদ্ধকাঠি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ভবনে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উষায় নগরকীর্ত্তন, প্রবন্ধপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন এবং দুই শত নিঃসহায় দরিদ্রকে একসের করিয়া চাউল ও একটী করিয়া পয়সা দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত, ঢাকা, নাগপুর, হবিগঞ্জ, রায়পুর (দেরাদুন), কনখল, রাঁচি প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসবের সংবাদ পাইয়াছি।

নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম প্রায় বৎসরাধিক কাল স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে নদীয়া জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভা আহূত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় বলেন, এই সেবাশ্রম নবদ্বীপের বহুতর ক্লেশ নিবারণের সহায়তা করিয়াছেন, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের ইহাতে সহায়তা করিয়া ইহাকে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

এবার চট্টগ্রামে প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার মতে

"প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইবে। পুরাণ ইতিহাসের আদর্শ যদি সমাজে না থাকে, সমাজের আদর্শ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিকৃত হইবে।"

"ভাষাশরীরের অভ্যন্তরে একটী প্রাণ পদার্থ আছে, সেইটী বাঙ্গালির মত হইলে তবে বাঙ্গালির উপযোগী ভাষা হয়।"

"যে ভাষায় প্রাণ নাই, সে ভাষাই নহে।"

"আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করিতে বা রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের নিম্নস্তরের ভাষাকে অবহেলা করিলে চলিবে না।"

"ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যক; আর ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস সংযোগ করা আবশ্যক। রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার।"

বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার এই সমুদয় মত তিনি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে অভিপ্রায় যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন, তিনিও অনেকটা এই মতাবলম্বী ছিলেন।

সরকার মহাশয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির আসন হইতে আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট বরিয়াছেন,—আমাদের দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

"পল্লীর উন্নতি দূরে থাকুক, এমন কি, পল্লীর স্থিতির জন্য কাহারও কোন উদ্যোগ নাই।" "দেশে জঙ্গল বাড়িতেছে," "বড় বড় আগাছায় গ্রাম নগবের উপকণ্ঠ একেবারে ভরিয়া উঠিতেছে।" "নদীগর্ভ সকল ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছে।" "জ্বরে ওলাউঠায় দেশ উজাড় হইয়া যাইতেছে।"

বৃদ্ধ সরকার মহাশয় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে সর্ব্বসাধারণকে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিয়াছেন। কারণ, "স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প—সকল বিষয়েরই উন্নতি হইবে।"

আমরা বলি, যদি এই কার্য্য কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হইবার আশা থাকে, তবে তাহা বঙ্গীয় যুবকগণের দ্বারাই হইবে। শত শত যুবক দেশহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া এই সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে বদ্ধপরিকর হউন—তাঁহাদের আর কিছু হউক বা না হউক, আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইবে নিশ্চিত। দেশের লোকের মুখ না চাহিয়া, কে সহায়তা

করিল, কেই বা বিরোধ করিল, এ সকল দিকে খেয়াল না করিয়া যদি কতকগুলি যুবক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই কার্য্যে নিঃস্বার্থভাবে লাগিয়া যাইতে পারেন, তবেই ইহা হইবার সম্ভাবনা। কেবল মুখে বক্তৃতা করিলে বা সংবাদপত্রে আন্দোলন করিলে হইবে না, যথার্থ কর্ম্মবীর হইতে হইবে।

ইহা ব্যতীত সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সম্প্রতি প্রকাশিত অধিকাংশ সাহিত্যগ্রন্থের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছেন।

সমালোচনা।

শ্রীমহাভারতের বৃহৎ সূচী। পণ্ডিতবর জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত এবং শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় (কাশীধাম) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম, বর্ণানুক্রম বিস্তৃত সূচী এবং ২য়, অধ্যায়ানুক্রম সূচী। ১ম ভাগটীতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে বিস্তারিত ভাবে এক একটী বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে যে যে শ্লোকে সেই সেই ভাব আছে তাহার কিয়দংশ, পরে পর্ব্বের নাম ও অধ্যায়সংখ্যা, অবশেষে যে শ্লোক হইতে উক্ত বিষয়টী আরব্ধ হইয়াছে তৎসংখ্যা, উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে প্রত্যেক পর্ব্বের বিষয়সমূহ, প্রত্যেক বিষয়ের শ্লোকৈকদেশ এবং শ্লোকসংখ্যা লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক পর্ব্বে বা অধ্যায়ে সেই সেই পর্ব্বের বা অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ানুযায়ী অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা এবং প্রাপ্ত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা সন্নিবিষ্ট করিয়া উভয়ের মধ্যে ন্যূনাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকার পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম

স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় পনর ষোল বৎসর লাগিয়াছে। মূল মহাভারতখানি যেরূপ বিপুলকলেবর গ্রন্থ, তাহাতে আজকাল খুব অল্প লোকেই সমগ্র গ্রন্থখানি আদ্যন্ত উত্তমরূপে পাঠ করিতে পারেন। আর পাঠ কবিলেও কোন বিশেষ বিষয় উহা হইতে বাহির করিতে গেলে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। সুতরাং এইরূপ স্থচী'র যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংরাজী প্রায় সকল ভাল ভাল গ্রন্থেরই এক একটী Index বা বিস্তারিত সূচী বা নির্ঘণ্ট দেওয়ার নিয়ম আছে। তাহাতে পাঠক ও লেখক-গণের যে কতদূর সুবিধা হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বঙ্গদেশেও এই রীতি অনুসৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী। আমরা বঙ্গবাসীর মহাভারতের সহিত কিছু কিছু মিলাইয়া দেখিয়াছি—এবং স্বল্প অনুসন্ধানেই উহা হইতে অভিপ্রেত বিষয় বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয় আদৌ ইংরাজী না জানিলেও ঠিক ইংরাজী ধরণে তিনি যে ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা পরম সুখী। অবশ্য অনেকের মতে এই সূচীতে আরও অধিক বিষয় সন্নিবেশিত করিতে পারা যাইত, কিন্তু এই প্রথম উদ্যমেই গ্রন্থকার যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আশাতীত। প্রার্থনা, মহাভারতের পাঠকবর্গ এবং লেখকমাত্রেই এই সূচীটী সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া গ্রন্থকারের উৎসাহবর্দ্ধন করিবেন—গ্রন্থকারও আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার আবশ্যকীয় পরিবর্দ্ধনাদি করিবেন।

'নিবেদনে' লিখিত হইয়াছে যে, গ্রন্থকার হরিবংশ ও বাল্মীকি রামায়ণেরও সূচী প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ গুলিও শীঘ্র প্রকাশিত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। পণ্ডিত মহাশয়ের পথানুসরণে অন্যান্য সুধীবর্গও এইরূপ সংস্কৃত বা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকসমূহের সূচী প্রণয়ন কার্য্যে অগ্রসর হইলে বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চ্চার গতি আব একপদ অগ্রসর করিয়া দিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

জীবন্মশিক্ষা। পণ্ডিতবর জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত এবং শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ কর্ত্তৃক ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

প্রাচীনকালের ব্যক্তিগণ কেন দীর্ঘায়ুঃ হইতেন এবং নব্যগণই বা অল্পায়ুঃ কেন, এই তত্ত্ব এই গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতিনীতির সম্যক্ অনমুষ্ঠানই নব্যগণের এইরূপ অল্পায়ুঃ হইবার কারণ। গ্রন্থকার ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি অবলম্বনে ধর্ম্ম, সদাচার, বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, আহার, সংসর্গশক্তি, দৈনিক কৃত্য, প্রাণায়াম, মন্ত্র-শক্তি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

শাস্ত্রীয় সদাচার প্রতিপালনই দীর্ঘায়ুঃ লাভের উপায়—সাধারণ ভাবে গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেও আমরা তাঁহার সকল যুক্তি-গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। প্রথমতঃ, আমাদের জিজ্ঞাস্য, 'প্রাচীন' বলিতে গ্রন্থকার কি বুঝেন? এক শত দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের লোক কিম্বা প্রাচীন স্মার্ত্ত বা পৌরাণিক যুগের লোক অথবা প্রাচীনতর বৈদিক যুগের লোক? যাঁহারা আজকাল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া তথাকথিত নব্যগণকে অবজ্ঞা বা করুণার দৃষ্টিতে দেখেন এবং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রচলিত প্রায় সমুদয় আচারকে শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পান, তাঁহারাই যে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন, আজকাল সকল বিষয়ের 'কেন' অনুসন্ধান করা একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, সেই জন্য তিনিও শাস্ত্রীয় আচারসমূহের যথাসাধ্য যুক্তি দিবার প্রয়াস পাইতেছেন, নতুবা ঋষিবাক্যের যুক্তি, বুঝ বা নাই বুঝ, উহা অবিচারিতচিত্তে প্রতিপালন করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য—উহাতেই আমাদের যথার্থ কল্যাণ।—ঋষিবাক্য সর্ব্বথা প্রতিপালনীয়, একথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু ঋষিবাক্যের যথার্থ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য আমরা সর্ব্বত্র আধুনিক পণ্ডিত মহাশয়গণের নিকট হইতে

অবিচারিতচিত্তে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। গ্রন্থকার বালিকা-বিবাহের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ও স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী; তাঁহার ঐ ঐ মতাবলম্বনের যুক্তিগুলি আমরা সবিশেষ প্রণিধান সহকারে বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। তিনি প্রাচীনকালে স্ত্রীগণের যৌবনবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ প্রথার জন্য তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইত না বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি কি কারণে সে প্রথা লুপ্ত হইল, তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তিনি পরে যৌবনবিবাহের যে যে দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রাচীনেরা কি তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন? অন্যান্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেও তাঁহাব কারণনির্দ্দেশ সকল স্থলে প্রাণে লাগে না।

যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয় নব্যগণকে সচ্চরিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া অনেক স্থলে উল্লেখ করাতে বুঝা যায়, তিনি উঁহাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন; কেবল শাস্ত্রীয় আচাববর্জ্জিত হওয়াতে তাহারা অল্পায়ুঃ হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, এই কারণে তিনি বিশেষ দুঃখিত। অতএব তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহার যদি বাস্তবিকই ধারণা হইয়া থাকে যে, শাস্ত্রীয় আচারের অবহেলাই নব্যগণের অকালমৃত্যুর কারণ এবং তিনি যদি তাহাদের জন্য অকপট ভাবেই দুঃখিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং শাস্ত্রীয় আচারগুলির মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিয়া নব্যগণ যে ভাবে বুঝিতে পাবে, সেই ভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করুন; তবেই তাঁহার শ্রম সফল হইবে। নতুবা পূর্ব্ব হইতেই যাহারা তাঁহার মতাবলম্বী, তাহারা কতকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেও যাহাদের উদ্দেশে এই গ্রন্থ লেখা, তাহারা তাঁহার এই গ্রন্থপ্রচারকে তথাকথিত প্রাচীন আচারের অক্ষম ওকালতিমাত্র মনে করিয়া ঈষদ্ধাস্যসহকারে ইহা হইতে দূরে অবস্থান করিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

(স্বামী সারদানন্দ।)

ঠাকুরের সাধনার শেষ চারি বৎসর (১২৭১—১২৭৪)।

ঠাকুরের বয়স—২৯ হইতে ৩২ বৎসর।

আমরা দেখিয়াছি, সন ১২৬৭ সালের শেষ ভাগে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেহত্যাগের পরেই অশেষকল্যাণগুণসম্পন্না শ্রীমতী যোগেশ্বরী বা যোগমায়া—ঠাকুর যাঁহাকে ব্রাহ্মণী বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন—দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করেন, এবং ঐকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৭০ সালের কিয়দংশ পর্য্যন্ত ঠাকুর, তন্নির্দেশে তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হয়েন। ঠাকুরের জীবনের ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলীই আমরা এখন পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

তন্ত্রোক্ত সাধন সকলের অনুষ্ঠানকালে মথুর বাবুই ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ, অদ্ভুত সংযম এবং অনন্ত ত্যাগ বৈরাগ্যের গম্ভীরত্বসম্বন্ধে বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা শ্রীযুত মথুর ঐকালের পূর্ব্বেই যেমন দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন, তেমনি তান্ত্রিকসাধনকালে তাঁহাতে অলৌকিক বিভূতি-সকলের প্রকাশ বারম্বার দেখিতে পাইয়া তাঁহার ইহা দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার ইষ্টদেবীই তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার সেবা লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্য্যাদা ও গৌরবসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। বাস্তবিকও অদৃষ্টবান্ পুরুষ মথুরানাথ তখন যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি ঐরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে আপনাকে দৈবসহায়বান্ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের সাধনানুকূল দ্রব্যসমূহের

সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায়মত দেবসেবার্থে বা অন্য কোন সৎকার্য্যানুষ্ঠানে মথুরের ব্যয় করাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই।

আবার তন্ত্রোক্ত সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ যতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস এবং বল দিন দিন ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব উৎসাহ এবং বলসঞ্চার অনুভব করেন, মথুরের অনুভূতিও এখন তাদৃশী হইয়াছিল। তবে রজোগুণী সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবাদি ও পুণ্যকার্য্যসকলের অনুষ্ঠানমাত্র করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যে অধিক দূর আর অগ্রসর হইতে চাহিত না। উহা না চাহিলেও কিন্তু মথুরের ভক্তি তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল পরকালের সম্বল, এবং তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতি সকলই একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় ও কৃপায় সংসাধিত।

ঐরূপে ঠাকুরের কৃপায় মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয়ও আমরা তাঁহার এই কালানুষ্ঠিত কার্য্যে পাইয়া থাকি। "রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত" শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীযুত মথুরানাথ এই কালেই (সন ১২৭০ সালে) দক্ষিণেশ্বরে বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, এই ব্রতকালে তিনি প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মন চাউল ও সহস্র মন তিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধা গায়িকা সহচরীর কীর্ত্তন ও রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান প্রভৃতি কিছুকালের জন্য নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। হৃদয় একথাও বলিতেন যে, এই সকল গায়কগায়িকাদিগের ভক্তিরসাশ্রিত সংগীত শ্রবণে ঠাকুরকে মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুত মথুর, ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই পরিমাপকস্বরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহারই ইচ্ছামত তাহাদিগকে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র এবং শত শত মুদ্রাদি পারিতোষিকস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত মথুরের ঐরূপে অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠানের কিছু পূর্ব্বেই যে, ঠাকুর বর্দ্ধমান রাজসভার তাৎকালিক প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের অশেষ গুণগ্রামে ও নিরভিমানিতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান এবং কৃপা করেন, একথাও বুঝিতে পারা যায়। কারণ, অন্নমেরু ব্রত-কালে আহূত পণ্ডিতসভাতে ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে আনয়ন ও দান গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীযুত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি বিশেষ ভক্তি-সম্পন্ন থাকিলেও এবং তাঁহার দ্বারা ঐবিষয়ে এক প্রকার অনুরুদ্ধ হইলেও উক্ত পণ্ডিত কি ভাবে আপন নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া মথুরের সাদর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র পাঠককে বলিয়াছি।

তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণব মতের সাধন-সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐরূপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক কারণও আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম, ভক্তিমতী ভৈরবী ব্রাহ্মণী—যিনি ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত বীর ও দিব্য মতের সাধনসমূহের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করেন—বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধন-সমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন এবং ঐ ভাবসকলের অন্যতমকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং অনেককাল অবস্থান করিতেন। নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার ঠাকুরকে সাক্ষাৎ বালগোপালরূপে দেখিবার ও নানাবিধ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভোজন করাইবার কথা আমরা ইতি-পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব তাঁহার ঐবিষয়ে ঠাকুরকে উৎসাহ প্রদান করা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-কুল-সম্ভূত ঠাকুরের বাল্যাবধি পূর্ব্বোক্ত ভাবসাধনসমূহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করাটা স্বাভাবিক। তৃতীয়, ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর অঞ্চলে ঐসকল সাধনানুষ্ঠান বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকায় উহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার তাঁহার আবাল্য বিশেষ সুযোগ ছিল। চতুর্থ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ, ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ প্রকৃতির মধুর, অদৃষ্টপূর্ব্ব সম্মিলন। উহার একের উদয়ে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক,

বিক্রমশালী, সর্ব্ববিষয়ের মূলকারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইতেন, এবং অন্তের প্রকাশে, ললনাজন-সুলভ অসামান্য কোমল-কঠোর স্বভাববিশিষ্ট হইয়া তিনি হৃদয়ের মধ্য দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও পরিমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, স্বভাবতঃ কতকগুলি বিষয়ে তীব্র অনুরাগসম্পন্ন ও অন্য কতকগুলিতে ঐরূপ বিরাগসম্পন্ন হইতেন এবং ভাবসংযুক্ত হইলে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিবার সামর্থ্য তাঁহাতে দেখা যাইলেও ইতরসাধারণের ন্যায় ভাববিহীন হইয়া কোন কার্য্য করিতে কখন সমর্থ হইতেন না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য, এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদামাদি ব্রজবালকগণের ন্যায় সখ্যভাবাবলম্বনে সাধন ও উপাসনায় স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া ঐ সকলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র গতপ্রাণ মহাবীর হনুমদনুষ্ঠিত দাস্যভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমদুঃখিনী সীতার দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা পাঠকের স্মরণ থাকিবে। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যগণনিষেবিত বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্বয় সাধনেই তিনি যে এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, একথা বেশ বুঝা যায়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এই কালের প্রথমেই তিনি আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখীরূপে ভাবনা করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎকালীন দেবীপূজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলস্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া ৺দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে অনেক সময়ে স্বয়ং যে পুংদেহবিশিষ্ট, একথা বিস্মৃত হইতেছেন। আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মসকাশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাঁহাতে সময়ে সময়ে ঐরূপ প্রকৃতি ভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহার এই কালের মত এত সুদীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান হইত না। ঐরূপ হইবার আবশ্যকতাও ছিল না। কারণ, স্ত্রী-পুং-প্রকৃতিগত

যাবতীয় ভাব এবং ভাবাতীত অদ্বৈতভাবমুখে ইচ্ছামত অবস্থান করা শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় তাঁহার তখন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সমীপাগত ব্যক্তিসকলের প্রত্যেকের কল্যাণসাধনের জন্যই তিনি ঐসকল ভাব বা ভাবাবস্থার যেটিতে যতক্ষণ ইচ্ছা অবস্থান করিতেছিলেন।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্ব্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন, জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যোত্থিত প্রবল বাত্যামুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ সমূহ পরিবর্ত্তনরাজি উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে সৎ-পথে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদয় হয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষ গুণসম্পন্ন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্ব্ব দৈবীশক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয় যথাযথ ভাবে বুঝাইয়া উহাদিগের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে সর্ব্বদা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিলেন। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুরও তাঁহারই ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্ব-সংস্কারবশে রূপরসাদি পার্থিব ভোগ্যবস্তুসকলের কোনটি লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকিলে তাঁহার ঐরূপ করা যে, সুকঠিন হইত একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আজীবন সর্ব্ব বিষয়ে ঠাকুরের আচরণ স্মরণ করিলেই আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'চাল কলা বাঁধা' বা অর্থোপার্জ্জনই প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য বুঝিয়া তিনি লেখা পড়া শিখিলেন না—সংসারযাত্রানির্ব্বাহে সাহায্য হইবে বলিয়া পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার অন্যোদ্দেশ্য বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কায়মনোবাক্যে কখনও স্ত্রীগ্রহণ করিলেন না—সঞ্চয়শীল ব্যক্তি কখনও ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভরবান্ হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন—ঐরূপ অনেক কথাই ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। ঐ সকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যায়, ইতরসাধারণ জীবের মোহকরী সংস্কারবন্ধনসকল তাঁহার মনে বাল্যাবধি কতদূর অসামান্য অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অথবা, উহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, ঠাকুরের ধারণাশক্তি এত অধিক প্রবল ছিল যে, তাহার সম্মুখে তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারসকল মস্তকোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে কখনও সমর্থ হইত না।

শুদ্ধ তাহাই নহে, আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা চিরকালের জন্য ধারণ করিয়া থাকিত। বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা, গান এবং যাত্রা প্রভৃতি একবার শ্রবণ করিবার পরেই ঠাকুর বয়স্যগণকে লইয়া কামারপুকুরের গোঠে ব্রজে ঐ সকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্যানুরাগ, শ্রুতিধরত্ব এবং সম্পূর্ণ ধারণারূপ সম্পত্তি পূর্ব্ব হইতে নিজস্ব করিয়াই ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণা প্রভৃতি আয়ত্ত করা ধর্ম্মপথের ইতরসাধারণ পথিকসকলের জীবনপাতী চেষ্টারও অসাধ্য হইয়া উঠে, ঠাকুর সেই গুণসকলকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধনরাজ্যে স্বল্প

কাল মধ্যে তাঁহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে। সাধনকালে বহুল কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়া অনেক সময়ে আমরা বিস্ময়ে যে, হতবুদ্ধি হইয়াছি, তাহার কারণ, ঠাকুরের অসামান্য মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। সাধনকালের প্রথমেই ঠাকুর বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় বিচারপূর্ব্বক 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে মৃত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন—অমনি তৎসহ ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক অভাব দূর করিবার এবং নানা ভোগ্যবস্তু সঞ্চয়পূর্ব্বক অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার সহায়ক হয় বলিয়া যে কাঞ্চনাসক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল! ইতর সাধারণে যে স্থানে গমনপূর্ব্বক স্নানাদি না করিয়া আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জ্জনা করিলেন—অমনি তাঁহার মন, জন্মগত জাত্যভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল- সে সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমূহাপেক্ষা কোন অংশে বড় নহে! জগদম্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণা করিয়া যখনি শুনিলেন, তিনিই—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—অমনি আর কখনও স্ত্রীজাতির কাহাকেও অন্য চক্ষে দেখিয়া তাঁহার সহিত দাম্পত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারিলেন না!—ঐ সকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, ঠাকুরের মনোগত ধারণাশক্তি পূর্ব্ব হইতে অসামান্য না থাকিলে তিনি কখনই ঐ সকল ফললাভ করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল কথা শুনিয়া আমাদের অনেকে যে, বিস্মিত হন, অথবা সহসা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহার কারণ—আমরা ঐ সময়ে আমাদিগের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, ঐরূপে মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ড সহস্রবার জলে বিসর্জ্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি

যাইবে না—সহস্রবার কদর্য্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের অভিমান ধৌত হয় না—জগজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ হইয়া থাকিবার কথা আজীবন শুনিয়া আমাদিগের রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের কদাচিৎ উদয় হইলেও কার্য্যকালে উহার একান্তাভাব বারম্বার দৃষ্টি করিয়া কাহারও ঐরূপ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া ভাবিয়া থাকি। আমরা একথা ভাবি না যে, আমাদিগের ধারণাশক্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কারে নিতান্ত নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের ঐরূপ বিপরীত প্রতীতি হইতেছে। সংযমরহিত, ধারণাশূন্য, পূর্ব্বসংস্কারপ্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি—ফলও সুতরাং তদ্রূপ হয়। তবে একথাও সত্য, ঠাকুরের ন্যায় ঐরূপ অপূর্ব্ব সংযম-ধারণাদি-শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি পাঁচ শত বৎসরেও এক আধটা আসে কিনা, সন্দেহ।

সে যাহা হউক, ঐরূপ সংযমপ্রবীণ, ধারণাকুশল, পূর্ব্বসংস্কার-নির্জীব মন লইয়া ঠাকুর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব অনুরাগ-ব্যাকুলতা-তাড়িত হইয়া ঐ মন গত আট বৎসর আহারনিদ্রাপরিশূন্য হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট ছিল। অতএব ঐকালের মধ্যে ঠাকুরের মন যে, কতদূর শক্তি-সম্পন্ন হইয়া কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের মত মনের কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব। বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুররসাশ্রিত ভাবসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে কিন্তু ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি-সম্পন্ন মনেরও অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক সময় লাগিয়াছিল। আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, মধুরভাবাবলম্বনে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করিতে বা উহাকে নিজ স্বাভাবিক সহজাবস্থায় পরিণত করিতে তাঁহার একাদিক্রমে ছয় মাস কাল লাগিয়াছিল।

ভগবান্ বুদ্ধ।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

[আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ডিট্রয়েট নামক স্থানে এক বক্তৃতার ভিতর স্বামীজি ভগবান্ বুদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।]

প্রত্যেক ধর্ম্মে আমরা এক এক প্রকার সাধনবিশেষের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্মে নিষ্কাম কর্ম্মের ভাবটাই খুব বিশেষ প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে গোল করিয়া ফেলিবেন না—এদেশে অনেকেই ঐরূপ গোল করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, উহা সনাতন ধর্ম্মের সহিত সংযোগহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম্ম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, উহা সনাতন ধর্ম্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত—তিনি তাৎকালিক অনবরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ, জাতিভেদের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি—স্থতরাং যাহারা এরূপ বংশে জন্মে নাই, তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বুদ্ধ জাতিভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি আবার পুরোহিতগণের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ছলে কৌশলে স্বার্থসিদ্ধির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, যাহাতে সকামভাবের লেশমাত্র ছিল না আর তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহিতেন না—ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিতেন—তিনি উত্তর দিতেন, ওসব বিষয়ে আমি কিছু জানি না। মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্যসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, সচ্চরিত্র হও ও অপরের কল্যাণ সাধন কর। একবার তাঁহার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে

বলিলেন। একজন বলিলেন, "ভগবন্, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়সম্বন্ধে এই এই কথা আছে।" অপরে বলিলেন, "না, না, ও কথা ভুল, কারণ, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন অন্য প্রকার বলিয়াছে।" এইরূপে অপরেও ঈশ্বরস্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায়সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বিভিন্ন অভিপ্রায়সমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে কি একথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী, হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র?"

ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলিলেন, "না, ভগবন্, সকল শাস্ত্রেই বলে, 'ঈশ্বর শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ।'" ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, "বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ ও সাধুস্বভাব হইবার চেষ্টা করুন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারেন।"

অবশ্য আমি তাঁহার সকল মতের সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে, কিন্তু মতভেদ আছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার ভাবের সৌন্দর্য্য দেখিব না, ইহার কি কোন অর্থ আছে? জগতের আচার্য্য-গণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্য্যের কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই আপনাদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, আমা-দিগকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের সহিতও কি বলিয়াছিলেন?—তিনি বলিয়া-ছিলেন, "কেহই তোমাকে মুক্ত হইবার সাহায্য করিতে পারে না—আপনার সাহায্য আপনি কর—নিজ চেষ্টা দ্বারা নিজ মুক্তি সাধনের চেষ্টা কর।" নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "বুদ্ধ শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি, গৌতম, সেই অবস্থা লাভ

করিয়াছি—তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে।” তিনি সর্ব্ববিধ কামনা ও অভিসন্ধি বিবর্জ্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বর্গে গমনের বা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি রাজসিংহাসনের আশা ও সর্ব্ববিধ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা উদরপূরণ করিতেন এবং সমুদ্রবৎ প্রশস্ত হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ যাহাতে হয়, তাহাই প্রচার করিতেন। জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণোদ্দেশে পশুগণের পরিবর্ত্তে নিজ জীবন বিসর্জ্জনে সতত প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক রাজাকে বলিয়াছিলেন, “যদি যজ্ঞে মেষ হত্যা করিলে আপনার স্বর্গ গমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে ত আরও অধিক উপকার হইবে—অতএব যজ্ঞস্থলে আমায় বধ করুন।” রাজা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অথচ এ ব্যক্তি সর্ব্ববিধ অভিসন্ধিবর্জ্জিত ছিলেন। তিনি কর্ম্মযোগীর আদর্শস্বরূপ ছিলেন, আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ম্মবলে আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোনরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, যদি সে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতে গমন না করে, এমন কি, প্রকাশ্যতঃ নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা লাভে সক্ষম। তাঁহার মতামত বা কার্য্যকলাপ বিচার করিবার আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব্ব হৃদয়বত্তার লক্ষাংশের একাংশেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতাম। হইতে পারে, বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হইতে পারে, বিশ্বাস করিতেন না—তাহাতে আমার কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু অপরে

ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কেবল এতে ওতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্ম্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখীকেও যাহা শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই আবৃত্তি করিতে পারে। কিন্তু কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই তাহার বলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীকদর্শন।

প্লেটো।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীকানাই লাল পাল এম, এ।

সক্রেটীসের অমানুষিক আত্মবিসর্জ্জনে প্লেটোর জীবনে আর একটী পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যে গুরু সত্যের জন্য অকাতরে নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম, সেই গুরুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি যে শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আদর্শ দার্শনিক, সত্যকে কখনও বর্জ্জন করে না—সত্যকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা সে নিজ জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে; সত্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, অবিচলিত ভক্তি ও প্রাণপণ অনুরাগই দার্শনিক জীবনের একমাত্র পরিচয়। গুরুর আত্মত্যাগে আদর্শ দার্শনিকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন, অধঃপতিত দেশের মূর্খ জনসাধারণের উপর প্রতিপত্তিলাভপূর্ব্বক দেশসংস্কারের চেষ্টা দ্বারা দেশের কোন কল্যাণ

করা একরূপ অসম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাষ্ট্রব্যাপার হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া তিনি নিজে আদর্শ দার্শনিকের জীবন লাভে যত্নবান্ হইলেন।

জেলার (Zeller) বলেন যে, এই সময়ে সক্রেটীসের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্লেটো নিজ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, কারণ, গুরুর নিকট শিক্ষালাভের পর ভিন্ন ভিন্ন দেশপর্য্যটনে তাঁহার প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত্তির অবসর হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা সেই পর্য্যটনের কথা বলিব। সক্রেটীসের মৃত্যুর পর তিনি কয়েকটী গুরুভ্রাতাসমভিব্যাহারে মেগারায় উপস্থিত হন। সেখানে ইউক্লিডস্ একটী শাখা সম্প্রদায় স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি তথায় তাঁহার নিকট তাঁহার দার্শনিক মত পরিজ্ঞাত হন। পরে মেগারা হইতে তিনি মিসর (Egypt), সিরিনী (Cyreni), গ্রীস (Magna Græcea) ইটালী (Italy) ও সিসিলী (Sicily)তে গমন করেন। এই সকল স্থানে ভ্রমণবৃত্তান্তের কথা প্রায় সকল ঐতিহাসিকই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ স্থলে তাঁহার ভ্রমণ-সম্বন্ধে অল্প বিস্তর প্রমাণও পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে তিনি এতদ্ভিন্ন ব্যাবিলোনিয়া (Babylonia), এসিরিয়া (Assyria), এসিয়া মাইনর (Asia Minor) প্রভৃতি স্থানেও গমন করিয়াছিলেন এবং পারসীকদিগের নিকট জোরোয়াষ্ট্রীয়ান (Zoroastrian) মত জ্ঞাত হন ও ম্যাগি (Magi) নামধেয় পারসীকদিগের প্রাচীন পুরোহিত বা জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিতও আলাপ পরিচয় করেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন—কোন কোন ঐতিহাসিক একথারও উল্লেখ করেন।

প্লেটোর ভ্রমণবৃত্তান্তের ধারাবাহিক কাহিনী প্রদান করা দুঃসাধ্য। কারণ, তিনি কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে গিয়াছিলেন, কতদিন বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ কোন প্রমাণ নাই এবং সকল ঐতিহাসিকও ঐ বিষয়ে একমত নহেন।

তিনি মেগারা হইতে সিরিনী ইজিপ্ট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করেন অথবা মধ্যে একবার এথেন্সে প্রত্যাগমন করিয়া পরে ঐ সকল স্থান পর্য্যটনে বহির্গত হন, এ বিষয়েও ঐতিহাসিকগণমধ্যে মতানৈক্য

বর্ত্তমান। তবে অনেকেই বলেন যে, তিনি মধ্যে একবার এথেন্সে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কয়েকটী যুক্তি প্রদানও করেন। সে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিচার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক, সুতরাং আমরা ঐ বিচারে নিরস্ত হইয়া বহু ঐতিহাসিকের অনুমোদিত মেগারা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার এথেন্স আগমন সিদ্ধান্তটীই স্বীকার করিয়া লইলাম. এথেন্সে প্রত্যাগমন করতঃ কতদিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাও সঠিক জানা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, এথেন্সে এই সময় কিছুকাল তিনি শিক্ষাদান ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার কোন্ পুস্তক কোন্ সময়ে রচিত, কোন্ পুস্তকে কোন্ দেশের বা কোন্ দেশীয় দর্শনের বা দার্শনিকের প্রভাব বর্ত্তমান, এই সকল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐতিহাসিকগণ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের সঠিক বিবরণ সংগ্রহে চেষ্টিত হইয়াছেন, কিন্তু সেই উপায় অবলম্বনেও সকল ঐতিহাসিক এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। যাক্, বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সকল গবেষণা অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

শুনা যায়, সিরিনী (Cyrene) দেশে থিওডোরাসের (Theodorus) নিকট প্লেটো অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করেন। কথিত আছে, ইঁহার সহিত প্লেটোর পূর্ব্ব হইতেই আলাপ পরিচয় ছিল। মিসর দেশে (Egypt) যাইয়া তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও তদ্দেশবাসীর প্রাচীন ধর্ম্মনীতি সমাজনীতিসম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করেন। ইটালীতে যাইয়া তিনি পিথাগোরীয়ানদিগের নিকট পিথাগুরুর দার্শনিক মত পরিজ্ঞাত হন ও তাঁহাদের সহিত অঙ্কশাস্ত্র অনুশীলনে বিশেষ যত্নবান্ হন; থিওডোরাসের নিকট এই শিক্ষার সূচনা হয় বটে কিন্তু পিথাগুরুর মতাবলম্বীদের সহিত আলোচনায় এই শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। পিথাগোরাস গণিত শাস্ত্রের কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, তাহা পশ্চাল্লিখিত প্রবাদবাক্য হইতেই অনুমিত হয়। কথিত আছে যে, তাঁহার একাডেমি বিদ্যালয়ের দ্বারদেশে এই কথা খোদিত ছিল—"গণিতশাস্ত্রবিৎ ব্যতীত কেহ যেন ইহার ভিতর প্রবেশ না করে।" এই শাস্ত্রে

তাঁহার কিরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি Analytic conic sectionএর আবিষ্কারক। ডেল্‌ফির (Delphi) বেদীর আয়তন কিরূপে দ্বিগুণ করিতে হইবে, এ প্রশ্নের তিনিই মীমাংসা করিয়াছিলেন অথবা মীমাংসার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই সকল প্রচলিত কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রাহ্য না হইলেও ইহাতে যে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় দেয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মনে করিতেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ হইতে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এই শাস্ত্রজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন ও এই শাস্ত্রসম্মত প্রণালীই প্রকৃষ্ট উপায়। দার্শনিক পাঠক একথার গূঢ়ার্থ বোধ করি বুঝিতে অক্ষম হইবেন না।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশভ্রমণব্যাপার তাঁহার দর্শনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেটী গবেষণার বিষয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ইটালী ও সিসিলী দেশে গমনের পূর্ব্বে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন এ বিষয় নিঃসন্দেহ যে, ঐ দুই দেশে ভ্রমণের ফল তাঁহার মতামতের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তখন ঐ সকল ঐতিহাসিকের কথা স্বীকার করা সুকঠিন। ফলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ পর্য্যটনের ফল বেশ পরিস্ফুট।

ইটালীতে পিথাগুরুমতাবলম্বীদের সহিত কিছুদিন অঙ্কশাস্ত্র অনুশীলনে অতিবাহিত করার পর প্লেটো সিসিলিতে গমন করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আগ্নেয়গিরি দেখিতে তথায় উপস্থিত হন। কাহারও মতে আবার দৈববলে তিনি তথায় উপনীত হইয়াছিলেন! কাহারও বা মতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি তথায় গমন করেন। আমরা দেখিয়াছি, "দেশের কল্যাণ" প্লেটোর অন্যতম প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। তিনি স্বদেশে প্রতিপত্তি লাভ করতঃ দেশ সংস্কার করা একপ্রকার অসম্ভব মনে করিয়া রাষ্ট্রব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে সঙ্কল্প করেন বটে, তথাপি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন

না। তখন সিসিলির নরপতি জ্যেষ্ঠ ডায়োনিসাস (Dionysus the elder) প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছিলেন। প্লেটো ভাবিলেন, এরূপ নৃপতিকে স্বমতে দীক্ষিত করিতে পারিলে তাঁহার দ্বারা সমগ্র দেশের বহুতর কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই নাকি তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিসিলিতে গমনের পর ডাইয়োনিসাসের শ্যালক ডাইওনকে (Dion) তিনি স্বমতে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহারই সহায়তায় ডাইয়োনিসাসকে (Dionysus) স্বমতে আনয়ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু প্রবীণ নৃপতি প্লেটোর কঠোর নীতিকথা ও স্পষ্ট বাক্যে এতদূর অসন্তুষ্ট হন যে, অবশেষে প্লেটোকে তিনি স্পার্টান দূত পলিসের (Polis) করে সমর্পণ করেন। পলিস তাঁহাকে ইজিনা দ্বীপে দাসরূপে বিক্রয় করেন। শুনা যায়, সিরিনী দেশবাসী এনিসিরিস (Anniceres) তাঁহাকে উদ্ধার করিলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। ডাইয়োনিসাসের অসন্তোষের ফলে প্লেটোর কি দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, এ বিষয়ে নানা ঐতিহাসিক নানা কথার উল্লেখ করেন। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, পরে ডাইওনের অনুরোধে সে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হয়—তখন নৃপতি প্লেটোকে পলিসের করে সমর্পণ করেন। আবার শুনা যায়, নৃপতির হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ইজিনা দ্বীপে তাঁহার আবার জীবন নাশের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তখন এনিসিরিস উপযুক্ত অর্থ প্রদানে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। কথিত আছে, ডাইওন ও প্লেটোর বন্ধুগণ এনিসিরিসকে প্লেটোর জীবনমূল্য প্রদান করিতে প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি সে অর্থ গ্রহণ না করায় সেই অর্থে একাডেমি (Academy) বিদ্যালয়ের বাগানবাটী ক্রয় করা হয়।

সিসিলি হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি স্বদেশে শিক্ষকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। গুরুর পদানুসরণ পূর্ব্বক তিনিও যুবকদিগের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু ধনিগৃহে উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করাতে সক্রেটীসের মত ধনী নির্ধন অজ্ঞ প্রাজ্ঞ সাধু অসাধু সকলের সহিত মিশিতে পারিতেন না। গুরুর উদার উচ্চ হৃদয় সকলেরই নিকট

উন্মুক্ত ছিল। প্লেটোর সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা বলা চলে না। কারণ, দেখিতে পাই, তাঁহার বিদ্যালয়ে ধীসম্পন্ন ধনী যুবকের সংখ্যাই অধিক।

কথিত আছে, প্রথমে ব্যায়ামাগারে (Gymnasium)* তিনি যুবকদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। পরে পাশ্চাত্য দার্শনিকের চির-গৌরবের অতীত স্মৃতিজড়িত একাডেমি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনেকেই বলেন, সিসিলি হইতে প্রথম প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; কেহ কেহ আবার সিসিলি হইতে তাঁহার শেষ প্রত্যা-বর্ত্তনের পর উক্ত বিদ্যালয়ের স্থাপনকাল নির্দ্দেশ করেন।

কিরূপ প্রণালী অবলম্বনে তিনি শিক্ষা প্রদান করিতেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ মধ্যে একটু মতানৈক্য বর্ত্তমান। কথিত আছে, তিনি বাক্‌সর্ব্বস্ব প্রচারক বা অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ বক্তাদিগের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের ধারাবাহিক প্রসঙ্গে বক্তৃতা প্রদান তিনি মোটেই অনুমোদন করিতেন না। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষাদানকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে, এ কথাও তিনি অযৌক্তিক মনে করিতেন। বাদানুবাদ বা কথোপকথন প্রসঙ্গ ক্রমে তত্ত্বানুশীলনে যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয়, অন্য কোন উপায়ে সেটী সম্ভব নয়, গুরুর সহবাসে তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। সুতরাং শিক্ষাদান ব্যাপারে তিনি গুরুরই পদানু-সরণ করিতেন, একথা অনুমান করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। কিন্তু আবশ্যক বোধে শিষ্যগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি কয়েকখানি পুস্তকে স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, একথাও অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। আরও শুনা যায় যে, "কল্যাণ" (The Good) সম্বন্ধে তিনি একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানও করিয়া-ছিলেন। কথোপকথনচ্ছলে এরূপ আলোচনা সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়া

* Gymnasium :—প্রাচীন গ্রীকদিগের 'জিম্‌ন্যাসিয়ম'কে ঠিক কুস্তির আখড়া বলা যায় না। কোন সুবৃহৎ স্থান বা বাটীতে ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত এবং তথায় ব্যায়ামের স্থান ব্যতীত স্নানাগার এবং কথোপকথনের জন্য বৃহৎ হল থাকিত।

সুবিধাজনক বলিয়া বোধ না হওয়াই বোধ হয় তাঁহার ঐ উপায় অবলম্বনের অন্যতম কারণ। আরও এক কথা—ঐতিহাসিকগণ অনেকেই বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিয়াছেন, কয়েকখানি পুস্তকে তিনি ধারাবাহিক কাহিনী অবলম্বনে স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক মোটামুটী নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে—বাদানুবাদ বা কথোপকথনচ্ছলে তত্ত্বালোচনাই তাঁহার সাধারণ নিয়ম ছিল, তবে প্রয়োজনানুসারে কখনও কখনও ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিতেন বা স্বীয় মতামত পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতেন। প্লেটোর এই শিক্ষাদানপ্রণালীর সহিত প্রাচীন হিন্দুর গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে শিক্ষাদানপ্রণালীর সাদৃশ্য কি এই স্থলে পরিলক্ষিত হয় না ?

সক্রেটীস জনসাধারণের সহিত কেবল যে জ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা নয়—তাহাদেব সহিত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদেও যোগদান করিতেন এবং সেই উপায়ে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে চেষ্টা করিতেন। বর্ত্তমান সমাজে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ কতকটা অর্থের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের কোন অবসরই নাই, আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন কি অনেক সময় দেখা যায়, গুরু শিষ্যকে আদৌ চিনেনই না। কি শোচনীয় পরিণাম! যাক্ অধঃপতিত বর্ত্তমান সমাজের কথা। প্রাচীনকালে তথাকথিত সভ্যতা এতদূর অগ্রসর হয় নাই—তাই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ একটী হৃদয়ের জিনিষ ছিল। প্লেটোও এ বিষয়ে গুরুর পদানুসরণ করিতেন —শিষ্যগণের সহিত সামাজিক উৎসবে, আহার বিহারে, আমোদ প্রমোদে তিনিও মধ্যে মধ্যে যোগদান করিতেন। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ শুধু অর্থের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইলে সে সম্বন্ধের কোন মর্য্যাদা থাকে না। তাই সক্রেটীসের ন্যায় প্লেটোও বিত্ত গ্রহণ না করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষাদান করিতেন। তবে শুনা যায়, কোন কোন শিষ্য শ্রদ্ধাবশতঃ বা ভক্তিপূর্ব্বক কখন কখন কোন কোন উপহার প্রদান করিতেন। এরূপ উপহার গ্রহণ করিতেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার বিদ্যালয়ে শিষ্যদিগের

বিত্ত প্রদানের কোন নিয়ম ছিল না, তখন এইরূপ উপহার গ্রহণ আমরা ত বিশেষ দোষের বিষয় মনে করি না।

যাহা হউক উক্ত উপায়ে এথেন্সে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি বেশ শান্তিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে দেশের কল্যাণ কামনায় আবার রাষ্ট্রব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। সক্রেটীসের অমানুষিক আত্মত্যাগের পর হইতেই তিনি রাষ্ট্রব্যাপার হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার সঙ্কল্প করেন বটে কিন্তু দেশ সংস্কারের উপযুক্ত সময় বা সুযোগ উপস্থিত হইলে বা তাহার সম্ভাবনা থাকিলে তিনি একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। তাই সিসিলিতে গিয়া ডাইয়োনিসাসের সাহায্যে সে উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পান। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার উৎসাহ অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। তখন সক্রেটীসের পন্থা অনুসরণ করতঃ তিনি রাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি, (যথা- Politics বা রাজনীতি), প্রকাশ করিয়া দেশের সংস্কার কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার উৎসাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই। তাই দেখি, জ্যেষ্ঠ ডাইয়োনিসাসের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ডাইয়োনিসাস সিরাকিউজে অধিনায়ক হইলে তিনি পুনরায় সিসিলিতে গমন করেন। শুনা যায়, নবীন নৃপতি ও ডাইওন উভয়েই তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তবে অনুমান হয়, সম্ভবতঃ প্লেটো-শিষ্য ডাইওনের প্ররোচনায়ই ডাইয়োনিসাস তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কারণ, নবীন নৃপতি তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনাসহ আহ্বান করিলেন ও কিছু দিন আগ্রহ সহকারে তাঁহার জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিলেন বটে—কিন্তু শীঘ্রই সেই সকল কঠোর নীতি-বাক্য ও জ্ঞানচর্চ্চা তাঁহার পক্ষে বিষম হইয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার উপায় ও সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ডাইওনের সহিত নৃপতির মনান্তর হওয়ায় সুযোগের আর অভাব রহিল না। ফলে প্লেটো স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

কথিত আছে, ডাইওন ও ডাইওনিসাসের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য তিনি পুনরায় সিসিলিতে যাত্রা করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও এই সময় তাঁহার মনে ক্ষীণ রেখায় উদিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও তাঁহাকে অকৃতকার্য্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়। শুনা যায়, ডাইয়োনিসাস তাঁহার উপর এতই বিরক্ত হন যে, পিথাগুরুর শিষ্যগণের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি স্বদেশে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর ডাইওন ও ডাইয়োনিসাসের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং বিশ্বাসঘাতক ক্যালিপ্পাস (Callyppus) কর্ত্তৃক ডাইওন নিহত হন। কয়েকজন প্লেটো-শিষ্য ডাইওনের পক্ষাবলম্বী থাকায় প্লেটোকেও উক্ত দ্বন্দ্বব্যাপারে কোন কোন ঐতিহাসিক জড়িত করিয়াছেন।

তৃতীয়বার সিসিলি হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তিনি রাষ্ট্র-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবন অধ্যাপনায় ও পুস্তক রচনায় অতিবাহিত করেন। এইরূপে স্বদেশে বিদেশে সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ পূর্ব্বক জীবনের শেষ ভাগ জ্ঞানচর্চ্চায় ও তত্ত্বানুশীলনে অতিবাহিত করিয়া এক বিবাহ উৎসবে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর সময় সঠিক জানা নাই—একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকের মতে তিনি ৮১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৩৪৮ খৃঃ পূঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

অনেক মহৎ লোকের জীবনচরিত আলোচনায় দেখা যায় যে, আলোর সহিত ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের নানা মহৎ গুণের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সত্য বা মিথ্যা অপবাদ মিশ্রিত থাকে। আমাদের আলোচ্য মহাত্মাও এ বিষয়ে অব্যাহতি পান নাই। আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণের এই আদি দার্শনিক গুরু সম্বন্ধে ও সকল কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি, তবে যখন কোন কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনকালেও কয়েকটী অপবাদ প্রচলিত ছিল বলিয়া শুনা যায়, তখন আমরা উহাদের উল্লেখ মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইব। তবে যদি তাঁহার কোন দোষ বাস্তবিক প্রমাণিতও হয়, তথাপি

তাহাতে তাঁহার দর্শনের গৌরবহানি করিবে না। তাঁহার প্রতি আরোপিত দোষগুলি এই:—সমালোচক ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি বড় আত্মাভিমানী ও দাম্ভিক পুরুষ ছিলেন এবং কয়েক জন সক্রেটীস্‌শিষ্যের প্রতি (যথা—এরিষ্টিপ্পাস ও এণ্টিস্থিনিস) তিনি বিরূপ আচরণ করিতেন, সুখাভিলাষ ও ভোগ-স্পৃহা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল—একারণ, সিরাকিউজে ডাইয়োনিসাসের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন। কেহ কেহ একথা পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, তিনি অপরের লিখিত বিষয় নিজ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বনামে প্রচার করিতেন। অবশ্য এ সকল কথার নিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। অপর দিকে তাঁহার দর্শনসাহায্যে তাঁহাকে বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি স্বতঃই উদয় হয় এবং এই সকল অপবাদে আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিলে এই বিষয় স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, তিনি দার্শনিকেরই উপযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রব্যাপারের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত ছিলেন। সক্রেটীসের শিক্ষা ও সহবাস তাঁহার জীবনে ও দর্শনে যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও তাঁহার জীবনচরিত আলোচনায় বেশ বুঝা যায়। সক্রেটীসের মত গুরুলাভ না হইলে প্লেটো এতদূর মহত্বলাভ করিতে সমর্থ হইতেন কিনা কে জানে। তবে যদিও প্লেটো দার্শনিকগুরু বলিয়া পূজিত, কিন্তু সক্রেটীসের মত উদার হৃদয় বা উন্মুক্ত ভাব তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। অভাব কাহাকে বলে, সক্রেটীস তাহা জানিতেন না—প্লেটো এ অবস্থা লাভ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তিনি যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কয়জন দার্শনিক আজি পর্য্যন্ত তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন?

উপসংহারে আমরা আর একটী কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত শেষ করিব। দর্শন আলোচনায় তিনি কূট বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানবাদকে (Idealism) সুপ্রতিষ্ঠিত

করিতে প্রয়াসী থাকিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলেও ভাবপ্রকাশের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে কখনও অমনোযোগী ছিলেন না। অপর দিকে—মানুবজীবনে কঠোর নীতিপ্রণালী অবলম্বনে আত্মসংযমে সতত চেষ্টিত থাকিলেও সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগেও সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। তিনি সক্রেটীসের ন্যায় আপামর সাধারণের সহিত মিশিতে পারিতেন না বটে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার হৃদয় সঙ্কীর্ণ ছিল না। প্রথম জীবনের রাজভোগ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবেন কিরূপে? কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাব মহত্ত্ব কোন দিন খর্ব্ব হইবে না। পাশ্চাত্য জগতে তিনি আদি দার্শনিক গুরু বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন ও চিরদিন পূজিত হইতে থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

ভক্ত গিরিশচন্দ্র।

(৩)

(শ্রী শ্রীশচন্দ্র মতিলাল।)

[স্বামী শ্রীসারদানন্দ কর্ত্তৃক সম্যক্ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।]

"এই কয়েকদিন দর্শনলাভে, আমার মনে মনে উদয় হইল, এ ব্যক্তি কে? আমার সম্পূর্ণ পরিচয় কি ইনি পান নাই? বোধ হয়। নচেৎ এরূপ আপনার ভাবিয়া কথাবার্ত্তা কেন কন্? কথায় মনে হয়, পরম আত্মীয়! ইনি কে? আমার মনে সাহস জন্মিয়াছে যে, ইনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানেন না। আমি ইঁহাকে আত্মপরিচয় দিলে, ইনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না, বরং আত্মপরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ইঁহার চরণে আশ্রয় লইব, ইনি শান্তিদাতা নিশ্চয়।

"দক্ষিণেশ্বর গেলাম। প্রভু বসিয়া আছেন, ভবনাথ নামে একজন

শিষ্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; আমি গিয়া প্রণাম করিবামাত্র যেন কে পরমাত্মীয় গিয়াছি, তিনি বলিলেন—'এই তোমার কথা আমি বলিতেছিলাম, সত্যি, জিজ্ঞাসা করো।' পরে একটি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; আমি যেমন বাপের কাছে আবদার করে, সেইরূপ আবদার করিয়া বলিলাম, 'আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, আপনি আমার কিছু করিয়া দেন।' এ কথায় বোধ হইল যেন তিনি পরম সন্তুষ্ট হইলেন, ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাসি দেখিয়া আমার মনে হইল, আমার মনে আর মলা নাই, আমি নির্ম্মল হইয়াছি।"

(উদ্বোধন—"পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ।")

অনন্তর দৃঢ় বিশ্বাসেই ঈশ্বরদর্শন হয়—বিশ্বাস করিলেই সব হইবে—শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশকে এই কথা বলিয়া সমীপস্থ এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কিরে, কি শ্লোকটা? বল্‌তো।' সে ব্যক্তি শ্লোক আবৃত্তি করিল, শ্লোকের ভাব—পর্ব্বতগহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই একমাত্র সার পদার্থ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি-পূর্ণ বাক্যে গিরিশের মনের সংশয় দূর হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—তবে আর কি, বিশ্বাসেই যদি সব পাওয়া যায়, তবে আজ হইতে আর কখনও অবিশ্বাস করিব না, মরিলেও না; ইঁহার কথাতেই প্রাণে এই অপূর্ব্ব বল পাইতেছি—অতএব, ইনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, সেইরূপেই চলিব। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিলেন এবং অন্তরে অপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় বিশ্বাস স্থাপনের পর তাঁহাকে আর কি করিতে হইবে জানিতে উৎসুক হইয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "এখন থেকে আমি কি কর্‌বো?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, (আপনাকে দেখাইয়া) "এখানে বিশ্বাস রাখ্‌লেই সব হবে—বিশ্বাস কর। আর, যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক্ (ঈশ্বর) ওদিক্ (সংসার) দুদিক্ রেখে চল, তার পর যখন একদিক্ ভাঙ্গবে, তখন যা হয় হবে। তবে সকালে বিকালে তাঁর স্মরণ মনন করাটা রেখো।"

তখন, গুরু-আজ্ঞা তিলমাত্র উল্লঙ্ঘনে সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিয়া গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষোক্ত আদেশে আপত্তি উঠাইয়া বলিলেন, "তা যদি করিতে না পারি, মহাশয় ?"

পরমহংসদেব গিরিশের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তা যদি না পার ত নিত্য খাবার শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ করে নিও।"

গিরিশচন্দ্র নীরবে ভাবিতে লাগিলেন, যেরূপ ভাবে সংসারে তাঁহাকে কাল কাটাইতে হয়, তাহাতে শ্রীগুরুর ঐকথা রক্ষা করিতে বিস্মৃত হওয়াও অসম্ভব নহে। গিরিশের মনে ঐকথার উদয়মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে যেন উহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিবার জন্য বলিলেন,—"তুই ব'ল্‌বি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে" অর্থাৎ, "তোর জন্য যা কিছু করা দরকার তা করিতে আমাকে ভার দে!" গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার করুণায় স্তম্ভিত হইয়া অকপটে তাহাই করিলেন এবং বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নানা ভাবের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে এককালে আত্মহারা হইয়া আপনাকে কোন এক দিব্যালোকে সহসা স্থানান্তরিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুর কৃপালাভে গিরিশচন্দ্র এখন হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্য এক ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সর্ব্বতোভাবে নিজ ভারার্পণ করিয়া গিরিশচন্দ্রের জীবনে কি ভাবে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনসমূহ নিত্য উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দ তাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথমাধ্যায়ে সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন,—অতএব তদ্বিষয়ে আমাদের অন্য কিছু বলিবার আর আবশ্যক নাই। আমরা এখানে তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া পাঠককে কেবল ইহাই বলিতে চাহি যে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে জড়িত হইয়া এবং উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বহুকাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিরিশচন্দ্র যদি ইতিপূর্ব্বে আপনার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিতেন, তবে কখনই এখন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐরূপ অকপটে আত্মনিবেদন করিতে পারিতেন না। 'বকল্‌মা' দিতে ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উহা বলিবামাত্র প্রদান করিয়া শান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশকে দেখিয়া ও তাঁহার অন্তরের ঐরূপ অবস্থার কথা বুঝিয়াই যে, তাঁহাকে ঐরূপ করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, গিরিশচন্দ্রের সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের নিকটে আমরা একথা শুনিয়াছি যে, ঐরূপ সুস্পষ্টভাবে বকল্‌মা দিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্র ভিন্ন অপর কাহাকেও বলিয়াছেন কি না সন্দেহ।

ধর্ম্মজগতে কেবলমাত্র অবতার মহাপুরুষেরাই যে জীবের সম্পূর্ণ ভার ঐরূপে গ্রহণ করেন, গিরিশের মনে এখন সেই কথার উদয় হইয়া তিনি অতঃপর স্তম্ভিতহৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনি কে?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে প্রশ্নের উত্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমায় কেউ কেউ বলে, আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে, রাজা রামকৃষ্ণ; আমি এইখানেই থাকি।" অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আমি আপনার দর্শন ও কৃপালাভ করিলাম, আবার কি আমাকে ইতি-পূর্ব্বে থিয়েটারাদি যাহা করিয়া আসিতেছি, তাহাই করিতে হইবে?" ঠাকুর বলিলেন, "তাহা করিলেই বা তাহাতে কি?" গিরিশ নিশ্চিন্ত হইলেন এবং পিতা হস্ত ধরিয়া থাকিলে বালক যেমন নিঃশঙ্ক পদবিক্ষেপে বিচরণ করে, তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পাইয়া তদ্রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে ফিরিলেন। গিরিশের মনে দৃঢ়ধারণা হইল, তাঁহার পা অতঃ-পর আর কখনও বেতালে পড়িবে না। ফলেও বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল! লোকের কাছে উহা প্রকাশ না করিলেও গিরিশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে নিজ শক্তি ও পুরুষার্থের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করাতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৈবীশক্তি ও অপার করুণার মহিমা এখন সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়াই তাঁহার প্রাণে প্রশ্ন উঠিয়াছিল —এ অলৌকিক পুরুষ কে, যিনি শিষ্যের ইহকাল ও পরকালের দায়িত্ব

ঐরূপ সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্কোচে আপন স্কন্ধে লইতে পারেন? পরে যত দিন যাইতে লাগিল এবং গিরিশ শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর ভাবমুখে অবস্থিত হইয়া নিজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ হইয়াছিল, সেই ইদানীং এই খোলটার (শরীরটার) ভিতরে; তবে, প্রজাদের অবস্থার স্বরূপ পরিচয় পাইবার নিমিত্ত রাজা যেমন সময়ে সময়ে ছদ্ম-বেশে তাহাদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন—এবার সেইরূপে আসা!"—তখন তাঁহার প্রাণে উল্লাসের আর অবধি রহিল না। গিরিশের নিশ্চিত ধারণা হইল, তাঁহার উদ্ধারের জন্য সত্যই শ্রীভগবান্ নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন—তিনি মুক্ত—চিরমুক্ত। আবার ঠাকুরের নিজমুখ হইতে যে দিন শ্রবণ করিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের লীলাপুষ্টির জন্য, কৈকেয়ীর—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের লীলাপুষ্টির জন্য, জটিলা ও কুটিলার এবং শ্রীগৌর-চন্দ্রের লীলাপুষ্টির জন্য, জগাই ও মাধাই নামক দুই ভ্রাতার আগমন হইয়াছিল,—যুগে যুগে ঐরূপ হইয়া থাকে এবং সংসারের চক্ষে তাহা-দের দুষ্কৃতের অবধি না থাকিলেও তাহারা শ্রীভগবানের অহেতুক কৃপা প্রদর্শনের নিদর্শন স্থলস্বরূপ হইয়া তাঁহার লীলাসহচরগণের মধ্যে পরি-গণিত হয়—তখন গিরিশও স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, "আমিও তবে তাহাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপুষ্টির জন্যই তবে আমার পূর্ব্ব-জীবনে দুষ্কৃতানুষ্ঠান, আমিও শ্রীভগবানের লীলাসহচর!—হে ভগবান্, তোমার সহিত তবে আমার নিত্য সম্বন্ধ!—তবে অনন্তগুণে দুষ্কৃত-কারী বলিয়া পরিচিত হইতে হইলেও আর আমার কষ্ট নাই! হে কৃপাসিন্ধু, তোমার চিরদাসকে তুমি যে সাজে যতবার ইচ্ছা সংসারে আনিতে চাহ, আনিও, তোমার চিরপদাশ্রিত—এই জ্ঞানটুকু কেবল আমায় ভুলাইয়া দিও না!"

সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ ধারণা গিরিশের জীবনে প্রতি কার্য্যকলাপে এখন হইতে কি আমূল পরিবর্ত্তন যে উপস্থিত করিয়া-ছিল, তাহা অন্যকে বুঝান সুকঠিন। কি অসীম উল্লাস, অপূর্ব্ব সাহস, নিশ্চিন্ত ভাব এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান যে, ঐ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহা কেবল মাত্র

তিনিই বুঝিবেন, যিনি অকপটে ঐরূপ বিশ্বাস জীবনে কখন করিয়াছেন। 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিশ উহা এইরূপে বলিয়াছেন—"এই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়, শয়নে স্বপনেও এই ভাব, পরম সাহস, পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই, মহাভয় মৃত্যুভয়—তাহাও দূর হইয়াছে!"—অতএব শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পাইয়া গিরিশচন্দ্রের এখনকার অবস্থা কল্পনায় অনুভব করিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

অন্যপক্ষে আবার, গিরিশের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না! গিরিশ যে বলিতেন, 'আমার উদ্ধারের জন্য আমার অপেক্ষা ঠাকুরের মাথা ব্যথা অধিক'—সে কথাই, উহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়! বাধা বা নিষেধ পাইলেই গিরিশের মন যে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথা প্রথম হইতেই ধরিয়া কেবলমাত্র ভালবাসার বন্ধনে গিরিশকে বাঁধিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "এখানে (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর) বিশ্বাস ঠিক রাখিয়া সংসারের যে কোন বস্তু উপভোগ করিতে তোর ইচ্ছা হয়, তাহাই ভোগ কর্‌গে যা! যাহা ইচ্ছা তাহা ভোগ কর্‌বি কিন্তু কখন একথা ভাব্‌বি না যে, ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহায়তার অঙ্গ বলিয়া কোন বস্তু ভোগ করিতেছিস্।" গিরিশকে তাহাতে 'এটা করা উচিত, ওটা করিতে নাই' এসকল কথায় মন দিয়া নিজ বিপরীতগামী ইচ্ছার সহিত নিত্য দ্বন্দ্ব করিয়া কালক্ষেপ করিতে হইল না, তিনি নিশ্চিন্তমনে যাহাতে সকল বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন, সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন এবং উহার ফলে শীঘ্রই একনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

বহুপূর্ব্ব হইতে গিরিশের পানাসক্তি জন্মিয়াছিল। আবার আজীবন উহা তাঁহাকে কখন কুক্রিয়ানিরত না করিয়া সর্ব্বদা উচ্চ কবিত্ব চিন্তার প্রেরণা দিত বলিয়া ধর্ম্মপথে আসিয়াও গিরিশ উহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা কখন অনুভব করেন নাই। লোকনিন্দা—গিরিশ ভাবিতেন, উহা ত আমার একরূপ অঙ্গের আভরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর,

ঠাকুর ত তাঁহাকে উহা নিষেধ করেন নাই, তবে আর কাহার কথা তিনি গ্রাহ্য করিবেন? বাস্তবিক, ঠাকুরও তাঁহাকে কখন উহার বিরুদ্ধে বলেন নাই। বরং ঐ আসক্তির জন্য যখন অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া গিরিশের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইত, তখন বলিতেন, "ওর তাতে দোষ হবে না! আমি দেখিয়াছি, গিরিশ মা কালীর অঙ্গ হইতে কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ শিশুর আকারে সুধাভাণ্ড ও পানপাত্র হস্তে লইয়া নির্গত হইল এবং পান করিতে করিতে দিব্যানন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিল!—কোন ভৈরবের অংশে উহার জন্ম, সে জন্যই অত পানাসক্তি, এবং সে জন্য উহা তাহাকে বিপথগামী করিবে না।" গিরিশচন্দ্রের গুরুভ্রাতাগণ বলেন, ঠাকুরের ঐরূপ কথায় তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, গিরিশ ঐ পানাসক্তি ক্রমে ত্যাগও করিতে পারিবেন।

ঠাকুরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গিরিশের ঐ বিষয়ক আচরণও এখন হইতে কিছু অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সুরাপান করিলেই তিনি এখন, ঠাকুরের অপার করুণা মহিমার চিন্তা ও আলোচনা ভিন্ন অপর কিছুই করিতে পারিতেন না—চেষ্টা করিয়াও পারিতেন না। কারণ, ঠাকুরের কথা ভিন্ন ঐ সময়ে অন্য প্রসঙ্গে তাঁহার আনন্দের এককালে অভাব হইত। ভগবান্ কাহাকে যে কিরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট করিয়া গঠন করিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন এবং সেজন্যই বোধ হয়, মনুষ্যবুদ্ধি যাহাদিগকে সৎপথে আনিবার কোন উপায় না পাইয়া ঘৃণ্য বলিয়া সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে করুণায় বারম্বার শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়।

সে যাহা হউক, পানাসক্ত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতে করিতে গিরিশ একদিন এই সময়ে বিশেষ উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অভয়দাতার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া একজন সহচর সমভিব্যাহারে তদ্দণ্ডেই নৌকারোহণে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন—তখন রাত্রি এগারটারও অধিক হইয়াছে। অলৌকিক ঠাকুরের রাত্রিতে এক প্রকার নিদ্রাই ছিল না এবং তাঁহার গৃহদ্বার অনেক সময়ে উন্মুক্তই থাকিত। ঠাকুর অন্যমনে ভাবাবেশে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে

গিরিশ ও তৎসহচর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের বেশ ভূষা, কথাবার্ত্তা এবং চালচলনে তাঁহাদের অবস্থা বুঝিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তাঁহাদের কারণানন্দ দর্শন করিয়া ঠাকুরের মনে জগৎকারণের উদ্দীপন হইয়া গেল এবং তিনি ভাবাবেশে উলঙ্গ হইয়া গান ধরিলেন—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বোলে।

আমার মন মাতালে মাতাল করে যত মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

ঐ গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর ভাবাবেশে টলমল করিতে করিতে ঐ দুইজনের সহিত যোগদান করিয়া এমন নৃত্য আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাকে তখন উঁহাদের অপেক্ষা অধিক মাতাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন অপূর্ব্ব দিব্য আনন্দে গৃহ পূর্ণ হইল এবং গিরিশ ও তৎসহচর ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহারে এককালে বিহ্বল হইয়া বালকের ন্যায় ঠাকুরের সহিত গীত ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ঐরূপে কাটিলে ঠাকুরের ভাব শান্ত হইল এবং গিরিশ ও তৎসহচর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় নৌকারোহণে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গিরিশ ও তৎসহচরের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল, ঠাকুর সাক্ষাৎ ঈশ্বর এবং জগাই মাধাইয়ের ন্যায় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতেই তাঁহার আগমন হইয়াছে। "নতুবা"—তাঁহারা বলিতেন, "যে দুর্দ্দান্ত মাতালদের মত্তাবস্থা দেখিয়া বারনারীকুলও সশঙ্কচিত্তে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে, তাহাদিগকে পরমাত্মীয়ের ন্যায় ঐরূপে সাদরাহ্বান করিয়া স্বর্গীয় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়া ধর্ম্মভাবে এককালে বিমোহিত করিতে অন্য কে আর সমর্থ হইবে!" তাঁহারা বুঝিলেন, অজ্ঞানতায় শত সহস্র অপরাধ করিয়া ফেলিলেও ইনি কখনও তাহার কিছুমাত্র গ্রহণ করিবেন না—ইনি সাক্ষাৎ করুণাময়, মঙ্গলময়, পতিতপাবন!

ঐরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গিরিশ অকপটে তাঁহাকে যতই আপন অন্তরের স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, ঠাকুরের করুণাও ততই শতধারে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে

নানাভাবে সান্ত্বনা ও রক্ষা করিতে লাগিল। গিরিশ ঐ সম্বন্ধে স্বয়ং এইরূপ বলিয়াছেন—

"(ঠাকুর) মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে আমাকে খাওয়াইবার জন্য খাবার লইয়া আসেন, প্রসাদ না হইলে আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেইজন্য মুখে ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন; আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি।

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে, আমায় বলিলেন, 'পায়েস খাও।' আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন, 'তোমায় খাওয়াইয়া দি।' আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম। তিনি কোমলহস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন; মা যেমন চেঁচেপুঁচে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচেপুঁচে খাওয়াইয়া দিলেন! আমি যে বুড়ো ধাড়ি তাহা আমার মনে রহিল না—আমি মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন, এই মনে হইল।"

(উদ্বোধন—পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ।)

গিরিশের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অনুধাবন করিলেই বেশ বুঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব্ব ভালবাসায় তাঁহার এখন কিরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীগুরুর অভয়পদাশ্রয় তিনি যে, নিজের কোন গুণে লাভ করেন নাই, একথা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে একথারও নিত্য উদয় থাকিত যে, সত্য সত্যই শ্রীগুরু তাঁহার স্নেহময় পিতা, মাতা, বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল পরকালের একমাত্র সম্বল। আদরের সন্তান নির্গুণ হইলেও যেমন পিতামাতার ভালবাসায় আপনার পূর্ণাধিকার জ্ঞান করে, গিরিশও তদ্রূপ আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বয়াটে আদরের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিয়া সকল বিষয়ে তাঁহাকে ইচ্ছামত আবদার করিয়া ধরিয়া বসিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্য ভক্তেরা কোনরূপ সাংসারিক কামনা পূরণের জন্য ঠাকুরকে প্রার্থনা করাটা অন্যায় জ্ঞান করিতেন—ঐরূপ করিতে ভয়ও পাইতেন। কারণ, তাঁহারা দেখিয়া-

ছিলেন, ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার বিষয়কামনা কাকবিষ্ঠার ন্যায় সর্ব্বথা ত্যাগ করিয়াছেন, বিষয় ও বিষয়ীর কথা শুনিতেও কষ্ট বোধ করেন এবং মনে কোনরূপ কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে মিষ্টান্নাদি খাইতে দিলে তিনি উহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া ঐ মিষ্টান্নাদি খাদ্য কিছুতেই ভক্ষণ করিতে পারেন না। গিরিশ কিন্তু ঐরূপ করিতে কখন সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। তিনি বলিতেন, "যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্থির জানিয়াছি, তাঁহার কাছে কেবল ধর্ম্মের জন্যই যদি প্রার্থনা করিব, তবে আমার অন্য সকল কামনা কি শয়তানে পূরণ করিবে?—অবশ্য, যাহার মনে বিষয়-কামনা নাই, সে ঐরূপ করিবে, কিন্তু যাহাকে ঠাকুর নানা সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত রাখিয়াছেন, সে ঐ সকলে সিদ্ধিলাভের জন্য আবার কাহাকে ডাকিবে? এক ভগবান্ ছাড়া কর্ম্মফলদাতা আবার কে আছে?" ঐরূপ ভাবের প্রেরণায় তিনি বলিতেন—"তোরা সব তাঁর শিষ্ট শান্ত ছেলে, তোরা ঐরূপ করিতে পারিস্; কিন্তু আমার মত বয়াটে ছেলের ঐসকল ক্ষুদ্র কামনাও পিতা পূর্ণ করিবেনই করিবেন; তবে যে তোরা বলিস্, কামনাপূরণের জন্য ধরিলে ঠাকুরের কষ্ট হইবে, সেটা আমার বোধ হয় তোদের মঙ্গলের জন্য ঠাকুর ঐরূপ ভান করেন—যাহাতে তোরা ঐরূপ ভেবে সব কামনা ছেড়ে কেবল ভক্তি কামনা করিস্, সেজন্য। নতুবা সর্ব্বশক্তিমান্ ঠাকুরের নিজের জন্য ভাল বা মন্দ কোন কাযেরই আবশ্যকতা নাই।" আশ্চর্য্যের বিষয়, গিরিশ ঐরূপ ভাবের প্রেরণায়, ঠাকুরকে যাহা কখন কেহ করিতে দেখে নাই, সে সকল কর্ম্ম করিতে ধরিলেও ঠাকুর অনেক সময় তাহা করিতেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত পাঠককে এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিবেন—

ঠাকুরের রীতি ছিল, গৃহস্থদের বাটী যাইলে যাহা হয় কিছু চাহিয়া খাইয়া আসিতেন। কারণ, তিনি বলিতেন, সাধু বাটীতে আসিয়া কিছু গ্রহণ না করিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। ঠাকুরের আর এক স্বভাব ছিল, যাহা হইতে অগ্রে কাহাকেও কিছু দেওয়া হইয়াছে, সে সকল খাদ্য

তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন না—কেমন করিয়া তিনি উহা জানিতে পারিয়া ঐরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতেন না।

বাগবাজারের প্রসিদ্ধ নন্দলাল বসুর বাটীতে ঠাকুর একদিন কোন কারণে গমন করিয়া বিদায়গ্রহণকালে এক গেলাস জল পান করিতে চাহিলেন। নন্দ বাবু জল আনাইয়া দিয়া নিজ পানের ডিবা তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া উহা হইতে পান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর জল পান করিলেন, কিন্তু পান গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "অগ্রভাগ দেওয়া জিনিস্ খাইতে পারি না।" নন্দবাবু বাটীর ভিতর হইতে পান সাজাইয়া আনিয়া দিলেন, কিন্তু বলিলেন, "আপনি পরমহংস, আপনার আবার বিধি নিষেধ মানা কি জন্য?—অজ্ঞানীরাই ঐরূপ করিবে, আপনি কেন ঐরূপ করেন?" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "ও (নিয়ম) আমার একটা আছে গো, (উহার ব্যতিক্রম করিতে) পারি না, কি করিব বল।" নন্দবাবু ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত রাখিয়া বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, তবে, পরমহংসের এখনও ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় নাই। আচার্য্যদিগকে অপরের কল্যাণের জন্য বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, একথা নন্দবাবুকে বুঝাইলেও বুঝিবেন না দেখিয়া ঠাকুর আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

গিরিশচন্দ্রের কর্ণে ঐকথা উঠিল। পরমহংসদেব এখনও অদ্বৈতজ্ঞানের পূর্ণাধিকারী হয়েন নাই, নন্দবাবুর ঐরূপ ধারণা হইয়াছে জানিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বিদ্যার অহঙ্কার লইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেজন্যই নন্দবাবুকে ঠাকুর ধরা দিলেন না, নন্দবাবুর দুর্ভাগ্য! নিজের কল্যাণের জন্য ঠাকুর যে, বিধি নিষেধ মানিয়া চলেন না, তাহা আমি দেখাইয়া দিব।" নন্দবাবুর ঐরূপ শ্রদ্ধারহিত ধারণায় গিরিশের মনে তখন বাস্তবিকই বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন গিরিশের বাটীতে আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া বাটীর ভিতর হইতে পান সাজাইয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই স্বয়ং একটি পান গ্রহণ করিলেন। এবং অবশিষ্ট হইতে ঠাকুরকে

গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে উহা হইতে একটি গ্রহণ করিলেন! গিরিশ আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিলেন এবং পরে সকলকে ডাকিয়া ঠাকুরের ঐ আচরণের কথা বলিতে লাগিলেন।

গিরিশচন্দ্রের ভৃত্য একদিন পিচ্ছিল স্থানে পতিত হইয়া হস্তে বিষমাঘাত প্রাপ্ত হইল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে নানা ঔষধের সাহায্যেও উহা হইতে আরোগ্য লাভ করিতেছে না দেখিয়া গিরিশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "তুই মনে মনে পরমহংসের নিকট মানত্ কর্ যে, ভাল হ'লে তাঁকে রসগোল্লা দিবি।" দরিদ্র ভৃত্য বাবুর কথায় ঐরূপ করিল। কিন্তু পরদিন স্নান করিবার স্থানে পুনরায় পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। সকলে ভাবিল, তাহার হস্তে আবার গুরুতর আঘাত লাগিল। সে কিন্তু স্নানান্তে গিরিশচন্দ্রকে আসিয়া বলিল, "বাবু, তবে আজ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংস ঠাকুরকে রসগোল্লা দিয়া আসি!" গিরিশ বলিলেন, "সে কিরে, এই যে শুনিলাম, আবার আজ পড়িয়া গিয়া তোর ঐ হস্তে আঘাত লাগিয়াছে?" ভৃত্য বলিল,"আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু উঠিয়াই দেখি হাতে আর ব্যথা যন্ত্রণা কিছুই নাই, সারিয়া গিয়াছে!" গিরিশ ঠাকুরকে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "তবে নাকি তুমি কামনা পূর্ণ কর না এবং কামনা করিয়া তোমাকে ধরিলে মঙ্গল হয় না?" গিরিশ দুই টাকার রসগোল্লা কিনিয়া দিয়া ভৃত্যকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ঠাকুর সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার নিজের কিছুরই আবশ্যক নাই—এ ভাবটি গিরিশের মনে 'প্রথম হইতেই ধারণা হইয়াছিল এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনাদ্বয়ের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপরম্পরায় উহা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর যাহাকে কৃপা করেন, তাহার নবানুরাগের প্রথমোচ্ছ্বাসকালে ঐরূপ ঘটনাসকল কি এক অজ্ঞাত নিয়ম বলে নিত্য উপস্থিত হইয়া তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি দৃঢ় হইয়া উঠে—আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাঁহারাই প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আমরা ঐ

বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে শুনিয়াছি। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবলম্বন করিয়া গিরিশের সম্বন্ধে ঐরূপ ঘটনাবলী এখন উপস্থিত হওয়ায় একভাবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই এবং উহা দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ সম্বন্ধে যাহা বারম্বার বলিয়াছেন, তাহাও অদ্ভুতভাবে প্রমাণিত হয়। ঠাকুর বলিতেন, "বামুন রামকৃষ্ণ বা অমুকের ছেলে রামকৃষ্ণ বহুকাল হইল অন্তর্ধান হইয়াছে, (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর এখন জগদম্বাই কেবল রহিয়াছেন এবং এইটেকে অবলম্বন করিয়া ইচ্ছানুরূপ নানা লীলা করিতেছেন।"

সে যাহা হউক, গিরিশচন্দ্রের ঠাকুরের নিকট আবদার অনুরোধের চূড়ান্ত কথা আমরা এখনও বলি নাই। উহাই এখন পাঠককে বলিতে আরম্ভ করি—

গিরিশ বলিতেন, ঠাকুরের শান্ত শিষ্ট ভক্ত সকলকে তাঁহার নানা ভাবে সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে দেখিয়া তাঁহার অনেক সময়ে এখন মনে হইত—"আহা, ইহারা কত সৌভাগ্যবান্! ইহারা ঠাকুরের মনোমত কেমন সেবা করিতে জানে—ঠাকুরও তাহাতে কত সুখী হন! জগাই মাধাইয়ের সাজ সাজিয়া সংসারে আসিয়া ঠাকুরের ভালবাসা যথেষ্ট পাইলাম বটে, কিন্তু চিরকাল নিজের সেবা করিতেই শিখিয়াছি, ঠাকুরের সেবা কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা ত শিখি নাই, অতএব আমার দ্বারা ঠাকুরের সেবা করা কিছুই হইল না।"

পাঠক হয়ত ভাবিবেন, এইমাত্র পূর্ব্বে শুনিলাম, গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে সর্ব্বশক্তিমান্ জানিতেন এবং তাঁহাব সেবার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না, তবে আবার গিরিশের মনে এইরূপ বিপরীত ইচ্ছার উদয় কেন? উত্তরে আমরা তাঁহাকে নিজ প্রকৃতির ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ঐরূপ করিলেই বুঝিবেন, আমাদিগের প্রত্যেকের মনেই কত ঐরূপ বিপরীত ভাবসমূহ নিরন্তর আসিতেছে ও যাইতেছে! মানব-প্রকৃতি যে, কত বিপরীত ভাব-সমষ্টিতে গঠিত, তাহা ভাবিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়। অতএব গিরিশের পূর্ব্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও ঠাকুরের প্রতি ভালবাসার

আধিক্যেই হউক বা ঠাকুরের সেবাধিকারী ভক্তসকলের সঙ্গগুণেই হউক, অথবা উভয় কারণেই হউক, গিরিশের মনে ঐরূপ বিপরীত ভাব উঠিয়া গিরিশকে ব্যাকুল করিয়াছিল। গিরিশ একদিন ঠাকুরকে খুলিয়া জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, "মহাশয়, আমার মনোমত সেবা একদিন গ্রহণ করিবেন না?" ঠাকুরও গিরিশের অন্তর দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, রাজসিক ভক্তিপ্রধান গিরিশ তাঁহাকে তাঁহার যাহা খাইতে ভাল লাগে তাহা না খাওয়াইতে পারিলে তৃপ্তিবোধ করিবে না, এবং উহা বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন—"এখন নয় রে, সে এখন নয়!"—অর্থাৎ, যতদিন না গিরিশ স্বয়ং সত্ত্বগুণপ্রধান হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনোমত খাদ্য পানাদি তাঁহাকে প্রদান করিলেও তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং গিরিশও তজ্জন্য তৃপ্তি বোধ করিবেন না। গিরিশ ঠাকুরের ঐ কথা বুঝিলেন। কারণ, তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছিলেন, মাছ মাংসাদি খাইতে বসিয়া নিজের ভাল লাগিলেই ভাবিতেছেন, "আহা, ঠাকুর যদি এ সকল খাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে খাওয়াইতাম।" গিরিশ বুঝিলেন, কিন্তু ক্ষুণ্নমনে ভাবিতে লাগিলেন, "তবে আর আমার দ্বারা ঠাকুরের সেবা কেমন করিয়া হইবে? আমার এ স্বভাবও বদলাইবে না, ঠাকুরের সেবা করাও হইবে না। আমার স্বভাবও এমন যে আমার যাহা ভাল লাগে না, তাহা খাইয়া ঠাকুরের যে তৃপ্তি হইতেছে, একথা ভাবিতেও পারি না এবং তিনি যাহা ভোজন করেন, তাহা শুদ্ধাচারে দেবতার ভোগের মত রাঁধিয়া দিতেও বিষম হাঙ্গাম বলিয়া মনে হয়। তবে আর আমার দ্বারা কেমন করিয়া ঠাকুরের সেবা করা হইবে?"

উহার অনতিকাল পরে গিরিশ একদিন থিয়েটারে রহিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর কয়েকটি ভক্তসঙ্গে অভিনয় দেখিতে আসিলেন। গিরিশ ঠাকুরকে সযত্নে উপরে লইয়া গিয়া বসাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই গিরিশের মনে হইল, "হায়, হায়, আমার দ্বারা ঠাকুরের কোন সেবাই হইল না!—আজ অভিনয় দেখিতে যদি কোন উচ্চপদস্থ সাহেব বা ধনী ব্যক্তি আসিত, তাহা হইলে লাল বনাত দিয়া রাস্তা পর্য্যন্ত

মুড়িয়া, রঙ্গালয় পত্রপুষ্পে সজ্জিত করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতাম; কিন্তু আমার ইহকাল পরকালের অবলম্বন ঠাকুর আসিবেন শুনিয়া কি করিয়াছি?—বড় জোর একটা আলাহিদা আসনে (box) বসিতে দিয়াছি!"

ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে গিরিশের মনে বিষম দুঃখ হইল এবং পানাসক্তদিগের যেমন হইয়া থাকে, গিরিশ দুঃখভার অসহ্য বোধ করিয়া মদ্যপান করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, "আমার দ্বারা ঠাকুরের সেবা হওয়া অসম্ভব, তবে যদি তিনি অহেতুক কৃপায় আমার সন্তান হইয়া কোনদিন আমার গৃহ উজ্জ্বল করেন, তবে মমতায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের আহরণাদি করিয়া অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা করিতে পারি। সে অদৃষ্ট কি আর আমার হইবে?" আবার ভাবিলেন, "কেনই বা হইবে না? ঠাকুরকে ঐরূপ হইতে ধরিয়া বসিব, তাহা হইলেই ঠাকুর স্বীকৃত হইবেন।"

মত্তপের খেয়াল—মনে উদয় হইলে তাহা না করিয়া শান্তি কোথায়? অভিনয় শেষ হইলেই গিরিশ ঠাকুরকে যাইয়া ধরিয়া বসিলেন—"তুমি বল, তুমি কোন্ সময়ে আমার পুত্র হইবে?" অতঃপর ঘটনাটি গিরিশচন্দ্রের নিজের মুখেই পাঠকের শুনা ভাল—

"আমার মনে ধারণা ছিল, আমি ভক্তিহীন, আমি ঠাকুরের সেবা করিতে পারিব না। কিন্তু ঠাকুর যদি আমার ছেলে হন, তাহা হইলে মমতাবশতঃ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে পারিব। এই আমি মত্ততার বেগে ধরিয়া বসিলাম—'তুমি আমার ছেলে হও।' ঠাকুর বলিলেন, 'তা কেন? তোর গুরু হব, তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো।' তিনি ছেলে হন্ না, এই আমি যা মুখে আসে, গালি পাড়ি।"*

"ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবার সময় সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণামও করিলাম!"*

"আমার মনে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আদুরে গোপাল বয়াটে ছেলে যেরূপ বাপকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও পরমহংসদেবের

* তত্ত্বমঞ্জরী—৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১১ সাল।

আদুরে, বয়াটে ছেলের মত কার্য্য করিয়া নির্ভয়ে রহিলাম। অনেকে অনেক বলিতে লাগিল, কার্য্য ভাল হয় নাই, ক্রমে বুঝিলাম, কিন্তু তত্রাচ পরমহংসদেবের স্নেহের উপর আমার এত নির্ভর, তাঁহার স্নেহ এত অসীম যে, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন, এ আশঙ্কা একবারও জন্মিল না। দক্ষিণেশ্বরে অনেকেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল যে, 'ওরূপ অসৎ ব্যক্তির নিকট আপনি যান্!' কেবল একমাত্র ৺রামচন্দ্র দত্তই বলিয়াছিলেন—'মহাশয়, ও আপনাকে পূজা করিয়াছে; কালীয় নাগ ভগবান্‌কে বলিয়াছিল যে, আপনি আমাকে বিষ দিয়াছেন, আমি কোথা হইতে সুধা আপনাকে দিব! গিরিশ ঘোষকেও যাহা দিয়াছেন, সে তাহাই দিয়া আপনাকে পূজা করিয়াছে।' পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন, 'শোনো, শোনো, রামের কথা শোনো।' আবার অনেকেই আমার নিন্দা করিতে লাগিল। প্রভু বলিলেন—'গাড়ি আনো, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাইব!'

"স্নেহময় পরমপিতা আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যজ্য পুত্র করে, সে অপরাধ আমার পরমপিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী আসিলেন, দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুণ্ঠিত হইতে লাগিল! তিনি স্নেহময় সম্পূর্ণ ধারণা রহিল, কিন্তু নিজ কার্য্যের আলোচনায় আপনি লজ্জিত হইতে লাগিলাম—ভক্তেরা কত প্রকারে তাঁহার পূজা করে ভাবিতে লাগিলাম, আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ইহার কিছুদিন পরে ভক্তচূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভু উপস্থিত হইলেন, আমিও তথায় উপস্থিত। চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে বলিলেন—'গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্‌নে, (এর পর) তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে যাবে।' আমি আশ্বস্ত হইলাম।"*

গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মদ্যপা-

* উদ্বোধন—"পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ" শীর্ষক প্রবন্ধ।

বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দুর্বাক্য প্রয়োগের পূর্ব্ব হইতে তিনি যদি ঠাকুরকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া দৃঢ় ধারণা না করিতেন, তাহা হইলে কখনই ঐরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন না। হরিপদ নামক যে ভক্তের কথা, শ্রীযুত গিরিশ তাঁহার চতুর্থবার ঠাকুরকে দর্শনকালের কথায় উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি ঐ দিন গিরিশের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার নিকটে আমরা শুনিয়াছি, শ্রীযুত গিরিশ ঐ দিন ঐ অবস্থাতেও ঠাকুরকে গালি দিবার পরে তাঁহার প্রতি অদ্ভুত ভক্তি বিশ্বাসের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ঐরূপ আচরণে ঠাকুর যে তাঁহার উপর কিছুমাত্র কুপিত হইবেন, একথা একক্ষণের জন্যও মনে স্থান দেন নাই! তিনি বলেন, "ঠাকুর ঐ সময়ে পাছে সমভিব্যাহারী ভক্তগণ একটা হাতাহাতি কাণ্ড করিয়া বসে, এজন্য তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছিলেন, 'এটা (গিরিশ) কোন্ থাকের (শ্রেণীর) ভক্ত রে? এটা বলে কি?' কিন্তু ঐ দিন থিয়েটার হইতে ফিরিবার সময়ে ঠাকুর যখন গাড়িতে উঠিলেন, তখন গিরিশ ঐ গাড়ির সম্মুখে কর্দ্দমাক্ত রাস্তার উপরে লম্বমান হইয়া শুইয়া পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। পরে গৃহে ফিরিবার কালে এবং তাঁহার বাটীতে সঙ্গে আসিয়া আমি গিরিশ বাবুকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার ঐরূপ আচরণ করাটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে এবং ঠাকুরের অসন্তুষ্টিতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, গিরিশ বাবু ততবারই উত্তরে বলিলেন, 'তুই জানিস্ নে, ওঁর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) নিন্দা ও স্তুতি উভয়ই সমান; উনি আমার উপর কিছুমাত্র কুপিত হন নাই; গালি দিবার সময়ে উনি যদি আমার কিছুমাত্র অপরাধ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমাকে কি আর এখনও দেখিতে পাইতিস্?—এতক্ষণে কোথায় রেণুর রেণু হইয়া যাইতাম!' তাঁহার ঐরূপ ভক্তিবিশ্বাসপূর্ণ কথাতেও যখন আমি প্রত্যয় না করিয়া তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকটে যাইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলাম, তখন তিনি 'আমার ঘুম পাইয়াছে,' বলিয়া আমার নিকট হইতে সহসা বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীর অন্দরে চলিয়া গেলেন!

অগত্যা আমি তাঁহাকে 'দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড' স্থির করিয়া ঠাকুরের করুণা ভাবিতে ভাবিতে দুঃখিত অন্তরে নিজ গৃহে ফিরিলাম।"

অসাধারণ বিশ্বাসবলে গিরিশ ঐরূপ আচরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেও তাঁহার উদার হৃদয় কিন্তু তাঁহাকে ঐরূপে থাকিতে দেয় নাই। গিরিশ পরদিনই বুঝিলেন, ঠাকুরের নিকট অপরাধী বলিয়া পরিগণিত না হইলেও তাঁহার ভক্তদিগের প্রাণে তিনি ঐ ঘটনায় বিষমাঘাত প্রদান করিয়াছেন। পরে ভাবিলেন, সেটা বড় অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে। আরও ভাবিলেন, আহা, তাহারা কতরূপে ঠাকুরের সেবা করিয়াও যথেষ্ট হইল না ভাবিয়া কাতর হয়, আর, আমি, ঠাকুরের অপার করুণা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াও সুখী করিতে সচেষ্ট হই নাই। তাঁহার করুণার ও নিজ বিসদৃশ আচরণের এইরূপে যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই গিরিশের অন্তরে যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ঠাকুরের করুণায় গিরিশের সমস্ত দম্ভ বহুপূর্ব্বে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এখন এই ঘটনায় ঐ দম্ভের সংস্কার পর্য্যন্তও তাঁহার অন্তর হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল। গিরিশ উহাতে বিনীত, অনুতপ্ত এবং আপনার নিকটে আপনি মহাপরাধী বলিয়া পরি-গণিত হইয়া নিরন্তর ঐ কর্ম্মের স্মৃতিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনুতপ্ত গিরিশ পরে কিরূপে আবার আশ্বস্ত হইলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার নিজ কথায় পাঠককে বলিয়াছি।

আবার, ঐ ঘটনায় গিরিশ নিজ পানাসক্তি যথাসাধ্য ত্যাগ করিতেও যে, কৃতসংকল্প হন, একথাও আমরা তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। এখন হইতে যখন তখন পানদোষে রত হইতে কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই। এইরূপে দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের অলৌকিক কৃপায় গিরিশের জীবনে ততই অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনসমূহ উপস্থিত হইয়া ক্রমে তাঁহাকে ভক্তাগ্রণী করিয়া তুলিয়া-ছিল। নিম্নের কয়েকটি ঘটনায় আমরা পাঠককে ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্থবার দর্শনকালে ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ঠাকুরের দেহরক্ষার পূর্ব্বে গিরিশ যে কতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা তৎকৃত 'বুদ্ধদেব' ও 'বিল্বমঙ্গল' গ্রন্থে সবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতের যে সকল রহস্য সেক্সপীয়রাদি জগতের কোন জাতির কোন মহাকবিই এ পর্য্যন্ত প্রকাশে সমর্থ হয়েন নাই, শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত গিরিশের লেখনী নাট্যচরিত্রসকলের ভিতর দিয়া সে সকল তত্ত্বের যথাযথ প্রকাশেও সমর্থ হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র শেষ জীবনে নাটকসকল প্রণয়ন করিয়া সমালোচকেরা উহা সু বা কু নয়নে দেখিলেও স্থির নিশ্চিন্ত মনে বলিতেন, "উহারা না বুঝিলে আমি কি করিতে পারি? আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি; যাহা জীবনে কখনও দেখি নাই বা অনুভব করি নাই, তাহা কখনও লিখি না: কিন্তু সকলে আমার মত দৃষ্টি কোথায় পাইবে? ঠাকুরের কৃপায় আমি যে, অবতার পুরুষের অদ্ভুত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃণ্য বারনারী-কুলের জীবন পর্য্যন্ত দেখিবার অবসর পাইয়াছি। সংসারের সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে সর্ব্ব নিম্নের স্তর পর্য্যন্ত ঐরূপে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা আর কাহার ভাগ্যে হইয়াছে? অতএব আমার পুস্তকসকল সাধারণে না বুঝিলেও আমি তাহাদের দোষ দিতে পারি না। সাধারণে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া আমি আমার সর্ব্বোচ্চ চিন্তা ও কল্পনা-সমূহ লইয়া অনেক সময়ে আমার পুস্তকের চরিত্র সকল গঠন করিনা। তাহা করিলে, সাধারণে আমার পুস্তকসকল এককালেই বুঝিতে পারিত না বলিয়া বোধ হয়।" বিন্দুমাত্র দম্ভের সহিত গিরিশচন্দ্র ঐ কথাগুলি বলিতেন না এবং ঐ ধারণাই তাঁহাকে খ্যাতি অখ্যাতির পরপারে অবস্থান করিতে সক্ষম করিয়াছিল।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাদৃষ্টিতে গিরিশের লৌহময় অন্তর সুবর্ণে পরিণত হইলেও সাধারণে গিরিশচন্দ্র সুলেখক হইয়াছেন এই পর্য্যন্তই জানিল। ঠাকুর যে বলিতেন, 'গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বুদ্ধি ও বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না!'—শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত ভক্তগণেই তাহা, কেহ বা প্রাণে প্রাণে উহার পরিচয় পাইয়া,

আবার, কেহ বা ঠাকুরের কথা বলিয়া উহা বিশ্বাস করিয়া—গিরিশকে প্রাণের সহোদরতুল্য ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এতদূর সম্মান করিতেন যে, কখন কখন তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছেন! শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কটুবাক্য প্রয়োগ করিবার পরে যেদিন ঠাকুর অপার করুণায় গিরিশের বাটীতে পুনরায় ভক্তগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন, সেদিন পূজ্যপাদ স্বামীজিও ঐ দলের মধ্যে ছিলেন এবং গিরিশকে দেখিয়া 'ধন্য তোমার বিশ্বাস' বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন।* গিরিশ পরে অনেক সময়ে স্বামীজির মহিমা কীর্ত্তনকালে সজলনয়নে ঐ কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। আবার পাশ্চাত্য বিজয় করিয়া যেদিন পূজ্যপাদ স্বামীজি প্রথম কলিকাতায় আসিলেন, সেদিন বাগবাজারের শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু মহাশয়ের বাটীতে গিরিশ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহার পদধূলি লইবার উপক্রম করিলে স্বামীজি শশব্যস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলেন—'কি কোর্‌চো জি, সি,† উহাতে যে, আমার অকল্যাণ হবে?' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জগৎপূজ্য শিষ্য শ্রীযুত গিরিশকে কি চক্ষে যে দেখিতেন, তাহা আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তি কি বুঝিবে! একদিকে ইঁহাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি এই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান, আবার অন্যদিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তর্কযুদ্ধকালে পরস্পরের প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণের সন্ধান দেখিয়া তাঁহাদিগের গুরুভ্রাতাগণও চমৎকৃত হইতেন। ঠাকুর স্বয়ংও তাঁহার সম্মুখে ইঁহাদিগকে কখন কখন তর্কে লাগাইয়া দিয়া আনন্দ করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, একদিন ঠাকুরের নিকটে ঐরূপ তর্ককালে গিরিশের অটল বিশ্বাসের কথায় স্বামীজিকে নীরব হইতে হইয়াছিল! গিরিশ আনন্দ করিয়া বলিতেন, "ঠাকুর সেদিন কৃপা করিয়া আমার জয়লাভ করাইয়া-

* তত্ত্বমঞ্জরী—৮ম বর্ষের ৯ম সংখ্যায় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র লিখিত 'রাম দাদা' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

† স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ গিরিশচন্দ্রকে আদর করিয়া ঐ বলিয়া অনেক সময় সম্বোধন করিতেন।

ছিলেন, নতুবা আমার সাধ্য কি স্বামীজিকে হারাই! স্বামীজি নিরস্ত হইলে ঠাকুর আনন্দ করিয়া আমায় বলিতে লাগিলেন, 'ওর (স্বামীজির) কাছ থেকে লিখে নাও যে, ও হার মান্‌লে!'"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় গিরিশের আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদৃষ্টি যে, কতদূর খুলিয়া গিয়াছিল তাহা, যাঁহারা তাঁহার সহিত জীবনে নিকট-সম্বন্ধে কখনও আসেন নাই, তাঁহাদিগকে বুঝান অসম্ভব। আবার, শ্রীরাম-কৃষ্ণ-পরিবারগণ মধ্যে গিরিশের যে কত উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাও তদ্রূপ বুঝান অসম্ভব। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণ, উৎসবাদি সময়ে গিরিশ মঠে উপস্থিত হইলে কখন কখন তাঁহাকে বিভূতিভূষিতাঙ্গ করিয়া গৈরিক রুদ্রাক্ষ ও ত্রিশূল ধারণ করাইয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিতেন—ধূনী জ্বালাইয়া তাঁহারা যখন জপ ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন, তখন গিরিশ উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে, "জি, সি, তুমিও ত সন্ন্যাসী, আমাদিগেরই একজন, এস, সাধন ভজন কর", বলিয়া সঙ্গে লইতেন! গিরিশ বলিতেন, "ঐসকল পবিত্র কুমার-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী, ঠাকুরের প্রিয় সন্তানেরা আমার মত লোকের সহিত যখন ঐরূপ ব্যবহার করে, তখন, ঠাকুর কৃপা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার অধিকারী হইয়াছি একথা ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত ও বালকবৎ হইয়া যাই! আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়া বাক্‌রোধ হইয়া যায়।"

গুণী ব্যক্তিই অপরের গুণের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে যথার্থ সম্মান দিয়া থাকেন। গিরিশচন্দ্রের গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে যে, ঐরূপে ভালবাসা ও সম্মান প্রদান করিতেন, তাহার কারণ—তাঁহারা গিরিশের হৃদয়ের অশেষ গুণাবলীর কথা যথাযথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বাস্তবিক, বালকের ন্যায় হৃদয় লইয়া গিরিশ ধর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া-ছিলেন। ঐ রাজ্যের কোন কথা তিনি যে বুঝেন বা বুঝিয়াছেন, ঐ ভান গিরিশ একদিনের জন্যও করেন নাই। কেবল একথাই তিনি প্রাণে প্রাণে ধারণা করিয়াছিলেন যে, শ্রীগুরুর প্রত্যেক কথাই অভ্রান্ত সত্য এবং তাঁহার নিকট যেক্ষণে যাহা কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানিতে, বুঝিতে, বা অপরোক্ষ করিতে চাহিবেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টিমাত্রেই তৎ-

ক্ষণাৎ উহা উপলব্ধি করিবেন; তাঁহার কৃপায় মূক অপূর্ব্ব বক্তা হয়, পঙ্গু হিমালয় উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হয়—জগতে যাহা কিছু লোকে অসম্ভব জ্ঞান করে, সে সকলই তাঁহার কৃপায় সম্ভবপর হয়। সংশয়াত্মা সংসার ঐ অকপট বিশ্বাসের মূল্য কোনকালে বুঝে নাই, কখন বুঝিবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ অকপট বিশ্বাসবলেই গিরিশের পূর্ব্বসংস্কার সকলের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ, উহারই প্রভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া এবং উহারই অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিতে গিরিশ, অবিশ্বাসী পুরুষ যেখানে অন্ধকার দেখে, সেখানে অপূর্ব্বালোক দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুদ্ধ তাহা নহে, আমরা শুনিয়াছি—শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে ঐরূপ অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গিরিশ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধিকাংশ ভক্তেরা যে স্থলে আলোক দেখিতে পান নাই, ঐরূপ সমস্যা-স্থল সকলেও কখন কখন সর্ব্বাগ্রে আলোক দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! দৃষ্টান্তস্বরূপে আগামী বারে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব।

ভারতের সাধনা।

(১০) শিক্ষাসংঘর্ষ।

"ভারতে আমাদের উন্নতিপথে দুইটী প্রবল বিঘ্ন বিদ্যমান, জাহাজের সংকীর্ণ পথে দুইপার্শ্বে দুইটী বারিগর্ভস্থিত পাহাড়ের (সাইলা ও চেরিব্‌ডিস্) মত এই বিষম বিঘ্ন দুইটী আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান—একটী জীর্ণ হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি ও অপরটী আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা। যদি এই দুইটীর একটীকে দেশের জন্য মনোনীত করিতে হয়, আমি প্রাচীন হিন্দুয়ানির গোঁড়ামির পক্ষেই মত দিব, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার পক্ষে নহে। কারণ, যিনি সংকীর্ণ, প্রাচীন হিন্দুয়ানির ভক্ত, তিনি কতকটা অজ্ঞানান্ধ হইতে পারেন, তাঁহার মতামত অপরিপক্ক হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার একটা মনুষ্যত্ব, একটা প্রতিষ্ঠাভূমি, একটা বলবত্তা আছে, —তিনি আপন পায়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান। আর যিনি পাশ্চাত্য ছাঁচে

রূপান্তরিত হইয়াছেন, তিনি মেরুদণ্ডবিহীন, তিনি যখন যেমন সুযোগ পাইয়াছেন, নানা বিসদৃশ ভাব ও আদর্শ আহরণ করিয়া আপনার মধ্যে পুঞ্জীকৃত করিয়াছেন—সেগুলি আবার সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত বা পরিপাক করা, অথবা পরস্পর সমঞ্জসীভূত বা সমন্বিত করা হয় নাই। তিনি আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ান না এবং তাঁহার মস্তিষ্কও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া এক ভাবকক্ষ হইতে কক্ষান্তরে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইঁহার সৎসাধনার পশ্চাতে কোন্ প্রেরণাশক্তি বিদ্যমান? ইংরাজ-সমাজের প্রশংসাসূচক পৃষ্ঠপীড়ন!" * * * "এই সমগ্র প্রাচীন জাতির পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধি প্রত্যেক হিন্দুর ভিতরে আশৈশব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, ঐ মূলছন্দেই তাঁহার জীবনগাথা গ্রথিত করিতে হইবে,—উহারই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে নিজের ঐশ্বর্য্য মান যশকে, নিজের পাশ্চাত্য বিদ্যাবিজ্ঞানাদির শিক্ষাকে, আনয়ন করিতে পারিলে আদর্শ হিন্দুচরিত্রের মূলরহস্য সমাধান করা হইল। অতএব একদিকে সেই প্রাচীন হিন্দুয়ানির গোঁড়াভক্ত যিনি সমগ্রজাতির প্রাণনশক্তির উৎস পরমার্থনিষ্ঠাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, এবং অপরদিকে ঐ পাশ্চাত্যভাবভাবিত নব্য—যাঁহার করপুট পাশ্চাত্য কেমিক্যাল বা মেকি সোণাজহরতাদিতে ভরা বটে কিন্তু যিনি জাতির উদ্ভবস্থান পরমার্থনিষ্ঠার সহিত সংযোগ হারাইয়াছেন,—এই উভয় পক্ষের মধ্যে, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, সকলেই একমত হইয়া পূর্ব্বোক্ত হিন্দুয়ানির গোঁড়াভক্তকেই মনোনীত করিবেন, কারণ, ইঁহার মধ্যে একটা আশাসূত্র রহিয়াছে। ইনি সনাতন জাতীয় জীবনছন্দটী বজায় রাখিয়াছেন, এবং ইঁহার আঁকড়াইয়া থাকিবার একটা অবলম্বন আছে, এই কারণে ইনি বাঁচিয়া যাইবেন, কিন্তু অপর ব্যক্তির মৃত্যু সুনিশ্চিত। ঠিক যেমন একটা মনুষ্য-দেহসম্বন্ধে দেখা যায় যে, যদি সেই দেহে জীবনসঞ্চারের কেন্দ্রশক্তিটী অক্ষুণ্ণ থাকে, যদি সেই দেহযন্ত্রের মূল ক্রিয়াটী বজায় থাকে, তবে অপরাপর ক্রিয়া সাময়িক আঘাত বা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলেও দেহের জীবনসংশয় ঘটে না,—আর দেখাও যায় যে, ঐ সমস্ত অবান্তর ক্রিয়া-গুলির প্রায়ই অবস্থান্তর ঘটিতে পারে- ঠিক এইভাবে বুঝিতে হইবে

যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমষ্টিদেহযন্ত্রের মূল ক্রিয়াটী অব্যাহত থাকিবে, ততদিন কিছুতেই এ জাতির ধ্বংসসাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু নিশ্চয় বলিতেছি মনে রাখিও, যদি তোমরা পরমার্থতন্ত্রতা পরিহার কর এবং উহার পরিবর্ত্তে জড়ভ্রান্তিবিবর্দ্ধিনী পাশ্চাত্য-সভ্যতার পশ্চাতে ধাবমান হও, তবে পরিণামে তিন পুরুষে জাতিলোপ ঘটিবে, কেন না জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে, জাতীয় জীবনসৌধ যে ভিত্তির উপর উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শূন্যগর্ভ হইয়া যাইবে, ফলে সকল দিকেই ধ্বংসলীলার বিস্তার ঘটিবে।"

(রামনদে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।)

গতবারের প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন অর্থাৎ পরমার্থকে লক্ষ্য ও কেন্দ্ররূপে নিরূপিত করিয়া, উহারই আনুগত্যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। মানবজীবনের সর্ব্ববিধ আগত ও অনাগত অর্থ বা প্রয়োজন সম্বন্ধে যথাযোগ্য তত্ত্বদৃষ্টি ও সাধনসামর্থ্য প্রদান করাই শিক্ষা বা culture এর উদ্দেশ্য; ভারতীয় শিক্ষার বিশেষত্ব এই যে, উহা মানবজীবনের আর সমস্ত অর্থ বা প্রয়োজনসম্বন্ধীয় তত্ত্বদৃষ্টি ও সাধনসামর্থ্যকে পরমার্থসাধনার সোপানরূপে আমাদের সম্মুখে গঠিত ও বিলম্বিত করিয়া দেয়। ভারতীয় শিক্ষার এই বিশেষত্ব রক্ষা করিবার ভার শ্রেষ্ঠ পরমার্থবিদ্‌গণই গ্রহণ করিতে পারেন; বিগত প্রবন্ধে ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে আমরা সে কথা আলোচনা করিয়াছি।

গত প্রবন্ধে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, ভারতীয় সনাতন শিক্ষা বা culture এর একটা সর্ব্বাঙ্গীন সমন্বয় ও কেন্দ্রীকরণ—reorganisation—হওয়া বর্ত্তমান যুগের একটী প্রধান অনুষ্ঠেয় ব্রত, সে ব্রত কিরূপে উদ্‌যাপিত হইবে, তাহা আমরা আগামী বারে আলোচনা করিব। আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষাসমস্যা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, কেন না ভারতীয় শিক্ষার নূতন

সমন্বয়বিধানে (reorganisationএ) যে সে সমস্তারও পূরণ হইবে, তাহা আমাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার প্রথম সংঘর্ষের ফলে আমাদের দেশে দুই রকম জীবের প্রাদুর্ভাব হয়, একটী সেকালের রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু ও অপরটী একালের শিক্ষিতম্মন্য নব্য বাবু। প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত স্বামীজির উক্তিতে অল্পকথায় ইঁহাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা গতিহীন, পরস্পর বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও খিন্নপ্রাণ হইয়া ক্রমশঃ অন্ধ-সংস্কারপুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সেই সকল অন্ধ সংস্কারের সমষ্টি, কিন্তু সনাতন পথের হিসাব হারাইলেও তিনি সে পথেই দণ্ডায়মান আছেন, পথবিচ্যুত হন নাই; তাঁহার একটা বনিয়াদী রকমের আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে, তিনি অপ্রতিষ্ঠ হন নাই। কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য নব্যগণের অবস্থা আরও বিপৎসঙ্কুল, তাঁহারা পথবিচ্যুত হইয়াছেন,—অতীতের যে সকল শুভসংস্কার একটা জাতির নব নব জীবনসংগ্রামে শ্রেষ্ঠ বিজয়াস্ত্ররূপে পরিণত হয়, নব্যগণ সেই সকল সংস্কারের এলাকা অতিক্রম করিয়া উধাও হইয়াছেন,—এক কথায় তাঁহারা জাতির পরমার্থমূলক সনাতন জীবনকেন্দ্রের সহিত সংযোগ হারাইতেছেন; অতএব জাতির জীবনসংগ্রামে এই সকল অপ্রতিষ্ঠ, কেন্দ্রচ্যুত জীবের বাঁচিবার আশা নাই।

এই দুইরকম জীবের নমুনা প্রদর্শন করিয়া স্বামীজি যে সেকালের সংস্কারান্ধ হিন্দুর পক্ষে অভয়বাণী ও একালের স্বরূপচ্যুত নব্যের সম্বন্ধে মৃত্যুলক্ষণ ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতে অনেকেই চমকিত ও বিস্মিত হইবেন, কারণ, অনেকেই ঠিক উল্টা বুঝিয়া বসিয়া আছেন। অনেকেই মনে করেন যে, নব্যগণ সনাতন পরমার্থকেন্দ্রের সহিত সংযোগ হারাইলেও আধুনিক জগতের উৎকর্ষবিধায়ক প্রত্যক্ষ জীবন-রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের এই আধুনিকত্ব আছে বলিয়াই আধুনিক জগতে তাঁহারা টিকিয়া যাইবেন, আর যাঁহারা অন্ধ-সংস্কারবশে ভারতীয় প্রাচীন জীবনরীতি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছেন, আধুনিক জগতে তাঁহাদের টিকিবার বা দাঁড়াইবার স্থান নাই। যাঁহারা

এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের একমাত্র নজীর হইতেছে the law of self-adaptation, অর্থাৎ আপনার জীবনের সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের নিয়ম। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মানুষের জীবন রুদ্ধগতি ও উন্নতিবিমুখ হইয়া বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা স্বীকার করি যে, সেকালের সংস্কারান্ধ হিন্দু এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবহেলা করেন, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, একালের শিক্ষাতমন্ত্র নব্য কি ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রকৃতপক্ষে পালন করেন? কখনই না। বরং সেকেলে হিন্দুর পক্ষে এই নিয়মপালনের সম্ভাবনা ও পথ উন্মুক্ত আছে, একালের নব্যগণ তাহাও রুদ্ধ করিয়াছেন।

নিজের জীবনের সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, *নিজের একটা জীবন—নিজস্ব একটা কিছু* বজায় রাখা চাই; কারণ, কে সামঞ্জস্যবিধান করিবে? সামঞ্জস্য করিবার জন্য দুইটী বস্তু বা পক্ষ থাকা চাই ত? আমরা জিজ্ঞাসা করি, একালের আদর্শ নব্যগণ আপনাদের অতীতাগত কোনও স্বরূপ বজায় রাখিয়া, তার পর আধুনিক কালের জীবনরীতি পরিগ্রহ করিতেছেন কি? পুরুষানুক্রমিক দৈহিক রক্ত ও ইংরাজপ্রদত্ত "নেটিভ" অভিধান ব্যতীত আর কোনও ধ্রুব লক্ষণের দ্বারা আপনাদের স্বরূপকে লক্ষিত ও অবিকৃত রাখিতে চেষ্টা করিয়া, তার পর পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার স্রোতে তাঁহারা গা ভাসাইয়াছেন কি? যে নিজের স্বরূপেরই পরিচয় জানে না, সে আবার self-adaptation কি করিবে, সে আবার নিজ জীবনরীতির কালোচিত পরিণাম কি করিবে? যে আত্মপরিচয় জানে না, সে কেবল পারে আপনাকে বিকাইয়া দিতে,—সে পারে বাহিরের প্রভাব ও শক্তির দাসত্বে আপনার বিলোপ সাধন করিতে।

সেকালের সংস্কারান্ধ হিন্দুও আত্মস্বরূপের প্রকৃত পরিচয় জানিত না। কিন্তু সে ত নব্য বাবুর মত self-adaptation করিতে ছুটে নাই? অতএব তাহার পক্ষে মরণ বিপদ্ অত সহজে ঘনায় নাই। তাহার সংস্কারগুলি অন্ধ হইলেও,তাহাকে স্বরূপভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই,

সনাতন পরমার্থকেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। এই সংযোগ একবার প্রত্যক্ষীভূত হইলেই, অন্ধ সংস্কার দৃষ্টিলাভ করিবে এবং কালোচিত পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আধুনিক জগতে নূতন উন্নতিপথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া লইবে। কিন্তু স্বরূপভ্রষ্ট নব্যগণ যদি জাতীয়জীবনের পরমার্থকেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত না হন, তবে ময়ূরের পালক গুঁজিয়া আপাতমনোরম গর্ব্বিত অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা কতদিন দেহের প্রকৃত স্বাস্থ্য বজায় রাখিবেন? ইতিমধ্যেই, "জাতীয় শিক্ষা" "হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়" প্রভৃতির উচ্চরোলের মধ্যে একূল ওকূল দুকূল হারাইবার আশঙ্কাই কি স্পন্দিত হইতেছে না? ইতিমধ্যেই এ সংশয় কি সর্ব্বত্র পুঞ্জীভূত হইতেছে না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতবাসীর মধ্যে একটা যোগ্যসম্ভ্রমাত্মক, ধ্রুব, নবীন স্বরূপ গড়িয়া দিতেছে না, কেবল উহার প্রাচীন স্বরূপটীকে নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে? ইতিমধ্যেই কি আমরা বুঝি নাই যে, পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে দেশে যে নূতন শিক্ষিতসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, তাহারা কেবল পাশ্চাত্যের ও পাশ্চাত্যসভ্যতার দাসত্বে এবং ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতায় সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট, এতদ্ব্যতীত তাহাদের কোনও রূপ সাধারণ স্বরূপবত্তা নাই। অবশ্য পাশ্চাত্যের নকল-করা অনেক রকম ভাব অজীর্ণাবস্থায় উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে, যথা রাজনৈতিক জাতীয়ত্ব, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি। ইহাতে মস্তিষ্কের বোঝাই বাড়িয়াছে, দৃষ্টিসঞ্চালন প্রখর ও দ্রুত হইয়াছে, রসনার উদ্গীরণশক্তি দশগুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু সেকালের মানুষ অপেক্ষা যে একালের মানুষ বড় হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? বরং এখনও যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, মানুষ সচরাচর পূর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপ্রিয়, বিরোধপ্রিয় ও "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" হইয়াছে, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড হারাইতেছে, —এককথায় ভারতের সনাতন জীবনাদর্শ—যদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবনাদর্শ জগতে অন্যত্র কোথাও অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই জীবনাদর্শ—আধুনিক নব্যশিক্ষিতদের জীবনে ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া আসিতেছে।

সুখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যশিক্ষা ভারতীয় শিক্ষার পূর্ব্বসংস্কারকে একেবারে বিলুপ্ত ও তিরোহিত করিতে পারে নাই। ঐ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একটা আশ্চর্য্য রক্ষণ-শীলতা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ (rationalism) উন্নতির দোহাই দিয়া ঐ রক্ষণশীলতাকে কোণ-ঠেসা ও অপদস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু শশধর পণ্ডিত, বঙ্কিম-বাবু প্রভৃতির যুগে, রক্ষণশীলতার স্বপক্ষেই পাশ্চাত্য যুক্তিবাদকে প্রয়োগ করা অন্ততঃ কতক পরিমাণে যে সম্ভবপর, তাহা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বোধগম্য হইল। সেই সময় হইতে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রয়োগে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিবার একটী নূতন পথ নির্ম্মিত হইতে লাগিল; আজ পর্য্যন্ত অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী এই পথের পথিক হইয়াছেন।

কিন্তু এ পথ দিয়া ভারতীয় শিক্ষার (cultureএর) পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণ ও পূর্ণমর্য্যাদাস্থাপনের সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের যেমন গুণও আছে, তেমনি দোষও অনেক আছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসের অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রসূতি; সে অভিজ্ঞতার মধ্যে নূতনত্বও আছে, সংকীর্ণতাও আছে; সে অভিজ্ঞতার দ্বারা ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা ও জীবনলীলার মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভবপর নহে।

দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-জগৎ বর্ব্বরতায় নিমগ্ন ছিল; ভয় ও বলের তাণ্ডবলীলা এবং বিরোধাত্মক উত্তেজনা দ্বারা সেই বর্ব্বরতার যুগ পরিব্যাপ্ত ছিল। সে অবস্থায় মানবজীবনের কোনও উচ্চপরিণাম ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। কালে খৃষ্টধর্ম্মের ভ্রাতৃভাব ও তৎপ্রসূত সামঞ্জস্যনীতি সেই আদিম বিরোধ-প্রবণতাকে যদি প্রশমিত না করিত, যদি গ্রীস রোমের মনুষ্যোচিত উচ্চাঙ্গুশীলন পাশ্চাত্যজাতিদের উচ্চতর বৃত্তিসকলকে উদ্দীপিত না করিয়া দিত, যদি ইস্‌লামের শিক্ষাসম্বন্ধীয় সার্ব্বজনীনতার দৃষ্টান্তে নিতান্ত সংকীর্ণ গণ্ডীসমূহে আবদ্ধ উচ্চশিক্ষা ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শিক্ষাসঞ্চারের নবযুগ (renaissance) আনয়ন না করিত, তবে পাশ্চাত্য ইতিহাস গ্রীস

ও রোমের ইতিহাসেই পর্য্যবসিত হইত। পাঁচ ছয় শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যখন পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের অধিকার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তখন গ্রীসীয় ও রোমীয় অপরাবিদ্যাদির মূলে উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্বেরও অনুশীলন হইত। পরে যখন এই 'একচেটিয়া' বন্দোবস্ত ভাঙ্গিতে লাগিল, তখনও অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত সহজে ভাঙ্গে নাই। ইউরোপীয় মধ্যযুগের উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্ব কখনও সাধারণ-শিক্ষার অঙ্গীভূত হয় নাই। যে গ্রীসীয় ও রোমীয় শিক্ষা ধর্ম্মানুশীলনের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, জনসাধারণ তাহাকে বিযুক্ত ও পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকদের সহিত জনসাধারণের ব্যবধান আপোষে ভাঙ্গে নাই, সেইজন্য বিগত পাঁচ ছয় শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে যে জনসাধারণ সমুত্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মধ্যযুগের খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব আমরা দেখিতে পাই না। যে সময় হইতে পাশ্চাত্যশিক্ষা পাশ্চাত্য জনসাধারণের সম্পত্তি হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় হইতেই ধর্ম্মযাজকদের সহিত তাহাদের বিরোধও ধূমায়িত হইয়াছে, সেই সময় হইতে ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতিপত্তি ও প্রভাবও কমিয়া আসিয়াছে, এইরূপ অবস্থান্তর সংঘটনের মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উত্থান একটী আনুষঙ্গিক ব্যাপার।

বিগত পাঁচ ছয় শতাব্দীর মধ্যে যে পাশ্চাত্যশিক্ষার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে ইউরোপীয় মধ্যযুগের অধ্যাত্মমূলকতা স্থান পায় নাই। সে যুগের যাজকসম্প্রদায় সাধারণ লোককে কুসংস্কারাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; জনসাধারণ তাহারই প্রতিশোধরূপে আধুনিক নবজীবন লাভে খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ব্বগৌরব ও উচ্চাসন অবহেলা করিয়াছে এবং উহার নিয়ন্তৃত্ব বর্জ্জন করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষায় খৃষ্টধর্ম্ম একটী উল্লেখযোগ্য সহকারী বটে, কিন্তু সে সহকারীরও ডাক পড়ে যেন সুবিধামত, অবসরমত বা প্রয়োজনমত! পাশ্চাত্য আপনার ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে উপাদান করিয়া, কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল বুদ্ধি আপনার মস্তিষ্ক হইতে প্রয়োগ করিয়া, এবং আবশ্যকমত সমমতিবিশিষ্ট পাঁচজনে সমবেত হইয়া, আপনাকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে; যে ধর্ম্ম

তাহাকে ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে অধিক আস্থা স্থাপন করিতে বলে, যে ধর্ম্ম সিদ্ধি অসিদ্ধি বিচার না করিয়া সকলক্ষেত্রে সাধুবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে বলে, সে ধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্বের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার খাপ খাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সেই জন্য পাশ্চাত্যজগতের আধুনিক উন্নতির মূলে খৃষ্টধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব নাই,—সহকারিতা বেশীভাগ মুখের কথাতেই আছে।

শিক্ষা বা cultureএর মূল উদ্ভবস্থান অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই উহা উৎপন্ন ও পল্লবিত হয়। জড়-বিষয়সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই পাশ্চাত্যশিক্ষার উদ্ভবস্থান; ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য শিক্ষার একমাত্র পরম প্রমাণ। যে সত্য ঐরূপ প্রমাণের কাছে ধরা দেয় না, তাহা hypothesis বা আন্দাজ মাত্র। যদি কোনও দার্শনিক উচ্চতত্ত্বের সমীচীনতা পাশ্চাত্যে প্রতিপন্ন করিতে হয়, তবে জড়বিষয়ের প্রত্যক্ষক্ষেত্রে উহার যোগ্য ফল ফলাইয়া দেখাইতে হইবে। পাশ্চাত্য কেবল জড়বিজ্ঞানের ভাষা ও কৌশল বুঝে, কারণ, উহাই কেবল তাহার প্রমাণক্ষেত্রের এলাকার মধ্যে অবস্থিত। পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন নাই, কেবল অনুমান লইয়া তাহার কার-কারবার।

পাশ্চাত্য দর্শনে প্রত্যক্ষ দর্শনের নজির নাই বলিয়া, পাশ্চাত্য-জাতিদের জীবন আপনাকে দার্শনিকতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। যে মধ্যযুগের খৃষ্টধর্ম্ম অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শনের স্পর্দ্ধা রাখিত, তাহা ত অনেক পূর্ব্বেই যবনিকার আড়ালে সরিয়া পড়িয়াছে। অগত্যা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ, এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ থাকাতে জড়বিজ্ঞানই পাশ্চাত্যশিক্ষার ঔরসজাত পুত্র, সূক্ষ্মতত্ত্বের বা অধ্যাত্মের দর্শনশাস্ত্রাদি জড়বিজ্ঞানের অনুচর গোষ্ঠবর্গ।

ইন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্যশিক্ষায় সত্যের একমাত্র গ্রহীতা হওয়ায়, পাশ্চাত্যযুক্তিবাদের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় সত্য কখনই অনুমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠ প্রমাণের উপর দাঁড়াইতে পারে না।

যাহা শ্রেষ্ঠ প্রমাণে প্রমাণিত হয়, তাহার উপরই মানুষ জীবনতরী ভাসায়। অতএব জড়জগতের ফলাফল বিচার না করিয়া অতীন্দ্রিয় সত্যের উপর জীবনতরী ভাসাইতে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ কখনই মানুষকে উৎসাহিত করিবে না। বাস্তবিকই ইংরাজীশিক্ষিত দেশহিতৈষীদের মুখে অনেকস্থলেই শুনা যায় যে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই আমাদের দেশটা গোল্লায় গিয়াছে। এ সমস্ত পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের জের। এই পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতীয় ইতিহাস ও শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ করা যাইবে না। ভারতীয় শিক্ষা (culture) অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ও অতীন্দ্রিয় সত্যকে পরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে, সেইজন্য জড়-ক্ষেত্রের ফলাফলের অপেক্ষা না রাখিয়া অতীন্দ্রিয় সত্যের সাধনায় মানুষকে নিযুক্ত করে; যদি ইন্দ্রিয়াতীত সত্যই শ্রেষ্ঠ সত্য হয়, তবে ভারতীয় ইতিহাস ও শিক্ষা সহস্র বাহ্য উত্থানপতনের মধ্যেও ঐ সত্য-সম্ভূত অমরত্বে অমর হইয়া থাকিবে।

পাশ্চাত্য জাতিরা পাঁচ ছয় শতাব্দীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, অতএব ইহাদিগকে প্রাচীন না বলিয়া অর্ব্বাচীনই বলিতে হইবে। একটা জাতি যতই প্রাচীন হয়, ততই তদন্তর্ভুক্ত মানবের মনে সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি হয়, এবং সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত মত ও যুক্তির উপর একান্ত বা অন্ধ নির্ভর শীলতা কমিয়া আসে। প্রাচীনের মধ্যে একটা স্থৈর্য্য ও সতর্কতা থাকে, অর্ব্বাচীনের মধ্যে ততটা থাকে না। পাশ্চাত্যশিক্ষার মধ্যে ব্যক্তিগত মতস্বাতন্ত্র্যের গৌরব সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতার প্রতি ফিরিয়া চাহিবার অবসর দেয় না, উহার এমনই একটা চাঞ্চল্য আছে। এই মতস্বাতন্ত্র্যের ঔদ্ধত্য পাশ্চাত্যদের কার্য্যক্ষেত্রের সংহতিনিষ্ঠতার দ্বারা অনেকাংশে নিয়মিত হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশে ততটা অহিতকর হইতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাধীনমতের ধূয়া আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাকে ধৈর্য্যসহকারে বুঝিবার চেষ্টায় নব্যদিগকে উৎসাহিত না করিয়া অনবরত বিচিত্র মতামতের উদ্ভাবন ও ঘোষণায় উত্তেজিত করিতেছে। যে যুক্তিবাদে স্বাধীন

মতামতের গৌরব বহুযুগব্যাপী জাতীয় অভিজ্ঞতার গৌরব অপেক্ষা উচ্চাসন এত সহজে অধিকার করিতে পারে, সে যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও শিক্ষার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার সামর্থ্যলাভ করা যায় না। আর অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য জাতিগণ ইউরোপীয় মধ্য-যুগের পরেই ইউরোপীয় পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার ধারা ছিন্ন করিয়া,—খৃষ্টধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব বর্জ্জন করিয়া,—রাজা ও প্রজার স্বাধীনতার সামঞ্জস্যের দ্বারা নূতন ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছিল। সেই সমস্ত জাতি যুগযুগান্ত-প্রবাহিত অভিজ্ঞতাধারার গৌরব কিরূপে বুঝিতে পারিবে? এমন কি, ইংরাজজাতির মধ্যে ঐ অভিজ্ঞতার মর্য্যাদা ও তজ্জনিত স্থৈর্য্য যতটা বিদ্যমান, মার্কিনজাতির মধ্যে কি ততটা আছে?

পাশ্চাত্যদিগের অর্ব্বাচীনতার আর একটী কুফল পাশ্চাত্য ক্রম-বিকাশবাদে নিহিত দেখা যায়। এই ক্রমবিকাশবাদকে আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ ঐন্দ্রজালিকের যষ্টির মত জীবজগৎ ও জড়জগতের রহস্যোদ্ঘাটনে ব্যবহার করিতেছেন। এই ক্রমবিকাশবাদের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কেবল উহার একটা মূল কথার উল্লেখ করিব। জীব বা জড়ের মধ্যে যাহা বিকশিত ছিল না, তাহা কিরূপে বিকশিত হইল, ক্রমবিকাশবাদ তাহাই ব্যাখ্যা করে। এখন প্রশ্ন এই যে, যাহা বিকশিত হইল, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল কি না? বিকশিত হইবার পূর্ব্বে কোনও না কোনও ক্ষেত্রে তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না? পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ-বাদ বা অভিব্যক্তিবাদ এ প্রশ্নের মীমাংসায় উদাসীন, উহা ব্যক্ত পরিণাম লইয়াই ব্যস্ত, অব্যক্ত অবস্থা সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে না; অর্থাৎ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান evolution স্বীকার করে, involution স্বীকার বা গ্রাহ্য করে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, যে অবস্থায় কিছু ছিল না, সে অবস্থা অর্থাৎ অসৎ হইতে, যে অবস্থায় কিছু আছে সে অবস্থা অর্থাৎ সৎ হইল,—ইহাই পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্ত। যদি বল, উহা অব্যক্ত সম্বন্ধে কোনও মতামত দিতে চাহে না, অব্যক্ত সৎ কি অসৎ তাহাও বলিতে চাহে না, তবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ন্যায়াত্মকভাবে

একদেশদর্শী হইল, এরূপ অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের দ্বারা জড়তত্ত্বের বা জীবতত্ত্বের সমীচীন ব্যাখ্যান হওয়া অসম্ভব। Evolutionএর সঙ্গে সঙ্গে involution স্বীকার না করিলে জীবতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা বা মীমাংসা পাওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতীয় বিজ্ঞান বা পরিণামবাদ উক্ত দুইটী তত্ত্বই স্বীকার করে, সেই জন্য কালতত্ত্ব ও মানবীয় উন্নতি (human progress) সম্বন্ধে উহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ।

বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে দুইটী বিসদৃশ মতের জোড়াতাড়া দেওয়া আছে, একটী ভারতীয় স্ফোটবাদের প্রতিধ্বনি, আর একটী আকস্মিক সৃজন বা হুকুমদারীর সৃজন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ অনেক রকম সৃষ্টি-বাদের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যং, সংযোগ এষাং" ইত্যাদি। হুকুমদারীর সৃজন-ব্যাপার 'যদৃচ্ছা' সৃজনের সঙ্গে মিলে। "Let there be light and there was light"—ইহাকে হুকুমদারীর সৃজন বলিতেছি; 'আদিতে বাক্য ছিলেন' অর্থাৎ স্ফোটবাদের প্রতিধ্বনি—গ্রীকদিগের যোজনা। একটা শূন্যগর্ভ অসৎরূপ সূচনা হইতে উজ্জ্বল ব্যক্ত পরিণামের সঙ্ঘটন প্রাচীন পাশ্চাত্যজাতিদের কল্পনায় বিসদৃশ ঠেকিত না। তাহারা আপনাদের জীবনলীলার অতীত সূচনাকে বর্ব্বরতার দ্বারা তমসাচ্ছন্ন দেখিতে পায়; তাহাদের অনতিদীর্ঘ ইতিহাসে দুর্ভেদ্য অন্ধকার হইতে উন্নতির আলোক আসিয়াছে। অসৎ হইতে সতের আবির্ভাবরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের মজ্জাগত অভিজ্ঞতার সহিত নির্ব্বিবাদে খাপ খাইয়া যায়, নচেৎ আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য পরিণামবাদ evolutionএর সঙ্গে involutionএর যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিল না,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এ সত্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতাও অনুভব করিল না?

Involution অর্থাৎ অন্তর্নিহিত বা অব্যক্ত সত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। ব্যক্তভাব ও অব্যক্তভাব যাঁহারা উভয়ই স্বীকার করেন, তাঁহারা জাগতিক ও জৈবিক পরিণামকে যে চক্ষে

দেখেন, পাশ্চাত্ত্যেরা উহাকে সে চক্ষে দেখেন না। পাশ্চাত্ত্যেরা বিশ্ব-পরিণামের আদি হইতে অন্তের দিকে উন্নতির একটী সরল ঋজু রেখা টানিয়া যায়; এই আদিকে হয় তাহারা অগম্য বলিবে, না হয় পরমাণুর স্পন্দন বলিবে এবং অন্তকে হয় অসম্ভব বলিবে, না হয় আকস্মিক প্রলয় বলিবে। উন্নতির এই ঊর্দ্ধরেখার নীচের দিকে ধাপে ধাপে অসভ্যতা বর্ব্বরতা জড়ত্ব প্রভৃতি অবস্থিত এবং উপর দিকে ধাপে ধাপে উচ্চ হইতে উচ্চতর সভ্যতা অবস্থিত। আমরা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে, এ বিশ্বজগতে কোনও গতি সরলরেখাপন্ন নহে, কিন্তু মানবের উন্নতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা উন্নতির গতিকে সরলরেখা সদৃশ না ভাবিয়া গত্যন্তর দেখেন না। মানবীয় উন্নতিতত্ত্বের এইরূপ ধারণা হইতে, ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিশেষ বিশেষ রীতি গড়িয়া গিয়াছে। কোনও বিশেষ জাতি বা সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা চালাইতে হইলে, ক্রমবিকাশবাদ যতই তোমাকে তাহার অতীতের গর্ভে লইয়া যাইবে, ততই তাহার রীতি নীতি, আচার বিশ্বাস, শিক্ষাধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে গভীর হইতে গভীরতর অসভ্যতা দেখিতে হইবে, যদি না দেখ তবে তোমার অসঙ্গতিদোষ হইবে। ভূতপ্রেত ও মৃতের পূজা হইতে ভারতীয় বৈদিক দেবতাবাদ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তোমার বাহাদুরী, নচেৎ তুমি কুসংস্কারাপন্ন। মস্তিষ্কের ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা ও মজ্জাগত কুঁড়েমি হইতে প্রাচীনকালের অদ্বৈতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল, পরে শঙ্করাচার্য্য তর্কের জোরে উহাকে মাথায় তুলিয়াছেন,—এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে পারিলে ক্রমবিকাশবাদের দাবী পূরণ করা যায়, নচেৎ অত প্রাচীন যুগে দার্শনিক অদ্বৈততত্ত্বের প্রত্যক্ষজ্ঞানে মানুষ আরূঢ় হইবে—ইহা ঘোর অবৈজ্ঞানিক কল্পনা। আর অদ্বৈতবাদটাই যে একটা অসম্ভব কথা, শঙ্করাচার্য্যের যুগে ওরকম বাজে বাদবিতণ্ডা চলিতে পারিত, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে ও সমস্ত অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না। সত্য সত্যই আমাদের দেশের ঐতিহাসিক-ধুরন্ধরগণও এই রকম মতামত বা প্রলাপ লিপিবদ্ধ করিতেছেন, কেননা পাশ্চাত্য

ক্রমবিকাশবাদ তাঁহাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে; পাশ্চাত্য বাইওলজি (জীবতত্ত্ব), পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্বনীতি প্রভৃতির চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া তাঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র পর্য্যন্ত এই সকল লেখকের হঠকারিতা দেখিতে পান না।

যাঁহারা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া ভূতার্থবিচার (investigation of facts) করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ যে সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক হইবে, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের প্রয়োগে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্ববিধ পরিণামের দুইটী দিক্ রহিয়াছে; একটী ব্যক্ত-ক্ষেত্রে কার্য্যকারণের পরম্পরা, আর একটী সেই পারম্পর্য্যবিধায়িনী অব্যক্তশক্তি। আমরা কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সমবায়ে একটী কার্য্যকে উদ্ভূত হইতে দেখি, এরূপ পারম্পর্য্য যে কেন বা কাহার দ্বারা ঘটিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা অনুসন্ধান করে না, অতটা তলাইয়া দেখিতে চায় না, এককথায় বলে—উহাই nature বা স্বভাব। ভারতীয় পরিণামবাদ ঐ কার্য্যকারণের পারম্পর্য্যকে 'প্রকৃতির আপূরণ' বলে; ইহাতে একদিকে nature শব্দ-প্রয়োগে যে অক্ষমতা ঢাকা দেওয়া হয়, তাহার প্রতীকার হইল, (কারণ, দৃষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়া হটিয়া আসা বিজ্ঞানের উপযুক্ত কাজ নহে),—অপরদিকে, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয়, এরূপ অসম্ভব সিদ্ধান্তও নিরাকৃত হইল। "প্রকৃতির আপূরণ" বলিলে প্রথমতঃ একটী অব্যক্ততত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি স্বীকার করা হইল এবং ইহাও স্বীকার করা হইল যে,যাহা সেই প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে অঙ্গীভূত থাকে, তাহাই সকল পরিণামে কার্য্যরূপে ব্যক্তভাব ধারণ করে। পরিণাম-ব্যাপারে পূর্ব্ববর্ত্তী সমবায়ী কারণ নিমিত্তমাত্র হইলেই—"আবরণ ভেদ" হইয়া অব্যক্ত ব্যক্তভাব ধারণ করে। Evolution বা ক্রম-বিকাশ স্বীকার করিলে এই involution বা অব্যক্তভাব স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দোষ এই যে, যাহা নিমিত্ত বা

উপলক্ষমাত্র (condition), তাহাকেই উৎপাদক কারণ (cause) বলিয়া মান্য করে, ফলে যাহা কার্য্য (effect), তাহাকে প্রকৃত মর্য্যাদা দেওয়া হয় না, সে যে নিজ অস্তিত্বের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা-সমবায়ের উপর নির্ভর করে না, তাহা প্রকাশ রহিল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলে যে, বানর হইতে নর অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহাতে প্রকৃত-পক্ষে নরের বানরত্ব প্রতিপন্ন হইল, কিন্তু আসল কথা এই যে, নর যদি অব্যক্তভাবে প্রকৃতিতে পূর্ব্বেই না থাকিত, তবে লক্ষ লক্ষ যুগেও বানরের সাধ্য নাই যে, সে মানুষ অভিব্যক্ত করে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিল যে, আদিম মানুষ মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিত এবং জাগ্রৎকালে তাহাকে নৈবেদ্য দিয়া সম্মান করিত; এইরূপ মৃতের সম্মান হইতে এবং ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী নৈসর্গিক শক্তির তুষ্টিসাধনা হইতে ক্রমশঃ দেবারাধনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেবারাধনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যদি পূর্ব্ব হইতেই তাহার অব্যক্তসত্তা না থাকিত, তবে অসংখ্য যুগ ধরিয়া লক্ষ লক্ষ বর্ব্বর মানুষ যদি মরিত ও তাহাদের লক্ষ লক্ষ আত্মীয় যদি নৈবেদ্য দিয়া তাহাদের পূজা করিয়া আসিত, তাহা হইলেও দেবারাধনা বলিয়া কোনও ব্যাপারই জগতে প্রচলিত হইত না। কতকগুলি নিতান্ত সাধারণ বা হীন অনুষ্ঠানসমবায়ের সহিত উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের উদ্ভবকে যেন তেন প্রকারেণ সংযুক্ত করিয়া উহাদের মুখে তুড়ি দেওয়াটা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও অস্মদ্দেশীয় তৎশিষ্যপ্রশিষ্যদের একটা বেশ কৌতুকের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এ সমস্ত জঘন্য ব্যবহার পাশ্চাত্যশিক্ষায়ই সম্ভব, ভারতীয় শিক্ষায় নহে।

পাশ্চাত্য দেশের আদিম মানুষটী যেমন ছিল, জগতের সর্ব্বত্র ঠিক সেই রকম প্রকৃতির মানুষটীই যে আদিমযুগে বিদ্যমান থাকিবে, এরকম অনুমানের মূলে কি কোনও যুক্তি আছে? বৈচিত্র্য যে প্রকৃতির একটা প্রধান নিয়ম, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? অথচ পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ যখন যে দেশেরই পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে যাউক না কেন, পাশ্চাত্যের আদিম বর্ব্বরতা ও যুদ্ধপ্রিয়তাকে সেই দেশের আদিম যুগে ভাড়া করিয়া লইয়া যাইবে! সকল দেশেরই আদিমযুগে মানুষের জীবনজাল

যে নিতান্ত সরল, নিতান্ত উপকরণবিহীন ছিল, তাহা স্বীকার করিতে রাজি আছি ; কিন্তু সকল দেশের আদিম মানুষই যে পাশ্চাত্য আদিম মানুষের মত হিংস্র ও অশান্ত ছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণ কি ? যদি বল, অনৃশংসতা ও মনঃস্থৈর্য্য অনেকযুগব্যাপী পরিণামের ফল, তাহা হইলে পশুজগৎ হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইব যে, একই যুগে চাঞ্চল্য ও স্থৈর্য্য, হিংস্রতা ও অহিংস্রতা প্রভৃতি বৈচিত্র্য ভিন্ন ভিন্ন জন্তুতে লক্ষিত হইতেছে। আসল কথা, প্রত্যেক যুগেই ভাল মন্দের বৈচিত্র্য লইয়া জগৎ ভ্রাম্যমান। কোনও দেশের আদিমযুগে মৃত্যুবিভীষিকা হয়ত মৃতব্যক্তির অস্তিত্ব—অনস্তিত্ব পর্য্যন্তই মানুষের কৌতূহলকে আকৃষ্ট করিয়াছে, আবার এমনও নিশ্চয়ই হইতে পারে যে, সেই মৃত্যুবিভীষিকায় কোনও দেশের আদিম যুগে মানুষ মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্যোগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বলিতেছে যে "দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্" ইত্যাদি। তার পর ঋক্, যজুঃ, সাম কিছুতেই মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারিল না, তখন সেই বৈদিক আদিম মানুষ উদ্গীথ অবলম্বন করিয়া মৃত্যুাতিতীর্ষু হইল—"যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্।" উদ্গীথ কিরূপে সেই আদিম যুগে অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাও প্রকাশ আছে। উদ্গীথ কি ? না, "ওমিতি হ্যুদ্গায়তি।" এই মন্ত্র নাসিকা, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনে ধারণ বা ধ্যান করিয়াও যখন ফল হয় নাই, তখন মনেরও অতীত যে মুখ্যপ্রাণ, তাহাতে উহাকে ধারণ করায় অমৃতত্বের অবস্থা লাভ হইল (ছান্দোগ্য ১-২ খণ্ড)। মৃত্যুভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য, অমৃতত্বলাভ করিবার জন্য আদিম আর্য্যগণের এই যে অক্লান্ত উদ্যমপ্রকাশ, ইহাই প্রাচীন আর্য্যসভ্যতাকে একটা গভীর বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে ; এ বিশেষত্ব পাশ্চাত্য সভ্যতায় নাই। এই বিশেষত্বের ফলে প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে এমন অন্তর্মুখতা বিকশিত হইয়াছিল, যাহা জগতের ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ, আবৃত্তচক্ষু-

রমৃতত্বমিচ্ছন্”—অমৃতত্বলাভার্থে চক্ষু আবৃত্ত করিয়া ধীর সাধক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস এই যে অতুল গৌরবের দাবী করিতেছেন, কোন্ নিয়মের বলে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ সে গৌরব দান করিতে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহা আমরা জানিতে চাই। জগতের নানা প্রাচীন দেশের পুরাবৃত্তে অমৃতত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়; অমৃতত্বের সাধনা যে একটা নিতান্ত আজগুবি কথা, তাহা পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণও অসংশয়ে বলিতে পারেন না। কিন্তু অমৃতত্বলাভের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা কেবল ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রেই আমরা দেখিতে পাই, অন্যত্র নানা গল্পগুজবই প্রচলিত রহিয়াছে।

মৃত্যুরহস্য জগতের আদিম মানুষের চিত্তকে সর্ব্বত্রই গভীরভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। মানুষের স্বভাব চিরকালই বিচিত্র, অতএব সে আন্দোলনের ফল সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। এই আন্দোলনের ফলে বৈদিক ঋষির অনুসন্ধিৎসা ও সাধনা যেরূপ গতিলাভ করিয়াছিল, তাহা অনন্যসাধারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে অসম্ভব, সে কথা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ জোর করিয়া বলিতে পারে না। সেই অন্তর্মুখতা সাধন করিবার পক্ষে আধুনিক জগতের শিক্ষা বা জীবনযাত্রার জটিল উপকরণ অপরিহার্য্য নহে; সে সাধনার পক্ষে সভাসমিতির বক্তৃতা বা প্রস্তাব, খবরকাগজে লেখালেখি এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি—কিছুই অপরিহার্য্য নহে। জীবননির্ব্বাহের নিতান্ত সরল উপকরণ প্রচলিত থাকা সে সাধনার পক্ষে একটা ব্যাঘাত নহে। অনেক অধ্যয়ন, বহুবিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি না থাকাও সে সাধনার পক্ষে অনধিকারিত্ব প্রকাশ করে না; বরং রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া বুদ্ধিপরিপক্কতার যেরূপ আধুনিক পরিচয় দেওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যসাধক বলিতেছেন, “নানুধ্যায়াদ্বহূন্‌শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ”। অতএব আজকালকার intellectual enlightenment অর্থাৎ বহ্বধ্যয়নমূলক জ্ঞানবত্তাও সেই বহুপ্রাচীন আর্য্যঋষির সাধনার পক্ষে আবশ্যক হইতেছে না। চাই কেবল শান্তমন, শুদ্ধচিত্ত ও একনিষ্ঠতা; কিন্তু অভিব্যক্তিবাদ যদি বলিয়া বসে যে, সে সকল সম্পদ্‌ও বহুযুগব্যাপী ক্রমবিকাশের ফল, খৃষ্টপূর্ব্ব বহুশতাব্দীর

প্রাচীন জগতে সে সমস্ত উচ্চসম্পদ্ বিকশিত হইতে পারে না, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, খৃষ্টাব্দের সূচনা যাঁহার তিরোভাব হইতে গণিত হয়, ১৯০০ শত বৎসরেও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার মত আধ্যাত্মিক সম্পদ্ কুত্রাপিও কেন বিকশিত হইল না?

আসলকথা, পাশ্চাত্যসভ্যতা যাহাকে উন্নতি বলে, সে উন্নতির গতি পরমার্থমূলক নহে, অতএব ঐ উন্নতির স্তরে স্তরে পারমার্থিক উন্নতিও যে তদনুপাতে লক্ষিত হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার মাপকাটিতে ভারতীয় সভ্যতার পারমার্থিকতা যুগপরম্পরায় মাপিতে চেষ্টা করা নিতান্ত বিড়ম্বনা ও দর্পের কথা। অথচ এইরূপ অসম্ভব চেষ্টারও আজকাল বিরাম নাই, সেইজন্য ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের নানারকম অদ্ভুত বিশ্লেষণ চলিতেছে; দু একটা দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

অব্যক্তবাদ বা theory of involution স্বীকার করিলে, মানবসমাজের উন্নতিতত্ত্বসম্বন্ধে যেরূপ ধারণা লাভ করা যায়, তাহার সহিত ইতিহাসের, বিশেষতঃ ভারতীয় ইতিহাসের, অধিকতর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ মানবীয় উন্নতিকে ঋজুরেখাপন্ন বলিয়া ধারণা করে, আমরা কিন্তু জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া মানবীয় উন্নতির গতিকে ঐরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট দেখি না। এক একটা প্রাচীন দেশ বা জাতির উত্থানপতন লক্ষ্য করিলে বেশ মনে হয় যে, উন্নতির গতি অপর সর্ব্ববিধগতির মত যেন বৃত্তাংশ অঙ্কিত করে, অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে উত্থিত হইয়া উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের মত কিয়ৎকালের পর অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং ক্রমে আবার অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত, অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা"—ভৌতিক জীবনসম্বন্ধে গীতার এই উক্তি যেমন খাটে, এক একটা জাতি বা সমাজের জীবনসম্বন্ধে ইতিহাসও যেন ঠিক সেইরূপ সাক্ষ্য দেয়। মার্কিণসুধী এমার্সন সাহেব তাঁহার "বৃত্ত" নামক প্রবন্ধে এইরূপ গতির নিয়ম সুন্দরভাবে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ ব্যষ্টিসত্তা ও সমষ্টিসত্তা সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রকটিত

হয় যে, উহারা অব্যক্ত হইতে কারণ-সমবায়-সহযোগে উদ্ভূত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে এবং কালের অব্যর্থ প্রভাবে জরা বা অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া আবার অব্যক্তে বিলীন হয়। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু-র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—এই alternation of life and death,—জন্ম-মৃত্যুর পৌর্ব্বাপর্য্য,—মানবীয় ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব-কালে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

ভারতীয় পরিণামবাদে এই ব্যক্তাব্যক্ততত্ত্ব বহুপ্রাচীন কাল-হইতেই অঙ্গীভূত হইয়াছে। এইজন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব চতুর্যুগবিভাগ স্বীকার করে, কিন্তু ইহাও পুরাণে প্রকাশ আছে যে, কেবল ভারতের পক্ষেই এইরূপ কালবিভাগ খাটে, অন্য দেশের পক্ষে নহে। কারণ, ভারতেতিহাসে একটী পরম আদর্শের ব্যক্তভাব ও অব্যক্তভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমষ্টির অভ্যুদয় ও অধঃপতন সংঘটিত হয়, অন্যান্য দেশে উত্থানপতনের মূলে সেরূপ শ্রেষ্ঠ, অমর আদর্শ নিহিত থাকে না। এই জন্য অন্যান্য দেশের ইতিহাসও ভারতের মত দীর্ঘকালব্যাপী নহে। ভারতের চতুর্যুগের মধ্যে প্রত্যেক যুগেই আবার সনাতন শ্রেষ্ঠ আদর্শ আপনার অভিব্যক্তির ক্ষেত্ররূপে এক একবার একটা সাধক জনসমষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে ও উহার জীর্ণাবস্থায় উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাপর যুগে আপনার ব্যক্তভাব ক্রমশঃ ম্লান হওয়ায়, কলি-যুগে স্বীয় অভিব্যক্তির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল ব্যয়িত করিয়াছে। বিশেষ ধৈর্য্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভারতীয় পরিণামবাদ যে দৃষ্টিতে কালবিভাগ ও কালতত্ত্ব উদ্ভাবিত করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক, যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান জ্যোতিষ্ক, গ্রহ প্রভৃতির গতিসম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা করিতে-ছেন, তাহার সহিত উক্ত যুগবিবর্ত্তন বিধির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সে সমস্ত সূক্ষ্ম আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাহা হউক, সংক্ষেপে আমরা ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করিলাম যে, পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ বা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতীয় সনাতন শিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার কোনও আশা

নাই, বরং ঐরূপ সহায়তার উপর নির্ভর করিলে পদে পদে ভ্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা এক্ষেত্রে তিনটী কারণের নির্দ্দেশ করিলাম; প্রথম কারণ—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবকেন্দ্র ইন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষ, অপরন্তু ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবকেন্দ্র অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় কারণ—ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রাচীনতা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অর্ব্বাচীনতা। তৃতীয় কারণ—পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের অসম্পূর্ণতা।

যে শিক্ষা বা cultureএর উদ্ভবস্থান অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পরমার্থতত্ত্বের অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিকশিত ও অভিব্যক্ত হয়, পাশ্চাত্য কোনও কৌশল বা সাধনার নকল করিয়া সে শিক্ষা ও সভ্যতার পুনরভ্যুদয় সংঘটিত করা যায় না। পরমার্থতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে মূলভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত না পাইলে, সে শিক্ষা বা সভ্যতা (Civilisation) পুনরভ্যুদিত হয় না, নূতন নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে অজস্র টাকা সংগ্রহ করিলে কি ফলোদয় হইবে? জীবনাদর্শ বুঝানই ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, আদর্শজীবন গড়িয়া তুলাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি যুক্তিসহকারে ভারতীয় জীবনাদর্শ বুঝাইয়া দেওয়াই ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত, তবে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়াদি দ্বারা কাজ চলিতে পারিত।

প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধৃত আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের উক্তির মধ্যে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষার সংঘর্ষফলে প্রাচীনতন্ত্রের সংস্কারান্ধ হিন্দু ও নব্যতন্ত্রের পাশ্চাত্যভাবভাবিত বাবুর মধ্যে কিরূপ ব্যবধান ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই শিক্ষাসমস্যা পূরণ করিবার আশায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের (Rationalism) সাহায্যে ভারতীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্য-শিক্ষার পার্শ্বে স্থান দান করিবার চেষ্টাও যে অসম্ভব, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। আগামী প্রবন্ধে আমরা বুঝিতে চাই, ভারতীয় শিক্ষার উদ্ভবকেন্দ্র পরমহংসদেবের জীবনে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায়, উহা এমন প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র লাভ করিয়াছে যে, তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া উহা পাশ্চাত্য-শিক্ষার সহিত সংঘর্ষে যে কেবল জয়লাভ করিবে,

তাহা নহে, উহাকে যথাসম্ভব আপনার অঙ্গীভূত করিয়া, এক অভূতপূর্ব্ব নবাভ্যুদয়ের সূচনা করিবে।

সমালোচনা।

শান্তিপথ ও ধ্যানযোগ। শ্রীসেবানন্দস্বামী কর্ত্তৃক কাশী যোগাশ্রম (বেনারস সিটি) হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—শঙ্কর লাইব্রেরী, ২নং ছুতর পাড়া লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সকল মানবের মনই সংসারের সুখদুঃখে বিরক্ত হইয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও শান্তির নিমিত্ত লালায়িত হয়। তবে সাধারণ লোকে ক্ষণিক চৈতন্যলাভের পর আবার বিষয়সুখে মাতোয়ারা হইয়া শান্তির কথা ভুলিয়া যায়, বিরল কেহ কেহ সেই শান্তিলাভের পথ খুঁজিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। এইরূপ শান্তিপথের অন্বেষিগণ বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধান পাইবেন। যদিও এই গ্রন্থখানি উপনিষদ্, গীতা, পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে বিরচিত, তথাপি এমন সরল শুদ্ধ অথচ হৃদয়ের ভাষায় পুস্তকখানি লেখা হইয়াছে যে, পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থকার নিজে অনুভব করিয়া গ্রন্থখানি লিখিতেছেন। আমরা প্রায় আদ্যোপান্ত গ্রন্থখানি পড়িয়াছি—একটি বাজে বা অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক কথা পাই নাই। ইহা পাঠ করিলে মুমুক্ষুগণের চিত্তকে সেই অতীন্দ্রিয় শান্তিরাজ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিবে—বিষয়ী লোকও ইহা পাঠ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও অপূর্ব্ব চিত্তপ্রসাদ অনুভব করিবেন। হিন্দুশাস্ত্রই গ্রন্থকারের প্রধান অবলম্বন হইলেও বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে মধ্যে মধ্যে আবশ্যকীয় বিষয় উদ্ধৃত করায় তাঁহার বহুশাস্ত্রজ্ঞতা ও উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থশেষে কতকগুলি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক সঙ্গীতও সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি-

পাত্ত বিষয়—সংসারের তীব্র আকর্ষণ, বিবেক ও বৈরাগ্য-বলে কাটাইয়া সেই অতীন্দ্রিয় পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং উহা কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান—এই চতুর্ব্বিধ উপায়েই সাধিত হইতে পারে। গ্রন্থকার জটিল দার্শনিক বিচার পরিত্যাগ করিয়া অতি সরল ও উপাদেয় ভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি যে সাধারণের নিকট উপযুক্ত আদর পাইতেছে, তাহা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়াই অনুমিত হয়। আশা করি, ইহা সাধকমাত্রেরই নিত্যসহচর হইবে।

অশোকবনে সীতা। জনৈকা দুঃখিনী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বিরচিত। ১৬১নং বলরাম দের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীমন্মথনাথ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য।০ আনা।

সীতাচরিত্র চিরকালই হিন্দুর আদরের ও গৌরবের জিনিষ। আদি কবি বাল্মীকির অমিয় লেখনী হইতে প্রসূত হইয়া এই মহামহিমময় চরিত্র কত লেখক কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইল, কিন্তু তথাপি উহা যেন চিরনূতন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সীতা ভারতীয় সনাতন আদর্শের সাকার বিগ্রহ-স্বরূপিণী। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে লেখিকা সেই সীতাচরিত্রের কিয়দংশ আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখায় বিশেষ নিপুণতার পরিচয় না থাকিলেও লেখিকা যে অসার নাটক নভেল লিখিতে চেষ্টা না করিয়া সীতাচরিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহা খুব প্রশংসার বিষয়। আশা করি, তিনি সীতাচরিত্র আরও গভীরভাবে অধ্যয়নের চেষ্টা করিবেন এবং ভগবান্ তাঁহার কবিত্বশক্তি আরও বর্দ্ধিত করিয়া পাঠক পাঠিকার সমক্ষে ভগবতী সীতাদেবীর উজ্জ্বলতর চিত্র প্রদানে সমর্থা করিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

(স্বামী সারদানন্দ)

ঠাকুরের সাধনার শেষ চারি বৎসর।

জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর তৎপ্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরানাথ ঐ সেবার জন্য নিয়মিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক্, অনেক সময়ে ঠাকুরের নিদেশে অনেক অধিক ব্যয় করিয়া বসিতেন। দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতেও তিনি ঐরূপে ব্যয় করিতেন। কারণ, ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাঁহার শিক্ষায় সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেজন্যই দেখা যায়, ঠাকুর যখন তাঁহাকে সাধুভক্তদিগকে অন্নদান ভিন্ন দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র কম্বলাদি ও নিত্য-ব্যবহার্য্য কমণ্ডলু জলপাত্র প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঐ সকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের নিদেশেই বিতরিত হইবে, কর্ম্মচারী-দিগকে এইরূপ আদেশ দেন। আবার উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৯—৭০ সালেই মথুরানাথ ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে ঐরূপে সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ কার্য্যে রাণী রাসমণির কালীবাটীর অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বত্র সমধিক প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাণী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই কালীবাটী তীর্থপর্য্যটনশীল সাধু-পরিব্রাজকগণের

পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের স্থান-বিশেষ হইয়া থাকিলেও, এখন উহার সুনাম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকাগ্রণী সাধুভক্তসকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্য-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবা-পরিচালককে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐরূপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* এখানে তাহার পুনরুল্লেখ—'জটাধারী' নামক যে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রাম-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও 'শ্রীশ্রীরাম-লালা'-নামক শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। *সম্ভবতঃ তিনি ১২৭০ সালের শেষভাগে অথবা ১২৭১ সালের প্রারম্ভে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মূর্ত্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল; এবং শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ মূর্ত্তির বহুকাল পর্য্যন্ত সানুরাগ সেবায় তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এমন একটা অন্তর্ম্মুখী তন্ময়াবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতিঘন বালবিগ্রহ সত্যসত্যই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন! প্রথম প্রথম ঐরূপ দর্শন ক্ষণকালের জন্য মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে তিনি ঐ সাধনায় যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ঐ দর্শনও ততই ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়-সকলের ন্যায় নিত্যবিদ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐরূপে অন্যের অবিষয়ীভূত হইলেও, ভাবারূঢ় হইয়া বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে একপ্রকার নিত্য-সহচর-রূপে লাভ করিয়া এবং যদবলম্বনে ঐ দিব্য দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হয়, সেই রামলালা বিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক্ত

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়।

রাখিয়া, জটাধারী যদৃচ্ছাক্রমে ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামলালার সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে, বাল-রামচন্দ্রের ভাবঘন মূর্ত্তির যখন তখন দর্শন লাভ করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি নিত্য সদাসর্ব্বক্ষণ একটি ধাতুময় বালবিগ্রহের সেবা অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্য্যন্ত। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু জটাধারীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই ঐ স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গূঢ় রহস্য অবধারণ করিল, এবং ঠাকুর উহাতে জটাধারীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তাঁহার সেবার অনুকূল যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার তাঁহাকে সাহ্লাদে যোগাইতে লাগিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ঠাকুর তাঁহার নিকটে প্রতিদিন বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া, তাঁহার নিষ্ঠা-সংকৃত সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণও করিতে লাগিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্য মূর্ত্তির দর্শন পাইতেন, ঠাকুরও সেই মূর্ত্তির দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঐরূপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* সে যাহা হউক, ঠাকুর এবং জটাধারীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বন্ধ ক্রমে এইরূপে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে প্রকৃতিভাবে ভাবিত হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিত্যসঙ্গিনী-রূপে আপনাকে ধারণা করিয়া স্বহস্তে পুষ্পহারাদি গ্রন্থনপূর্ব্বক তাঁহার বেশভূষা করিয়া দেওয়া, গ্রীষ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামর বীজন করা, মথুরকে বলিয়া নূতন নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া এবং স্বয়ং স্ত্রীবেশ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার পরি-তৃপ্তির জন্য তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্য্যে তিনি এই সময়েই মনোনিবেশ করেন। অবশ্য ঐরূপ করিবার প্রবল প্রেরণা তাঁহার মনে স্বভাবতঃ উদয় হওয়াতেই ঠাকুর এখন ঐরূপ কার্য্যসকলের

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ২য় অধ্যায় ৫০ পৃষ্ঠা।

অনুষ্ঠান করিতেন। জটাধারীর এই কালে আগমনে ও তৎসহ আলাপে ঠাকুরের মনে বৈদেহীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি-প্রীতিও পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন তাঁহার যে ভাবঘন মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করিলেন, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের শৈশবাবস্থার প্রতিরূপ। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিভাবের প্রাবল্যে তাঁহার মন যে এখন ঐ দিব্য শিশুর প্রতি বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মাতা নিজ হৃদয়ে শিশুপুত্রের প্রতি যে অপূর্ব্ব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, ঠাকুর ঐ দিব্য শিশুর প্রতি অন্তরে সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন, ঐরূপ প্রীতি এবং প্রেমাকর্ষণই যে তাঁহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইয়া কিরূপে কোথা দিয়া সময় অতীত হইতেছে তাহা জানিতে দিত না, একথা নিঃসন্দেহ। কারণ, তাঁহার নিজমুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ অদ্ভুত উজ্জ্বল শিশু মধুময় নানা বালচেষ্টাদির দ্বারা ভুলাইয়া তাঁহাকে নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রয়াস পাইত, তাঁহার অদর্শনে ব্যথিত হইয়া আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সহিত যথা তথা গমনে উদ্যত হইত!

ঠাকুরের উদ্যমশীল মন কখন কোন কার্য্যের অর্দ্ধেক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থূল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁহার ঐরূপ স্বভাব, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় কোন ভাব উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিলে, তিনি উহার চরম সীমা পর্য্যন্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের অনুশীলন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিয়া বসিবেন, "কিন্তু উহা কি ভাল?—যখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মানবের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে?—দুর্ব্বল মানবের অন্তরে সু এবং কু— সকল প্রকার ভাবই যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের ঐ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কেবলমাত্র

সুভাবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা মানবের কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্ব্বদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।"

তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও, উত্তরে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চনৈক-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ভোগলোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি অতদূর বিশ্বাস স্থাপন কখনও যে কর্ত্তব্য নহে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে ভাবসংযমনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূরদৃষ্টি মূঢ় ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরকৃপায় বিরল কোন কোন সাধকের ঐ সংযম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজাবস্থা হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহাদিগের মন তখন কামকাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এককালে মুক্তিলাভ করিয়া কেবলমাত্র সুভাবসমূহের নিবাসস্থলরূপে পরিণত হয়। ঠাকুরও বলিতেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মানবের মনে তাঁহার কৃপায় তখন কোন কুভাবই আর মস্তকোত্তোলন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না—"মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন্ না।" ঐরূপ অবস্থাবিশিষ্ট মানব তৎকালে তাঁহার অন্তর্গত প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি না হইয়া বরং তদ্দ্বারা অপরের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হয়। কারণ, দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়া জগতের সমগ্র ভোগসুখাধিকার লাভকেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি না, অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট্ আমিত্বে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দেওয়ায়, ঐরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থসুখান্বেষণ এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। বিরাট্ ঈশ্বরের সর্ব্বকল্যাণকরী ইচ্ছাই সুতরাং ঐ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণসাধনের জন্যই বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধক তখন 'আমি

যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট্ পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থির-নিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না এবং ফলেও দেখা যায়, তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণই সর্ব্বদা সাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুরের ন্যায় অলোক-সামান্য মহাপুরুষদিগের প্রত্যক্ষসিদ্ধ উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যুষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেজন্যই ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনে-তিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তি-তর্ক না করিয়াই নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশ্বাসপূর্ব্বক অনেক সময়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই। বিরাট্ ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্রেচ্ছাকে সর্ব্বদা ঐরূপে অভিন্ন রাখিয়া, তাঁহারা মানবসাধারণের মনবুদ্ধির অবিষয়ীভূত বিষয়সকল সর্ব্বদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট্ মনে সূক্ষ্ম ভাবাকারে ঐসকল বিষয় পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে। আবার বিরাটেচ্ছার সর্ব্বদা সম্পূর্ণ অনুগত থাকায়, তাঁহারা এতদূর স্বার্থ ও ভয়শূন্য হয়েন যে, কি ভাবে কাহার দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর মন ধ্বংস হইবে তদ্বিষয় পর্য্যন্ত ঐপ্রকারে পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিলেও, ঐ বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না হইয়া পরম প্রীতির সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখ—শ্রীরামচন্দ্র, জনকতনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া, তাঁহাকে বনে বিসর্জ্জন করিলেন। আবার, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলে নিজ লীলাসম্বরণ অবশ্যম্ভাবী, একথা বুঝিয়াও ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'যদুবংশ ধ্বংস হইবে' পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতিরোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ঐ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথবা ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও ঐ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষপত্রান্তরালে সর্ব্বশরীর লুক্কায়িত করিয়া নিজ আরক্তিম

চরণযুগল এমনভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীর রক্ষা করিলেন।

মহামহিম বুদ্ধ, চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণে পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্বীকারপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনার দ্বারা তাহাকে অপরের ঘৃণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে সম্যক্ রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আরূঢ় হইলেন; অথবা স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলে, তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম শীঘ্র কলুষিত হইবে জানিতে পারিয়াও, মাতৃস্বসা আর্য্যা গৌতমীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে আদেশ করিলেন।

ঈশ্বরাবতার ঈশা, 'তাঁহার শিষ্য যুদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাঁহার শরীর ধ্বংস হইবে' একথা জানিতে পারিয়াও, তাহার প্রতি সমভাবে স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

এইরূপে অবতারপুরুষদিগের ত কথাই নাই, সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিয়াও আমরা ঐরূপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত পুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উদ্যমশীলতার এবং অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামঞ্জস্য করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বিরাটেচ্ছার অনুমোদনেই তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া উদ্যমের প্রকাশ হইয়া থাকে, নতুবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুষসকলের অন্তর্গত স্বার্থ-সংস্কার-সমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন, এমন এক পবিত্রভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থদুষ্ট ভাবসমূহের কখনও উদয় হয় না এবং ঐরূপ অবস্থা-সম্পন্ন সাধকেরা নিশ্চিন্তমনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন এবং ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অনুকরণীয় না হইলেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধককে নিজ জীবন পরিচালনে

বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র, ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য স্বার্থবাসনাকে ভ্রষ্ট বীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন আর উৎপন্ন করিতে পারে না, ঐরূপ পুরুষদিগের সংসারবাসনা তদ্রূপ সংযম ও দিব্য-জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহারা তাঁহাদিগকে আর কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে পারে না। ঠাকুরও বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়া লৌহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়া যাইলে, উহার হিংসাক্ষম আকার মাত্রই বর্ত্তমান থাকে, উহা দ্বারা হিংসাকার্য্য আর করা চলে না।

উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বলিয়াছেন, এইপ্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা সত্যসংকল্প হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অন্তরে উদিত সংকল্পমাত্রই তখন সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা ঋষিদিগের পূর্ব্বোক্ত কথায় কখনও বিশ্বাসবান্ হইতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সঙ্কুচিত হইলে অনুসন্ধানে জানা যাইত, তাহা ইতিপূর্ব্বে বাস্তবিকই দোষদুষ্ট হইয়াছে—কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত হইয়াছে, বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহজীবনে ধর্ম্মলাভ হইবে না বলিয়া অথবা অত্যল্পমাত্র ধর্ম্ম-লাভ হইবে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইলে, বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে—কাহাকেও দেখিয়া তাঁহার মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেব-দেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ ভাবের বা ঐ দেব-দেবীর অনুগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে—অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বলিলে, ঐ কথায় ঐ ব্যক্তি বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার জীবন এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ কত কথাই না তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক সময় ললনাজনোচিত দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া নিজ সম্বন্ধে ধারণাপূর্ব্বক অনুরূপ কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময় বাল্যরূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ও সেবাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বহুপূর্ব্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি নিজ সেব্য প্রভু ভিন্ন অন্য কোনভাবে আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্ত্তমানে ঐ দেবতার প্রতি পূর্ব্বোক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায়, তিনি এখন গুরুমুখে যথাশাস্ত্র ঐ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহ্লাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ঠাকুরও ঐ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্ত্তির দিব্যদর্শন লাভে অনুক্ষণ সমর্থ হইলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, পূর্ব্বোক্ত ভাবসহায়ে ঐ দিব্যমূর্ত্তির অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

"যো রাম দশরথকি বেটা,
ওহি রাম ঘট্‌-ঘট্‌মে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সবসে নেয়ারা।"

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতিশরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জগদ্রূপে নিত্য-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্, মায়ারহিত নির্গুণ স্বরূপেও নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত হিন্দী দোঁহাটি আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন, জটাধারী 'রামলালা'-নামক যে বালগোপাল বিগ্রহের এতকাল পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতে-

ছিলেন, তাহাও ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ, এখন হইতে ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিবেন বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া ঐ বিগ্রহের অপূর্ব্ব লীলাবিলাসের কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি,* এজন্য তৎপ্রসঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন, নিষ্প্রয়োজন।

বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্ষ লাভের জন্য ঠাকুর যখন পূর্ব্বোক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে তৎসকাশে অবস্থান করিতেছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত ঐ সকল পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি? এ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে, বাৎসল্যভাবে স্বয়ং আরূঢ়া হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে বালগোপালরূপে দর্শন-পূর্ব্বক সেবাদি করিতেন, ইত্যাদি কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তিতে বাৎসল্যভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলব্ধি এবং মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে ঐ সকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, ঠাকুরের মনে ঐ সকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্ততঃ নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারা যায়।

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ,—২য় অধ্যায় ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা এবং ৬১-৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বামীজির অস্ফুট স্মৃতি।

সে আজ ষোড়শ বর্ষ পূর্ব্বের কথা। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন হইতেই স্বামীজি চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই তৎসম্বন্ধীয় যে কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। তখন ২।৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি—কোনরূপ অর্থোপার্জ্জনাদিও করি না—সুতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদের বাটী গিয়া, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ ধর্ম্মতলায় ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ অফিসের বহির্দ্দেশে বোর্ডসংলগ্ন ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ পত্রিকায় স্বামীজির সম্বন্ধে যে কোন সংবাদ বা তাঁহার যে কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামীজি ভারতে পদার্পণ করা অবধি সিংহলে বা মান্দ্রাজে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রায় সব পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা—বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিষ্ট প্রভৃতি—যাঁহার যেরূপ ভাব—তদনুসারে কেহ বিদ্রূপচ্ছলে, কেহ উপদেশদানচ্ছলে, কেহ বা মুরুব্বিয়ানা ধরণে—যিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন, তাহাও প্রায় কিছুই জানিতে বাকি নাই।

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিবেন—আজ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে—তাই প্রত্যূষে উঠিয়াই শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত। এত প্রত্যূষেই স্বামীজির অভ্যর্থনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল—তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল—দেখিলাম, ইংরাজীতে মুদ্রিত দুইটী কাগজ বিতরিত হইতেছে—পড়িয়া দেখিলাম, লণ্ডনবাসী ও আমে-

রিকাবাসী তাঁহার ছাত্রবৃন্দ তাঁহার বিদায়কালে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে অভিনন্দনপত্রদ্বয় প্রদান করেন, ঐ দুইটী তাহাই। ক্রমে স্বামীজির দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল—ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল—সকলেই পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসিতেছেন—স্বামীজির আসিবার আর কত বিলম্ব। শুনা গেল—তিনি একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণে আসিবেন, আসিবার আর বিলম্ব নাই। ঐ যে—গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছে—ক্রমে সশব্দে ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল।

স্বামীজি যে গাড়ীখানিতে ছিলেন, সেটী যেখানে আসিয়া থামিল—সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ী থামিল—দেখিলাম, স্বামীজি দাঁড়াইয়া সমবেত সকলকে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিলেন—তখন ট্রেণমধ্যস্থ স্বামীজির মূর্ত্তি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তার পরেই অভ্যর্থনাসমিতির নরেন্দ্রনাথসেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া কিছু দূরবর্ত্তী একখানি গাড়ীতে উঠাইলেন—অনেকে স্বামীজিকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানটায় খুব ভিড় হইয়া গেল। এদিকে সকল দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতই "জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকি জয়" "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকি জয়"—এই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়া জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন ষ্টেশনের বাহিরে পঁহুছিয়াছি, তখন দেখি—অনেকগুলি যুবক স্বামীজির গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে—আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম—ভিড়ের জন্য পারিলাম না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামীজির গাড়ীর সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ষ্টেশনে স্বামীজিকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনামসঙ্কীর্ত্তনদলকে দেখিয়াছিলাম—রাস্তায় একটী ব্যাণ্ড বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্বামীজির সঙ্গে চলিল, দেখিলাম। রিপণ কলেজ

পর্য্যন্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা লতাপাতা পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল—গাড়ী আসিয়া রিপণ কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। এইবার স্বামীজিকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম—তিনি মুখ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে—তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র। দুইখানি গাড়ী—একটীতে স্বামীজি, এবং মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার্—মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়ীতে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন। অপরটীতে গুডউইন, হ্যারিসন (সিংহল হইতে স্বামীজির সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাহেব), জি. জি, কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক ৩ জন মান্দ্রাজি শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইবার পরই অনেকের অনুরোধে স্বামীজি রিপণকলেজবাটীতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া ২।৩ মিনিট ইংরাজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হইল না—গাড়ী বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাটীর দিকে ছুটিল—আমিও মনে মনে স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

*　　　*　　　*　　　*

আহারাদির পর মধ্যাহ্নে চাঁপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দ) বাটীতে গেলাম। তথা হইতে খগেন ও আমি তাহাদের একখানি টমটমে চড়িয়া পশুপতি বসুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্বামীজি উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন—বেশী লোকজনকে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত পরিচিত স্বামীজির অনেক গুরুভাইএর সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীজির নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করিয়া দিলেন—"এরা আপনার খুব admirer."

স্বামীজি ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতি বাবুর দ্বিতলস্থ একটী সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন—অন্যান্য স্বামিগণ

উজ্জ্বল গৈরিক বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছিলেন। মেজে কার্পেটমোড়া ছিল—আমরা প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম। স্বামীজি যোগানন্দ স্বামীর সহিত তখন কথা কহিতেছিলেন—আমেরিকা ইউরোপে স্বামীজি কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল—স্বামীজি বলিতেছিলেন—

"দেখ্ যোগে, দেখ্‌লুম কি জানিস্?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা কচ্চে। আমাদের বাপ দাদারা সেইটেকে religionএর দিকে manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest কচ্চে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্চে মাত্র।"

খগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগা দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন—"এ ছেলেটীকে বড় sickly দেখ্‌ছি যে।"

স্বামী শিবানন্দ। এটী অনেক দিন থেকে chronic dyspepsiaতে ভুগ্‌ছে।

স্বামীজি। আমাদের বাঙ্গালা দেশটা বড় sentimental কিনা—তাই এখানে এত dyspepsia.

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিলাম।

* * * *

স্বামীজি এবং তাঁহার শিষ্য মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার্ কাশীপুরে ৺গোপাল লাল শীলের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। স্বামীজির মুখের কথাবার্ত্তা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে করিয়া কয়েক দিন গিয়াছিলাম। তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়—প্রথম এই বাগান-বাটীর একটী ঘরে। স্বামীজি আসিয়া বসিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়াছি—সেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামীজি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কি তামাক খাস্?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞে না।" তাহাতে স্বামীজি বলিলেন, "হাঁ,

অনেকে বলে—তামাকটা খাওয়া ভাল নয়—আমিও ছাড়্‌বার চেষ্টা কচ্চি।”

আর একদিন স্বামীজির নিকট একটী বৈষ্ণব আসিয়াছেন—তাঁহার সহিত স্বামীজি কথা কহিতেছেন—আমি একটু দূরে রহিয়াছি—আর কেহ নাই। স্বামীজি বলিতেছেন—“বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী—অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এক নির্জ্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।” তার পর স্বামীজি ত্যাগ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—“যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের ভাব তেমন উজ্জ্বলরূপে প্রচার নাই, তাহাদের ভিতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে—যথা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়।”

আর একদিন গিয়াছি—দেখি—অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন এবং একটী যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। যুবকটী বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটীর গৃহে থাকে, সে বলিতেছে—আমি নানা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি—কিন্তু সত্য কি, নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। স্বামীজি অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিতেছেন—“দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মত অবস্থা ছিল—তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি কি রকমই বা করেছিলে—বল দেখি?” যুবক বলিতে লাগিল—“মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর-নামক একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন—তিনি আমায় মূর্ত্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন—আমিও তদনুসারে দিন কতক খুব পূজা অর্চ্চনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে শান্তি পাইলাম না। সেই সময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন—দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য করিবার চেষ্টা কর দেখি—তাহাতে পরম শান্তি পাইবে—আমি দিন কতক সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলাম—কিন্তু তাহাতেও আমার মন শান্ত হইল না। আমি, মহাশয়, এখনও একটী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া যতক্ষণ সম্ভব বসিয়া থাকি—কিন্তু

শান্তিলাভ কিছুতেই হইতেছে না—বলিতে পারেন—কিসে শান্তি হয় ?"

স্বামীজি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"বাপু, আমার কথা যদি শুন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটী খুলে রাখ্‌তে হবে। তোমার বাড়ীর কাছে—পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে। তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা কর্ত্তে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ পথ্য যোগাড় করে দিলে ও শরীরের দ্বারা সেবা-শুশ্রূষা কল্লে। যে খেতে পাচ্চে না—তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ—মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও, বাপু, তা হলে, এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা কর্ত্তে পার্লে তুমি মনের শান্তি পাবে।"

যুবক। আচ্ছা মহাশয়, ধরুন, আমি একজন রোগীর সেবা কর্ত্তে গেলাম—কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার করে—আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে ?

স্বামীজি এতক্ষণ যুবকটীর সহিত স্নেহপূর্ণস্বরে সহানুভূতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—এই শেষ কথাটীতে একটু বিরক্ত হইলেন, বোধ হইল। তিনি একটু বিদ্রূপের ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"দেখ বাপু, রোগীর সেবা কর্ত্তে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা করুচ—কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্চে এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝ্‌তে পারুচেন যে, তুমি এমন কোরে রোগীর সেবা কোনকালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে যাবে।"

যুবকটীর সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। আমরা বুঝিলাম—লোকটী—'জাঁতি' শ্রেণীর লোক—অর্থাৎ জাঁতি যেমন যা পায়, তাই কাটে, সেইরূপ এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা কোন সদুপদেশ শুনিলেই তাহার খুঁত কাটে বা ঐ উপদিষ্ট বিষয়ের মধ্যে দোষভাগ দেখিতেই অগ্রে ছুটিয়া যায় এবং যত ভাল কথাই তাদের বল না কেন, সব তর্কযুক্তি করে কেটে দেয়।

আর একদিন মাষ্টার মহাশয়ের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা শ্রীম–) সঙ্গে কথা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন, "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে ত মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ—সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান—তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে ও লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি ?"

স্বামীজি, বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন—"মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নহে ? আত্মা ত নিত্যমুক্ত—তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি ?"

মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বুঝিলাম, মাষ্টার মহাশয় দয়া, সেবা, পরোপকার ইত্যাদি ছাড়িয়া সর্ব্ববিধ অধিকারীর জন্যই জপ তপ ধ্যান ধারণা বা ভক্তির ব্যবস্থা করিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু স্বামীজির মতে মুক্তিলাভের জন্য ঐগুলির অনুষ্ঠান একপ্রকার অধিকারীর পক্ষে যেরূপ একান্ত আবশ্যক, এমন অনেক অধিকারী আছে, যাহাদের পক্ষে আবার পরোপকার, দান, সেবা ইত্যাদির তদ্রূপই প্রযোজন। একটীকে উড়াইয়া দিতে গেলে অপরটীকেও উড়াইয়া দিতে হয়,—একটীকে লইলে অপরটীকে না লইয়া উপায় নাই। স্বামীজির ঐরূপ প্রত্যুত্তরে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল, মাষ্টার মহাশয় দয়া সেবাদিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অথচ ধ্যান ভজনাদিকে রাখিয়া সঙ্কীর্ণভাবের পোষকতা করিতেছিলেন। স্বামীজির উদারহৃদয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধি যেন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তিনি মুক্তিলাভের চেষ্টাকে পর্য্যন্ত মায়ার অন্তর্গত বলিয়া অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিলেন এবং দয়া সেবাদির সহিত উহাকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়া কর্ম্মযোগের পথিককে পর্য্যন্ত আশ্রয় দিলেন।

Thomas a Kempisএর Imitation of Christ এর প্রসঙ্গ উঠিল। অনেকেই জানেন, স্বামীজি সংসার ত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চর্চ্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থান কালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামীজির দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটী সাধক-

জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা সর্ব্বদা উহার আলোচনা করিতেন। স্বামীজি ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন সাহিত্যকল্পদ্রুম নামক মাসিকপত্রে উহার একটী সূচনা লিখিয়া ঈশানুসরণ নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। সূচনাটী পড়িলেই স্বামীজি ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, বুঝা যায়। বাস্তবিকই উহাতে বিবেক বৈরাগ্য, দীনতা, দাস্য ভক্তি, আর্ত্তি প্রভৃতির এত শত শত জ্বলন্ত উপদেশ আছে যে, যিনিই উহা পাঠ করিবেন, তাঁহারই হৃদয়ে সেই ভাব কিছু না কিছু উদ্দীপিত হইবেই হইবে। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামীজির উক্ত গ্রন্থের উপর এখন কিরূপ ভাব জানিবার জন্য উহার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রসঙ্গ পাড়িয়া বলিলেন, নিজেকে ঐরূপ একান্ত হীন ভাবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে! স্বামীজি শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস করিতেছি—আমরা যে জ্যোতির তনয়।"

তাঁহার ঐরূপ প্রত্যুত্তরে বুঝিলাম, স্বামীজি উক্ত গ্রন্থোক্ত ঐ প্রাথমিক সাধনসোপান অতিক্রম করিয়া সাধনরাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে তখন উপনীত হইয়াছেন।

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম—সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উহাদেরও সহায়তায় তিনি উচ্চ ধর্ম্মভাব প্রচারের চেষ্টা করিতেন—

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুগণ যাঁহাকে রামলাল দাদা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজি একখানি চেয়ার আনাইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন ও স্বয়ং পায়চারি করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাহাতে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনি বসুন, আপনি বসুন।" স্বামীজি কিন্তু কোন মতে ছাড়িবার পাত্র নহেন—অনেক বলিয়া কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন

ও স্বয়ং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন—"গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" দেখিলাম—এত ঐশ্বর্য্য, এত মান পাইয়াও আমাদের স্বামীজির এতটুকু অভিমানের আবির্ভাব হয় নাই। আরও বুঝিলাম—গুরুভক্তি এই-রূপেই করিতে হয়।

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে—স্বামীজি একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বসিয়া আছেন—সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার দুটা কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব—অথচ সেখানে আর কোন আসন নাই, যাহাতে ছেলেদের বসিতে বলিতে পারেন—কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বসিতে হইল। স্বামীজির বোধ হয় মনে হইতেছিল—ইহাদিগকে বসিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু আবার বুঝি তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তা বেশ, তোমরা বেশ বোসেছো—একটু একটু তপস্যা করা ভাল।"

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বর্দ্ধনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডী বাবু Hindu Boys' School নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের সত্বাধিকারী—তাহাতে ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করান হয়। তিনি পূর্ব্ব হইতেই খুব ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, পরে স্বামীজির বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন—পূর্ব্বে সময়ে সময়ে ধর্ম্মসাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া সংসার পরিত্যাগেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই। দিন কতক সখের থিয়েটারে অভিনয়াদি এবং এক আধখানি নাটক রচনাও করিয়াছিলেন। ইনি একটু ভাবপ্রবণ ধাঁতের লোক ছিলেন। বিখ্যাত Democrat Edward Carpenter ভারতভ্রমণকালে ইহার সহিত আলাপ পরিচয় এবং তাঁহার Adam's Peak to Elephanta নামক গ্রন্থে চণ্ডী বাবুর সহিত আলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাঁহার একখানি চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

চণ্ডী বাবু আসিয়া স্বামীজিকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"স্বামীজি, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?"

স্বামীজি। যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই

তোমার গুরু। দেখ না—আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিয়েছিলেন।

চণ্ডী বাবু। আচ্ছা স্বামীজি, কৌপীন পরলে কি কাম দমনের বিশেষ সহায়তা হয়?

স্বামীজি। একটু আধটু সাহায্য হতে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে কাম বাহ্য কোন উপায়ে একেবারে যায় না। তবে কি জান—যতক্ষণ লোকে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা স্বভাবতঃই করে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকতে অনেক দিন লাগে।

ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে চণ্ডী বাবু স্বামীজিকে নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, স্বামীজিও অতি সরল ভাবে সব কথা বুঝাইয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। চণ্ডী বাবু ধর্ম্মসাধনার জন্য অকপটভাবে চেষ্টা করিতেন—কিন্তু গৃহী বলিয়া সব সময় মনের মত উহার সাধনা করিতে পারিতেন না—বিশেষতঃ, ব্রহ্মচর্য্য—ধর্ম্মসাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকিলেও কার্য্যকালে সম্পূর্ণভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু ছেলেদের লইয়া সদা সর্ব্বদা অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকায়, ধর্ম্মসাধনা ও সৎশিক্ষার অভাবে এবং কুসঙ্গের প্রভাবে অতি অল্পবয়স হইতেই তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে নষ্ট হয়, তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন এবং কি উপায়ে উহা তাহাদের ভিতর পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। কিন্তু "স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়েৎ"? সুতরাং কোনরূপে নিজের ও পরের ভিতর ব্রহ্মচর্য্যভাব প্রবেশ করাইতে অসমর্থ হইয়া সময় সময় বড়ই কাতর হইতেন—এক্ষণে পরম ব্রহ্মচারী স্বামীজির অকপট উপদেশাবলী ও ওজস্বিনী বাণী শ্রবণ করিয়া হঠাৎ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল—এই মহাপুরুষ একবার মনে করিলে আমাদের ও বালকগণের

ভিতর সেই প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যভাব নিশ্চিত উদ্দীপিত করিয়া দিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইনি একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ পূর্ব্বোক্তভাবে উত্তেজিত হইয়া ইংরাজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"Oh Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust" অর্থাৎ "হে আচার্য্যবর! যে কাপট্যের আবরণে আমাদিগের যথার্থ স্বভাব গোপন করিয়া আমরা অন্যের নিকটে শিষ্ট শান্ত বা সভ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেছি, তাহা নিজ দিব্যশক্তিবলে ছিন্ন করিয়া ফেলুন এবং লোকের ভিতর যে ঘোর কাম-প্রবৃত্তি বিরাজ করিতেছে, যাহাতে তাহার সমূলে উৎপাটন হইতে পারে—তাহা শিক্ষা দিন্।"

স্বামীজি চণ্ডীবাবুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিলেন।

পরে Edward Carpenterএর প্রসঙ্গ পড়িল। স্বামীজি বলিলেন, "লণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। আরও অনেক Socialist, Democrat প্রভৃতি আসিতেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্ম্মে তাঁদের নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।"

স্বামীজি উক্ত Carpenter সাহেবের Adam's Peak to Elephanta নামক গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চণ্ডীবাবুর ছবিটীর কথা তাঁহার মনে পড়িল—বলিলেন—"আপনার চেহারা যে বইএ আগেই দেখেছি।" আরও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজি বিশ্রামের জন্য উঠিলেন—উঠিবার সময় চণ্ডীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"চণ্ডীবাবু, আপনারা ত অনেক ছেলের সংশ্রবে আসেন—আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?" চণ্ডীবাবু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন—স্বামীজির কথার সম্পূর্ণ মর্ম্মপরিগ্রহ করিতে না পারিয়া স্বামীজি যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, অগ্রসর হইয়া তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন—"সুন্দর ছেলের কথা কি বলিতেছিলেন?" স্বামীজি

বলিলেন, "আমি চেহারা দেখ্‌তে ভাল—এমন ছেলে চা'চ্চি না—আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্ম্মঠ, সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে—তাদের train কর্ত্তে চাই—যাতে তারা নিজেদের মুক্তি সাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।"

আর একদিন গিয়া দেখি, স্বামীজি ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন, শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামিশিষ্যসংবাদ-প্রণেতা) স্বামীজিব সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন। আমাদের স্বামীজিকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অতিশয় কৌতূহল হইল। প্রশ্নটী এই—অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি? আমবা শরৎ বাবুকে স্বামীজির নিকট ঐ প্রশ্নটী উত্থাপিত কবিতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসব হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা কবিলেন। আমবা শরৎ বাবুব পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামীজির নিকট যাইয়া—তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তব দেন, তাহা শুনিতে লাগিলাম। স্বামীজি উক্ত প্রশ্নেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "বিদেহমুক্তিই যে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা—ইহা আমার সিদ্ধান্ত—তবে আমি সাধনাবস্থায় যখন ভাবতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জ্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কত বাব মুক্তি লাভ হল না বলে প্রায়োপবেশন কবে দেহত্যাগ করবাব সঙ্কল্প কবেছি, কত ধ্যান, কত সাধন ভজন কবেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাক্‌ছে, ততদিন আমার নিজেব মুক্তিব কোন প্রয়োজন নাই।"

আমি স্বামীজির উক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপাব করুণার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম, আরও ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি এক-জন অবতার? আরও মনে হইল—স্বামীজি এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় উঁহার মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নাই।

আর একদিন আমি ও খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) সন্ধ্যার পর গিয়াছি। হরমোহন বাবু (ঠাকুরেব ভক্ত) আমাদিগকে স্বামীজিব

সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, "স্বামীজি, ইঁহারা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।" হরমোহন বাবুর বাক্যের প্রথমাংশ সম্পূর্ণ সত্য হইলেও, দ্বিতীয়াংশটী কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত ছিল। কারণ, আমরা গীতাটাই তখন কতকটা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু বেদান্তের ছোটখাট কয়েকখানা গ্রন্থ ও দুই একখানা উপনিষদের বঙ্গানুবাদ একটু আধটু দেখা ছাড়া ঐ সকল শাস্ত্র ছাত্রের মত উত্তমরূপে আলোচনা করি নাই অথবা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষ্যাদির সাহায্যে পড়ি নাই। যাহা হউক, স্বামীজি বেদান্তের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হ্যাঁ, একটু আধটু দেখেছি।"

স্বামীজি। কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?

আমি মনের ভিতর হাতড়াইয়া আর কিছু না পাইয়া বলিয়া ফেলিলাম—"কঠ উপনিষদ্ পড়েছি।"

স্বামীজি। আচ্ছা, কঠটাই বল—কঠ উপনিষদ্ খুব grand—কবিত্বপূর্ণ।

কি সর্ব্বনাশ! স্বামীজি বুঝি মনে করিয়াছেন, কঠ উপনিষদ্ আমি কণ্ঠস্থ করিয়াছি—আমাকে তাহা হইতে খানিকটা আবৃত্তি করিতে বলিতেছেন। অথচ উহার সংস্কৃতটা একটু আধটু দেখিলেও কখন অর্থ বুঝিয়া পড়িবার বা মুখস্থ করিবার চেষ্টা করি নাই। বড়ই ফাঁপরে পড়িলাম। কি করি! হঠাৎ একটা বুদ্ধি যোগাইল। ইহার কয়েক বৎ পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যহ নিয়ম করিয়া কিছু কিছু গীতাপাঠ করিতাম। তাহার ফলে গীতার অধিকাংশই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ভাবিলাম—যাহা হউক কয়েকটা শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি না করিলে আর স্বামীজির নিকট মুখ দেখাইবার যো নাই। সুতরাং বলিয়া ফেলিলাম—"কঠটা কণ্ঠস্থ নাই—গীতা হইতে খানিকটা বলি"—

স্বামীজি। আচ্ছা, তাই বল।

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা" হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুনের সমুদয় স্তবটা আওড়াইয়া দিলাম।

শুনিয়া স্বামীজি উৎসাহ দিবার জন্য "বেশ, বেশ" বলিতে লাগিলেন। ইহার পর দিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজির দর্শনার্থ গিয়াছি। রাজেনকে বলিয়াছি, "ভাই, কাল স্বামীজির কাছে উপনিষদ্ লইয়া বড় অপ্রস্তুত হইয়াছি। তোমার নিকট উপনিষদ্ কিছু থাকে ত পকেটে করিয়া লইয়া চল। যদি কাল্‌কের মত উপনিষদের কথা পাড়েন ত বাহির করিয়া তাহা হইতে পড়িলেই চলিবে।" রাজেনের নিকট একখানি প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ্ ও তাহার বঙ্গানুবাদ পকেট এডিশন ছিল—সেটি পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অদ্য অপরাহ্নে এবঘর লোক বসিয়াছিলেন—যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আজও—কিরূপে ঠিক স্মরণ নাই—কঠ উপনিষদেব প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বাহির করিয়া ঐ উপনিষদের গোড়াটা হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাঠের অন্তরালে স্বামীজি নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা—যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীকচিত্তে যমভবনে যাইতেও সাহসী হইয়াছিলেন,—বলিতে লাগিলেন। যখন নচিকেতার দ্বিতীয় বর স্বর্গপ্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন সেই খানটা বেশী না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় বরের স্থানটা পড়িতে বলিলেন—

নচিকেতা বলিতেছেন—মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ যাইলে কিছু থাকে কি না—তার পর যমের নচিকেতাকে প্রলোভন প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎসমুদয় প্রত্যাখ্যান। এই সব খানিকটা পড়া হইলে স্বামীজি তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন—ক্ষীণস্মৃতি যোড়শবর্ষে তাহার আর কিছু চিহ্ন রাখে নাই।

কিন্তু এই দুই দিনের উপনিষৎপ্রসঙ্গে স্বামীজির উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তাহার পর হইতে যখনই সুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব্ব স্বরলয় ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটী মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই।

যখন পরচর্চ্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চ্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই— তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষ—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ"।

"সেই একমাত্র আত্মাকে জান—অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর—তিনিই অমৃতত্বের সেতু।"

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজি সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

"সেখানে সূর্য্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারাও নহে, এই সব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।"

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশে আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজি আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
* * * * *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

"হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর।

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।”

যাহা হউক, আর এক দিনের ঘটনার বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া অদ্য পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এদিনের ঘটনা শরৎ বাবু তাঁহার স্বামিশিষ্যসংবাদে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি অদ্য দ্বিপ্রহরেই উপস্থিত হইয়াছি। দেখি—ঘরের ভিতর একঘর গুজরাটী পণ্ডিত—তাঁহাদেব নিকট স্বামীজি বসিয়া অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বিচাব কবিতেছেন। জ্ঞান ভক্তি নানাবিষয়িণী কথা হইতেছে—ইতিমধ্যে একটা গোল উঠিল—লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম—স্বামীজি সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ কি একটা ব্যাকরণের ভুল করিয়াছেন। তাই পণ্ডিত মহাশয়গণ জ্ঞানভক্তি-বিবেকবৈরাগ্যেব চর্চ্চা সব ছাড়িয়া দিয়া ঐ ব্যাকরণের খুঁত ধরিয়া “আমরা স্বামীজিকে হারাইলাম” বলিয়া খুব সোরগোল করিতেছেন ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। তখন শ্রীবামকৃষ্ণদেবের সেই কথা মনে পড়িল—“চিল শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তাদেব নজর থাকে গো-ভাগাড়ে।” যাহা হউক, স্বামীজি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“দাসোঽহং পণ্ডিতানাং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্।” খানিকক্ষণ বাদে স্বামীজি উঠিয়া গেলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়গণ গঙ্গায় হাত মুখ ধুইতে গেলেন। আমিও বাগানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গাতীরে গিয়াছি, শুনিতে পাইলাম, পণ্ডিতগণ স্বামীজির সম্বন্ধে কি আলোচনা করিতেছেন। শুনিলাম—তাঁহারা বলিতেছেন—“স্বামীজি তাদৃশ পণ্ডিত নন, তবে উঁহাব চক্ষুতে এক মোহিনীশক্তি আছে—সেই শক্তি-বলেই তিনি নানাস্থানে দিগ্বিজয় লাভ করিয়াছেন।”

ভাবিলাম, পণ্ডিতগণ ত ঠিক ধরিয়াছে। চক্ষুতে এ মোহিনী-শক্তি না থাকিলে কি এত বিদ্বান্, ধনী মানী, প্রাচ্য পাশ্চাত্য দেশীয় বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী দাসের ন্যায় ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে? এ ত বিদ্যায় নয়, রূপে নয়, ঐশ্বর্য্যে নয়—এ তাঁহার চক্ষের সেই মোহিনীশক্তিতে।

হে পাঠক, চক্ষে এ মোহিনীশক্তি স্বামীজির কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিবার জন্য যদি কৌতূহল হয়, তবে তাঁহার শ্রীগুরুর সহিত দিব্য সম্বন্ধ এবং অপূর্ব্ব সাধনবৃত্তান্ত একবার শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা কর—ইহার সন্ধান পাইবে।

শুদ্ধানন্দ।

ভক্ত গিরিশচন্দ্র।

(৪)

(শ্রী শ্রীশচন্দ্র মতিলাল।)

[স্বামী শ্রীসারদানন্দ কর্ত্তৃক সম্যক্ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।]

কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে ভক্তগণ যখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চিকিৎসার জন্য আনিয়া রাখিয়াছেন, সেই সময়ে ৺কালীপূজার দিন সমাগত হইবার কিছু পূর্ব্বে তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জন পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন, ঠাকুরের শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকিলে ঐ বাটীতেই ঐ পূজা সমাধা করিবেন। ইঁহাদিগের অন্যতম একজন প্রতি বৎসর নিজাবাসে ৺কালীপূজা করিতেন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছা তাঁহার মনে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল। ভক্তদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে ঠাকুরের রোগ কঠিন বলিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নির্দ্দেশ করিলেন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কয়েকজন পূজার সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাদিগের বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই—অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায়ে উপস্থিত সকল ভক্তদিগকেই ঐ দিন পূজা করাইয়া লইয়া তাঁহাদিগের অন্তর দিব্যানন্দে পূর্ণ করিয়াছিলেন। পূজার দিন প্রাতে ঠাকুর জনৈক ভক্তকে ফুল চন্দন বিল্বদল এবং মিষ্টান্নাদি পূজোপযোগী সমস্ত পদার্থ আহরণ করিতে বলায় ভক্তগণ মনে করিয়াছিলেন, ঠাকুর নিজেই পূজকের পদ গ্রহণ করিবেন। রাত্রিতে পূজাকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সমাহৃত পদার্থসকল ঠাকুরের সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ঐজন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর কিন্তু পূজোপযোগী দ্রব্যসকল সম্মুখে পাইয়াও নীরবে

বসিয়াছিলেন। গিরিশই ঐদিন ঠাকুরের মনোগত অভিপ্রায় প্রথম বুঝিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের শ্রীপদে বিল্বকুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া অপর সকল ভক্তকে ঐরূপ করিতে পথ দেখাইয়া দেন! অতঃপর ঘটনাটি গিরিশের নিজমুখেই সবিস্তারে পাঠকের শুনা ভাল।

"পীড়িত অবস্থায় প্রভু শ্যামপুকুরের একটী বাটী ভাড়া করিয়া আছেন। কালীপূজার দিন উপস্থিত হইল। ঠাকুব শ্রীমান্ কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'আজ কালীপূজার উপ-যোগী আয়োজন করিও।' কালীপদ অতি ভক্তির সহিত আয়োজন করিয়াছে। সন্ধ্যাব সময় প্রভুর সম্মুখে পূজাব উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত হইল। এক দিকে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী, প্রভু অন্ন আহার করিতে পাবিতেন না, তাহার জন্য বালিও আছে। অপর দিকে স্তূপাকার ফুল, রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক। পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ। ঘরের পশ্চিম প্রান্তে রামদাদা, আমি তাঁহার নিকট আছি। আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছট্‌ফট্ করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির। রাম দাদা আমায় কি বলিলেন, ঠিক আমার স্মরণ নাই। আমার প্রকৃত অবস্থা তখন নয়, কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে। রাম দাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'যাওনা—যাওনা!' রাম দাদার কথায় আমার আর সঙ্কোচ রহিল না, ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমায় দেখিয়া বলিলেন,—'কি, কি—এ সব আজ্ করতে হয়।' আমি অমনি 'তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই' বলিয়া, দুই হাতে ফুল লইয়া, জয় মা শব্দ করিয়া পাদপদ্মে দিলাম, অমনি সকল ভক্তই পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। প্রভু বরাভয়কর প্রকাশ হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। সে দৃশ্য যখন আমার স্মরণ হয়, রামদাদাকে মনে পড়ে। মনে হয়, রাম দাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।"*

* তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকা—৮ম বর্ষ, নবম সংখ্যা, পৌষ ১৩১১ সাল—'রামদাদা'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

ঐরূপে অকপট আন্তরিক বিশ্বাস ও হৃদয়ের স্বাভাবিক উদারতা-বলে গিরিশ অনেক বিষয় ভক্তদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে পারিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিজ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের নিকটে আমরা শুনিয়াছি। ঐ বিষয়ের অন্য একটি কথা এই প্রসঙ্গে আমাদিগের মনে উদয় হইতেছে। উহাতে শ্রীযুত গিরিশের লোকচরিত্র বুঝিবার এবং মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষের মনোমালিন্য দূর করিবার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি সেজন্য আমরা উল্লেখ করিতেছি—

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাশীপুর বাগানে অবস্থানকালে তাঁহার সেবার জন্য যে সকল যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের খরচপত্র ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণই প্রদান করিতেন। ঠাকুর ঐ স্থানে অবস্থান করায়, তাঁহার দর্শনার্থী অনেক নূতন লোকের সমাগম হইত এবং তাহাতে অনেক সময় ব্যয়াধিক্যও হইয়া যাইত। ঠাকুরের সমীপাবস্থিত সন্ন্যাসী ভক্তগণ ঠাকুরের পরিচর্য্যা ও সাধন ভজনে নিবিষ্ট থাকায়, অনেক সময়ে ঐ ব্যয়াধিক্য খাতাপত্রে লিখিয়া রাখিতে পারিতেন না। গৃহী ভক্তগণের অনেকে তাহাতে বিরক্ত হইতেন এবং প্রতি মাসে ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী ভক্তগণকেই দোষী সাব্যস্ত করিতেন। সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সংকল্প করিয়া বসিলেন, তাঁহারা এখন হইতে আর কোনরূপ হিসাব পত্র লিখিয়া রাখিতে পারিবেন না; তাঁহারা ঠাকুরের সেবার জন্যই ঘর দ্বার ছাড়িয়াছেন, অতএব তাহাই যথাসাধ্য করিবেন। ঐরূপে উভয় পক্ষের ভিতর একটা মনোমালিন্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, এমন সময়ে গিরিশ ঐ বিষয় জানিতে পারিলেন। পরস্পরের উদ্দেশ্য না বুঝাতেই ঐরূপ হইয়াছে একথা স্থিরনিশ্চয় করিয়া তিনি কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলেন। গিরিশ সর্ব্বাগ্রেই সন্ন্যাসী ভক্তগণের সম্মুখে বিবাদের মূলীভূত হিসাবের খাতাখানি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, গৃহী ভক্তদিগকে, যাঁহার যথাসাধ্য তাঁহার হস্তে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে হিসাব লইতে অনুরোধ করিলেন এবং নির্দ্ধারিত ব্যয়া-

পেক্ষা অধিক যাহা লাগিত, তাহা এখন হইতে স্বয়ং যেরূপে হউক প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। ফলে, এখন হইতে হিসাবপত্র আর লিখিয়া রাখিতে হইল না, অথচ সকল কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল।

গিরিশ যাহাকে বা যে বিষয় বিশ্বাস করিতেন, তাহা এত সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেন যে, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের ব্যক্তিবর্গে ঐ বিশ্বাস তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে সংক্রামিত হইয়া যাইত! ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া তিনি এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বত্র সকল সময়ে ঐ বিশ্বাসের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, এবং তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহার কর্ম্মস্থলের (রঙ্গালয়ের) অনেকেই—তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে না বলিলেও, ঐরূপ করিতে শিখিয়াছিল। শ্রীযুত গিরিশ কিন্তু তাহাতে ভুলিতেন না—তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি স্বল্পকালেই বুঝিয়া লইত, উহাদিগের মধ্যে কাহারা ঠাকুরকে বাস্তবিক বিশ্বাস করে এবং কাহারাই বা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া গিরিশ যেদিন হইতে স্বয়ং শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতেই তাঁহার মহদুদার প্রাণ নিত্য প্রার্থনা করিত, যাহাতে তাঁহার পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তিই ঠাকুরকে ধরিয়া তাঁহার ন্যায় শান্তিলাভ করেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন রঙ্গালয়ে কোন পুস্তকের অভিনয় দর্শন করিতে আসিতেন, তখন গিরিশের বিশ্বাস তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে বলিত, পতিতদিগকে উদ্ধার করিতেই পতিতপাবনের আগমন—অভিনয় দেখাটা একটা ভাণ মাত্র! গিরিশের সেদিন আর বিরাম থাকিত না, কোথায় কোন্ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রাণে ঠাকুরের প্রতি একটু বিশ্বাস হইয়াছে জানিয়াছেন, কোথায় কোন্ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী যুবক ঠাকুরের পদস্পর্শ করিবার প্রার্থনা সভয়ে তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছে—তাহাদিগের সকলকে একত্রিত করিয়া অবসর বুঝিয়া ঠাকুরের সমীপে আগমন করিয়া মনে মনে তাহাদের উদ্ধার-কামনা করতঃ তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ

করিতেন! গিরিশের প্রাণে তখন আর উল্লাসের অবধি থাকিত না। তিনি স্থির ধারণা করিতেন, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইল এবং এইজন্যই ঠাকুর তাঁহাকে রঙ্গালয়ে এই সকল হীনব্যক্তির মধ্যে রাখিয়াছেন! ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণ কখন কখন তাঁহার ঐ ধারণার বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপিত করিয়া যদি বলিতেন, 'বাসনার ঠেলায় পুস্তক রচনা ও থিয়েটারাদি করিতেছ, আর, বলিতেছ কি না, ঠাকুর আমাকে পতিতোদ্ধারের জন্য এইরূপ সাজে তাহাদের ভিতর রাখিয়াছেন!—ঐরূপ বলিতে লজ্জা করে না?'—গিরিশের বিশ্বাস তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে উত্তরে বলিতেন. 'আচ্ছা রোস্, তোদের দেখাচ্ছি এইবার, এইবার দেখা হলেই ঠাকুরকে ধরে বস্‌ছি যে, প্রতিবারেই আমি জগাই মাধাইয়ের সাজে কেন আস্‌বো? আগামী বারে আমায় ভাল ছেলের সাজে আন্‌তে হবে; এবার যাদের সন্ন্যাসীর সাজে এনেচ, তাদের ভিতর কাউকে আগামী বারে জগাই মাধাইয়ের সাজে এনো—হাম্ হর্‌দফে জগাই মাধাই নেহি হোঙ্গে।" বাস্তবিকই গিরিশ ভাবিতেন যে, ঠাকুর তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা সাজে সাজাইয়া সংসারক্ষেত্রে পতিতোদ্ধারের জন্য আবশ্যক মত আগমন করিয়া থাকেন, লীলাময়ের ঐরূপ লীলায় অন্য কাহারও কিছুমাত্র হস্ত নাই!

গিরিশের প্রবল বিশ্বাসের সংক্রামক শক্তিতে রঙ্গালয়ের সকল ব্যক্তিই প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মান্য করিতে শিখিয়াছিল। শুদ্ধ তাহা নহে, আমরা তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের মুখে শুনিয়াছি, গিরিশ, ঠাকুরের বর্ত্তমান কালে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ধারণা বা বিশ্বাস করিতেন, ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের অনেকের ভিতর ঐরূপ ধারণা ও বিশ্বাসের আবির্ভাব অনেক সময়ে হইতে দেখা যাইত। গিরিশ, ঈশ্বরাবতার ঠাকুরের শরীর, চিন্ময় বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ করিতে লাগিলেন—অপরে অনেকেও ঐরূপ করিতে লাগিলেন। তিনি—ঠাকুরের চিন্ময় দেহে রোগাধিকার নাই, অতএব ঠাকুরের গলরোগ একটা ভাণ মাত্র, বলিয়া স্থির করিলেন—অনেকে উহাই তাঁহাদিগেরও বিশ্বাস বলিয়া

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি, বকল্‌মা দিয়া সাধন ভজন করাটা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া স্থির করিলেন—অপরে কেহ কেহ উহাই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ঐজন্য গিরিশকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাসের সকল কথা নির্ব্বিচারে সকলের নিকট প্রকাশে অপরের অকল্যাণের সম্ভাবনা বুঝাইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন—একথা আমরা গিরিশ-চন্দ্রের নিজমুখে শুনিয়াছি। গিরিশ বলিতেন, ঠাকুরের দেহরক্ষার কিছুকাল পরে স্বামীজি তাঁহাকে ঐরূপে সতর্ক করিয়াছিলেন।

নিজ বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে গিরিশ কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। অনেক সময়ে ঐজন্য তাঁহাকে সাধারণের চক্ষে দোষী হইতে হইয়াছে। গিরিশ ঐ সকল সময়কে পরীক্ষার কাল জ্ঞান করিয়া নিজ বিশ্বাসমাত্রাবলম্বনে নীরব থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদিগের নিকটেও তিনি কখন কখন ঐরূপে দোষী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। অবশ্য, কিছুকাল পরেই তাঁহাবা তাঁহার নিষ্ঠা ও বিশ্বাসেব কথা বুঝিয়া তাঁহাকে আর ঐরূপ জ্ঞান করিতেন না। ঠাকুরের দেহরক্ষাকালে গিরিশ ঐ প্রকারের চূড়ান্ত পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, গিরিশ কিন্তু মনে মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া রহিলেন,—ঠাকুর কতকগুলি ভক্তকে সংসার ত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাসী করিতে, যাহাদের দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট যাইবার সুবিধা ছিল না ঐরূপ নূতন অনেক ব্যক্তিকে কৃপা করিতে, ভক্তদিগকে পরস্পরের সহিত পরিচিত কবিতে এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সমগ্র ভক্তমণ্ডলীকে অদ্ভুত ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এক পরি-বারে পরিণত করিতে মিথ্যা একটা রোগের ভাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন—ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আবার যেমন ছিলেন, তেমনি হইবেন। ক্রমে ঠাকুরের দেহরক্ষার কাল উপস্থিত হইল, গিরিশ উহা শুনিলেন; কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বা হইতে পারে। গিরিশ ঐ ঘটনার কিছু পূর্ব্ব হইতে কাশীপুরে ঠাকুরের নিকট গমন করেন নাই, এখন ভক্তদিগের মুখে ঠাকুরের দেহ-

রক্ষার কথা জানিতে পারিয়াও তথায় যাইলেন না। শোকাকুল ভক্তেরা গিরিশের ঐরূপ আচরণে বিশেষ ব্যথিত হইলেন, অনেকে অনেক কথা বলিয়া তাঁহার দোষদর্শনও করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐরূপ আচরণের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। গিরিশ কিন্তু নিজ বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাঁহাদিগকে নিজ মনোগতভাব বুঝাইয়া বলিলেন—"দেখ ভাই, আমার নিশ্চিত ধারণা, ঠাকুরের চিন্ময় শরীরকে জরা, ব্যাধি বা মৃত্যুর স্পর্শ করিবার অধিকার নাই, উহা নিত্য। কিন্তু সংসারে নরাকারে আসিয়া সাধারণ নরের ন্যায় সকল কার্য্য ঠাকুরকে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইতে হইয়াছে, দেহরক্ষাটাও সেইরূপ দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিন্ময় শরীরের দ্বারা দেহরক্ষার অভিনয় দেখান অসম্ভব বলিয়া, আমার ধারণা,—তিনি মায়াগঠিত অন্য একটা শরীর আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া চিন্ময় শরীরের অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন—ঐরূপ করিবার কারণ, ঐ মায়ার শরীরটাকে মৃত দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিব, তাঁহারই মৃত্যু হইয়াছে। আমি উহা করিতে প্রস্তুত নহি, সেজন্যই দেহরক্ষার কথা শুনিয়াও কাশীপুরে যাই নাই। আমি ভাবিলাম, দুর্ব্বল আমি, ঐ মৃত মায়ার শরীরটাকে দেখিলে আমার বিশ্বাস ঠিক রাখা কঠিন হইবে—উহা দেখিলেই আমার চক্ষু আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে, 'স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলি যে, তিনি মরিয়াছেন।' সেজন্য ইচ্ছা করিয়া ঠাকুরের দেহরক্ষা সম্বন্ধে চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে বিবাদ রাখিয়া দিলাম। এখন কর্ণ ঐ কথা শুনিয়াছি বলিলেও তাহাকে বলিতে পারিব, ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ কত মিথ্যা কথা ত শুনিয়াছিস্, তাহাই বিশ্বাস করিবি না কি? যে যাহা বলে বলুক্ না কেন, আমি ত ঐ ঘটনা দেখি নাই—আমি উহা বিশ্বাস করিব না।"

জ্ঞানবিচারের সম্মুখে গিরিশচন্দ্রের ঠাকুর-সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস যেরূপ বলিয়াই প্রতিপন্ন হউক না কেন, ঐকালে তাঁহার ঐরূপ আচরণ যে তাঁহার বিশ্বাসের বিশেষ পুষ্টিকর হইয়াছিল, তদ্বিষয় কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভক্তকে যত্নে নিজ বিশ্বাস রক্ষা করিবার

উপদেশ ভক্তিশাস্ত্রে বহুল দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশের নিজ বিশ্বাস রক্ষার জন্য ঐরূপ বিশেষাগ্রহের উদয় দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করিয়া স্বতঃই শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। আমরা জানি, তিনি আজীবন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহরক্ষার ছবিখানি কখন দর্শন করেন নাই।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের পত্নী একটি মাত্র শিশুসন্তান রাখিয়া পরলোকগামিনী হইলেন। গিরিশচন্দ্রের ঐ শিশুসন্তান স্বল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল, কিন্তু ঐ কালের মধ্যেই অদ্ভুত ঐশী ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল—একথা আমরা পাঠককে পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের স্বর্গীয়া ভগিনী দক্ষিণাকালী এবং বাটীর অন্য সকল পরিবারবর্গের মুখে আমরা শুনিয়াছি, ঐ শিশু অন্য সকল খেলিবার দ্রব্য ফেলিয়া ঠাকুরের ছবি লইয়া খেলা করিত, উহার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিবার মত বসিয়া থাকিত, এবং পূর্ব্বে কখনও না দেখিলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ভক্তগণের নিকটেই পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় আচরণ করিত। মাতৃহীন শিশু ঐজন্য সকলেরই একটা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল। গিরিশ নিজ পুত্রের ঐরূপ ভক্তিপ্রকাশ দেখিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতেন—"কল্পতরু ঠাকুরের নিকটে মত্ততাবশে 'পুত্র হও' বলিয়া কামনা করিয়াছিলাম বলিয়াই কি তিনি কোন যথার্থ ঈশ্বরভক্তকে পুত্ররূপে প্রদান করিয়া ঐরূপে আমার সেবা লইতেছেন?—কারণ, তিনিই ত একথা নিজমুখে বারম্বার বলিয়াছেন, 'ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্—তিনে এক, একে তিন!'—এই পুত্র যদি বাঁচিয়া থাকে ত তাহাকে কখন সংসারে নিবদ্ধ করিব না, ঠাকুরের সেবার জন্য প্রদান করিয়া সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত সন্ন্যাসী করিব।" ঐ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হইয়া তিনি বাস্তবিকই, ঐ পুত্র দুই বৎসর বয়স্ক হইতে না হইতে তাহাকে পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র শুনাইয়া দিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা দেবতাজ্ঞানে পুত্রের শুশ্রূষা করিতেন। পুত্র তিন বৎসর হইতে না হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কিন্তু তাহার ঐভাবে সেবা করিয়া গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মবিশ্বাস যে অধিকতর বিকশিত হইয়া

উঠিল, একথা বলা বাহুল্য। প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণসদৃশ পুত্রের মৃত্যুতে ক্রমে 'বকলমা' প্রদানের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, যখন ঠাকুরকে সমস্ত ভারার্পণ করিয়াছেন, তখন উহাদিগের প্রাণভিক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। তাঁহার কল্যাণের নিমিত্ত মঙ্গলময় ঠাকুর যাহাই বিধান করিবেন, তাহাই অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস অটল রাখিতে হইবে। গিরিশ-চন্দ্রের হৃদয় এককালে ছিন্ন ও দলিত হইয়া গেল, কিন্তু তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ অটল অচল ভাবে রাখিয়া স্থির হইয়া রহিলেন!—গিরিশের বিশ্বাস, এইক্ষণ হইতে তাঁহাকে প্রায় সন্ন্যাস-পদবীতে আরূঢ় করাইল! ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, গিরিশচন্দ্রের উভয়পক্ষের সংসারই প্রায় স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল! কিন্তু, ঠাকুর মঙ্গলময়, তাঁহার এই বিশ্বাস সর্ব্ব সময়ে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহার দৈনন্দিন প্রতি কার্য্যকলাপ পর্য্যন্ত অন্য আকার ধারণ করিল এবং একমাত্র বিশ্বাসবলে গিরিশ, ভক্তির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিলেন। ঐ বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিব।

পুত্রের মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গিরিশ রঙ্গালয়-সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রথম দিন দর্শনকালে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'এখন যাহা করিতেছ, তাহাই করিয়া যাও, পরে যখন একদিক্ (সংসার) ভাঙ্গিবে, তখন যাহা হয় হইবে'—গিরিশ এখন সেই কথা স্মরণ করিয়া অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে কি করাইবেন—তদ্বিষয় জানিতেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি এখন তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গেই নিরন্তর কালযাপন করিতেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক গুণাবলী ও অপার করুণার কথা তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়াই উল্লসিত অন্তরে অবস্থান করিতেন। ঐরূপ চর্চ্চাকালে তাঁহার সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ ও প্রলোভনকে গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান হইত, ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করাটা কিছুই মনে হইত না,

এবং দিন রাত্র যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহার জ্ঞান থাকিত না। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নামক তাঁহার এক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা একদিন ঐ কালে তাঁহাকে বলেন—"ঠাকুর ত তোমায় সন্ন্যাসী করিয়াছেন, তুমি কি করিতে আর বাটীতে রহিয়াছ? চল দুইজনে কোথাও চলিয়া যাই।" গিরিশ বলিলেন, "তোমরা যাহা বলিবে, তাহা ঠাকুরের কথা জ্ঞানে আমি এখনি করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজে ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসী হইতেও আমার সামর্থ্য নাই, কারণ, ঠাকুরকে আমি যে, বকল্‌মা দিয়াছি।" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "তবে চলিয়া আইস, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস, আমি বলিতেছি।" গিরিশও আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নগ্নপদে, একবস্ত্রে, বাটী ছাড়িয়া তাঁহার সহিত বাহির হইলেন এবং ঐ বেশে অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তখন, এতকাল ভোগসুখে লালিত পালিত গিরিশের দেহে ভিক্ষাটনাদির কষ্ট কখন সহ্য হইবে না স্থির করিয়া এবং গিরিশের ন্যায় বিশ্বাসী ভক্তের ঐরূপ পরিভ্রমণে শরীর নষ্ট করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বুঝাইয়া বলিলেন এবং বাটীতে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি ৺কামারপুকুরে গমন করতঃ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসিবার পরামর্শ দিলেন। গিরিশও তাঁহাদিগের ঐকথা ঠাকুরেরই কথা জ্ঞানে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।

ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মভূমি ৺কামারপুকুর ও জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিয়া গিরিশচন্দ্র নিজজীবন পরিচালনার জন্য নূতনালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে, কৃষাণদিগের সহিত তাহাদিগের সুখদুঃখের আলোচনায়, তাহাদিগের সরল ধর্ম্মবিশ্বাস, নির্ভরশীল জীবন ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুষ্ঠানে, ঠাকুর এই সকল দীন গ্রাম্য লোকের ভিতর আবির্ভূত হইয়া কি ভাবে বাল্যে ও কৈশোরে ইহাদিগের জীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের চর্চ্চায় এবং সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অদ্ভুত অকৃত্রিম ভালবাসায় গিরিশের বিশ্বাসী কবিহৃদয় এককালে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর

পুণ্যদর্শন এমন ভাবে গিরিশ কখনও প্রাপ্ত হন নাই, হইবার চেষ্টাও করেন নাই। গিরিশ এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, বাস্তবিকই ইনি তাঁহার মাতা, অপরের সংসারে তাঁহাকে নানা কারণে কিছুকালের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে যেমন আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স প্রভৃতি সকল কথা ভুলিয়া পিতার স্নেহের বালক হইয়া যাইতেন, এখানেও তদ্রূপ সকল কথা ভুলিয়া শ্রীশ্রীমার স্নেহে আপ্যায়িত হইয়া বালকের ন্যায় কয়েক মাস নিশ্চিন্তমনে কাটাইয়াছিলেন। দরিদ্র ভিখারী সুদূর গ্রামান্তর হইতে ভিক্ষা করিতে আসিয়া ভাঙ্গা বেহালার সহিত সুর মিলাইয়া যখন গান ধরিত—

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)
ওমা লোকের মুখে শুনি, সত্য বল্ শিবানী
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে।
অপর্ণে যখন তোমায় অর্পণ করি
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে।
খ্যাপা খ্যাপা আমায় বোল্‌তো দিগম্বরে
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে
দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে !
বিষয়-বুদ্ধি বটে বিশ্বাস হইল মনে
তা না হোলে গৌরীর এতেক গৌরব ক্যানে
নয়নে না দেখে আপন সন্তানে
মুখ বাঁকায়ে রয় রাধিকার নামে।

তখন গিরিশ উহাতে ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার বাল্যজীবনের জলন্ত ছবি দেখিতে পাইয়া উল্লাসে আত্মহারা হইতেন। গিরিশ মাঠে ঘাটে সরল কৃষাণদের সহিত বেড়াইতেন, উদরপূর্ণ করিয়া মার নিকট প্রসাদ পাইতেন এবং চেষ্টা না করিয়া স্বতঃই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথার আলো-

চনা করিয়া সর্ব্বক্ষণ উচ্চ কবিত্ব বা অধ্যাত্মচিন্তায় ভরপুর হইয়া থাকিতেন। ফিরিবার কালে গিরিশ শ্রীশ্রীমাকে অকপটে অন্তরের সকল কথা খুলিয়া বলিয়া অতঃপর তাঁহার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলেন। এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া গিরিশ কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা দীক্ষা লইয়া পুস্তকসকলের প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্রের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ এখন কত বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝান কঠিন। গিরিশ পূর্ব্বের ন্যায় রঙ্গালয়ের সকল কার্য্য করিতেন, পূর্ব্বের ন্যায়ই ঐ স্থলে সকলের সহিত মিশিতেন ও শিক্ষা দান করিতেন, কিন্তু অন্তরে গিরিশ যেন অন্য এক দিব্য রাজ্যে দিব্য সঙ্গে বিচরণ করিতেন! লোকে দেখিত, গিরিশ যাহা ছিলেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে করিতেছিলেন, তাহাই আছেন ও করিতেছেন—গিরিশের নিজের কিন্তু মনে হইত, শ্রীরামকৃষ্ণপুত্র তিনি তাঁহাকে লইয়াই আছেন, তাঁহার কার্য্যেই পরিশ্রম করিতেছেন। ঐ বিষয়ের একটী কথা এখানে বলিলেই পাঠক আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গিরিশকে এক সময়ে দশহরার দিনে গঙ্গাস্নান করাইয়াছিলেন। গিরিশের ইচ্ছা না থাকিলেও—'তোমরা এ সব না মানিলে অপর কে আর মানিবে'—বলিয়া অনুরোধ করিয়া ঐ কার্য্য করাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন, অতএব আর কোন বিচার না করিয়াই গিরিশ স্নান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শরীর ত্যাগের পরেও গিরিশ সক্ষম হইলে পর্ব্বদিনে গঙ্গায় স্নান করিতেন। একদিন সহসা তাঁহার মনে হইল, ঠাকুর ত আমার সমস্ত ভার লইয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, তবে আবার গঙ্গাস্নান করিয়া নিষ্পাপ হইব কেমন করিয়া? আবার ভাবিলেন, ঠাকুর তবে ঐরূপ অনুরোধ করিয়া গঙ্গায় স্নান করাইয়া গিয়াছেন কেন? সহসা তাঁহার বিশ্বাস ঐ প্রশ্নের অপূর্ব্ব সমাধান করিয়া দিল। বিশ্বাস বলিল, মা গঙ্গা পাপীর পাপ গ্রহণ করিয়া

তাহাকে নিষ্পাপ করিয়া দেন, এবং নিষ্কাম পবিত্র লোকদিগকে স্নানকালে তৃপ্তি প্রদান করতঃ নিজে পুণ্য অর্জ্জন করেন। ঠাকুরের কৃপায় আমরা এককালে পবিত্র হইয়া গিয়াছি, সুতরাং আমরা স্নান করিলে মা গঙ্গার পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার শক্তি শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গিরিশ বলিতেন, "প্রশ্নের ঐরূপ সমাধানে মনে ভয়ও হইতে লাগিল। পূর্ব্বসংস্কার ও অবিশ্বাস আসিয়া মনে নানা তোলাপাড়া উপস্থিত করিল। ঠাকুরকে মনে মনে চিন্তা করিলাম, দেখিলাম—তিনি যেন প্রসন্নমুখে হাস্য করিতেছেন। তখন আর কিছু না ভাবিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিয়া বলিলাম, 'মা গঙ্গা, ঠাকুরের কৃপায় তোমাকে পবিত্র করিবার জন্য তোমার জলে স্নান করিতেছি,' এই বলিয়া ডুব দিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে করিতে উঠিয়া আসিলাম! তদবধি গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেই মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইত!" গঙ্গা-স্নানের ন্যায় গিরিশচন্দ্রের অপর সকল অনুষ্ঠিত কার্য্যের উদ্দেশ্যও ঐরূপ অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছিল।

জীবনের শেষভাগে গিরিশ তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বলিতেন, 'ভাই, আমি আর কিছুই চাই না, কেবল তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ করিও, যেন, ঠাকুর মঙ্গলময়—এই জ্ঞান কখন কোন অবস্থায় আমার লুপ্ত না হয়।' রোগশয্যায় পতিত হইয়া তিনি একদিন সদর্পে বলিয়াছিলেন, 'তোরা ভাবিস্ কি, আমি এই সামান্য রোগের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি না? ঠাকুরকে জোর করে বোলে পঞ্চবটীতলে গড়াগড়ি দিয়ে এসে তোদের এখনি দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ঠাকুর মঙ্গলময়, রোগ শোক দুঃখ কষ্ট—যা কিছু জীবনে অনুভব করাচ্ছেন, সকলই আমার মঙ্গলের জন্য, এই ধারণা মনে তাঁর কৃপায় এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, ঐরূপ করতে আর প্রবৃত্তি হয় না। কল্পতরুতলে আমি যখন যাহা প্রার্থনা করেছি, তখনি তাহা পেয়েছি!'

গিরিশচন্দ্র যখন শেষ রোগশয্যায় পতিত রহিয়াছেন, তখন কতক-গুলি যুবক ভক্ত তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিত্য আগমন করিতেন। ঐ

সকল ভক্তদিগের ভাগ্যে ঠাকুরের দর্শন না হইলেও, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্য দর্শন লাভ হইয়াছিল। গিরিশ ইঁহাদের সহিত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঠাকুরের অপার করুণার কথা আলোচনা করিতে করিতে উল্লাসে রোগের যন্ত্রণা এককালে বিস্মৃত হইতেন। ইঁহাদিগের ভিতর এক ব্যক্তির কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলেও, সুযোগ্য পাত্র পাওয়া যাইতেছিল না। অনেক অনুসন্ধানেও যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন ঐ ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের উপর ঐ বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে রহিলেন। তাঁহার ঐরূপ আচরণে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গ তাঁহাকে নিরন্তর তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'পুরুষকার অবলম্বনে চেষ্টা না করিলে, ঠাকুর কি তোমার মেয়ের পাত্র বাড়ীতে জুটাইয়া দিবেন? তুমি নিশ্চিতই যথাযথ চেষ্টা কর নাই।' গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে একদিন ঐ ব্যক্তির বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ঐরূপে অনুযোগ করিয়া নানা বাদানুবাদ উপস্থিত করিলেন। ঐ ব্যক্তিও তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন যে, তিনি ঐ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও নিষ্ফল হইয়াছেন, আবশ্যক অর্থাদিও এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টায় কিছুই হইবে না। কিন্তু তাঁহার সে কথা শুনে কে? সকলেই বলিতে লাগিলেন, 'তুমি যথাযথ চেষ্টা কর নাই।' লোকচরিত্রজ্ঞ গিরিশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে তাঁহাদিগের ঐ সকল কথা শুনিলেন, পরে ঐ ব্যক্তি সত্যই আপনাকে নিরুপায় জ্ঞানে অকপটে ঠাকুরের আশ্রয় লইয়াছে বুঝিয়া, সহসা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'তুই যদি মেয়ের বিবাহের জন্য আবার ভাবিস্ ত তোর দিব্য আছে, তোর দিব্য আছে, তোর দিব্য আছে! তুই অকপটে তাঁকে (ঠাকুরকে) ভার দিয়েছিস্, দেখি ঠাকুর কেমন ক'রে তোকে এ দায় থেকে উদ্ধার না করেন!' গিরিশচন্দ্রের ঐ প্রকার প্রবল বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যের সম্মুখে সকলে এককালে নীরব হইলেন এবং ঐ ব্যক্তিও আশ্বাসিত হইয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। এখন হইতে গিরিশচন্দ্র ঐ ব্যক্তিকে ঐ বিষয়ের জন্য ঠাকুরের উপর বিশ্বাস অবিচলিত রাখিতে নিত্য উৎসাহিত করিতেন।

দেহত্যাগের আন্দাজ একমাসকাল পূর্ব্বে তিনি ঐ ব্যক্তির বিশেষ পরিচিত জনৈক ডাক্তারকে নিকটে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'কালিলাল, (কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্যক্তির নাম করিয়া) কটীকে বলিস্, আমি তার কথা ভুলি নাই (অর্থাৎ ঠাকুরকে জানাইয়াছি)'। ঠাকুর, তাঁহার গিরিশের কথা ঐ ঘটনার অল্পকাল পরেই এমন অদ্ভুত ভাবে পূর্ণ করিলেন যে, তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। জনৈক ধনী ব্যক্তি কন্যাকে দেখিতে আসিয়া বিশেষ পছন্দ করিলেন এবং পিতা বিবাহকার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত টাকার যোগাড় করিবার জন্য একমাস কাল বিবাহ স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি উহাতে স্বীকৃত না হইয়া কন্যার পিতার যাবতীয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিয়া আপন পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া চলিয়া গেলেন!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তপরিবারমধ্যে গিরিশচন্দ্রের উচ্চাসন যে কারণে নির্দ্দিষ্ট ছিল, আমরা তাহার যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। ঠাকুর যে একদিন নিজ কল্যাণের জন্য চিন্তান্বিত গিরিশকে পদাশ্রয় দানে কৃতার্থ করিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—'গিরিশ ঘোষ, তুই ভাবিস্‌নে, এর পর তোকে দেখে লোক অবাক্ হবে'—গিরিশচন্দ্রের জীবনকথার আলোচনা করিয়া ঐ বাক্যের সার্থকতা বর্ণে বর্ণে অনুভূত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যদি আমরা পাঠককে উহার কিয়দংশও বুঝাইতে পারিয়া থাকি, তবে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। নতুবা নিশ্চিত বুঝিব, আমাদেরই ক্রটির জন্য আমরা উহা পারিলাম না, পরমভক্ত গিরিশ-চন্দ্রের ভক্তিবিশ্বাসের অভাবের জন্য নহে। কারণ, আমরা নিশ্চিত বুঝিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের ন্যায় বিশ্বাসী হৃদয় সংসারে অতি বিরল। তবে একথাও বিশেষভাবে সত্য যে, তাঁহার অদ্ভুত ভক্তিবিশ্বাস সর্ব্বথা প্রার্থনীয় হইলেও, তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে যে দুর্গম পথে বিচরণ করিয়া নিজ বিশ্বাসভক্তি অবিচলিত রাখিয়া গিয়াছেন, সে পথাবলম্বন কাহারই প্রার্থনীয় নহে—কারণ, সে শক্তি সাধারণ মানবের কখনই হইবে না। সেজন্যই আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, কবি গিরিশচন্দ্রের মহত্ব সংসার শীঘ্রই উপলব্ধি করিবে, কিন্তু ভক্ত গিরিশচন্দ্রের ভক্তিবিশ্বাসের গভীরতা

উপলব্ধি করিতে সাধারণের বিলম্ব হইবে। কিন্তু বিলম্ব হইলেও, বীরভক্ত গিরিশের অসাধারণ আধ্যাত্মিকতায় কালে লোকনয়ন যে আকৃষ্ট হইবে, একথা নিশ্চয়।

গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব, তাঁহার গভীর বিশ্বাসেই পরিলক্ষিত হয়। প্রথম সাক্ষাৎকার-কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিতে বলিয়াছিলেন, শ্রীযুত গিরিশও তাঁহার ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া উহা আজীবন বর্ণে বর্ণে পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাঠক হয়ত বলিবেন, 'উহাতে আর বিশেষত্ব কি ?—ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়া সকলেই ঐরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়া থাকেন এবং সকলেই ঐ আদেশ পরিপালনে যথাসাধ্য যত্নপর হয়েন, অতএব শ্রীযুত গিবিশ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া নূতন আর কি করিয়াছেন ?' তদুত্তরে আমাদিগের বিনীত নিবেদন, ঐ কথা সত্য হইলেও, শ্রীযুত গিরিশের গুরুবাক্যে বিশ্বাস যে ভাবে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ নিয়মিত কবিত এবং যে ভাবে উহা আমাদিগের জীবনে ঐরূপ করিয়া থাকে, তদুভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

ধর্ম্ম-জগতে বিশ্বাসই যে, বিশ্বাস করার ফল—বিশ্বাসরূপ উপায়ের দ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া পূর্ণবিশ্বাস মাত্রই যে লাভ হয়—বিশ্বাসই উপায় এবং বিশ্বাসই উদ্দেশ্য,—একথা আমরা প্রাণে ধারণা না করিয়া উহাকে উপায় মাত্র বলিয়া সর্ব্বথা স্থির করিয়া বসি, এবং তৎ-সহায়ে ঈশ্বরদর্শনরূপ একটা অদ্ভুত অজ্ঞাত পদার্থবিশেষ আমাদিগের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইবে, এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকি। ফলে, ঐ অজ্ঞাত অদ্ভুত পদার্থাগমের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি না, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইয়া উহা লক্ষ্য করাই অচিরে আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠে এবং উক্ত বিষয়ে আশু কোন ফললাভ হইতেছে না দেখিয়া, আমরা বিশ্বাসরূপ উপায়ের প্রতি সন্দিহান হই। ক্রমে ঐ সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া 'বিশ্বাসে লভিবে কৃষ্ণ'-রূপ উপদেশবাক্যটী আমাদিগের নিকট কথার কথামাত্র বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

তখন মুখে বিশ্বাস করি বলিলেও, কার্য্যকালে সম্পূর্ণ বিপরীতানুষ্ঠানই আমাদিগের স্বভাবগত হইয়া পড়ে।

ঐরূপে বিশ্বাসের দ্বারা লভ্য পদার্থ, বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ধারণা করিলে, সাধককে আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আবার 'বিশ্বাস' সম্বন্ধে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা 'ভক্তি' সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। ভগবান্ নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রে, ভক্তির উদ্দেশ্য ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছু হওয়া উচিত নহে, একথা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; আবার বিশ্বাস ও ভক্তি, দুইটি কথা আমরা অনেক সময়ে এক অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। অতএব বিশ্বাস সম্বন্ধেও আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা যে পূর্ব্বতন ভক্ত্যাচার্য্যগণের অনুমোদিত, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতেই শ্রীযুত গিরিশ বিশ্বাস সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য ভক্তগণ তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক প্রথম প্রথম কোন বিশেষ দর্শন বা আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা লাভরূপ উদ্দেশ্যাবলম্বনে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিতেন, একথা আমরা তাঁহাদের নিকটে অবগত হইয়াছি। ঐজন্য শ্রীযুত গিরিশের সহিত তাঁহাদিগের অনেকের অনেক সময় ঐ বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত। আমরা শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্র তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের প্রতি সর্ব্বদা বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিলেও, কখন কখন তাঁহাদিগকেও ঐ বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিতেন, "আচ্ছা ভাই, তোরা যে, মাঝে মাঝে 'কিছু হ'ল না, কিছু হ'ল না বলে আক্ষেপ করিস্ ও পাহাড়ে পর্ব্বতে উপোস করে পড়ে থাক্তে ছুটিস্—এর মানে কি, আমি ত বুঝে উঠ্তে পারি না। অথচ দেখি, ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলে ধারণা আমার চেয়ে তোদের বেশী বৈ কম নহে। উহাতে আমার আরও আশ্চর্য্য বোধ হয়। নিশ্চিতই তোরা ঐ বিষয়ে আমার চেয়ে কিছু একটা উঁচু জিনিসের আভাস পেয়েছিস্, তাই সেটা পূর্ণ-ভাবে দেখ্‌বি বলে ঐরূপ করিস্। কিন্তু পূর্ব্বজীবনে mesmerism ও অধুনা hypnotism চর্চ্চা করে আমার মনে হয়, ভাগ্যে আমি

কিছু একটা অদ্ভুত দেখে ঠাকুরকে বিশ্বাস করি নাই, তা হ'লেই এখন অকুল পাথার দেখতুম্ আর কি! মনে হত, ঠাকুর কোনরূপে hypnotise ক'রে আমাকে ঐ অদ্ভুত দর্শন করিয়েছেন ও ফাঁকি দিয়েছেন! কাজেই ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার, এ বিশ্বাস ঠিক রাখা তখন কঠিন হত, নিশ্চয়! সেজন্যই ভাবি, তোরাও ত ঐ সব মানসিক শক্তির (hypnotism etc.) কথা পড়েছিস্, অথচ অদ্ভুত দর্শন করতেও চাস্, আবার ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলে বিশ্বাসও করিস্! বড় আধার বলে, তোরা ঐ সব বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চল্‌তে পারিস্। তাই মনকে বুঝাই যে, তোর ও পথ নয়, তুই কিছু দেখ্‌তে চাস্ নি। তবে এটা মনে খুব বিশ্বাস আছে, যদি ভাব, সমাধি বা কোন দর্শন লাভ করবার কখনও সখ হয় ত ঠাকুরকে জোর করে ধরে বস্‌লেই তিনি তৎক্ষণাৎ উহা নিজ শক্তিবলে করিয়ে দিবেন!"—ঐরূপে ভক্তিমান্ গিরিশ তাঁহার সরল একনিষ্ঠ বিশ্বাসের কথা বলিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে মোহিত করিতেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণ, গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য এবং নিজ নিজ দর্শনকে মিলাইয়া লইবার জন্যই তখন ব্যাকুলভাবে পাহাড়পর্ব্বতে ছুটাছুটি করিতেন।

ঘনীভূত বিশ্বাসকেই শাস্ত্র—দর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তরল বিশ্বাসই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সাধককে তন্ময়াবস্থায় উপনীত করে এবং ঐ তন্ময়াবস্থার তারতম্যানুসারেই সাধক সবিকল্প নির্বিকল্পাদি সমাধি লাভ করে, শাস্ত্র এই কথাই বলেন। অতএব বিশ্বাস ও দর্শনে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই এবং যথার্থ বিশ্বাসের অণুমাত্র কাহারও প্রাণে উদয় হইলে, তন্মুহূর্ত্ত হইতে তিনি সমাধিলভ্য উল্লাসের আংশিক ছায়া প্রাণে অনুভব করিতে থাকেন। অতএব বিশ্বাসী সাধকের প্রাণে তৎপ্রসূত উল্লাসের অভাব দেখিলে বুঝিতে হইবে, তাহার বিশ্বাসে ভাঁটা পড়িয়াছে এবং ঐ উল্লাস কোনরূপে পুনরায় না আনয়ন করিতে পারিলে, ক্রমে ঐ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবনতিরই বিশেষ সম্ভাবনা। বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্রের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াছেন,

তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন, তিনি আপন বিশ্বাসের ফলে সর্ব্বক্ষণ কতদূর উল্লসিত হইয়া থাকিতেন। ঠাকুরের কথা পড়িলে, তাঁহার অন্য সকল কর্ম্ম, এমন কি, আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত যেন ভুল হইয়া যাইত। বিশ্বাস-প্রসূত প্রাণের উল্লাস তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে এবং বিশাল নয়নে তখন এক অপূর্ব্ব শ্রী ও প্রসন্নতা আনয়ন করিত, এবং তাঁহার দৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বাক্যাবলী বিশ্বাসী শ্রোতাকে উল্লসিত এবং অবিশ্বাসী বা স্বল্পবিশ্বাসীকে সন্দেহ-ঔদাসীন্যের হস্ত হইতে সেই সময়ের জন্য মুক্ত করিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিত। বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্রকে ঐরূপে অপরের প্রাণে বিশ্বাসবল সঞ্চারিত করিতে আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি।

আবার, গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস যে কেবলমাত্র কথায় বিশ্বাস ছিল না, উহার জন্য তিনি যে সাংসারিক ও আর্থিক সকল প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন, তাহার প্রমাণও অনেক সময় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দীর্ঘকালব্যাপী অসুস্থতার সময়ে কাশীপুরের উদ্যানে ভক্তগণ ব্যয়ভারে অবসন্ন ও হতোদ্যম হইয়া পড়িলে শ্রীযুত গিরিশই তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাবনা কি? —(আমার) বাড়ীখানা ত আছে, ইটের উপর ইট যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ চিন্তার কারণ কি?—উহা বিক্রয় করিয়া প্রভুর সেবা চালাইব!" —একথা আমরা তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাসে আমরা কখনও ভাঁটা পড়িতে দেখি নাই। তবে, তাঁহার ও তদীয় গুরুভ্রাতাগণের মুখে শুনিয়াছি, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কোন সময়ে যখন তিনি ঠাকুরের প্রতি স্বল্পমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, একদিন এক পুরাতন অভিনেত্রীর বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ উপস্থিত হয়। কয়েক জন বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া গিরিশচন্দ্র সেরাত্রি তথায়ই বাস করিতে বাধ্য হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভয় পদাশ্রয় গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই গিরিশচন্দ্র নিয়ম করিয়াছিলেন, ঐরূপ স্থানে রাত্রিবাস করিবেন না; অদ্য বাধ্য হইয়া উহার বিপরীতাচরণে তাঁহার মনে বিশেষ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রাত্রিবাস

সম্বন্ধে যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বাধ্য হইয়াই হউক, আর যেরূপেই হউক অদ্য ভঙ্গ করিতে হইল, কল্য আবার কি করিয়া বসিবেন, কে বলিতে পারে? এবং ঐরূপে অবনতির কোন্ অধঃসোপানে উপস্থিত হইবেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? ঠাকুর কি তবে তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন নাই, নতুবা এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিলেন কেন? চিন্তা ও সন্দেহে অস্থির হইয়া, তিনি, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে নির্গত হইলেন এবং একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া পূর্ব্বরাত্রের ও মনের সমস্ত সন্দেহের কথা খুলিয়া বলিয়া কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহার কথা ধীরভাবে শুনিতে শুনিতে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"শালা! তুই ভেবেছিস্, তোকে ঢ্যাম্‌না সাপে ধরেছে বুঝি, যে পালিয়ে যাবি, তা নয়, এ জাত্ সাপের (বিষধর সর্পের—যথা, কেউটে গোখ্‌রো ইত্যাদি) ধরা; তিন ডাক ডেকেই চুপ্ কর্‌তে হবে; কোন রকমে পালিয়ে গেলেও বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌তে হবে!" ঠাকুরের কথায় গিরিশ আশ্বস্ত হইলেন এবং তদবধি ঠাকুর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, একথা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গে অন্য এক দিবসের অন্য একটী কথাও আমাদের এখানে মনে পড়িতেছে। দেহরক্ষার কিছুকাল পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র যখন বহুকাল যাবৎ কঠিন রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন এক সময়ে তাঁহার মনে হইয়াছিল—'মৃত্যু ত সন্নিকট, মৃত্যুর পরে কি হইবে বা কোথায় যাইব, তাহার ত কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই; এখন উপায়?' কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি ঐ বিষয়ে নানা আন্দোলন করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। পরে ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে ঐ সময়ে দেখিতে আসিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তিনি ঐ বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন—'ভাই, আমায় ঘা কতক জুতো মেরে যাও ত, সত্যি সত্যি ঘা কতক জুতো মেরে যাও!' মহেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে কারণ

জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, 'হাঁ হে, জুতো খাওয়াই আমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত; তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) আমার রয়েছেন, তবু কি না আমি ভাবি, মৃত্যুর পরে আমার কি হবে!'

ঈশ্বর বিশ্বাস যে বহুভাগ্যে প্রাণে উদয় হইয়া থাকে, এবং উহাকে সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা না করিলে যে উহার লোপ অবশ্যম্ভাবী, গিরিশ-চন্দ্র একথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৈবী-শক্তির এবং তাঁহার আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর ভিন্ন অপর কোন বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তিকে আশ্রয়স্বরূপে অবলম্বন করিবার তিল মাত্র ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে উদয় হইলে, তিনি আপনাকে বিশেষ তিরস্কার করিতেন এবং উহাদিগের ঐরূপ আশ্রয়দান সম্বন্ধে শক্তিহীনতার কথা আলোচনা করিয়া উহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দূরে পরিহার করিতেন। ঐ বিষয়ের একটী বিশেষ দৃষ্টান্তের কথা আমরা তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। উহা এখানে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ আলমবাজার বা উত্তর বরাহনগরে যখন অবস্থান করিতেন, তখন গিরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপে দিবারাত্রি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসিগণ আপনাদিগের মধ্যে ত্যাগের ভাব উদ্দীপিত রাখিবার জন্য কখন কখন বিশেষ পূজা ও হোমের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক তদন্তে ঐ নিজ নিজ বাসনাসংস্কারসমূহ দগ্ধীভূত হইতেছে ভাবিয়া আহুতি প্রদান করিতেন। ঐরূপ অনুষ্ঠানকালে তাঁহারা সচরাচর ঠাকুরের গৃহী শিষ্যবর্গের কাহাকেও তথায় প্রবেশ করিতে দিতেন না। কল্পনা-প্রবণ গিরিশের মন ঐরূপ হোমের কথা শুনিয়া বিশেষ উল্লসিত হয় এবং সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, তিনি একদিন উহা দেখিবার অনুমতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লন। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও পুত্রের মৃত্যু কিছুকাল পূর্ব্বে হওয়ায়, তিনি তখন এক প্রকার সন্ন্যাসীর মতই সংসারে অবস্থান করিতেছিলেন। সে যাহা হউক, হোম দর্শন করিতে করিতে গিরিশ-

চন্দ্র মুগ্ধ হইলেন এবং সন্ন্যাসিগণের আহুতিদান সাঙ্গ হইলে, তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিজ সংস্কারবাসনাদি দগ্ধ করিতেছি চিন্তা করতঃ কয়েকবার আহুতি স্বয়ং প্রদান করিলেন। পরে যথারীতি অগ্নি বিসর্জ্জিত হইবার পরে অনেকে সেখান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার কয়েকটী সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা ঐস্থানে বসিয়া কেহ মৌনাবলম্বনে তন্মনস্কভাবে রহিলেন এবং কেহ কেহ পরস্পর ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

গুরুভ্রাতাগণের সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আহুতি প্রদান করিয়া গিরিশ পূর্ব্ব হইতে প্রাণে বিশেষ উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন, এখন আবার ইহপরকালে তাঁহার একমাত্র আশা-ভরসার নিদান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা পড়ায়, ঐ উল্লাস শতধারে উচ্ছলিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ প্রগল্‌ভ করিয়া তুলিল। তিনি তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অশেষ করুণার নানা দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ উত্তেজিতভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে সহসা তাঁহার ভাবান্তর হইল এবং তিনি স্থির গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অপরে ভাবিল, তিনি ঠাকুরের চিন্তায় তন্ময় হইয়া ঐরূপ করিতেছেন। সেজন্য কথা কহাইয়া তাঁহার ভাব-ভঙ্গ না করিয়া আপনারাই পরস্পরে ঠাকুরের কথা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলে যখন ঐরূপে ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তখন একজন সহসা দেখিতে পাইলেন, গিরিশচন্দ্র সকলের অলক্ষ্যে হোম-স্থণ্ডিলের ভস্মাবশেষের উপর থু থু করিয়া বারত্রয় থুৎকার প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় দ্বিগুণোৎসাহে সকলের সহিত যোগ দিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন! গিরিশচন্দ্রের ঐরূপ ব্যবহার অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পাছে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় ভাবিয়া, ঐ ব্যক্তি তখন ঐ কথা কাহাকেও না বলিয়া কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুত গিরিশকে অন্তরালে দেখিতে পাইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশচন্দ্র উহাতে প্রথম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি উহা দেখিতে পাইয়াছ? উহার কারণ আর কিছুই নহে ভাই, কেবল, ঠাকুরের কথা কহিতে কহিতে আমার সহসা

মনে হইল, ঠাকুর ত আমাকে ঐরূপে হোম করিতে বলেন নাই, উহা ত আমি নিজের ইচ্ছাতেই করিলাম, তবে ত ঠাকুরকে ছাড়িয়া ঐরূপে আগুনে খানিক ঘি পোড়াইয়া আমি আমার মনের বাসনা-সংস্কার দূর করিতে স্পর্দ্ধা করিয়াছি,—তাঁহার উপর বিশ্বাস না করিয়া হোমের উপর অথবা নিজের উপর বিশ্বাস করিয়া অপরাধী হইয়াছি? হায়! হায়! এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমার কেন হইল? ঐরূপ ভাবিয়া ঠাকুরের নিকট ব্যাকুল অন্তরে অপবাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মন শালা এত বড় পাজি যে, ঐ সময়ে তোমাদের দেখাইয়া বলিল, তুই ঐ কর্ম্মের জন্য আপনাকে যে অপরাধী জ্ঞান করিতেছিস্, তাহা তোর ভ্রম মাত্র— ঐ দেখ্‌না, তোর গুরুভ্রাতারা কেহই ত ঐরূপ ভাবিতেছে না, বরং প্রাণে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক উল্লাস অনুভব করিতেছে। তখন ঠাকুরের কৃপায় সুবুদ্ধির উদয় হইয়া বুঝাইয়া দিল যে, আমার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরের নিদেশে ঐরূপ করিয়াছেন, এজন্যই তাঁহারা ঐরূপ অনুষ্ঠানে দোষভাগী হন নাই, কিন্তু আমি তাহা করি নাই। সেজন্যই ঐ কার্য্যে বিশেষ অপরাধী হইয়াছি! তখন মনে মনে তোমা-দিগকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম এবং আমার অপরাধের নিদর্শনস্বরূপ সম্মুখে বর্ত্তমান ঐ ভস্মাবশেষের উপর একটা বিষম ঘৃণার ভাব মনে উদয় হইয়া যেন জোর করিয়া আমাকে ঐরূপে থুৎকার প্রদান করাইয়া লইল। উহা করিয়া তবে যেন শান্তি পাইলাম! আমার ঐরূপ কার্য্যে তোমরা ক্ষুণ্ণ হইও না ভাই; আমি ঐরূপে আমার নিজের মন্দ বুদ্ধি ও কার্য্যের প্রতিই অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি, ইহা ভাবিয়া সকলে এ দুর্ব্বল গুরুভ্রাতার প্রতি কৃপা রাখিও এবং আশীর্ব্বাদ করিও, যেন আর কখনও সে ঐরূপে তোমাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া অপরাধী না হয়।" গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ পরে ঐ কথা জানিতে পারিয়া ঐরূপ কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি দোষা-রোপ না করিয়া, উহা দ্বারা তাঁহার অনন্যচিত্ত হইয়া ঠাকুরকে আশ্রয়-স্বরূপে অবলম্বনের ইচ্ছাই সূচিত হইয়াছে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত বিশ্বাসভক্তির পরিচায়ক ঐরূপ অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের আলোচনায় নিশ্চিত বুঝা যায়, নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসিবৃন্দ গিরিশচন্দ্রকে কেন সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে অবলোকন করিতেন। হে পাঠক, এখনও কি তোমায় বলিবার প্রয়োজন হইবে—গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতায় কি অপূর্ব্ব বিশেষত্ব ছিল? যদি হয়, তবে আইস, গিরিশচন্দ্রের শেষ দুর্গোৎসবের কথা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিই, যে দিন শ্বাসরোগে নির্দ্দয়ভাবে আক্রান্ত হইয়াও তিনি উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া 'মা! এস, অধম সন্তানের গৃহে একবার পদার্পণ করিয়া তাহার জীবন ধন্য কর' বলিয়া কাতর প্রার্থনায় নিযুক্ত,এবং তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া একদিকে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী তাঁহার সতী সাধ্বী সঙ্গিনী কুললনাগণসঙ্গে আগমন করিয়া তদীয় ভবন তীর্থীভূত করিয়াছিলেন—আবার অন্য দিকে তাঁহার সহানুভূতি ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা সমাজ-বহির্ভূত, ঘৃণ্য, অভিনেত্রীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া প্রতিমাসম্মুখে ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রসাদ গ্রহণ করাইয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়াছিল। আর, স্মরণ করাইয়া দিই, গিরিশচন্দ্রের ধরাধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুর অভয়পদপ্রান্তে সঙ্গত হইবার দিন, যেদিন তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সন্ন্যাসী, ভক্ত, সাহিত্যসেবক, দরিদ্র এবং রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ—সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিসকল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব নিম্নের পতিতআখ্যাপ্রাপ্ত স্তরের লোকসমূহ পর্য্যন্ত—প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতায়, সজলনয়নে পূত ভাগীরথীতীরে আগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তিপুষ্পে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে দেবদুর্লভ ঈশ্বরভক্তির যথার্থ বিকাশ না হইলে, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভামাত্র কখন সর্ব্বশ্রেণীর জনসঙ্ঘকে ঐরূপে আকৃষ্ট করিতে পারিত না—ধর্ম্মৈকপ্রাণ ঋষিকুলের বাসভূমি ভারতে অন্ততঃ ঐরূপ ঘটনা কখন সম্ভবপর হইত না।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি খণ্ডন

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।)

(৮)

আচার্য্য রামানুজ "বেদান্তে ধ্যান বিহিত হইয়াছে" বলিয়া অদ্বৈত-বাদীর মত যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, এবং অদ্বৈতবাদী তাহার যেরূপ উত্তর দিয়া থাকেন, তাহা আমরা ইহার পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আচার্য্য রামানুজ তাঁহার উক্ত মতটীকে দৃঢ়তর করিবার জন্য "বেদান্তে উপাসনা বিহিত" বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন, এবং তজ্জন্য তিনি পূর্ব্বে যেমন বেদান্তোক্ত "বেদন" অর্থাৎ জ্ঞানকে ধ্যান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেই "বেদন" অর্থাৎ জ্ঞানকে উপাসনা বলিয়া প্রমাণ করিবেন। বেদান্তোক্ত বেদন অর্থাৎ জ্ঞানকে ধ্যান বা উপাসনা বলিয়া প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বেদান্তে "ব্রহ্মকে জানিবে" "ব্রহ্মকে জানিলে মুক্তি হয়" এইরূপ অনেক কথা আছে এবং এই সকল কথার বলে অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন যে, বেদান্তে কেবলই ধ্যান ও উপাসনা বিহিত হয় নাই, পরন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করাও হইয়াছে, যেহেতু এই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিলে জীবের মুক্তি হয় ইত্যাদি। আচার্য্য রামানুজ অদ্বৈতবাদীর এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদান্তে সর্ব্বত্রই কেবল ধ্যানোপাসনাদি বিহিত হইয়াছে এবং তদনুসারে তিনি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ সিদ্ধ করেন।—এইরূপে তাঁহার মতে জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়বাদ সিদ্ধ হয় বলিয়া তিনি বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের প্রথম পদ 'অথ' শব্দের অর্থ "কর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর" বলিয়া থাকেন; কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, ইহার অর্থ কেবল কর্ম্মজ্ঞানানন্তর নহে, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-ধারণোপযোগী শমদমাদি সাধনচতুষ্টয়ের অনন্তর বুঝিতে হইবে। জ্ঞান-

কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ কি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে একাধিকবার কথিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে অদ্বৈতবাদীর পক্ষাবলম্বন করিয়া আচার্য্য রামানুজের উক্ত কথাটীর উত্তর প্রদান করিব। সুতরাং এক্ষণে এস্থলে বিচার্য্য বিষয়টী কি, তাহাই দেখা যাউক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এস্থলে বিচার্য্য বিষয়টী এই ;—

(১) বেদান্তে উপাসনা বিহিত হইয়াছে কি না ?

(২) আচার্য্য রামানুজ বলেন—হাঁ, বেদান্তের তাৎপর্য্য উপাসনা।

(৩) অদ্বৈতবাদী বলেন—না—বেদান্তের তাৎপর্য্য ব্রহ্মজ্ঞান, কিন্তু নিম্নাধিকারীর সুবিধার জন্য কোথাও কোথাও উপাসনাদি বিহিত হইয়াছে মাত্র। উপাসনা প্রভৃতি বেদান্তের তাৎপর্য্য নহে, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান স্থায়ী করিবার পক্ষে সহায় মাত্র।

এখন দেখা যাউক, আচার্য্য রামানুজ এ বিষয়ে কি বলেন। আচার্য্য রামানুজ বলেন ;—

"তদিদম্ অপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিতং বেদনম্ উপাসনম্ ইতি অবগম্যতে, বিদ্যুপাস্যোঃ ব্যতিকরেণ উপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ। 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' (ছান্দোগ্য ৩।১৮।১) ইত্যত্র 'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ' (ছান্দোগ্য ৩।১৮।৩) 'ন স বেদ অকৃৎস্নো হ্যেষঃ * * আত্মেত্যেবোপাসীত' (বৃহদারণ্যক ১।৪।৭) 'যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদ্ উক্ত' (ছান্দোগ্য ৪।১।৪—৬) ইত্যত্র 'অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাম্ উপাস্স ইতি' (ছান্দোগ্য ৪।২।২)।"

অর্থাৎ "মুক্তির উপায়রূপে বিধিৎসিত (বিধান করিতে যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন) এই 'বেদন' অর্থে যে উপাসনা, তাহাও বেশ বুঝা যায়। কারণ, উপনিষদে জ্ঞানার্থক বিদ্‌ধাতু ও উপাসনার্থক উপপূর্ব্বক আস্ ধাতুর ব্যতিকর অর্থাৎ অদল বদল ভাবে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্ট হয়। যথা,—

১। (উপক্রম—) "মনকে ব্রহ্মভাবে 'উপাসনা' করিবে।"

(উপসংহার) এ স্থলে উপসংহার এই যে, "যে এরূপ 'জানে,' সে

কীর্ত্তি অর্থাৎ পরাক্রমজনিত প্রতিষ্ঠা, যশঃ অর্থাৎ দানজন্য প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মণ্যতেজে প্রতিভাত হয় এবং সকলকে অভিভূত করে।" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩।১৮।৩)।

২। (উপক্রম) ["যে লোক প্রাণাদি সমষ্টির মধ্যে প্রাণ বা চক্ষুঃপ্রভৃতি এক একটী অংশমাত্রকে সম্পূর্ণ 'আত্মা' বলিয়া উপাসনা করে] সে লোক [পূর্ণ আত্মাকে] 'জানে না', যেহেতু এই প্রাণ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা নহে, আত্মার একদেশমাত্র।"

(উপসংহার—) "তাহাকে আত্মা অর্থাৎ ঐ সকল অংশের ব্যাপক বলিয়াই 'উপাসনা' করিবে।"

(উপক্রম) "তিনি (রৈক্ক) যাহাকে (যে ব্রহ্মকে) জানেন, যিনি তাহাকে (সেই ব্রহ্মকে) জানেন, আমি তাদৃশ ব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছি।"

এস্থলে (উপসংহার), "হে ভগবন্, আপনি যে দেবতার 'উপাসনা' করেন, আমাকে তাহার উপদেশ দিন।"

এই তৃতীয় দৃষ্টান্তটী বুঝিবার জন্য শ্রীভাষ্যের অনুবাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের এই টিপ্পনীটী বেশ সাহায্য করিবে। সুতরাং নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্ক সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা লিখিত আছে,—জানশ্রুতি নামক এক রাজা রাত্রিকালে প্রাসাদের উপরিভাগে শয়ান আছেন, এমন সময় কতিপয় ঋষি হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশপথে যাইতেছিলেন। যখন অগ্রগামী হংস জানশ্রুতিকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন হংস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, 'অহে ভল্লাক্ষ! (অর্থাৎ তোমার চক্ষুতে কি কোনও পীড়া হইয়াছে!) তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, জানশ্রুতির তেজঃপুঞ্জ গগনমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে? ইহার উপর গেলেই তুমি ভস্মসাৎ হইবে।' তখন অগ্রগামী হংস প্রথমোক্ত হংসকে বলিলেন যে, 'তুমি অবোধ! একি রৈক্কের তেজ, যে, ইহার উপর গেলেই ভস্ম হইব? রৈক্কের তেজই অলঙ্ঘনীয়, ইহার তেজ নহে। তখন

পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস রৈক্ক কে এবং তাঁহার বিশেষ বিবরণই বা কিরূপ— তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তদুত্তরে অগ্রগামী হংস রৈক্কের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে জানশ্রুতি ও রৈক্কের কথার সূচনা করিলেন—'অনু মে' ইত্যাদি।

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেদন বা জ্ঞান এবং উপাসনা পৃথক্ নহে, কারণ, বেদ অর্থাৎ জানা এবং উপাসনা এই শব্দ দুইটীর উপক্রম উপসংহারে অদলবদল ভাব রহিযাছে। এস্থলে শ্রীভাষ্যের অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয় যে একটী টিপ্পনী দিয়াছেন, তাহাতে একটী সার সঙ্কলন করিয়া ভাষ্যস্থিত বক্তব্য বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যথা—"উপাসনার বিধেয়ত্ব (অর্থাৎ বেদান্তে উপাসনাই বিহিত ইহা) প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে তিনটী শ্রুতির অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমাংশের উপক্রমে আছে, 'উপাসীত' শব্দ, উপসংহারে আছে 'বেদ' শব্দ। দ্বিতীয়ের উপক্রমে আছে 'বেদ' শব্দ এবং উপসংহারে আছে 'উপাসীত' শব্দ। তৃতীয়ের উপক্রমে আছে দুইবার 'বেদ' শব্দ এবং উপসংহারে আছে উপাসনার্থক 'উপাস্স' শব্দ। এবিষয়ে একটী সাধারণ নিয়ম এই যে উপক্রমে যে বিষয়ের নির্দ্দেশ থাকে, উপসংহারে তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহার অন্যথা করা অতীব দোষাবহ। উক্ত নিয়মানুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে, উপাসনার্থক 'উপাসীত' ও 'উপাস্স' শব্দ এবং জ্ঞানার্থক 'বেদ' শব্দের অর্থ এখানে এক উপাসনা। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, উপনিষদের অন্যান্য স্থলেও যে জ্ঞানার্থক 'বিদ্', 'জ্ঞা' প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সে সকলেরও প্রকৃত অর্থ উপাসনা—জ্ঞান নহে।"

কিন্তু এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের একটী বিষয়ের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। বিষয়টী এই—আচার্য্য প্রথমে বেদান্তে ধ্যান বিহিত বলিয়াছেন, এক্ষণে আবার উপাসনা বিহিত বলিতেছেন, সুতরাং এই ধ্যান ও উপাসনার মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে কি না?—এ বিষয়টী বুঝিতে পারিলে, আচার্য্যমতের অন্তরে প্রবেশ করা

সুবিধা হইবে এবং তাহার ফলে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে।

এই বিষয়টী আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, আচার্য্য রামানুজমতে এই ধ্যান ও উপাসনার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। অবশ্য শ্রীভাষ্যের মধ্যে ইহাদের পার্থক্য পরিস্ফুট হয় নাই বটে, কিন্তু তথাপি সম্প্রদায়মধ্যে ইহাদের পার্থক্য স্বীকৃত হয় এবং একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, শ্রীভাষ্যের এই বিচার্য্য স্থলেই তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

দেখা যায়, বর্ত্তমান জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদসংক্রান্ত বিচারের প্রারম্ভেই আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন, "বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতং জ্ঞানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। কিং বাক্যাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রম্ উত তন্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি ?"

অর্থাৎ "বেদান্তবাক্যের দ্বারা বিধিৎসিত জ্ঞান কিরূপ, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ইহা কি বাক্য হইতে বাক্যার্থজ্ঞানমাত্র কিম্বা তন্মূলক উপাসনাত্মক জ্ঞান ?"

এবং এই বিষয়ের বিচারশেষে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা এই,—"অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদ্ অন্যদেব ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতম্।"

অর্থাৎ "এইজন্য বাক্যার্থজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনরূপ ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্য জ্ঞানই বেদান্তবাক্যের দ্বারা বিধিৎসিত বলিতে হইবে।"

এখানে দেখা যায়, আচার্য্য রামানুজ প্রশ্নমধ্যে "উপাসনাত্মক" জ্ঞান শব্দ প্রয়োগ করিয়া, উত্তরমধ্যে "ধ্যানোপাসনাদি" শব্দ ব্যবহার করিলেন। বস্তুতঃ উহারা ঠিক এক হইলে, উপক্রমের "উপাসনাত্মক জ্ঞান" পদটী উপসংহারে "ধ্যানোপাসনাদি" পদে পরিণত হইত না। ফলতঃ উপক্রমে এবং উপসংহারে এক বিষয় থাকা উচিত সত্ত্বেও যখন তিনি উপসংহারে "ধ্যান" এবং "আদি" পদ অধিক প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন ইহাতে যে একটু ভেদ আছে, তাহা আচার্য্যই ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর শ্রুতিসাহায্যে বিচারকালে আবার তিনি প্রথমে ধ্যান বিহিত

বলিয়া, পরে উপাসনা বিহিত বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে শ্রুতিপ্রমাণ দিয়াছেন। (এই ধ্যানের কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, এক্ষণে এ প্রবন্ধে উপাসনার কথাই আলোচিত হইতেছে)। দেখ, ধ্যানবিষয়ে বলিবার কালে তিনি বলিলেন, "তথাচ শ্রুতয়ঃ···তস্মাৎ ধ্যানমেব বিধীয়তে" এবং এক্ষণে উপাসনার কথা বলিবার সময় বলিলেন, "তদিদং অপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিতং বেদনম্ উপাসনম্ ইতি অবগম্যতে।" এস্থলেও আচার্য্য রামানুজ ধ্যান ও উপাসনাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিলেন বলিয়া, উহাদের মধ্যে যে কিছু পার্থক্য আছে, তাহা স্থির।

আর বাস্তবিক ধ্যান ও উপাসনার মধ্যে যে একটু ভেদ আছে, তাহাও সহজে বুঝা যায়। কারণ, কেহ যদি কোন কিছুকে মনশ্চক্ষে কেবল মাত্র দেখিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ধ্যান করা হইতে পারে; কিন্তু উপাসনা বলিলে, কেবলই তাহাই বুঝায় না, উহাতে ধ্যানাতিরিক্তও কিছু বুঝাইতে পারে। অর্থাৎ উপাসনা বলিতে মনশ্চক্ষে দৃষ্ট বস্তুকে লইয়া তাহার ব্যবহার অর্থাৎ নানা প্রকারে সেবা পর্য্যন্ত বুঝাইতে পারে। তাহার পর আচার্য্যমতে ইহাদের ভেদ থাকাও অভীষ্ট, কারণ, আচার্য্য রামানুজের মুক্তির আদর্শ বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানের সেবার জন্য তাঁহার আদেশ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট সর্ব্বদা করজোড়ে অবস্থান করা। অবশ্য যে ব্যক্তি এরূপ আদেশের অপেক্ষা করেন, তিনি যে ভগবানের পদসেবা, চামর-ব্যজন প্রভৃতি কার্য্য আবশ্যক মত করিয়া থাকেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই সব কার্য্য বুঝাইবার জন্য উপাসনা শব্দটী তাঁহার মতে যেমন উপযুক্ত হইবে, ধ্যান শব্দটী সেরূপ উপযুক্ত হইতে পারে না। আর সেই সব কারণে তাঁহার মতে ধ্যান উপাসনার মধ্যে যে একটু ভেদ স্বীকার্য্য হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বলিতে কি, এইজন্য তিনি কখন বলিয়াছেন—বেদান্তে ধ্যান বিহিত, আবার কখন বা বলিয়াছেন—ধ্যানোপাসনাদি বিহিত। বস্তুতঃ তিনি যেখানে ধ্যান বিহিত বলিয়াছেন, সেখানে উপাসনাও তাহার মধ্যে উহ্য আছে, বুঝিতে হইবে। অবশ্য আচার্য্য রামানুজ বেদান্তদর্শনের নিজ শ্রীভাষ্যে ৪।১।১ সূত্রে ধ্যান ও উপাসনাকে একার্থকই বলিয়াছেন,

কিন্তু সেখানেও যে উহাদের মধ্যে আদতেই ভেদ নাই, এমন কথা স্পষ্ট-ভাবে কথিত হয় নাই।

যাহা হউক, তিনি বেদান্তে ধ্যানের বিধান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিচার করিয়া দেখিয়াছি। এক্ষণে উপাসনা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। উপরে যে আচার্য্যবাক্য উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, বেদনাখ্য জ্ঞান ও উপাসনা এক জিনিষ। বেদান্তে এই উপাসনার বিধান থাকায়, এই উপাসনার অঙ্গস্বরূপ উপাস্য ব্রহ্ম এবং উপাসক জীবের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান প্রয়োজন। সুতরাং যেখানে বেদান্তে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে, সেখানে তাহা উপাসনারই অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে, পরন্তু কেবলই জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের জন্য কথিত হয় নাই। অধিক কি, যদি বেদান্তে এমন কোন স্থল থাকে, যেখানে উপাসনার কথা আদৌ নাই, পরন্তু কেবলই জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ কথন রহিয়াছে, তাহা হইলে সেখানেও উহা অন্যত্র কথিত উপাসনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ফল কথা, বেদান্তে উপাসনাই বিহিত, উপাসনাই বেদান্তের তাৎপর্য্য। আর যদি কেহ মনে করেন যে, উপাসনা বেদান্তের তাৎপর্য্য হইলে, বেদান্তে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রামাণ্য থাকিতে পারে না। কারণ, যে গ্রন্থের যাহা তাৎপর্য্য, তাহাতেই প্রামাণ্য থাকিবার কথা। যাহা গ্রন্থের তাৎপর্য্য নহে, তাহাতে প্রামাণ্য থাকিতে পারে না ইত্যাদি, তাহা হইলে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, কোন গ্রন্থের যদি কোন বিষয়টী তাৎপর্য্য না হয়, তাহা হইলে যে তাহার অপ্রামাণ্য হইবে, তাহারও কোন নিয়ম নাই—একে তাৎপর্য্য থাকিলে অপরে যে প্রামাণ্যের অভাব হইবে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং বেদান্তের তাৎপর্য্য উপাসনাদি হইলেও উহাতে যে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ-বিষয়ক বর্ণনা আছে, তাহা অপ্রমাণ নহে, পরন্তু উহাও প্রমাণ।

যাহা হউক, এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী কি বলেন, দেখা যাউক। অদ্বৈতবাদী বলেন—সত্যবটে, এস্থলে বেদন ও উপাসনা এক জিনিষ। কিন্তু তাই বলিয়া মোক্ষসাধক বেদন ও উপাসনা যে এক, তাহার প্রমাণ

কোথায়? বল দেখি, বেদান্তে যত উপাসনা কথিত হইয়াছে, তাহারা কি সকলই এক জিনিষ? তাহাদের কি ফলের তারতম্য নাই? বল দেখি, আচার্য্য রামানুজ যে কয়েকটী স্থলে বেদন ও উপাসনাকে এক বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন, সে কয়েকটী স্থলে কি মোক্ষসাধক উপাসনার কথা বলা হইয়াছে? আমরা বলি, যেহেতু বেদান্তোক্ত উপাসনায় ফলের তারতম্য দেখা যায়, সেই হেতু সকল উপাসনা এক নহে, এবং যে কয়টী স্থল দেখাইয়া বেদন ও উপাসনা এক বলা হইয়াছে, সে কয়টী স্থলে কেবল মোক্ষসাধক উপাসনার কথা নাই। সুতরাং মোক্ষসাধক জ্ঞানও কখন উপাসনা হইতে পারে না। দেখ, যেখানে কেবল মোক্ষসাধক জ্ঞানের কথা আছে, যথা 'তত্ত্বমসি' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি, সেখানে বেদান্তে কোথাও বেদন ও উপাসনার উপক্রম-উপসংহারের ব্যতিকর-ভাব নাই। অধিক কি, সেখানে "কেবল" ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপাসনা শব্দই প্রযুক্ত হয় নাই। দেখ, আচার্য্য রামানুজ যে তিনটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা সে তিনটী স্থলের কথা একে একে বিচার করিতেছি—দেখিবে, ইহাতে কেবল মোক্ষসাধক উপাসনার কথা নাই।

আচার্য্যের প্রথম দৃষ্টান্তটী ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের ১৮শ খণ্ডের কথা। তাহা এই;—

"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত, ইতি অধ্যাত্মম্। অথ অধিদৈবতম্। আকাশো ব্রহ্ম। ইতি উভয়ম্ আদিষ্টং ভবতি, অধ্যাত্মঞ্চাধিদৈবতঞ্চ।" ১।

অর্থাৎ "মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। ইহা অধ্যাত্ম। অনন্তর অধিদৈবত এই—আকাশই ব্রহ্ম অর্থাৎ আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে; এই অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয়ই উপদিষ্ট হইল।" ১।

"তদেতৎ চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম। বাক্ পাদঃ, প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, শ্রোত্রং পাদঃ ইতি অধ্যাত্মম্। অথ অধিদৈবতম্—অগ্নিঃ পাদো, বায়ুঃ পাদঃ, আদিত্যঃ পাদো, দিশঃ পাদঃ। ইতি উভয়ম্ আদিষ্টং ভবতি, অধ্যাত্মঞ্চাধিদৈবতঞ্চ।" ২।

অর্থাৎ "সেই এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্। যথা—বাক্ তাঁহার একটী পাদ,

প্রাণ তাঁহার একটী পাদ, চক্ষু তাঁহার একটী পাদ, শ্রোত্র তাঁহার একটী পাদ। ইহাই হইল অধ্যাত্ম। আর অধিদৈবত এই—অগ্নি তাঁহার একটী পাদ, বায়ু তাঁহার একটী পাদ, আদিত্য তাঁহার একটী পাদ, দিক্ তাঁহার একটী পাদ। এই অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত উভয়ই আদিষ্ট হইল।" ২।

"বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থপাদঃ, সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ।" ৩।

অর্থাৎ "বাক্ই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। উহা অগ্নিস্থ জ্যোতিঃ দ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ দান করে। যিনি ইহা জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা দীপ্তি পান এবং তাপ দান করেন।" ৩।

অতঃপর প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্র সম্বন্ধে ঠিক ঐ ভাবের কথা আছে; সুতরাং তাহার উদ্ধার এস্থলে বাহুল্য। এখন দেখ, "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" বলিয়া উপক্রম করিয়া "য এবং বেদ" বলিয়া উপসংহার করায় এস্থলে বেদন ও উপাসনা এক হইল বটে, কিন্তু ইহার ফলটা কি একবার দেখা উচিত নহে? ইহার ফল "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন" অর্থাৎ কীর্ত্তি যশ ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা তিনি দীপ্তি পান ও তাপ দান করেন। দেখ, ইহাতে মোক্ষ লাভের কথা নাই; যাহা আছে, তাহা কীর্ত্তি যশ প্রভৃতি ইহলৌকিক অভ্যুদয় মাত্র। যদি বল, ব্রহ্মতেজ লাভ হয় যখন বলা হইয়াছে, তখন অনুমান করিতে হইবে, উহাতে মোক্ষ লাভ হয়, একথা বলাও শ্রুতির অভীপ্সিত। তাহাও বলিতে পার না—কারণ, ব্রহ্মতেজ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণোচিত কতকগুলি বিশেষ গুণও বুঝাইতে পারে। দেখিতেও পাওয়া যায় যে, যে ব্রাহ্মণের শাপ ও বরদান সফল হয়—যিনি সত্যবাদী, ব্রহ্মচারী, তাঁহাকেও লোকে ব্রহ্মণ্যতেজে তেজীয়ান্ বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সিদ্ধ হয় না। আর যদি 'ব্রহ্মবর্চ্চসেন' পদের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানই বলিতে চাও, তাহা হইলেও, উহার সঙ্গে যশ ও কীর্ত্তির কথা থাকায় এ উপাসনার ফল কেবল ব্রহ্মজ্ঞান নহে, পরন্তু উহার সঙ্গে ইহলৌকিক অভ্যুদয়ও আছে বলিব। সুতরাং আচার্য্য রামা-

নুজের প্রথম দৃষ্টান্তের ফলে মোক্ষসাধক উপাসনা ও বেদন এক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিল না।

অবশ্য এ অবস্থায় আচার্য্য রামানুজের পক্ষ হইতে একটী কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহাতে সদ্‌যুক্তি দেখিতে পাই না। যাহা হউক, এস্থলে আমরা তাঁহার পক্ষ হইতে ঐ কথাটী বিচার করিয়া এই প্রবন্ধটী এস্থলে শেষ করিব, অবশিষ্ট শ্রুতির বিচার প্রভৃতি বারান্তরে করা যাইবে। কথাটা এই যে, উপরিউক্ত উপাসনার ফলে যে ব্রহ্ম-তেজের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানকেই বুঝায় এবং কীর্ত্তি যশ প্রভৃতি ইহলৌকিক অভ্যুদয়ের কথা তৎসঙ্গে কথিত হওয়ায় কোন দোষ হয় নাই। কারণ, বেদান্ত পড়িবার প্রবৃত্তি যাহাদের হয়, তাহারা যে অচিরাৎ জীবনান্ত আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক মোক্ষকামনা করে, তাহা নহে, তাহারা অবশ্যই ইহলৌকিক সুখশান্তি সম্ভোগপূর্ব্বক অন্তে মোক্ষ চাহিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এখন এ সব ব্যক্তির এজন্য কীর্ত্তি যশ প্রভৃতি যে একেবারে অনাবশ্যক, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ও কীর্ত্তি যশ সকলই প্রয়োজন এবং তজ্জন্যই এস্থলে উক্ত উপাসনার ফলে কীর্ত্তি যশ ও ব্রহ্মজ্ঞান একত্র কথিত হইয়াছে। মানবের কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যকতা বোধ অস্বাভাবিক কথা। বেদান্তে যেখানে কেবল মোক্ষের কথা আছে, তাহাতেও কীর্ত্তি যশের কথা উহ্য আছে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন—না—ও কথা ঠিক নহে। কীর্ত্তি ও যশের প্রয়োজন জীবন ধারণার্থ হইলেও, বৈরাগ্যের মাত্রানুসারে উহাদের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ও চতুর্থাশ্রমী এবং নিত্য পদার্থের অন্বেষণকারী কীর্ত্তিযশের আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ই করে না। কীর্ত্তিযশের জন্য অন্য অনেক শাস্ত্র আছে, অনেক বিদ্যা আছে, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ইহাদের অনিবার্য্য সম্বন্ধ যে সর্ব্বত্র থাকিতেই হইবে, তাহার কোন হেতু দেখা যায় না। এইজন্যই অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, সাধনচতুষ্টয়ের পর বেদান্ত-বিচারের অধিকার হয় এবং বৈরাগ্য উক্ত সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে একটী প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ব্রহ্মবর্চ্চস শব্দ দ্বারা

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং ব্রহ্মজ্ঞানীর কীর্ত্তিযশের প্রয়োজন নাই। অধিক কি, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মজ্ঞানীর কীর্ত্তিযশাকাঙ্ক্ষাই সম্ভব নহে, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা। মান অপমান, সুখ দুঃখ—সকলই হেয়, সকলই মিথ্যা। তাঁহারা নিজ অজ্ঞানবশতঃ প্রারব্ধক্ষয় মাত্র অপেক্ষা করিয়া কালাতিপাত করেন মাত্র। দ্বিতীয় কথা, বেদান্তের এক স্থলে এক-প্রকার উপাসনার ফলে ব্রহ্মজ্ঞানীর কীর্ত্তিযশ হয় বলিলে যে, বেদান্তের সর্ব্বত্র সকল প্রকার উপাসনা প্রভৃতির ফল ব্রহ্মজ্ঞান ও কীর্ত্তিযশ, তাহা বলা চলে না। কারণ, যেস্থলে ব্রহ্মজ্ঞানীর কীর্ত্তিযশের কথা নাই, সে স্থলে কীর্ত্তিযশের কথা উহ্য করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলে, বেদান্তমধ্য হইতে সেরূপ নিয়ামক বাক্য প্রদর্শন করিতে হইবে, নচেৎ উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ বেদান্তমধ্যে এরূপ নিয়ামক বাক্যও নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির ব্রহ্মবর্চ্চস শব্দে যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার কোন নিয়ামক যুক্তি নাই। অগত্যা আচার্য্য রামানুজের প্রদর্শিত শ্রুতি দ্বারা বেদান্তের জ্ঞান উপাসনা ভিন্ন আর কিছু নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ হইতে পারিল না। আচার্য্য শঙ্কর এ সকল শ্রুতি বিচার করিয়াছেন এবং এ জাতীয় বহু আপত্তি খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজের কথাগুলি অধিকাংশ স্থলেই আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বপক্ষের কথা মাত্র। যথাসময়ে এ সকল কথা পাঠকবর্গ বিদিত হইবেন।

যাহা হউক, বারান্তরে অন্য শ্রুতিদ্বয়ের অর্থবিচার এবং উপাসনা সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর অবশিষ্ট কথা আলোচিত হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা এ বৎসর কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সেবা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ৫৮৫৬ জন দুঃস্থ রোগীর সেবা হইয়াছে—তন্মধ্যে ১১জন খ্রীষ্টিয়ান ও ২০৭ জন মুসলমান। আশ্রম সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্যে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে সাহায্যদাতৃগণের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত না হইলে আর চলিতেছে না। প্রয়াগ হিন্দুর একটী প্রধান তীর্থ, তদ্ব্যতীত ইহা যুক্তপ্রদেশের রাজধানী; সুতরাং এখানে যে বহু তীর্থযাত্রী ও দরিদ্র কর্ম্মপ্রার্থী ব্যক্তিগণের সমাগম হইবে, ইহা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। আর সেই কারণেই ইহা ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির দাবী করিতে পারে—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর নিকট, কারণ, ইহা বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। এই কার্য্যে সুদূর পশ্চিমবাসীর চক্ষে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং আশা করি, আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহার জন্য যাঁহার যেরূপ শক্তি, সাহায্য পাঠাইয়া নিজেরাও ধন্য হইবেন এবং আমাদিগকেও "দরিদ্রনারায়ণ"-গণের উপযুক্ত সেবায় সক্ষম করিয়া ধন্য করিবেন।

আরও নিবেদন, এই সেবাশ্রমের নিজস্ব হাঁসপাতালবাটী নাই। সুতরাং এ পর্য্যন্ত সেবকগণকে কেবল ঔষধপথ্য বিতরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে—যাহাদের কোনরূপ আশ্রয় নাই, তাহাদিগকে স্থানাভাবে অনিচ্ছার সহিত বাধ্য হইয়া ফেরত দিতে হইয়াছে ও হইতেছে—কিন্তু এক্ষণে আর অন্ততঃ একটী ক্ষুদ্র হাঁসপাতালবাটী না হইলে চলিতেছে না। পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদের রামকৃষ্ণ মিশনের এই নূতন অনুষ্ঠানটীর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, তাঁহারা "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ" ঠিকানায় পত্র লিখিলে, ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন। ঐ স্থানেই অর্থসাহায্যাদিও পাঠাইতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বিনী বাণী ও রামকৃষ্ণ মিশনের "দরিদ্র নারায়ণ" সেবানুষ্ঠানের বহু সফল দৃষ্টান্তে প্রোৎসাহিত হইয়া বঙ্গদেশের —এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষের—নানা স্থানে দরিদ্রভাণ্ডার, অনাথ-ভাণ্ডার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তন্মধ্যে বহুবাজার (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ সমিতি অনাথভাণ্ডারের অষ্টম বার্ষিক ও দ্বারহাটা (হুগলি)

রামকৃষ্ণ-দরিদ্রভাণ্ডারের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথমটীর প্রধান কার্য্য—অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা। আলোচ্য বর্ষের শেষে আশ্রমে ২২টী অনাথ বালক প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছে। ইহা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি এবং অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে অনাথ বালকগণের বাসোপযোগী একটী নিজস্ববাটী প্রস্তুত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। দ্বিতীয়টী হুগলি জেলার একটী ক্ষুদ্রগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধ্যমত "দরিদ্রনারায়ণ"-গণের সেবার চেষ্টা করিতেছে। বিগত ২৭শে এপ্রিল শ্রীরামপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ, এন্, সেন মহোদয়ের সভাপতিত্বে উহার দ্বিতীয়-বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমরা এই উভয় ভাণ্ডারের নিঃস্বার্থ জীবসেবাকার্য্যে শ্রীভগবানের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, আর ইহাদের সেবকগণকে বলি,—তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখের দিকে চাহিয়া নিঃস্বার্থভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকুন—তিনি তাঁহাদের সতুদ্যমে নিশ্চিত সহায় হইবেন। আশা করি, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এইরূপ আশ্রম ও ভাণ্ডারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দেশের আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ দেশের সর্ব্ববিধ যথার্থ কল্যাণ সাধনে আপনাদের মনপ্রাণ নিয়োজিত করিবেন।

গত ৩১শে চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য ভক্তবর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত ইটালি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চ্চনালয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব অতি আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে পূজা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং প্রসাদ-বিতরণাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। এবার এই উৎসবে মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানগণ পৃথক্ পৃথক্ দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সমবেত হওয়ায়, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। মাড়োয়ারিগণও পৃথক্ দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া, তাঁহাদের ভাবানুযায়ী ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থান হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব-সংবাদ পাইয়াছি। সর্ব্বস্থলেই পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, প্রসাদ-বিতরণাদিতে আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল।

কোটালিপাড়ায় (ফরিদপুর) তিন বৎসর ধরিয়া একটী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। গত বর্ষে ইহা হইতে ৩৮ জন নিরাশ্রয় ব্যক্তি মাসিক সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন এবং ২৮ জনকে সাময়িক সাহায্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৪৭টী রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা হয়। সম্প্রতি ঐ স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ব্রহ্মচারী। যতীশচন্দ্র সেন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কোচবিহার। মূল্য ৷৹ আনা।

এই কিঞ্চিদধিক একশত পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য লিখিত। সেইজন্য ইহা প্রধানতঃ শরীর, মন ও আত্মা এই তিন অংশে বিভক্ত। প্রারম্ভে দিনচর্য্যা ও পরিশিষ্টে কয়েকটী ভগবৎস্তোত্র ও তাহার বঙ্গানুবাদ ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। আহার, ব্যায়াম, ইন্দ্রিয়সংযম, অধ্যয়ন, উপাসনা প্রভৃতি ছাত্রজীবনে জ্ঞাতব্য যাবতীয় তত্ত্বসম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রীয় উপদেশ ও দৃষ্টান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উপদেশ ও মনীষিগণের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অতি সরল ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস—ছাত্রগণ এই পুস্তিকাখানি কাছে কাছে রাখিয়া ইহার উপদেশানুযায়ী জীবন নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ (লক্ষ্মীনারায়ণস্মৃতি)।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবার পর যাহাতে নিতান্ত নিঃস্ব ব্যক্তিগণও এই পুস্তক এক একখানি কাছে রাখিয়া নিত্য পাঠ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে বাগবাজারনিবাসী শ্রীহরিপদ দত্ত ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ভ্রাতৃদ্বয় উদ্বোধন-সত্ত্বাধিকারীর অনুমতি লইয়া একসহস্র খণ্ড নিজেদের ব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়া আপনাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিবিজড়িত করিয়া দরিদ্রগণকে বিতরণ করেন। এবারেও তাঁহারা প্রায় দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত ৬ষ্ঠ সংস্করণ পুস্তকখানি ঐরূপে দুইসহস্র খণ্ড মুদ্রিত করাইয়া বিতরণ করিতেছেন। এইরূপ নিষ্কামভাবে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে সহায়তার জন্য তাঁহারা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হউন। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১নং, রামকান্ত বসুর ১ম গলি, লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানায় উহা পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

মধুর ভাব।

(স্বামী সারদানন্দ)

সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা সুকঠিন। কারণ, সাধনা সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থূল মূর্ত্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্যবস্তু ও ব্যক্তিসকল অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্য্য দেখা যায় না, অথবা রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগসুখ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে পশ্চাৎপদ ও পদদলিত করিতে নিজ শরীরেন্দ্রিয়াদিসহায়ে যেরূপ অপূর্ব্ব উদ্যম ও চেষ্টার প্রয়োগ করে এবং বিষয়বিমুগ্ধ সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে—সেরূপ উন্মাদ উদ্যমাদিরও কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্ম-জন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কারপ্রবাহ। আছে কেবল, বাহ্যবস্তু বা ব্যক্তি-বিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তদ্ভাবে মনের একতানতা আনয়ন করিবার ও তল্লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের সহিত দৃঢ় সংকল্প-পূর্ব্বক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল বাহ্যবিষয়সমূহ হইতে সাধক-মনের ক্রমে এককালে বিমুখ হইয়া নিজাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, অন্তররাজ্যের গভীর গভীরতর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ হইতে হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবস্তরসমূহের উপলব্ধি করা এবং পরিশেষে নিজাস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যদবলম্বনে সর্ব্বভাবের এবং অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যদাশ্রয়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 'অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় একমেবা-দ্বিতীয়ং' বস্তুর উপলব্ধি ও তাহাতেই একীভূত হইয়া অবস্থিতি। পরে,

সংস্কারসমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের সংকল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম্ম চিরকালের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত, যে পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্ব্বোক্ত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই পথ দিয়া সমাধি অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জ্জগতের উপলব্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরূপে সমাধি হইতে বাহ্য এবং বাহ্য হইতে সমাধি অবস্থায় উহার গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। আবার সৃষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটি সাধকমনের কথা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে, যাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সমাধি অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থানভূমি—যেন, ইতর সাধারণ মানবের কল্যাণের জন্য কোনরূপে জোর করিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ মনকে কিছু কালের জন্য সংসারের বাহ্যভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনেতিহাস আমরা যতই অবগত হইব, ততই বুঝিব—তাঁহার মন পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিল। তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনায় যদি আমাদের ঐরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার জন্য লেখকের ত্রুটিই দায়ী, তিনি নহেন। কারণ, তিনি আমাদিগকে বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন, 'ছোট ছোট এক আধটা বাসনা জোর করিয়া রাখিয়া তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্য নিচে নামাইয়া রাখি!—নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই অখণ্ডে মিলিত ও একীভূত হইয়া, অবস্থানের দিকে।'

পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে প্রাচীন ঋষিগণের কেহ কেহ—সর্ব্বভাবের অভাব বা শূন্য বলিয়া, আবার কেহ কেহ—সর্ব্বভাবের পূর্ণতা বা পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ, সকলেই উহাকে সর্ব্বভাবের উৎপত্তি এবং লয়ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধ যাহাকে সর্ব্বভাবের নির্ব্বাণভূমি বা শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্কর তাহাকেই বেদান্তোক্ত পূর্ণ বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের কথা আলোচনা করিলে ঐরূপই প্রতিপন্ন হয়।

শূন্য বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাব ভূমিই উপনিষৎ ও বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, উহাতে সম্যক্‌-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক সমরসমগ্ন হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, সসীম মানবমন আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তদাস্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হয়, সে সকল হইতে অদ্বৈতভাব একটি পৃথক্‌ অপার্থিব বস্তু। পৃথিবীর মানুষ, ইহ-পরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগসুখে এককালে উদাসীন হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণাপেক্ষা উচ্চ পদবী লাভ করিলে তবেই ঐভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উহা দ্বারা সেই নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

অদ্বৈতভাব এবং উহা দ্বারা উপলব্ধ নির্গুণব্রহ্মের কথা ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ পঞ্চভাব প্রকাশই দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেকটিরই সাধ্য বস্তু ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম। অর্থাৎ সাধক মানব, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব-বান্‌, সর্ব্বশক্তিমান্‌, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি ঐসকল ভাবের অন্যতমের আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হয়, এবং সর্ব্বান্ত-র্যামী সর্ব্বভাবাধার ঈশ্বরও তাহার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহারই ভাবানুরূপ তনু ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া তাহার ভাব পরিপুষ্টি করিয়া থাকেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের নানা ভাবময় চিদ্ঘন মূর্ত্তি ধারণ এবং এমন কি, স্থূল মনুষ্যবিগ্রহে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্টপূর্ণ করণের কথা শাস্ত্র ও ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব, অন্য সকল মানবের সহিত যে সকল ভাব লইয়া নিত্য সম্বন্ধ থাকে, শান্ত দাস্যাদি পঞ্চভাব সেই পার্থিব ভাবসমূহেরই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ প্রতিকৃতি স্বরূপ। দেখা যায়, সংসারে আমরা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা,

রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হইলে ইতরসকলের সহিত শ্রদ্ধাসংযুক্ত শান্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। ভক্ত্যাচার্য্যগণ ঐ সম্বন্ধসকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং উহাদিগের অন্যতমের অন্তর্গত ভাবকে ঈশ্বরে আরোপ করিয়া অধিকারিভেদে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ, শান্তাদি পঞ্চভাবের সহিত জীব সংসারসম্বন্ধে নিত্য পরিচিত থাকায় তদবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুগম হইবে। শুদ্ধ তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক ঐসকল ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেষাদি যে সকল বৃত্তি তাহাকে সংসারে ইতিপূর্ব্বে নানা কুকর্ম্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরার্পিত ভাবপ্রেরণায় সে সকল বৃত্তি তাহার মনে উত্থিত হইলেও উহাদের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখেই অগ্রসর করিয়া দিবে। যথা—সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্‌রোগ কাম তাহাকে ঈশ্বরদর্শন কামনায় নিযুক্ত রাখিবে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্য বস্তু ঈশ্বরের অপূর্ব্ব প্রেম সৌন্দর্য্যাদি সম্ভোগ লোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশ্বরের পুণ্য দর্শন লাভে কৃতকৃতার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্ব্ব ধর্ম্মশ্রী দেখিয়া তল্লাভের জন্য সেও কাতর হইয়া উঠিবে।

শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে জীব এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ সকল ভাবের এক দুই বা ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়া এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐসকল আচার্য্যগণের অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোন প্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই ঐ প্রেম সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি মানব

যতদিন না করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সে ঈশ্বরের কোন না কোন প্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পনা ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

আবার, প্রেমের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমূলক ভেদোপলব্ধি এককালে তিরোহিত করিয়া দেয়। ভাবসাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন হইতেও উহা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে তাহার ভাবানুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র বলিয়া গণনা করিতে সর্ব্বথা নিযুক্ত করে। এজন্যই দেখা যায়, ঐপথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তিরস্কারাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সেজন্যই আবার, পূর্ব্বোক্ত ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটি যতদূর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভুলাইয়া সাধককে কেবলমাত্র তাঁহার প্রেম ও মাধুর্য্যের উপলব্ধি করাইতে সক্ষম, সেটি ততদূর উচ্চভাব বলিয়া ঐপথে পরিগণিত হয়। শান্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য নির্ণয় করিয়া মধুর ভাবকে সর্ব্বোচ্চ পদবী প্রদান ভক্ত্যাচার্য্যগণ ঐরূপেই করিয়াছেন। নতুবা উহাদিগের প্রত্যেকটিই যে, সাধককে ঈশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম একথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

আবার, ঐ ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটীর চরম পরিপুষ্টিতে সাধক যে, আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হইয়া থাকে এবং বিরহাদিকালে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে আপনাব অস্তিত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে, একথাও আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপিকাগণ ঐরূপে আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞানই কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না কিন্তু সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণ-কামনায় ঈশার শরীরত্যাগের কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া কোন কোন সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমনের

কথাও প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে—শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে প্রেমের প্রাবল্যে সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় তন্ময় হইয়া অদ্বৈতভাবে উপনীত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য সাধকজীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে অদ্ভুত আলোক প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টিতেই প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজাস্তিত্ব এককালে বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, শান্ত, দাস্যাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া সর্ব্বভাবাতীত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধিতে উপনীত হইতে পারে? কারণ, অন্ততঃ দুই বস্তু বা ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত মানবমনে কোন প্রকার ভাবের উদয় স্থিতি ও পরিপুষ্টি ত হইতে পারেনা?

সত্য। কিন্তু ঐ ভাব যতই পরিপুষ্ট হয়, ততই উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল প্রকার ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পূর্ব্বপরিদৃষ্ট 'তুমি' (সেব্য), 'আমি' (সেবক) এবং উভয়ের মধ্যগত দাস্যাদি সম্বন্ধ, সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র 'তুমি' শব্দ নির্দ্দিষ্ট সেব্য বস্তুতেই প্রেমে এক হইয়া অচলভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ভারতের বিশিষ্ট আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই এককালে 'তুমি', 'আমি' ও উভয়ের মধ্যগত ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করেনা। উহা এক ক্ষণে 'তুমি' শব্দনির্দ্দিষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে 'আমি' শব্দাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; এবং ঐ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বদা দ্রুত পরিভ্রমণ করিবার জন্যই উহাদিগের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন মনে হয়, যেন উহা উহাদিগকে এবং উহাদিগের মধ্যগত ঐ সম্বন্ধকে এককালে প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের ঐ প্রকার চঞ্চলতা নষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ কথা ধরিতে সক্ষম হয় এবং ক্রমে বুঝিতে পারে যে, এক অদ্বয় পদার্থকেই দুই দিক্ হইতে

দুই ভাবে দেখিয়া 'তুমি' ও 'আমি'রূপ দুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে।

শান্ত দাস্যাদি ভাবের প্রত্যেকটি পরিপুষ্ট হইয়া মানবমনকে পূর্ব্বোক্ত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করাইতে তদবলম্বনে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্ররূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, এক এক যুগে ঐ সকল ভাবের এক একটি মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই ঐ যুগের বিশিষ্ট সাধককুল ঈশ্বরের ও তাঁহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিল। দেখা যায়, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে প্রধানতঃ শান্তভাবের, ঔপনিষদিক যুগে শান্তভাবের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবের এবং দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্ম্মসংযুক্ত দাস্য ভাবের, তান্ত্রিকযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাব সম্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈষ্ণবযুগে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম পরিস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল।

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরূপে সর্ব্বভাবাতীত অদ্বৈতভাবের এবং ঈশ্বরপ্রেমে পঞ্চভাবের পূর্ণপ্রকাশ দেখিতে পাইলেও ভারতেতর দেশীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে কেবলমাত্র শান্ত, দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাব সম্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। য়াহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সকলে রাজর্ষি সোলেমানের সখ্য ও মধুরভাবাত্মক গীতসকল প্রচলিত থাকিলেও উহারা ঐ সকলের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভিন্নার্থ কল্পনা করিয়া থাকে। মুসলমানধর্ম্মের সুফি সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও মধুর ভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও মুসলমান জনসাধারণ উহা কোরাণবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। আবার, খৃষ্টান ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরির প্রতিমাবলম্বনে জগন্মাতৃত্বের পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও উহা ঈশ্বরের ঐ ভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায় ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজার স্থায় ফলদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের

উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঐশী বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই—ফল্গু নদীর ন্যায় অর্দ্ধপথেই ঐ ভাবপ্রবাহ অন্তর্হিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন প্রকার ভাবসম্বন্ধাবলম্বনে সাধকমন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে থাকে। ঐরূপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্ব্বসংস্কারসমূহ ঐপথে বাধাপ্রদান করিয়া তাহাকে ভাসাইয়া পুনরায় বহির্ম্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ঐজন্য প্রবল পূর্ব্বসংস্কারবিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটিমাত্র ভাবে তন্ময় হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। ঐরূপস্থলে সে প্রথমে নিরুৎসাহ, পরে হতোদ্যম এবং তৎপরে সাধ্য-বস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়া বাহ্যজগতের রূপরসাদি ভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্যবিষয়বিমুখতা, ভাবপ্রসূত উল্লাস এবং উহাতে তন্ময়ত্বই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিচায়ক ও পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে পরিগণিত হইয়াছে।

কোন এক ভাবে তন্ময়ত্ব লাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখন অন্তর্নিহিত পূর্ব্বসংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই, সাধকমনের অন্তঃ-সংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন—কত দুঃখে মানবজীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তিনিই ঠাকুরকে স্বল্পকালে একের পর এক করিয়া ক্রমশঃ সকল প্রকার ভাবেই অদৃষ্টপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব লাভ করিতে দেখিয়া এককালে বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, ঐরূপ হওয়া মনুষ্যশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্ম্মবীরদিগের সাধনেতিহাস সম্যক্ লিপিবদ্ধ হয় নাই? কারণ, তৎপাঠে দেখা যায়, তাঁহাদিগের সাধন-পথে প্রবেশের পূর্ব্বে বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্যাগের কথার এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভের পরে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মনের কল্যাণের

জন্য যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। দেখা যায়, পূর্ব্বসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সম্যক্ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহারা সাধন-কালে যে অপূর্ব্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাষ-মাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অথবা রূপক এবং অতি-রঞ্জিত বাক্যসহায়ে উহা এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ঐ সকল বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির করিয়া লওয়া আমাদিগের পক্ষে এখন সুকঠিন হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমা-দিগের কথা বুঝিতে পারিবেন—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণসাধনোদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তি লাভের জন্য অনেক সময় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে তিনি কিছুকাল জল বা পবনাহার পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি কথা ভিন্ন তাঁহার অন্তরের ভাবপরম্পরার বিবরণ কিছুমাত্র পাওয়া যায় না।

ভগবান্ বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিষ্ক্রমণ ও পরে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার সাধনেতি-হাস ততদূর পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য ধর্ম্মবীরগণের ভাবেতি-হাসের যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রূপ না হইয়া উহার অল্প স্বল্প কিছু পাওয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়—সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আহার সংযম করিয়া তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর একাসনে ধ্যান তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপূর্ব্বক, 'আস্ফানক' নামক ধ্যানাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কালে পূর্ব্বসংস্কারসমূহের সহিত তাঁহার সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় স্থূল বাহ্য ঘটনার সহায়তা লইয়া রূপক অবলম্বনে গ্রন্থকার 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

ভগবান্ ঈশার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের কয়েকটি ঘটনামাত্র

লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার একেবারে তাঁহার ত্রিংশ বৎসরে জন্ নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে অভিষেক গ্রহণপূর্ব্বক বিজন মরুপ্রদেশে একাকী প্রবিষ্ট হইয়া চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যান তপস্যার এবং 'শয়তান' কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া দৃঢ়সংকল্প ও ঈশ্বরনির্ভরতাসহায়ে তদুপরি জয়লাভ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা করিয়াছেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর মাত্র স্থূল শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে কি ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই।

ভগবান্ শঙ্করের জীবনের ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য অনেকটা পাওয়া যাইলেও তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

আবার, মাত্র চারিশত বৎসরের কথা বলিয়া প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের জীবনে ঐ বিষয়ের অনেক কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যাইলেও তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিহারাদির ভিতর দিয়া রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায় মানবসাধারণে অনেক সময় উহার বিপরীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বসে অথবা কল্পনা ও শ্রীগুরুসহায়ে উহার সামান্য মাত্রই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ধর্ম্মবীর শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গেরা সাধকমনের সখ্য, বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ মধুর ভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত যে যে অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সকল কথা ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায়, ততদূর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল, ঐ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটির সর্ব্বোচ্চ তন্ময়াবস্থায় সাধকমন যে, প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অনুভব পূর্ব্বক এক অদ্বয় বস্তুতে পরিলীন হইয়া থাকে—এই চরম তত্ত্বটিই তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনেতিহাসই আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগে ঐ তত্ত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্ম্মভাব যে, সাধকমনকে

একই লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এবিষয় সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা গণনায় না আনিলেও তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে অতি প্রসার এবং সমন্বয়তায় প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র সংসার তাঁহার নিকট চিরকালের জন্য নিঃসংশয় ঋণী হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথ প্রদর্শন না করিলে কখনই উহা ঈশ্বর লাভের জন্য এত লোকের অবলম্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শান্তি ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অনুষ্ঠিত হয় নাই, একথা তাঁহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইলে শ্রীবৃন্দাবন পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সামান্য বনমাত্র বলিয়াই সাধারণে পরিগণিত থাকিত।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেই যত্নশীল বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ বলিবেন, কিন্তু বৃন্দাবনলীলা তোমরা যেরূপ বলিতেছ, সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বিষয়েরই যে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব তোমাদের এতটা হাসি কান্না, ভাব মহাভাব সবই যে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তদুত্তরে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ বলিতেছি, উহা যে তদ্রূপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার? তোমার ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, এবিষয়ে যত দিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব, তোমার সন্দেহই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই কখন তুমি ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেই বা আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে? নিত্য বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য ঐরূপ লীলাদিকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে উহা চিরকালই সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাশ্যামের

ঐরূপ অপূর্ব্ব প্রেমলীলা যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কামগন্ধহীন হও এবং শ্রীমতীর সখীদিগের অন্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয়েই শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত এবং তোমাকে লইয়া ঐরূপ লীলা নিত্য হইতেছে।

বাস্তবিক, ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহ্যঘটনারূপ আলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন নাই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্য্যের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ লীলার কথা সোৎসাহে বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাঁহার সমীপাগত ইংরাজীশিক্ষিত নব্য যুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ্‌না, ধর্‌না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হ'লে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। দেখ্ দেখি, গোপীরা স্বামিপুত্র, কুল শীল, মান অপমান, লজ্জা ঘৃণা, লোক-ভয়, সমাজ-ভয়—সব ছেড়ে কেমন শ্রীগোবিন্দের জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল!—ঐরূপ কর্‌তে পার্‌লে তবে ভগবান্ লাভ হয়!" আবার বলিতেন—"কামগন্ধহীন না হ'লে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখ্‌লেই গোপীদের মনে কোটি কোটি রমণসুখের অধিক আনন্দ হ'ত, দেহবুদ্ধি হারিয়ে যেত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হতে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হ'তে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হ'য়ে তাদের শরীরকে স্পর্শ ক'রে প্রতি রোমকূপে যে তাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত।" বাস্তবিক শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত সহস্র আপত্তি উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত এবং তাঁহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলম্বনে প্রকাশিত মধুর ভাবসম্বন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে—চিরকালই ঐ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবান্‌কে নিজ পতিস্বরূপে দেখিয়া তাঁহার পুণ্য দর্শনলাভে

ধন্য হইবে, 'এবং পরিশেষে ঐ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপেও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও পুংশরীরধারীদিগের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অতএব একথা সহজেই মনে উদিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ বিসদৃশ সাধনপথ কেন লোকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদুত্তরে বলিতে হয় যে, যুগাবতার-গণের সকল কার্য্য লোককল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্ত্তনও ঐজন্যই হইয়াছিল। তৎকালীন সাধকগণ আধ্যাত্মিক পথে যেরূপ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য বহুকাল হইতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিনি ঐ পথে তাহাদিগকে অগ্রসর করিয়াছিলেন। নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে, ঐ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়া উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুইপ্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরে ভাবসহায়ে তিনি লোককল্যাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে সর্ব্বভাবাতীত অদ্বয় ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।'

বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দেশে বজ্রাচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন—নির্ব্বাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হইয়া ধ্যানাদিসহায়ে যখন মহাশূন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন 'নিরাত্মা' নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন এবং তখন সাধকের শরীররূপ ভোগায়তন না থাকিলেও তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্ব্ব ভোগসুখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়া থাকেন। ঐরূপে জনসাধারণে

প্রচারিত স্থূলবিষয়ভোগত্যাগে ভাবরাজ্যে সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখ-প্রাপ্তিরূপ তাঁহাদের ঐমত যে কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জ ভোগসুখপ্রাপ্তিকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগসুখলাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল, এবং যথার্থ সাধককুল বজ্রাচার্য্যগণের পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মমতাবিষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভে প্রয়াসী হইয়াও যে, যথার্থ পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য নিজজীবনে অনুষ্ঠান করিয়া অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ঐ সকল সাধকদিগের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা করিলে জীব যে, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দলাভে সত্য সত্যই সমর্থ হয়, তাহাও স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন এবং স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকটে ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসংকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিলেন। ঐরূপে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুলবিকৃত বৌদ্ধসম্প্রদায় তাঁহার কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল এবং বিকৃত বামাচার অনুষ্ঠানকারীর দলও প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্যই কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইবার কালে শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—এবং জগতের

স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশসম্ভূত, অতএব তাঁহার স্ত্রী—সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জীব তাঁহাকে পতিরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাহার গতি, মুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রাপ্তি হয়—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের স্থূল কথা। সর্ব্বভাবের একত্র সমাবেশ মহাভাবে। প্রধানা গোপী শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবান্তর্গত উনবিংশ প্রকার অন্তর্ভাবের এক দুই বা ততোধিক ভাবস্বরূপিণী। সুতরাং ব্রজগোপিকা-গণের ভাবানুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক ঐ সকল অন্তর্ভাব নিজায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোত্থ মহানন্দের আভাষও প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়া থাকে। ঐরূপে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাবানুধ্যানে নিজ সুখবাঞ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই সাধকের চরম লক্ষ্য।

আবার যথাবিধানে বিবাহিত নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রেম—জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় প্রভৃতি নানা বাহ্য বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া প্রবাহিত হয়। ঐরূপ নায়ক নায়িকা ঐ নিয়মের সীমার ভিতরে থাকিয়া নানা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তবে পরস্পরের সুখসম্পাদনে যতদূর সম্ভব ত্যাগ-স্বীকার করিয়া থাকে। বিবাহিতা নায়িকা ঐ কঠোর নিয়মবন্ধন যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময় নায়কের প্রতি নিজ প্রেম-সম্বন্ধ ভুলিতেও সঙ্কুচিতা হয় না। স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ। প্রেমের প্রাবল্যে ঐরূপ নায়িকা অনেক সময় ঐ নিয়ম-বন্ধনকে পদদলিত এবং নিজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে কুণ্ঠিতা হয় না। সেজন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐরূপ সর্ব্বগ্রাস-করী প্রেমসম্বন্ধই ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন এবং বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা সেজন্যই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্বত্যাগিনী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মধুর ভাবকে অন্য চারি প্রকার ভাবের সার সমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, প্রেমিকা নায়িকা ক্রীতদাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সখার ন্যায় সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে সুপরামর্শ দানপূর্ব্বক তাহার আনন্দে উল্লসিতা ও দুঃখে সমবেদনাযুক্তা হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাহার শরীর মনের পোষণে এবং কল্যাণ-কামনায় নিযুক্তা থাকেন এবং ঐরূপে আপনাকে ভুলিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাহার কল্যাণসাধন ও চিত্তবিনোদনপূর্ব্বক তাহার মন অপূর্ব্ব শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন। যে নায়িকা ঐরূপে নিজ প্রেমে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃতা হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধা হইয়া থাকেন, তাহার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমর্থা প্রেম বলিয়া ভক্তিগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বার্থগন্ধদুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসা প্রেমে নায়িকা প্রিয়ের সুখের ন্যায় আত্মসুখের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণী শ্রেণীভুক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্যই নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে। সে যাহা হউক, ঐরূপে সাধকগণকে কঠোর ত্যাগের আদর্শে জীবন নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষাপ্রদান এবং নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তৎকালে দেশের ভাবপরিবর্ত্তনে ও ব্যভিচার নিবারণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ফলেও তৎ-কালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবীন সমাজবন্ধনে আনিয়া, জাতিবহির্ভূতদিগকে ভগবদ্ভক্তরূপ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভূত 'অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার' নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ শ্রীশ্রীজগৎস্বামীর তীব্র ধ্যানানুচিন্তনে পবিত্রচেতা সাধকের সত্যসত্যই উপস্থিত হইয়া থাকে, একথা নিঃসংশয় প্রমাণিত করিয়া তৎপ্রচারিত মধুরভাব অলঙ্কার শাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকলের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, কুকাব্যসকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের

উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল, এবং শান্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্য পরিহর্ত্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ, শ্রীভগবান্‌কে আপনার করিয়া লইয়া তন্নিমিত্ত এবং তাঁহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া উহা অধিকারিবিশেষের সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুর ভাব, পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও বেদান্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন, ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানবমনে দৃঢ়সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কারের জন্যই আমরা এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকি। ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্ত্তে যদি আমি জগৎ নাই বলিয়া ঠিক্ ঠিক্ ভাবনা করিতে পারি, তবে তদ্দণ্ডেই উহা আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অন্তরাল হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইবে। জগৎ আছে ভাবি বলিয়াই আমার নিকট জগৎ বর্ত্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্যে স্ত্রী বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার মানবহৃদয়ে একভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট। অতএব ঈশ্বরের প্রতি কোন ভাবসম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে মনের অন্য সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেষ্টাকে তিনি অন্য কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 'আমি দেহী' বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী' বলিয়া সংস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া 'আমি স্ত্রী' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক পুরুষ আপনার পুংস্ব ভুলিতে সক্ষম হইলে তিনি যে উহার পরে 'আমি স্ত্রী', এ ভাবকেও অতি সহজেই নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুর ভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই

উপস্থিত হইবেন, বেদান্তবাদী দার্শনিকের চক্ষে ইহাই সর্ব্বথা প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের চরম লক্ষ্য? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্ত্তমানে উহা অস্বীকার পূর্ব্বক সখীভাব প্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাব লাভ সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও—উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণ-গত পার্থক্যই বর্ত্তমান। দেখা যায়, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদনে সর্ব্বদা যত্নবতী। আবার দেখা যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাব পরিপুষ্টির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই—আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে, তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অনুমিত হয়।

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুর ভাবের যাঁহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোস্বামিপাদ-গণের গ্রন্থসমূহের এবং শ্রীবিদ্যাপতি চণ্ডীদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিকুলের পূর্ব্বরাগ, দান, মান ও মাথুর সম্বন্ধীয় পদাবলীসকলের আলোচনা করিবেন। মধুর ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

৬৩, সেণ্টজর্জ্জের রোড।

লণ্ডন দক্ষিণ-পশ্চিম।

৬ই জুলাই, ১৮৯৬।

প্রিয়—

* * * * *

আট্‌লাণ্টিকের এপারে এসে আমি বেশ আছি এবং আমার কার্য্যাদিও অতি সুন্দররূপে চল্‌ছে।

আমার রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলি লোকের খুব হৃদয়গ্রাহিনী হয়েছিল —ক্লাসগুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাযের মুরসুম শেষ হয়ে গেছে— আমিও সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমি মিস্ মুলারের সঙ্গে সুইজরলণ্ডে বেড়াতে যাচ্চি।—রা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো—বড় অদ্ভুতভাবে তাঁদের এদিকে ফিরিয়েছেন। আমি জো—র বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্য্যপ্রণালীর শতমুখে প্রশংসা না করে থাকতে পার্‌ছি না। তাঁকে একজন সুচতুর রাজনীতিবিশারদ রমণী বল্‌তে পারা যায়। তিনি প্রয়োজন হলে একটা রাজ্য চালাতে পারেন। আমি, মানুষের ভিতর এমন চটু করে সব বিষয় ধর্‌বার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি আবার উহাকে ভাল বিষয়ে প্রয়োগ কর্‌বার ক্ষমতা খুব অল্পই দেখেছি। আমি আগামী শরৎকালে আমেরিকা ফির্‌ব ও তথাকার কার্য্যভার আবার গ্রহণ কোর্‌বো।

গত পরশ্ব সন্ধ্যায় আমি মিসেস্ ম—র বাটীতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। উক্ত মহিলার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত ইতিমধ্যেই জো—র পত্রে অনেক খবর পেয়েছ।

যা হক, ইংলণ্ডে কায খুব আস্তে আস্তে অথচ সুনিশ্চিতভাবে বেড়ে চলেছে। এখানকার অন্ততঃ অর্দ্ধেক নরনারী আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কার্য্যসম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাকুক, ইহা যে চারিদিকে ভাব ছড়াবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

যন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমার সংকল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার ভাবরাশি প্রদান কোর্ব্বো—তা হলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে। অবশ্য সব বড় বড় কাযই খুব আস্তে আস্তে হয়ে থাকে—উহার বাধাবিঘ্নও অনেক—বিশেষ আমরা হিন্দুরা—বিজিত জাতি বলে। কিন্তু তাও বলি—যেহেতু আমরা বিজিত, সেই হেতু আমাদের ভাব চারিদিকে ছড়াতে বাধ্য—কারণ, দেখা যায়—আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য হতে উদ্ভূত হয়েছে। দেখ না—য়াহুদীরা তাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে রোম সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বোপরি, সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবলপ্রতাপশালী এঙ্‌লো-ইণ্ডিয়ান্‌দের মধ্যেও যে ভগবান্ রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে, শয়তান বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্য্যন্ত ভালবাস্‌তে পারবো।

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলুম যে, কারও সঙ্গে সহানুভূতি কর্ত্তে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চল্‌তে পারতাম না—কল্‌কেতার যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে পর্য্যন্ত চল্‌তাম না। এখন তেত্রিশ বছর বয়স—এখন বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও উঠবে না। *এ কি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি—না—আমার হৃদয় ক্রমে* উদার হয়ে হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছি? আবার লোকে বলে শুনতে পাই—যে ব্যক্তি চার দিকে মন্দ, অমঙ্গল দেখ্‌তে না পায়, সে ভাল কায করতে পারে না—সে একরকম অদৃষ্টবাদী হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়। আমি ত তা দেখ্‌ছি না। বরং আমার কার্য্যশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের সফলতাও খুব অধিক হচ্ছে। কখন কখন আমার এক প্রকার ভাবাবেশ হয়—

আমার মনে হয়, জগতের সব্বাইকে—সব জিনিষকে আশীর্ব্বাদ করি—সব জিনিষকে ভালবাসি—আলিঙ্গন করি। তখন দেখি—যাকে মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তিমাত্র। প্রিয়—, এখন আমি সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি—আর তুমি ও মিসেস্ ল—আমায় কত ভালবাস ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে সত্যসত্যই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছি। আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাকে ধন্য ধন্য কর্‌ছি। আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি,আর যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ ('মন্দ' কথাটীতে ভয় পেয়ো না) প্রত্যেক কাযটী লক্ষ্য করে আস্‌ছেন—কারণ, আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি—কোন্ কালেই বা তা ছাড়া আর কিছু ছিলাম?—যাঁর সেবার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি—আমার প্রেমাস্পদদের ত্যাগ করেছি—সব সুখের আশা ছেড়েছি—জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি? তিনি আমার সদাক্রীড়াশীল আদরের ধন—আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোন খানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। তিনি আবার কোন্ হেতুতে বা যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎনাট্যের সকল অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় কচ্চেন। জো—যেমন বলে—ভারি তামাসা, ভারি তামাসা।

এ ত বড় মজার জগৎ আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু। সব জগৎটা খুব মজা নয় কি? আমাদের পরস্পরে পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বল আর খেলুড়েগিরিই বল, এ যেন জগতের এই ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল ইস্কুলের ছেলেকে খেল্‌তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—আর সকলে খুব চেঁচামেচি করে খেলা কচ্চে—তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি কোর্‌বো—কাকে নিন্দা কোর্‌বো—এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়—কিন্তু তাঁকে ব্যাখ্যা কর্‌বে কিরূপে? তাঁর ত মাথা মুণ্ডু কিছু নেই—তিনি যুক্তিবিচারেরও কোন ধার ধারেন না। তিনি আমাদের সকলকে ছোটখাট মাথা

ও বুদ্ধি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন—কিন্তু এবার আর আমায় ঠকাতে পাচ্চেন না—আমি এবার খুব হুঁসিয়ার ও সজাগ আছি।

আমি এতদিনে দু একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে, ভাব, "প্রেম", "প্রেমাস্পদ"—এসকল যুক্তিবিচার, বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্যাডম্বরের বাইরে—ওসব হতে অনেক দূরে। ওহে 'সাকি', * পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেম-মদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই—

ইতি

তোমারই পাগল বিবেকানন্দ।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি খণ্ডন।

(৯)

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।)

বেদান্তমধ্যে "বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানমূলক উপাসনা বিহিত হইয়াছে," এই কথাটী প্রমাণ করিবার জন্য আচার্য্য রামানুজ বলেন—বেদান্তোক্ত বেদনের (অর্থাৎ জ্ঞানের) অর্থ উপাসনা, এবং ইহা প্রমাণের জন্য তিনি তাঁহার শ্রীভাষ্যমধ্যে তিনটী বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার উদ্ধৃত প্রথম বেদান্তবাক্যসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর যাহা বক্তব্য, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয়

* সাকি—প্রাচীন পারসীকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অভ্যাগতগণের পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া দিত, তাহাকে সাকি বলিত। হাফেজ প্রভৃতির কবিতায় এই সাকি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

বেদান্তবাক্যসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর যাহা বক্তব্য, তাহাই আলোচিত হইবে।

বলা বাহুল্য, অদ্বৈতবাদী বেদান্তে "বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানমূলক উপাসনা বিহিত হইয়াছে" ইহা স্বীকার করেন না এবং বেদান্তোক্ত বেদন অর্থে যে সর্ব্বত্র উপাসনাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাও বলেন না। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে একাধিকবার কথিত হইয়াছে এবং এস্থলেও যথাস্থানে পুনরায় কথিত হইবে।

যাহা হউক, আচার্য্য রামানুজ উপরি উক্ত উদ্দেশ্যে যে দ্বিতীয় বেদান্তবাক্যটী প্রমাণরূপে উদ্ধার করেন, তাহা এই;—"ন স বেদ অকৃৎস্নোহি এষঃ, আত্মা ইত্যেব উপাসীত।" বৃহঃ ১।৪।৭, অর্থাৎ "সে জানে না, যেহেতু ইহা অকৃৎস্ন, আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে।"

এই অর্থটীকে শ্রীভাষ্যের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই,—

অর্থাৎ "[যে লোক প্রাণাদি সমষ্টির মধ্যে ঘ্রাণ বা চক্ষু প্রভৃতি এক একটী অংশমাত্রকে সম্পূর্ণ আত্মা বলিয়া উপাসনা করে] সে লোক [পূর্ণ আত্মাকে] জানে না, যেহেতু এই ঘ্রাণ বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, —কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা নহে—আত্মার একদেশ মাত্র। [তাঁহাকে] আত্মা অর্থাৎ ঐ সকল অংশের ব্যাপক বলিয়াই উপাসনা করিবে।" বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ৭ম খণ্ড।

পণ্ডিত মহাশয় যেরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত শ্রুতির পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের অর্থ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে শ্রুতির অর্থটী স্পষ্টতর হইয়াছে। পরন্তু ইহা আচার্য্য রামানুজের অভিপ্রায়ের কতটা অনুকূল হইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়; কারণ, একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, আচার্য্য রামানুজ কর্তৃক উদ্ধৃত শ্রুতির পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশ একত্র করিয়া অর্থ করিলে এই শ্রুতি আচার্য্য রামানুজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে না। যাহা হউক, আমাদের মনে হয়, পণ্ডিত মহাশয়ের পরিশ্রমের ফলে সত্য আবিষ্কারের সহায়তা হইয়াছে এবং তজ্জন্য ইহা সত্যানুসন্ধিৎসুর আদরণীয়

হইবে ভাবিয়াই ঐ অর্থ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। এখন দেখা যাউক, উক্ত শ্রুতিবাক্যে আচার্য্য রামানুজের মতটী কিরূপ প্রকাশ পায়।

আচার্য্য রামানুজ বলেন—যেহেতু বেদান্তোক্ত বেদন ও উপাসনা শব্দদ্বয় একই বিষয়ের উপক্রম ও উপসংহারে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই হেতু বেদন শব্দটীর অর্থ উপাসনা। এখানে "ন স বেদ" অর্থাৎ "সে জানে না" বলিয়া উপক্রম করিয়া "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" অর্থাৎ "আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে" এই বলিয়া উপসংহার করায়, যাহা "বেদ" শব্দের অর্থ, তাহাই "উপাসীত" শব্দের অর্থ হইতেছে। কারণ, "সে জানে না" এই কথাটীর প্রতি যে "হেতুবাক্য" প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেই হেতুবাক্যের বলে, যখন আত্মার উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন এই জানা ও উপাসনা যে এক—অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। "সে জানে না" এই কথাটীর প্রতি যে "হেতুবাক্য" প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা এস্থলে "অকৃৎস্নোহি এষঃ" অর্থাৎ "যেহেতু ইহা অকৃৎস্ন" এই বাক্যটী। শ্রুতিদেবী এই হেতু-বাক্যের বলে একটু পরেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবার বিধি দান করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে।

এখন যদি কেহ বলে, এস্থলে বেদন ও উপাসনা একার্থক হইলেও বেদনের অর্থ উপাসনা কেন হইবে? উপাসনার অর্থ বেদন অর্থাৎ জানা কেন হইবে না? তদুত্তরে আচার্য্য রামানুজের পক্ষ হইতে বলা যায় যে,—না, তাহা হইবে না। কারণ, এস্থলে "উপাসীত" পদ দ্বারা উপাসনা কার্য্যেই বিধি প্রদান করা হইয়াছে, "বেদ" শব্দার্থজ্ঞানে কোন বিধি প্রদান করা হয় নাই। সুতরাং উপাসনা অর্থই প্রবল হইতেছে। দ্বিতীয় কারণ—এস্থলে উপক্রমে "বেদ" শব্দ এবং উপসংহারে "উপাসীত" শব্দ আছে আর উপক্রম অপেক্ষা উপসংহারের অর্থ প্রবল হওয়া উচিত। কারণ—লোকমধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বক্তার অভিপ্রায়, বক্তা যতটা বক্তব্য শেষে বলিয়া ফেলে, ততটা বক্তব্যের প্রথমেই বলিয়া ফেলে না। এজন্য উপক্রম ও উপসংহারের

মধ্যে পরস্পরের বলের তারতম্য বিচার করিতে হইলে উপসংহারেরই বলাধিক্য সাধারণতঃ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং এস্থলে বেদন শব্দের অর্থ উপাসনা, উপাসনা শব্দের অর্থ বেদন অর্থাৎ জ্ঞান হইতে পারে না।

এইরূপে আচার্য্য রামানুজ প্রমাণ করেন যে, বেদান্তে বেদন শব্দের অর্থ সর্ব্বত্র "উপাসনা" বুঝিতে হইবে এবং বেদান্তমধ্যে বেদান্ত-বাক্যার্থজ্ঞানমূলক উপাসনাই "বিহিত" হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, অদ্বৈতবাদিগণ আচার্য্য রামানুজের এ কথার উত্তরে কি বলিতে পারেন। অদ্বৈতবাদী এতদুত্তরে প্রথমেই বলিবেন যে, এস্থলে "বেদ" ও "উপাসীত" শব্দদ্বয়ের মধ্যে উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, উভয় অর্থ তুলনা করিলে আচার্য্য রামানুজের অর্থে দোষাধিক্য দৃষ্ট হইবে। তৃতীয়তঃ, ইহাদের মধ্যে উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও এস্থলে বেদন শব্দের অর্থ উপাসনা নহে, পরন্তু উপাসনার অর্থই বেদন অর্থাৎ জানা।

এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, এস্থলে মূল শ্রুতিমধ্যে কি বলা হইয়াছে। কারণ, শ্রুতির অর্থ লইয়াই এস্থলে বিবাদ। অদ্বৈত-বাদী বলেন, এস্থলে শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের বক্তব্য সহজেই বুঝা যাইবে। কারণ, এস্থলে শ্রুতিতে আছে ;—

"তদ্ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ। তৎ নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে, অসৌনাম অয়ম্ ইদংরূপ ইতি, তদ্ ইদম্ অপি এতর্হি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে, অসৌনাম অয়ম্, ইদংরূপ ইতি। স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যো, যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাদ্, বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি সঃ, প্রাণন্ এব প্রাণোনাম ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানো মনঃ। তানি অস্য এতানি কর্ম্মনামানি এব। স যঃ অতঃ একৈকম্ উপাস্তে, ন স বেদ, অকৃৎস্নোহি এষঃ, অতঃ একৈকেন ভবতি, আত্মা ইত্যেব উপাসীত। অত্র হি এতে সর্ব্ব একং ভবন্তি। তদ্ এতৎ পদনীয়ম্ অস্য সর্ব্বস্য, যদ্ অয়ম্ আত্মা। অনেন হি এতৎ সর্ব্বং বেদ।

যথা হ বৈ পদেন অনুবিন্দেদ্ এবং কীর্ত্তিং শ্লোকং চ বিন্দতে, য এবং বেদ।" বৃহঃ ১।৪।৭

অর্থ—সেই এই (জগৎ) তখন (উৎপত্তির পূর্ব্বে) অব্যাকৃত ছিল। তাহা নাম ও রূপের দ্বারাই ব্যক্ত হয়—উহা এই-নামক, এই-রূপ ইত্যাদি (প্রকারে)। সেই এই (জগৎ)ও এখন নাম ও রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে, উহা এই-নামক, এই-রূপ ইত্যাদি (প্রকারে)। যে এই (আত্মা) ইহার মধ্যে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত (রহিয়াছে), যেমন ক্ষুর ক্ষুরের খাপের মধ্যে থাকে, অথবা অগ্নি অগ্নিস্থানস্থ কাষ্ঠাদির মধ্যে থাকে—লোকে দেখিতে পায় না (সেইরূপ)। সেই (আত্মা) অকৃৎস্ন (হয়) [অর্থাৎ অপূর্ণভাব ধারণ করে]। (যেমন) প্রাণকার্য্য করে বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়, কথা কহে বলিয়া বাক্, দেখে বলিয়া চক্ষু, শুনে বলিয়া শ্রোত্র, মনন করে বলিয়া মনঃ (নামপ্রাপ্ত হয়)। সেই এ সবগুলি ইহার কর্ম্মনাম (অর্থাৎ কর্ম্মজন্য নাম)। সে যে, এই হেতু, এক একটীকে উপাসনা করে, সে জানে না, যেহেতু ইহা (আত্মার) অকৃৎস্ন (অর্থাৎ অসমগ্র বা অপূর্ণভাব)। এইজন্য (সে) এক একটী বিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ এক একটীর জ্ঞানলাভ করে)। (এইজন্য) আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে। যে হেতু এখানে এই সব এক হইয়া যায়। সেই এইটীই, এই যে আত্মা, (সেইটীই) এই সকলের (অর্থাৎ এই সকল জীবের) পদনীয় (অর্থাৎ গমনীয় স্থান বা পাইবার জিনিষ)। যেহেতু ইহা দ্বারাই এই সব জানা যায়। যেমন পদচিহ্ন (অনুসরণ করিয়া গাভী প্রভৃতি) পাওয়া যায়, সেইরূপ, যে ইহা জানে, সে কীর্ত্তি ও শ্লোক লাভ করে"। ১।৪।৭।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মাকে যদি কেহ বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি রূপে উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার আত্ম-জ্ঞান লাভ হয় না, এবং তজ্জন্য এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও সিদ্ধ হয় না। পরন্তু যদি আত্মাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার তাহা হইতে পারে।

এখন এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "যে লোক প্রাণাদি সমষ্টির

মধ্যে প্রাণ বা চক্ষু প্রভৃতি এক একটী অংশমাত্রকে সম্পূর্ণ আত্মা বলিয়া উপাসনা করে, সে লোক পূর্ণ আত্মাকে জানে না, যে হেতু এই প্রাণ বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা নহে, পরন্তু আত্মার এক-দেশ মাত্র। এই জন্য তাঁহার উক্ত চক্ষু প্রভৃতি এক একটী সংক্রান্ত জ্ঞান হয়। এ জন্য তাঁহাকে আত্মা অর্থাৎ ঐ সকল অংশের ব্যাপক বলিয়াই উপাসনা করিবে" ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, এস্থলে "ন স বেদ" এই বাক্যের "বেদ"শব্দের সহিত "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" এই বাক্যের "উপাসীত" শব্দের উপ-ক্রমোপসংহার সম্বন্ধ আছে কিনা? আমরা বলি—নাই। প্রথমতঃ দেখ, এস্থলে শ্রুতিতে আছে—"স য অতঃ একৈকম্ উপাস্তে, ন স বেদ, অকৃৎস্নঃ হি এষঃ, অতঃ একৈকেন ভবতি, আত্মা ইত্যেব উপাসীত।" কিন্তু আচার্য্য রামানুজ উদ্ধৃত করিলেন—"ন স বেদ, অকৃৎস্নঃ হি এষঃ, আত্মেত্যেব উপাসীত" এইরূপ করিয়া তিনি "স যঃ অতঃ একৈকম্ উপাস্তে" এবং "অতঃ একৈকেন ভবতি" এই দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিলেন না। এখন দেখ—"ন স বেদ" এই বাক্যের সহিত "আত্মে-ত্যেবোপাসীত" এই বাক্যের যে সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা "স য অত একৈকমুপাস্তে" এই বাক্যের সম্বন্ধটী ঘনিষ্ঠ। কারণ, ইহার অর্থ "যে এক একটীকে উপাসনা করে, সে জানে না।" এখানে "সে জানে না" বাক্যটী "যে এক একটীকে উপাসনা করে" এই বাক্যের সমাপ্তিসূচক অংশ বা পরিচায়ক অংশ। ইহা ব্যতিরেকে "যে এক একটীকে উপাসনা করে" এই বাক্যটী অপূর্ণ থাকে। পক্ষান্তরে "ন স বেদ" এই বাক্যকে যদি "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" এই বাক্যের সহিত অন্বয় করিয়া অর্থ করা যায়, তাহা হইলে তাহার অর্থ হইবে "সে জানে না,.যে হেতু ইহা অপূর্ণ, আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে"। এই অর্থমধ্যে দেখ, ওরূপ অংশাংশী সম্বন্ধ নাই। বরং ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে ইহাদের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদক ব্যবধান দৃষ্ট হইবে। কারণ, যদি কেহ বলে, "সে জানে না, যে হেতু ইহা এইরূপ, সুতরাং আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে", তাহা হইলে "না জানার" হেতু প্রদর্শনের পর কি একটী প্রকৃত জানা ব্যাপার

স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয় না ? দেখ, যদি কেহ বলে, "তুমি এটা জান না ; কারণ, এটা এইরূপ" ; তাহা হইলে সে যদি কিছু আর নাও বলে, তাহা হইলেও শ্রোতা কি একটা কিছু জানিল না ? নিশ্চয়ই জানিল। সুতরাং "সে জানে না, যেহেতু ইহা অপূর্ণ, সুতরাং আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে" এই বাক্যের মধ্যে "আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে" এই বাক্যের পূর্ব্বে একটা জানা ব্যাপার উহ্য বা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, বুঝা গেল। অর্থাৎ তাহা হইলে আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত শ্রুতির যে আকার হইল, তাহা এইরূপ—"সে জানে না, যেহেতু ইহা অপূর্ণ, সুতরাং ইহা জানিয়া আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে।" বস্তুতঃ এরূপ ভাবে একটা জানা ব্যাপার উহ্য করিয়া লইলে উহাকে বাধা দিবার কোন কথাই এস্থলে পাওয়া যায় না। সুতরাং "ন স বেদ অকৃৎস্নঃ হি এষঃ" এবং "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে "ইহা জানিয়া" এইরূপ একটা কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ-বিচ্ছেদক বাক্য ব্যবধান দেখা যাইতেছে, সুতরাং "ন স বেদ" এই বাক্যের সহিত ইহার পূর্ব্ববাক্য "স য অতঃ একৈকম্ উপাস্তে" এই বাক্যের অংশাংশী ভাবসম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় এবং "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" এই বাক্যের মধ্যে সে সম্বন্ধ না থাকায় "ন স বেদ" এই বাক্যটী ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য—"স য অতঃ একৈকমুপাস্তে" ইহার সহিত অন্বিত হইতে বাধ্য। এখন দেখ, যদি কেহ "যে এক একটীকে উপাসনা করে," এইরূপে বাক্য আরম্ভ করিয়া "সে জানে না" বলিয়া, শেষকালে বলে, "তাহাকে অতএব এইভাবে উপাসনা করিবে," তাহা হইলে উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ কি "জানে না" ও "উপাসনা করিবে", এই দুই বাক্যের মধ্যে হয় অথবা "যে উপাসনা করে" এবং "সুতরাং উপাসনা করিবে" এই দুই বাক্যের মধ্যস্থ দুইটী উপাসনা শব্দের মধ্যে হয় ? সুতরাং এস্থলে উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ "উপাস্তে" ও "উপাসীত" এই দুই শব্দের মধ্যে বিদ্যমান, "বেদ" এবং "উপাসীত" শব্দের মধ্যে নাই।

যদি বল, "ন স বেদ" এটী এস্থলে ন্যায়শাস্ত্রোক্ত ন্যায়াবয়বের একটি অবয়ব-স্বরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য, এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের "হেতুবাক্য" স্বরূপ যখন

"অকৃৎস্নো হি এষঃ" এই বাক্যটী রহিয়াছে, এবং তাহার পর যখন "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" এই সিদ্ধান্তবাক্য রহিয়াছে, তখন "বেদ" শব্দের সহিত "উপাসীত" শব্দের হেতু-হেতুমদ্ভাব-সম্বন্ধ-জনিত একটা সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যেই উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ স্বীকারে বাধা কি? তাহা হইলে বলিব, না, তাহা হইবে না। কারণ, "ন স বেদ" বাক্যটী যখন ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী "স য অতঃ একৈকম্ উপাস্তে" এই বাক্যের অংশস্বরূপ, তখন "ন স বেদ" এই বাক্যের হেতুভূত "অকৃৎস্নো হি এষঃ" এই বাক্যটী "ন স বেদ" এই বাক্যটীকে ইহার অংশস্বরূপ "স য অতঃ একৈকম্ উপাস্তে" বাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "আত্মা-ইত্যেব উপাসীত" এই বাক্যের সহিত ইহাকে অম্বিত করিতে পারে না, বস্তুতঃ "অকৃৎস্নঃ হি এষঃ" এই হেতুবাক্যটী কেবলমাত্র "ন স বেদ" বাক্যের হেতু নহে, পরন্তু "স য অতঃ একৈকম্ উপাস্তে ন স বেদ" এই সমস্ত বাক্যেরই হেতু। তাহার পর "ন স বেদ" বাক্যটী "স য অতঃ একৈকম্ উপাস্তে" এই বাক্যের পরিচায়ক বা অধীন বাক্য হওয়ায় "স য অতঃ একৈকম্ উপাস্তে ন স বেদ" এই সমগ্র বাক্যের মধ্যে "বেদ" পদ অপেক্ষা "উপাস্তে" পদেরই প্রাধান্য অধিক হইয়া পড়িতেছে। আর তাহা হইলে এই সমগ্র বাক্যের কোন বিধেয় পদের সহিত যদি পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তবাক্য "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" বাক্যের কোন বিধেয় পদের উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে "উপাসীত" পদের সহিত "উপাস্তে" পদেরই তাহা ঘটিবে, "বেদ" শব্দের সহিত "উপাসীত" পদের সে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না।

তাহার পর আরও দেখ—"ন স বেদ" এই বাক্যের সহিত "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" এই বাক্যের যে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যের ন্যায় একটা সম্বন্ধ স্বীকার করিবার চেষ্টা হইতেছিল, তাহাও এস্থলে ফলবতী হইতে পারে না। কারণ, "ন স বেদ" বাক্যটী যদি প্রতিজ্ঞা-বাক্য হয়, তাহা হইলে "অকৃৎস্নঃ হি এষঃ" বাক্যটী তাহার হেতুবাক্য হইবে বটে, কিন্তু তাহা হইলে "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" এই বাক্যটী উহাদের সিদ্ধান্তবাক্য হইতে পারিবে না। কারণ, "আত্মা ইত্যেব

উপাসীত” এই সিদ্ধান্তবাক্যের পূর্ব্বে এবং “অকৃৎস্নঃ হি এষঃ” এই হেতু-ভূত বাক্যের পর “অত একৈকেন ভবতি” এই যে একটী বাক্য রহিয়াছে, ইহা তাহাতে বাধা দিবে। কারণ, এই বাক্যের “অতঃ” শব্দটি সিদ্ধান্তসূচক শব্দ এবং সমগ্র বাক্যটী ফলবোধিক বাক্য। সুতরাং “ন স বেদ” বাক্যের সহিত “আত্মা ইত্যেব উপাসীত” বাক্যের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যদ্বয়ের যে সম্বন্ধ থাকে, এস্থলে সে সম্বন্ধ নাই, আব তজ্জন্য “বেদ” শব্দের সহিত “উপাসীত” শব্দের উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধও নাই। পক্ষান্তরে “বেদ” শব্দ “উপাস্তে” শব্দেব অধীন হওয়ায় “উপাসীত” শব্দের সহিত “উপাস্তে” শব্দেরই উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। জানি না, আচার্য্য রামানুজ এস্থলে বেদন ও উপাসনা শব্দদ্বয়ের এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া কিরূপে লাভবান্ হইলেন? আমাদের মনে হয়, তিনি এস্থলে আচার্য্য শঙ্করেব উদ্ধৃত বৃত্তিকারের মতেব অনুসরণ করিতে যাইয়া এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, এইবার আমাদের দ্বিতীয় উত্তরটী আলোচ্য। আমরা বলি যে, আচার্য্য বামানুজ উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যা যেরূপ করিয়াছেন, তাহাতে দোষাধিক্য দৃষ্ট হইবে।

দেখ, আচার্য্য রামানুজমতে এখানে “বেদ” শব্দের অর্থ উপাসনা। সুতরাং বাক্যটী হইল, “যে এইরূপে উপাসনা কবে, সে জানে ন অর্থাৎ সে উপাসনা করে না, যেহেতু ইহা অপূর্ণ, আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে।” এখন এরূপে বাক্যের প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিলে কি ইহার কোন অর্থ হয়? “যে উপাসনা করে, সে উপাসনা করে না”—একথা বলিলে কি কোন অর্থ বোধ হয়? যদি বল, “যে এক একটীকে উপাসনা করে, সে উপাসনা করে না” বলিলে অর্থবোধ হইবে না কেন? এরূপ বাক্য ত লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। তাহা হইলে বলিব—না—একথাও এস্থলে অসঙ্গত হয়। কারণ, যাঁহারা উপনিষদ্ পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা ভূরি ভূরি স্থলে দেখিয়াছেন যে, আত্মার অপূর্ণভাবের উপাসনাও উপাসনা-পদবাচ্য। আমরাও ইতিপূর্ব্বে “মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত” এই

শ্রুতির ব্যাখ্যাকালে ইহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। সুতরাং "যে একএকটীকে উপাসনা করে, সে উপাসনা করে না," এরূপ বাক্যও এস্থলে অসঙ্গত হইয়া উঠিতেছে। অগত্যা আচার্য্য রামানুজমতে ইহার সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে হইলে এইরূপ করিতে হইবে যে, "যে আত্মার এক একটী ভাবের উপাসনা করে, সে (আত্মার) উপাসনা করে না, যেহেতু উহারা আত্মার অপূর্ণ বা অসমগ্রভাব, সুতরাং আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে।" নচেৎ এ শ্রুতির অর্থই হইতে পারে না। ফল কথা, আচার্য্য রামানুজমতে উক্তবাক্যের মধ্যে যেস্থলে "উপাসনা করে না" বাক্যটী দেখা যায়, সেস্থলে একটী "আত্মার" শব্দ উহ্য করিয়া "আত্মার উপাসনা করে না" এইরূপ বাক্য রচনা করিতে হইতেছে। এখন দেখ, এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ করিলে উপাসনা শব্দের অর্থ "সকল উপাসনা" হইল না। পরন্তু কেবল আত্মার উপাসনা হইল। এখন তাহা হইলে বল দেখি, আচার্য্য রামানুজমতে উপাসনা শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করা হইল কি না?

যদি বল, তাহা হইলে, আমাদের মতেও সে দোষ ঘটিবে, অর্থাৎ "ন স বেদ" বাক্যের অর্থ "সে জানে না" করিলে, ইহার অর্থও আবার "সে আত্মাকে জানে না" এইরূপ করিতে হইবে, কারণ, "জানে না" বলিলে "কাহাকে জানে না" ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই লোকের মনে উদয় হয়। সুতরাং আমাদের মতেও "জানে না" বাক্যের অর্থ "আত্মাকে জানে না" করিতে হয়, এবং তজ্জন্য আমাদের মতেও অর্থ-সঙ্কোচ দোষ ঘটিতেছে। তাহার পর আমাদের মতে "জানে না" এই বাক্যের অর্থ, আবার "জানিতে পারে না" এইরূপ করিতে হয়। কারণ, আমাদের মতে আত্মাকে জানিবার পর আর উপাসনা সম্ভবই নহে; সুতরাং উক্ত অর্থ-সঙ্কোচ দোষ ভিন্ন আমাদের মতে অর্থবিকৃতি-রূপ আর একটী দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অগত্যা অদ্বৈত-মতে "ন স বেদ"বাক্যের অর্থ "সে জানে না" বলিলে আচার্য্য রামানুজের অর্থ অপেক্ষা অধিক দোষ দৃষ্ট হয়, বলিতে হইবে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন—না—তাহা নহে। কারণ, আচার্য্য

রামানুজ উক্ত "বেদ" ও "উপাসীত" শব্দদ্বয়ের মধ্যে উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াই "বেদ" শব্দের অর্থ "উপাসনা" করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে এস্থলে উহাদের মধ্যে সে সম্বন্ধ নাই, এবং তজ্জন্য আচার্য্য রামানুজের এরূপ অর্থ করিবার অধিকারই নাই। তাহার পর, "বেদ" শব্দের স্পষ্টার্থ "জানা"। এই স্পষ্টার্থ ত্যাগে যে দোষ হয়, তাহা কখনই "জানে না" (অর্থ "জানিতে পারে না") করিলে যে দোষ হয়, সে দোষের সহিত সমান হইতে পারে না। কারণ, এরূপ ব্যবহার লোকমধ্যে দৃষ্ট হয়।

তাহার পর আর এক কথা। আচার্য্য রামানুজমতে "স য অতঃ একৈকম্ উপাস্তে ন স বেদ" এই বাক্যের অর্থ "যে এক একটীর উপাসনা করে, সে উপাসনা করে না" এইরূপ অসঙ্গত ও বিরুদ্ধ অর্থ হয় বলিয়া প্রকরণ দেখিয়া "আত্মা" শব্দকে উহ্য করিয়া "আত্মার উপাসনা করে না" এইরূপ অর্থ করিতে হইতেছে; কিন্তু আমাদের মতে সেরূপ অসঙ্গত অর্থের সম্ভাবনা নাই; আর তজ্জন্য কোন অসঙ্গতি নিবারণ করিবার জন্য "আত্মা" শব্দ অধ্যাহার করিয়া "আত্মাকে জানে না" এরূপ অর্থ করিতে হয় না। সুতরাং আমাদের মতে "ন স বেদ" বাক্যের অর্থে আচার্য্য রামানুজের মত অর্থ-সঙ্কোচ করা হয় না। পরন্তু "জানে না" বাক্যের প্রকৃতিসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রকরণ দেখিয়া "আত্মা" শব্দের অধ্যাহার করিতে হয় মাত্র। আর এইরূপ অধ্যাহার আচার্য্য-মতেও করিতে হইবে, কারণ, "উপাসনা করে না" বলিলেই "কাহার উপাসনা করে না" একথা লোকে স্বভাবতঃই জানিতে চাহিবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা-পূরণের জন্য আত্মার অধ্যাহার উভয়পক্ষেই সমান হইতেছে। এখন দেখ, যেটুকু অধিক হইতেছে, সেটুকু আচার্য্যপক্ষে দোষনিবারণপ্রয়াস ভিন্ন আর কিছু নহে। এইজন্য বলি, অর্থসঙ্কোচ-জন্য দোষ আমাদের নহে, পরন্তু আচার্য্য রামানুজমতেই তাহা বর্ত্তমান।

তবে এস্থলে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, আমাদের এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা ভাল। আপত্তিটী এই :—যদি বল, আমাদের প্রদর্শিত অর্থে "ন স বেদ" বলিয়া "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" বলায়

অর্থাৎ "সে জানে না" বলিয়া "আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে" এই কথা থাকায়, জানার পর উপাসনা কর্ত্তব্য—ইহাই সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয়। কারণ, যে এইরূপে উপাসনা করে, সে জানে না বলায় সে উপাসনা করিতে জানে না—ইহাই বুঝায়. অথচ এই স্থলের "বেদ" শব্দে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহা উপাসনার পরের জ্ঞান, পূর্ব্বের জ্ঞান নহে, সুতরাং আমাদের অর্থেও অরুচিকর স্থল রহিয়াছে। তাহা হইলে তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে—না, সে দোষও স্থান পাইবে না। কারণ, এই শ্রুতির শেষকালে আবার "বেদ" শব্দ থাকায় এবং এক আত্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রসঙ্গ বিদ্যমান থাকায়, সে দোষ হইতে পারিল না। যথা—"অনেন হি এতৎ সর্ব্বং বেদ, যথা হ বৈ পদেন অনুবিন্দেৎ এবং কীর্ত্তিং শ্লোকং চ বিন্দতে, য এবং বেদ।" (ইহার অর্থ পূর্ব্বে যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।) এই শ্রুতির এই অংশটী পড়িলে সহজেই বোধ হইবে যে, "বেদনই" এই শ্রুতির লক্ষ্য, উপাসনাবিষয়ক উপদেশ করা এ শ্রুতির লক্ষ্য নহে; তবে যে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানেরই উপায়স্বরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে "ন স বেদ" অর্থ সে আত্মাকে জানে না অর্থাৎ জানিতে পারে না; অন্য কিছু নহে।

আর যদি বল, অদ্বৈতবাদীর মতে উপাসনার ফল জ্ঞান এবং এখানে "বেদ" শব্দের অর্থ উপাসনা না হওয়ায় এস্থলে "বেদ" শব্দেরও অর্থ-সঙ্কোচরূপ দোষটী অদ্বৈতবাদীর পক্ষেও উপস্থিত হইবে। কারণ, কোন কিছু উপাসনা করিতে হইলে অদ্বৈতমতেই তৎসম্বন্ধে সামান্যতঃ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক এবং সেই উপাসনার ফলে আবার তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হয়, এই দুই রকম জ্ঞানই স্বীকার্য্য। আর ইহার ফলে অদ্বৈতবাদীকে এই "বেদ" শব্দে এস্থলে উক্ত উভয় প্রকার জ্ঞানের এক প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। এখন যদি এই "বেদ"শব্দে সামান্য জ্ঞান বলা হয়, তাহা হইলে এই শ্রুতির দ্বারা 'উপাসনার ফল জ্ঞান হয়', ইহা আর সিদ্ধ হইল না; এবং বেদান্তমধ্যে তাহা হইলে উপাসনাই বিহিত—ইহা বলিতে বাধ্য হইতে হয়। আর যদি এই "বেদ" শব্দের

অর্থ বিশেষ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে "বেদ" শব্দের অর্থসঙ্কোচ হইয়া গেল; কারণ, সামান্য জ্ঞানকে ত্যাগ করা হইল। সুতরাং অর্থসঙ্কোচ দোষটী উভয় মতেই সমান হইতেছে।

*এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন—না; তাহা হইতে পারে না; কারণ, এস্থলে আমরা "বেদ" শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান বলি, এবং বিশেষ জ্ঞান অর্থ হওয়ায় অদ্বৈতমতে অর্থসঙ্কোচ দোষ ঘটিবে না। কারণ, বিশেষ জ্ঞানটি সামান্য জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া হয় না, বিশেষ জ্ঞানে সামান্য জ্ঞানও বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং অর্থসঙ্কোচ দোষ এ স্থলে ঘটিতে পারিল না। দেখ, ঘটজ্ঞান হইতে গেলে ঘটজাতিজ্ঞান হওয়া আবশ্যক হয়, নচেৎ ঘটজ্ঞানই হয় না; সুতরাং কথিত আপত্তি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িতেছে। আর যদি বল, এই "বেদ" শব্দে বিশেষ জ্ঞানই লক্ষ্য হইলে সামান্য জ্ঞানের কথা এস্থলে কোথায় কথিত হইল, তদুত্তরে আমরা বলিব যে, উপাসনার বিধির মধ্যেই উহার কথা কথিত হইয়াছে; যেহেতু যাহার উপাসনা করিতে হয়, তাহার জ্ঞান অগ্রেই হওয়া আবশ্যক হয়, ইহা উভয়পক্ষসম্মত কথা। সুতরাং সামান্য জ্ঞানের উপদেশ আর নূতন করিয়া না করিলেও দোষ হইল না, এবং অদ্বৈতবাদীর গৃহীত অর্থে অর্থসঙ্কোচরূপ কোন দোষও থাকিতে পারিল না। সুতরাং বলিতে হইবে, আচার্য্য রামানুজ এই শ্রুতিসাহায্যে বিশেষ কোন লাভবান্ হইলেন না।

যদি বল, কোন কিছুর অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে যেমন বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে তাহার অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তদ্রূপ বেদ অতি-প্রাচীন বলিয়া ইহার প্রাচীন অর্থই ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে। আর এতদনুসারে আচার্য্য রামানুজের সম্মত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, আচার্য্য রামানুজ বেদান্তের প্রাচীন ব্যাখ্যাকার বৃত্তিকারের মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার আর একটী প্রমাণ এই যে, আচার্য্য শঙ্কর এই উপনিষদ্ভাষ্যে উক্ত অর্থেরই খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত অর্থ একটা প্রামাণিক অর্থ না হইলে আর তিনি তাহা খণ্ডন করিতে যাইতেন না।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—না—তাহা হইতে পারে না। কারণ, বৃত্তিকার প্রাচীন হইলেও, বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রচারক যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মত প্রাচীন নহেন। আর বৃত্তিকারকে বোধায়ন ঋষি বলিয়াও যে তাঁহার অর্থই প্রমাণ বলিবে, তাহাও বলা যায় না; কারণ, বোধায়নই যে বৃত্তিকার অথবা বৃত্তিকার যে একজন ঋষি, ইহা অবিসংবাদিত সত্য নহে। মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বৃত্তিকারকে উপবর্ষ বলিয়াই সাধারণতঃ অনুমান করা হয়, এবং উপবর্ষ বৃত্তিকার হইলে, কথাসরিৎসাগরের মতে ইনি নন্দবংশের সময়ের লোক হইয়া পড়েন। নন্দবংশের সময় ঋষির কথা শুনা যায় না এবং বোধায়ন ঋষি বৃত্তিকার—একথা আচার্য্য রামানুজের পূর্ব্বে কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। সুতরাং ঋষিকথিত অর্থ বলিয়া বৃত্তিকারের অর্থের প্রামাণ্য স্থাপন করা চলে না। তাহার পর অদ্বৈতমত-প্রচারক আচার্য্য শঙ্করও সম্প্রদায়বিৎ প্রাচীন আচার্য্যের মত প্রচার করিতেছেন, তাহা তিনি নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং এপথ দিয়াও আচার্য্য রামানুজের গৃহীত অর্থ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। আর যদি আচার্য্য শঙ্করের সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণের কথা বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, আচার্য্য শঙ্করের সম্প্রদায় শুকদেব হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শুক ব্যাসের পুত্র বলিয়া শুককথিত অর্থ যে ব্যাসের হৃদ্‌গত ভাব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রাচীনত্বের নিদর্শন দেখাইয়া আচার্য্য শঙ্করমতের দুর্ব্বলতা প্রমাণ করা যায় না।

এইবার এই প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদীর শেষ কথা। কথাটা এই—যদি বৃত্তিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বৃত্তিকারের মতানুসারে বলা যায় যে, এস্থলে "বেদন" ও "উপাসনার" উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ আছে, এবং এস্থলে এই সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদী ইহার কি উত্তর দিতে পারেন, তাহা দিন্। কারণ, বৃত্তিকার সম্ভবতঃ ভগবান্ উপবর্ষ। ইঁহার মত আচার্য্য শঙ্কর মধ্যে মধ্যে খণ্ডন করিলেও অনেক স্থলে প্রমাণ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। তাহা হইলে বলিব, হাঁ, আমরা তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি। দেখ, বৃত্তিকারের মতে, (প্রথম) এই

সিদ্ধ হয় যে, "বেদন" ও "উপাসনার" উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ থাকায় এস্থলে বেদন অর্থ উপাসনা, (দ্বিতীয়) উপাসনার বিধি থাকায় এবং উপাস্যবিষয়ক জ্ঞানের পরই উপাসনা সম্ভব বলিয়া, বেদান্তজ্ঞানমূলক উপাসনাই বিহিত ; (তৃতীয়) অদ্বৈতবাদী যে বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মস্বরূপবর্ণনপ্রসঙ্গে কোথাও উপাসনা শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা মিথ্যা ; কারণ, "এই ব্রহ্মই প্রাপণীয়" তাহা এই শ্রুতিমধ্যেই আছে এবং এই ব্রহ্মেরই উপাসনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী প্রথমে বলেন যে, বেদন ও উপাসনা এক হইলেও "বেদন" শব্দের অর্থ "উপাসনা" না বলিয়া "উপাসনা" শব্দের অর্থ "বেদন" বলা যাইতে পারে। কারণ, "সে জানে না, যেহেতু ইহা অপূর্ণ, সুতরাং আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে," এই বাক্যটী যেস্থলে বলা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে ও পরে কেবল জগৎকারণের সূক্ষ্মাবস্থা ও সৃষ্টির কথাই বর্ণিত হইয়াছে, যেমন "বলে বলিয়াই বাক্" "শোনে বলিয়াই শ্রোত্র", "পূর্ব্বে ইহা অব্যাকৃত ছিল", এবং পরে "এই আত্মার জ্ঞানে সমুদায় জ্ঞাত", "যে এইরূপ জানে, সে কীর্ত্তি ও শ্লোক লাভ করে" ইত্যাদি। তাহার পর "বেদ" ও "উপাসীত" শব্দদ্বয়ে উপক্রমোপসংহার সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও, "বেদ" শব্দের প্রাধান্য এস্থলে অধিক। কারণ, "সে জানে না" বলিয়া পরবর্ত্তী বাক্যে তাহার কারণ দেখান হইয়াছে ; যথা :—"যেহেতু ইহা অকৃৎস্ন" তাহার পর এই "হেতু" দেখাইয়া একটা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ; যথা :—"এই হেতু সে এক একটী বিশিষ্ট হয়," ইহার পর আবার বলা হইয়াছে—"অতএব আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে"। এখন দেখ, এস্থলে "জানে না" বলিয়া, এই না জানার কারণ দেখাইয়া যদি একটা কিছু সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে 'জানান' ব্যাপারটাই পূর্ণ করা হইতেছে কি না ? বস্তুতঃ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেখ, একজন যদি বলে—"এই করিলে এই হয়", তাহা হইলে ইহাতে সে অপরকে জ্ঞাত করা ভিন্ন কি আর কিছু করে ? তদ্রূপ "ন স বেদ" বলিয়া শ্রুতিদেবী এস্থলে আমাদিগকে কিছু জানাইতেছেন মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু দেখ—"আত্মা বলিয়াই

উপাসনা করিবে" এই বাক্যটীর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপাসনা শব্দার্থের বাহুল্য প্রদর্শন করা যায় না। অধিক কি "ন স বেদ" বাক্যের সিদ্ধান্ত "অতঃ একৈকেন ভবতি" এই বাক্যটী যখন "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" এই বাক্যের পূর্ব্বেই স্থান পাইতেছে, তখন এই বাক্যটীর সঙ্গে উহার সম্বন্ধ একটু দূর হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে, এস্থলে বেদশব্দার্থের যত বাহুল্য আছে, উপাসনাশব্দার্থের তত বাহুল্য নাই; আর তজ্জন্য "বেদ" শব্দেরই এস্থলে প্রাধান্য হইতে বাধা। তাহার পর এই "বেদ" শব্দে যদি জ্ঞাত করা অর্থটী প্রধান হয়, তাহা হইলে এতদবলম্বনে যাহা বিহিত হইবে, তাহা যদি আবার উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ দ্বারা তাহার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে যাহা বিহিত হইবে, তাহাও জ্ঞাত করা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে উপক্রম বাক্যেরই প্রাধান্য অধিক হইতেছে, এবং তজ্জন্য "উপাসীত" শব্দের অর্থই "জানিবে" এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে, পরন্ত "উপাসনা করিবে" এরূপ হইতে পারে না। তাহার পর যে বলিয়াছিলে যে, উপক্রম উপসংহারের মধ্যে উপসংহার-বাক্যেরই বল অধিক, ইত্যাদি, তদুত্তরেও আমরা বলি যে, ইহা যেস্থলে সম্ভব হয়, সেস্থলে বক্তার চাতুর্য্য অথবা দোষই সাব্যস্ত হয়। কারণ, যাহার বক্তব্য শেষকালে পরিস্ফুট হয়, তাহার চিন্তা প্রথমে অপূর্ণ ছিল বলিতে হইবে, অথবা সে লোক ইচ্ছা করিয়া প্রথমে কোন রুচিকর কথা বলিয়া অপরকে আকৃষ্ট করিয়া, পরে নিজ বক্তব্য বলে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা এরূপ আচরণ করেন, তাঁহাদের ইহা অসম্যকৃচিন্তা বা চাতুর্য্য ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রুতিদেবী এদোষ-বিবর্জ্জিতা বলিয়া বিবেচিত হন। সুতরাং উপক্রম উপসংহারের মধ্যে উপসংহারের বলাধিক্য বলিলে প্রকারান্তরে শ্রুতির গৌরবহানি ঘটিবে। অগত্যা বলিতে হয়, বেদন অর্থে উপাসনা নহে, পরন্ত উপাসনা অর্থে বেদন বুঝিতে হইবে। বলিতে কি, আমরা এস্থলে এরূপ অর্থ করিতে পারিলেও, এরূপ অর্থ আমাদের অভীষ্ট নহে, কারণ, আমরা এস্থলে উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না, কেবল বুদ্ধি-

কারের প্রতি যাঁহারা সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জন্ত এরূপ বলিলাম মাত্র।

দ্বিতীয় কথার উত্তর এই যে, বেদান্তে-বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানমূলক উপাসনা বিহিত হইলেই যে বেদান্তের সর্ব্বস্থলে এইরূপ হইবে, তাহার প্রমাণ কোথায়? আমরা বলিব, "অপর ব্রহ্ম" সম্বন্ধে এরূপ করা আমাদের স্বীকার্য্য, কিন্তু সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য নহে। দেখ, এস্থলে "বেদ" শব্দেও বিধিসূচক অর্থ থাকিতে পারে; কারণ, ইহা "লেট্ লকার"* ঘটিত পদ। সুতরাং উপাসনা শব্দেই বিধি থাকায় "বেদ" শব্দ উপাসনা হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। সর্ব্বত্র কেন ওকথা স্বীকার্য্য নহে, তাহার কতিপয় কারণ, পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরেও আবার কথিত হইবে। এস্থলে এই ব্রহ্মবোধক শ্রুতিকে এতদুদ্দেশ্যে গ্রহণ করিলে যে কি বিপত্তি ঘটিবে, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা, সুতরাং এই শ্রুতিটীকে আচার্য্য রামানুজ স্বমতে আনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, 'বেদান্তে সর্ব্বত্র উপাসনা বিহিত' বলিলে, তাহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পরে না।

এইবার তৃতীয় কথার উত্তর কি, দেখা যাউক। অদ্বৈতবাদী বলেন—ব্রহ্মস্বরূপবর্ণনপ্রসঙ্গে কোথাও উপাসনা শব্দ নাই, সুতরাং বেদান্তে সর্ব্বত্র উপাসনা বিহিত হয় নাই। আচার্য্য রামানুজ বলেন—না, তাহা নহে, কারণ, এই স্থলেই তাহা করা হইয়াছে। এই বর্ত্তমান শ্রুতিই তাহার দৃষ্টান্ত। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী, প্রথমতঃ বলিতে পারেন যে, এই শ্রুতিটী নির্গুণব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনবিষয়ক শ্রুতিই নহে, সুতরাং ইহা প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপবর্ণনপ্রসঙ্গই নহে; যেহেতু নির্গুণব্রহ্ম,

* ব্যাকরণে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার, তিঙন্ত ও কৃদন্ত। তিঙন্ত ক্রিয়া পাণিনি মতে দশ প্রকার এবং উহা 'লকার' নামে অভিহিত। এই দশ প্রকার লকারের মধ্যে "লেট্" পঞ্চম "লকার" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার রূপ "লটের" মত এবং অর্থ "বিধিলিঙের" মত হয়। ইহা বেদেই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, সুতরাং উপরি উক্ত "য এবং বেদ" এই বাক্যের "বেদ" পদের অর্থ "যে ইহাকে জানুক" বা "যাহার ইহা জানা উচিত।"

ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ, সগুণভাব মায়িক ভাব মাত্র। এখন দেখ, ইহা নির্গুণব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতি নহে কেন? প্রথম কারণ এই যে, এই শ্রুতিতে সৃষ্টির কথা রহিয়াছে, যথা,—"তদ্ ইদম্ অব্যাকৃতম্ আসীৎ" ইত্যাদি। দ্বিতীয় কারণ, ইহাতে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞানের প্রসঙ্গও আছে; যথা,—"অনেন এতৎ সর্ব্বং বেদ।" তৃতীয়, নির্গুণব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি সম্ভব নহে; শ্রুতি সৃষ্টিসাহায্যে নির্গুণব্রহ্মের উপদেশ কোথাও করেন নাই। সৃষ্টি হইতে গেলেই মায়া সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন; সুতরাং এস্থলে "উপাসীত" শব্দ থাকায় সগুণব্রহ্মেরই উপাসনার কথা পাওয়া যায়, নির্গুণব্রহ্মের নহে। তাহার পর এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-সিদ্ধি, ইহাও সগুণব্রহ্মের বোধক কেন, দেখ। দেখ, এককে জানিলে সকলের জ্ঞান হইলে, একের সহিত সকলের সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক হয়। "সকল" ও "এক"—এক হইয়া গেলে আর তাহা সম্ভব নহে। এই একে সকল ভাব থাকাই সগুণত্বের বোধক ভিন্ন আর কি? এই জন্য এই উভয় কারণে এই শ্রুতি সগুণব্রহ্ম বোধক বলিয়া সিদ্ধ হয়, আর তজ্জন্য ইহাতে উপাসনা করিবার উপদেশ থাকায়, অদ্বৈতমতের পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশের কোন ক্ষতি হইতে পারিল না।

পরন্তু অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার অতি অদ্ভুত প্রতিভাবলে এই শ্রুতিকেও নির্গুণব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিয়া, বাদীর ঐসকল দোষা-রোপ হইতে ইহাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অবশ্য তাই বলিয়া যে, তিনি এই শ্রুতিতে বেদ ও উপাসনার উপক্রম-উপসংহার সম্বন্ধ আছে বলেন, তাহা নহে; অথবা এই শ্রুতি উদ্ধার করিবার প্রয়ো-জন হইলে, আচার্য্য রামানুজের ন্যায় পূর্ব্বার্দ্ধ বাদ দিয়া শেষার্দ্ধ মাত্র উদ্ধৃত করেন, তাহাও নহে। তাঁহার কৃত এই শ্রুতির নির্গুণব্রহ্মপর ব্যাখ্যা, এ উদ্দেশ্যে নহে অথবা বৃত্তিকারের মতে মত দিয়া নহে। যাহা হউক, তাঁহার মতাবলম্বনে এস্থলে বলা যায় যে, এস্থলে ব্রহ্মের উপাসনা যে বিহিত হইয়াছে, তাহা উপাসনার জন্য নহে, পরন্তু তাহা জ্ঞানের অঙ্গ বা জ্ঞানের উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে মাত্র, সুতরাং এস্থলে মুখ্য প্রসঙ্গ জ্ঞান, উপাসনা নহে; এবং তাহা হইলে "নির্গুণ-

ব্রহ্মপ্রসঙ্গে বেদান্তে কোথাও উপাসনা শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই" অদ্বৈত-বাদীর এ কথাটার কোনও হানি হয় না। দেখ, এস্থলে বলা হইয়াছে— "স যঃ অতঃ একৈকম্ উপাস্তে ন স বেদ," অর্থাৎ যে ইহাদের এক একটার উপাসনা করে, সে জানে না। এস্থলে "জানে না" বাক্যে "কি জানে না", এতদুত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম জানে না"। যদি বল, ইহার উত্তরে "ব্রহ্ম জানে না" না বলিয়া "উপাসনা জানে না" বলিলে দোষ কি? তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, পরবর্ত্তী বাক্যে "পদনীয়" শব্দ দ্বারা ব্রহ্মই যে এস্থলে জানিবার বিষয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অধিকন্তু এস্থলে যে প্রকরণ, তাহা ব্রহ্ম বা আত্মার উপাসনা নহে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানলাভই এস্থলে বেদান্তের অভিপ্রায়, ব্রহ্মোপাসনা অভিপ্রায় নহে।

অবশ্য এরূপ ব্যাখ্যায় সহজেই একটী সন্দেহ হইবে যে, ইহা যদি নির্গুণব্রহ্মের প্রসঙ্গ হয়, তাহা হইলে সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধি হইবে কি করিয়া, এবং এই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল—কীর্ত্তি ও শ্লোকই বা সঙ্গত হয় কি করিয়া? তদুত্তরে বলা যাইবে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধি লক্ষ্য হইলেও মুখ্য লক্ষ্য আত্মা; কারণ, আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিমধ্যে "পদনীয়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কীর্ত্তি ও শ্লোক শব্দের অর্থ আচার্য্য শঙ্কর-মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান ও মুক্তি। যথা,—"যদ্বা যথোক্তং বস্তু যো বেদ মুমুক্ষূণাম্ অপেক্ষিতং কীর্ত্তিশব্দিতম্ ঐক্যজ্ঞানং তৎফল-শ্লোকশব্দিতমুক্তিমাপ্নোতি ইতি মুখ্যমেব ফলম্।" বৃহঃ উপঃ ভাষ্য ১।৪।৭। সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত হইল না। আর কীর্ত্তিশ্লোক শব্দ থাকাতেই যে জাগতিক অভ্যুদয় বুঝিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই; কারণ, এ কীর্ত্তি প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞের উপযুক্ত যে কীর্ত্তি হইবে, তাহা এই প্রকরণবলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে এবং ব্রহ্মজ্ঞের উপযুক্ত কীর্ত্তি হইলে, ইহা জাগতিক অভ্যুদয় হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

যদি বল, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইলে ত বিষয়-বিষয়ি-জ্ঞান অনিবার্য্য হয়, এবং তাহা হইলে ব্রহ্মের সগুণভাবই এই শ্রুতির

লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, নির্গুণব্রহ্মভাব ত সিদ্ধ হয় না, কারণ, নির্গুণ-ব্রহ্মভাবে বিষয়-বিষয়ি-সম্বন্ধ ত থাকিবার কথা নাই। তাহা হইলে বলিব যে, সর্ব্ববিজ্ঞান অর্থ যে ব্রহ্মভাবাপন্ন সাধক, সর্ব্বদা সকল বিষয়ের জ্ঞান লইয়া অবস্থান করিবেন—সর্ব্বদা সকল বিষয়ই মনশ্চক্ষে দেখিতে থাকিবেন, তাহা নহে। ইহার অর্থ—সমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত সবই মিথ্যা—এই বলিয়া জ্ঞান হওয়ার পর, জ্ঞানী ব্রহ্মতত্ত্বেই অবস্থান করিবেন, সমুদায় বিষয় সম্ভোগ করিবেন না। তাঁহার পাইবার বিষয় আর থাকিবে না, তাঁহার শোক মোহাদির হেতু কিছু থাকিবে না। যখনই তাঁহার বিষয়ানুভূতি ঘটিবে, তখনই তিনি, পূর্ব্ব হইতে তাহার স্বরূপ—ব্রহ্ম এবং তাহার নামরূপ মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়া, তাহার সহিত তদুপযুক্ত ব্যবহার করেন মাত্র। সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, সাধক যে কেবল বসিয়া বসিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য দেখিতে থাকেন অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্মরণ করিয়া সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনি স্বয়ং ইহাই চিন্তা করেন, তাহা নহে। সুতরাং এই শ্রুতিতে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথা থাকিলেও এই শ্রুতির লক্ষ্য নির্গুণ-ব্রহ্ম হইবার পক্ষে কোন বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যদি বল, সৃষ্টিপ্রসঙ্গ থাকায়, ইহার লক্ষ্য সগুণব্রহ্ম, ইহা আমরাই পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এখন সে কথার খণ্ডন কি করিয়া করা হইবে? তদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, তাহাতেও দোষ হয় নাই; কারণ, ব্রহ্মের সৃষ্টি মিথ্যা, তাহা অন্য শ্রুতি অতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া দিয়াছেন। সৃষ্টি সত্য হইলে, সে দোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারিত। স্বপ্নে দৃষ্ট সম্পত্তি লইয়া কি জাগরিত কোন ব্যক্তি বিবাদ করে? সুতরাং সৃষ্টিপ্রসঙ্গ থাকায় এ শ্রুতির লক্ষ্য সগুণব্রহ্ম—ইহা বলা চলে না। অতএব দেখা গেল—আচার্য্য রামানুজ এই শ্রুতি দ্বারা 'বেদান্তোক্ত বেদন শব্দের অর্থ উপাসনা', ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেন না এবং তজ্জন্য 'বেদান্তে বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানমূলক উপাসনাই বিহিত' একথাও সিদ্ধ হইল না। যদিও এই শ্রুতিটী আচার্য্য রামানুজের মতের একটী নিতান্ত আশা-ভরসার স্থল, তথাপি ইহা তাঁহার কোন

উপকার করিতে পারিল না। ইহা যেমনই তাঁহার অনুকূল বলিয়া প্রথমতঃ বোধ হয়, বিচার করিলে, ইহা সেইরূপই তাঁহার প্রতিকূল হইয়া পড়ে। আগামী বারে আচার্য্য রামানুজের এতদুদ্দেশ্যে তৃতীয় শ্রুতি-প্রমাণটী আলোচিত হইবে।

কাশীতে শঙ্কর।

(২)

মণিকর্ণিকায় স্নানাদি সমাপন করিয়া যোগিবর শঙ্কর ভাবিতেছেন—কোন্ পথে বিশ্বনাথ দর্শনে যাইবেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মহাত্মন্! মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া মণিকর্ণি ভগবান্ বিষ্ণু দর্শন করিতে হয়। ঐ দেখুন—সেই ভগবানের মন্দির।" ইহা শুনিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে সেই দিকে গমন করিলেন; শিষ্যগণও তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্কর ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন এবং নতজানু হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, অবশেষে কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে করজোড়ে ভগবানের সমক্ষে অবস্থান করিলেন। চন্দ্রমাসমক্ষে জলধিবক্ষঃ যেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ভগবানের সমক্ষে শঙ্করের হৃদয় আজ তাহাই হইল। তিনি মনে মনে নানা উপচার কল্পনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া এইরূপে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন,—

"হে কৃষ্ণ! তুমি জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যাম-কলেবর, তোমার নয়নযুগল পদ্মসদৃশ, তুমি মুকুট, মাল্য, কেয়ূর ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়া থাক, তোমার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভমান, তুমি মুরলীবাদনে তৎপর, তুমি সদা গোপীগণ দ্বারা পরিবৃত থাক, তুমি কুঙ্কুমাঙ্কিতদেহ। হে হরে! তোমায় হৃদয়-কমলে ধ্যান করি ॥১॥

"হে ভগবন্! ক্ষীরোদসাগরান্তর্গত দ্বীপ হইতে আসিয়া আমার

স্বর্ণময় আসন আশ্রয় কর। হে হরে! সেই সুখাসনোপরি মণি-খচিত কনকময় পীঠে উপবেশন কর। হে যদুকুলজ! তোমার সু-চিহ্নিত পাদযুগলে এই যে পাদ্যরূপে সুনির্ম্মল জল প্রদান করিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর। হে মুরারে! আমি তোমাকে দূর্ব্বাদল, ফল ও জল-সমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥২॥

"হে উপেন্দ্র! আমি তোমাকে সুশীতল গঙ্গাজল আচমনীয়রূপে প্রদান করিতেছি, ইহা দ্বারা আচমন কর। হে পাপহারিন্! এই আমি তোমাকে স্নানার্থ পঞ্চামৃত-প্লাবিত গঙ্গা ও যমুনার জল প্রদান করিলাম, তুমি সেই জল দ্বারা স্নান কর। ৩॥

"হে বলানুজ! তুমি অরাতিবর্গকে বিজয় করিয়া অনেক কান্তা আহরণ করিয়াছিলে; এই আমি তোমাকে তড়িদ্বর্ণ বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিতেছি, তুমি তাহার মধ্যে একখানি পরিধান কর ও অপরখানি গলে উত্তরীয়রূপে ধারণ কর। হে হরে! ললাটে মৎপ্রদত্ত এই কস্তুরী-মিশ্রিত চন্দন ধারণ কর এবং এই যে পদ্ম ও তুলসী নির্ম্মিত মাল্য প্রদান করিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর ॥৪॥

"হে প্রভো! আমি ত্বদীয় চরণ-সমীপে এই দশাঙ্গধূপ অর্পণ করিতেছি, ইহার সৌগন্ধ তুমি আঘ্রাণ কর। এই আমি তোমার অভিমুখে চন্দ্রপ্রভা-সদৃশ দীপ প্রদান করিলাম, তুমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। হে ব্রহ্মাদিবন্দ্য! আমি আমার এই করদ্বয় শোধন করিয়া তোমাকে কর্পূর-বাসিত আচমনীয় জল প্রদান করিতেছি, ইহা দ্বারা তুমি আচমন কর। ৫॥

"হে যশোদানন্দন! আমি গব্যঘৃত ও পানপাত্র-সমন্বিত সুবর্ণপাত্রে স্থাপিত করিয়া ষড়্‌রসসমন্বিত ব্যঞ্জনসহিত অন্ন প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রতি পরম দয়া প্রকাশ করিয়া প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সখিগণের সহিত সেই অন্ন ভোজন কর। হে বিভো! সেই অন্ন ভোজন করিয়া এই জল পান কর ॥৬॥

"হে হরে! আমি সুখরুচিকর সকর্পূর তাম্বূল প্রদান করিতেছি, অনুকম্পা-পূর্ব্বক তুমি সেই তাম্বূল ভক্ষণ কর; আর এই সুগন্ধি ও

সুস্বাদু ফল প্রদান করিলাম, প্রীতিপূর্ব্বক সেই ফল আস্বাদন কর। হে লক্ষ্মী-সমালিঙ্গিত-কলেবর! তোমার পূজাসিদ্ধ্যর্থ এই কনকমণি-সকল স্থাপিত করিয়া প্রদীপ দ্বারা আরতি করিতেছি, তুমি আমার এই আরাত্রিক গ্রহণ কর ॥৭॥

"হে অজিত! আমি তোমার মস্তকে নানাবিধ সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ পুষ্প ও তুলসী একত্র করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম, হে বিষ্ণো! আমি জন্ম-মরণের ক্লেশ জানিয়া সেই ক্লেশের পরিহারার্থ চারিবার তোমাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, আমার সকল পাপ বিনষ্ট হউক ॥৮॥

"হে রমানাথ! আমি তোমাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতেছি, আমার সকল দুরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্য গীত ও স্তব করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক—ইহাই প্রার্থনা। হে বিভো! আমি যেন তোমার দাস হইয়া থাকি; আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর; হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি ॥৯॥

"যিনি প্রথমে করতলে দধ্যন্ন, তৎপর নবনীত, অনন্তর বংশী ধারণ করিয়াছেন, সেই নবঘনশ্যামতনু শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করা কর্ত্তব্য ॥১০॥

"হে ভগবন্ মণিকর্ণি বিষ্ণো! এই মানস পূজা তোমারই ইচ্ছায় উদ্ভূত হইল। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যুষসময়ে এইরূপে তোমার মানস পূজা করে, তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই ॥১১॥" *

শঙ্করকে এইভাবে বহুক্ষণ তথায় অবস্থান করিতে দেখিয়া, সকলে কিছু বিস্মিত হইল, তাহাদের অন্তরের কৌতূহল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শঙ্কর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং পশ্চাতে সেই কাশীবাসীকে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে পবিত্রাত্মন্! এই বার কি ভগবান্ বিশ্বনাথের দর্শন করিতে হয়?" তাঁহার বিনয়পূর্ণ সুমিষ্ট বাক্যে সে ব্যক্তি পরম তৃপ্ত হইয়া বলিল—

* এইগুলি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত ভগবন্মানসপূজার ছায়াবলম্বনে লিখিত। 'বসুমতী'-প্রকাশিত শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা ১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"মহাত্মন্, আসুন, আমরা আপনাকে বিশ্বনাথের মন্দির দেখাইয়া দিতেছি।"

শঙ্কর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, আবালবৃদ্ধবনিতা অসংখ্য নরনারী দলে দলে একদিকে চলিয়াছে। তাহারা সকলেই প্রায় স্নাত-দেহ, কেহ বা পট্টবস্ত্র-পরিধানা, কেহ বা কার্পাসবস্ত্র-পরিহিত, কেহ বা সিক্তবস্ত্র; প্রায় সকলেরই হস্তে পুষ্প-চন্দন-বিল্বপত্র-সজ্জিত ফুলের সাজি এবং বারিপূর্ণ পাত্র; ইহাদিগকে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ইহারা সকলেই ভগবান্ বিশ্বনাথের দর্শনার্থী। যেহেতু পূর্ব্বেই তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, লোকে মণিকর্ণিকা-স্নানান্তে বিশ্বনাথ দর্শন করে।

শঙ্কর অনতিবিলম্বে বহু অট্টালিকাদিবেষ্টিত ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা দেব-মন্দিরাদিশোভিত, ঋজুবক্র কয়েকটী সঙ্কীর্ণপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্মুখীন হইলেন। পূর্ব্বোক্ত কাশীবাসী শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন; তিনি যোগিবরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "স্বামীজি, ঐ দেখুন—বিশ্বনাথের মন্দির"। শ্রবণমাত্র তিনি তথায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং করজোড়ে বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন। শিষ্যগণও সঙ্গে সঙ্গে "জয় বিশ্বনাথকি জয়" বলিয়া উচ্চরবে ভগবান্ বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

মৃদুপদসঞ্চারে শঙ্কর বিশ্বনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং মন্দিরশোভা দেখিবার জন্য যেন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন—মন্দিরটী নাতিবৃহৎ এমন একটী ক্রমোচ্চ স্থানোপরি অধিষ্ঠিত যে, দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহা দর্শককে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সঙ্কেত করিতেছে। মন্দিরের চারিদিকে সুবিশাল প্রাঙ্গণ—প্রস্তরফলকে আবৃত এবং নানা-জাতীয় অসংখ্য জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া যেন বিশ্বনাথের বিশ্বপতিত্বেরই পরিচয় দিতেছে। দক্ষিণ দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী-শোভিত একটী নাতিবৃহৎ স্বচ্ছসলিল নিস্তরঙ্গ সরোবর—যেন আপামর-সাধারণকে নবজীবন দান করিবে বলিয়া শান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে। পশ্চিমে বিল্ববৃক্ষবহুল মনোহর পুষ্পোদ্যান যেন ভক্তবৃন্দকে ভক্তির

উপকরণ বিতরণ করিবার জন্যই দণ্ডায়মান। মন্দিরের চারিদিকে নর-নারীর জনতা কিছু অধিক এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের মুখোচ্চারিত "হর হর বম্ বম্" শব্দ অথবা "বিশ্বনাথকি জয়" ধ্বনি মন্দিরগগনকে যেন প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মন্দিরের একদিক্ হইতে সুবৃহৎ ঘণ্টাধ্বনি যেন এই জন-কলরবকে সঙ্গীতে পরিণত করিয়া তাহার তাল দিতেছে।

দেবদর্শনের প্রচলিত প্রথা অনুসারে শঙ্কর সরোবরের বারিস্পর্শ করিতে চলিলেন। সঙ্গের লোকটী তখন তাঁহাকে বলিল, "মহাত্মন্! ইহাই জ্ঞানবাপী সরোবর, ইহার জলপান করিলে বিশ্বনাথের কৃপায় মনুষ্যের সর্ব্বোত্তম কৈবল্যমুক্তিপ্রদ জ্ঞান লাভ হয়।" শঙ্কর বাল্যাবধি শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন; তিনি জানিতেন—তীর্থে আসিয়া তীর্থগুরুর কথা শুনিতে হয়; সুতরাং তিনি আনন্দে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন এবং অতঃপর বিশ্বনাথ দর্শনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বিশ্বনাথের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন—অপূর্ব্ব দৃশ্য। মর্ম্মরপ্রস্তর-ফলকাবৃত মন্দিরমধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ নিম্নক্ষেত্র। ক্ষেত্রটী প্রস্তর-নির্ম্মিত একহস্ত-পরিমিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তন্মধ্যে ভগবান্ বিশ্বনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্ত্তি একটী নীলবর্ণের গৌরীপট্টের উপর স্থাপিত। প্রদীপালোকে প্রতিফলিত হইয়া স্ফটিকলিঙ্গ এমন এক অপূর্ব্ব কিরণ বিকিরণ করিতেছে যে, সহসা তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লয়, কাহার সাধ্য?

যাত্রিগণ প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ভগবানের পূজা করিতেছে, তাহাদের কেহ বা শিবশিরে জলসেচনে ব্যস্ত, কেহ বা চন্দনচর্চ্চিত বিল্বদল ভক্তিসহকারে শিরোপরি রক্ষা করিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অপরের জলধারায় বিধৌত হইতেছে। কত লোকে কত মিষ্টান্ন আনিয়া ভক্তিভরে লিঙ্গোপরি ঢালিয়া দিতেছে, কেহ বা বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ আনিয়া শিবশিরে অর্পণ করিতেছে, কিন্তু নিমেষ মধ্যে তাহা পূজকের হস্তগত হইয়া যাইতেছে। কেহ বা দীপ জ্বালিয়া ভগবানের আরতি করিতেছে, কিন্তু তাহার কার্য্য শেষ হইতে না হইতে অপরে

হয়ত তাহার উপরই পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া দিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ইহাতে কাহারও মনে বিরক্তি নাই। সকলেই ভগবানের পূজা করিয়া সফলকাম হইতেছে। বাবা বিশ্বনাথের নিকট কুলবধূর সংকোচ বা লজ্জা নাই, যুবকের অন্য দৃষ্টি নাই, বৃদ্ধ আতুরের জনসমাগমজনিত ভয় নাই, বালকের চাপল্য নাই। পণ্ডিতের অভিমান নাই, ধনীর মাৎসর্য্য নাই। দরিদ্র দুঃখ ভুলিয়াছে, শোকাতুর শোক ভুলিয়াছে, সকলে যেন তাহাদের নিজস্ব হারাইয়াছে। তাহাদের করদ্বয় যেন পূজার জন্য ব্যস্ত, চক্ষু যেন লিঙ্গমূর্ত্তির প্রতিই নিবদ্ধ, কর্ণ যেন উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণেই উন্মুখ, চিত্ত যেন শিবময় হইবার জন্য লালায়িত। আহা, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

যোগিবর শঙ্কর ইহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান; বুঝি ইচ্ছা করিয়াছেন, জনতা হ্রাস হইলে, স্বয়ং ভগবানের পূজা করিবেন। এইরূপে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে না থাকিতে তিনি যাত্রিবৃন্দের নয়নপথে পতিত হইলেন। একজন বিশালদেহ, গৌরকান্তি, কোমলাঙ্গ, যুবক দণ্ডী, কয়েকজন সন্ন্যাসি-সহ দণ্ডকমণ্ডলু-হস্তে পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া পূজার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা কাহার না দৃষ্টি আকর্ষণ করে? বিশেষতঃ সে সময়ে কাশী নগরীতে বৌদ্ধসন্ন্যাসীই সর্ব্বদা দৃষ্ট হইত, এরূপ দণ্ডী সন্ন্যাসী লোকে কদাচিৎ নিরীক্ষণ করিত। সুতরাং আজ সশিষ্য শঙ্করকে সে ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া যাত্রিগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল এবং উৎসুকনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাঁহার পূজার জন্য যেন অপেক্ষা করিতে লাগিল। শঙ্কর কিন্তু নিশ্চল নিস্পন্দ—কোন দিকে দৃষ্টি নাই, যেন কি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! বিশ্বনাথের পূজকগণ তখন দণ্ডায়মান হইয়া যাত্রিগণকে সরাইয়া দিয়া শঙ্করকে পূজার জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল। শঙ্কর কিন্তু নিশ্চল স্থির। তিনি যেন কি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! পূজকগণ দুই একবার অনুরোধের পর নিবৃত্ত হইলে, যাত্রীরা সকলেই উৎসুকভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সকলেরই পূজা পাঠ বন্ধ হইল। বিশ্বনাথের মন্দির যেন ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ,—কোনও কোলাহল নাই, কলরব নাই, সে ঘণ্টাধ্বনি নাই, সে জনতাই যেন নাই।

সহসা মন্দিরের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব কোলাহলশূন্যতা মন্দিরপথবর্ত্তী বহুলোককে যেন বিস্মিত করিয়া তুলিল। তখন অনেকেই সবিস্ময়ে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এমন কি, যাহারা বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারাও আবার মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সকলেই যেন ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য ব্যগ্র। সুতরাং মন্দিরাভ্যন্তরে জনতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু কাহারও মুখে কোনও কথা নাই—কোনও শব্দ নাই। তাহারা কেবল পরস্পরে বিস্ময়সূচক দৃষ্টি অথবা দুই একটী অস্ফুট বাক্য বিনিময় করিতেছে মাত্র।

শঙ্করের ভাব দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ যেন কিছু চিন্তান্বিত হইলেন। কেন যে যোগিবর সহসা এরূপ নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারিলেন না। অপরে তাঁহাকে চিন্তামগ্ন বলিয়া বুঝিলেও, শিষ্যগণ তাহা বুঝিলেন না। অথবা যোগীশ্বরের চিন্তা কে বুঝিবে, তাঁহার কার্য্য কে জানিবে? অতি সুদক্ষ ডুবুরীও কি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ স্পর্শ করিতে পারে?

যোগিবরের একজন প্রবীণ শিষ্যের চিত্তে তখন নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন—আজ কেন এমন হইল? যিনি আজ গুরুর আদেশে কত দূরদেশ হইতে কত দুর্গম পার্ব্বত্য অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া বিশ্বনাথের দর্শনে আসিয়াছেন, তিনি আজ বিশ্বনাথের সম্মুখে নিশ্চল নিস্তব্ধ। কেনই বা পূজকগণের অনুরোধেও আজ তিনি পূজায় অগ্রসর হইতেছেন না? যোগিবর ব্রহ্মজ্ঞানী, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শী এবং উপাস্য-উপাসক-ভাবের অতীত বলিয়া কি আজ বিশ্বনাথের মন্দিরে সহস্র সহস্র লোকের আগ্রহ-উদ্যম-সমন্বিত উপাসক-উপাস্য-ভাবপূর্ণ কার্য্যকলাপ দেখিয়া নিজেও তাহাদের মত ভগবানের পূজা করিবেন কি না ভাবিতেছেন? সেই চিন্তায়ই কি আজ তাঁহার ভাবান্তর হইয়াছে? তাই কি তিনি আজ বিশ্বনাথের সম্মুখে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান? কিন্তু না, তাহাও ত সম্ভব নহে। কারণ, তিনি ত গুরু গোবিন্দপাদ-সন্নিধানে ওঙ্কারনাথে থাকিয়া

তাঁহারও পূজা করিতেন? আর যখন তিনি নর্ম্মদা ও জাহ্নবী দেখিয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতি করিয়াছেন, মণিকর্ণিকাতীরে ভগবান্ বিষ্ণুর যথারীতি স্তবস্তুতি করিয়াছেন, তখন বিশ্বনাথের সম্মুখে তাঁহার এ ভাব কেন? পরক্ষণেই তিনি আবার ভাবিলেন—না, না, ইহার কারণ অন্ত কিছুই নহে, ইহার কারণ—যোগিবর জ্ঞানযোগী। জ্ঞানযোগী সকলই ব্রহ্মময় দেখেন, সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর তাঁহারা যাহা দেখেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রথমে ব্রহ্মভাবেরই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, প্রত্যেক নূতন অনুভব সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগের অন্তরে ব্রহ্মানুভূতির স্মৃতি উদয় করিয়া দেয় এবং পরে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বিশেষত্ব বা নিজস্ব অনুভূত হইয়া থাকে। আর তখনই জ্ঞানযোগী তাহা লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন সুতরাং জ্ঞানযোগীর ব্যবহারে অজ্ঞজনোচিত তৎপরতা দেখা যায় না। কিন্তু তাহাও ত সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, যোগিবর মণিকর্ণিকা-তীরে বিষ্ণুদর্শনেও এরূপ স্তম্ভিত ভাব ধারণ করেন নাই। তবে কি তিনি আজ বিশ্বনাথের শিবমূর্ত্তি-দর্শনে ব্রহ্মসাগরের এতই তলদেশে উপনীত হইয়াছেন যে, তাঁহার সেই ভাবটী সহসা তিরোহিত হইতেছে না? তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, ব্রহ্মের শিবভাবটী যতটা শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপের উদ্বোধক, রুদ্র বিষ্ণু কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি ভাবসমুদায় সেরূপ নহে। ওঙ্কারনাথের সন্নিধান ত্যাগ করিয়া অনেকদিনের পর তিনি এই প্রথম শিবদর্শন করিলেন, তাই তিনি সেই অমৃতসাগরের অমৃতরসাস্বাদে বুঝি বিভোর হইয়া গিয়াছেন। নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর পূজাপাঠ অসম্ভব নহে, একথা ত তাঁহার নিকটেই শ্রবণ করিয়াছি। যদিও সাধকগণ যে সকল পথ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই সেই পথের গুণে কাহারও কাহারও পূজাপাঠ অসম্ভব বোধ হয় বটে, কিন্তু সকল পথেই ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহারা হঠযোগ বা রাজযোগ অভ্যাস করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদের পূজাপাঠ একদিন অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মের কৃষ্ণ, শিব, কালী প্রভৃতি সগুণ ভাবের উপাসনা করিবার পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, অথবা বেদান্তবিচাররূপ জ্ঞানযোগ-সাধনের পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ

করেন, তাঁহাদের তাঁহা অসম্ভব হয় না। যোগীশ্বর ত এ সকলগুলিই অভ্যাস করিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দপাদ তাঁহাকে অতি উত্তম অধিকারী দেখিয়া সকল দিক্ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পথজনিত সঙ্কীর্ণতা • কেন থাকিবে? গীতা-অধ্যাপনা-কালে সেদিন তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞানযোগী প্রবৃত্তির দ্বেষ করেন না, নিবৃত্তিরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, প্রকৃতির গুণসমূহই কার্য্য করিয়া থাকে জানিয়া তাঁহারা অহঙ্কারে বিমুগ্ধ হইয়া নিজেকে কর্ত্তা জ্ঞান করেন না।"

শিষ্যটী মনে মনে এই সমুদয় আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, শঙ্কর ধীরে ধীরে লিঙ্গ-সমক্ষে নতজানু হইয়া বসিতেছেন এবং করজোড়ে যেন স্তবপাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ক্রমে শঙ্করের অস্ফুট কণ্ঠস্বর তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।—

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥ ১॥
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং, সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥ ২॥
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥ ৩॥
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে, মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ, প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥ ৪॥
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং, নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং,তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥৫॥
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু, র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো,ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে॥৬॥
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং, প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥ ৭॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য॥ ৮॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে, ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥৯॥
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক,ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥১০
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্॥১১॥

যিনি পশুগণের অধিপতি, যিনি সকল লোকের পাতক হরণ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজাজিন পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জটাকলাপমধ্যে গঙ্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই মদনান্তক মহাদেবকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর,যিনি সুরবৃন্দের শত্রুসমূহকে নির্ম্মূল করেন, যিনি বিভু, বিশ্বনাথ এবং বিভূতি অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিলোচন, যাঁহার নয়নত্রয়ে চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি বিদ্যমান এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চমুখ প্রভুকে স্তব করি ॥ ২ ॥

যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, যাঁহার গলদেশ কালিমা-বিভূষিত, যিনি গো পতিতে আরোহণ করেন, যিনি সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত, যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় (পরম-দীপ্তিমান্), যিনি ভস্মদ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছেন, সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

হে পার্ব্বতীনাথ ! হে শম্ভো ! হে চন্দ্রার্দ্ধমৌলে ! হে জটাজূটধারিন্ ! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি পূর্ণব্রহ্ম , হে মহেশ্বর ! হে শূলধারিন্ ! তুমি মৎপ্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ ! একমাত্র তুমিই পরমাত্মরূপী, তুমিই জগতের আদি কারণ, তুমি সর্ব্বচেষ্টাবিবর্জ্জিত, তুমি নিরাকার, তুমি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, তুমিই বিশ্ব পালন করিতেছ এবং তোমাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইয়া থাকে, আমি তোমাকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহ্নি নহেন, পবন নহেন, শূন্য নহেন, এবং যাঁহার তন্দ্রা নাই, নিদ্রা নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, বেশ নাই, ও যাঁহার মূর্ত্তি নাই অথচ যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তি-ত্রয়াত্মক, তাঁহাকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যিনি জন্মাদি-রহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, যিনি এক অদ্বিতীয়, যিনি জগৎপ্রকাশক চন্দ্র ও সূর্য্যাদিকেও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয়, অজ্ঞানান্ধকারের পারে অবস্থিত, যিনি আদি-অন্ত-বিহীন, সেই দ্বৈতবিহীন পরমপুরুষের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭ ॥

হে বিভো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে চিদানন্দমূর্ত্তে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি তপস্যা ও যোগের গম্য অর্থাৎ যোগ ও তপস্যাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে শিব! তুমি শ্রুতিজন্য জ্ঞানের গোচর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

হে প্রভো! হে শূলপাণে! হে বিভো! হে বিশ্বনাথ! হে মহাদেব! হে শম্ভো! হে মহেশ! হে ত্রিনেত্র! হে পার্ব্বতীপতে! হে শান্তমূর্ত্তে! হে মদনরিপো! হে পুরবিজয়িন্! তুমি ভিন্ন অন্য দেবগণ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মান্য গণ্য বা বরেণ্য নহেন ॥৯॥

হে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণাময়! হে শূলপাণে! হে গৌরীপতে! হে পশুপতে! হে পশুপাশবিনাশিন্! হে কাশীপতে! এক তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎপালন করিতেছ, বিনাশ করিতেছ এবং জগদ্বিধান করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর ॥১০॥

হে ভব! তোমা হইতে জগৎ সঞ্জাত হইতেছে। হে দেব! হে মদনান্তকারিন্! হে মৃড়! হে বিশ্বনাথ! তোমাতেই জগৎ অবস্থিত আছে। হে ঈশ! লিঙ্গাত্মক তোমাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ ॥১১॥

শঙ্করের এই অপূর্ব্ব স্তোত্রটী শুনিয়া সমবেত জনমণ্ডলী যেন মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। বিশ্বনাথের পূজকগণ এতই বিহ্বল হইলেন যে, কিছুক্ষণ যেন তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কেহ

বা ইচ্ছা করিতেছেন—এই নবীন সন্ন্যাসীর পরিচয় লইবেন, কাহারও বা এই সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণের জন্য ইচ্ছা হইতে লাগিল, কেহ বা ভাবিতেছেন—নিশ্চয়ই এই সন্ন্যাসী সাধারণ ব্যক্তি নহেন, কেহ মনে করিতেছেন—কিরূপে এই সন্ন্যাসীর শরণ গ্রহণ করিবেন। সকলেই যেন এই সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কোন না কোনরূপে উপকৃত হইবার জন্য উৎসুক হইল। কিন্তু শঙ্করের মুখ দেখিয়া কাহারও মুখে আর কোন কথা সরিল না, তাঁহার মুখে তখন এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য। সকলেই মনের বাসনা মনে লইয়া নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

স্তোত্র সম্পূর্ণ করিয়া যোগিবর শঙ্কর বিশ্বনাথের সম্মুখে পুনঃপুনঃ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন এবং কমণ্ডলুজলে শিবের স্নান করাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথের প্রধান পূজক ইহা দেখিয়া শঙ্করকে বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগবন্, যদি ইচ্ছা করেন, এই পূজোপকরণ দ্বারা বিশ্বনাথের পূজা করুন, আপনি মহদ্ব্যক্তি—আপনি যাহা করিবেন, আপামরসাধারণ তাহারই অনুগমন করিবে।"

পূজকের বাক্যে শঙ্কর সানন্দে বিশ্বনাথের পূজার আয়োজন করিতে সম্মতি দিলেন। অবিলম্বে প্রধান পূজক পুষ্পচন্দন বিল্বপত্র ধূপদীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া শঙ্করের নিকট আনিয়া দিলেন। শঙ্করও ভক্তিভাবে নানা উপচারে বিধিমত দেবাদিদেবের পূজা সম্পন্ন করিলেন এবং পূজান্তে ভগবানের সমক্ষে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সশিষ্য ভগবান্ বিশ্বনাথের মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কাশীপুরাধীশ্বরী ভগবতী অন্নপূর্ণা দেবীর দর্শনোদ্দেশে চলিলেন।

শঙ্করের পশ্চাতে দলে দলে বহুসংখ্যক নরনারী তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

শ্রীমতী—

কথা।

(১)

প্লেটো ও ডাওজিনিস্।

উৎসব-মন্দিরে।

ডাওজিনিস্ সন্ন্যাসী। মন বিষয়-বিমুখ। বিষয়ে মগ্নতা ও তাহার যে কোনও প্রকারের ভোগ হউক না কেন, তাঁহার নিকট অতীব অন্যায়।

কৃচ্ছ্রসাধন যে আবশ্যক, একথা তিনি ষোল আনাই মানিতেন। শুধু মানিতেন না—রীতিমত কার্য্যে পরিণত করিতেন।

ছিন্ন বেশ। জীবন রক্ষা করিতে হইবে, তাই আহার। সাধারণের কাছে সে ত অতি কদর্য্য। শয়ন, সে অতি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য। একটা প্রকাণ্ড "টব", তাহারই মধ্যে কুকুর-কুণ্ডলীতে শয়ন করিতেন, —ভোগবিলাসের এতটুকু মাত্রাও তাঁহার নিকট বিলাসিতার—গর্ব্বের বিষয়।

প্লেটো গৃহী,—সন্ন্যাসী। বিষয়কে তিনি ভগবানের প্রীতির মঙ্গলদান বলিয়াই জানিতেন। অতি কৃচ্ছ্রসাধন, কিংবা অতিভোগ—উভয়কেই তিনি মঙ্গলের অন্তরায় জানিয়া উভয় হইতেই দূরে ছিলেন। সংসারকে সংসারকে তিনি ঘৃণা করিতেন না, তা'কে তিনি বিধাতার মঙ্গলেচ্ছার প্রকাশ বলিয়াই নমস্কার করিতেন।

উভয় মহাত্মার মধ্যে প্রভেদটা এমনই।

সংসারী প্লেটো, উৎসব আমোদ সবই তাঁহার আছে। সেদিন তাঁহার গৃহে উৎসব। বাহুল্যই উৎসবের—সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। সাধারণ কাজের দিনের মাপকাটিটি উৎসবের দিনে ঠিক থাকে না। উৎসবের প্রাণ প্রেম। মিলনেই প্রেমের অভিব্যক্তি। বাহুল্যই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

উৎসবমন্দির* সুচারু সজ্জিত। নগরের সম্ভ্রান্ত নরনারী সবাই সে উৎসবে নিমন্ত্রিত। ডাওজিনিস্‌ও নিমন্ত্রিত।

সবাই আসিয়াছেন। ডাওজিনিস্‌ও আসিয়াছেন। উৎসবসজ্জায় সবাই মোহিত হইয়াছেন, কেবল হইলেন না ডাওজিনিস্‌। তাঁহার আনন্দের বদলে বিরাগেরই উদয় হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী ডাওজিনিস্‌ মিলনমন্দিরের শুভ্র আস্তরণ আপনার ধূলিপূর্ণ চরণযুগলে বিমর্দ্দিত করিয়া সতেজে প্লেটোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"প্লেটো, আমি তোমার এই গর্ব্বকে পদদলিত করিতেছি।"

প্লেটো ধীরে ধীরে মাথা নত করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এর চেয়ে কোনও বড় গর্ব্বের প্ররোচনায় নয় কি?"

---

(২)

মহম্মদ।

শৈলশিখরে।

শরীর যখন অবসন্ন, মন যখন উদাসীন, হৃদয় যখন ব্যাকুল, আত্মা যখন পরম আশ্রয়ের—মহানের—শান্তিস্বরূপের—আনন্দময়ের বিরহ-নীরে ভাসমান, এমন সময় সেই আশ্রয়ের আশ্রয়, প্রিয়ের প্রিয়, আপন হইতে আপন, যিনি একমাত্র গতি, কেমন করিয়া আপনার শুভ্র ক্রোড় উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন?

পাগল মহম্মদ নিখিল বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে পাগল করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সংসার এই ভাবে-ভোলা পাগলকে চিনিতে পারিল না, পারারও কথা নয়। চারিদিক্‌ হইতে বিদ্রূপ, উপহাস, অযত্ন তাঁহাকে আরও পাগল করিয়া তুলিল। প্রতিবেশীর এক একটী লোষ্ট্র-

---

* D—"Plato: I tread upon thy pride."
P— "With greater pride."

নিক্ষেপ তাঁহার অঙ্গে এক একটি প্রেমের, ত্যাগের, দীনতার দাগ অঙ্কিত করিয়া দিতে লাগিল। সকল দাগে দাগী মহম্মদ এমনি করিয়াই প্রিয়তমের উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন।

এত ব্যথা, এত দংশন যদি না হইবে, তবে এমন মহান্‌কে—এমন সুন্দরকে—এমন প্রিয়তমকে কি জানা যায়, দেখা যায়? যতই ব্যথা, ততই আকর্ষণ, ততই সন্নিকর্ষ। ব্যথার মূর্ত্তিতে—রুদ্রমূর্ত্তিতে আসেন বলিয়াই তিনি শান্তমূর্ত্তিতে—আনন্দমূর্ত্তিতে থাকিয়া যান।

দিবসের কর্ম্মের কঠোর মূর্ত্তি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, রজনীর শুদ্ধ মিলনমূর্ত্তি—প্রেমের মূর্ত্তি তাঁহাকে কত না নয়নজলে ভাসাইল।

"আর নয়, বন্ধন ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, নিখিল সংসার মুখ ফিরাইয়াছে! এখনও যদি তিনি না আসিলেন, তবে এইখানেই এ জীবনের যবনিকা পড়ুক!"

এই ত পর্ব্বতশিখর—মাঝখানে, নিম্নে ওই মূক মেদিনী, উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ। সবার মাঝে থাকিয়াও একা—বন্ধনহীন—বড়ই একা—আমার এই ভরা মনে একা। দিতে চাই, তিনি ত নিলেন না! এ আমার স্থান নয়! ওই উর্দ্ধে অনন্তে।—বৃথা আশা! ওই নিম্নে পৃথিবীর ধূলিতেই আমার স্থান। ওইখানেই মিশিয়ে যাই। "হে স্বামিন্‌, পিতঃ, আমায় শেষ করিয়া দাও!" মহম্মদ শিখর হইতে পতনোন্মুখ হইলেন।

'ছিঃ' পশ্চাৎ হইতে মৃদুস্বরে কে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। এই নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে করুণাময়ী খোদেজা মহম্মদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই দারুণ কাণ্ড করিলেন।

পিতার দূত এমনি করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইলেন, অতটুকু তিরস্কার করিলেন 'ছিঃ!'

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

——:——

সংবাদ ও মন্তব্য।

মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ-মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ মালয় উপনিবেশের অন্তর্গত কুয়ালা লামপুর নামক স্থানে "বিবেকানন্দ-আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। ঐস্থানে বহুদিন হইতে "বিবেকানন্দ-পাঠাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবার তথাকার সভ্যগণের উদ্যোগে স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বিগত ২৫শে এপ্রিল তথায় উপস্থিত হন। ষ্টেশনে পঁহুছিবামাত্র প্রায় তিন সহস্র হিন্দু অধিবাসী তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন ও জাঁকজমক সহকারে টাউনহলে লইয়া গিয়া এক অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীও উহার যথোপযুক্ত উত্তর দান করেন। ১১ই ও ১২ই মে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হয়। ইতিমধ্যে তিনি তথায় ২রা মে পর্য্যন্ত ভগবদ্গীতার ক্লাস করিতে থাকেন। ২রা মে ঐস্থান হইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তী সেরাম্বান নামক স্থানে যাইয়া তথাকার বিবেকানন্দ-আশ্রমের প্রস্তাবিত বাটীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ৩রা ও ৪ঠা মে ঐস্থানে "ধর্ম্মের আবশ্যকতা" ও "হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৫ই মে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামী সিঙ্গাপুরে গমন করেন এবং তথায়ও তাঁহার বিশেষ অভ্যর্থনা হয়। এখানে তাঁহার ৫টী বক্তৃতা হইয়াছিল।

১১ই মে কুয়ালা লামপুর বিবেকানন্দ-আশ্রমে হোম পূজা বেদপাঠ প্রভৃতি সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ফটো প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রায় ১৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। পরদিন সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব হয়। ঐদিন তথায় ইউরোপীয়, ইউরেশীয়, চীনা ও ভারতবাসী—সর্ব্বপ্রকার জাতির ভদ্রমহোদয়গণের সমাগম হইয়াছিল। স্বামী শর্ব্বানন্দ কর্ত্তৃক রৌপ্যকুঞ্চিকাদ্বারা আশ্রমের দ্বার উন্মোচিত হইবার পর আশ্রমের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত ইহার সমুদয় কার্য্যবিবরণ পাঠ, সভ্যগণ কর্ত্তৃক ইংরাজী ও তামিল ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা, ও সর্ব্বশেষে স্বামী শর্ব্বানন্দের ওজস্বিনী

বক্তৃতা হইয়া উৎসব সমাপ্ত হয়। সঙ্কীর্ত্তন ও প্রসাদাবিতরণও হইয়াছিল।

১৫ই মে হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত স্বামী শর্ব্বানন্দ উক্ত আশ্রমে এবং অন্যান্য স্থানেও বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, মায়াবাদ প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের ইচ্ছা—রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া সর্ব্বদা উক্ত আশ্রমে থাকিয়া মালয় উপনিবেশে বেদান্ত প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা একটী বেদান্তের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র, সন্দেহ নাই—চীনেদের মধ্যেও নাকি বেদান্তের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ আছে।

নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতির অধ্যক্ষ স্বামী বোধানন্দ উক্ত সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতেছেন:—প্রতি রবিবার সর্ব্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা, প্রতি মঙ্গলবার ভগবদ্গীতার ক্লাস, প্রতি বৃহস্পতিবার ধ্যানশিক্ষা দান ও পতঞ্জলির যোগসূত্র ব্যাখ্যা, প্রতি শুক্রবার প্রাণায়াম ও মনঃসংযম শিক্ষাদান এবং তুলনায় দর্শন ও ধর্ম্ম আলোচনা। এতদ্ব্যতীত প্রতি বুধবারে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বামীর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন।

স্বামী অভেদানন্দ সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের দক্ষিণভাগে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়া অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন স্বামী তথায় বেদান্ত প্রচার করিতে গমন করেন নাই—সুতরাং ইনি বেদান্তের এক নূতন কার্য্যক্ষেত্র সৃষ্টি করিলেন, বলিতে হইবে। তিনি ফার্ণাণ্ডিনা, ফ্লোরিডা ও জ্যাক্সনভিলে নামক স্থানে বহু অনুরাগী শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ও সর্ব্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। তাঁহার বক্তৃতায় অনেক খ্রীষ্টীয়

পুরোহিতও বেদান্তের উপর আকৃষ্ট হন। ফ্লোরিডা হইতে স্বামী জর্জিয়া ষ্টেটের মধ্যে বক্তৃতা করিতে করিতে আট্‌লাণ্টা নামক স্থানে ১লা মার্চ্চ তারিখে উপস্থিত হন। এই স্থানের অধিবাসিগণের নিকট স্বামী অভেদানন্দ প্রচুর অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ করেন। এখানে কয়েকদিন ধরিয়া "বেদান্তদর্শন ও ধর্ম্ম" সম্বন্ধে কয়েকটী এবং "আধুনিক নীতিবিজ্ঞানের নিকট ভারতীয় চিন্তার দান" সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করেন। ঐ শেষোক্ত বক্তৃতাগুলির জন্যই তিনি বিশেষভাবে এস্থানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ৯ই মার্চ্চ প্রাতে "ঈশ্বরের রাজ্য তোমারই ভিতরে" এবং ঐ দিনই অপরাহ্নে "পুনর্জ্জন্মবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পর দিন তিনি নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আট্‌লাণ্টাতে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তের উপর যেরূপ আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ সচরাচর বড় দেখা যায় না।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ বিগত ১৪ই মে দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুরের 'হরিপদ' নামক স্থানে রামকৃষ্ণ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তদুপলক্ষে শ্রীরুদ্র-জপ, গীতাপারায়ণ, দেবীমাহাত্ম্যপারায়ণ, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্র হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ, ও পরে আশ্রমে উহার প্রতিষ্ঠা, নির্ম্মলানন্দ স্বামী ও অপরাপর ব্যক্তিগণের বক্তৃতা, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী প্রকাশানন্দ বিগত মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত সান্‌ফ্রান্সিস্কো হিন্দুমন্দিরে প্রতি রবি-বাসরে এই বক্তৃতাগুলি প্রদান করিয়াছিলেন :—

২রা মার্চ্চ—ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মজীবনের সামঞ্জস্য সম্ভব কি না? আভ্যন্তরিক জ্ঞান। ক্ষমা ও তিতিক্ষা শিক্ষার উপায়।

৯ই মার্চ্চ—গুরুর আবশ্যকতা। পুরোহিত ও অবতার। ঐশ্বরিক প্রেরণা।

১৬ই মার্চ্চ—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তদীয় সার্ব্বজনীন উদার ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেণীর মানবের আদর্শ।

২৩ শে মার্চ্চ—আমরা কি আমাদের সাধনপথ নির্ব্বাচন করিয়াছি? সদসদ্রহস্য। আধ্যাত্মিক জাগরণ।

৩০শে মার্চ্চ—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" ঈশ্বরেচ্ছায় নিজ ইচ্ছা বিসর্জ্জন। "চাহিলেই পাইবে।"

৬ই এপ্রিল—পুনরুত্থানের (Resurrection) তাৎপর্য্য। আধ্যাত্মিক বিকাশ। ধ্যান—কর্ম্মজীবনে উহার উপকারিতা।

১৩ই এপ্রিল—কর্ম্মবাদ ও অদৃষ্টবাদ। অতীন্দ্রিয় বস্তুর অনুসন্ধান। সভ্যতার যথার্থ ভিত্তি।

২০শে এপ্রিল—যীশু খ্রীষ্টের উপদেশসমূহ কি নূতন? ভগবৎকৃপা ও স্বাধীন ইচ্ছা। ব্যক্তিবিশেষ আদর্শের আবশ্যকতা।

২৭শে এপ্রিল—তুরীয় অবস্থা। আত্মবিজয়। স্পন্দনরহস্য।

স্বামী পরমানন্দ এক্ষণে ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। সুতরাং সিষ্টার্ দেবমাতার উপরে বোষ্টন বেদান্তসমিতি পরিচালনার ভার পড়িয়াছিল। তিনি বিগত মে মাসে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে নিয়মিত ক্লাস ব্যতীত তিনটী রবিবারে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দ বিগত ৪ঠা আষাঢ় তারিখে বরিশালের নরোত্তমপুর নামক স্থানে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

বাঁকুড়া জেলার কোয়ালপাড়া নামক গ্রামে একটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথসেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৺বারাণসীধামের বিখ্যাত রুদ্রাক্ষবিক্রেতা ৺নিবারণচন্দ্র দাস দরিদ্র-সেবার জন্য স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের হস্তে তাঁহার গৃহ ও

ব্যবসায়ের সমুদয় লাভ দান করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে বিগত এপ্রিল মাস হইতে উক্ত সেবাশ্রমের জঙ্গমবাড়ী শাখা ভাড়াটিয়া বাটী হইতে দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটস্থ উক্ত নিবারণ বাবুর বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে।

সমালোচনা।

পল্লীসেবক—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ অধ্যাপক—ধনবিজ্ঞান, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর প্রণীত। মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীরাধাপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে পঠিত।

পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ভারতবর্ষের পল্লীসমূহের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধন-পন্থা নির্দ্দেশ। গ্রন্থকারের মতে পল্লীগ্রামই দেশের শক্তি ও সভ্যতার কেন্দ্র। "ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্য পল্লীজীবনের চিন্তা এবং কর্ম্মপ্রণালীর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।" প্রাচীন ভারত যে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা এই "পল্লীগ্রাম এবং নগরজীবনের মধ্যে এরূপ ভাবের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ থাকায়," বর্ত্তমানে "পল্লীগ্রাম এবং নগরের পূর্ব্বেকার ভাববিনিময়ের সামঞ্জস্য আর নাই। নগর-গুলিই এখন দৃষ্টান্তস্থল এবং পল্লীগ্রাম তাহার অনুগামী মাত্র।" গ্রন্থকার বলেন, "ভারতবর্ষ আধুনিক ইউরোপকে অনুসরণ করিয়া তাহার পল্লী-জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে।" কেন না, "পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক উন্নতি বাণিজ্যব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এজন্য সেখানে সহরগুলিই সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ।" পক্ষান্তরে "ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতির উপর ভারত-বর্ষের জাতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে।......কৃষিকার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়া...সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।......এজন্য ভারতবর্ষের সভ্যতা পল্লীগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সহর রাজধানীতে নয়।" সুতরাং "ইউরোপকে এ বিষয়ে অন্ধ অনুকরণ করিতে যাওয়া আমা-

দিগের জাতীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ কাজ।" ভারত-বর্ষের উন্নতি "ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা"য়। বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য—"ভারতবর্ষের পল্লীজীবন আজকালকার নূতন অবস্থার উপযোগী" করিয়া গঠন করা, "ইউরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বৈরাগ্য" সম্মিলিত করা, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই মহামিলনের (বিজ্ঞান-বৈরাগ্যের) কেন্দ্রস্থল" পল্লীগ্রামকে করা। এই গেল থিওরি (Theory)।

উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

প্রথমতঃ কয়েকটি পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করা—(১) যৌথ ঋণদান-মণ্ডলী, (২) যৌথ শস্য-ভাণ্ডার (৩) যৌথ ক্রয়-বিক্রয়-মণ্ডলী (৪) কৃষিকার্য্যের সমবায় ইত্যাদি। এক কথায় "অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পন্থার নিয়োজন।"

এইরূপ অনুষ্ঠানের ফল হইবে "পল্লীর দারিদ্র্য-দূর," "স্বাস্থ্য-লাভ," "আত্মনির্ভরতা-লাভ", "আত্মশক্তির উপলব্ধি," "কর্ম্মশক্তির উদ্বোধন," "পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি," এবং "সমবায় প্রকৃতির জাগরণ।"

এই গেল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা। তার পর "ভারতবর্ষীয় বৈরাগ্যে"র উদ্বোধনার্থ অনুষ্ঠান (১) "আমাদের এই সনাতন প্রেম, সৌহার্দ্দ্য, মিলন ও আত্মনির্ভরতা অনেক বৎসর দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। এখন আমাদিগকে আমাদের পুরাতন জিনিষই নূতন নামে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

(২) পল্লীসেবক গঠন এবং তাঁহাদের দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, টোল প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, সেবা-সমিতি, সুহৃৎ-সমিতি—মদ্যপান-নিবারণী সভা প্রভৃতির স্থাপন।

পল্লীসেবকগণ পল্লীর শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবেন, এক কথায় "পিতা-স্বরূপ" হইবেন, ইঁহারা "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পারদর্শী হইবেন।"

এইরূপে "পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে পারদর্শী ভারতবর্ষের পল্লীসেবকগণ বিজ্ঞান-সাহায্যে ভারতীয় পল্লীজীবনের দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া এক

বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া দিবেন।............ বিশ্ব-জগৎকে একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন উপহার দিবেন।”

এত বিস্তৃত আলোচনাসত্ত্বেও পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ভাল পরিস্ফুট হয় নাই। ভারতবর্ষ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন পথে চলিবে; পাশ্চাত্য জগৎ যাহা করে, তাহা আমাদের উপযোগী নয়, ইতিহাস-বিরুদ্ধ—প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, পাশ্চাত্য অনুকরণ ভাল নয় ইত্যাদি অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য—প্রাচীনেরই বা কি ছিল, এখনই বা কি; এখন পূর্ব্বের মতই থাকিবে, না, নূতন কিছু হইবে, ভারতবর্ষ উন্নতি বলিতে কি বোঝে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কি, এবং তাহার স্বাতন্ত্র্যপথটাই বা কি, প্রবন্ধলেখক স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। কেবল ভারতবর্ষের বহির্জীবনটাকে লইয়া পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনা এবং ‘বোঝা পড়া’ করিয়াছেন, এবং অবশেষে ‘স্বাতন্ত্র্য’ ‘আপন পথ’ টথ সব ভুলিয়া পাশ্চাত্য পন্থাটাকেই একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া “একটা অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পন্থা” খাড়া করিয়াছেন। ফলে অন্তরের সহিত যোগ না রাখিয়া ভারতবর্ষের বাহিরের জীবনটাকে একদেশী ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অথচ প্রবন্ধের প্রারম্ভে আভ্যন্তরিক জীবনটার কথাই মুখ্যভাবে বলিবেন বলিয়া আভাষ দিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় বৈরাগ্যকে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সহিত সম্মিলিত করিয়া “একটা মহা-জীবনের সূচনা”র কথাও বলিয়াছিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে এবং ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে ভারতবর্ষের পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিয়া এই আবশ্যকতাই ভারতবর্ষের মুখ্য আবশ্যকতা নহে, মুখ্য আবশ্যকতার সাময়িক সহায়ক মাত্র। প্রকৃত সংস্কার ভিতর হইতেই আরব্ধ হয়। প্রবন্ধকার আশা করিয়াছেন, ‘একটা বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলন’ ‘জগৎকে একটা শ্রেষ্ঠরত্ন উপহার প্রদান।’ এই আশা করিয়াছেন বলিয়াই আমরা এই কয়েকটি কথা বলিলাম।

যাহা হউক, পুস্তিকার উদ্দেশ্য মহৎ। পল্লীর উন্নতির জন্য প্রবন্ধ-লেখক যে সব পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলির কতকগুলিও যদি

কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে 'আধ্যাত্মিক আন্দোলন' 'শ্রেষ্ঠ রত্ন উপহার' ইত্যাদি হউক আর না হউক, দেশের দুরবস্থার কতকটা অবসানের উপায় হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার ও আলোচনা প্রার্থনীয়।

প্রবন্ধরচয়িতা—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বাণী উদ্ধৃত করিয়া পল্লীসেবক-গঠনের জন্য দেশবাসীকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা জানি, এইরূপ পল্লীসেবকগঠনকার্য্য ইতিমধ্যেই আরব্ধ হইয়াছে; আর যতই লোকে দেশের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে, ততই চতুর্দ্দিকে এইরূপ সেবক-মণ্ডলী গঠিত হইতে থাকিবে। কার্য্যক্ষেত্রে হয়ত আমাদিগকে প্রবন্ধকার-নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত অনেক নূতন নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া লোকের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের বোধ হয়, ধর্ম্মভিত্তিতে রামকৃষ্ণমিশনের সেবাশ্রমসমূহের অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবাসমিতিসমূহ গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাদেরই বিকাশে দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণসমূহ সংসাধিত হইবার পথ উন্মুক্ত হইবে। এখন প্রথম চাই—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, নিঃস্বার্থ, কষ্টসহিষ্ণু, যথার্থ পথে সুপরিচালিত সেবকবৃন্দ।

শ্রীদক্ষিণেশ্বর—শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লাব হইতে প্রকাশিত। ৪০ পৃঃ, মূল্য ।০

আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনক্ষেত্র পবিত্র দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইবার সুযোগ প্রদান করায় আমরা গ্রন্থকারের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ। মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, প্রতিষ্ঠাত্রী স্বর্গীয়া পুণ্যবতী রাণী রাসমণি দাসীর বংশ-পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত, দেবালয়ের প্রত্যেক স্থানের এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তথায় আবির্ভাব এবং সাধনলীলা, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, তদীয় উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমত ও অমর অমৃতময় বাণী, এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তগণের অনেকের নামতালিকা প্রভৃতি বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির বংশপত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুইখানি এবং গঙ্গাবক্ষ হইতে দেবালয়ের মনোহর দৃশ্য—এই তিনখানি ছবি পুস্তকের মর্য্যাদা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। আশা করি, এই পুস্তকখানি সাধারণের তৃপ্তি দান করিবে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ অতিশয় পরিপাটী।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার মনোরম পত্রখানি এইমাত্র পেলাম। তুমি যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছ, তা জেনে আমার বড়ই আনন্দ হল। আরও আনন্দ হল তোমার তীব্র বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে। এই বৈরাগ্যই ত হল ভগবান্ লাভ কর্‌বার সাধনসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রথম সাধন। আমি মান্দ্রাজবাসীর উপর চিরকাল প্রবল আশা পোষণ করে এসেছি—এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস—মান্দ্রাজ হতে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উঠে সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসিয়ে দেবে। আমি তোমার পত্রোত্তরে কেবল এই কথা বলি যে, ঈশ্বর তোমার শুভসংকল্পসিদ্ধিতে শীঘ্র সহায় হোন। তবে হে বৎস, তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিঘ্নগুলির কথাও আমার বলা উচিত। প্রথমতঃ, এইটী দেখ্‌তে হবে যে, হঠাৎ কিছু করে ফেলা কারও পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, তোমার মা ও স্ত্রীর জন্যও একটু ভাবা উচিত। অবশ্য তুমি বল্‌তে পার, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা সংসার ত্যাগ কর্‌বার সময় তাঁদের মা বাপের মতামতে কি সব সময়ে চলেছিলেন? আমি জানি—নিশ্চিত জানি—বড় বড় কায খুব স্বার্থত্যাগ ব্যতীত হতে পারে না। আমি নিশ্চিত জানি—ভারতমাতা তাঁর উন্নতির জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠতম সন্তানগণের জীবনবলি চান আর আমার অকপট আশা এই যে, তুমিও তাঁর কৃপায় তাদেরই মধ্যে অন্যতম হবার সৌভাগ্য লাভ কর্‌বে।

সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাবে, সকল মহাপুরুষেরাই চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন আর সাধারণ

---

* মান্দ্রাজবাসী জনৈক শিষ্যকে লিখিত একখানি পত্র সম্প্রতি ডাঃ নঞ্জুনরাও কর্ত্তৃক মান্দ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ।

লোকে তার শুভফল ভোগ করেছে। তুমি যদি তোমার নিজের মুক্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ কর, সে আর কি ত্যাগ হল? তুমি কি জগতের কল্যাণের জন্য তোমার নিজের মুক্তিবাঞ্ছা পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছ? তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—ঐকথাটা ভেবে দেখ। আমি তোমাকে উপস্থিত এই পরামর্শ দিই যে, তুমি কিছুদিন ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কর অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য স্ত্রীর সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিয়ে তোমার পিতার গৃহেই বাস কর—ইহাই 'কুটীচক' অবস্থা। জগতের কল্যাণের জন্য তুমি যে মহা স্বার্থত্যাগ কর্‌তে যাচ্ছ, তাতে তোমার স্ত্রীকেও সম্মতা কর্‌বার চেষ্টা কর। আর তোমার যদি জ্বলন্ত বিশ্বাস, সর্ব্ব-বিজয়িনী প্রীতি ও সর্ব্বশুভফলদায়িনী চিত্তশুদ্ধি থাকে, তবে তুমি যে তোমার উদ্দেশ্যসাধনে শীঘ্রই সফলতা লাভ কর্‌বে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি দেহ মন প্রাণ অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উপদেশপ্রচারকার্য্যে লেগে যাও দিকি—কারণ, সাধনার প্রথম সোপান হচ্চে কর্ম্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর আর খুব সাধনভজনের অভ্যাস কর। কারণ, তোমাকে মানবজাতির একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হতে হবে আর আমার গুরু মহারাজ বল্‌তেন,—

"আপনাকে মার্‌তে হলে একটী নরুন্‌ দিয়ে হয়, কিন্তু অপরকে মার্‌তে গেলে ঢাল তরবারের দরকার হয়। তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়্‌তে হয় ও অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয়, কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটী কথায় বিশ্বাস কল্লেই হয়।" আর যখন ঠিক সময় হবে, তখন তুমি সমগ্র জগতে গিয়ে তাঁর নাম প্রচার কর্‌বার অধিকারী হবে। তোমার সংকল্প অতি শুভ ও পবিত্র, সন্দেহ নাই—ভগবান্‌ শীঘ্র তোমার সংকল্পসিদ্ধির সহায় হোন, কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু করে ফেলো না। প্রথমে কর্ম্ম ও সাধনভজনের দ্বারা নিজেকে পবিত্র কর। ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্ম্মের উপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়—তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন—পতিত ভারতকে আবার জাগ্রত হবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠ্‌তে পার্ব্বে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ, চারিদিকে প্রচার কর্‌তে হবে—যেন হিন্দুসমাজের সর্ব্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কায করবে?—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা গ্রহণ করে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে? কে নামযশ, ঐশ্বর্য্যভোগ, এমন কি, ইহলোক পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনতির স্রোত রোধ করতে এগুবে? কয়েকটী যুবক দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নপ্রদেশে লাফিয়ে পড়েছে—তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা খুব অল্পসংখ্যক—এইরূপ কয়েক সহস্র যুবকের প্রয়োজন—তারা নিশ্চিত আস্‌বে। আমি বড় আনন্দিত হলাম যে, আমাদের প্রভু তোমার মনে তাদের মধ্যে একজন হবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন। প্রভু যাকে মনোনীত করবেন, সেই ধন্য—সেই মহাগৌরবের অধিকারী। তোমার সংকল্প উত্তম, তোমার আশা উচ্চ, তমোহ্রদে মজ্জমান লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সেই প্রভু ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে আনয়নরূপ তোমার লক্ষ্য অতি মহৎ।

কিন্তু হে বৎস, নির্ব্বিঘ্নে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে হলে হঠাৎ তাড়াতাড়ি কিছু করে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটী গুণ—আবার সর্ব্বোপরি প্রেম—সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তোমার সাম্‌নে ত অনন্ত সময় পড়ে আছে, অতএব তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তোমার মত শত শত যুবক এমন চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়্‌বে এবং যেখানে যাবে, সেখানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক মহাশক্তি সঞ্চার করবে। ভগবান্ শীঘ্র তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করুন। ইতি

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

প্রহ্লাদ-চরিত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

[এই বক্তৃতা আমেরিকার অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়ায় প্রদত্ত হইয়াছিল।]

হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণের রাজা ছিলেন। দেব ও দৈত্য—উভয়েই এক পিতা হইতে উৎপন্ন হইলেও সর্ব্বদাই পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপ্রকাশ ও পরস্পরে যুদ্ধ করিতেন। সচরাচর দৈত্যগণের মানবগণপ্রদত্ত যজ্ঞভাগে অথবা জগতের শাসনে অধিকার ছিল না। কিন্তু কখন কখন তাঁহারা প্রবল হইয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের সিংহাসন অধিকার ও কিছুকালের জন্য জগৎ শাসন করিতেন। তখন দেবগণ যাইয়া সমগ্র জগতের সর্ব্বব্যাপী প্রভু বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে উক্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতেন। তাঁহা কর্ত্তৃক দৈত্যগণ পরাস্ত হইয়া বিতাড়িত হইতেন, দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতেন। পূর্ব্বোক্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপে তাহার জ্ঞাতি দেবগণকে জয় করিয়া স্বর্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ত্রিভুবন—অর্থাৎ মানব ও অন্যান্য জীবজন্তুগণদ্বারা অধ্যুষিত মর্ত্ত্যলোক, দেব ও দেবতুল্য ব্যক্তিগণ দ্বারা অধ্যুষিত স্বর্গলোক এবং দৈত্যগণদ্বারা অধ্যুষিত পাতাললোক—শাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু আপনাকেই সমগ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন—তিনি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ছাড়া আর ঈশ্বর নাই, আর চারিদিকে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোন স্থানে কেহ যেন সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর উপাসনা না করে, এখন হইতে সমুদয় পূজা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য।

হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি অতি শৈশবাবস্থা হইতে স্বভাবতঃই ভগবান্ বিষ্ণুতে অনুরক্ত ছিলেন। অতি শৈশবাবস্থায়ই প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ দেখিয়া তদীয় পিতা হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, আমি সমগ্র জগৎ হইতে বিষ্ণুর উপাসনা যাহাতে

উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমার নিজগৃহেই যদি ইহা প্রবেশ করে, তবেই ত সর্ব্বনাশ—অতএব প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে ষণ্ড ও অমর্ক নামক দুইজন কঠোর ছাত্রশাসনদক্ষ আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, প্রহ্লাদ যেন বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত কখন শুনিতে না পায়। আচার্য্যদ্বয় সেই রাজপুত্রকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহাব সমবয়স্ক অন্যান্য বালকগণের সহিত রাখিয়া অধ্যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশু প্রহ্লাদ তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষাগ্রহণে মনোযোগী না হইয়া সদাসর্ব্বদা অপর বালকগণকে বিষ্ণুর উপাসনা-প্রণালী শিখাইতে নিযুক্ত রহিলেন। আচার্য্যগণ যখন এই ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা অতিশয় ভীত হইলেন। কারণ, তাঁহারা প্রবলপ্রতাপ রাজা হিরণ্যকশিপুকে অতিশয় ভয় করিতেন—অতএব, তাঁহারা প্রহ্লাদকে উক্ত অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু-উপাসনা ও তদ্বিষয়ক উপদেশ-দান প্রহ্লাদের নিকট শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল—সুতরাং তিনি কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন নিজেদের দোষক্ষালনার্থ রাজার নিকট গিয়া এই ভয়ঙ্কর সমাচার নিবেদন করিলেন যে, তাঁহাব পুত্র যে কেবল নিজেই বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছে, তাহা নহে, অপর বালকগণকেও বিষ্ণুর উপাসনা শিক্ষা দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

যখন রাজা ষণ্ডামর্কের নিকট পুত্রের এই চরিত্র শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ সমীপে আহ্বান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বিষ্ণুর উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, দৈত্যরাজ আমিই এক্ষণে ত্রিভুবনের অধীশ্বর—অতএব আমিই একমাত্র উপাস্য—কিন্তু এই উপদেশে কোন ফল হইল না। বালক বার বার বলিতে লাগিলেন—সমগ্র জগতের অধীশ্বর সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য; কারণ, তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তিও বিষ্ণুরই

ইচ্ছাধীন—আর যতদিন বিষ্ণুর ইচ্ছা হইবে, ততদিনই তাঁহার রাজত্ব। প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া নিজ অনুচর-বর্গকে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে বধ করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়াই দৈত্যগণ সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল, কিন্তু প্রহ্লাদের মন বিষ্ণুর প্রতি এতদূর নিবিষ্ট ছিল যে, তিনি শস্ত্রাঘাত-জনিত বেদনা কিছুমাত্র উপলব্ধি কবিতে পারিলেন না।

যখন প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেখিলেন যে, শস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না, তখন তিনি ভীত হইলেন। কিন্তু আবার দৈত্যজনোচিত অসৎপ্রবৃত্তিব বশীভূত হইয়া বালককে বিনাশ করিবার নানাবিধ পৈশাচিক উপায়ের আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহাকে হস্তিপদতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন—ইচ্ছা—হস্তী তাঁহাকে পদতলে পিষিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যেমন লৌহপিণ্ডকে পিষিয়া ফেলা হস্তীর অসাধ্য, প্রহ্লাদেব দেহও তদ্রূপ হস্তিপদতলে লৌহপিণ্ডবৎ পিষ্ট হইল না। সুতরাং প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবাব এই উপায় বিফল হইল। পরে রাজা প্রহ্লাদকে এক উচ্চ গিবিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন—তাঁহার এই আদেশও যথাযথ প্রতিপালিত হইল। কিন্তু প্রহ্লাদেব হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন—সুতরাং পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে তৃণের উপব পতিত হয়, প্রহ্লাদও তদ্রূপ অক্ষতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন। প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য অতঃপর বিষ, অগ্নি, অনশন, কূপপাতন, অভিচার ও অন্যান্য নানাবিধ উপায় একটীর পরে একটী অবলম্বিত হইল, কিন্তু এই সকল উপায়ে কোন ফল হইল না। প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন, সুতবাং কিছুতেই তাঁহার কিছু-মাত্র অনিষ্ট করিতে পারিল না।

অবশেষে কোনরূপে পুত্রের নিধনসাধন করিতে না পারিয়া রাজা আদেশ করিলেন, পাতাল হইতে নাগগণকে আহ্বান করিয়া সেই নাগ-পাশে প্রহ্লাদকে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তাহার উপর বড় বড় পাহাড় স্তূপাকার করিয়া দেওয়া হউক। এই

অবস্থায় তাহাকে রাখা হউক—তাহা হইলে এখনই না হউক, কিছুকাল পরে সে বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু পিত্রাদেশে এই অবস্থায় পাতিত হইয়াও তিনি "হে বিষ্ণো, হে জগৎপতে, হে সৌন্দর্য্যনিধে" ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার পরম প্রিয়তম বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর চিন্তা ও তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তিনি ক্রমে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার অতি নিকটে রহিয়াছেন, আরও চিন্তা করিতে করিতে অনুভব কবিলেন, বিষ্ণু তাঁহার আত্মার ভিতরই বহিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার অনুভব হইল যে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সকল বস্তু এবং তিনিই সর্ব্বত্র।

যখনই প্রহ্লাদের এইরূপ অদ্বৈতানুভব হইল, অমনি তাঁহার নাগ-পাশ খুলিয়া গেল—তাঁহার উপর যে পর্ব্বতরাশি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা গুঁড়াইয়া গেল, তখন সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠিল ও তিনি ধীরে ধীবে তরঙ্গরাজির উপর উত্থিত হইয়া নিরাপদে সমুদ্রকূলে নীত হইলেন। প্রহ্লাদ তখন, তিনি যে একজন দৈত্য, তাঁহার যে একটা মর্ত্ত্যদেহ আছে, একথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—তিনি উপলব্ধি কবিতেছিলেন যে, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি তাঁহা হইতেই নির্গত হইতেছে। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে—তিনিই সমগ্র জগতের—সমগ্র প্রকৃতির শাস্তাস্বরূপ। প্রহ্লাদ এইরূপ উপলব্ধিবলে সমাধিজনিত অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া বহুকাল যাপন করিলেন—বহুকাল পরে ধীরে ধীরে তাঁহার দেহজ্ঞান আবির্ভূত হইতে লাগিল, তিনি আপনাকে প্রহ্লাদ বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন। এইরূপে দেহজ্ঞান আবার আবির্ভূত হইলে তিনি দেখিতে লাগিলেন, ভগবান্ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, তখন জগতের সকল বস্তুই তাঁহার বিষ্ণু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেখিলেন যে, তাঁহার শত্রু ভগবান্ বিষ্ণুর পরম ভক্ত নিজ পুত্র প্রহ্লাদের বিনাশার্থ যত প্রকার উপায় হইতে পারে, তৎসমুদয়ই বিফল হইল, তখন তিনি পরম ভীতিগ্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন দৈত্যরাজ পুনরায় পুত্রকে

নিজ সন্নিধানে আনয়ন করাইলেন এবং নানাপ্রকার মিষ্টবাক্য বলিয়া তাঁহাকে .আবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ পূর্ব্বে পিতার নিকট যেরূপ উত্তর করিতেন, এক্ষণেও সেই একই উত্তর তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল। হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, শিক্ষা ও. বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার শিশুজনোচিত এই সব খেয়াল চলিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় প্রহ্লাদকে ষণ্ডামর্কের হস্তে অর্পণ কবিয়া তাঁহাদিগকে প্রহ্লাদকে রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অনুমতি করিলেন। ষণ্ডামর্কও প্রহ্লাদকে লইয়া রাজধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই উপদেশ প্রহ্লাদের ভাল লাগিত না, তিনি সুযোগ পাইলেই সহপাঠী বালকগণকে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

যখন হিরণ্যকশিপুর নিকট এই সমাচার পঁহুছিল যে, প্রহ্লাদ নিজ সহপাঠী শিশুগণকে পর্য্যন্ত বিষ্ণুর উপাসনা করিতে শিখাইতেছে, তখন তিনি আবার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং প্রহ্লাদকে নিজ সমীপে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইতে এবং বিষ্ণুকে অকথ্য ভাষায় নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ তখনও দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন যে, "বিষ্ণুই সমগ্র জগতের অধীশ্বর, তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য।" এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রে দুষ্ট, যদি তোর বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তিনি এই স্তম্ভে নাই কেন?" প্রহ্লাদ বিনীতভাবে কহিলেন, "হাঁ, তিনি অবশ্যই এই স্তম্ভে আছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে এই আমি তোকে তরবারি আঘাত করিতেছি, তোর বিষ্ণু তোকে রক্ষা করুক।" এই বলিয়া দৈত্যরাজ তরবারিহস্তে প্রহ্লাদের দিকে বেগে অগ্রসর হইলেন এবং স্তম্ভের উপর প্রচণ্ড তরবারির আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্তম্ভমধ্য হইতে বজ্রনির্ঘোষ উত্থিত হইল, বিষ্ণু নৃসিংহ অর্থাৎ অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ সিংহাকারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্তম্ভমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। সহসা এই ভীষণ মূর্ত্তিদর্শনে চকিত ও ভীত হইয়া দৈত্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

হিরণ্যকশিপু কিন্তু তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে ভগবান্ নৃসিংহ কর্ত্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলেন।

তখন স্বর্গ হইতে দেবগণ আগমন করিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদও ভগবান্ নৃসিংহদেবের চরণে নিপতিত হইয়া পরম মনোহর স্তব করিলেন। তখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া প্রহ্লাদকে বলিলেন, "বৎস প্রহ্লাদ, তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর। বৎস, তুমি আমার পরম প্রিয়তম। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমার নিকট প্রার্থনা কর।" প্রহ্লাদ ভক্তিগদ্গদস্বরে বলিলেন, "প্রভো, আমি আপনাকে দর্শন করিলাম। এক্ষণে আমার আর কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? আপনি আর আমাকে ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইবেন না।" ভগবান্ পুনরায় কহিলেন, "প্রহ্লাদ, তোমার নিষ্কামভক্তি দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। তথাপি আমার দর্শন কখন বিফল হয় না। অতএব আমার নিকট যে কোন একটী বর প্রার্থনা কর।" তখন প্রহ্লাদ বলিলেন,

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়ে যেরূপ তীব্র আসক্তি থাকে, তোমাকে স্মরণ করিবার সময় যেন সেইরূপ তীব্র অনুরাগ আমার হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়।

তখন ভগবান্ কহিলেন,

"বৎস প্রহ্লাদ, যদিও আমার পরম ভক্তগণ ইহলোক বা পরলোকের কোনরূপ কাম্যবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, তথাপি তুমি আমার আদেশে সর্ব্বদা আমাতে মন রাখিয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যভোগ ও পুণ্যকর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠান কর। যথাসময়ে কল্পান্তে দেহপাত হইলে আমায় লাভ করিবে।" এইরূপে প্রহ্লাদকে বর দিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণ প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্ব স্ব লোকে প্রস্থান করিলেন।

ভারতের সাধনা।

(১১)

শিক্ষাসমন্বয়।

"The secret of a true Hindu's character lies in the subordination of his knowledge of European sciences and learning, of his wealth, position and name, to that one principal theme which is inborn in every Hindu child—the spirituality and purity of the race"

অনুবাদঃ—সমগ্র হিন্দুজাতির সনাতন পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধি, সঙ্গীতের সুরলয়ের মত, প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের জীবনে আজন্ম অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে, আপনার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিদ্যাবত্তাকে, আপনার ঐশ্বর্য্য, পদবী ও যশকে, ঐ পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনয়ন করাই আদর্শ হিন্দুচরিত্রের রহস্য।

————"রামনদে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা।"

আমরা শিক্ষাসম্বন্ধীয় নবম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, ভারতীয় শিক্ষা (culture) পরমার্থমূলক, উহা কেবল মস্তিষ্কের খোরাক যোগাইয়া ব্যাখ্যানপটু পণ্ডিত গড়িতে চাহে না, উহার উদ্দেশ্য—সংসারের সকলক্ষেত্রে পরমার্থনিষ্ঠ কর্ম্মবীর মানুষ গড়িয়া তোলা। পরমার্থসাধনার কেন্দ্রই এইরূপ শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্র এবং যে শক্তিতে দেশে ধর্ম্মজীবন উদ্দীপিত ও সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিতেই ঐ শিক্ষার অভ্যুদয় ও বিস্তার ঘটে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে যে মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে, তাহা আমরা বিগত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, শিক্ষা বা cultureএর আদিম উৎস—প্রত্যক্ষজনিত অভিজ্ঞতা (experience), ইউরোপে যেরকম প্রত্যক্ষকে জমি পাইয়া শিক্ষারূপ বৃক্ষটী জন্মাইয়াছে ও পত্রপুষ্পফলে উন্নতশির হইয়া দাঁড়াইয়াছে,

তাহার নাম ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ,—কেবল হয়ত খৃষ্টধর্ম্ম গাছের গোড়ায় সময় সময় সার ফেলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে রকম প্রত্যক্ষকে জমি পাইয়া শিক্ষারূপ বৃক্ষ মঞ্জরিত ও পল্লবিত হইয়াছে, তাহার নাম অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। জমির প্রভেদ থাকায় গাছেরও প্রভেদ ঘটিয়াছে, কিন্তু দুই-ই গাছ বটে, ভারতীয় শিক্ষাও culture, পাশ্চাত্য শিক্ষাও culture।

উপনিষৎ বলেন, "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বানি নিঃশ্বসিতানি।" ভারতীয় শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের চিরকালের ধারণা এইরূপ। আগুণে ভিজে কাঠ ঠেলিলে যেমন রাশি রাশি ধূম নির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ হইতে ভারতীয় শিক্ষা শাখাপ্রশাখাসমন্বিত নানা বিদ্যার আকারে যেন নিঃশ্বসিত হইয়াছে। এই ঘোর শিক্ষাসমস্যার যুগে আমাদিগকে এই সব শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

ভারতীয় শিক্ষার উদ্ভবস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া ভারতীয় শিক্ষার গতিও (trend) নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় শিক্ষা মানুষকে অনিবার্য্যরূপে উহার উদ্ভবস্থানের দিকে গতিশীল করিয়া দেয়, ভারতীয় শিক্ষায় এমন কিছু শিক্ষিতব্য থাকিতে পাবে না, যাহার জন্য বা যাহার দ্বারা সেই গতির বিপরীত আবর্ত্তণ শিক্ষার্থীর উপর প্রযুক্ত হয়। অতএব পরমার্থের প্রতি অনন্যগতিনিষ্ঠতাই ভারতীয় শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ; যদি জগতের কোনও বিদ্যা বা তত্ত্বকে ভারতীয় শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে হয়, তবে ঐ বিদ্যা বা তত্ত্বকে এই বিশেষ লক্ষণের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে লক্ষণান্বিত করিতে পারিলে, সে অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, এইরূপ প্রণালীর সাহায্যে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কতদূর আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু এইখানে একটা সন্দেহ উঠিতে পারে। ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের এলাকার যাহা অন্তর্গত, তাহাকে ব্যবহার বলে; যে পরমার্থভূমিতে

অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের প্রয়োগ হয়, তাহা সর্ব্ব ব্যবহারের অতীত; অতএব কেবল ব্যবহার লইয়াই যে পাশ্চাত্য শিক্ষার নাড়াচাড়া, তাহার সহিত পরমার্থনিষ্ঠ ভারতীয় শিক্ষার অনুকূল সংযোগ কিরূপে ঘটিতে পারে?

ব্যবহারের দ্বারা ব্যবহারকে নিরাকৃত করাকেই জীবন বলে। জড়ত্ব নিরাকৃত করাকেই জীবত্ব বলে, আবার জীব যখন ব্যবহার্য্য স্থূল পদার্থসকলকে সূক্ষ্মমনের সম্ভোগার্থ নিযুক্ত করে, তখন সূক্ষ্মদ্বারা স্থূল নিরাকৃত হইতে থাকে; তার পর যখন মানুষের স্বভাবে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর নানারূপ বুদ্ধির প্রকাশ হয়, এবং মন বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া—আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া—ব্যবহার্য্য পদার্থে পরিণত হয়, তখনও ব্যবহারই ব্যবহারকে নিরাকৃত করে। মানুষের জীবন এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্যবহারের দিকে ধাবিত হইতেছে, এবং পদে পদে স্থূলতর ব্যবহার সূক্ষ্মতর ব্যবহারের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে। ভারতীয় শিক্ষা সেই বহু প্রাচীনযুগ হইতে এই নিরাকরণ-ব্যাপারের একটা সীমা খুঁজিয়া পাইয়াছিল,—ভারতীয় শিক্ষার প্রাচীন নেতৃবৃন্দ নেতি নেতি করিয়া সর্ব্বব্যবহারের একটা সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। যে গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার রহস্য জানে, গোলকধাঁধায় তাহার আর ধাঁধা লাগে না; তাহাকে গোলকধাঁধার যেখানেই ছাড়িয়া দাও না, সে ঠিক বাহির হইয়া আসিবে। ব্যবহারের ধন্ধ কিরূপে অব্যাহতভাবে অতিক্রম করিতে হয়, সেই শিক্ষার নামই ভারতীয় শিক্ষা—শ্রেষ্ঠ কৌশলের প্রয়োগে কিরূপে সর্ব্ববিধ ব্যবহারকে ব্যবহারের দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিতে হয়, সেই শিক্ষার নামই ভারতীয় শিক্ষা। এ শিক্ষা ব্যবহারের ধন্ধকে ভয় করে না, এ শিক্ষা ব্যবহারকে জয় করিয়া ব্যবহারের অতীতে মানুষকে পৌছাইয়া দেয়,—ব্যবহারের পাশ কাটাইয়া, ব্যবহারকে দূরে রাখিয়া, ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, ব্যবহারের পরপারে পাড়ি দেয় না—ব্যবহার-প্রবাহ কাটিতে কাটিতে মানুষের চিত্ত-তরণীকে পারে পৌছাইয়া দেয়। অতএব পাশ্চাত্য শিক্ষা যে ব্যবহারের রাজ্যে চলাফেরা করিতেছে, সে রাজ্যের সর্ব্বত্রই ভারতীয় শিক্ষারও গতিবিধি থাকিতে পারে। তবে প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্য

শিক্ষা হয়ত যেখানে কোনও ব্যবহারকে নিরাকৃত করিতে না পারিয়া উহাকেই চরম বলিয়া ধরিয়া আছে, ভারতীয় শিক্ষা সেখানেও ব্যবহারের অতীতে দৃষ্টি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে, সেখানেও ব্যবহারকে অতিক্রম করিয়া পরমার্থের সহিত সংযোগ রাখিতেছে। যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সৃষ্টিবিলাসের মূলে পরমাণুর স্পন্দন স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু এই পরমাণু ও স্পন্দন লইয়া যতই কেন গবেষণা চলুক না, উহাদের ধারণা নিতান্তই ব্যবহারিক থাকিয়া যাইতেছে; এমন কি, সম্প্রতি নির্ব্বাত দেশভাগে তাড়িতশক্তি সঞ্চালন করিয়া কেহ কেহ নাকি তথাকথিত শূন্য হইতে জড়ের (হেলিয়ম্ ও নিয়ন্) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে, যাহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়পরমাণু বলে, তাহাও জড়শক্তিরই একরূপ বিকাশ মাত্র, ইত্যাদি। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যে শক্তির ধারণাও কতদূর স্থূল; আজ যাহাকে নিছক শক্তি বলা হইতেছে, কাল তাহার ভিতরও জড়ত্ব বা সাকারত্ব দেখা যাইতেছে এবং আজ যাহাকে আদিম জড়পরমাণু বলা হইতেছে, কাল তাহারও সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এইভাবে কেবলই কাশীর বিশকৌটা খুলিয়া যাইতেছে, এ কৌটার-পর-কৌটা-খুলার আর অন্ত নাই। এখন কথা এই যে, ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর দাঁড়াইয়া জগতের মূল উপাদান বা মূলশক্তি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই যে একটা অনেক পরের গড়া-পেটা জিনিস, যন্ত্রাদি ও অনুমানের সাহায্য পাইলেও উহার দৌড় কতটুকু? ঐরূপ প্রত্যক্ষের ভূমি হইতে কি জগতের মূলস্পন্দনের প্রকৃতি বুঝা সম্ভব? বরং তার চেয়ে বাইবেলকথিত ব্যাবেলের মিস্ত্রীদের পক্ষে ইটসুরকির দ্বারা পৃথিবীর মাটি হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সিঁড়ি গড়িয়া তুলা বেশী সম্ভব!! সেই সমস্ত কারিগর অপেক্ষা আধুনিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের স্পর্দ্ধা কিছু কম নহে!

যাঁহারা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে জগতের আদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সৃষ্টির মূলে একপ্রকার স্পন্দনক্রিয়া স্বীকার

করিয়াছেন; অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষাও পাশ্চাত্য শিক্ষার মত ব্যবহারিক জগতের সকল শক্তির মূলে মূলস্পন্দন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা (culture) পাশ্চাত্য শিক্ষার মত ব্যবহারের গোলক-ধাঁধায় ঘুরপাক খাইয়া অনর্থক কেবলই কৌটার পর কৌটা খুলার অভিনয় করে নাই। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—প্রাণ স্পন্দিত হওয়ায়, যাহা কিছু সৃষ্টরূপে বিলসিত, সে সমস্তই নিঃসৃত হইল। এই সূক্ষ্মস্পন্দনব্যাপারটী—যাহা একটা কার্য্যমাত্র, তাহার—ধারণায় ভারতীয় শিক্ষা বরং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত যোগদান করিতে পারে, কিন্তু স্পন্দনের কারণ প্রাণবস্তুর ধারণা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এলাকার বহির্ভূত। এই প্রাণবস্তুকে ভারতীয় শিক্ষা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে?

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ।
প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি।
দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৄণাং প্রথমা স্বধা
ঋষীণাঞ্চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি।
ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ।

ইত্যাদি—প্রশ্নোপনিষৎ।

এই প্রাণবস্তুকে তুমি অবৈজ্ঞানিক বলিতে পার? বৈজ্ঞানিক বলা যায় কাহাকে? না, যাহার সত্তা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণিত হয়, তাড়িতশক্তি বৈজ্ঞানিক, কেন না প্রত্যক্ষক্ষেত্রে উহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। প্রত্যক্ষই বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বিজ্ঞানের অস্থিমজ্জা ও মূলভিত্তি। ভারতীয় শিক্ষায়ও বিজ্ঞানশব্দ এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেইজন্য পরমহংসদেব বলিতেন, "জ্ঞানের পর বিজ্ঞান"। অতএব বৈদিক ঋষি যে তত্ত্বকে প্রাণনামে অভিহিত করিতেন, সে তত্ত্বের অস্তিত্ব যদি প্রত্যক্ষমূলক হয়, তবে

তাহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা যায় না, কারণ, "অবৈজ্ঞানিক" বলিতে সাধারণতঃ "কাল্পনিক" বা "আনুমানিক" বুঝায়।

প্রাণতত্ত্ব ও স্পন্দনতত্ত্বের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের এলাকামধ্যে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা একযোগে কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষায় অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই মূলপ্রমাণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োগক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশস্ত ও গভীর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায় ও অবলম্বন একমাত্র ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, ভারতীয় বিজ্ঞানের সহায় ও অবলম্বন প্রধানতঃ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, কিন্তু ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ তাহারই তাঁবে কাজ করিতে পারে, কারণ, স্থূল কার্য্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অধিকারভুক্ত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কারণের স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হয় না, তাহার সত্তামাত্র অনুমান করিয়া রাখে (যথা—"A force is that which causes or tends to cause motion."); এইজন্য প্রকৃত হিসাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা যায়। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে কারণের স্বরূপ অনুসন্ধান করে এবং ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে কার্য্যের প্রকৃতি বিচার করে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রকৃত কারণবাদ না থাকায়, প্রত্যেক পরিণামের পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যসমবায়কেই পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যসমবায়কে প্রকৃতপক্ষে নিমিত্ত বলাই উচিত। যাহা হউক, একথা সহজেই বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার কার্য্যতত্ত্বের সহিত ভারতীয় শিক্ষার কারণতত্ত্ব অনুকূল সংযোগে সংযুক্ত হইতে পারে, কেননা ভারতীয় বিজ্ঞান যাহাকে কারণ বলে, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কারণ নহে—উহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকের বস্তু। সে থাক্ বা ভূমিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আদৌ গতিবিধি নাই, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাহাকে কারণ বলে, তাহাকে নিমিত্তমাত্র ভাবিয়া লইয়া ভারতীয় বিজ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারে।

পরিণামের সূক্ষ্মতর অবস্থাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্থূলতর অবস্থার কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত হয়, সে ভাব ভারতীয়

বিজ্ঞানের পক্ষে উপাদেয় নহে, কারণ, ভারতীয় বিজ্ঞানীকে ঐ ভাবে কার্য্য-প্রপঞ্চের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না,—কার্য্য-প্রপঞ্চের অতীতে যে কারণবস্তু প্রকাশমান, অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে তাহাকে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিতে হইবে। এইজন্য দেখিতে পাই যে, পরমবিজ্ঞানী পরমহংসদেবের মনে একবার অনুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কৌতূহল হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণতত্ত্বে মনের আকর্ষণ জগৎকে বুঝাইবার জন্যই যেন সে মন পাশ্চাত্য স্থূল কার্য্যতত্ত্বের ধান্ধার মধ্যে ঢুকিতে চাহিল না,—অনুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা করা হইল না।* আমরা কার্য্যপ্রপঞ্চকে কারণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি বলিয়াই আমাদের পক্ষে একটা স্বতন্ত্র জগৎ থাকিয়া যায়—জীবনের একটা ঐহিক বিভাগ বিদ্যমান থাকে। এই রকম একটা আলাদা বিভাগ বজায় থাকার নামই অবিদ্যামায়া, এইজন্য পরমহংসদেব বলিতেন যে, "যতক্ষণ তাঁকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ জগৎ মিথ্যা", অর্থাৎ কারণসত্তার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ জগৎ থাকে, তাহা মিথ্যা। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানীর জগৎ সেরূপ জগৎ নহে, তিনি দেখেন —ব্রহ্মই জীবজগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হইয়াছেন; "যে ইট-চূণ-সুরকিতে ছাদ, সেই ইট চূণ-সুরকিতেই সিঁড়ি হইয়াছে"। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কারণানুসন্ধানে ব্রতী হইলেও, মিথ্যা জগতের এলাকামধ্যে কার্য্যপ্রপঞ্চের ধান্ধায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পরমহংসদেবের জীবনলীলায় এইরূপ ধাঁধা-লাগার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বহু বার ইঙ্গিতে প্রকাশ হইয়াছে।

কিন্তু পরিণামের পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মতর অবস্থাকে বা নিমিত্তসমবায়কে পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলে যে, কোনও হিসাবে কোনও উপকার নাই, তাহা নহে। সাধারণ সংসারী মানুষ ব্যক্ত জগৎকে স্বতন্ত্র জানিয়া উহাতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা খুঁজে, পাশ্চাত্য কার্য্য-

* এইরূপে পরমহংসদেবের জীবনলীলায় এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাহাতে নানাবিষয়ে আমাদের ভারতীয় সনাতন ভাবটী কি তাহা প্রকটিত হইয়াছে। ১৩১৯ সালের বৈশাখের "ভারতের সাধনা"য় সংবাদপত্র স্পর্শ করায় তাঁহার সঙ্কোচের উল্লেখ করিয়া আমরা আর একটী এইরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইতি লেখকস্য।

কারণবাদের দ্বারা সে আত্মপ্রতিষ্ঠার যে অনেক সুবিধা ও সুযোগ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তার পর আধুনিক জগতে একটা টিকিবার ও দাঁড়াইবার স্থান পাইতে হইলে, প্রত্যেক সমাজ ও দেশকেই সমষ্টিশক্তির (collective life) উপযুক্ত বিকাশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ঐরূপ বিকাশ যে ভাব ও শক্তির একরূপ ব্যূহ-রচনার দ্বারা (অর্থাৎ, organisation of thought and activityর দ্বারা) সম্ভবপর, তাহা আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখিয়াছি। ঐরূপ ব্যূহরচনা বা organisationএর জন্য আজকাল পাশ্চাত্যের নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কৌশলাদি ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সে প্রয়োজন পূরণার্থে ভারতীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত যোগদান করিতে হইবে। এ সংযোগ কি ধরণের, তাহা আমরা এখন বিচার করিলাম। আমরা দেখিলাম যে, প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত স্বামীজির উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, কেন না পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিলেই যে ভারতীয় বিজ্ঞানকে পরিহার করিতে হইবে এমন কিছু কথা নহে, বরং ভারতীয় বিজ্ঞান ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কার্য্যপ্রপঞ্চের অনুসন্ধানে নিয়োজিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে এবং যে ভাব ও শক্তির ব্যূহনির্ম্মাণের দ্বারা দেশে সমষ্টিশক্তির প্রতিষ্ঠা হইলে ভারতীয় শিক্ষার নবাভ্যুদয় ঘটিবে, সেই ব্যূহনির্ম্মাণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও সম্যক্‌রূপে কার্য্যকরী হইতে পারে।

কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা দ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আত্মসাৎকার সম্ভবপর হইলেও, একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। যে বিজ্ঞান ও শিল্পে ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই একমাত্র সহায় ও অবলম্বন, সে বিজ্ঞান ও শিল্পের সহিত ভারতীয় শিক্ষা হইতে উদ্ভূত শিল্পবিজ্ঞানের একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ থাকিবার কথা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিজ্ঞানের উৎকর্ষ যেমন শিল্পে (art) প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, ভারতীয় শিক্ষায়ও সেইরূপ হইয়াছিল। আমাদের শাস্ত্রাদির অকাট্য সাক্ষ্য এই যে, প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণ প্রকৃতির নানা শক্তিকে আপনাদের কাজে

লাগাইতে পারিতেন; আধুনিক পাশ্চাত্যদের মত তাঁহাদেরও প্রকৃতির সঙ্গে সে রকম একটা বোঝাপড়া ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বোঁঝাপড়া ও আধুনিকদের বোঝাপড়ায় যথেষ্ট প্রভেদও রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যদের সে বোঝাপড়াকে প্রকৃতই বোঝাপড়া বলা যায়, তাহাতে একপ্রাণতা ছিল, হৃদয়ের সাড়া ছিল, ভাবের আদানপ্রদান ছিল; প্রকৃতি তাঁহাদের নিকট প্রাণময়ী ও ভাবময়ী হইয়া পূজা আদায় করিতেন। এরকম বোঝাপড়া প্রকৃত কারণতত্ত্বের খোঁজ না পাইলে হয় না, কেন না কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রকৃতির রূপ জড়যন্ত্রবৎ, কিন্তু কারণভূমিতে তিনি চিন্ময়ী, ভাববিলাসিনী। ঐন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদী আধুনিকেরা সে কারণভূমিতে উঠে নাই, তাই প্রকৃতি তাহাদের চক্ষে যেন একটা অন্তহীন, বিরাট্ জড়যন্ত্র। এই বিরাট্ যন্ত্রে সূক্ষ্ম কার্য্য কিরূপে স্থূল কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা ধরিয়া ফেলাকেই আধুনিকেরা প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া বলিয়া মনে করে, এইরূপ একটা বোঝাপড়ার গুণে. আধুনিকেরা জড়প্রকৃতির অনুকরণে জড়যন্ত্র-সহায়ে কতকগুলি সূক্ষ্মতর নিমিত্তের সমবায় ঘটাইয়া স্বেচ্ছামত স্থূল কার্য্যের সংঘটন করাইতেছে। ইহাই হইল পাশ্চাত্যের শিল্প বা art mechanics প্রভৃতি যন্ত্রকৌশল ও যন্ত্রবিদ্যা। প্রাচীন আর্য্যগণ প্রকৃতিকে জড়যন্ত্ররূপে দেখেন নাই, তাই যন্ত্র গড়িয়া গড়িয়া প্রকৃতির নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে যান নাই। এমন কি, সেরূপ হৃদয়হীন জড়বাদমূলক ব্যবহারকে আর্য্যগণ ঘৃণার্হ বলিয়াই মনে করিতেন। সেইজন্য দেখিতে পাই, যন্ত্রবিদ্যার অনুশীলন ক্রমশঃই উন্নত আর্য্যসমাজে অনুকূল আশ্রয় হারাইয়া কলিযুগের পূর্ব্বেই অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের সভা গড়িবার জন্য ময়দানবকে ডাকিতে হইতেছে; ময়দানবের জাতিই স্থাপত্য, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি নানা শিল্পের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতির সহিত প্রাচীন আর্য্যের যেরূপ বোঝাপড়া ছিল, তাহাকে যোগবিদ্যা বলা যাইতে পারে। সেই বহুপ্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ দেবতাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির নানা

শক্তিকে নিজ প্রয়োজনসাধনে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছিলেন। এইরূপ মন্ত্রসাধন ও দেবতাসাধনের বৈজ্ঞানিক সারভাগ আমরা পুতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাইতেছি। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ"—এই সংযম-বিদ্যার প্রভাবে পাঞ্চভৌতিক ও তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর শক্তি আর্য্যগণ আয়ত্তীভূত করিতেন, দেবতা ও মন্ত্র অনেক স্থলেই উপলক্ষ্যরূপে গৃহীত হইত। "ভারতের সাধনা"র নবম প্রবন্ধে আমরা ধনুর্ব্বেদের প্রসঙ্গে এইরূপ দেবতাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছি। এক দ্বাপরযুগেই এই সকল অদ্ভুত সিদ্ধি আর্য্যগণের শিক্ষার কতদূর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে বেশ প্রত্যক্ষ হইতেছে; এই সমস্ত সিদ্ধিকে যে সেকালে অলৌকিক রহস্য বলিয়া মনে করা হইত না, তাহাও নিষাদতনয় একলব্যের ধনুর্ব্বেদসাধনা দেখিলে বুঝা যায়। একলব্য নির্জ্জনে "সংযম" সাধনা করিয়া গুরূপদিষ্ট না হইয়াও ধনুর্বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এই দেবতামন্ত্রাদিসাধন একটা অলৌকিক ব্যাপার ছিল না, উহার একটা psychology, একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছিল। দেবতামন্ত্রাদিসাধনকে বৈজ্ঞানিক বলিতেছি, কেননা, ঐ সাধন-তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষরূপ মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস যদি ঐ সকল সাধনার আর কোন বার্ত্তা আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া না দিয়া কেবল পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রখানি প্রকটিত করিয়া রাখিত, তাহা হইলেও ঐরূপ সাধনাদির কথা আমরা আজ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম না। এই শাস্ত্রখানির প্রতি অক্ষরের পশ্চাতে বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন, অকপট অধ্যবসায় ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, প্রকরণ-যোগ্য ভাষা ও ভাবের সংযম ও প্রাঞ্জলতা, এমন "বৈজ্ঞানিক" মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যক্ত রহিয়াছে যে, নিতান্ত "অবৈজ্ঞানিক" ছাড়া আর কেহ ঐ শাস্ত্রকে চট্ করিয়া অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না, এই শাস্ত্রখানি হইতে যে উজ্জ্বল আলোক প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণাদির উপর প্রতিফলিত হইতেছে, তাহাতে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যসমাজে নানা বিদ্যাবিভাগে নানা সিদ্ধিলাভ করিয়া আর্য্যবর্ণত্রয় প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও রহস্যের আয়ত্তীকরণে

আধুনিক পাশ্চাত্যদের অপেক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন; তবে সাধারণ মনুষ্যজীবনের বাহিরের লীলাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদের বিদ্যাবিত্তাকে যে আজ আমরা অধিকতর ফলবতী হইতে দেখিতেছি, তাহার কারণ—আধুনিক যুগের অভিনব সমষ্টিগঠনমূলক জীবনকৌশল,—(progressive organisation of thought and activity consequent upon the growth of collective life)—এইরূপ সমষ্টিমূলক ও সমষ্টিনিষ্ঠ জীবনকৌশলের দ্বারা ব্যষ্টির চিন্তা ও সাধনফলকে সমষ্টির শিক্ষায় ও প্রয়োজনসাধনে অদ্ভুতরূপে নিয়োজিত ও উপচিত করা যায়। কাচ-সংহতিসংযোগে যেমন আলোকের অত্যদ্ভুত উপচয় ঘটাইতে পারা যায়, সেইরূপ পাশ্চাত্য ব্যষ্টিসংহতিমূলক জীবনকৌশলের দ্বারা সমাজের প্রত্যেক চিন্তা ও সাধনার সুফলকে প্রয়োজনসাধনের ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য-রূপে ব্যক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। এই কৌশলের কথা আমরা অষ্টম প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু কারণতত্ত্বের বহুবিধ সাধনার দ্বারা প্রকৃতির নিকট নানা সিদ্ধি আহরণ করা কলিযুগের পর হইতেই আমাদের দেশে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ভারতীয় সমাজে এই সকল সিদ্ধির বিকাশ ও প্রচলনের একটা মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায়। পাতঞ্জল শাস্ত্রোক্ত "সংযমের" বিচিত্র প্রয়োগে এই সমস্ত শক্তি বা সিদ্ধির উদয় হয়, অতএব যখন দেশে বা সমাজে অধ্যাত্মসাধনার উৎকর্ষ বা উপচয় ঘটে, তখন ঐ সমস্ত সিদ্ধির বিকাশ ও প্রচলন অনুকূল ক্ষেত্র লাভ করে। অতএব যখন কলিযুগের পর হইতে ভারতে নানা স্থানে আর্য্যেতর সমাজসকল অভ্যুদিত হইতেছিল,—ফলে যখন ভারতীয় সমাজসকলে পারমার্থিক জীবনাদর্শ ম্লান হইয়া আসিতেছিল,—তখন হইতেই আর্য্যসমাজকর্ত্তৃক পূর্ব্বপূর্ব্বযুগার্জ্জিত সিদ্ধিসকল ক্রমশঃই বিলুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল, এবং ক্রমশঃই স্থানবিশেষে ও সাধকবিশেষে উহাদের বিকাশ ও প্রচলন সীমাবদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময় হইতে সাধারণ লোকেও ঐরূপ সিদ্ধিলাভকে অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে লাগিল। তার পর একবার বৌদ্ধযুগে অধ্যাত্মসাধনার উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল এবং তাহার ফলে

সমাজের নানাস্থানে আবার সিদ্ধিসকলের উদয় দেখা গিয়াছিল। যজ্ঞ-নিষ্ঠ জীর্ণপ্রায় বৈদিক সমাজের উপকণ্ঠে পূর্ব্ব হইতেই যে তন্ত্রসাধনা নূতন জীবনে সঞ্জীবিতা ও নববলে বলবতী হইয়া আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেই তন্ত্রসাধনা যখন ধীরে ধীরে বৌদ্ধসাধনাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, তখন বৌদ্ধযুগের নববিকশিত সিদ্ধিসকল তান্ত্রিকমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। যে কারণে বুদ্ধপ্রচারিত নির্ব্বাণসাধনা ও সত্ত্বশুদ্ধি তদানীন্তন ভারতীয় সমাজসমূহে অগণ্য দেবদেবীপূজা ও ধর্ম্মসঙ্কুল ক্রিয়াকলাপে পরিণত হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই সিদ্ধি-সকলের বিকাশ ও প্রচলন ক্রমশঃ বিষম আসুরিক ভাবের দ্বারা অনু-প্রাণিত হইতে লাগিল। সিদ্ধি যখন পরমার্থলাভার্থে ও জগদ্ধিতার্থে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে দৈবী সিদ্ধি বলে, কিন্তু যখন সম্ভোগলিপ্সার আকর্ষণে মানুষ সিদ্ধির অনুশীলন করিয়া মুগ্ধ হয়, তখন উহা আসুরী মূর্ত্তি ধারণ করে। বৌদ্ধযুগের শেষাংশে আসুরী সিদ্ধির প্রবল অনুশীলন ও প্রচলনের উপর প্রকৃতিদেবীর ভীষণ অভিশাপ নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহার সহিত বোঝাপড়ার দরজা যেন সমাজের পক্ষে ক্রমশঃই রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই অস্তমিতপ্রায় বৌদ্ধযুগের হুজুক বা ঝোঁকটা আজ পর্য্যন্ত আমাদের মন হইতে সম্পূর্ণ চুকিয়া যায় নাই, সেইজন্য এখনও লোকে ধর্ম্মজীবনের উন্নতি নির্ণয় করিতে সিদ্ধির হিসাব করে, সেইজন্য এখনও যুগাবতার সাবধান করিয়া দেন যে, সিদ্ধি ধর্ম্মপথের বিঘ্ন।

জগদ্ধিতায় সর্ব্বত্যাগী সাধকই দৈবী সিদ্ধি-বিকাশের যোগ্যপাত্র। সমগ্র দেশ আজ সেইরূপ সর্ব্বত্যাগী সাধকবৃন্দের আবির্ভাবের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া রহিয়াছে। যেদিন দেশের নানাস্থানে তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটিবে, সেদিন দৈবী সিদ্ধিসমূহেরও পুনরভ্যুদয় ঘটিবে, সন্দেহ নাই। ইতিহাস একবার যাহা অভিনয় করে, অবশ্যই তাহার পুনরাবর্ত্তন বারংবার ঘটে। সেইজন্য ভারতের সনাতন সাধনায় সর্ব্বত্যাগী সাধক-বৃন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার যেদিন ভারতীয় "কারণবিজ্ঞান" দেশে নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সেদিন ভারতের পূর্ব্বার্জ্জিত ও অন্তর্নিহিত

দৈবী সিদ্ধিসমূহ আবার বৈজ্ঞানিক শিল্পমূর্ত্তিতে (art) অভিব্যক্ত হইয়া পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পকে আপনার নিম্নাধিকারী উত্তরসাধকরূপে পরিণত করিবে; কেননা, পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের প্রভাব কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কারণরাজ্যে উহার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ খাটে না, অর্থাৎ উহা বহির্বিষয়াবগাহিনী একটী শক্তির দ্বারা আর একটী শক্তিকে আয়ত্ত করে, উহাদের সূক্ষ্মতর উৎস হইতে উহাদের স্ফুরণ বা স্পন্দনের উপর ঐ যন্ত্রশিল্পের কোনও হাত নাই; কিন্তু ভারতীয় "সংযম"-শিল্প বা বিভূতিযোগ,—বহির্বিষয়াবগাহিনী শক্তি ও মানুষের মনের শক্তি,—এই উভয়ের যে এক অভিন্ন উৎস বিদ্যমান, সেই কারণভূমির দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, অতএব এ শিল্পের নিকট জগতের আর সব শিল্পই নিতান্ত অর্ব্বাচীন ও নিম্নপদভাগী। কিন্তু তথাপি দেশের সমষ্টিশক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের নানা কৌশলসম্বন্ধে পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের এমন একটা কার্য্যকারিতা আছে, যাহা প্রাচীন আর কোনও বিদ্যা বা শিল্পের নাই, সেইজন্য আধুনিক যন্ত্রশিল্প শিক্ষা করিতে করিতেই আমাদিগকে প্রাচীন বিভূতিযোগের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং পাশ্চাত্য কার্য্যবিজ্ঞানকে পূর্ব্বকথিতভাবে ভারতীয় কারণ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিম্ন থাকে স্থান দিতে হইবে।

ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সমন্বিত করিবার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা প্রথমেই উত্থাপন করা সমীচীন হইয়াছে; কারণ, বিজ্ঞানই প্রত্যেক শিক্ষা বা cultureএর কেন্দ্রস্থানীয় নিয়ামক। জীব ও জগতের সহিত তোমার আমার যেরূপ সম্বন্ধ বিজ্ঞান নির্ণয় করিয়া দেয়, শিক্ষা বা culture ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ আরোপ করিয়া সেই সম্বন্ধজনিত দৃষ্টিতে,—জীবজগতের সহিত আজীবন ব্যবহার করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত ও প্রণোদিত করে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগৎকে একটী বিরাট্ যন্ত্ররূপে ধারণা করে, উহা জীবকেও একটী সূক্ষ্মতর যন্ত্র ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে রাজি নহে। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মসাধক বা কাব্যরসরসিক, তাঁহারা অবশ্য বিরাট্‌কে অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় এখনও ঐ দুই

রকম দৃষ্টির একটা সামঞ্জস্য সাধিত হয় নাই, কারণ, যাহা প্রত্যক্ষ-হিসাবে সত্য, তাহাই শিক্ষা বা cultureএর গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে; যাহা ভাব বা sentimentএর হিসাবে সত্য, তাহার সে প্রভাব নাই, তাহা কেবল উপাদেয় বলিয়া শিক্ষা বা cultureএর মধ্যে একটা স্থান লাভ করে মাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিরাট্‌কে জড়যন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করে, সেইজন্য সেই প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নিরূপিত করিয়া দিতেছে; অপর পক্ষে আধুনিক খৃষ্টীয় সাধক ও কবির দৃষ্টিমূলে sentimentই বিদ্যমান, প্রকৃত অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা realisation নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবজগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সেই দৃষ্টি অবলম্বন ও আরোপ করিতে হইবেই। সেইজন্য পাশ্চাত্যের নানা বিদ্যার মধ্যে সেই দৃষ্টিই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জগৎ যদি একটা বিপুল যন্ত্র হয়, তবে উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি অবয়বের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত, আমাদের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য হইবে, কিন্তু জগৎ যদি একটা স্বতন্ত্র যন্ত্রবিশেষ না হইয়া সূক্ষ্মতর ভাবপ্রপঞ্চের স্থূলবিকাশ-রূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমাদের পক্ষে হৃদয়বেদ্য সূক্ষ্ম ভাবই অধিক প্রণিধানযোগ্য হইবে, অবস্থানবর্ণভূতাদিসংঘাতে উহার যে স্থূল বিকাশ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে, তাহা ততটা প্রণিধানযোগ্য হইবে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ মানিয়া পাশ্চাত্য চিত্রশিল্প ভাব অপেক্ষা স্থূলবিকাশের অবয়বকে বেশী প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছে। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্প তুলি ধরিয়া যেন হৃদয়ের ভাবই আঁকিতে চায়, স্থূল অবয়ব আঁকিতে চায় না, সেইজন্য অনেক সময় অনেক জিনিসের ছবি আমাদের প্রত্যক্ষের অনুরূপ হওয়া দূরে থাকুক, উহার তুলনায় বেশ বিসদৃশ মনে হয়। অবশ্য অনেকস্থলে এই বৈষম্যকে কমাইয়া আনা দরকার হইয়াছে; কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় চিত্র-শিল্প ধ্যেয় বস্তুই আঁকে, যথাদৃষ্ট বস্তু আঁকে না; উহার ছবির সহিত দৃষ্ট বহির্বিষয়ের খুঁটিনাটি মিলাইতে গেলে চলিবে না, সে ছবি সর্ব্বাঙ্গে ও সর্ব্ববিষয়ে ভাবকে বিকাশ করে কি না, তাহাই মিলাইতে হইবে।

কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলাসম্বন্ধে আসল কথাটী এখনও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সেইজন্য নবপ্রস্তাবিত ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি "ভারতীয়" এই নামের জোরেই যতটা আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে দেশের লোকের চিত্তহরণ করিতে ততটা পারিতেছে না। আমরা ভারতীয় শিক্ষা বা culture সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবজগতের সহিত ব্যবহারে ও সকল রকম বিদ্যার চর্চ্চাতেই আমাদের একটী যেন নিজের "কোট" আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভারতীয় শিক্ষার সহিত সমন্বিত বা অঙ্গীভূত করিতে যাই, বা আর যাহাই করিতে যাই, সেই সনাতন নিজেদের "কোট"টীকে কোনমতেই পরিহার করা হইবে না। যখন বলা যায়—অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর ভারতীয় শিক্ষা বিবর্ত্তিত হইয়াছে, যখন বেদ বলিতেছেন—ভারতীয় শিক্ষা ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ হইতে নিঃশ্বসিত ধূমরাশির মত নির্গত হইয়াছে, তখন আমাদের নিজেদের "কোট" যে কি, তাহাও বলিতে বাকি থাকে না। পরমার্থের প্রতি ভারতীয় শিক্ষার অনন্যগতিনিষ্ঠতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; পরমার্থই যে ভারতীয় শিক্ষার চরম প্রয়োজন ও উদ্ভবস্থান, তাহাও বারংবার বলা হইয়াছে। "ভারতের সাধনায়" আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে সমষ্টিগত জীবনের লক্ষ্য পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার; অতএব ভারতীয় শিক্ষায় পরমার্থই যে উদ্ভব, স্থিতি ও প্রয়োজনের স্থানভাগী হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহা হইলে আমাদের নিজেদের "কোট" বলিতে আমরা বুঝি—পরমার্থদৃষ্টি; এই পরমার্থদৃষ্টির আরোপ করিয়া ভারতীয় শিক্ষায় প্রত্যেক বিদ্যার উদ্ভব, স্থিতি ও প্রয়োজন নিরূপিত করিতে হইবে।

কিন্তু আমরা আজকাল যে চিত্রকলার অনুশীলন করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে এখনও আমরা নিজেদের "কোটে" প্রকৃতভাবে দাঁড়াইতে পারি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশের চিত্রকলা ছবি আঁকিতে ভাব আঁকে; অতএব অঙ্কনীয় বিষয়ের একটা সনাতন বা সর্ব্বজনগোচর ভাব নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই। তাহা না হইলে, তোমার অঙ্কিত ছবি আমি

বুঝিব কেন? কিন্তু অধুনা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি-অনুসারে যে সমস্ত পৌরাণিক চিত্রের দ্বারা যে সকল ভাব অঙ্কিত করা হইতেছে, তাহার মূলে সনাতনত্ব বা সার্ব্বজনীনত্ব আছে কি? তুমি রামচন্দ্রকে যেরূপ বুঝিয়াছ, তুমি সেইরূপ আঁকিতেছ, আবার শিবকে যেমন বুঝিয়াছ, তেমনই গড়িতেছ; কিন্তু সমগ্র সমাজটা রামচন্দ্র বা শিবকে কিরূপ বুঝিতেছে বা কিরূপ বুঝিয়া আসিয়াছে, তাহা তুমি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছ কি? যদি বল, আজকাল পৌরাণিক দেবদেবী বা মহাজন প্রভৃতি সম্বন্ধে সমাজের ভাব ও ধারণা সম্পূর্ণ গুলাইয়া গিয়াছে, অতএব কোনরূপ নূতন ভাব ও ধারণা চিত্রকরদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি—ঐ শিল্পিগণ নূতন করিয়া ঐ সমস্ত ভাব গড়িয়া তুলিবার কে? তাঁহাদের গড়া-জিনিস দেশ লইবে কেন? তাঁহারা ভারতীয় পদ্ধতি-অনুসারে ধ্যান করিয়া ঐ সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি কি দেখিয়া লইয়াছেন যে—তাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি-অনুসারে উহাদিগকে তুলিতে আঁকিয়া দেশকে শিখাইতে স্পর্দ্ধা করিয়াছেন? তুমি যদি ধ্যানসিদ্ধ চিত্রকর হও, তবে তোমার চিত্র হইতে দেশের লোকের ভাবশিক্ষা হইতে পারে; কিম্বা যদি দেশে পরমার্থসাধনার পুনরভ্যুদয়ে প্রাচীন ইতিহাসপুরাণের বর্ণনা আবার নূতন করিয়া জীবন্ত ভাবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তবে তুমি চিত্রবিদ্যার দ্বারা সেই সকল ভাবমূর্ত্তির প্রচারে কৃতকার্য্য হইতে পার। ভারতীয় সনাতন সমাজ সেই আদিযুগ হইতে যে ভাবের ভাবুক হইয়া বিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, যে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ভাবভিত্তির উপর সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা সুখদুঃখ, ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্যে ঐ সমাজের সকল লীলা, সকল সাধনার উদ্ভব ও লয় হইতেছে, সেই মূলভাবটী যখন ভারতীয় চিত্রকরের তুলিকা ধারণ করিয়া বর্ণ ও রেখার দ্বারা নানা চিত্রের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত ও চিত্রিত করিতে থাকিবে, তখন বলিব—ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি আবার নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। নচেৎ আগেকার যুগের চিত্রশিল্পীদের রেখা টানিবার ধাঁজটী মাত্র আজ অনুকরণ করিতে পারিলেই যদি ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির পুনরুদ্ধার হইয়া যায়, তবে উপবীতমাত্র গ্রহণ

করিলেই আধুনিক কায়স্থবিগ্রহে প্রাচীন ক্ষত্রিয়ত্বের পুনঃসঞ্চার না হইবে কেন ?

সর্ব্বাগ্রে সমগ্র দেশকে আপনার "কোটে" ফিরিয়া আসিতে হইবে। দেশের যাহারা ফিরিলে সমগ্র দেশটা ফিরিতেছে—একথা বলা যায়, অবশ্য তাহাদের কথাই বলিতেছি। তাহারা আজ পর্য্যন্ত যে পরের কোটে, অথবা পরের কোটের আশেপাশে দিন কাটাইতেছে, তাহাই বুঝিতে পারা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। পরের কোট ও আপনার কোটে প্রভেদ কি, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলে, তবে আপনার কোটে ফিরিবার চেষ্টা ফলবতী হইতে আরম্ভ করিবে, নচেৎ নহে। ইতি-মধ্যেই চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিদ্যার ক্ষেত্রে যে আপনার কোটে ফিরিবার একটা উদ্যম ও প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, সেজন্য অবশ্য প্রবর্ত্তকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্পণ করিব, কিন্তু আমাদের নিজের কোট কি, এবং সে কোটে ফিরিবার পথপ্রদর্শক হইতে হইলে সত্যের বিচার-মূলক সমঝদার (intellectual appreciation) হইতে পারিলেই চলিবে, কি সত্যের প্রত্যক্ষমূলক সমঝদার (spiritual realisation) হইতে হইবে, সকলেরই পক্ষে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবারও সময় আসিয়াছে, নতুবা সর্ব্ববিভাগে আমরা ভারতীয় সনাতন সাধনপথে ফিরিয়া আসিতেছি, এ কথা মনে ভাবিলেও, প্রকৃতপক্ষে পথ যে আমরা আরও গুলাইয়া ফেলিতেছি না, তাহা কি কেহ সমস্যার গুরুত্ব ভাবিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে জোর করিয়া বলিতে পারেন ?

ভারতীয় সনাতন সমাজের আপনার কোট যে কি, তাহা আধুনিক ইতিহাসও প্রমাণ করিয়া দিতেছে, কেন না, এখনও সে সমাজ আপনার কোটে যে বিপুল শক্তির পরিচয় দিয়াছে, সেরূপ পরিচয় অপরের কোটে পথভ্রান্ত হইয়া দিতে পারে নাই; পরমার্থসাধনার গৌরবশিখরে যে উচ্চস্থান সে আজও অধিকার করিয়াছে, আর কোনও সাধনায় সে স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। আপনার কোটে আজ এই অসাধারণ শক্তির অভ্যুত্থান হওয়ায়, সমাজ আপনার সমস্ত সাধনার প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজিয়া পাইয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়মূলক পরমার্থসাধনরূপ প্রতিষ্ঠাভূমিতে

আজ যদি আমরা ফিরিয়া আসিতে পারি, তবেই নিজের কোটে ফিরিয়া আসা হইবে। তখন ভারতীয় শিক্ষায় বিজ্ঞানশিল্পের আবার পুনরভ্যুদয় ঘটিবে। সে অভ্যুদয় কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত, তাহা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইঙ্গিত করিলাম; অপরাপর বিদ্যাসকলের পুনরভ্যুদয়-সম্বন্ধে আগামী বারে আলোচনা করাই শ্রেয়স্কর; কারণ, এবার স্থানাভাব।

মহা আহ্বান।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।)

(১)

বাজে তূরী বাজে মহা আহ্বান
দ্যুলোক ভূলোক ভরি,'—
ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ!
তোমার দুয়ারে ভিখারীর বেশে
আজিকে দাঁড়া'য়ে হরি।
কিবা দিবে তাঁরে দুর্লভ ধন,
বাঞ্ছিতনিধি, প্রাণ-প্রিয়জন,
আশা, সুখসাধ, জীবন, মরণ,
অঞ্জলি তাঁর ভরি',
তোমার দুয়ারে ভিখারীর বেশে
এসেছেন আজি হরি!
বাজে তূরী বাজে মহা আহ্বান,
উঠিতেছে বার বার—
ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ!
ত্যাগের মন্ত্র ত্যাগ উপাসনা,
সকল সাধনা-সার!

পথের মাঝারে আসিয়া দাঁড়াও
গৃহবাধা নাহি আর,
কি ধূলি তুলিছ আঁচলে কুড়া'য়ে,
দাও বিলাইয়ে আপনা লুটা'য়ে,
জগত আপন, প্রাণ মন ধন,—
বন্ধন কিবা তার!
তোল মাথা তোল, বজ্র রবে বল—
"ত্যাগের সাধনা সার,
"আকাশের আলো ভালে টীকা দিয়া,
"নিয়াছে আমারে বরণ করিয়া,
"দিব বিলাইয়া, দিব লুটাইয়া—
কে আর বহিবে ভার!"
ওই তূরী বাজে, মহা আহ্বান
উঠিতেছে বার বার—
ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ।

(২)

বাজে তূরী বাজে, হৃদয়ের মাঝে
ঝঙ্কারে বারে বার—
তপঃ! তপঃ! তপঃ!
শুন চরাচরে উঠে অম্বরে
গম্ভীর ধ্বনি তার—
তপঃ! তপঃ! তপঃ।
মহা পারাবার অতল আঁধার
অসীম শূন্য মাঝে,
দীর্ণ করিয়া স্তব্ধতা ভীম
গম্ভীর বাণী বাজে—
তপঃ! তপঃ! তপঃ!

লীলাশতদল ধীরে ধীরে ফুটে
অপার আঁধার জলে,
দলে দলে তার, বিজলী চমকে
দলে দলে জ্যোতি ঝলে!
চাহ কি গড়িতে নূতন সৃষ্টি,
চাহ কি লভিতে নবীন দৃষ্টি?
ওই শোন তূরী বাজে,—
তপঃ! তপঃ! তপঃ!
কে আছ তাপস, পরমানন্দে
দাও দূর করি সকল বন্ধে।
গাও কবি গাও জলদ-মন্দ্রে—
তপঃ! তপঃ! তপঃ!
যাও ডুবে যাও, আরো ডুবে যাও
তপঃসমুদ্র মাঝে,
অকূল অতল তপঃ-পারাবার,
নাহি বন্ধন বালুকা বেলার,
নাহি তরঙ্গ হৃদয়ে তাহার—
কল্লোল নাহি বাজে!
গভীর সুপ্তি—নব জাগরণ,
চির-নির্ব্বাণ—নবীন জীবন!
অনন্তরূপে অরূপে মিলন,
জলদে বিজলী-হার—
অপার আঁধার-বারিধির জল,
তাহে উঠে ফুটি লীলা-শতদল,
বাজে তূরী বাজে গরজে গভীর
ঝঙ্কারে বারে বার—
তপঃ! তপঃ! তপঃ!

———

বিমলানন্দ।

(১)

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।)

একাদশবর্ষীয়া বালিকা ষোড়শবর্ষীয় পতিকে পত্র লিখিতেছে—"তুমি কলিকাতায় পড়িতে যাইতেছ। সেখানে কত সুন্দরী আছে, তা'দের দেখে কি আর আমাকে মনে থাকবে?"—এমনি অনেক কথা। পতি ইহার উত্তরে লিখিল—"তোমায় যেদিন ভুলিব, সেদিন আমার মৃত্যু" ইত্যাদি। অথচ ইহাদের এক বৎসর মাত্র বিবাহ হইয়াছে এবং দুই দিনের বেশী দেখা শুনা হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে সেইরূপই সর্ত্ত হইয়াছিল, বর-কন্যায় নয়, উভয়ের জনকের মধ্যে।

বিমলানন্দের পিতা পুত্রের বিবাহ দিবার পূর্ব্বে ভাবী বৈবাহিককে বলিয়াছিলেন, "বিমলার অতি অসাধারণ মেধা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে, আমার বিশ্বাস—প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। এ সময় বিবাহ দিয়া তাহার অধ্যয়নের ব্যাঘাত জন্মাইতে আমি ইচ্ছুক নহি, কিন্তু তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু, তোমার জাতিকুল রক্ষা করাও আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। যদি তুমি একটি সর্ত্তে রাজি হও যে, বিমলা যতদিন না বি, এ, পাশ করিবে, ততদিন আমিও বধূ আনিব না এবং তুমিও বৎসরে এক আধ্ বাবের বেশী জামাতা লইয়া যাইবে না, তাহা হইলে আমি বিবাহ দিতে স্বীকৃত আছি।" সেইরূপ সর্ত্তেই বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু পুত্রসম্বন্ধে সর্ব্বানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হইল, তখন তিনি ইহলোকে নাই। পরীক্ষায় পুত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে শুনিয়া মাতা গঙ্গাদেবী অতিশয় উল্লসিতা হইলেন; দুই ফোঁটা অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল,—আজ কর্ত্তা থাকিলে কি আনন্দ! এ বংশে কখনও ইংরেজিশিক্ষা হয় নাই। সর্ব্বানন্দ গোস্বামী দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় দুঃখদুরবস্থা দেখিয়া বংশধর একমাত্র পুত্রকে, উন্নতির

আশায়, ইংরেজি শিক্ষাদানে সঙ্কল্প করিলেন। পতিপরায়ণা গঙ্গাদেবী শুনিয়াছিলেন, ইংরেজি পড়িলে খৃষ্টান হয়। কিন্তু পতির দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া, তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তার পর গঙ্গাদেবী বিধবা হইলেন। বিমলা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; কুড়ি টাকা জলপানি হইয়াছে; গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে আর পড়া চলিবে না, কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে। স্থির হইল—বিমলা বার টাকা মাহিনা দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবে। বাসাখরচ চালাইতে জলপানির বাকী আট টাকার উপর আর যাহা লাগিবে, গঙ্গাদেবী তাহা পুত্রকে পাঠাইয়া দিবেন। কয়েক বিঘা উৎকৃষ্ট জমি আছে, তাহাতে সংসার চলিয়া কিছু ধান উদ্বৃত্ত হয়। সেই ধান বিক্রয় করিয়া গঙ্গাদেবী পুত্রের খরচ চালাইবেন। বিমলার শ্বশুর নাই, থাকিলেও দরিদ্র শ্বশুর এ সময় বড় একটা উপকারে আসিতেন না। গঙ্গাদেবী বিধবা, বিধবার খরচ কি? এক সন্ধ্যা একমুঠা আলো চাল, আধখানা কাঁচকলা। দিন এক রকমে চলিবে, কিন্তু একমাত্র পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া শূন্যগৃহে বাস করিবেন কিরূপে? ভাবিলেন, বিমলা ত কলিকাতা চলিল, এখন আর বধূমাতাকে আনিয়া রাখিতে ক্ষতি কি? নির্দ্দিষ্ট দিনে বিমলা কলিকাতা যাত্রা করিল। বধূ তাহার স্থলাভিষিক্তা হইয়া গঙ্গাদেবীর শূন্যহৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন।

কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া বিমলানন্দের হৃদয় একেবারে দমিয়া গেল। দেখিল, এক বিশাল জনসমুদ্র ভৈরবরবে ঘূর্ণিত হইতেছে; চারিদিকে কোলাহল, চারিদিকে ছুটাছুটি, যেন সহরে কি এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; সকল লোকেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া যাওয়া আসা করিতেছে! বিমলা আর কখনও কলিকাতায় আসে নাই, তাহার ত্রাস উপস্থিত হইল! আসিবার সময়, মনে মনে স্থির করিয়াছিল, নির্দিষ্ট কোনও আশ্রয় না পাওয়া পর্য্যন্ত একটা দোকানে থাকিবে। দু'এক দোকানে চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু থাকিবার স্থান দিতে কেহই সম্মত হয় নাই। তোরঙ্গটি মুটের মাথায় দিয়া পথে পথে ঘুরিতেছে; রৌদ্রতাপে সুন্দর মুখখানি মলিন হইয়াছে; বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে দুই এক ফোঁটা অশ্রুও

তপ্তগণ্ডের উপর পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছে! বিমলা ভাবিতেছে, কি আশ্চর্য্য, এত লোক, তাহাকে কাতর দেখিয়া ডাকিয়া কেহ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতেছে না! কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে দেখিল, তাহারই প্রায় সমবয়স্ক একটি বালক পুস্তক হাতে বিড়ি টানিতে টানিতে আসিতেছে। ভরসা বাঁধিয়া বিমলা তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "মহাশয়!" অপরিচিত বালক থমকিয়া দাঁড়াইল। বিমলা বলিল, "মহাশয়, আমি কলিকাতায় নূতন এসেছি, কোথাও থাকিবার যায়গা পাচ্ছি না। আপনি একটা উপায় করিয়া দিতে পারেন?" অপরিচিত বালক জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি? কোথা থেকে এসেছেন? বোধ হয়, ফুটবল্ ম্যাচ্ দেখ্‌তে আসা হয়েছে। কৃষ্ণনগর টীম্ ভারী খেলেছে। তিনটার সময় না বেরুলে যায়গা পাওয়া যাবে না। তা বেশ, এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। আমি ব্যাচিলর (Bachelor) মেসে থাকি। সেইখানে চলুন। আপনি আজ আমার গেষ্ট (guest), কি নাম বল্লে ভাই?" বিমলা এতক্ষণ নাম বলিবার অবকাশ পায় নাই। বালক হাত পা মুখ নাড়িয়া এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে গেল, কিন্তু মুখের বিড়ি একবারও নামায় নাই! অবকাশ পাইয়া বিমলা বলিল, —"আমার নাম বিমলানন্দ গোস্বামী। হরিপুর ভিলেজ স্কুল (village school) হইতে পাশ হইয়াছি। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িব বলিয়া আসিয়াছি।" বিড়িমুখে বালক থুড়িলাফ খাইয়া বলিয়া উঠিল— "হুর্‌রে! হুর্‌রে! (hurrah, hurrah) থ্রি চিয়ার্স ফর্ কৃষ্ণনগর টীম্, (three cheers for Krishnanagar team)! তুমি ইউনিভার্সিটির ফার্ষ্ট হয়েছ? আমি তোমার ফ্রেণ্ড (friend)। কন্‌গ্রাচুলেট্ ইউ (congratulate you), তা' বেশ, কোথাও যায়গা পাওনি, ভালই হয়েছে! আমাদের মেসে চল, সিট্ খালি আছে।" এই বলিয়া মুটে সমেত বিমলাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া ব্যাচিলর মেসের দিকে চলিল। অপরিচিত বালক চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল— "তা বেশ, চলুন, চলুন। কালই কলেজে ভর্ত্তি করে দেব। ওখানে ইংলিশ (English) ভাল পড়া হয় না। ম্যাথেমেটিক্‌সএ (Mathematics) আমি

ভারী ডি ফিসিয়েণ্ট (deficient)—কোন রকমে সেকেণ্ড ডিবিশনে (second division) এড়িয়ে গেছি ! তা বেশ,চলুন চলুন, তিনটের সময় ম্যাচ্ দেখ্‌তে যাওয়া যাবে। গড়গড়ি ভাল বোল (bowl) কর্‌তে পারে না। আমিও প্রেসিডেন্সিতে পড়ি। মামাবাবুর খুব পয়সা আছে। আমার সব খরচ দেন ! সেই টাকা থেকেই বিড়ি কেনা চলে। বাবা কুড়ি টাকা বই মাইনে পান না ! মামাবাবু না থাক্‌লে আক্কেল গুড়ুম হ'ত ! স্কুলের মাইনে দিতে পারেন না, নাম রেখেছেন নলিনীকান্ত ! আপনি কি অপ্‌শন্তাল (optional) নেবেন ? আমি নিয়েছি হিষ্ট্রী (History) —মামাবাবুর পেড়াপীড়িতে। ঐতেই নিশ্চয় ফেল হব ! তা বেশ, চলুন, সে যা হয় হবে ! আজ ত ম্যাচ্ দেখে আসা যাক্ ! আপনি কোন্ দিকে ? রয়েল অক্সফোর্ড (Royal Oxford) না কৃষ্ণনগর ?" ইত্যাদি ইত্যাদি,—বলিতে বলিতে মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেসে প্রবেশ করিয়াই বালক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিল—"এই নিন্ ইউনিভার্সিটির ফাষ্ট বয় (First boy)—আমার বন্ধু, ইন্‌টিমেট্ ফ্রেণ্ড (intimate friend)—কি নাম বল্‌লে ভাই ?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম কি ?"

"বিমলানন্দ গোস্বামী।"

নাম, ধাম প্রভৃতি সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "আপনার যে বয়স দেখ্‌ছি, তাতে কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌বার দরকারই নেই। কিন্তু একটা ফর্‌ম্ (form) আছে—আমরা ব্যাচিলার নৈলে এ মেসে থাক্‌তে দিই নি। তা আপনার বিবাহ হয় নি ?" বিমলা মেসের একটি জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে রাস্তা দেখা যায়। তাহার দৃষ্টি সেই রাস্তার উপর পড়িল। ভাবিতে লাগিল —"অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়াছি। এখনই আবার ঐ নির্দ্দয়, নির্ম্মম জনতার মাঝে গিয়া হারাইয়া যাইব। অপরিচিত স্থান, আশ্রয়হীন ! অর্দ্ধ ঘণ্টার পরিচয়ে বন্ধু বলিয়া ইহারা আশ্রয় দিতে চাহিতেছে। পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছে, পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তপদ, ক্ষুধায় আকুল ! কি করি, কোথায় যাই ?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি

ভাবছেন? আপনি কি বিবাহিত?" বিমলা উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিবাহিত কি না, সাক্ষী চাই নাকি?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন—"না না, আপনার কথাই যথেষ্ট। কেন? এই অল্প বয়সে আপনার বিবাহ হয়েছে নাকি?" কম্পিতস্বরে বিমলা বলিল—"না।" কিন্তু তাহার দৃষ্টি ট্রাঙ্কের উপর পড়িল। তাহার মধ্যে তাহার পত্নীর পত্রগুলি একখানি সিল্কের রুমালে বাঁধা লুক্কায়িত আছে।

বিমলা ব্যাচিলার মেসে ভর্ত্তি হইল। পরদিন নলিনী তাহাকে লইয়া গিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিল।

কথায় বলে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। মেসে বিমলার ভারী প্রতিপত্তি। বি,এ ক্লাশ হইতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত সকল বয়সের ছাত্রই এই মেসে থাকে। সকলেই বিমলাকে খাতির করে। পাছে তাহার পড়ার কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এজন্য সকলেই সতর্ক, কেবল নলিনী বক্ বক্ করিতে ছাড়ে না। পড়ার সময় হাজার বেজার করিলেও, বিমলা তাহাকে কিছু বলিতে পারে না। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। কলেজেও বিমলার ভারী প্রতিপত্তি। অধ্যাপকগণ ভালবাসেন।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মাবকাশ আসিল। বিমলা দেশে যাইবার পূর্ব্বেই গঙ্গাদেবী বধূমাতাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু বিমলা বাড়ী আসিলে, তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী গঙ্গাদেবীকে অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া একবাব জামাইকে লইয়া গেলেন। পত্র-বিনিময়ে পতি-পত্নীর পরিচয়েব অভাব ছিল না। চিরপরিচিতের ন্যায় উভয়ে মিলিত হইল। পত্নী সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ডাকঘরে বাসা করেছ?" বিমলা বলিল, "না, আমি মেসে থাকি।"

"তবে তোমার সব চিঠিতে ডাকঘরের ঠিকানা দেও কেন?"

বিমলা বলিল, "কি জান? মেসের ছেলেগুলো ভারী বদ্। মেয়ে মানুষের লেখা দেখে তারা পাছে তোমার চিঠি খুলে পড়ে, সেইজন্য আমি কলেজ অঞ্চলের পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি,—তাঁর জিম্মায় চিঠি থাকে, আমি রোজ গিয়ে খবর নি।"

সুষমা বলিল—"তা খুলে পড়্‌লেই বা, তা'দেরও ত স্ত্রী আছে, চিঠি আসে! তুমি ভারী দুষ্টু। তুমি তাদের চিঠি পড়, আর নিজের চিঠি তাদের দেখ্‌তে দেও না।" বিমলা কোন রকমে কথাটা কাটাইয়া দিয়া অব্যাহতি পাইল। সে যে অবিবাহিত পরিচয় দিয়া মেসে থাকে, সে কথা নিজের স্ত্রীর কাছে বলিতেও লজ্জা হইল। প্রথম মনে করিয়াছিল, দুই চারিদিন ব্যাচিলর মেসে থাকিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইবে। কিন্তু সতীর্থ নলিনী ও সহবাসী ছাত্রগণের আদরে, যত্নে, খাতিরে তার দিন একরকম নিশ্চিন্তভাবে কাটিয়া যাইতেছিল। আবার নিশ্চিন্তজীবনকে ব্যস্ত করিয়া তোলা কেন? একটা তুচ্ছ মিথ্যা বই ত নয়! সে অবিবাহিত বলিয়া ভাণ করিয়াছে, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইয়াছে? বরং সমূহ ক্ষতি তাহারই। ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, রৌদ্র হউক, একবার পোষ্ট আফিসে গিয়া চিঠি আসিয়াছে কি না, খবর আনিতেই হইবে। দূর হউক, এখন যেমন চলিতেছে চলুক, পরে যা হয় হবে।

সুখের দিন শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়। গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হইল। বিমলা কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল।

ছাত্রাবাসে ছাত্রগণের জীবন বড় বৈচিত্র্যহীন, নীরস! কোনরূপ আমোদ না থাকিলে মনুষ্যজীবন তিক্ত বোধ হয়। সেই জন্যই আমোদ-প্রিয় নলিনী এই মেসের জীবনস্বরূপ ছিল। অনর্গল বকিয়া যাইতে, অনুক্ষণ বিড়ি টানিতে, আবশ্যক হইলে বই বাজাইয়া বা টেবিল বেঞ্চ বালিস চাপড়াইয়া একটা গান গাইয়া দিতে, এবং কলিকাতার কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার অভ্রান্ত সংবাদ আনিতে, নলিনীর মত আর কেহ ছিল না। সরল, উদার, দয়ার্দ্রহৃদয় নলিনীকে সকলেই ভালবাসিত এবং সেও সকলকে ভালবাসিত, বিশেষতঃ বিমলাকে। মাতুলালয়েও তার বিশেষ প্রতিপত্তি। নলিনী ঠিক বলিয়াছিল, তাহার মাতুল বড়লোক। বিদ্যায় অর্থে, নব্যসমাজে বিশেষতঃ সাহেবদের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি। বাটীতে বিলাতী চালচলন। অতিথি-সৎকারে, বন্ধু-বান্ধবগণকে ভোজ দিয়া আপ্যায়িত করিতে মিঃ র‍্যাম্‌সডেন্ (Mr.

Ramsden—রামসদন) ভাদুড়ী মুক্তহস্ত। ব্যাচিলর মেসের সকল ছাত্রই নলিনীর সহৃদয়তায় মিঃ র‍্যাম্‌স্‌ডেন্‌ ভাদুড়ীর কারি, কাট্‌লেট্‌, কোপ্তার আস্বাদ পাইয়াছে। এইবার বিমলার প্যালা। নলিনী ছাড়িল না, টানিয়া লইয়া চলিল। র‍্যাম্‌স্‌ডেন্‌ ভাদুড়ী বিমলাকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ইউনিভার্সিটির ফাষ্ট বয়; নলিনীর ইন্‌টিমেট্‌ ফ্রেণ্ড্‌, রূপে, গুণে, বিদ্যায়, নম্রতায় ছেলেটি হীরের টুক্‌রো, —তার উপর নলিনী বলিয়াছে,—ইহার কেহ নাই, আহা! এমন অনাথ বালককে কে না যত্ন করিবে। নলিনী যে জ্ঞানতঃ মিথ্যা বলিয়াছিল, তাহা নহে। সে ঠাওরাইয়াছিল—এর দেশ আছে, কিন্তু দেশ হইতে কখনও কোন চিঠি পত্র আসে না, যদি কেহ থাকিত, নিশ্চয় ইহার চিঠি পত্র আসিত। নলিনী একেবারেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, বিমলার কেহ নাই। মামা-মামীকেও সেইরূপ বলিয়াছিল। ছেলেটির অনাথ অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলে পাছে মনঃকষ্ট হয়, নিজের দরিদ্র অবস্থার কথা স্বীকার কবিতে হইলে পাছে লজ্জা পায়, এজন্য ভাদুড়ী-পরিবার বিমলার নিজ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। যত্নের জিনিষ—যত্ন করিতেন। নলিনীর তাহাতে ঈর্ষ্যা নাই, বরং উল্লাস। কলেজ কয়দিন বন্ধ আছে। ভাদুড়ী বলিলেন, "তোমরা কলিকাতায় ঘিন্‌জি যায়গায় থাক, এ কয়দিন বাগানবাড়ীতে থাকিয়া যাও না।" মিঃ র‍্যাম্‌স্‌ডেন্‌ ভাদুড়ীর বাগানবাড়ী বালিগঞ্জে। নন্দন-কাননেব ন্যায় উদ্যান, ইন্দ্রভবনের ন্যায় বাটী, আর সেই বাটীর একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন,—তাঁহার নাম রমাসুন্দরী। রমা ভাদুড়ী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা—রমা রমার ন্যায় গুণবতী, আর সত্যই সুন্দরী। বয়স বেশী নয়, একাদশ বর্ষে পড়িয়াছে। দেখিলে বালিকা কি কিশোরী, ঠিক্‌ বুঝা যায় না। রমাও বিমলাকে বড় যত্ন করিতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত ঘরে বিমলার এই প্রথম প্রবেশ। কলিকাতায় সে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় থাকে। মিঃ র‍্যাম্‌স্‌ডেন্‌ ভাদুড়ী একটা মুরুব্বীবিশেষ—কয়দিন থাকিবার জন্য তাঁহার উপরোধ বিমলা উপেক্ষা করিতে পারিল না। বাগানবাড়ীতে রহিল এবং নলিনীর মামা-

মামীকে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রমাকে ইংরাজি পড়াইতে লাগিল। বিমলার শিক্ষাদান-প্রথা দেখিয়া ভাদুড়ী চমৎকৃত হইলেন। ইচ্ছা—কন্যার শিক্ষার ভার তাহাকে অর্পণ করেন, কিন্তু সাম্‌নে ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্ (First Arts) পরীক্ষা, পাছে বালকের পড়াশুনার ক্ষতি হয়, সেজন্য কোন প্রস্তাব করিলেন না। ছুটি ফুরাইল। বিমলা ও নলিনী মেসে ফিরিয়া আসিল।

বালিগঞ্জের বাগানবাড়ীর অধিষ্ঠাত্রীগণের হৃদয়ে বিমলা যেমন ছায়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহার হৃদয়েও তেমনি ভাদুড়ী-পরিবারের স্মৃতি অঙ্কিত হইয়াছিল। নলিনী বালিগঞ্জে গেলে, ভাদুড়ী মহাশয় বিমলার স্বাস্থ্য ও পড়াশুনাসম্বন্ধে সংবাদ লইতেন। ক্রমে ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্ পরীক্ষা হইয়া গেল। সংবাদ বাহির হইল, বিমলা এবারেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আর তাহার শিক্ষকতাগুণে নলিনীও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে। ইহারা উভয়েই তখন ভাদুড়ী-পরিবারের সহিত দার্জ্জিলিং শৈলে। পরীক্ষান্তে বিমলা দেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় ভাদুড়ী ছাত্রাবাসে আসিয়া বলিলেন—"বিমলা! আমরা শৈলবাসে যাইতেছি, তুমি ও নলিনী সঙ্গে চল। দুই বৎসর নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াছ। সেখানে কিছুদিন থাকিলে, শরীরমন সুস্থ ও সবল হইবে। আবার দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে।" তাহাই হইল। বিমলা গোপনে গঙ্গাদেবীকে পত্র লিখিয়া দিল—"আমি বেড়াইতে যাইতেছি, শরীব একটু খারাপ হইয়াছে; তোমাদের কোন চিন্তা নাই। পাশের খবর পাইলেই সংবাদ পাঠাইয়া দিব। কখন কোথায় থাকিব ঠিক নাই; কিন্তু যেখানেই থাকি, মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিব। তোমাদের পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই।" বৎসরান্তে পুত্রমুখ দেখিতে না পাইয়া গঙ্গাদেবী দুঃখিতা হইলেন, কিন্তু পুত্রের মঙ্গলের জন্য জননী কি স্বার্থ না বলি দিতে পারেন? যথাসময়ে গঙ্গাদেবীর কাছে পাশের সংবাদ গেল। কিন্তু পাশের সংবাদ পাওয়া অপেক্ষা বিমলাকে পাইলে বোধ হয় গঙ্গাদেবী অধিকতর আহ্লাদিতা হইতেন। তাহা হইল না। জননী পূজাবকাশের প্রতীক্ষায় রহিলেন

—বিমলা অবশ্যই আসিবে। কিন্তু বিমলা আসিল না। স্বাস্থ্য ও পড়াশুনার ওজর করিয়া ভাদুড়ী-পরিবারের সহিত পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

সুষমা দিন দিন মলিনা হইতে লাগিল। বিমলার দেখা অনেক দিন পায় নাই, মধ্যে মধ্যে পত্র পাইত—তাহাও এখন বিরল হইয়াছে। সুষমা কিশোর-যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। সমবয়স্কারা স্বামীর কথা কয়, সুষমা আমোদ করিয়া শোনে, সঙ্গিনীগণের সহিত হাসে, কিন্তু গোপনে কাঁদে। পতিকে পত্র লিখিয়া যে মনের ভাব লাঘব করিবে, সে সুযোগও নাই—পত্র লিখিতে বারণ। সুষমা বিরলে বসিয়া সহস্রবার পঠিত পুরাতন পত্রগুলি পাঠ করে। পত্রগুলির প্রতি ছত্র তাহার কণ্ঠস্থ, তবু পাঠ করে। পত্রগুলি হৃদয়ে ধরে, পত্রের সহিত কথা কয়, এই পত্রগুলি তাহার জীবন। তাহারই চক্ষের জল পড়িয়া পত্রের অনেক স্থল মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু সুষমার স্মৃতিপটে তাহার প্রতিবর্ণ উজ্জ্বলরাগে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। জাগরণে স্বপনে এই পত্রগুলি তার জীবনের সম্বল। সংসারের কাজেকর্ম্মে দিন একরকমে কাটিয়া যায়। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় কখন সৌধশিরে গিয়া বসে। দূর আম্রকাননের পশ্চাতে অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে চন্দ্রোদয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর হৃদয়ান্ধকার নাশ করিয়া আর একখানি চাঁদমুখ জাগিয়া উঠে। আকাশে তারা ফোটে, অনিমেষনেত্রে দেখিতে দেখিতে আর কার নয়নদুটি তাহার মনে পড়ে। তরুপত্র কাঁপাইয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বয়, সুষমার মনে হয়, যেন কার চিরপরিচিত স্বর তাহাকে সম্ভাষণ করিতেছে! এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে সুষমার জীবন বিমলাময় হইয়া উঠিল। হৃদয় যাহাকে নিরন্তর চাহিতেছে, তাহাকে কাছে না পাইয়া সুষমা দিন দিন শুকাইতে লাগিল। গঙ্গাদেবীর যন্ত্রণা অনুরূপ হইলেও, শাশুড়ী ও বধূ সমবেদনায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহার অদর্শন-বেদনায় উভয়ে কাতরা, সে তখন কি করিতেছে? সে তখন রমাকে লইয়া ব্যস্ত।

ভাদুড়ী-পরিবার এখন দিল্লীনগরে একখানি মনোহর উদ্যানভবনে

অবস্থিত। বিমলা রমাকে ইংরাজি পড়ায়, কবিতা পাঠ করিতে শিখায়, সন্ধ্যায় কুঞ্জগৃহে বসিয়া তাহাকে নানা গল্প শুনায়। এখানেও চন্দ্রোদয় হয়, বাতাস বয়, তারা ওঠে, ফুল ফোটে, কিন্তু প্রেমের প্রবেশাধিকার এখানে নাই। সুষমার ন্যায় রমাও এখন কিশোরী—বালিকার কলিকা-হৃদয় এখন বিকাশোন্মুখ। বিমলার স্পর্শে, স্বরে, নয়নে, সম্ভাষণে সে কি যেন অন্বেষণ করে, কিন্তু পায় না! রমা বুঝিল, বিমলার অন্তরের অন্তরে এমন একটি নিভৃত স্থান আছে, যাহা দুর্ভেদ্য-প্রাচীর-বেষ্টিত, যেখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সে নিভৃত প্রদেশে বিমলা তাহার স্বার্থ লইয়া একা বাস করে। সুহৃদ্, সঙ্গী, সহপাঠী, জননী, স্ত্রী, প্রণয়িনী—কেহই সে দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিত না। অভিমানিনী বালিকা হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করিয়া তাহার ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা দলিত করিল। রমা যখন তাহার হৃদয়ের সহিত প্রাণপণে এইরূপ যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার পিতা মিঃ র‍্যাম্‌স্‌ডেন্ ভাদুড়ী তখন ভাবিতেছিলেন, বিমলাকে জামাতৃপদে বরণ করিবেন। এমন দুর্লভ পাত্র আর কোথায় পাইবেন? বিমলা দরিদ্র? হইলই বা। আমার ত যথেষ্ট অর্থ আছে। বিমলার পিতামাতা কেহ নাই? সে ত আরও ভাল—স্নেহ, আদর, যত্ন পাইলে বিমলা আমাদের অধিকতর আপনার হইবে। চেষ্টা যদি সফলতা-জনয়িত্রী হয়, চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। মনে মনে ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়া মিঃ এবং মিসেস্ ভাদুড়ী বিমলাকে অধিকতর যত্ন আদর করিতে লাগিলেন। সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন না সত্য, কিন্তু যাহাতে কলেজের অবকাশে কাছে রাখিয়া দিন দিন বিমলাকে অধিকতর আপনার করিয়া লইতে পারেন, আপাততঃ সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিমলা ভাদুড়ী মহাশয়ের মনের কথা বুঝুক না বুঝুক, মনে মনে ভাবিল, ইঁহারা উদ্মি লোক; কন্যাকে শিক্ষা দিয়া, ইঁহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া যে কোনও রূপে ইঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তাহারই ভাল।

পূজার অবকাশ গেল, পুনরায় গ্রীষ্মাবকাশও চলিয়া গেল; বিমলার দেশে যাওয়া আর হইল না। মা কাঁদেন। হৃদয়সন্তাপে বধূর অস্থি-

চর্ম্ম সার। বিমলা কদাচ কখন একখানা চিঠি লিখে।' সে চিঠির না আছে শ্রী, না আছে ছাঁদ,—পড়াশুনায় বড় ব্যস্ত, শারীরিক ভাল আছি, তোমরা ভাবিত হইও না। "ভাবিত হইও না" বলিলে যদি মন বুঝিত, তাহা হইলে ভাবনা কি? যতই দিন যাইতে লাগিল, বধূর অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিল।

আবার পূজার অবকাশ আসিয়াছে। বি,এ, পরীক্ষার আর অল্পদিন বাকী। ভাদুড়ী আর কালবিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। একদিন বিমলাকে নিভৃতে ডাকিয়া আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন—"তুমি বি, এ, পাশ করিলে রমার সহিত তোমার বিবাহ দিয়া, তোমায় সিবিল সার্ব্বিসের (Civil Service) জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দিব। সেখানে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছেন, তোমার কোনও কষ্ট হইবে না। পাশ করিয়া আসিলে, তোমার উন্নতির জন্য আমি দায়ী। আমার প্রস্তাবের উত্তর আজই তোমায় দিতে বলিতেছি না। বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে উত্তর দিও। তোমার কেহ অভিভাবক আছে কি না, জানিনা, নলিনী বলে, তোমার কেহ নাই। ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলিয়া আমি তোমার পারিবারিক কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। যদি কেহ তোমার অভিভাবক থাকেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ ক'রে উত্তর দিও। আর আমায় বল ত, আমিও তাঁকে চিঠি লিখ্‌তে পারি।" বিমলা বলিল—"একখানা বই আন্‌বার জন্য আমাকে আজ মেসে যেতে হবে। আমি দু' একদিন পরে এসে আপনার কথার জবাব দিব।"

বই আনাটা অছিলা মাত্র। কথাটা এই, গঙ্গাদেবীর নিকট হইতে টাকা আসিবার সময় হইয়াছে, সেইজন্য বিমলাকে পোষ্টাফিসে যাইতে হইবে। টাকা আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে একখানা পত্রও আসিয়াছে—বধূমাতা পীড়িতা, তুমি একবার অবশ্য বাটী আসিবে। পোষ্টমাষ্টারের সহিত অনেক দিনের পরিচয়, বিমলা ডাকঘরে বসিয়াই উত্তর লিখিয়া দিল—"চার পাঁচ মাস পরে আমার পরীক্ষা; এখন বাটী গেলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। আমার যাওয়া নিষ্প্রয়োজন; আপনি যেরূপ আবশ্যক

বুঝিবেন, সেইরূপ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবেন। আমার যাওয়াতে বেশী কি ফল হইবে? এ কয়মাস নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতে পারিলে ভাল হয়। সকল কথা আমাকে জানাইবার প্রয়োজন নাই। আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, করিবেন।"

যথাসময়ে পত্র গঙ্গাদেবীর নিকট পৌছিল। তিনি পড়িতে জানিতেন না, মনে করিয়াছিলেন—পত্রে বিমলার বাটী আসিবার সংবাদ আছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বধূমাতার হস্তে দিলেন। সুষমার পীড়া সাংঘাতিক—শুষ্ক ক্ষয় রোগ। গঙ্গাদেবী বিমলাকে সে কথা লিখেন নাই; বধূর চিকিৎসা করাইতেছিলেন। রোগ যখন সাংঘাতিক বলিয়া নির্ণীত হইল, কর্ত্তব্যপরায়ণা গৃহিণী তখন পুত্রকে গৃহে আনিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া পত্র লিখিলেন। বিমলা কবে বাটী আসিবে, এই সংবাদ জানিবার জন্য বধূমাতার হস্তে পত্র দিয়া উৎসুক হইয়া তাহার মুখ চাহিয়া আছেন; কিন্তু পত্রপাঠান্তে বধূর মুখে বাক্য সরিল না, এক একটী কথা বজ্রের ন্যায় হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল; সুষমা মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল। এ দিকে বিমলা তখন তাহার ভাবী বিবাহ-প্রস্তাবে ভাদুড়ী মহাশয়কে সম্মতি জানাইতেছে। ভাদুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি তোমার বাপের এক ছেলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমার বাপের মৃত্যু কতদিন হইয়াছে?"

"আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে।"

"তোমার মার?"

"সেও অনেক দিন।"

সহৃদয় ভাদুড়ী বলিলেন—"পুয়োর্ অর্ফ্যান্ বয় (Poor orphan boy)! আমরা জীবিত থাকিতে তুমি আর বাপ-মার অভাব বোধ করিবেনা।"

বিমলা বুঝিয়াছিল, গঙ্গাদেবী কদাচ এ বিবাহে সম্মত হইবেন না। মা আছেন—জানিতে পারিলে, ভাদুড়ী মহাশয়ও তাঁহার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিবেন না। এইরূপে ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িবে যে, সুষমা

জীবিতা আছে। হিন্দুর দুই বিবাহে দোষ নাই; কিন্তু সপত্নীসত্ত্বে ভাদুড়ী কখনও তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না। তবে রমার সহিত একবার বিবাহ হইয়া গেলে, আর ত ফিরিবে না। চুপি চুপি বিবাহটা হইয়া যাক্। তার পর যা হয় হবে। নলিনীকে অনুরোধ করিল—"দেখ ভাই, আমি গরীবের ছেলে—এ বিবাহের কথা টের পেলে সকলে বল্‌বে, বড মানুষের মেয়ে বে কর্‌বার জন্যেই আমি এখানে হ'ড়ে প'ড়ে থাকৃতুম্। বিবাহটা যাতে চুপি চুপি হয়, তোমার মামাকে সেই কথাটি বুঝিয়ে বলো।" নলিনী একেবারে চড়িয়া উঠিয়া বলিল—"বল্‌বে? কে কি বল্‌বে? কার সাধ্যি, কি বল্‌বে? ভেরি গুড্ (very good), বলুক, আমি চ্যালেঞ্জ (challenge) কচ্চি।" বিমলা ভাবিল—'সর্ব্বনাশ।' বলিল—"চুপ কর, চুপ কর।" নলিনী বলিল "চুপ্ কি? আমি এই চল্লুম, গোলদীঘিতে দাঁড়িয়ে সবার সাম্‌নে বের কথা বলিগে। বল্‌ব—কে কি বল্‌তে চাও, এগিয়ে এস।" বলিয়া আস্তিন গুটাইতে আরম্ভ করিল; নলিনীর চীৎকারে ভাদুড়ী ঘরে আসিয়া পড়িলেন। ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে, কি হয়েছে?" নলিনী বলিল—"মামাবাবু, তুমি কালই কল্‌কাতা সহরে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও, রমার সঙ্গে বিমলার বিবাহ। কার কি বল্‌বার আছে, সে নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করুক।" ভাদুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঢ্যাঁড়া দিবার কি প্রয়োজন?" নলিনী বলিল—"বিমলা বল্‌চে, লোকে বল্‌বে, ওর লজ্জা হবে।" ভাদুড়ী বিমলার মুখের দিকে চাহিলেন। সুযোগ পাইয়া বিমলা সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল। ভাদুড়ী বলিলেন—"তোমার আত্মসম্মানের উপর আমি আঘাত করিব না। তুমি যেমন ইচ্ছা করিতেছ, তেমনি হউক।"

বিবাহের কথিতমত বন্দোবস্ত করিয়া বিমলা নিশ্চিন্তমনে পড়িতেছিল। পরীক্ষা অতি নিকট, কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টমাসের ছুটি উপলক্ষে মেসের অনেক ছাত্র দেশে গিয়াছে। বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়া অবধি বিমলা আর বালিগঞ্জে প্রায় থাকে না, মেসে থাকিয়া পড়ে। বিমলা থাকে না বলিয়া নলিনীও বাগানবাটীতে থাকে না। বিমলা

এক মনে বসিয়া পড়িতেছিল, তড়্ তড়্ করিয়া দুই তিনটী সিঁড়ি লাফাইতে লাফাইতে নলিনী উপরে গিয়া উঠিল। সিঁড়ি উঠার শব্দে বিমলা জানিতে পারিয়াছিল যে, নলিনী আসিতেছে। কিন্তু যে সংবাদ সে আনিয়াছিল, বিমলা তা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়াই নলিনী বলিল, "এস এস, তোমার মা এসেছে!" সহসা বিমলার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। অসামান্য উদ্যমে আত্মসংযম করিয়া বিমলা বলিল—"আমার মা!" নলিনী হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল,—"আরে এস না, দেখ্‌বে এস না, শুধু মা নয়, সঙ্গে এক ধেড়ে সন্ন্যাসী।" বলিয়াই বিমলাকে টানিয়া লইয়া চলিল। সত্যই বিমলাকে টানিয়া লইয়া যাইতে হইল। ফাঁসীকাঠের নিকট যাইতে খুনীর যেমন পা উঠে না, বিমলারও সেইরূপ অবস্থা। মুখ ঘামিয়াছে, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, কিন্তু নলিনী ত ছাড়িবার পাত্র নহে। নীচে আসিয়া বিমলা দেখিল, সত্যই তাহার মা, এবং সঙ্গে এক সন্ন্যাসী। বিমলার মুখে কথা সরিল না, নতমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গঙ্গাদেবী বলিলেন,—"বাবা, বাড়ী চল, তোমায় নিতে এসেছি।" বিমলা নীরব! মাতা বিস্মিতা হইয়া আবার বলিলেন—"কথা কোচ্চ না কেন?" বিমলা নিরুত্তর! গুরুদেব বলিলেন—"এ তোমার মা, চিন্তে পাচ্চো না, না কি?" তখন উপর হইতে আরও দুই চারিজন ছাত্র নামিয়া আসিয়াছে। "কি হে, ব্যাপারখানা কি হে?" নলিনী বলিল, "এই বামুন বল্‌চে, এ ওর মা।" একজন বলিল—"তাই ত! তোমার মা আছে না কি?" বিমলা ধীরস্বরে বলিল—"না।" সন্ন্যাসী গুরু-গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি তোমার মা, চিন্তে পাচ্চো না?"—"না।" গঙ্গাদেবী বসিয়া পড়িলেন! একজন ছাত্র বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর, স'রে পড় না, আর কেন?" আর একজন বলিল,—"বাবা, কোলকেতা সহর, কত রকম জোচ্চুরিই চোল্‌ছে!" সন্ন্যাসী বলিলেন—"পাষণ্ড, তোর মা'র অপমান তুই দাঁড়িয়ে দেখ্‌চিস্?" একজন বলিল—"ঠাকুর, থিয়েটার কোর্‌বে? বেশ অ্যাক্ট (act) কর্‌তে পার।" ক্রোধ সংবরণ করিয়া গেরুয়াধারী ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা, চল, এক পুত্র তোমায় পরিত্যাগ

করিল, সহস্র পুত্র তোমার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে।” বলিয়া গঙ্গাদেবীকে লইয়া চলিলেন।

বধূমাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়াও বিমলা যখন বাড়ী গেল না, গঙ্গাদেবীর মন তখন অস্থির হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ধারণা ছিল, ইংরাজী পড়িলে খ্রীষ্টান্ হয়। এখন মনে হইল, সত্যই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বিমলা যে সময় ভাদুড়ী-পরিবারের সহিত পশ্চিমাঞ্চলে, গঙ্গাদেবীর কাতরতায় তাঁহার গুরুদেব সেই সময় কলিকাতায় আসিয়া গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন—বিমলার সহিত উক্ত পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়; ভাদুড়ীর আচার ব্যবহার খ্রীষ্টানের মত, এবং তাহার একটি বিবাহযোগ্যা রূপসী কন্যা আছে। গঙ্গাদেবী গুরুদেবের মুখে এই সকল সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। ভাবিয়াছিলেন, বধূমাতার সাংঘাতিক পীড়ার কথা বলিয়া বিমলাকে দেশে লইয়া যাইবেন। জননীর কোন কথাই বলা হইল না। বাসায় গিয়া, মৃতপ্রায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মায়ের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিয়া গুরুদেব কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ পরে গঙ্গাদেবী বলিলেন—“বাবা, বৌমার দিন সংক্ষেপ, এই অভাগাকে দেখ্‌বার জন্য পথ চাহিয়া আছেন। দেশে গিয়ে কেমন ক’রে মুখ দেখাব! বৌমা অবশ্য জানেন না, আমি এসেছি। কিন্তু বেয়ান ত জানেন! হায়, হায়, কেন এমন হ’ল!”

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“মা, তুমি ত জান, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবন বড় কষ্টের জীবন, দারিদ্র্য দুঃখ অভাবের সঙ্গে নিত্য যুদ্ধ কর্‌তে হয়। সর্ব্বানন্দ সময়ে সময়ে এ সকলের তাড়নায় কাতর হ’য়ে বল্‌তেন—আমি অতি কষ্ট ভোগ কর্‌লুম্, আমার যদি পুত্র হয়, সে যাতে সুখে থাকে, তাই কোর্‌বো; তা’কে অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যা অভ্যাস করাব। পুত্র-মমতায় অন্ধ হ’য়ে, তাই ক’রেও ছিলেন। ফলও মা সেইরূপ হয়েছে! পুত্র তোমার ঘোরতর স্বার্থপর।”

নলিনী পরদিন বালিগঞ্জে গিয়া বলিল—“মামাবাবু, এক মিন্‌সে সন্ন্যাসী সেজে, আর এক মাগী মা সেজে, বিমলাকে ঠকাতে এসেছিল।

বিমলা সেই অবধি ভয়ে কেমন এক রকম হ'য়ে গিয়েচে। তার কেবল মনে হচ্চে, তারা আবার আসচে। ওকে আর মেসে রাখা নয়।" ভাদুড়ী মশায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বটে বটে! বিমলা কি বোল্‌চে?" নলিনী বলিল—"বিমলা বল্‌চে, ওর মা শিশুকালে মারা গেলে, গ্রামস্থ একটী স্ত্রীলোক ওকে মাই দিয়ে মানুষ করে। তার পর বিমলা একটু বড় হ'লে সে কাশী চ'লে যায়। বিমলার বাপ মরবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, বিমলা যদি তার সন্ধান পায়, তা হলে তাকে দু পাঁচ বিঘে জমি দিতে হবে। বিমলার যতদূর মনে আছে, সে ছিল কাল কোল' বেঁটে, আর এ হচ্চে ঢেঙ্গা ঢোঙ্গা ফর্সা।" স্বার্থান্ধ ভাদুড়ী মহাশয় সেইরূপই বুঝিলেন, বলিলেন—"এরা নিশ্চয় জোচ্চোর। এই বামুন কেমন ক'রে সন্ধান পেয়েছে—বিমলার বাপ জায়গা জমি দেবার কথা ব'লে গিয়েছিলেন, সেইটে ফাঁকি দেবার জন্য মা সাজিয়ে এনেছিল, আর কি।" নলিনী বলিল—"মামাবাবু, বিমলা বড ভয় পেয়েছে, সেই অবধি কেমন এক রকম হ'য়ে রয়েছে, ওকে আর মেসে রাখা নয়।" ভাদুড়ী বলিলেন—"নিশ্চয়, আমি এখনই গাড়ী নিয়ে নিজে গিয়ে আন্‌চি।" সেইরূপই হইল।

বিমলার পরীক্ষা হইয়া গেল, শুভদিনে মিষ্টার র্যাম্‌স্‌ডেন্‌ ভাদুড়ী রমার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। বি, এ, পরীক্ষার ফল জানিবার অপেক্ষা না করিয়া বিমলা পরের মেলে বিলাতযাত্রী জাহাজে উঠিল।

জাহাজ ছাড়িতে আর অল্প সময় বাকী আছে। বিমলা দেখিল, নৌকা করিয়া কলেজ স্কোয়ারের সেই পোষ্টমাষ্টার জাহাজের দিকে আসিতেছেন। পোষ্টমাষ্টার জানিয়াছিলেন, বিমলা র্যাম্‌স্‌ডেন্‌ ভাদুড়ীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া, সিভিল সার্ভিস্‌ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত যাইতেছে। সেইদিন সকালে পোষ্টমাষ্টারের ঠিকানায় বিমলার নামে একখানি টেলিগ্রাম আসে। অন্য কাহারও টেলিগ্রাম হইলে, ডাকবাবু তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, কিন্তু র্যাম্‌স্‌ডেন্‌ ভাদুড়ীর জামাই, সিভিল সার্ব্বিস্‌ পরীক্ষা দিতে যাইতেছে, কালে বড় লোক হইবে; লোকটাকে হাতে রাখিলে উপকারে আসিতে পারে। নৌকা হইতে পোষ্টমাষ্টার

টেলিগ্রামখানি বিমলার হাতে দিলেন। ধন্যবাদ দিয়া বিমলা তাঁহাকে বিদায় করিল—সেই সময় জাহাজও ছাড়িল। বিমলা টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিল, সুষমা তার করিয়াছে। তাহার ভাবার্থ এই,—'আমার চরম সময় সন্নিকট, একবার মাত্র তোমার দর্শনাভিলাষিণী।' বিমলার মস্তক টলিল। জাহাজের রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তলস্থ জলতরঙ্গের ন্যায় পরে পরে মনে কত কথাই উঠিতেছে! ইচ্ছা হইল, একবার সুষমাকে দেখিয়া আসে, কিন্তু তখন জাহাজ ছাড়িয়াছে। নদীকূলের দৃশ্য ছায়াবাজীর ন্যায় নয়নপথ হইতে অপসৃত হইতেছে; সুষমার ছবিও মন হইতে এমনি সরিয়া যাইবে! ভাবিতে ভাবিতে উদাস-নেত্রে দিগন্ত পানে চাহিয়া, বিমলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জাহাজ চলিতে লাগিল। (আগামী বারে সমাপ্য।)

বেদান্তের প্রয়োজন।

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।)

আচ্ছা, বেদান্তে আমাদের প্রয়োজন কি? এই যে জগতে এত শাস্ত্র, এত বিদ্যা রহিয়াছে, এসব থাকিতে আবার বেদান্তের প্রয়োজন কি? ইতিহাস যতদিনের পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দেখা যাইবে যে, জগৎ দিন দিন উন্নতির পথেই ছুটিয়াছে, মানবজাতির জ্ঞানবল দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে এ উন্নতির একটু আধটু ব্যাঘাত ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও, মোটের উপর জগতের যে উন্নতিই হইতেছে, তাহা অবধারিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঐ দেখ—এক তাড়িত শক্তির আবিষ্কারে জগতে কত অদ্ভুত কাণ্ডই না হইতেছে! ইহা যেন জগতে এক নবযুগ আনিয়া দিয়াছে। ঐ দেখ

—টেলিগ্রাফ মুহূর্ত্তমধ্যে অতিদূরের সংবাদ আনিয়া দিতেছে, টেলিফোন দেশদেশান্তর হইতে পরস্পরে কথোপকথনেব সুবিধা করিয়া দিতেছে। বিদ্যুতালোক গৃহপ্রাঙ্গণ, উদ্যান, পথ ঘাট—সর্ব্বত্র যেন নয়নাভিরাম পূর্ণচন্দ্রালোক বিতরণ করিতেছে, বৈদ্যুতিক 'ফ্যান্' মৃদুপবনহিল্লোলে নিদাঘের দুঃখ দূর করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়—বৈদ্যুতিক বলে একটি পদার্থ অপর পদার্থে পরিণত হইতে চলিল। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি এখন কেবল তাড়িততেজ হইতে লাভের চেষ্টা হইতেছে। আর যদি অন্যান্য আবিষ্কারের কথা ভাবা যায়, তাহা হইলে ত তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ দেখ—গ্রামোফোন, কবে আমরা কি সুরে কোন্ কথা কহিয়াছি, তাহা চিরতরে রক্ষা করিতেছে। যে বিমানবিহার কবি-কল্পনা বলিয়া এতদিন শুনা যাইত, তাহা আজ গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োজনীয় ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিল। যে জড় ও চেতন নিতান্ত বিভিন্ন বলিয়া লোকে বুঝিত, সেই জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে, অধিক কি, পিতামাতা ব্যতিরেকে সন্তান উৎপত্তিও আজ আর অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। জানি না, আর দুই দশ দিন বাঁচিলে আরও কত অদ্ভুত দেখিব। হয়ত মর্ত্ত্য মানব কৃতান্ত-কবল-মুক্ত হইতেও সক্ষম হইবে। তাই বলি—এ সব বিদ্যা, এ সব শাস্ত্র থাকিতে বেদান্তের আবার প্রয়োজন কি?

একজন বেদান্তানুরাগী এতদুত্তরে হয়ত বলিবেন—এ সব জড়-বিজ্ঞানের কথা, এ সব বিদ্যার ফলে জাগতিক সুখসম্ভোগ কতকটা সম্ভব হয় বটে, ইহাতে জীবের বাঞ্ছনীয় অনেক অভাব মোচন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সম্পূর্ণভাবে সে সুখ সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, ইহার সে সুখ প্রদানের সামর্থ্য নাই। ঐ দেখ—আজ বিজ্ঞানের এত উন্নতিসত্ত্বেও কতশত পুত্র পিতৃদ্রোহী হইতেছে, ঐ দেখ—আজও দুর্দ্দমনীয় বাসনার তাড়নায় কতশত জননী প্রাণাধিক পুত্রের বধ-সাধন করিতেছে, আজও কত বন্ধু কত বন্ধুর, কত ভৃত্য কত প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিতেছে। আরও দেখ—প্রবল ভূপতি মিত্র-নৃপতির দুর্ব্বলতা দেখিলেই, তাহার রাজ্য হরণে ব্যস্ত হইতেছে।

ঐ দেখ—চৌর্য্য, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা আজও সমানভাবেই চলিতেছে। বরং ইতিহাস দেখিলে বোধ হইবে, পূর্ব্বে যে সব অধর্ম্মাচরণ অন্য উপায়ে অনুষ্ঠিত হইত, আজ তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নত প্রণালীতে বর্দ্ধিতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বল দেখি, বিজ্ঞান কি এ সব দুঃখ নিবারণ করিতে পারে? এতদুত্তরে হয়ত কোন বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলিবেন—"অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানই ইহার প্রতিবিধান করিবে। বিজ্ঞানের কোন দোষ নাই, পরন্তু দোষ আমাদের, কারণ, আমরা এখনও বিজ্ঞানের চরম ফললাভে সমর্থ হই নাই। বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিতে পারিলে এ সব পাপ থাকিবে না। বিজ্ঞানের উন্নতিতে এসব ক্রমে ক্রমে যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" কিন্তু ইহার উত্তরে একজন বৈদান্তিক বলিবেন—"না, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, তোমার হৃদয়ের বাসনা, তোমাব অন্তরের অজ্ঞান, তোমার বুদ্ধির মোহ, তোমার পাশব প্রবৃত্তি, দৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি-বৈচিত্র্য, জীবের অদৃষ্টের তারতম্য—তাহা হইতে দিবে না। ঐ দেখ—ঐ যে ত্রিতল সৌধশিরে মনোহর গৃহে বিলাসেব ক্রোড়ে বসিয়া একজন সর্ব্ববিধ সুখ সম্ভোগ করিতেছে, যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া সদর্পে কালাতিপাত করিতেছে—উহা দেখিয়া ছিন্নবস্ত্র ক্লিষ্টদেহ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ কি বাসনানলে বিদগ্ধ হইবে না? ইহার ফলে কি সে হিংসা, হতাশা, বা মর্ম্মবেদনা অনুভব করিবে না? এই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য তাহার কি পরদ্রব্যে লোভ জন্মিবে না? তাহার পর, ঐ পরদ্রব্যে লোভ হইতে তাহার কি অপহরণ-চেষ্টা হইবে না এবং তাহার ফলে কি তাহার রাজদণ্ড ভোগ অনিবার্য্য নহে? এই জন্যই বলি—ইহলোকের সুখভোগে যাহাদের চিত্ত ব্যাকুল, তাহাদের সুখ কোথায়? এক কথায় আমরা বলিতে পারি—অনাত্মপদার্থের বিজ্ঞানে সুখ নাই, তাহার সে সুখ দিবার সামর্থ্যই নাই। দেখ—জগতের বৈচিত্র্য যতদিন থাকিবে, ততদিন জগতে ধনী দরিদ্র ভেদ থাকিবে; ধনী ধনাপ-হরণ-জনিত চিন্তায় ব্যাকুল থাকিবে, দরিদ্র দারিদ্র্যদুঃখে কাতর হইবে, মনে কর, এক জন না হয় বিজ্ঞানবলে অমরত্ব লাভের উপায় আয়ত্ত

করিল। এখন যদি অপর একজন অমর ব্যক্তি সেই বিজ্ঞান বলে তাহার বধসাধন চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার অমরত্ব কোথায় থাকে? কোটীপতি লক্ষপতির ধন আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিলে, লক্ষপতির আত্মরক্ষার সামর্থ্য কোথায়? সবলের দুষ্ট চেষ্টার নিকট দুর্ব্বলের উপায় কি? মনে কর—বিজ্ঞানবলে তুমি চিরযৌবন লাভের উপায় জানিলে, কিন্তু বল দেখি, সে যৌবনের সুখসম্ভোগ করিতে যাইলে কি তাহার ক্ষয় হইবে না এবং ক্ষয় হইলে কি তাহার প্রতি আবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না? জড়বিজ্ঞান কি এ সব মানসিক প্রবৃত্তি নিবারণ করিতে পারে? মানবতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূততত্ত্ব, আইন আদালত কি এ সব সমূলে দমন করিতে পারে? ঐ দেখ—ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে রোগের বৃদ্ধি, আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে শক্রতার বৃদ্ধি। অধর্ম্ম,অত্যাচার, সমাজকলঙ্ক প্রভৃতি নাশের চেষ্টার সঙ্গে অধর্ম্মাদি হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। দেখ—সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগতে যত মানবনিধন যন্ত্র বিদ্যমান ছিল, আজ তাহা অপেক্ষা তাহা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানব পরস্পরকে যত হত্যা করিত,আজ তাহা অপেক্ষা কত অধিক করিতেছে। দেখ—যতদিন জীবের "আমি আমার," "তুমি তোমার" ইত্যাদি ভেদ সত্য বলিয়া বোধ থাকিবে, যতদিন জীবের "ভোগ্য-ভোক্তা-জ্ঞান" থাকিবে, যতদিন জীবের সুখভোগ-লালসা থাকিবে, যতদিন জীবের কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুকুল সজীব থাকিবে, ততদিন জীবের নিরতিশয় সুখসম্ভোগ অসম্ভব। দেখ—জগতে আমার যাহা বাঞ্ছনীয়, তাহা লাভে যত্ন করিলে অপরের স্বার্থহানি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সকলের স্বার্থ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে, কামনার পূর্ণতঃ পরিতৃপ্তি অসম্ভব। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—ভোগলালসার অন্ত নাই। দেখ—যতই ভোগ করিবে, ততই ভোগলালসা বাড়িয়াই যাইবে। অজ্ঞানীর ভোগলালসার স্বভাব এই যে, সে অভাব সৃষ্টি করিয়া, তাহা পূর্ণ করিয়া সুখী হইতে চাহে; কাজেই তাহার কামনা হ্রাস পায় না, বাসনার ক্ষয় হয় না। এইজন্য বলি, জড়বিজ্ঞানে জীবের

নিখুঁত সুখের আশা নাই, মানবের নিরুপদ্রব শান্তির সম্ভাবনা নাই। এইজন্য বলি,মানবের দুষ্টপ্রবৃত্তি দমন করিবার সামর্থ্য জড়বিজ্ঞানের নাই। কারণ, ইহা ভয় দেখাইয়া দমন করা যায় না, ইহা ভোগ করিয়া নিবারণ করা যায় না, ইহা দণ্ড দিয়া দূর করা যায় না। এসব উপায়ে অন্যায় কার্য্য বা পাপ একটু আধটু নিবারিত হয়, স্বীকার করিলেও, তাহাতে পাপপ্রবৃত্তি সমূলে উন্মূলিত কখনই হইতে পারে না। পাপপ্রবৃত্তি সমূলে উন্মূলিত করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে, তাহা জীবের প্রতি ভালবাসা, তাহা অপরের প্রতি স্নেহমমতা অথবা তাহা এসকলের মিথ্যাত্বজ্ঞান, এসকলের অলীকত্বজ্ঞান, এসকলের দুঃখমূলকত্বজ্ঞান।

দেখ—এই সব উপায় নিরূপণের জন্য বেদান্তশাস্ত্রের জন্ম। আমাদের দুষ্টপ্রবৃত্তি যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হইতে পারে, তাহারই জন্য বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। আমরা দেখাইব—এই বেদান্তই মানবকে যথার্থ সুখ বা প্রকৃত শান্তি দিতে সক্ষম। দেখ—এই বেদান্ত একটী দর্শনশাস্ত্র; ইহাতে মনের শান্তির জন্য অন্যপথ প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; ইহাতে জড় ও চেতনের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানবজীবনের লক্ষ্য প্রভৃতি মানবের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই নিরূপিত হইয়াছে। ইহার অধ্যয়ন এবং এতদুক্ত উপদেশানুষ্ঠানের ফলে মানবের অনিত্য পদার্থ লাভ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির ব্যগ্রতা দূর হয়। মানবের মন অন্য জগতে বিচরণ করে, মর্ত্ত্যধামের কিছুই তাহাকে বিচলিত বা আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। ইহা অনিত্যের মধ্য হইতেই নিত্যের সন্ধান আনিয়া দেয়, পরিবর্ত্তন-শীলের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ দেখাইয়া দেয়। ইহা জীবের অজ্ঞান দূর করিয়া তাহার যথার্থ অভীষ্ট কি, তাহা বলিয়া দেয়। এজন্য ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির প্রতি আর তাহার লক্ষ্য থাকে না, এজন্য অনিত্য স্বার্থের জন্য মানব আর ব্যগ্র হয় না। ইহা কামক্রোধাদি রিপুসমূহের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেয় বলিয়া, অভিমান-অহঙ্কারের তত্ত্ব ও লক্ষ্য দেখাইয়া দেয় বলিয়া, পরিণামে জীবের অধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও রিপুকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়, অথবা প্রকারান্তরে তাহারা মানবের অভীষ্টসাধনের সহায় হইয়া

থাকে। এই পথে ভাবিয়া দেখ, দেখিবে—যদি মানবের যথার্থ শান্তির পথ কিছু থাকে ত ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পথ, ইহাই তাহার অতি উত্তম উপায়। এইজন্য বলি—উক্ত জড়বিজ্ঞানসত্ত্বেও বেদান্তের প্রয়োজন আছে। এইজন্য বলি—জগতে এত শাস্ত্র, এত বিদ্যা থাকিলেও, বেদান্তের আবশ্যকতা আছে।

কিন্তু ইহাই যদি বেদান্তের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, আচ্ছা, বেদান্তই কি একমাত্র দর্শনশাস্ত্র? জগতে কি আর কোন দর্শনশাস্ত্র নাই? জগতে কি আর কোন শাস্ত্রে ঐসকল কথা আলোচিত হয় নাই? ঐ দেখ—কতকাল পূর্ব্ব হইতে এক ভারত-ভূমিতেই কপিল, কণাদ, গৌতম, জৈমিনি প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ প্রতিভায় আজ পর্য্যন্ত মানববুদ্ধিকে সমুদ্ভাসিত করিয়া আসিতেছেন। ঐ দেখ—পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এরিষ্টটল্, সক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি মানবচিন্তার গতি নিয়মিত করিয়া দিতেছেন। ইহারা সকলেই ত একই উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন? সকলেই ত ইহারা দার্শনিক? সকলেই ত সেই একই লক্ষ্যলাভের আশায় জীবনক্ষয় করিয়াছিলেন? তবে কেন আমরা এসকল ছাড়িয়া বেদান্তের শরণ গ্রহণ করিব? কি কারণে তবে আমরা বেদান্তের অনুশীলন করিব?

এতদুত্তরে বলিতে হইবে,—না, তাহা হইলেও বেদান্তের প্রয়োজন আছে। আমরা বলি, যিনি সকল দর্শন আলোচনা করিয়া দেখিবেন, যিনি সকল দার্শনিক মত আলোড়ন করিয়া দেখিবেন, তিনিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন—বেদান্তের প্রয়োজন আছে। একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বেদান্ত পড়িয়া, বেদান্তের বিশিষ্ট প্রয়োজন না বুঝিয়া থাকিতে পারিবেন না; একজন বিচারশীল ব্যক্তি বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাই আমরা আজ এই বেদান্তের প্রয়োজন কি, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। আর এজন্য আমরা চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কথাই স্মরণ করিব এবং তাঁহাদের কথারই প্রতিধ্বনি করিব।

আমাদের মনে হয়—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, অন্যান্য সকল বিদ্যা হইতে বেদান্তবিদ্যার বিশেষত্ব দুইটী দিক্ দিয়া বুঝাইয়াছেন। একটী বেদান্তের উৎপত্তির দিক্ দিয়া, দ্বিতীয়টী ইহার সিদ্ধান্তের নূতনত্বের দিক্ দিয়া। তন্মধ্যে প্রথম—বেদান্তের উৎপত্তি-সংক্রান্ত পথে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় মহর্ষিবৃন্দ-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র ব্যতীত ইহা অপরাপর দর্শন-শাস্ত্র হইতে অতি প্রাচীন ও অপৌরুষেয় বলিয়া প্রয়োজনীয়। দেখ—বেদান্ত বেদের অন্তিম ভাগ। ইহার অপর নাম উপনিষৎ বা রহস্য-বিদ্যা। এই বেদান্ত অবলম্বনে যে দর্শনের জন্ম হইয়াছে, তাহাই বেদান্ত-দর্শন। কপিল, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই বেদান্ত অবলম্বনে নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্র রচনা করিলেও, তাঁহাদের দর্শনগুলি বেদান্তদর্শন নামে অভিহিত হয় নাই। কারণ, যাঁহার দর্শন বেদান্ত দর্শন নামে পরিচিত হইয়াছে, সেই দর্শনের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত হইতে তাঁহাদের মতের পার্থক্য আর তাঁহার নিজ দর্শনের সম্পূর্ণ-ভাবে বেদান্তানুসারিত্ব দেখাইয়াছেন। আর তিনি সর্ব্বতোভাবে বেদান্ত অবলম্বনে নিজ দর্শন রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার দর্শনই বেদান্তদর্শন নাম লাভ করিয়াছে। এখন দেখ—ইতিহাস হইতে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বেদই জগতের আদিগ্রন্থ। বেদের পূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারিতেছে না। সুতরাং অপর গ্রন্থ হইতে বেদের আদি নির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই। আর যদি বেদের মধ্যেই বেদের উৎপত্তিসম্বন্ধে অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা অনাদি,—ঋষিগণ ইহার লব্ধা ও দ্রষ্টা মাত্র, রচয়িতা নহেন। ফলকথা, কোনও প্রাচীন গ্রন্থে বেদের রচনাকাল দেখা যায় না, সুতরাং বেদান্তের অতি প্রাচীনত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব নিশ্চিত। আর ইহারই জন্য ইহা যেমন সাধারণলোকের হৃদয়ে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে—ইহার উপদেশের সত্যতার প্রতি লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে, এমন আর অন্য দর্শনের সামর্থ্য নাই। আর যদি বেদের রচনাকাল একটা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, যে সময়ে ইহা রচিত হইয়াছে, সে সময় মনুষ্যজাতির আদিম-

অবস্থা; বসুধাবাসী তখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, বর্ত্তমান সভ্যতার নামগন্ধও ছিল না। এমন অবস্থায় যদি এরূপ সত্য আবিষ্কৃত হয়, এরূপ অনুভবের উৎকর্ষ সংঘটন হয়, যে উৎকর্ষ আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধা হরণ করিতেছে, তাহা হইলে, যে সকল লোক ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা, যাঁহারা ইহার অনুভবকর্ত্তা, তাঁহাদের কথার সত্যতা যে অধিক, তাঁহাদের কথা যে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাহাতে কি আর সন্দেহ হয়? সুতরাং এই কারণে বেদান্ত যে অপর দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই হইল বেদান্তের উৎপত্তি-সংক্রান্ত বিশেষত্ব। বল দেখি—এ বিশেষত্ব কি অপর দর্শনে আছে? দেখ দেখি—এ বিশেষত্ব কি সক্রেটিস্ এরিষ্টটলের দর্শনে আছে? ভাব দেখি—এ বিশেষত্ব কি বুদ্ধ-মহাবীরের কথায় আছে? কখনই নহে। সুতরাং বেদান্তের প্রয়োজন যে অবধারিত, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই বুঝে। বুদ্ধিমানের আর কথা কি?

আজকাল কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অধিকাংশই বেদান্তের এই অতুলনীয় গৌরবকে ক্ষুন্ন করিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর। এই বেদান্তকে তাঁহারা আধুনিক শাস্ত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও এই বেদান্তের অস্তিত্ব তাঁহাদের মতে অসম্ভব। জানি না—তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীর জন্ম হয় নাই বলিয়া উল্লিখিত থাকাতেই তাঁহারা এইরূপ ভাবিয়া থাকেন কি না। তাহা না হইলেও তাঁহাদের যুক্তি, কল্পনায় কুহক-বিজৃম্ভিত, অধিকাংশ সময়ে প্রমাণের প্রান্তদেশেও পদার্পণ করে না। অবশ্য, তাই বলিয়া যখন আল্লোপনিষৎ দেখি, যখন চৈতন্যোপনিষদের অস্তিত্ব স্মরণ করি, তখন তাঁহাদের চেষ্টাকেও সাধুবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া মুখ্য উপনিষৎ সম্বন্ধে ওকথা বলা আদৌ চলে না। যাউক, তাঁহাদের কথায় আর কাজ নাই। প্রকৃত হিন্দু ইহাতে টলিবেন না, ইহাতে সত্যানুসন্ধিৎসুর উদ্বেগের কারণ নাই।

এইবার দ্বিতীয় পথটী বিচার্য্য। এইবার দেখা যাউক, বেদান্তের সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত বিশেষত্ব কি। ইহা বুঝিলে, কপিল-কণাদাদির দর্শন

হইতে ইঁহার বিশেষত্ব প্রমাণিত হইবে, স্থায়-সাংখ্য হইতে ইহার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হইবে। দেখ—বেদান্ত ভিন্ন যত দর্শন দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জীব ও জগতের কারণকে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্ত কিন্তু ইহাদের কারণকে এক ও বিভু বলিয়া থাকেন। দেখ -বেদান্ত ভিন্ন যত দার্শনিক মত আছে,তাহাদের মধ্যে আবার অনেকের মতেই জগতাদির মূল কারণবস্তুটী, হয় অংশতঃ, না হয় পূর্ণতঃ পরিণামী বা বিকারশীল বলিয়া বিবেচিত হয়, অথবা কালভেদে অংশতঃ বা পূর্ণতঃ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করা হয়, কিন্তু বেদান্তমতে জগৎকারণ নিয়ত সর্ব্বত্র অবিক্রিয়সত্বেও জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়। কেহ বা আবার, এই বেদান্তমতের ছায়া অনুসরণ করিয়া অন্য দর্শনমতের সংস্কার লইয়া জগৎকারণকে অবিক্রিয় বলেন এবং জগদাদিকে তাহার শক্তির বিকার বা পরিণাম বলিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু প্রকৃত বেদান্তমতে জগদাদিকে উক্ত শক্তির বিকার বা পরিণামও বলা হয় না, পরন্তু শক্তির খেলা, বিলাস বা বিভ্রম বলা হয়। বিলাস বলিবার তাৎপর্য্য—জগৎরূপ মিথ্যা; কিন্তু বিকার বলিলে, জগৎরূপকে মিথ্যা বলা হয় না, পরন্তু সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। কারণ, শক্তি কখনও শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ আধারে থাকে না, সুতরাং শক্তির বিকারে, শক্তিমানের বিকার অবশ্যম্ভাবী হয়। অধিক কি, বেদান্তমতে এই শক্তি ও ব্রহ্ম একই পদার্থ, বোধ-সৌকর্য্যার্থ নামভেদমাত্র। দেখ—নিয়ত একরূপ, অবিক্রিয়, অনন্ত, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, এক অদ্বৈততত্ত্বই জগৎকারণ—ইহা কেবল বেদান্তেরই সিদ্ধান্ত। দেখ—জগৎকারণ অবিক্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়াও জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়—ইহা কেবল বেদান্তেরই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের জন্যই বেদান্ত সকলের বড়, বেদান্ত সকলের শ্রেষ্ঠ। যদি বল—ইহাতে বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? বৈদান্তিক না হয় জগতের কারণকে এক বলেন, অপরে না হয় তাহাকে বহু বলিয়া বিবেচনা করেন ইহাতে অপরের দোষ কি?—ইহার জন্য বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব কেন স্বীকার করিতে হইবে? আমরা বলি, এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। দেখ,—পাঁচটী জিনিষের কারণ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি পাঁচটীর কারণ চারিটী

বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি তাহাদের কারণকে তিনটীতে পরিণত করিতে পারে, সে কি অধিক বুদ্ধিমান্, অধিক কৌশলী নহে? তদ্রূপ যে ব্যক্তি আবার সেই তিনটীকে দুইটীতে, এবং যে ব্যক্তি সেই দুইটীকে আবার একটীতে পরিণত করিতে পারেন, তিনি কি উহাদের সকলের মধ্যে ক্ষমতাশালী নহেন? কোন ব্যক্তি একটা কার্য্য করিতে যদি পাঁচটা জিনিস চায়, এবং অপর ব্যক্তি যদি সেই কার্য্য করিতে তদপেক্ষা অল্প জিনিস চায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি যেমন প্রথম ব্যক্তি হইতে কার্য্যক্ষম ও উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়, তদ্রূপ এক বস্তু হইতেই সমুদয়ের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করায় অপরাপর দর্শনমত হইতে বেদান্তমত যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর যদি বল—এই জগৎকারণ অবিক্রিয় থাকিয়াও জগতের কি করিয়া আবির্ভাব হয়?—ইহা যে নিতান্ত অসম্ভব কথা? ইহার উত্তরেও দেখ—বেদান্তমত অপরাপর দার্শনিক মত হইতে কত শ্রেষ্ঠ—কত উত্তম। ইহার উত্তরে অপর দার্শনিকগণ উক্ত জগৎকারণ ভিন্ন এক বা একাধিক পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু বৈদান্তিক ইহার উত্তরে জীবের ভ্রম বা অজ্ঞানকেই তাহার কারণ বলিয়া তাহার সমাধান করিয়া থাকেন। দেখ—কার্য্যপদার্থ নিজ কারণাবস্থার "বিশেষ" পরিচয় জানিতে চির অসমর্থ হইয়া থাকে। সন্তান কখন নিজ জন্ম দেখিতে পায় না। আসল কথা এই যে—মানব যে অন্তঃকরণের সাহায্যে সব বুঝিয়া থাকে, সেই অন্তঃকরণের জন্মের পূর্ব্বে তাহার কিছুই বুঝিবার সামর্থ্য নাই। অবশ্য, তাই বলিয়া যে একেবারে আমরা আমাদের উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা কিছুই বুঝিতে পারি না, তাহা নহে; পরন্তু যেটুকু বুঝি, তাহা সত্তামাত্র, তাহা তাহার জ্ঞানবৎ প্রকাশস্বভাব, তাহা তাহার চিন্ময় স্বরূপ ভিন্ন আর কিছু নহে। ফলে, বৈদান্তিক ব্রহ্মে, জগদুৎপত্তির প্রতি ব্রহ্ম ভিন্ন কারণের সত্তা স্বীকার না করিয়া জীবের ভিতর সে কারণ নিরূপণ করায়, এই লাভ হইল যে, যাহা অচিন্ত্য, তাহাতে আর কোন বিশেষণ দিতে হইল না, এবং তাহার ফলে অচিন্ত্যত্বেরও আর হানি হইল না। যাহা মানববুদ্ধির অগোচর, তাহাকে আর বুদ্ধিগোচর করিবার জন্য

বৃথা চেষ্টা করা হইল না। দেখ—এই মতে যাহা আমাদের বুদ্ধি-গোচর, তাহারই দ্বারা আমরা তাহার উত্তর প্রদান করিলাম, তাহারই দ্বারা আমরা এ সমস্যার সমাধান করিলাম। আমরা অচিন্ত্য শব্দে বিশেষণ দিয়া নিজের কথার নিজেই প্রতিবাদ করিলাম না। আর দেখ—ইহাতে সত্যের অপলাপও ঘটিল না, তত্ত্বের ব্যতিক্রমও হইল না, কারণ, ব্রহ্মে যে 'কারণবশতঃ' সৃষ্টি হয়, সে কারণের যাহা কার্য্য, তাহা জীবের অজ্ঞান বা অন্যথাজ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান এবং এই অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান নষ্ট হইলে, জীব সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দেখে,—জীব মুক্ত হয়,—জীবের বন্ধন ঘুচিয়া যায়। বস্তুতঃ এই অজ্ঞান-নাশে মুক্তি হয়, ইহা সকল দার্শনিকই স্বীকার করিবেন, ইহাতে সকলেই একমত। ইহা স্বীকার না করিলে, মুক্তিই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং বেদান্ত-মতে জীবের অজ্ঞানবশতঃই ব্রহ্মে জগদুৎপত্তি হয় বলায়, জগদুৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা জীবের বুদ্ধির গোচর পদার্থ দ্বারাই সিদ্ধ হইল, ব্রহ্মশক্তি, প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি বুদ্ধির অগোচর পদার্থের দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইল না। এখন দেখ—ইহাতে বেদান্তমতের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? মনে কর—দুইজনে একটা পদার্থের কারণ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, একজন যদি এমন একটী পদার্থকে কারণ বলে, যাহা উভয়েরই পরিচিত এবং আর একজন এমন একটী পদার্থকে তাহার কারণ বলে, যাহা উভয়েরই অপরিচিত, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির কথা লোকে যেমন বুঝে, লোকের নিকট প্রথম ব্যক্তির কথা যেমন সহজ ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা সেরূপ হয় না, আর তজ্জন্য যেমন প্রথম ব্যক্তির সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করা হয়, ঠিক এই কারণেই বেদান্তমতটীও অপর দার্শনিক মত হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা এইজন্য বলি—বেদান্তের প্রয়োজন আছে।

এইবার এই সিদ্ধান্তের ফল দেখ। বেদান্ত ভিন্ন অপর দার্শনিক মতে জীবকুল বহু ও বিভিন্ন বলিয়া, জীবের প্রতি ভালবাসা বৈদান্তিক যে ভাবে করিবেন, অপরে তাহা পারিবেন না। কারণ, বৈদান্তিক

অপরকে ভালবাসিবার সময় অপরকে নিজ আত্মার বিলাস বলিয়া ভালবাসিবেন। অপরে কিন্তু পরস্পরকে পৃথক্ জ্ঞান করেন বলিয়া, অপরকে নিজ আত্মার মত ভালবাসিতে পারিবেন না। কে না জানে, জীবকুল নিজ আত্মাকে যত ভালবাসে, এত আর কাহাকেও ভালবাসে না? এজন্য দয়া, পরোপকার, দান প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের মাত্রা বৈদান্তিক ব্যক্তির হৃদয়ে যত স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, অপরের তাহা পারে না। দেখ—কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় বৈদান্তিক যত সক্ষম হইবেন, অপরে কখনই তত হইতে পারেন না। কে না জানে, কর্ত্তব্যপালনে প্রথমে দুঃখ, পরে সুখ হয়? ইহাতে ইহজগতে যখন দুঃখ, তখন পরজগতে সুখ হয়; ইহাতে কখনই প্রথমাবধি সুখ হয় না। বৈদান্তিক কিন্তু এই কর্ত্তব্যপালনে যখন ব্রতী হইবেন, তখন তিনি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত যে ভাবে আলিঙ্গন বা উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবেন, অপর দার্শনিক কখনই সেরূপ পারিবেন না। কারণ, বেদান্তমতে দুঃখ ও মৃত্যুর যাহা হেতু, দুঃখ ও মৃত্যুর যাহা জনক, সে সকলই ব্রহ্ম। বেদান্তবাদীর দৃষ্টিতে সবই ব্রহ্ম। অপরবাদী অবশ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবেন বটে, কিন্তু তিনি এভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারিবেন না; কারণ, তাঁহার নিকট দুঃখ ও মৃত্যুর হেতুভূত দ্রব্যগুলি সত্য এবং তাঁহা হইতে বিভিন্ন। সুতরাং অপর মত অপেক্ষা বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব অবধারিত; আর সেইজন্যই বলি—বেদান্তের প্রয়োজন আছে।

যদি বল—বৈদান্তিকের নিকট সবই যখন ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন সবই যখন মিথ্যা, তখন তাঁহার আবার ভালবাসা কি? তাঁহার আবার সদ্‌গুণ কি? তাঁহার আবার কর্ত্তব্যপরায়ণতা কি? তাহা হইলে বলিব যে, বৈদান্তিক "সব ব্রহ্ম" ইহা জানিয়া রাখেন এবং যতদিন জীবন থাকে, ততদিন সাধারণ মানবের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহার ফলে তাঁহার মনে আনন্দপ্রবাহ প্রবলবেগে বহিতে থাকে, ভয় ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। বৈদান্তিক রোগ-শোকে বিপদ্-আপদে একেবারে মুগ্ধ হন না; বিপদ্-আপদে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী তখন নীরবে অতি সংগোপনে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—এইরূপ সংগীত শুনাইয়া তাঁহার

সে মোহদুঃখ অপনোদন করিয়া থাকে। কণ্ঠভূষণ কণ্ঠে আছে জানিয়া ভূষণের মিথ্যা অপহরণ-চিন্তা যেমন লোকের দূর হয়, বিপচ্চিন্তাও বৈদান্তিকের হৃদয় হইতে তদ্রূপ দূর হইয়া যায়। দূরদেশস্থ সন্তানের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে মুহ্যমান জনকজননী শোকাভিভূত হইলে, যেমন পুত্র জীবিত আছে,—এই সত্য সংবাদে সুখলাভ করে, বেদান্তমতাবলম্বী সাধক ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জানিয়া তদ্রূপ সুখলাভ করেন। আর যদি বল—এভাবে একজন দ্বৈতবাদীও সকলই ভগবদ্বিধি বা ভগবল্লীলা বলিয়া সুখী হইতে পারে, আমরা বলি, তাহা কতকটা সম্ভব বটে, কিন্তু অদ্বৈতবাদে সে সুখের মাত্রা অধিক। কারণ, তাঁহার মতে জগৎ মিথ্যা, ভগবদ্বিধি বা ভগবল্লীলা—সবই মিথ্যা; সুতরাং দুঃখও মিথ্যা। রাজবিধান বলিয়া রাজদণ্ড সহ্য করিবার কালে যে অপ্রিয় শাস্তিলাভ হয়, স্বপ্নসম মিথ্যা রাজদণ্ডে সেরূপ অপ্রিয় ভাব থাকিতে পারে না। দেখ—আমরা সকলেই একদিন মরিব—এ জ্ঞানসত্ত্বেও যেমন আমরা অমরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি, ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জানিয়াও তদ্রূপ আমরা জগতে সাধারণের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং বৈদান্তিকের ভালবাসা অসম্ভব নহে, কর্ত্তব্যপরায়ণতা অসঙ্গত নহে, সদ্‌গুণরাশি উপেক্ষণীয় নহে। পক্ষান্তরে ইহা বৈদান্তিকে যে মাত্রায় বিকশিত হইতে পারে, অপরবাদীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। এইজন্য বলি—বেদান্তের শ্রেষ্ঠতা অলঙ্ঘনীয়, এইজন্য বলি—বেদান্তের মহত্ত্ব অনতিক্রমণীয়। আর পরিশেষে এইজন্যই বলিতে পারা যায় —অপরাপর বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তেরও প্রয়োজন আছে।

আর যদি বল—বেদান্তে যে জগন্মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য, উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা ত সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। ঐ দেখ—আচার্য্য রামানুজ বেদান্তে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদসিদ্ধান্ত দেখিতে পান, ঐ দেখ—মধ্বমুনি দ্বৈত-বাদই বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, ঐ দেখ—নিম্বার্কাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ভাষ্য করিয়াছেন। ঐ দেখ— মহাপ্রভুচৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ, বেদান্তমত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এসব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

এক প্রকার দ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং বেদান্তে যে অদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট, তাহা বলিল কে? এতদুত্তরে আমরা বলি—বেদান্তে যে অদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আমরা তাহার অতি উত্তম প্রমাণ দিতে পারি, আমরা তাহার একেবারে অকাট্য যুক্তি দিতে সক্ষম।

দেখ—বেদান্ত যেমন অপরাপর দার্শনিকগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন, অপরাপর দর্শনেও তদ্রূপ বেদান্তের মত খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এখন এই সকল দর্শন-প্রণেতা ঋষিকুল যাহাকে বেদান্তমত বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা কোন্ মতটী, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে? সকলেই দেখিবেন—ইহা সেই অদ্বৈতবাদ, ইহা সেই মায়াবাদ, ইহা সেই 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা'-বাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাঠক! অপরাপর দর্শনগুলি পড়িয়া দেখুন, তাঁহারা সকলে বেদান্তের নামে এই মায়াবাদই খণ্ডন করিয়াছেন—এই অদ্বৈতবাদেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ কথাটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বল দেখি—মহর্ষি কপিল, কণাদ, গৌতম, জৈমিনি প্রভৃতি মুনি-ঋষিগণের কথা ঠিক, কি আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের কথা ঠিক? বল দেখি—বেদান্তদর্শন-প্রণেতা ব্যাসের সমসাময়িকগণ ব্যাসকে যতটা বুঝিবেন, উক্ত আচার্য্যগণ ব্যাসের বহুকাল পরে জন্মগ্রহণ করিয়া কি তাঁহাদের অপেক্ষা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন? তাই বলি, মহর্ষি বেদব্যাসের বেদান্তের মত—দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, কোন বাদই নহে, পরন্তু বেদব্যাসের বেদান্তের মত—অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ বা 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা'-বাদ। ইতিপূর্ব্বে আমরা এই বাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছি, সুতরাং এইজন্যই বেদান্তের বিশেষত্ব, এইজন্যই বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এইজন্যই জগতে এত বিদ্যা থাকিতেও বেদান্তের প্রয়োজন অবধারিত।

বৌদ্ধ-কথা।

বোধিসত্ত্ব ও সুজাতা।

['নিদান কথা' হইতে।]

তখন ধনবন্ত সেনানী পরিবার সেনানী পল্লী অন্তর্গত উরুবিল্বে অবস্থান করিতেছিল। সেই সেনানীবংশেই ভগিনী নিবেদিতা সুজাতা—প্রীতিময়ী দেবী, আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

তাহাদেরও আশীর্ব্বাদ কর, জননী চিন্ময়ি, যাহারা তোমায় মৃণ্ময়ীই দেখে! তোমারই তনুই ত সেই দেবীর অঙ্গখানি গড়িয়া তুলিয়াছিল। নন্দনের সুষমা সেই রুচির তনুখানি—সে নন্দন তুমিই।

এমনি করিয়া বালিকা সুজাতা ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। মৃগকস্তুরী—সেই কুমারীহৃদয়, মৃগেরই মত যখন আপন গন্ধে আপনিই বিভোল হইয়া উঠিয়াছিল, দেবতার চরণে তাহার ব্যাকুল গোপন প্রার্থনা এমনি করিয়া নিবেদিত হইয়াছিল—"দেবতা, আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, আমার এই ক্ষুধিত জীবন, মাতৃহৃদয় সার্থক করিয়া তোল।"

কুমারী সুজাতা ন্যগ্রোধ পাদপদেবতার চরণে শরণ লইলেন। দেবতা যদি অভিলাষ পূর্ণ করেন, শতোপচারে বর্ষে বর্ষে পূজিত হইবেন—কৌতুকময়ী সুজাতা মনে মনে প্রতিদানের কল্পনাও সঙ্গোপনে সেই সঙ্গে নিবেদিয়াছিলেন।

দেবতা প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

সুজাতা জননী হইলেন।

বাসন্তী পূর্ণিমা দেবতার পূজার দিন সমাগত হইল। বৎসরান্তে এই বাসন্তী পূর্ণিমা তিথিতেই প্রভু বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।*

দীর্ঘ ছয় বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। এই বাসন্তী পূর্ণিমার শুভ্রতা শুধু বাহিরেই নয়, সমস্ত নিখিলান্তরেরই

* "মাগধেসু উরুবিল্যায়াং বোধিমূলে, মহামুনি, বৈসাখপুন্নমায়াং, সো পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।"—মহাবংশ।

শুভ্রতা। প্রভো, তোমারই দিকে সে এতকাল তা'র অন্ধ হৃদয়খানি উন্মুখ করিয়া ধরিয়া আছে. তোমার জ্যোতির স্পর্শে সেও জ্যোতিষ্মান্ হইবে—তা'র হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হইবে। ওগো আলোকের দেবতা, জগতের দ্বারে তোমার আগমনী তা'র পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুণ্যময় করিয়া তুলুক, ধন্য করিয়া তুলুক।

"সখি পুন্না, আজ বাসন্তী পূর্ণিমা, দেবতার পূজার দিন। আজ দেবতাকে তৃপ্ত করিব।"

ভগিনী সুজাতা মহানসে প্রভুর সেবার অমৃতান্ন রন্ধনের উদ্যোগ করিলেন।

বিশ্বের ক্ষুধানিবৃত্তির আয়োজন—তাইত প্রভুর এ ক্ষুধার অভিনয়। দেবগণ সুজাতার রন্ধনশালায় প্রচ্ছন্ন আগমন করিলেন। এ ক্ষুধার অন্ন দেবতারাই রন্ধন করিবেন।

"পুন্না, একি রহস্য! অলৌকিক এ কি রন্ধনপদ্ধতি!" বিস্মিতা ভক্তিপূতা সুজাতা অন্তরের দেবতার মুখপানে চাহিলেন।

দেবতারই বাণী পুন্না নিবেদিলেন,

"আর্য্যে, দেবতা আজি প্রসন্ন।"

দাসী পুন্না ন্যগ্রোধ পাদপোদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। শুভ্র, সদ্যস্নাত, জ্যোতির্ম্ময় প্রভু বোধিসত্ত্বকে পুন্না পাদপমূলে নিরীক্ষণ করিলেন। জ্যোতিরুদ্ভাসিত ন্যগ্রোধ দ্রুমদেশ পুন্নার নয়ন মন উদ্ভাসিত করিল।

"কি আনন্দ! দেবতা আপন হাতেই আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন, কি আনন্দ!"

আনন্দময়ী পুন্না সুজাতার চরণে আনন্দসংবাদ নিবেদন করিলেন।

আত্মহারা সুজাতা হেমপাত্র পূরিয়া অমৃতান্ন বহিয়া প্রভুর চরণে উপনীত হইলেন।

নয়নের ধারা নিখিলবিশ্বে যবনিকা টানিয়া দিল, বাক্যহারা কণ্ঠ শব্দময়ী ধরণীকে অতল, অটল, একখানি শান্ত শুদ্ধ অনুভূতিতে পরিণত করিল। সেই সর্ব্বহারা, সর্ব্বময়, আপনাতে হারা আপনি, বিরাট্ মহাব্যোমে উদ্ভাসিত জ্যোতিষ্মান্ আনন্দঘন প্রভুর চরণে সুজাতার আত্ম-

সমর্পণ হইল। শুভ্র হাত দু'খানি—চেতনার জাগ্রত ইচ্ছা, জীবনমথিত ভক্তিসুধা হেমপাত্রপূর্ণ অমৃতায় প্রভুর হাতে সঁপিয়া দিল। প্রভু অঞ্জলি পূরিয়া সে অমৃত পান করিলেন।

তৃপ্ত বোধিসত্ত্ব, তৃপ্ত নিখিলবিশ্ব। বিশ্বের ভগিনী সে অমৃত পান করাইলেন। এই অমৃতই প্রভুর অমৃতত্বলাভের সূচনা করিয়া দিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

যশোহর জেলার অন্তর্গত হরিণাকুণ্ড গ্রামে কয়েকটী উৎসাহশীল যুবক বিগত ১৩১৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশানুযায়ী "দরিদ্র নারায়ণ" সেবার উদ্দেশে "বিবেকানন্দ সমিতি" নামে একটী ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপন করিয়া সামান্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই নিষ্কাম সদনুষ্ঠানের ক্রমেই উন্নতি ও বিস্তার হইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ইঁহারা সুবিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্য পাইয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মে পর্য্যন্ত ৫৫৫ জন বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী নরনারীকে বিনা-মূল্যে চিকিৎসা করিতে ও ঔষধদানে সমর্থ হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ইঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ ২৭২।৵৫ ও প্রায় ৭মন চাউল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তন্মধ্যে নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে ২৬৫৵১৫ এবং প্রায় সমুদয় চাউল খরচ হইয়াছে। হস্তে ৭।/১০ এবং সামান্যমাত্র চাউল অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে ইঁহাদের ইচ্ছা—রোগিগণকে রাখিয়া সেবাশুশ্রূষার জন্য একটী ক্ষুদ্র গৃহনির্ম্মাণ এবং একটী অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন। এই কার্য্যে যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক, তাহা গ্রামবাসীর দেওয়া সম্ভব নয়, এই কারণে ইঁহারা সহৃদয় সাধারণের নিকট ঐ বিষয়ের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্পাদক, বিবেকানন্দ সমিতি, হরিণাকুণ্ড (যশোহর) ঠিকানায় সাহায্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে।

কটকে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সেবকসম্প্রদায়ের চতুর্থ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকজন বাঙ্গালী ও উড়িষ্যাবাসী যুবক

ইহাঁরা প্রধান উদ্যোগী। অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্তব্যক্তি ইহার পৃষ্ঠপোষক। এই সম্প্রদায়ের যত্নে একটী বাটী ("রামকৃষ্ণ কুটীর") ভাড়া লইয়া তাহাতে একটী অবৈতনিক ছাত্রাবাস স্থাপন করা হইয়াছে। দরিদ্র-ছাত্রগণের এখানে থাকিতে বাসাভাড়া ও রাঁধুনির খরচ লাগে না।

উপস্থিত ছাত্রসংখ্যা ১৬ জন। এতদ্ব্যতীত এই সম্প্রদায় সংস্কৃত-শিক্ষা ও বিদ্যাবিস্তারকল্পে একটী রামকৃষ্ণটোল ও লাইব্রেরিও স্থাপন করিয়াছেন। সহৃদয় সাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্য ও চাউল-সংগ্রহের উপরই সম্প্রদায়ের নির্ভর। আলোচ্য বর্ষে (১৯১২ খ্রীঃ অব্দে) সর্ব্বশুদ্ধ আয় হয় ১১১০৮/১২পাই, সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয় ৫১১৷/০—হস্তে উদ্বৃত্ত —৫৯৯৷৷০/৭২পাই। অধিক অর্থসাহায্য পাইলে সম্প্রদায় 'কুটীরে' আরও অধিকসংখ্যক ছাত্র লইতে পারেন। আরও ইঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা যাহাতে একটী স্থায়ী ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখানকার একটী প্রধান অভাব দূরীভূত হয়। কিন্তু তজ্জন্য সহৃদয় সাধারণের বিশেষরূপ সাহায্যের প্রয়োজন। আশা করি, ভগবান্ সম্প্রদায়ের শুভসংকল্পে সহায় হইবেন।

বিগত পুনর্যাত্রার দিবস পাথুরিয়াঘাটানিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহীভক্ত শ্রীরঙ্গলাল বসাক বৃদ্ধবয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি শ্রীরাম-কৃষ্ণভক্তগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবাদি অনেক কার্য্যের বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইয়াও ইনি মৃত্যুভয় গ্রাহ্য না করিয়া ভগবদ্গীতাদি শ্রবণ ও মননেই শেষ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

স্বামী সর্ব্বানন্দ মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত টেপিং নামক স্থানের টাউনহলে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন। ১৩ই জুন উক্ত স্থানে তাঁহাকে একটী অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়।

১৪ই জুন—হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব।
১৫ই জুন—ঈশ্বর, আত্মা ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধ।
১৬ই জুন—মুক্তিলাভের উপায়।

স্বামী একণে মাদ্রাজমঠে ফিরিয়া আসিয়া তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৯ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিবস কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণোৎসব হইবে।

সমালোচনা।

ফরাসী বীরাঙ্গনা—বা জোয়ান আর্কের জীবনচরিত ও কার্য্যকলাপ শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোং হইতে শ্রীমহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এস্, সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই মহীয়সী বীরবালিকার বীরত্বকাহিনীর সহিত পরিচিত। গ্রন্থকার ইহার বিষদ সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠককে এই—"একাধারে ভগবৎপ্রেম, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রীতি ও রাজভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ"-স্বরূপ নারীরত্নের সহিত পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতি সরল ও হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় এই অশিক্ষিতা কৃষকবালিকার দৈববাণী শ্রবণে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এবং শত্রুগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিতা হইয়াও ভগবদ্বিশ্বাসে অটল হইয়া অম্লানবদনে উহা সহ্য করিবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পড়িলে নারীজাতির উপর যথার্থই শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থ প্রথম ধারাবাহিকরূপে 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হয়। এক্ষণে সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। ছয়খানি মনোজ্ঞ চিত্রও গ্রন্থের অঙ্গে অলঙ্কারস্বরূপে সংযুক্ত হইয়া উহার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। আশা করি, গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে আদৃত হইবে। গ্রন্থকার আরও কয়েকখানি নারীগৌরব-গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার আভাষ দিয়াছেন—ইহাতে আমরা পরম আনন্দিত। আশা করি, এবার তিনি প্রাচ্যদেশ হইতেই তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিবেন। কারণ, যদিও উত্তম আদর্শচরিত্র সর্ব্বস্থান হইতে সংগৃহীত করা যায়, তথাপি ঘরের আদর্শ আমাদের যত প্রকৃতিসঙ্গত ও অনুকরণীয় হয়, বাহিরের আদর্শ তত নহে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের মধুর-ভাব সাধন।

(স্বামী সারদানন্দ।)

ঠাকুরের শুদ্ধ একাগ্রমনে যখন যে কোন ভাবের উদয় হইত, তাহাতেই তখন তিনি এককালে তন্ময় হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিতেন। ঐ ভাবই তখন তাঁহার মনে পূর্ণাধিকার স্থাপনপূর্ব্বক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার শরীরকে নিজ প্রভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহারই প্রকাশানুরূপ পূর্ণাবয়ব যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিত। ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিবার কালেও তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা নিত্য পাইতাম। দেখিতাম, সঙ্গীতাদি শ্রবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার মন ভাববিশেষে মগ্ন হইবার কালে যদি কেহ সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তিনি মনে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। একভাবে প্রবাহিত চিত্তবৃত্তি-সকলের সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে তাঁহার ঐরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য। মহামুনি পতঞ্জলি, একই ভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্পক সমাধিস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ভক্তিগ্রন্থসকলে ঐ সমাধিই ভাব-সমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্থ ছিল।

সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইবার কাল হইতে তাঁহার মনের পূর্ব্বোক্ত স্বভাব এক অপূর্ব্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ, দেখা যায়,—ঐকালে তাঁহার মন পূর্ব্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ মাত্র অবস্থান

করিয়াই অন্য ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে না; কিন্তু কোন এক ভাবাবিষ্ট হইয়া যতক্ষণ না ঐ ভাবের চরমসীমায় উপনীত হইয়া অদ্বৈত-ভাবের আভাষ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। দেখনা—দাস্যভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি মাতৃভাবোপলব্ধি করিতে অগ্রসর হন নাই; আবার তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃভাবসাধনার চরমোপলব্ধি না করিয়া বাৎসল্যাদি ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার সাধনকালের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ঐরূপ সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অনুধ্যানেই পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ, স্ত্রীমূর্ত্তিসকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্রেই তিনি যে মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে এককালে ব্রাহ্মণীর বালক বলিয়া উপলব্ধি করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার ক্রোড়ে পর্য্যন্ত উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যে ঐজন্যই—একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ভাবকুশলা ব্রাহ্মণী এইকালে কখন কখন ব্রজগোপিকা-গণের ভাবে আবিষ্টা হইয়া মধুররসাত্মক সঙ্গীতসকল আরম্ভ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে ঐভাব সম্বরণপূর্ব্বক মাতৃভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্য সাগ্রহে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাযথ বুঝিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ের গভীরোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। এই ঘটনা অবশ্য ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূর্ব্বের কথা এবং ঠাকুরের মনে 'ভাবের ঘরে চুরি' যে বিন্দুমাত্রও কোনকালে ছিল না, একথাই উহাতে বুঝিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাৎসল্য ও মধুর ভাব সাধনে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব শেষোক্ত

সাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেই সকল কথাই আমরা এখন বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিতে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়,— আমরা যাহাকে 'নিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায় তদ্রূপ অবস্থা-সম্পন্ন হইলেও, কেমন করিয়া আজীবন শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। গুরুগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যে সকল সাধনানুষ্ঠানসমূহে রত হইয়াছিলেন, সে সকলও কখন শাস্ত্রবিরোধী না হইয়া উহার অনুগামীই হইয়াছিল। 'ভাবের ঘরে চুরি' না রাখিয়া শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে ঐরূপই যে হইয়া থাকে, তাঁহার জীবনের ঐ ঘটনা তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। হইবারই কথা, কারণ, শাস্ত্রসমূহ ঐভাবেই যে বহুপূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল অথবা ঐরূপ হৃদয়ের সত্যলাভের চেষ্টা ও উপলব্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইয়াই যে পরে 'শাস্ত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, একথা স্বল্প চিন্তার ফলেই বুঝিতে পারা যায়। স্বাধ্যায়সম্পন্ন না হইয়াও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপলব্ধিসকলের যথাযথ অনুভূতি করায়, ঠাকুরের অলৌকিক জীবনের দ্বারা শাস্ত্রসমূহের সত্যতাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ঐকথা নির্দ্দেশ করিয়া সেজন্যই বলিয়াছেন,— ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থা ও উপলব্ধিসমূহকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য।

পূর্ব্বোক্ত কথার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে, ভাবের প্রেরণায় ঠাকুরের একের পর অন্য করিয়া নানা ভেক্ বা বেশ গ্রহণের কথার উল্লেখ করিতে পারি। ঋষিগণ উপনিষদ্মুখে বলিয়াছেন,—'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'* সিদ্ধ হওয়া যায় না। ঠাকুরের জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়,— তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবানুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছিলেন। যথা—তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি

* মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৪

রক্তবস্ত্র, বিভূতি, সিন্দূর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়াছিলেন; বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরুপরম্পরাপ্রসিদ্ধ ভেক্ বা তদনুকূল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দনতুলসী-মাল্যাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়াছিলেন; বেদান্তোক্ত অদ্বৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কাষায় ধারণ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। শুদ্ধ তাহাই নহে, তিনি পুংভাবসমূহের সাধনকালে যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্ত্রীজনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভূষায় আপনাকে সজ্জিত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার শিক্ষা দিয়াছেন,—লজ্জা ঘৃণা ভয় এবং জন্ম-জন্মা-গত জাতি-কুল-শীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না করিলে, কেহ কখন ঈশ্বরলাভ-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এ শিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন কায়-মনোবাক্যে কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার ঐরূপে বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্য্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আমরা দেখিতে পাই, মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইবামাত্র ঠাকুর ঐরূপে স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এবং তাঁহার পরমভক্ত মথুরানাথ তাঁহাকে কখন বহুমূল্য বারাণসী সাড়ী এবং কখন ঘাগ্‌রা, ওড়্‌না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত করিয়া সুখী হইতেছেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, 'বাবা'র রমণীবেশ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিত করিতেছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান্ মথুরের ঐরূপ দান, ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে দুষ্টচিত্তদিগকে অবসর দিয়াছিল; কিন্তু ঠাকুর ও মথুরানাথ সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরানাথ 'বাবা'র পরিতৃপ্তিতে এবং 'তিনি যে উহা নিরর্থক করিতেছেন না'—এই বিশ্বাসে পরমসুখী হইয়া-ছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া একাদিক্রমে ছয় মাস কাল অবস্থানপূর্ব্বক দিনের পর দিন শ্রীহরির প্রেমে লোলুপা

ব্রজরমণীর ভাবে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনাকে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল।

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? কিন্তু ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গ-ভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে, এককালে ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনাও যে এখন বাস্তবিক সম্ভব হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর এবং হৃদয়—উভয়ের নিকটেই বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতেও দেখিয়াছি। দেখিয়াছি,—তখন উহা এতদূর সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন।

এই সময়ে ঠাকুর কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ বাটীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরানাথের পুরাঙ্গনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন পূতচরিত্রের কথা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন আবার তাঁহার স্ত্রীসুলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম যত্ন ও স্নেহে তাঁহারা এতদূর মুগ্ধা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আপনাদিগেরই অন্যতম বলিয়া নিশ্চয় ধারণাপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে লজ্জা-সঙ্কোচাদি আবরণের কিছুমাত্র রক্ষা করিতে সমর্থা হয়েন নাই। * ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—শ্রীযুক্ত মথুরের কন্যাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবাজার-ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশ-ভূষাদি নিজ হস্তে সম্পাদন ও স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক তাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৭ম অধ্যায় পৃঃ ১৯৯-২০১।

পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেন,—'তাহারাও তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না!'

হৃদয় বলিতেন,—"ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার পরমাত্মীয়দিগের পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুর বাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্‌টি?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য-সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাঁহাকে সহসা চিনিয়া লইতে পারি নাই। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় তাঁহার বামপদই প্রতিবার অগ্রসর হইতেছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিতেন,—'ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে!' ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এই কালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীকে সজ্জিত করিতেন এবং কখন কখন শ্রীশ্রীজগদম্বাকেও ঐরূপে সাজাইয়া ৺কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সকরুণ প্রার্থনা করিতেন।"

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবা পূজাদিও ঠাকুর এখন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ও তাঁহাকে স্বীয় বল্লভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে সম্পাদনপূর্ব্বক অনন্য-চিত্তে শ্রীশ্রীযুগলপাদপদ্মসেবায় রত হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিবা কিম্বা রাত্রি—কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ বা মাসান্তেও অবিশ্বাসপ্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে ঐ প্রার্থনা আকুল ক্রন্দনে এবং ঐ প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাঁহার আহারনিদ্রাদির পর্য্যন্ত লোপ সাধন করিয়াছিল। আর

বিরহ?--নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিঘ্ন-বাধায় প্রতিরুদ্ধ হইলে মানবের হৃদয়-মন-মথনকরী শরীরেন্দ্রিয়-বিকলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ? উহা তাঁহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্ব্বাবস্থায় অনুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জ্বালারূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে; ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি,—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে তাঁহার শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্তনির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থিসকল শিথিল বা ভগ্নপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায়, দেহ কখন কখন মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত!

দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ, তন্মাত্রৈকবুদ্ধি মানব আমরা, প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি। অথবা জীবনপাতী চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া উহার আখ্যা প্রদান-পূর্ব্বক উহার কতই না যশোগান করি। কিন্তু আমাদিগের কবি-কুলবন্দিত ঐ অতীন্দ্রিয় প্রেম যে স্থূল দেহবুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ভোগ-লালসা-পরিশূন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় এবং অন্তঃসারশূন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়!

ভক্তিগ্রন্থসকলে উল্লিখিত আছে, ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীই কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জা ঘৃণা ভয় ছাড়িয়া, লোকভয়—সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল শীল পদ-মর্য্যাদাদি সকল বাহ্য বিষয় ভুলিয়া এবং নিজ দেহ-মনের ভোগসুখের কথা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখেই কেবল-

মাত্র আপনাকে সুখী অনুভব করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে আর পাওয়া যায় না। কথিত আছে, সেজন্য, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ঐ প্রেমের আংশিক উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিতে জগতে কেহ কখন সমর্থ হয় না। কারণ, সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমে চিরকাল সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ বা বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। অতএব প্রেমঘনতনু শ্রীমতীর প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে, কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং ঐ প্রেমের পূর্ণ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত কথার ইহাই যে অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা যায়।

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের জনসাধারণ উহা কিরূপে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহা বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে শ্রীমতীর সহিত পুনরায় একশরীরালম্বনে একাধারে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল এবং অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধা রূপে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবই, মধুরভাবের প্রেমাদর্শ শিক্ষা দিয়া লোককল্যাণসাধনের জন্য আবির্ভূত শ্রীভগবানের ঐ অপূর্ব্ব বিগ্রহ। তাঁহারা একথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে শ্রীমতী রাধারাণীর শরীর-মনে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবে সে সমস্ত লক্ষণই ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবির্ভূত হইয়াছিল। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শরীর-মনে প্রকাশিত মধুরভাবোত্থ ভক্তিলক্ষণসকলের প্রকাশ দেখিয়াই যে, তাঁহারা তাঁহাতে শ্রীমতীর আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং ঐজন্যই যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঐরূপ অতীন্দ্রিয় প্রেমাদর্শের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সে যাহা হউক, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া, ঠাকুর এখন তদ্গতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমঘন মূর্ত্তির স্মরণ মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া,তাঁহার শ্রীপাদপদ্মেই নিজ হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর কামগন্ধহীন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে অন্যান্য দেবদেবী-সকলের দর্শনকালে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও তিনি সেইরূপে ঐ মূর্ত্তি নিজাঙ্গে সম্মিলিত হইয়া যাইল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন,—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব ; তবে মনে আছে, শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিল।

এখন হইতে ঠাকুর ভাবাবেশে আপনাকে শ্রীমতী বলিয়াই উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমূর্ত্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ব-বোধ এককালে হারাইয়াই যে এখন তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধুরভাবোত্থ ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অনুরূপ সুগভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। কারণ, ঐ অবস্থার পর হইতেই শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত ঊনবিংশ প্রকার শারীরিক লক্ষণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণব-তন্ত্রনিপুণা ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণবচরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় ঐ সকল লক্ষণেরই আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর স্বয়ংও তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত ঊনবিংশলক্ষণসমন্বিত মহাভাবের উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছেন,—"সাধন

করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐ প্রকার উনিশটি ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।”

শ্রীকৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—উহা মহাভাবের পরাকাষ্ঠায় এই কালেই সংঘটিত হইয়াছিল। আবার, আপনাকে প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখন আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় কার্য্যকলাপে তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত! আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছি,—স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোমকূপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় প্রতিবারই উপর্য্যুপরি দিবসত্রয় ঐরূপ হইত! তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছেন,—তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন।

বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মনই তাহার শরীরকে বর্ত্তমান আকারে সৃষ্টি করিয়াছে, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'। এবং তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর মনের ঐরূপ প্রভুত্বের কথা, বদ্ধজীব আমরা শুনিলেও, বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ, যেরূপ তীব্র বাসনা উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষয়-বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় ও নিজ শক্তি প্রকাশ করে, সেইরূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যই অনুভব করি না! বিষয়-বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর স্বল্পকালেই ঐরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত কথা যে সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। পদ্মলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপূর্ব্বক বেদ

পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সিদ্ধ ঋষিকুলের ঐ বিষয়ের উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে!" মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের শারীরিক পরিবর্ত্তনসকলের অনুশীলনে তদ্রূপ স্তম্ভিত হইয়া বলিতে হয়,—তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহ বিজ্ঞানরাজ্যে অপূর্ব্ব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম পরিশুদ্ধ ও ঘনীভূত হওয়াতেই, ঠাকুর ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রভাবে স্বল্পকাল পরেই সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দৃষ্ট মূর্ত্তি অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গেই মিলিত হইয়াছিল। ঐ দর্শন লাভের দুই তিন মাস পরে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী আসিয়া তাঁহাকে বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাব সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাই-তেছে,—মধুরভাব সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসম্ভোগে কাল যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—ঐ কালে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় এককালে তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব-বোধ হারাইয়া কখন আপনাকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিয়া-ছেন, আবার কখন বা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলকেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন করি, তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটি ঘাসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে) যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতাম, তাঁহার অঙ্গের এই রকম রং ছিল।"

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় বাল্যে কামারপুকুরে বাস করিবার কাল হইতে ঠাকুরের মনে এক প্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজ-গোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া, ঠাকুরের মনে হইত, তিনিও যদি ঐরূপে স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে

গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজনা ও লাভ করিতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃষ্ণলাভের পথেব অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া, তিনি কখন কখন কল্পনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমা সুন্দরী কড়ের্ঁাড়ী (বাল-বিধবা) হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। শুদ্ধ তাহাই নহে, মোটা ভাত কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়ে ঘরেব পার্শ্বে দুই এক কাঠা জমীও থাকিবে— যাহাতে নিজ হস্তে দুই পাঁচ প্রকার শাকসবজী নিজ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটি গাভী—যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন করিতে পারিবেন এবং একখানি সূতা কাটিবার চরকাও থাকিবে। বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনেব বেলা গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকার সূতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া ঐ সকল গ্রহণ করিবেন এবং ঐরূপে অপরের অগোচরে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐ ভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব-সাধনকালে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটী দর্শনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্ত্তমান বিষয়ের উপসংহার কবিব। ঐকালে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ মূর্ত্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ায় মত একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থে আসিয়া পতিত হইল এবং পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রহিল।

ঠাকুর বলিতেন,—ঐরূপ দর্শন করিয়া অবধি তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্, ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণপূর্ব্বক বিদ্যমান থাকিলেও, তিনই এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশ সম্ভূত। "ভাগবত (শাস্ত্র) ভক্ত ও ভগবান্, তিনই এক, একই তিন।"

জড় ভরতের উপাখ্যান।

(কালিফোর্ণিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

প্রাচীনকালে ভরত নামে এক প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। বৈদেশিকগণ যাহাকে 'ইণ্ডিয়া' নামে অভিহিত করেন, তাহা তদ্দেশবাসিগণের নিকট ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। তখন শাস্ত্রের শাসনানুসারে, বৃদ্ধ হইলে সকল আর্য্যসন্তানকেই সংসার ছাড়িয়া নিজ পুত্রের উপর সংসারের সমুদয় ভার—ঐশ্বর্য্য ধন সম্পত্তি সব তাহাকে সমর্পণ করিয়া—বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। তথায় তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ আত্মার তত্ত্বচিন্তায় কালক্ষেপণ করিতে হইত - এইরূপে তিনি সংসারের বন্ধন ছেদন করিতেন। রাজাই হউন, পুরোহিতই হউন, কৃষকই হউন, দাসই হউন, পুরুষই হউন বা স্ত্রীই হউন, কাহারও এই শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিবার সাধ্য ছিল না। কারণ, গৃহস্থের সমুদয় অনুষ্ঠান—পিতামাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, স্বামীস্ত্রী, পুত্রকন্যা সকলেরই অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য—সেই এক চরম অবস্থার সোপানস্বরূপমাত্র—যে অবস্থায় মানবের জড়বন্ধন একেবারে চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া যায়।

রাজা ভরত বৃদ্ধ হইলে, পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গমন করিলেন। এক সময়ে যিনি লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন, যিনি সুবর্ণরজতখচিত মর্ম্মরপ্রাসাদে বাস করিতেন, যাঁহার পানপাত্র নানাবিধ রত্নখচিত ছিল, তিনি হিমারণ্যের এক স্রোতস্বিনি-

তীরে কুশ ও তৃণযোগে স্বহস্তে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। এবং তথায় বাস করিয়া স্বহস্তে বন্য ফল মূল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। মানবাত্মায় যিনি অন্তর্যামিরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই পরমাত্মার অহরহঃ স্মরণ মননই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইল। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন রাজর্ষি নদীতীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় তথায় এক হরিণী জলপানার্থ সমাগতা হইল। ঠিক সেই সময়েই কিছুদূরে একটী সিংহ প্রবল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হরিণী এত ভীতা হইল যে, সে পিপাসা-শান্তি না করিয়াই, নদীপার হইবার জন্য উচ্চলম্ফ প্রদান করিল। সেই হরিণী আসন্নপ্রসবা ছিল—এইরূপে হঠাৎ ভয় পাওয়াতে এবং লম্ফপ্রদানের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তৎক্ষণাৎ সে একটী শাবক প্রসব করিয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হইল। হরিণশাবকটী প্রসূত হইয়াই জলে পড়িয়াছিল—নদীর প্রবল তরঙ্গে তাহাকে প্রবলবেগে একদিকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে রাজার দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল। রাজা নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া হরিণশাবকটীকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন, পরে নিজ কুটীরে লইয়া গিয়া অগ্নিসেকাদি বিবিধ যত্ন ও শুশ্রূষাসহকারে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। করুণ-হৃদয় রাজর্ষি অতঃপর হরিণশিশুটীর লালনপালনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন—প্রত্যহ তাহার জন্য সুকোমল তৃণ ও ফলমূলাদি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সংসারোপরত রাজর্ষির জনকসুলভ যত্নে হরিণশিশুটী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল - পরি-শেষে সে একটী সুন্দরকায় হরিণ হইয়া দাঁড়াইল। যে রাজা নিজ মনের তেজে পরিবার, রাজ্যসম্পদ্, অতুল বিভব ও ঐশ্বর্য্যের উপর চিরজীবনের মমতা কাটাইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে নদী হইতে তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত মৃগটীর উপর আসক্ত হইয়া পড়িলেন। হরিণের উপর তাঁহার স্নেহ যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করিতে অক্ষম হইতে লাগিলেন। বনে চরিতে গিয়া যদি হরিণটীর

ফিরিতে বিলম্ব হইত, তবে রাজর্ষির মন তাহার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইত। তিনি ভাবিতেন,—"আহা, বুঝি আমার প্রিয় হরিণটীকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া থাকিবে, অথবা হয়ত তাহার অন্য কোনরূপ বিপৎ-পাত হইয়াছে—নতুবা তাহার ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?"

এইরূপে কয়েক বর্ষ কাটিয়া গেল। অবশেষে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে রাজর্ষির মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার মন মৃত্যু-কালেও আত্মতত্ত্বধ্যানে নিযুক্ত না হইয়া হরিণটীর চিন্তায়ই নিযুক্ত ছিল। নিজ প্রিয়তম মৃগটীর কাতর নয়নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার জীবাত্মা দেহত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে হরিণভাবনার ফলে পরজন্মে তাঁহার হরিণ-জন্ম হইল। কিন্তু কোন কর্ম্মই একেবারে ব্যর্থ হয় না। সুতরাং রাজর্ষি ভরত গৃহস্থাশ্রমে রাজারূপে এবং বান-প্রস্থাশ্রমে ঋষিরূপে যে সকল মহৎ শুভকার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন, তাহারও ফল ফলিল—যদিও তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পশুশরীর পরিগ্রহ করিলেন, কিন্তু তিনি জাতিস্মর হইলেন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সমুদয় কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত রহিল। তিনি নিজ সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বসংস্কারবশে ঋষিগণের আশ্রমের নিকট চরিতে যাইতেন, যথায় প্রত্যহ যাগ-হোম ও উপনিষদালোচনা হইত।

মৃগরূপী ভরত যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পরজন্মে কোন ধনী ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মেও তিনি জাতি-স্মর হইলেন—সুতরাং পূর্ব্ববৃত্তান্ত সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকাতে, তাঁহার বাল্যকাল হইতেই এই দৃঢ় সংকল্প হইল যে, তিনি আর সংসারের পাপপুণ্যে জড়িত হইবেন না। শিশুর ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইলেন, কিন্তু কাহারও সহিত একটীও বাক্যালাপ করিতেন না—পাছে সংসারজালে জড়িত হইয়া পড়েন, এই ভয়ে তিনি জড় ও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মন সেই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকিত, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্যই তিনি জীবনধারণ করিতেন। কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইল, পুত্রগণ পিতার সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন;—

তাঁহারা তাঁহাদের ঐ সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জড় ও অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়া তৎপ্রাপ্য সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া তাহা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ভ্রাতার প্রতি এইটুকু মাত্র অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে দেহধারণোপযোগী আহার মাত্র দিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়াগণ সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি অতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন,—তাঁহাকে সর্ব্বদা গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, আর যদি তিনি তাঁহাদের সকল কার্য্য খুঁটাইয়া করিতে অক্ষম হইতেন, তবে তাঁহাকে ঘোরতর নির্য্যাতন করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি বা ভয় হইত না, তিনি একটী মাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেন না। যখন অত্যাচারের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হইত, তখন তিনি গৃহ হইতে নিস্তব্ধ-ভাবে বাহির হইয়া গিয়া তাঁহাদের ক্রোধোপশম পর্য্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিতেন—তাঁহাদের রাগ পড়িয়া গেলে আবার শান্তভাবে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন।

একদিন জড়ভরতের ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহাকে অতিবিক্ত তাড়না করিলে, তিনি গৃহের বাহির হইয়া গিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই দেশের রাজা শিবিকাযোগে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একজন শিবিকাবাহক অসুস্থ হইয়া পড়িল, —তখন রাজানুচরবর্গ তাহার স্থানে শিবিকাবাহন কার্য্যের জন্য আর একজন লোক অন্বেষণ করিতে লাগিল ও অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়ভরতকে বৃক্ষতলে অবস্থিত দেখিতে পাইল। তাঁহাকে সবল যুবা পুরুষ দেখিয়া তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসিল, "রাজার এক শিবিকাবাহকের পীড়া হইয়াছে,—তুমি তাহার পরিবর্ত্তে রাজার শিবিকা-বহন করিতে প্রস্তুত কি না?" ভবত তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তাহারা দেখিল, এ ব্যক্তি বেশ হৃষ্টপুষ্ট,—ইহা দেখিয়া রাজানুচরগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিল। ভরতও নীরবে শিবিকাবহন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা দেখিলেন, শিবিকা বিষমভাবে চলিতেছে। শিবিকার বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি নূতন বাহককে দেখিয়া বলিয়া

উঠিলেন, "মূর্খ,—কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর্, যদি তোর স্কন্ধে বেদনা বোধ হইয়া থাকে, তবে খানিকক্ষণ বিশ্রাম কর্।" তখন ভরত স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া জীবনের মধ্যে এই প্রথম মৌনভঙ্গ করিয়া রাজাকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্, আপনি মূর্খ কাহাকে বলিতেছেন? কাহাকে আপনি শিবিকা নামাইতে বলিতেছেন? কে ক্লান্ত হইয়াছে, আপনি বলিতেছেন? আপনি কাহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? হে রাজন্, 'তুই' শব্দের দ্বারা যদি আপনি এই মাংসপিণ্ড দেহটাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখুন, আপনার দেহও যেমন পঞ্চভূতনির্ম্মিত, এই দেহও তদ্রূপ। আর দেহটা ত অচেতন, জড়,—উহার কি কোন প্রকার ক্লান্তি বা কষ্ট থাকিতে পারে? যদি মন আপনার লক্ষ্য হয়, তবে আপনারও মন যেরূপ, আমারও ত তাহাই—উহা ত সর্ব্বব্যাপী। আর যদি 'তুই' শব্দে দেহমনেরও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত উহা সেই আত্মতত্ত্ব—আমার যথার্থ স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে—তাহা আপনাতেও যেমন, আমাতেও তদ্রূপ বর্ত্তমান—জগতের মধ্যে উহাই সেই একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্ব। রাজন্, আপনি কি বলিতে চাহেন,—আত্মা কখনও ক্লান্ত হইতে পারেন? আপনি কি বলিতে চাহেন,—আত্মা কখন আহত হইতে পারেন? হে রাজন্, আমার—এই দেহটার—অসহায় পথসঞ্চারী কীটগুলিকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা ছিল না—সেই কারণে যাহাতে তাহারা পদদলিত না হয়, এইভাবে সাবধান হইয়া চলাতেই শিবিকা বিষম হইয়াছিল। কিন্তু আত্মা ত কখন ক্লান্তি অনুভব করে নাই—উহা কখন দুর্ব্বলতা বোধ করে নাই। কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্।" এইরূপে তিনি আত্মার স্বরূপ, পরা বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন। রাজা পূর্ব্বে বিদ্যা ও জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন—তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইল। তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, ভরতের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে মহাভাগ, আপনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহা না জানিয়াই আপনাকে শিবিকাবহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম—তজ্জন্য

আমি আপনার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।" ভরত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ও পূর্ব্ববৎ আপন ভাবে নীরবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যখন ভরতের দেহপাত হইল, তিনি চিরদিনের জন্য জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন।

বিমলানন্দ।

(২)

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।)

ক্ষয়রোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া সুষমা মরিল,—পলে পলে, তিলে তিলে, পক্ষ, মাস, বর্ষ, মনাগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া চিরদুঃখিনী চিতার আগুনে চরমশান্তি লাভ করিল। পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া গঙ্গাদেবী বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, মাতৃকোলে বালিকা পতির অভাবে যদি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পায়। নিরাশায় বুক বাঁধিয়া মাতাও দুঃখিনী কন্যাকে লইয়া শমনের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রোগ বাগ মানিল না। বিমলা যে সময় বিলাত গমন করে, সেই সময় সুষমার চরম দশা উপস্থিত হইল। বধূর পিত্রালয় গ্রামান্তরে। গঙ্গাদেবী নিত্য দেখিতে যাইতেন। আজ তিনি আসিতেই সুষমা বলিল;— "মা এসেছ! আমায় ভাল করে সাজিয়ে গুজিয়ে দাও, আমায় যেতে হবে।" গঙ্গাদেবী চক্ষের জল চক্ষে সংবরণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"সে কি মা, কোথায় যাবে?"

"তিনি চিঠি লিখেছেন, আমায় ব'লেছেন,—তুমি আগে যাও, ঘর ঘরকন্না পাতো গে, আমি পরে যাচ্চি।" বলিয়া হতভাগিনী বালিশের নীচে এদিক্ ওদিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিল। গঙ্গাদেবী একবার বেহানের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিয়া, অতি স্নেহে বধূর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"কি খুঁজ্‌চো মা?" ক্ষীণ ভগ্নকণ্ঠে সুষমা বলিল,— "তাঁর চিঠি।" সুষমার মাতা যে-সে একখানি কাগজ লইয়া কন্যার

হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এই যে চিঠি"। ক্ষীণ কম্পিতকরে কাগজখানি ধরিয়া শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া সুষমা বলিল,—"এই যে লিখেছেন, এই যে লিখেছেন,—তুমি আগে যাও, ঘরকন্না গোছাও গে, সংসার পাতগে, আমি এলেম ব'লে!" বলিয়া ঝিমাইয়া পড়িল। সেই অবসরে গঙ্গাদেবী বেহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতক্ষণ এমন হয়েছে?" বেহান বলিলেন,—"কাল তুমি যাবার পর থেকে। দিদি কেমন ক'রে আমি এ সোণার চাঁপা ভাসিয়ে দেব?" সুষমা সচকিতে জাগিয়া বলিল,—"ভেসেছে, ভেসেছে! মা, সে অকূলে ভেসেছে, আর কি আমি থাকতে পারি, ওই যে মা, সাম্‌নে অকূল সমুদ্র—জাহাজ চ'লেছে! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও! আমায় তুলে নিয়ে যাও!" বলিতে বলিতে আবার ঝিমাইয়া পড়িল। একটু পরেই জাগিয়া বলিল,—"মা আমায় কিছু খেতে দাও, আর ত খেতে আস্‌বো না, মা, অম্‌নি মুখে যেতে নেই।" পার্শ্বে গঙ্গাজলমিশ্রিত দুগ্ধ ছিল, গঙ্গাদেবী অতিযত্নে এক ঝিনুক মুখে দিলেন। সমস্ত উদরস্থ হইল না, তথাপি "আঃ" বলিয়া যেন শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। শয্যার একপার্শ্বে গঙ্গাদেবী, অপর পার্শ্বে সুষমার মাতা নীরবে বসিয়া অজস্র নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সুষমা আবার জাগিয়া উঠিল। ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাতা ও শ্বশ্রূকে দেখিতে লাগিল। দৃষ্টি যেন প্রশ্ন করিতেছে,—তোমরা কে? অল্পক্ষণ পরেই বালিকার দৃষ্টি দ্বারদেশে নিক্ষিপ্ত হইল। অমনি সেই মৃত্যু-কালিমা-অঙ্কিত মুখে মেঘান্তরিত রৌদ্রের মত ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। অতিমৃদু অস্পষ্টকণ্ঠে বলিল,—"তুমি এসেছ?" পরে একখানি হস্ত বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া বলিল,—"এই দেখ তোমার চিঠিগুলি সব আমি বুকে ক'রে রেখেছি।" আর একখানি হস্ত অতি কষ্টে তুলিয়া বলিল,—"আমায় তুলে নিয়ে যাও।" কম্পিত হস্ত পড়িয়া গেল। মুখে আবার সেই হাসি দেখা দিল। একটি মাত্র দীর্ঘ শ্বাস;—সব ফুরাইল! পতির পত্রগুলি বুকে করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ব্যথিতা বালিকা দুঃখের সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া কোন্ অজানিত দেশে অভিনব সুখের সংসার পাতিতে চলিয়া গেল। বধূর মৃত্যুর পর গঙ্গাদেবীও দেশ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

যথাসময়ে বিমলানন্দ সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলেন। "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!" করিয়া, রুমাল উড়াইয়া, বিড়ি টানিয়া বড়্ বড়্ করিয়া বকিতে বকিতে, নলিনীকান্ত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। ভাগ্যদেবী যেন বিমলার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন, আসিবামাত্রই তাঁহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার ত্বরিত উন্নতি দর্শনে বঙ্গদেশ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। বিমলানন্দ অসামান্য কৃতিত্বের সহিত বিচার-বিভাগে কার্য্য করিতে লাগিলেন। অতি দক্ষ বিচারপতি, তাঁহার কাছে আইনের ফাঁকি চলে না, কৌঁসুলির বুলি ব্যর্থ হয়; নব্য বিচারকের অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সমক্ষে প্রবীণ উকিল ব্যারিষ্টারগণ কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। পক্ষপাতশূন্য বিচারে, বিধি-বিধানের অব্যর্থ প্রয়োগে প্রিভি কাউন্সিলে বিমলানন্দের সুখ্যাতি হইল। বিমলানন্দ ভাবিয়াছিলেন,—অবস্থায় পড়িয়া অতীত জীবনে তাঁহার চরিত্রে যে কালিমা লাগিয়াছে, কর্ত্তব্যপালনে তাহা ধুইয়া ফেলিবেন; কিন্তু অতীত স্বেচ্ছায় অপনীত হইবার নহে। ভুলিব মনে করিলেই ভোলা যায় না। একবার এক তরুণ যুবক গুরুতর প্রবঞ্চনার অভি-যোগে দায়রা সোপর্দ্দ হয়। বিমলানন্দ সেসনে বসিয়াছেন। মোকর্দ্দমা উঠিতেই যুবা করযোড়ে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল,—সে ভদ্রসন্তান—বাড়ী কোনও পাড়াগাঁয়ে—ঘরে বৃদ্ধা মাতা, অতি দরিদ্র অবস্থা—উপার্জ্জন আকাঙ্ক্ষায় কলিকাতায় আসিয়াছিল। অসহায় অবস্থায় অনাহারে অনিদ্রায় বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া সে অপকর্ম্ম করিয়াছে। বিচারপতি রায় লিখিতে বসিলেন, কিন্তু সহসা হাত থামিয়া গেল। মানবের অন্তস্তলে এক সূক্ষ্ম বিচারপতি বাস করেন,—অন্তরের সেই নিভৃত প্রদেশ হইতে তিনি সহসা বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাপু হে, কলিকাতায় প্রথম আসিবার দিনটা স্মরণ আছে ত? সেই ব্যাচিলার্ মেসের কথাটা? রায় লেখা বন্ধ করিয়া বিমলানন্দ ভাবিতে লাগিলেন,—সত্য, ন্যায় বিচার করিতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য? আগে আপনাকে দণ্ড নিতে হয়। এ যুবক অবস্থার পীড়নে একদিন প্রবঞ্চনা করিয়াছে, আর তিনি আজীবন প্রবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছেন। যাহার অপরাধ বেশী সে

আজ বিচারাসনে; যাহার অপরাধ কম, সে বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কথাটা অতি গুরুতররূপে তাঁহার মনের ভিতর তোলাপাড়া হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন,—আমি আইনের দাস—অপরাধীর বিচার করিতে বাধ্য, ব্যক্তিগত উদাহরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সাফাই সাক্ষী বড় মনঃপূত হইল না। মনে নানা তর্ক উঠিতে লাগিল। তখন উকীল ব্যারিষ্টার কুতূহলী হইয়া ভাবিতেছে—সামান্য মোকদ্দমা, ইহার ভিতর এত কি জটিল তত্ত্ব আছে। উকীল ব্যারিষ্টারের কুতূহলদৃষ্টি দেখিয়া বিমলানন্দ আবার কলম ধরিলেন। কিন্তু রায় লেখা হইল না। সহসা 'বেকসুর খালাস' বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সেদিনকার মত সেসন বন্ধ রহিল।

আর একদিন, দিনের কঠোর পরিশ্রমান্তে বিমলা গৃহে ফিরিয়াছেন, কিছুক্ষণের জন্য শ্রম দূর করিতে উদ্যানে বসিয়াছেন। সুন্দর রাত্রি, সুন্দর আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে, সুন্দর বাতাসে সুন্দর ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, সুন্দরী রমা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছে। বিমলা-নন্দের বহিশ্চক্ষু এই সকল সৌন্দর্য্যের উপর নিপতিত সত্য; কিন্তু তাঁহার অন্তশ্চক্ষু আর একটি সুন্দর ছবি দেখিতেছে—যৌবনোন্মুখী একটি বালিকার একখানি মুখ। বিমলানন্দ সহস্র চেষ্টায় সে মুখ ভুলিতে পারেন না। দিবসে কার্য্যের বশে যখন তিনি ব্যস্ত থাকেন, সে মুখ তাঁর হৃদয়ের কোন্ গুপ্ত গুহায় লুকাইয়া থাকে। রমার সহিত সম্মিলিত হইলেই, সেই মুখখানি আপনা আপনি আসিয়া উদয় হয়।

মনে উদয় হয় আর একখানি মুখ—যে দেব-প্রভান্বিত সুন্দর মুখ দর্শন-শক্তি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিমলা প্রথম দেখিয়াছিলেন, অসহায় শৈশবে যে মুখ তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল, যে মুখ তাঁহার বাল্যের আলোক, কৈশোরের সুখস্মৃতি, যে মুখ শয্যাপার্শ্বে না দেখিলে তাঁহার সুখে নিদ্রা হইত না, রন্ধনশালায় না দেখিলে তৃপ্তিতে ভোজন হইত না, পৃথিবীর অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, যে কোমল করুণাদীপ্ত মুখের মত মুখ তিনি আর কোথাও দেখিতে পান নাই, কলিকাতার মেসে যে মুখ প্রত্যাখ্যাত হইয়া চলিতে চলিতে বার বার

ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছে; উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, সে মুখ তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে না।

বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া বিমলানন্দ এই দুইখানি মুখের তত্ত্ব লইয়াছেন, জানিয়াছেন—একখানি মুখ, অনেক দিন হইল, ইহ সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আর একখানি মুখ এখন কোথায় কি ভাবে বিরাজ করিতেছে, দক্ষ অনুসন্ধানকারীও তাহার সন্ধান দিতে সমর্থ নয়।

বিমলানন্দের বহু বন্ধুবান্ধব জুটিয়াছিল, তাহারা তাঁহার বাটীতে আসিয়া ভোজ খাইত, আমোদ করিত, চলিয়া যাইত, কেহ ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিতে পারিত না। যে বিশ্বাস, পরকে আপনার করে, যে সহৃদয়তা সৌহার্দ্দের মূল, বিমলার তাহা ছিল না। তার উপর তাঁর কি একটা ভাব ছিল, যাহা সকলকে দূরে রাখিত। সেজন্য তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু কেহ ছিল না। বিমলা বিশ্বাস করিয়া কাহারও বাড়ী আহার করিতেন না, পাছে আহার্য্যের সহিত বিষ দিয়া কেহ তাঁহাকে হত্যা করে। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে যে আমোদের রোল উঠিত, বিমলা সে আনন্দে যোগ দিতেন না। রমা ও নলিনী অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবদিগকে আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিতেন, বিচারালয়ের জজ সাহেব গৃহেও জজ সাহেব হইয়া থাকিতেন। এইরূপে বিমলা আপনি আপনার চারিদিকে যে অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেহ তাহা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না,—রমা পর্য্যন্ত নয়। বিমলানন্দ কার্য্য অন্বেষণ করিতেন, কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহার স্কন্ধে ভার চাপাইতে ক্রটি করিতেন না। বিমলা একা তিনজনের কর্ম্মভার বহন করিতেন। একবার কোনও দারুণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে পরিদর্শনে যাইতে হয়, তিন দিনের অধিক তথায় বাস করেন নাই; কিন্তু ফিরিবার সময় শরীর অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। লৌহবৎ দৃঢ় সবল শরীর ছিল, বিমলানন্দ প্রথম এ অসুস্থতাকে গ্রাহ্য করেন নাই। রমা পীড়াপীড়ি করে, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দেন; বলেন,—"তুমি যতই বল, তোমার আর একটা বিবাহ করিবার বয়স থাকিতে থাকিতে আমি

মরিতেছি না।” কিন্তু নলিনী ছাড়িবার পাত্র নয়—তখনও নয়, এখনও নয়; একজন প্রবীণ ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া উপস্থিত। ডাক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সন্ধ্যার সময় আবল্য বোধ হয় কি?”—“একটু।” “হাত পা চোখ জ্বলে?”—“ঈষৎ।” “রাত্রে ঘাম হয়?”—“সামান্য।” ডাক্তার বলিলেন,—“পীড়াও সামান্য বটে, কিন্তু অবহেলা করা উচিত নয়। কিছু দিনের ছুটি নিন্, একটা ওষুধ দেব, নিয়মিতরূপে খাবেন, ভয় নাই।” বিমলানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—“সেকথা আপনি এই পাগলদের বোঝান। এঁরা ভাই বোনে পরামর্শ ক'রেছেন, আমায় শীগ্‌গির শীগ্‌গির সাবাড় কর্‌বেন। শুন্‌লে ত? ডাক্তার সাহেব বল্লেন,—ভয় নেই?” বিমলানন্দ প্রথমে ছুটি লইতে রাজি হন নাই, বলিলেন,—‘ভয় যদি নেই,তবে ওষুধ খাব আবার ছুটি নেব কেন?’ কিন্তু নলিনী ও রমা উভয়ে পীড়াপীড়ি করিয়া ছুটি লওয়াইলেন। দার্জ্জিলিং শৈলে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া হইল—সেই দার্জ্জিলিং শৈল—যেখানে তিনি রমার সন্তোষ সাধনার্থ কতই না প্রয়াস পাইতেন—সেইস্থানে আবার দুইজনে বেড়াইতে লাগিলেন, রমা পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু যেন কে কা'কে বলিতেছে। অভিমানে রমা চুপ্ করে; আধ ঘণ্টা নীরব থাকিবার পর বিমলানন্দ বলেন, “কথা কইতে কইতে চুপ কর্‌লে কেন?” রমা হাসিবে কি কাঁদিবে, তা' ঠিক করিতে পারে না। বলে,—“আমি ত আধ ঘণ্টা চুপ ক'রেছি।” একমাস শৈলবাসে অতিবাহিত করা হইল, ছুটিও ফুরাইল। কিন্তু সে সান্ধ্য অসুস্থতার কিছুই উপশম হইল না। নিয়তির ন্যায় কঠোর, মৃত্যুর ন্যায় নিশ্চিত, সান্ধ্যজ্বর নিত্য আসিয়া বিমলাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তিনি দিন দিন বলহীন হইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কি একটা ছায়া পড়িল,—নলিনী ও রমা দেখিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিত। বিমলানন্দ সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “কি?” উভয়েই ব্যগ্র হইয়া সমস্বরে বলিত,—“কিছু না।” কিন্তু তাঁহার মনে হইত, ইহারা যেন তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া কি লুকাইতেছে। দিন এমনি করিয়া চলিতে লাগিল। বিমলানন্দ দিন দিন হীনবলহইতে লাগিলেন।

জীবনাশা মানুষকে সহজে পরিত্যাগ করে না। বিমলানন্দ মনে করিয়াছিলেন,—তাঁহার বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহার জীবন নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়াছে। তাঁহা হইতে এক অভিনব বংশধারা প্রবাহিত হইবে, তিনি সেই অভিনব বংশের আদিপুরুষ হইবেন। অসুখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঁচিবার লালসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন,—কর্ম্ম হইতে বৎসরব্যাপী অবসর লইয়াছেন; বুঝিয়াছেন,—পীড়া কঠিন; মনে মনে নিরন্তর চিন্তা,—এ কঠিন পীড়া সাংঘাতিক হইবে কি না। এক রাত্রি অতি ঘোর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। স্বপ্ন এই,—বিমলানন্দ যেন একটি পথ ধরিয়া চলিতেছেন, সে পথে আলোক নাই, অন্ধকার নাই, লোকজন নাই, পথপার্শ্বে বাড়ীঘর নাই, বৃক্ষাদি নাই। পথ কেবল গোধূলিছায়াচ্ছন্ন, আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিমলানন্দ একা সেই পথে চলিতেছেন; গা ছম্ ছম্ করিতেছে; পথের প্রতি বাঁকে মনে হইতেছে,—কে যেন আসিবে! কিন্তু না, কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। পথটী স্তব্ধ, বায়ু স্তব্ধ, তাঁহার নিজের পদশব্দও শুনা যাইতেছে না। পথ অনন্ত, অতি সঙ্কীর্ণ; ক্রমে সঙ্কীর্ণতর হইয়া এক সীমাশূন্য প্রান্তরে পতিত হইয়াছে। সে প্রান্তরও জনশূন্য, বৃক্ষশূন্য, তৃণশূন্য; তথায় কোনও শব্দ নাই, গতি নাই, কাল যেন স্পন্দহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অতি নিবিড় নিস্তব্ধতা, কিন্তু মনে হইতেছে,—কোথায় যেন কি গণ্ডগোল বিলাপ-রোল উঠিতেছে। আতঙ্কে অভিভূত হইয়া বিমলানন্দ দেখিলেন;—অনন্ত প্রান্তরে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল নরকঙ্কাল ও নরমুণ্ড ক্ষেত্রতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উপরে চাহিয়া দেখিলেন,—আকাশে চন্দ্র তারা কিছুই নাই; যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল সীসকের ন্যায় বর্ণ ধূ ধূ করিতেছে। অস্থিরাশি দলিয়া বিমলানন্দ চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শব্দ হইল না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—একটি সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। মাঠে আলোক নাই, অথচ তাঁহার দেখিবার কিছুই অসুবিধা হইল না, চারিদিকে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, আলোকের অভাবে বরং স্পষ্টতর দেখিতে পাইতেছেন। সেই সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল দেখিয়া বিমলানন্দের মনে

প্রশ্ন হইল,--এ কঙ্কাল কা'র, কোথা হইতে কে উত্তর দিল,—"তোমার, তোমার, তোমার।" বিমলানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন; অমনি বিকট হাস্যে বিকট প্রান্তর পরিপূর্ণ হইল। সভয়ে বিমলানন্দ দেখিলেন,—ক্ষেত্র-বিক্ষিপ্ত নৃমুণ্ডনিচয় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতেছে ও তাহাদের চক্ষুহীন নয়ন-গহ্বর যেন তাঁহাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতেছে। ত্রাসে বিমলানন্দ দুই হস্তে তাঁহার দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। নৃমুণ্ডসকল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত, জিহ্বা শুষ্ক; ভয়ে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—"রমা!" রমা পাশের ঘরে ঘোর নিদ্রায় অভি-ভূতা। তিনি উত্তর পাইলেন না,—আর ডাকিলেনও না। মনে বল সঞ্চয় করিয়া তিনি আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আর আসিল না। জাগিয়া জাগিয়া সারা রাত সেই স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে মনে নিশ্চিত ধারণা হইল,—আর অব্যাহতি নাই। তখন সেই জীবন-মরণের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া বিমলানন্দ দেখিতে লাগি-লেন—মৃত্যু,চারিদিকে মৃত্যু, সংসারে মৃত্যু বই আর কিছুই নাই। দেখি-লেন, এই শোভাময়ী সৃষ্টির তলে তলে মৃত্যুর স্রোত অন্তঃসলিলা বহিতেছে! ফুল্ল ফুলে, রমণীর হাসির অন্তরালে, মৃত্যু লুকাইয়া আছে। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, উৎসবে আমোদে, শ্রমে আরামে, আনন্দে বিষাদে, মৃত্যুরই বিজয়সঙ্গীত উঠিতেছে! দেখিলেন, সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণু মৃত্যুর সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু অবশেষে মৃত্যুরই জয়! মৃত্যুর সহিত এই অনিবার্য্য সংগ্রামের নামই জীবন। সংসার মৃত্যুময়! মৃত্যুরই জয়! মৃত্যু যদি দুর্জ্জয়, তবে জীবনের কি প্রয়োজন? এই সুন্দর সংসার মৃত্যুর আগার! এ কোন্ কঠোর বিধাতার সৃষ্টি? জীবন যাঁর দান, মৃত্যু কি তাঁরই বিধান? যে দান করে, সেই হরণ করে? দিয়ে কেন কেড়ে নেয়? কেন দেয়, কেন নেয়? কি কঠোর! কি কঠোর!

দেখিতে দেখিতে সেই অন্ধকারময় গৃহে গবাক্ষের রন্ধ্রপথ দিয়া

প্রভাতকিরণ প্রবেশ করিল। বিমলানন্দ উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান। প্রভাতপবনহিল্লোলে বিমল সরোবর টল টল করিতেছে। স্বর্ণকর অঙ্গে মাখিয়া সমস্ত প্রকৃতি হাসিতেছে। বিমলানন্দ ভাবিতে লাগিলেন,—এই উজ্জ্বল আলোক নিভে যাবে,এই সুন্দর আকাশ, সুন্দর মেঘের খেলা, এই শ্যামলা মেদিনী ফুলগন্ধে আমোদিনী—সব ফুরিয়ে যাবে! আজীবন স্বার্থচেষ্টায় ঘুরেছি, স্বভাব এত সুন্দর কখনও দেখিনি। কিম্বা আজ আমার নূতন চোখ ফুটলো। কি সুন্দর! কি সুন্দর! আলোক এত সুন্দর! আকাশ এত সুন্দর! শ্যামল ধরাতল এত সুন্দর! জলের হিল্লোল এত সুন্দর! স্নিগ্ধ নীর ক্ষুদ্র আঙ্গুলগুলি নেড়ে আমায় অবগাহন করতে আহ্বান কর্‌ছে! সন্তাপ হরণ কর্‌বার জন্য মধুর বাতাস যেন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! পাখীর গান কি মিষ্ট! হায় এত সুন্দর, এত মধুর, এত মিষ্ট—সব ফুরিয়ে যাবে! না, না, কিছুই ত ফুরা'বে না, সব যেমন আছে, তেমনি থাক্‌বে, আমিই কেবল থাক্‌বো না। আমার মৃত্যুর পরেও সূর্য্য উঠ্‌বে, ফুল ফুটবে, স্বভাব সৌন্দর্য্য বিকাশ কর্‌বে, মাধুরী-হিল্লোল বইবে; আমি আর তা' দেখ্‌তে পা'ব না! আজ যেমন সুন্দর প্রভাত, আমার মৃত্যুর পর এমনি কত প্রভাত হবে। কিন্তু আমি যে মহানিশায় শয়ন কর্‌বো, তা আর পোহাবে না! আমার মহানিদ্রা আর ভাঙ্গবে না! আর সবই থাক্‌বে, আমি কেবল থাক্‌বো না। রমা থাক্‌বে, নলিনী থাক্‌বে, বন্ধুবান্ধব যেমন গৃহে এসে আমোদ করে, তেমনি কর্‌বে;— আমি কেবল নীরব নিথর হ'য়ে মহানিদ্রার কোলে শুয়ে থাক্‌বো! তবে কিসের জন্য এত চিন্তা, এত যত্ন? এত অর্থব্যয় ক'রে এই গৃহ নির্ম্মাণ করেছি—এই গৃহে মরিবার জন্য? এত আয়াসে এই সকল বিলাসের উপাদান সংগ্রহ করেছি কা'র জন্য? আমার পুত্র নাই—কে ভোগ কর্‌বে? রমা?—সহসা বিমলানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। রমা যদি আবার বিবাহ করে? আমি মরিলে রমা যদি আবার বিবাহ করে! যাকে বিবাহ কর্‌বে সেই ভোগ কর্‌বে! কখনও না, কখনও না! আমি মর্‌বো না, মর্‌বো না! আমার কিসের অভাব?—মান, ধন, জন, যশ, প্রতিষ্ঠা,

প্রতিপত্তি—আমার কিসের অভাব? তবে কেন মরিব? কখনও না! কখনও না! আমি মরিব না, মরিব না! আমার ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স, এই কি মর্‌বার সময়! আমি মরিব না! কিন্তু কেমন করিয়া বাঁচিব? বাঁচ্‌বার কি উপায় আছে? কোনও উপায় নাই? নাই! নাই! নাই! আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু বলিতেছে, 'নাই!' আমার কঙ্কালসার দেহ বলিতেছে, 'নাই! বাঁচিবার উপায় নাই!' দর্পণে ঐ প্রতিবিম্ব বলিতেছে, 'বাঁচিবার আশা নাই!' আমি মরিব! আমার অন্তরাত্মা বলিতেছে,—'আর আমার অব্যাহতি নাই; আমি মরিব!' হায় হায়! এই উষ্ণ রক্তস্রোত স্তব্ধ—নিশ্চল হবে! কি কঠোর! কি কঠোর! কার এ কঠোর বিধান? কে সে? কোথায় সে? তুমি যেখানেই থাক, তুমি অতি কঠোর দণ্ডদাতা। কেন আমায় এ জীবন দিয়েছিলে? আমি তোমার কাছে কি দোষে দোষী? দিয়ে আবার কেন কেড়ে নিচ্ছ? আমার কি অপরাধে এ দণ্ড দিচ্ছ? যদি অপরাধী হই, আমায় ক্ষমা কর; তুমি পিতা, আমি সন্তান। এ যুবাবয়সে আমায় মেরো না, মেরো না, মেরো না! আমি মরিতে চাই না, আমায় মেরো না, মেরো না, মেরো না! অসহায় বালকের ন্যায় বিমলানন্দের চক্ষে অজস্র অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সেই সময় নলিনীর সহিত ডাক্তার সাহেব কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রোগীর মুখভাব দেখিয়াই ডাক্তার শিহরিয়া উঠিলেন। ডাক্তার বাঙ্গালী হইলেও, পুরা দস্তুর সাহেব। বিমলানন্দ তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন,—"সাহেব, একটা সাদা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আশা করি, তুমি সরল কথায় উত্তর দেবে। আমি বাঁচিব কি মরিব? ডাক্তার, আমার পরম সময় উপস্থিত, আমায় প্রবঞ্চনা ক'রো না।" ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"কে বলিল আপনার পরম সময় উপস্থিত? আপনাকে আরোগ্য করিব। নিশ্চয় করিব।" কঠোরস্বরে বিমলানন্দ বলিলেন,—"তুমি মিথ্যাবাদী—আমি ধ্রুব জানিয়াছি, আমার আর অব্যাহতি নাই।" ডাক্তার সাহেব একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কে আপনাকে একথা বলেছে?" বিমলানন্দ উত্তর দিলেন,—"তোমার চক্ষু বলেছে, তোমার মুখের ভাব বলেছে, আর বলেছে আমার অন্তরাত্মা।"

নলিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,চটিয়া চক্ষু লাল করিয়া বলিল,—"অন্তরাত্মা বেটা কে হে? কে সে বেটা? বেটার ত ভারি আস্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি!" বিমলানন্দ একথার কোন উত্তর না দিয়া ডাক্তারকে বলিলেন,—"ডাক্তার, আর আমি ওষুধ খাব না, ওষুধে কোন ফল হচ্চে না, তবে মিছামিছি বিষ খাই কেন? আমি ওষুধ খাব না; কিন্তু তুমি যেমন রোজ রোজ দেখে যাও, তেমনি দেখে যেও।" ডাক্তার চলিয়া গেলেন। বিমলানন্দ আবার ভাবিতে লাগিলেন। সেই সময় পার্শ্বের ঘর হইতে অনুচ্চ হাসির শব্দ উঠিল, বিমলানন্দ ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—রমা ও তাহার তিন চারি জন বন্ধু বসিয়া আছে, কি একটা রঙ্গরস চলিতেছে। তিনি আসিতেই তাহা থামিয়া গেল। কেহ গম্ভীর, কেহ ম্লানমুখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। রমা বলিল,—"আজ তোমার চেহারা অনেক ভাল দেখ্‌ছি, কেমন আছ? আজ রাত্রে থিয়েটার দেখিতে যাইবার জন্য ইঁহারা আমায় নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন।" কথাগুলি তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় বিমলানন্দের মর্ম্মে প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রতারণা! ডাক্তার প্রতারক! বন্ধুবান্ধব প্রতারক। পত্নী প্রতারণা-কারিণী! আমি মরিতে বসিয়াছি, তিল তিল করিয়া মরিতেছি, মনে জ্ঞানে ইহারা জানে; তবু প্রতারণা করিয়া বলিতেছে—'ভাল আছ,' পাছে একরাত্রি আমোদের ব্যাঘাত হয়। কি নির্দ্দয়! এদের এতটুকু ধর্ম্ম নাই, দয়া নাই! মুমূর্ষুর সঙ্গে প্রতারণা! এদেরই বা অপরাধ কি? সংসার প্রতারণাময়! মিথ্যা কথায় সমাজ চল্‌ছে, পরস্পর পরস্পরকে প্রতারিত কর্‌ছে! সহৃদয়তা কোথায়, সত্য কোথায়, সারল্য কোথায়! সংসার প্রতারণাময়! রমা বলিল,—"কি ভাব্‌চো? তোমার যেতে দিতে না ইচ্ছে হয়, আমি যাব না।" "না, না, যাবে বই কি!" এই বলিয়া বিমলানন্দ ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আঘাত পাইলে শম্বুক যেমন শঙ্খমধ্যে আশ্রয় লয়, বিমলানন্দ সেইরূপ নিজ কক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। তিনি চলিয়া আসিবার পরই পাশের কক্ষে আবার অনুচ্চ হাসির রোল উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,

"কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ সব! ভাবে না—একদিন মর্‌তে হবে; আমি আগে, ওরা পরে; দুদিনের আগু পেছু! আমোদ ক'চ্ছে, শমন শিয়রে হাস্‌চে! বেকুক, বেকুব, বেকুব!"

অতি যন্ত্রণায় বিমলানন্দের দিন কাটিতে লাগিল। দিন দিন জীবনদীপ ক্ষীণ হইতেছে—কখন নিভিবে। দৈহিক যন্ত্রণা সহনাতীত, মানসিক যন্ত্রণা ততোধিক। যন্ত্রণার বিরাম নাই, দিন রাত্রি যন্ত্রণা, যন্ত্রণা অব্যক্ত, তাহার মানবীয় ভাষাও নাই—কেবল উঃ! আঃ! রমা ধনীর দুহিতা, বিলাসলালিতা, শুশ্রূষায় অনভ্যস্তা, একা নলিনী কত করিবে। একজন শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীর প্রয়োজন, ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজ হইতে আনাইলেন। কিন্তু ধাত্রীর শুশ্রূষায় বিমলানন্দের তৃপ্তিবোধ হওয়া দূরে থাকুক, বিরক্তি বোধ হয়। প্রতিনিয়ত ধাত্রী-পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে আর কেহ আসিল না। ধাত্রীব জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। নলিনী একা দিনরাত্রি সেবা করিতেছে। রুগ্ন-কক্ষে নিয়ত বাস করিয়া সদানন্দময় নলিনীর জীবন নিরানন্দময় হইয়াছে—স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে; কিন্তু তবু সে বিমলানন্দকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। ক্রমে তাহার জ্বর হইতে আরম্ভ হইল, এবং এই সময় তাহার বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নলিনীকে পিতার শুশ্রূষার কারণ যাইতে হইল—কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ করিল। জীবনে এই তাহার প্রথম অশ্রুপাত। বিমলা ভাবিতে লাগিলেন,—সংসার প্রতারণাময়। কিন্তু বোধ হয়, এই পাগল প্রতারণাশূন্য, আর সব প্রতারক। আমিও প্রতারক! বালকবয়সে বালিকা সুষমাকে প্রতারিত করেছি; কিশোরে এই পাগলকে প্রতারিত করেছি, যৌবনে রমাকে, রমার পিতাকে প্রতারিত করেছি, আমার মাকে প্রতারিত করেছি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতারিত করেছি আপনাকে আপনি! ধন, জন, যশঃ, প্রতিপত্তি, পদোন্নতি—এই সকলকে জীবনের সার পদার্থ মনে ক'রে আপনাকে আপনি ঠকিয়েছি! স্বার্থের চেষ্টায় নিত্য ঘুরে আত্মপ্রবঞ্চনা করেছি! হায় হায়! এত আশা, এত উদ্যম, এত

চেষ্টা, এত অধ্যবসায়, এত চিন্তা—সব বৃথা! সব নিষ্ফল! কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা! নশ্বর স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় নিরর্থক শক্তিক্ষয় করেছি; এখন উপায় কি? কি উপায়—কি উপায়? অন্তরের অন্তস্তলে নিহিত নৈরাশ্য-কন্দর হইতে প্রতিধ্বনি হইল—"নিরুপায়! নিরুপায়! নিরুপায়!"—তবে আর বিলম্ব কেন? কোথা মৃত্যু, এস, আমায় নিয়ে যাও! নিয়ে যাবে? কোথায় নিয়ে যাবে? কোথায় যাব? যেতেই হবে; কিন্তু কোথায়? সেই নীরব নিরালোক কঙ্কালাস্থিময় স্বপ্নদৃষ্ট প্রান্তরে? বিমলানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। হায় হায়! এই পরিণাম। এত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা, এত উদ্যম—এর এই পরিণাম। দুর্লভ মানবজীবনের এই পরিণাম! এইই পরিণাম! আর কি পরিণাম সম্ভব? পলে পলে তিল তিল করিয়া জীবন গঠিত হয়, মৃত্যু আসিয়া এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া দেয়। জীবনে মৃত্যু নিশ্চিত, আর সব অনিশ্চিত। মৃত্যুর পর কি হয়, তাও অনিশ্চিত। অতি জটিল রহস্য। জীবন কি? মৃত্যু কি? আজীবন স্বার্থচিন্তায় অতিবাহিত করেছি। জীবন চিন্তাময়; জাগ্রতে চিন্তা, স্বপ্নে চিন্তা, চিন্তার নিবৃত্তি কোথায়? মৃত্যুতে কি চিন্তার শেষ হয়? নিদ্রায় স্বপ্ন দেখি, কে বলিবে মহানিদ্রায় স্বপ্ন নাই? স্বপ্ন, স্বপ্ন! নিদ্রায় স্বপ্নের সংসার সত্য ব'লে মনে হয়, জাগ্‌লে সে ভ্রম থাকে না। এ জাগ্রৎ সংসারও ত ঘুমুলে থাকে না? তবে কোন্‌টা সত্য? স্বপ্নের সংসার সত্য, না, জাগ্রত সংসার সত্য? মহানিদ্রায় যদি স্বপ্নের শেষ না হয়? তা হ'লে সে কঙ্কালময় ক্ষেত্র মিথ্যা বলি কেমন ক'রে? আমি জাগ্রত কি মহানিদ্রাগত? জীবিত কি মৃত?" বিমলানন্দের মস্তিষ্কে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইল। সূক্ষ্ম বিচারকের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি যেন জড়তাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। চিন্তার অন্ত নাই। দূর হোক্ আর ভাব্‌বো না। কিন্তু ভাবিব না বলিলেই ভাবনার শেষ হয় না। শিকার যেমন মুগ্ধদৃষ্টে ব্যাধের পানে চাহিয়া থাকে, মুমূর্ষু বিমলানন্দও তেমনি মৃত্যুমুখ চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যন্ত্রণা দিন দিন বাড়িতে

লাগিল। বিমলা ভাবিতে লাগিলেন,—কেন এত যন্ত্রণা? জীবনে যন্ত্রণা, মৃত্যুতে যন্ত্রণা! যন্ত্রণার শেষ কোথায়? সুখ কোথায়? শান্তি কোথায়? জীবনে কখনও কি সুখী হইয়াছি? কখনও কি শান্তি পাইয়াছি? কবে সুখ ছিল? কখন শান্তি ছিল? মনে হইল, মন যেন বলিতেছে,—"ছিল।" কবে, কখন? মুমূর্ষুর জীবনালোক ক্রমে ক্রমে যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল, স্মৃতির আলোক ততই উজ্জলতর হইতে লাগিল। সেই আলোকে বিমলা দেখিলেন,—হরিদ্বর্ণ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, সেই গ্রামে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর, সেই ক্ষুদ্র কুটীরে একটি ক্ষুদ্র বালক খেলা করিতেছে। কাছে একটি দেবী বসিয়া স্মিতমুখে মুগ্ধনেত্রে সেই ক্রীড়া দেখিতেছেন। বালক খেলিতে খেলিতে গিয়া মাতৃবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। পবিত্র চুম্বনে হাসির লহর তুলিয়া বালক আবার খেলিতেছে। কুটীরে কি স্বর্গীয় শান্তি বিরাজিত! দেখিতে দেখিতে আবার একটি দৃশ্যের উপর স্মৃতির আলোক পতিত হইল। এও একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ, সেই গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার একখানি মুখ। সে মুখখানি দেখিবামাত্র বিমলার অর্দ্ধেক যন্ত্রণার লাঘব হইল। অন্তরে কি এক বিমল সুখ উথলিয়া উঠিল। এ মুখখানি বহুদিন সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। গুপ্তচরমুখে বিমলা সন্ধান পাইয়াছেন—তাঁহারই লিখিত পত্রগুলি বক্ষে ধরিয়া সুষমা অনলে ভস্মীভূত হইয়াছে। কিন্তু অপর মুখখানি? গঙ্গাদেবী এখন যে কোথায়, কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। সুষমার পত্রগুলি বিমলা একটি গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিতেন; সেগুলি বাহির করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িতে লাগিলেন। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বিমলা সুষমাকে লিখিয়াছিলেন,—"তোমায় যেদিন ভুলিব, সেদিন আমার মৃত্যু।" তাহার উত্তরে সুষমা লিখিয়াছিল,—"তুমি সহস্র সুন্দরী লইয়া থাক, তা'তে আমার দুঃখ নাই, দাসীকে মনের কোণে এতটুকু স্থান দিও। যেদিন জানিব—তোমার মন হইতে আমি দূর হইয়াছি, সেইদিন জানিবে সুষমা মরিয়াছে।" কি স্বর্গীয় ভালবাসা! এ

কখনও প্রতারণা নয়! সুষমা মরিয়া প্রমাণ করিয়াছে, তাহার ভালবাসা প্রতারণা নয়। বিমলার মনে হইল, সুখী হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, হায়! হেলায় হারাইয়াছেন। স্নেহময়ী জননী যেদিন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, অকিঞ্চিৎকর উন্নতির আশা ত্যাগ করিয়া যদি সেদিন তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইতেন—তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় লইতেন, বোধ হয় তিনি জীবনে সুখী হইতেন। কিন্তু হায়, সে সুযোগও চলিয়া গিয়াছে!

বিমলার চক্ষে দর দর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—একা আসিয়াছি, একা যাইব। সংসারের কাহাকেও আপনার করিতে পারিলাম না। মরিলে কেহ এক ফোঁটা অশ্রু দিয়া আমার তর্পণ করিবে না! আবার যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা; মনে হইতে লাগিল—তিনি সুষমাকে হত্যা করিয়াছেন। তাঁহারই তাচ্ছিল্যে সুষমা মরিয়াছে। তিনি হত্যা-অপরাধে কত লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কি দণ্ড হইয়াছে? সুষমা স্বর্গে; আর মা? মা কোথায়? মাও বোধ হয় এ পৃথিবীতে নাই! সন্তানের কৃতঘ্নতায়, বোধ হয়, জননীও সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! আমি পত্নীঘাতী, মাতৃঘাতী! আমার কি দণ্ড হওয়া উচিত? এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি? পাপের কি দণ্ড আছে? স্বর্গ নরক সত্য না কবির কল্পনা? যদি থাকে, কোন্ নরকে আমার স্থান হইবে? হৃদয়ে যে যন্ত্রণা হইতেছে, ইহার অপেক্ষা কি নরক-যন্ত্রণা অধিক? স্বার্থসাধনের ব্যর্থ চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, কাঞ্চন-বিনিময়ে কাচ কিনিয়াছি, প্রেমের প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বিলাসিনী রমণীকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি! ঘোরতর স্বার্থপরতায় জীবনে কখনও কাহাকেও বিশ্বাস করি নাই, কখন ওকাহাকেও ভালবাসি নাই; হৃদয় দিয়া হৃদয় কিনি নাই; ধন, জন, যশঃ, মান, সুন্দরী রমণী, আমার সকলই আছে, তথাপি আজ আমি অতি দীন দরিদ্র অপেক্ষাও দুঃখী! আমায় ভালবাসিবার কেহ নাই!—আমার ভালবাসিবার কিছু নাই! এ নশ্বর জীবনে বুঝি ভালবাসাই সুখ! প্রেমের বন্ধনে সংসার স্থাপিত; সে বন্ধন আমি

যত্নে কাটিয়াছি,• কি প্রাণান্তিক ভ্রান্তি! কিন্তু আর ত ফিরিবার নয়! আমার জন্ম বিফল, আমার জীবন নিষ্ফল!

অসহ্য যন্ত্রণায় বিমলানন্দ এক একদিন মুহ্যমান হইয়া থাকিতেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন তাঁহার মনে হইল, কার একখানি কোমল কর অতি সন্তর্পণে তাঁহার ললাট স্পর্শ করিল। বিমলার মনে হইল,—সেই শীতল সন্তাপহর স্পর্শে তাঁহার অর্দ্ধেক যন্ত্রণার উপশম হইল। ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী তাঁহার শিয়রে বসিয়া ললাটে মস্তকে হস্ত বুলাইতেছে। সেই সময় রমা কক্ষে আসিয়া বলিল,—"এই দাসীটি আজ পাওয়া গিয়াছে। এ ধাত্রীর কার্য্য করিতে ও তোমার শুশ্রূষার ভার লইতে রাজি। মাহিনার কথায় বলিয়াছে,—'কাজ দেখিয়া বিবেচনা করিয়া দিবেন'। আমি তাহাতেই স্বীকার করিয়াছি।" বিমলানন্দ কোন উত্তর করিলেন না। দাসীর শুশ্রূষায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। অনেকদিন নিদ্রাহীন, অনেকক্ষণ ধরিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রমা রুগ্নকক্ষে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না, মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিমলার সংবাদ লইয়া যাইত। বিমলাও তাহাকে বেশীক্ষণ কাছে থাকিতে দিতেন না। দাসী একাকিনী রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মাতৃকোলে শিশু যেমন নিশ্চিন্তে অবস্থান করে, নূতন ধাত্রীকে পাইয়া বিমলারও সেইরূপ হইল। কখন্ তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছে, তৃষ্ণা পাইয়াছে, কখন্ কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছে, কখন্ তিনি ঘুমাইবেন, ধাত্রী যেন অন্তর্য্যামিরূপে সকল জানিতে পারিত। রোগীকে কিছু বলিতে হয় না, চাহিতে হয় না, নিঃশব্দে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। ধাত্রী কখন্ কোথায় স্নানাহার করে, কেহ তাহা জানে না; কেহ তাহার সংবাদও রাখে না। বিমলানন্দ সর্ব্বক্ষণই দেখিতে পান, ধাত্রী জগদ্ধাত্রীর ন্যায় সেই মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন রুগ্নকক্ষ আলো করিয়া অবগুণ্ঠিতমুখে তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে। শুশ্রূষায় বিমলার দৈহিক যন্ত্রণার অনেক. উপশম হইল বটে, কিন্তু অনুতাপজনিত মানসিক যন্ত্রণার অণুমাত্র হ্রাস হইল না।

মিষ্টার ব্যাম্‌স্‌ডেন্‌ ভাদুড়ী জামাতা অপেক্ষা কন্যাকে অধিক স্নেহ করিতেন। কথায় বলে, জামাইয়ের জন্য মেয়ের আদর, কিন্তু র‍্যাম্‌স্‌ডেন্‌ কন্যার জন্য বিমলাকে আদর করিতেন। যখন দেখিলেন, চেষ্টায়, অর্থব্যয়ে, চিকিৎসায়, বিমলার কোন উপায় হইল না, মৃত্যু দিন দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, তখন তিনি রমাকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মৃত্যুর ছায়া যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, বিমলানন্দের বিশাল ভবন ততই জনশূন্য হইয়া উঠিল। যে গৃহে নিত্য সন্ধ্যায় আনন্দকোলাহল উঠিত, সে স্থান এখন নিবিড় নিস্তব্ধতা ভাবাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। রমা একাকিনী কেমন করিয়া বাস করে। ভাদুড়ী পরিবার অবশ্য বিমলার গৃহে আসিয়া বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু শাশুড়ি জামাইবাড়ী থাকেন কিরূপে? লোকাচার অনেক সময় মানুষকে বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করে। ইঁহারা রমাকেই স্থানান্তরিত করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। দৈব তাহা মিলাইয়া দিল। দাসী আসিয়া শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলে, রমার অসুস্থতার ভাণ করিয়া, ব্যাম্‌স্‌ডেন কন্যাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বিমলাও আগ্রহের সহিত সম্মতি দিলেন। ভাবিলেন— ইঁহারা থাকিলেই কি, যাইলেই কি। এ বিশাল সংসারে, কেহই আপনার নাই। মৃত্যুর সময়, বোধ করি, একখানিও পরিচিত মুখ দেখিতে পাইব না। দাস দাসী সে সময় চুরি করিতে ব্যস্ত থাকিবে। আমার পরম সময়, মুখে কেহ এক ফোঁটা জলও দিবে না। স্বার্থপরতায় পরকে আপনার করবার চেষ্টা করেছি, এদের আপনার কোরবো ভেবে, মা'র মনে দারুণ ব্যথা দিয়েছি। হায় হায়। মা এখন কোথায়। বোধ করি জীবিতা নাই। আমার পীড়ার সংবাদ দেশবিদেশে রাষ্ট্র—মা বাঁচিয়া থাকিলে, অবশ্যই শুনিতে পাইতেন। শুনিলে একবার কি দেখিতে আসিতেন না? মা নাই। রোগে, শোকে, অনাহারে হতভাগিনী হয়ত পথে প'ড়ে দেহত্যাগ করেছেন। তীব্র যন্ত্রণায় বিমলা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। অমনি একখানি শীতল কোমল হস্ত তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপিত হইল, যেন যাদুবলে

সমস্ত যন্ত্রণা অপহৃত হইল। এ কি! কে এ। এ কি দেবী না মানবী! বিমলানন্দের স্মরণ হইল, বহুকাল পূর্ব্বে বাল্যকালে একবার তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, এমনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। সে সময়ও এমনি একখানি শীতল হস্তের কোমল স্পর্শে তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হয়। কত কথাই মনে হইতে লাগিল। কলিকাতায় আসিবার দিন জননীর চক্ষের জল, তার পর ব্যাচিলার মেসের সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন—প্রত্যাখ্যাতা হইয়া জননী সন্ন্যাসীর পাছে পাছে যাইতেছেন। দেহ চলিতেছে না, সন্ন্যাসী টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, যাইতে যাইতে জননী বার বার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছেন। নয়নে রোষের লেশ মাত্র নাই, কেবল করুণার পীযূষধারা ঝরিতেছে। মা মা বলিয়া বিমলানন্দ শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। 'মা গো, কোথায় তুমি, একবার দেখা দাও, দেখা দাও। কৃতঘ্ন পুত্রকে মার্জ্জনা ক'রে যাও!' কা'র তপ্ত অশ্রু বিমলানন্দের ললাট-দেশ সিক্ত করিতেছে? বিস্মিত হইয়া বিমলানন্দ বলিলেন,—"মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী তুমি কে মা? আমার দুঃখে কাঁদ্‌ছো! আমি মাতৃঘাতী —আমার জন্য কেঁদ না। মা গো, তোমারি মতন দয়াময়ী আমার মা ছিলেন, তোমার স্পর্শে আমার তাঁকে মনে পড়ে। কে মা তুমি।"

সহসা অন্ধকার কক্ষমধ্যে গম্ভীর ধ্বনি হইল,—"বৎস, ইনি তোমার মাতা গঙ্গাদেবী।" বিমল। চাহিয়া দেখিলেন, মেসের সেই সন্ন্যাসী। "মা, মা" বলিয়া উঠিতে গিয়া বিমলানন্দ গঙ্গাদেবীর চরণতলে পড়িয়া গেলেন। সন্ন্যাসী উঠাইয়া শোওয়াইলে, বিমলানন্দ বলিলেন,—"মা, মা, অপারকরুণাময়ি! তুমি দাসী হ'য়ে আমার শুশ্রূষা কর্ত্তে এসেছ।" বলিয়া মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

যতদিন গঙ্গাদেবী বিমলানন্দের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা, ততদিন সন্ন্যাসী আসিয়া নিত্য তাঁহাকে দুগ্ধপান করাইয়া যাইতেন। গঙ্গাদেবী আর কিছুই খাইতেন না। আজ দুগ্ধ আনিয়া সন্ন্যাসী নির্দ্দিষ্ট স্থলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু গঙ্গাদেবীর বিলম্ব হইতে লাগিল। সঙ্কেত

করিয়া তাঁহাকে ডাকিবেন ভাবিয়া, সন্ন্যাসী বিমলার কক্ষের নিকট উপস্থিত হন। সেই স্থান হইতে বিমলার ব্যাকুল আগ্রহ দেখিয়া সন্ন্যাসী গঙ্গাদেবীর পরিচয় প্রদান করেন। বিমলা যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তাহার কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী একদিন গঙ্গাদেবীর গৃহে অতিথি হন। তাঁহার সেবায় ও শ্রদ্ধায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া, সন্ন্যাসী গঙ্গাদেবীকে কন্যার ন্যায় দেখিতেন। সর্ব্বানন্দের গুরুবংশের লোপ হইয়াছিল; গঙ্গাদেবী সন্ন্যাসীকে গুরুস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার নিকট সাধনোপদেশ লইতেন। বিমলা বলিলেন,—"মা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমি অনেক সন্ধান করেছি, তোমার তত্ত্ব পাইনি।"

সন্ন্যাসী। বৎস, বৈদ্যনাথে আমার একটি সেবাশ্রম আছে, সেই-খানে তোমার মা পীড়িত তীর্থযাত্রীর সেবা করেন। দৈবাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় সংবাদপত্রে ধাত্রীর জন্য তোমাব বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই।

বিমলা। দাসী হ'য়ে কেন এসেছিলে মা?

গঙ্গাদেবী ও সন্ন্যাসী উভয়কে নিরুত্তর দেখিয়া বিমলা বলিলেন,—"বুঝেছি, পাছে আবার তোমায় তাড়িয়ে দিই। সন্ন্যাসি, আমার মহাপাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বৎস, ভগবানের পবিত্র নামে সব পাপ ক্ষয় হয়।"

সেইদিন হইতে সন্ন্যাসী নিত্যই বিমলাব কক্ষে আসিতেন। মুমূর্ষুর দিন ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী গোপনে গঙ্গাদেবীকে বলিলেন,—"মা, বুক বাঁধ, সম্মুখে তোমার বিষম দিন! গঙ্গাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বাবা, বড় কঠিন, বড় কঠিন!"

সন্ন্যাসী। মা, মা, তুমি অধীরা হ'য়ো না।

গঙ্গাদেবী। বাবা, ভয় নেই, আমি পাষাণ হয়েছি। আমি অধীর হ'লে পরম সময়ে বিমলাকে কে দেখ্‌বে? ওর পুত্র নাই, কন্যা নাই, আমি এখন মা নই, ওর কন্যা। আমার এখনও অনেক কাজ বাকী। বাবা, তুমি সন্ন্যাসী, সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু বোধ করি, মায়ের হৃদয় তুমিও বোঝ না। আমি এখন আর ইহকালের কথা ভাব্‌ছি নি, ভাব্‌ছি—পর-

লোকে বিমলার গতি কি হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করেনি। বাবা, তুমি ওর উপায় কর।

সন্ন্যাসী। মা, তুমি যার জননী, তার গতির জন্য ভাব্‌না কি! বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। বিমলানন্দের দিন আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। দারুণ যন্ত্রণায় তিনি জননীকে বলিলেন,—"মা, তুমি কাছে রয়েছ, তবু কেন এত যন্ত্রণা?"

গঙ্গাদেবী। বাবা, দুর্গা বল, দুর্গা নামে সব যন্ত্রণা দূর হয়।

বিমলানন্দ। দুর্গা, দুর্গা! দুর্গা কে মা!

গঙ্গাদেবী। দুর্গা মা, দুর্গা জগতের মা; দুর্গা তোমার মা!

বিমলানন্দ। আমার মা! তিনি কি মা, তোমার মতন দয়াময়ী?

গঙ্গাদেবী। বাবা, তিনি অপারকৃপাময়ী। তাঁর একবিন্দু স্নেহ আমার হৃদয়ে আছে ব'লে আমি মা।

বিমলা বলিলেন, তুমি মা, আমি আর মা জানি না।

পরদিন সন্ন্যাসী আসিলে বিমলানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, বোল্‌তে পার? এক সময় মনে হ'ত,—ধন, মান, যশঃ, প্রতিপত্তি এই সকল উপার্জ্জন করাই বুঝি জীবনের উদ্দেশ্য। সকলই ত পেয়েছিলুম, তবে সুখী হইনি কেন? আমার মনে হচ্ছে - জীবন ব্যর্থ হয়েছে। আজীবন স্বার্থচেষ্টায় ঘুরে কেবল যন্ত্রণাই পেয়েছি, জীবনে যন্ত্রণা, মরণে যন্ত্রণা। সুখ কোথায়? জীবনের উদ্দেশ্য কি কেবল যন্ত্রণা? যন্ত্রণা ভোগের জন্যই কি আমি সৃষ্ট হয়েছিলুম।"

সন্ন্যাসী। কি উদ্দেশ্যে কে সৃষ্ট হ'য়েছে, তা জান্‌বার কা'রও অধিকার নাই। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানেন। তবে মানবের কর্ত্তব্য—তাঁকে জানা। তাঁকে জান্‌লেই জীবন সার্থক, নইলে ব্যর্থ।

বিমলানন্দ। তাঁকে কেমন ক'রে জান্‌বো?

সন্ন্যাসী। ভগবানের শরণাপন্ন হও। আমি শুনেছি—কাতর হ'য়ে যে তাঁকে ডাকে, তিনি তার উপর সদয় হন। তাঁর নাম কর, তোমার সব যন্ত্রণা দূর হবে।

বিমলানন্দ। সন্ন্যাসি, সাকার ঈশ্বরী আমার সাম্‌নে, যখন বড় যন্ত্রণা হয়, মা ব'লে ডাকি, শান্তি পাই। মা'র নামই আমার মহামন্ত্র। মা ই আমার পরম ঈশ্বরী। এই সাক্ষাৎ সাকার ঈশ্বরী থাক্‌তে, আবার কা'কে ডাক্‌বো? সন্ন্যাসি, ব্রাহ্মণের ছেলে—আজীবন কুপথে বেড়িয়েছি, মা'র মনে ব্যথা দিয়েছি। আমার বড় সাধ—মা'র পদ পূজা কর্‌বো, কিন্তু কেমন ক'রে পূজো কর্‌তে হয়, আমি জানি না। তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস, একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি।"

কিছুক্ষণ পরে ফুল, বিল্বদল, চন্দনাদি লইয়া সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিলেন। গঙ্গাদেবীকে বলিলেন,—"মা, তুমি এইখানে বসো।" বিমলানন্দের হস্তে ফুল বিল্বদল দিয়া বলিলেন,—"বৎস বল :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

বিমলানন্দ মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"মা, তোমার কাছছাড়া হ'য়ে তোমার মনে ব্যথা দিয়ে, জীবনে বড় যন্ত্রণা পেয়েছি, আশীর্ব্বাদ করো—যেন শান্তি পাই।" গঙ্গাদেবী বলিলেন,—"বাবা, যদি কায়মনোবাক্যে পতিপদ পূজা ক'রে থাকি, যদি গুরুর চরণে মতি থাকে, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার পাপ তাপ দূর হোক্, অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হও।" বিমলানন্দের মুখে দিব্য জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল। বলিলেন,—"সন্ন্যাসি, মা'র আশীর্ব্বাদে আমি শান্তিলাভ করেছি, নিষ্পাপ হয়েছি।"

এই ঘটনার পর হইতে বিমলানন্দের জীবন অতি দ্রুত ক্ষয় হইতে লাগিল। উকীল ডাকাইয়া, রেজিষ্ট্রারকে আনাইয়া, তিনি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমস্ত বিষয় সন্ন্যাসীর সেবাশ্রমে দান করিলেন। তার পর মাতৃহস্তে দুগ্ধপান করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইলেন। সমস্ত রাত্রি সেই ভাবেই গেল, গঙ্গাদেবী ও সন্ন্যাসী নীরবে উভয় পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বেই বিমলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মুখে মৃদুহাসি দেখা দিল; শূন্য লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"জীবনসঙ্গিনি,

তুমি এসেছ!" গঙ্গাদেবী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, কার সঙ্গে কথা কচ্চ? কে এসেছে?" বিমলা বলিলেন,—"সুষমা। মা, মা, আমায় বুকে তুলে নাও।" অতি সন্তর্পণে গঙ্গাদেবী পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। বিমলানন্দ বলিলেন,—"আঃ! জীবনে প্রথম এই হৃদয় আশ্রয় পেয়েছিলুম, এই বক্ষ হ'তে প্রথম জীবনসুধা পান করেছি, চরমে এই হৃদয় আমার পরম আশ্রয়। সন্ন্যাসি, জানালা খুলে দাও। মা, মা, এত রূপ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলি মা? দশহাত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলি মা? বিমল জ্যোতিঃ! বিমল আনন্দ।" সহসা নবোদিত অরুণকর অন্ধকার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিমলানন্দের ললাট চুম্বন করিল। মাতৃকোলে শিশু ঘুমাইয়া পড়িল।

(সমাপ্ত)

রামসাগর ভ্রমণ।

দিনাজপুর আসিবার পর কয়েক দিন মধ্যেই কতিপয় মনোমত বন্ধু জুটিয়াছিল। তাঁহারা সকলেই সৎস্বভাব, ধর্ম্মের দিকেও সকলেরই একটু না একটু টান আছে। ইঁহাদের সংসর্গে প্রায় সদালোচনায়ই কাল কাটিত। তাই বলিয়া আমোদ প্রমোদ একবারে বন্ধ ছিল না। এখানে আসিয়াই শুনিয়াছিলাম, সহরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটি মনোহর সুবৃহৎ প্রাচীন দীঘি আছে—উহার নাম রামসাগর। সকলে অনুমান করেন, প্রাচীন হিন্দুরাজা রামপাল ইহা খনন করাইয়া তাঁহার নামানুসারেই ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে মহীপাল দীঘির নাম পাইয়াছি বটে, কিন্তু রামসাগর নাম পাই নাই। যাহা হউক, এই স্থানটি নাকি অত্যন্ত সুদৃশ্য ও নির্জ্জন। যাঁহারা দিনাজপুরে থাকেন, অথবা দিনাজপুর বেড়াইতে আসেন, তাঁহারা সকলেই এই স্থানটি দর্শন করেন। তাই আমরাও ক্রমে ক্রমে উহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। আমাদের বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই একবার করিয়া রাম সাগর গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা একবার দেখিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই;

আবার যাইবার জন্য ব্যাকুল। আমি একবারও যাই নাই, আমার কথা ত বলাই বাহুল্য।

আমাদের দলের জনৈক বন্ধুরই বিশেষ আগ্রহে এই ক্ষুদ্র ভ্রমণের আয়োজন হইল। বন্ধুটির নাম শ্রীযুক্ত বনবিহারী সাহা। ইঁহার সাধুতা, সরলতা, বৈরাগ্য, উচ্চাশয়তা সকলেরই অনুকরণীয়। রামসাগর সহর হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে। যাইয়া, দেখিয়া শুনিয়া একবেলার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায় না। বিশেষতঃ সেখানে কিছু সময় থাকিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ না করিলে আর জায়গাটা উপভোগ করা হইল কেমন করিয়া? সুতরাং সকলের মতানুসারে রামসাগরের তীরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের যোগাড় লওয়াই ঠিক হইল। এ উদ্যোগ প্রধানতঃ বনবিহারী বাবু করিলেন। যথাসময়ে ভাল ঘৃত, চাউল, ডাল, তরকারী, দুগ্ধ, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি প্রচুরপরিমাণে সংগ্রহ করিবার বন্দোবস্ত করা হইল। যখন আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম, তখন ভারী উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলাম। ক্রমে দলটা একটু পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করা গেল। অল্প দিন এখানে আসিয়াছি, বেশী লোকের সঙ্গে ভাব হয় নাই। আবার যাকে তাকে লওয়া যায় না। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ আমরা ৮ জন হইলাম। কেশব বাবু নামক জনৈক ভদ্রলোক বেশ গাইতে পারেন। লোকটি ভাল, বাড়ী আমাদের দেশে। তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিয়া আসিলাম, তাঁহারও উৎসাহের সীমা নাই। গায়কের যোগাড় হইল বটে, কিন্তু আমাদের ভিতর "বাজিয়ে" কেহই নাই। সুতরাং একটি হারমোনিয়ম ও একটি বাদক সংগ্রহ করা গেল। ৩১শে বৈশাখ শনিবার রওনা হওয়ার দিন স্থির হইল। শুক্রবার দিন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখা গেল। কিন্তু মনে এক আশঙ্কার উদয় হইল যে, যদি বৃষ্টি হয়, তবে ত সব মাটি হইবে। এই আশঙ্কায় সকলেরই মুখ একটু অপ্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে ভাবিতে লাগিলাম—বৃষ্টি হইবে না—আমাদের এত উৎসাহ আনন্দ কি ঠাকুর মাটি করিবেন?

শুক্রবার রাত্রিতে যখন শয়ন করিলাম, তখন হৃদয় রামসাগরে

যাইবার উৎসাহে-আগ্রহে পূর্ণ, কিন্তু শেষ রাত্রিতে জাগরিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। দেখিলাম —অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আছে। ভাবিলাম—সর্ব্বনাশ, সব মাটি হইল। বড়ই বিমর্ষ হইয়া নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। ভোরে জাগিয়া দেখি— বৃষ্টিটা ধরিয়াছে বটে, কিন্তু আকাশ এখনও ঘনঘটাচ্ছন্ন; দেখিয়া বোধ হয়—বৃষ্টি নিশ্চয়ই সমস্ত দিন ব্যাপিয়া হইবে—তবে ত আর কিছুতেই যাওয়া হয় না। যাহা হউক, আমি ও আমার বাসার নিকটস্থ রাম-সাগর-যাত্রী জনৈক পরিচিত ব্যক্তি আমাদের প্রধান উদ্যোগী বনবিহারী বাবুর বাসায় গেলাম; দেখি, তিনিই বা কি স্থির করিতেছেন।— দেখিলাম—তিনিও বিষণ্ণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু নিরাশ হন নাই। তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণবালকটি আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া বলিতে লাগিল— "বাবুজি, বরখা কোভি নেহি হোগা"। যাহা হউক 'ঠাকুরের ইচ্ছায় কি হয় দেখা যাক্' ভাবিয়া, আমরা সেখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে গায়ক কেশববাবু আসিয়া জুটিলেন। তখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইতেছে। তাঁহার আগমনে আমাদের উৎসাহ আবার ফিরিয়া আসিল। সকলে মিলিয়া স্থির করিলাম যে, কয়েকটি ভাল ওয়াটারপ্রুফ্ ত্রিপল লইয়া যাওয়া যাক্, তা হা হইলে বৃষ্টি হইলেও আমাদের বিশেষ কষ্ট হইবে না। পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত হইয়ছিল যে, আমাদের খাদ্যদ্রব্যাদি, কাষ্ঠ ও বাসনপত্র একখানি গোশকটে করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইবে— সুতরাং ত্রিপলগুলি পাঠাইবারও চিন্তা নাই। ত্রিপলেরও অভাব নাই— আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে একজন বড় পাটের মহাজন ছিলেন— ঠাকুরের বড় ভক্ত—তিনি আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহারই বাসা হইতে ত্রিপল রসি ইত্যাদি লওয়া হইল। তখন আবার আমাদের পুরাতন উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে মেঘও ক্রমে কাটিয়া আসিতেছে দেখিয়া, আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না—সকলের মুখে আবার হাসি দেখা দিল। আনন্দে বন্ধুগণ "গুরুজিকী জয়" শব্দে বাসাখানি মাথায় করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু আবার আর এক গোলযোগ—যাঁহার হারমোনিয়ম বাজাইবার কথা ছিল, তিনি ইতিমধ্যেই ভাসিয়া পড়িলেন—তাঁহারই আবার হারমোনিয়ম দিবার কথা ছিল, তিনি তাহাও দিতে পারিলেন না। তিনি ইহার জন্য একটু মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা আমাদের উৎসবের এই অঙ্গহানি দেখিয়া আবার ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু নিজেরা চেষ্টা না করিয়া কেবল ঠাকুরকে ডাকিলে কোন "ফয়দা" হয় না মনে করিয়া, দুইটি বন্ধু দুই যায়গায় হারমোনিয়মের অনুসন্ধানে গেলেন। ঐ দুই স্থানেই হারমোনিয়ম মিলিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অল্প কালের মধ্যেই দুইজনেই দুইটি হারমোনিয়ম লইয়া ফিরিলেন দেখিয়া আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু বাদক কৈ? বাজাইবে কে? আমরা ত সকলেই এক একজন ধনুর্দ্ধর—গাইতে বাজাইতে তানসেনের ছোট ভাই—সুতরাং বাদকের জন্য বড় ভাবনায় পড়িলাম। এই একটু এত ক্ষুদ্র কার্য্যে এত বাধা—কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ঠাকুরের ইচ্ছায় যখন সব সুবিধা হইয়া যাইতেছে, তখন বাদক নিশ্চয় মিলিবে। আর দেরি করা যায় না, বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে, ঠাকুরের ইচ্ছায় দিনটি ভারি পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং গাড়ী রওনা করিয়া দিয়া আমরা সকলেই নগ্নপদে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। সকলের আগে আগে বনবিহারী বাবু—ঠাকুর, স্বামীজি ও মা কালীর ছবি নীলবর্ণের কাপড়ে জড়াইয়া মাথায় করিয়া লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে আমরা রাস্তায় যাহাকে দেখি, তাহাকে বলি,—"মহাশয়, বাজাইতে পারেন? চলুন না, রামসাগরটা দেখিয়া আসি?" কিন্তু কেহই স্বীকৃত হইলেন না। আমি ত নূতন মানুষ—অগত্যা আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু সহরের পুরাণ বন্ধুরা রাস্তায় রাস্তায় "বাদক কৈ, বাদক কৈ" বলিয়া একরূপ ফিরি করিতে করিতেই চলিলেন। ইহাতে কেহ হাসিলেন, কেহ রাগিলেন, কেহ চুপ করিয়া রহিলেন। আমাদের বাদক জুটিল না। কিন্তু তথাপি আমাদের মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া দিতে লাগিল যে, নিশ্চিতই বাদক মিলিবে।

যাহা হউক, ক্রমে সহর ছাড়াইয়া গ্রামে পড়িলাম। তখন বাদকের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া, তন্ময় হইয়া মধুর গ্রাম্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। নীল স্নিগ্ধ মাঠ—ছোট ছোট ধান ও পাটের ক্ষেত। সবুজ রঙ্গের ছোট ছোট জঙ্গল, মাঝে মাঝে বেত ও বাঁশঝাড; দিনটা মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর—তাহাদের সম্মুখে নগ্ন গ্রাম্যশিশুগণ ক্রীড়ানিরত। বড় সুন্দর দৃশ্য। বহু দিন সহরে বাস করিবার পর যিনি গ্রামের এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন এ দৃশ্য কত মিষ্ট লাগে। আমরা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এক স্থানে দেখিলাম—রাস্তার এক ধারে একটা ফুলগাছে অনেক ফুল ফুটিয়া আছে। দেখিয়াই হঠাৎ মনে হইল—তাইত, ঠাকুরের পূজার ফুল ত আমরা সংগ্রহ করিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তখনই একজন লাফাইয়া গাছে উঠিলেন। যথেষ্ট ফুল সংগ্রহ করিয়া লওয়া গেল। মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া গান ধরিলাম। ছয় মাইল রাস্তা অতি শীঘ্র ফুরাইয়া আসিল। ঐ বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে রামসাগরের উচ্চ চালা দেখা যাইতেছে। পুকুরের চালা দেখিয়া, বাস্তবিকই ছোট পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়। ক্রমে আমরা রামসাগরের তটে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কি প্রকাণ্ড দীঘি, হিন্দু রাজাদিগের সময়ের হইলে, এ অতি প্রাচীন কীর্ত্তি। এখনও দীঘিটির জল কেমন পরিষ্কার, কেমন স্বচ্ছ। অনেক নির্ম্মল জল দেখিয়াছি কিন্তু এমন কোথাও দেখি নাই। শুনিলাম—অনেক সাহেব সুবা বড়মানুষ গাড়ী করিয়া এখান হইতে পানীয় জল লইয়া যায়। দীঘিটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা, প্রস্থে কিছু কম। দীঘির পরিধি এক মাইলের উপর হইবে। কিনারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুমান হয়, জল অনেকটা শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও যে জল আছে, তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই মানুষের ডুবজলের অনেক অধিক। পশ্চিমদিকে বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী শোভিত একটি সুদৃশ্য ঘাট, উহা এখনও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অবিকৃতভাবে দণ্ডায়মান আছে। দীঘির উত্তরের চালার নিম্নে তাহার ঠিক মাঝখানে এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। আমরা প্রথমেই সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ঐ অট্টালিকাটি

যে দেবমন্দির ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর যিনি এই দীঘি খনন করিয়াছেন, তিনিই যে এই দেবমন্দিরেরও প্রতিষ্ঠাতা, ইহাও অনায়াসে অনুমিত হয়। মন্দিরের মাঝখানে বিগ্রহের স্থান ছিল। আশে পাশে ৬টি ছোট ঘর। ঘরে ৭ জোড়া কবাট ছিল এবং কবাটগুলিও অতি বৃহদায়তনের ছিল, চিহ্ন দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম। মন্দিরের নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার, শিল্পহিসাবে ইহা যে একটি বিশেষ মূল্যবান্ জিনিস, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এক্ষণে কেবল প্রাচীন কারুকার্য্যের সাক্ষি-স্বরূপে অতিকষ্টে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয়, ২০।২৫ বৎসর পরে আর দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিবে না। যেরূপ বোধ হইল, তাহাতে এখনও যত্ন করিলে এই প্রাচীন কীর্ত্তিটি রক্ষা করা যায়। এমন কি, দেবমন্দিরস্বরূপই পুনঃ ব্যবহৃত হইতে পারে। এমন কি কেহ নাই, যিনি এই প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিতে পারেন? স্থানটি যেরূপ নির্জ্জন ও শান্তিপূর্ণ, তাহাতে দেবমন্দির, আশ্রম বা মঠের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ইহা দিনাজপুরের স্বনামধন্য পরমধার্ম্মিক মহারাজার অধিকারভুক্ত। কেহ উদ্যোগী হইলে, মহারাজ নিশ্চয়ই এই মন্দিরটি ও পার্শ্ববর্ত্তী কিছু স্থান অনায়াসে দান করিতে পারেন বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। এদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য আশ্রম বা শাখা মঠ ইত্যাদি নাই বলিলেই হয়। এ প্রদেশে ঐ প্রকারের অনুষ্ঠানের অভাব অনেকেই বোধ করিতেছেন। সুতরাং উপযুক্ত চেষ্টা হইলে, খুব সম্ভবতঃ ওদিকে ভাল কাজকর্ম্ম হইতে পারে। ঠাকুরের কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন। যাহা হউক, আমরা বহুকালের অব্যবহৃত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। দেখা যায়, প্রাচীন অট্টালিকার উপর প্রায়ই বট ইত্যাদি গাছ জন্মিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু এ বাটি এতই দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত যে, এপর্য্যন্ত কোন গাছে ইহার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করিতে পারে নাই। আমরা কয়েকজন সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়া, চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। পরে বেলা অনেক হইয়াছে দেখিয়া, নামিয়া আসিলাম।

এদিকে আমাদের রসদ লইয়া গাড়ীও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অন্যান্য বন্ধুগণ পশ্চিমপারের বাঁধাঘাটের তীরস্থ একটি সুন্দর বটমূলে পরিষ্কৃত স্থান দেখিয়া আড্ডা করিয়াছিলেন। গাছের মূলটি বেশ বাঁধান ও উচ্চ। সেখানে বেশ করিয়া ঠাকুর, স্বামীজি ও মা কালীর মূর্ত্তি বসান হইল এবং সম্মুখে বৃক্ষতলে ত্রিপল ইত্যাদি পাড়িয়া ভক্তগণের বসিবার স্থান করা হইল। ইতিমধ্যে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। দিনাজপুর স্কুলের একটি বালককে পুকুরের পাড়ে দেখা গেল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে—সে রামসাগর দেখিতে আসিয়াছে এবং আমরাও যে এখানে আসিব, সে কথাও সে বিশেষ অবগত আছে। বিশেষ আনন্দের কথা এই যে,—সে বেশ হারমোনিয়ম বাজাইতে পারে। আনন্দে বন্ধুগণ ঘন ঘন ঠাকুরের জয়ধ্বনি গাহিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশের মহাগম্ভীর শান্তি ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন দিবা দ্বিপ্রহর। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। তথাপি একটি মনুষ্যও আমরা সে প্রদেশে দেখিতে পাইলাম না। কিছু দূরে কয়েক ঘর মুসলমান গৃহস্থ আছে বটে, কিন্তু তাহারা বড়ই শান্তিপ্রিয়, বোধ হইল—যেন গোলমাল করিতে জানেই না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম তাজপুর এবং ইহাও দিনাজপুরের মহারাজের এলাকা। ইহার উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব্বে বহুবিস্তৃত মাঠ—জনসমাগম একেবারে নাই। এস্থানে আসিয়া ক্ষণেকের জন্য জনকোলাহলময় সংসারের কথা অনায়াসে ভুলিতে পারা যায়। ঠাকুর যেন এই অপূর্ব্ব স্থানে হাস্যময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ঠাকুরকে ত প্রতিদিনই দর্শন করি, কিন্তু আজি এখানে তাঁহার যে শোভা খুলিয়াছে, এমন ত কোন দিন দেখি নাই। সংসার-গন্ধহীন বিমল বিজন শান্তিময় স্থানই কামকাঞ্চনত্যাগের আদর্শ দেবতার উপযুক্ত বটে! ভজন গান হইতে লাগিল। গীত-বাদ্যের সুমধুর শব্দ বাপীতটে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভজন-সমাপ্তির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে কতিপয় বন্ধু রামসাগরের বিমলজলে যথেচ্ছ স্নানাদি সমাপন করিয়া, ঠাকুরের ভোগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সকলের স্নান সমাপন হইলে, ঠাকুরের পূজা হইল, সেদিন সেস্থানে পুষ্পমাল্যে পুষ্পশয্যায় ঠাকুরের যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল,

তাহা আমরা কেহই জীবনে কখন ভুলিব না। হায় ঠাকুর! তোমার আসন কি এস্থানে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না?

বিবিধ অন্নব্যঞ্জন ও পায়স ইত্যাদি প্রস্তুত হইলে, ঠাকুরের ভোগ আরতিও হইতে লাগিল। ভক্তগণ দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে স্তোত্রপাঠ ও গান করিতে লাগিলেন। ভোগ হইলে, মহাসমারোহে ও আনন্দে সেই রামসাগর-তীরে আমরা প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেলাম। কি অপূর্ব্ব আনন্দ! কি অপূর্ব্ব ভাব! সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলাম! এমন সুখ বহুদিন হয় নাই। সে দিনটা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে পরম নিষ্ঠাবান্ একটি মহা সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কতিপয় রঙ্গপ্রিয় বন্ধু তাঁহাকে লইয়া, বিবিধ উপায়ে রঙ্গ করিতে লাগিলেন। মুহু-র্মুহুঃ হাসির রোল উঠিতে লাগিল। আহা! সে প্রাণখোলা বিমল অট্টহাসি যে কত মধুর, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? প্রসাদ পাইয়া দীঘির জলে আচমন ও কেহ কেহ গাত্র ধৌত করিলেন। সঙ্গের গাড়োয়ান ও ভৃত্যা-দির আহার হইলে, উহারা স্থানটি পরিষ্কৃত করিতে ও বাসনাদি মাজিতে লাগিল। আমরা ঠাকুরের সম্মুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম, আবার কিছুক্ষণ গীতবাদ্য হইল। এদিকে দিবাবসান হইল। আমরা সকলে মিলিয়া দীঘিটা একবার ভাল করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে গেলাম, আমাদের সঙ্গের বালকটি ও দুই একটি বালকস্বভাব বন্ধু দীঘির ধারে ঢিল ছুঁড়িয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ দেখিয়া বোধ হইল, দীঘির ধারেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ছিল, এক্ষণে তাহাদের ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ঠাকুর উঠাইয়া মাথায় লওয়া হইল। দীঘির ধার অন্ধকার হইল, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। আমাদের গাড়ী বাসন কোসন ইত্যাদি লইয়া রওনা হইয়া গেল। আমরা আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া, সেই মহামহিমাময় দৃশ্য-শোভিত পবিত্র স্থান মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিদায় হইলাম। রাত্রি অন্ধকারময়, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু আমরা নিরাপদে আসিয়া দিনাজপুরে পৌছিলাম। বাসায় পৌছিবার পূর্ব্বে বৃষ্টি হয় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

বিশ্বরূপা।

করালি, অয়ি কালি,
জগত জ্বালায়ে তুলেছ তোমার
রূপের অনল জ্বালি।
কোটী কোটী মুখ, কোটী কোটী পদ,
অসংখ্য কোটী করে
ধৃত প্রহরণ, ছিন্ন মুণ্ডে
শোণিতের ধারা ঝরে।
শোণিতের ধারা নদী হ'য়ে বহে
রাঙ্গা চরণের তলে,
এলোকেশ উড়ে প্রলয়-পবনে
নব-শিব-মালা গলে।

করালি, অয়ি কালি,
জগত জ্বালায়ে তুলেছ তোমার
রূপের অনল জ্বালি।
ধ্বক্ ধ্বক্ জলে ললাটে বহ্নি
মারী দুর্ভিক্ষ দাহে,
কোটী কোটী তোর নয়নের তারা
বহ্নি জ্বলিছে তাহে।
বহ্নি ঝলকে উঠে দশদিকে
দীপ্ত জ্যোতির ধার,
রূপের আলোকে ঘুচিল নিবিড়
কেশের অন্ধকার।

আমি দশদিকে যেথা চাই,
অসংখ্য-রূপা ভুবন ভরিয়া
তোমারে দেখিতে পাই—

দেখি তৃষার্ত্ত অযুত রসনা
মাগিছে শোণিত ধার,
দেখি কত শত ক্ষুধার্ত্ত-বেশে
দুয়ারে আমার দাঁড়ায়েছে এসে
রুগ্ন, আতুর, বিকল মূর্ত্তি
সংখ্যা নাহিক তার।

করালি, অয়ি কালি,
এস মা রুদ্রে দিব এ জীবন
তোমার চরণে ডালি।
স্নেহময়ী বেশে নিশিদিন তুমি
পিয়ায়েছ সুধা-ধাব,
সে অমৃত-রসে আছে কি শকতি,
পরিচয় লহ তার।
এত রক্ত আছে শিরায় শিরায়
পিপাসা মিটায়ে দিতে পারি তায়,
অযুত জিহ্বায় তোর,
এস হয়ে কোটী অনাথ আতুব
সব দুঃখ পারি ক'রে দিতে দূর,
এত সেবা আছে এত প্রেম আছে
প্রাণ-ভাণ্ডারে মোর।

করালি, অয়ি কালি,
লহ বিশ্বরূপা অনন্ত প্রাণ
অনন্ত রূপে ডালি।'

শ্রীসরলাবালা দাসী।

উদাসীন পথিক।

(১)

চতুর্দ্দিক্ নীরব ও নিস্তব্ধ। ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশ নিস্তব্ধভাবে বিরাজমান; সম্মুখে বিশাল বারিধি অবিরাম গর্জ্জন করিতেছে। উত্তাল তরঙ্গরাজি রুদ্রমূর্ত্তি ধূর্জ্জটির ন্যায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। সমুদ্রতটে একা বসিয়া রহিয়াছি। বিশ্বজগৎ নরিব ও নিস্তব্ধ। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বালুপ্রান্তর বহুদূর ব্যাপিয়া ধূ ধূ করিতেছে। কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন নাই। সমস্তই জনশূন্য ও নীরব। আমি একা বসিয়া রহিয়াছি। অসীম বারিধির দিকে চাহিয়া অনন্ত প্রকৃতিরাজ্যের ক্রীড়া দেখিতেছি।

কোথা হইতে আসিয়াছি কে জানে, কোথায় বা যাইতেছি তাহাই বা কে জানে! উদাসীন পথিকের মত বিশ্বপ্রকৃতির অসীম রাজ্যে কোথায় যাইতেছি, কোন্ অজানার টানে চলিতেছি, তাহার কিছুই জানি না। কোন্ ধ্রুবলক্ষ্যের উদ্দেশে, কোন্ জীবনদেবতার টানে এরূপ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া চলিতেছি, তাহা কে বলিয়া দিবে?

"অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
যাক্ সুখ যাক্ দুঃখ, যাক্ সব ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমি গো একক যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু দিগ্বিদিক্ হারাইয়া।
সীমাহীন বারিরাশি কোথায় যাইছে ভাসি,
সীমাহীন তার পানে নীরবে চাহিয়া।
যে দিকে তরঙ্গ বায়, সে দিকে বহিয়া যায়,
কে জানে কোথায় যায়, ভাসিয়া ভাসিয়া।"

(২)

সুদূর অতীতে যুগযুগান্তর পূর্ব্বে কোন্ সময়ে যে এজগতে প্রথম ব্যক্ত হইয়াছিলাম, তাহা কে বলিবে! কি কারণে বা কাহার প্রেরণায় এই সংসাররাজ্যে আসিলাম, তাহা জানি না। কতকাল অতীত হইয়া

গিয়াছে; কত যুগ ব্যাপিয়া এই সীমাহীন সুদীর্ঘ পথে চলিতেছি! আরও কতকাল চলিতে হইবে, তাহা কে জানে?

এই সুদীর্ঘ পথে চলিবার সময় পুনঃ পুনঃ কত ঝড়বৃষ্টি সহিতে হইয়াছে। সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, অনুকূল প্রতিকূল বিবিধ ঘটনারাশির মধ্য দিয়া এই সীমাহীন পথে চলিতেছি। কখন প্রকৃতি দেবীর শান্ত স্নিগ্ধ প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া প্রফুল্লমনে চলিতেছি; আবার কখন বা তাঁহার ভীম রুদ্র ভীষণরূপ দেখিয়া ত্রস্ত ও ভীত হইতেছি; সেই ঘন ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কম্পিতহৃদয়ে ভয়ে ভয়ে চলিতেছি। এইরূপে বিবিধ দ্বন্দ্বরাশির মধ্য দিয়া অবিরাম ঘাত প্রতিঘাত সহিতে সহিতে গন্তব্য স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি।

পথে চলিবার সময় মনোমুগ্ধকর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কতবার অপথে বিপথে কুপথে গমন করিয়াছি। দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া অসহায় ভাবে কত কষ্ট কত বেদনা সহিতে হইয়াছে। এত দুঃখ এত কষ্ট ভুলিয়া গিয়া আবার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছি।

কতদিনে যে এ মোহ দূর হবে, কত দিনে যে এই কষ্টকর পথ ভ্রমণ শেষ হবে, তাহা কে জানে! কতদিনে যে এই দুঃখের হাত হ'তে ত্রাণ পাব, তাহা জানি না।

"দিন যায় ও গো দিন যায়, দিনমণি যায় অস্তে!
নাহি হেরি বাট, দূরতীরে মাঠ, ধূসর গোধূলি ধূলিময়!
ঘরের ঠিকানা হ'ল না গো! মন করে তবু যাই যাই!
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো, সে দিকের পথ চিনি নাই!"

(৩)

তিনিই ধন্য, যাঁহার এই কষ্টকর পথভ্রমণ শেষ হইয়াছে। তাঁহারই জীবন সার্থক, যিনি শান্তিময় গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর তাঁহাকে অসহায়ভাবে এই সংসার-মরুতে ভ্রমণ করিতে হইবে না। তিনি এই নির্ম্মম সংসাররাজ্য অতিক্রম করিয়া শান্তিময় ধ্রুবধামে পৌঁছিয়াছেন; তিনিই প্রকৃত সুখ বা চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন।

এতদিন তাঁহাকে অজ্ঞাত-অপরিচিত-দেশে গমনশীল পথিকের ন্যায় বিজন প্রান্তরে একাকী ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, কত উদ্বেগ ও শঙ্কার সহিত পথান্বেষণ করিতে হইয়াছে, ভীতি ও উদ্বেগের সহিত কত সাবধানে পথ চলিতে হইয়াছে, পথে বারম্বার কত কষ্ট কত দুঃখ সহিতে হইয়াছে, এক্ষণে সে সমস্ত অশান্তি ও ভয় দূরে চলিয়া গিয়াছে; দুঃখ ও বেদনা দূর হইয়া গিয়াছে।

"গতাধ্বনো বিশোকস্য বিপ্রমুক্তস্য সর্ব্বথা।
সর্ব্বগ্রন্থিপ্রহীণস্য পরিদাহো ন বিদ্যতে ॥"

যিনি পথের পারে গিয়াছেন, যিনি বিশোক, সর্ব্বথা মুক্ত ও সর্ব্বগ্রন্থি- বিহীন, তাঁহার আর কোন জ্বালা বা যন্ত্রণা থাকে না। তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়াছেন।

তিনিই ধন্য, যিনি সংসাররাজ্যের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া সত্য বস্তু দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আর কোন সংশয় নাই। তাঁহার অজ্ঞান ও মোহ সমূলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নয়নের আবরণ খুলিযা গিয়াছে। তিনি দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া প্রকৃতিরাজ্যের যাবতীয় রহস্য অবগত হইয়াছেন। তাঁহার আর কোন আসক্তি বা মোহ নাই; তিনি তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন; চিরকালের জন্য বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন; *চিরকালের জন্য শান্তিলাভ করিয়াছেন।*

(৪)

"বহু জন্ম জন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে* কোথা রয়েছে আজি এ গৃহ† যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত মম তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ, সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ অতি দুঃখকর। হে তৃষ্ণা,

* অবিদ্যামোহজনিত তৃষ্ণা, আসক্তি, বাসনা—ইহারাই জন্মের কারণ।
† গৃহ—দেহ।

হে মোহ, হে প্রলোভন, তোমরা আর আমাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ বা সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করাইতে পারিবে না। তোমরা দূরে চলিয়া গিয়াছ; তোমরা আর আমার নিকটে আসিতে সমর্থ হইবে না। আজ আমি চিরকালের জন্য শান্তি ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি।"

আর কোন সংশয় নাই, "আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা যাইব" এ সমস্ত রহস্য আজ আমি জ্ঞাত হইয়াছি। জীব কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় বা যাইতেছে, কেনই বা জীব বিপথে গমন করে, প্রকৃত পন্থাই বা কি, কিরূপেই বা সেই সুপথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ সমস্ত তত্ত্ব আজ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতেছি। শ্রুতি, অনুমান, মতমতান্তরের বিশ্বাস দূরে চলিয়া গিয়াছে। মোহ আবরণ দূর হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতিরাজ্যের যাবতীয় রহস্য আজ প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি,যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি; আর জানিবার কিছুই নাই, চাহিবার কিছুই নাই। যাঁহাকে দেখিবার তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে অবলোকন করিতেছি, তাঁহাকে হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব কবিতেছি। শরীর মন প্রাণ সর্ব্ব বস্তুতেই তাঁকে অনুভব কর্‌ছি। সর্ব্বত্রই তাঁকে দেখ্‌ছি। বিরাট্‌রূপ ধারণ করে তিনি আমার চক্ষের সাম্‌নে ভাস্‌ছেন। কেবল তিনি আর আমি। সমস্তই নীরব নিস্তব্ধ, কেবল তিনি আব আমি। আমি তাঁর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছি, সেই নিস্তব্ধ মহাসাগবে,সেই শান্তিসাগরে মিশিয়ে যাচ্ছি। সমস্তই নীরব নিস্তব্ধ; চতুর্দ্দিকে সর্ব্বব্যাপী নিস্তব্ধতা,কৈবল্য,শান্তি ও নির্ব্বাণ!!!

সেবানন্দ।

শ্রীভাষ্য।

(সমালোচনা।)

শ্রীভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত সূত্র শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যকৃত ভাষ্য, সূত্র ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ আছে। মূল্য গ্রাহকের পক্ষে ২।/॰আনা, নচেৎ ৩৵৹ আনা।

এখণ্ডে ব্যাসসূত্রের ৫ম সূত্র হইতে প্রথম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আছে। এখনও তিন অধ্যায় প্রকাশিত হইতে অবশিষ্ট আছে, প্রাপ্তি-স্থান ২৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, লোটাস লাইব্রেরী।

উদ্বোধনপাঠকের নিকট ভক্তকুলচূড়ামণি আচার্য্য রামানুজ অপরিচিত নহেন। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যমে যেমন রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মত এদেশের জনসাধারণে প্রচারিত হয়, তদ্রূপ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পরিশ্রমে উদ্বোধনপাঠক তাঁহার জীবনচরিত অবগত হইয়াছেন। সুতরাং এস্থলে আচার্য্যদেবের পরিচয়প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক শ্রীভাষ্যের উপযোগিতা যে কত অধিক তাহা না বলিলেও চলিতে পারে। তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধযুগের পর যদি প্রেম বা শুদ্ধাভক্তির ভিত্তি নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা এই শ্রীভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে। ভারতে নিরীশ্বরমতাবসানে এই শ্রীভাষ্যের আবির্ভাব অমানিশাবসানে অরুণকিরণের ন্যায়।

আচার্য্য শঙ্করপ্রচারিত অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আচার্য্য রামানুজ যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন, এরূপ আর কোন ব্যক্তিই করিতে সমর্থ হন নাই। আচার্য্যের এই প্রতিবাদ ভক্তসম্প্রদায়ের অতীব চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকে। এই প্রতিবাদে রামানুজের অপূর্ব্ব বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা যেমন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বুদ্ধির দৃঢ়তা সম্পাদন করে এবং ভগবদ্‌ভজননিষ্ঠা স্থিরা করে, জ্ঞানী সম্প্র-দায়ের ইহাতে তদ্রূপ বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিবে সন্দেহ নাই। ইহা পড়িলে মনে হয়,অদ্বৈতমতাবলম্বী যদি এতদুত্থাপিত আপত্তিগুলির যথাযথ উত্তর দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অদ্বৈতমতসম্বন্ধীয় সন্দেহা-ন্ধকার সব দূর হয় নাই। অনেক অদ্বৈতমতাবলম্বী মনে করেন, রামানুজমত বেদবিরুদ্ধ, কিন্তু আমরা অন্যরূপ ভাবি। আমরা ইহারও উপযোগিতা উপলব্ধি করি। অখণ্ড অদ্বৈতব্রহ্মের প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে উপাসনাব্যাপার চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, অশুদ্ধ চিত্তে তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানও স্ফূর্ত্তি পায় না। মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন লালসায় লোকে যেমন

দর্পণখানি পরিমার্জ্জন করিয়া উহাকে নির্ম্মল করে, তদ্রূপ চিত্তমুকুরে অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমুৎসুক ব্যক্তি উপাসনারূপ চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম আচরণ করে। বস্তুতঃ যাঁহারা সাধক, কেবল পাণ্ডিত্য লইয়া উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা বুঝেন যে, উপাসনাকালে এই বিশিষ্টাদ্বৈত-মতানুমোদিত বুদ্ধির উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। এইজন্য ইহার স্থান বেদমধ্যে দৃষ্ট হয়, এজন্য ইহা অদ্বৈতজ্ঞানের উপায়স্বরূপ এবং উহার সহিত অবিরুদ্ধ। এবং এইজন্যই আমরা ইহাব বহুল প্রচার কামনা করি।

গ্রন্থসম্পাদন মোটের উপর ভালই হইতেছে। মূল ও অনুবাদ থাকায় বড়ই সুবিধা হইয়াছে, কারণ, কেবল মূল যেমন দুর্ব্বোধ্য, কেবল অনুবাদও তদ্রূপ অবিশ্বাস্য। যাহা হউক ইহাতে ভ্রম প্রমাদ খুব অল্প। অনুবাদের ভাষা পড়িয়া গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় ও সংস্কৃত অংশটী বুঝিতে পারা যায়। দুর্ব্বোধস্থলে প্রায়ই টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে—উহা দ্বারা ঐ দুরূহস্থলগুলি বুঝিবার যথেষ্ট সাহায্য হয়। তথাপি আমাদের মনে হয়, গ্রন্থখানি আরও একটু সরল করিতে পারিলে ভাল হইত। এতদুদ্দেশ্যে প্রথমতঃ বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এক একটী বিচারের শেষে অনুবাদের পাদদেশে বিচারের একটি সারসঙ্কলন করিয়া দিলে ভাল হইত। দ্বিতীয়তঃ, মনে হয়, পণ্ডিত মহাশয় কোন একটী অশিক্ষিত ব্যক্তিকে মনে মনে সম্মুখে রাখিয়া অনুবাদ করেন না। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের বক্তব্য বলিব। ধরা যাউক এই খণ্ডের প্রথম সূত্রটীর অর্থ। সূত্রটী "ঈক্ষতের্নাশব্দম্"। ইহার "পদচ্ছেদ" মধ্যে দেখা যায়, পণ্ডিত মহাশয় লিখিতেছেন—"[পদচ্ছেদ—ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষ-ধাতুর প্রয়োগ হেতু) ন (নহে) অশব্দং (বেদে অনুক্ত, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) জগৎকারণ]। আমরা বলিব, ইহাতে "সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি" ও "জগৎকারণ" পদগুলি না দিলে ভাল হইত। কারণ, ইহারা সূত্রে নাই; উহ্য আছে। পণ্ডিত মহাশয় বলিতে পারেন, উহ্য পদগুলি না দিলে অর্থ স্পষ্ট হইবে না, তদুত্তরে আমরা বলি যে—উহ্য পদগুলি "অন্বয়" নামে পৃথক্‌ভাবে দিলে ভাল হইত। কারণ, ঐ কয়টী পদই কেবল এস্থলে উহ্য নহে এবং এ সূত্রের অন্বয়ও আবশ্যক। অবশ্য পণ্ডিত

মহাশয় উক্ত পদচ্ছেদের নিম্নে সরলার্থ মধ্যে অন্বয় দিয়াছেন, কিন্তু তথায় প্রতিশব্দাদি এমনভাবে এত দিয়াছেন যে, যাহাদের লক্ষ্য করিয়া পদচ্ছেদে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে ঐ অন্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়াছে। আমরা পণ্ডিত মহাশয়েরই কথা লইয়া বলি, এস্থলে যদি তিনি অন্বয়ের নামে বলিতেন—"(তৎ জগৎকারণং ব্রহ্ম) ন (সাংখ্যোক্তং প্রধানং, যতঃ তৎ) অশব্দম্। (কুতঃ—) ঈক্ষতেঃ।" অর্থাৎ (সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম সাংখ্যোক্ত প্রধান) নহে (যে হেতু তাহা) অশব্দ অর্থাৎ বেদে অনুক্ত; (কেন ?)—ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগ আছে বলিয়া।" এবং ইহার পর সরলার্থটী দিতেন, তবে ভাল হইত। আসল কথা, প্রতি সূত্রের কেবল মাত্র উহ্য পদগুলি দিয়া একটী অন্বয় অত্যাবশ্যক। সরলার্থ তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। তাহার পর এ গ্রন্থে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অভাব লক্ষিত হইল, তাহা এই—ভাষ্যের শ্রুতপ্রকাশিকা নাম্নী প্রসিদ্ধ টীকাটী। একথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। আমরা বলি, রাজা বাহাদুর এবং পণ্ডিত মহাশয় এই টীকাটী গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাদের দান ও পরিশ্রমের সম্পূর্ণরূপে সার্থকতাসাধন করুন। কারণ, এ দরিদ্র দেশে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ কতদিনে হইবে তাহা বলা যায় না, এবং অন্যত্র কোথাও ইহার টীকা আর পাওয়া যায় না। আমরা আরও আশা করি যে, গ্রন্থখানি শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে।

রামকৃষ্ণমিশন
কর্ত্তৃক
বন্যাপীড়িতগণের সেবাকার্য্য।

১। কাঁথি—ভগবান্‌পুর।

কাঁথি অঞ্চলে প্রেরিত সেবকগণের নিকট আমরা যেরূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তথাকার অবস্থা অতি শোচনীয়। জল ধীরে ধীরে কমিতেছে বটে, কিন্তু শস্যের আশা নাই বলিলেই হয়।

লোকসকল অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে—গবাদি পশুরও যথেষ্ট খাদ্যের অভাব। গবর্ণমেণ্ট এখনও পর্য্যন্ত বিশেষভাবে সাহায্যদান আরম্ভ করেন নাই। অন্যান্য কয়েক দল বিভিন্ন স্থানে সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু অভাবের তুলনায় ঐ সাহায্য কিছুই নয় বলিলেও হয়। লোকে ক্ষুধার তাড়নে ক্রমশঃ অনেক স্থানে হিংস্রপ্রকৃতি হইয়া উঠিতেছে, স্থানে স্থানে লুটপাট ও ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আমাদের সেবকগণ লিখিতেছেন,' "গতবারের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ও আমরা এরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখি নাই, জীবনে কখন এরূপ দৃশ্য দেখি নাই। সরকার বাহাদুর সাহায্য আরম্ভ না করিলে শুধু সাধারণের সাহায্যে দেশরক্ষা পাইবে না। আমাদের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ৮।১০ মাইল দূর হইতে লোক সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিতেছে।"

আমাদের সেবকগণ ১৯শে অগষ্ট ভগবান্‌পুরে উপস্থিত হন এবং ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় প্রেরিত সেবকগণের নিকট হইতে ৫ মণ চিঁড়া ও মুড়কি ও ২৭টিন জমাট দুগ্ধ পাইয়া ২০শে তারিখে প্রায় ৮০০ দুঃস্থ লোককে উহা বিতরণ করেন।

২৩শে অগষ্ট হইতে রীতিমত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সেবকগণ গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া ঐ তারিখে নিতান্ত দুঃস্থ কয়েকটী পরিবারে নিম্নলিখিত সাহায্য করিয়াছেন :—

গ্রাম	পরিবারসংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্ত লোকসংখ্যা	চালের পরিমাণ
ভগবান্‌পুর	২৭	৬৫	৪/২৷৹
কোটলরি	১৯	৪০	২৷৹
নওকাবার	২	৪	/।৹
কুয়ালবার	১	৩	/৭৷৹
মোট	৪৯	১১২	৭/০ মণ

রামকৃষ্ণ মিশন আপাততঃ এই কেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহে চারি শত করিয়া টাকা পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন এবং ২ দফায় ৮০০৲ ইতি-

মধ্যেই পাঠাইয়াছেন। সেবকগণ লিখিতেছেন, এরূপ সহস্র কেন্দ্র খুলিলেও কাঁথি মহকুমার সমুদয় অভাবমোচন দুঃসাধ্য আর অন্ততঃ ৩।৪ মাস ধরিয়া এইরূপ সাহায্যদান করিতেই হইবে। অতএব এই কার্য্য চালাইতে কি পরিমাণ অর্থের আবশ্যক, সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণ তাহা ভাবিয়া দেখুন।

২। আঁটপুর চাঁপাডাঙ্গা কেন্দ্র।

এই কেন্দ্র ১২ই অগষ্ট খোলা হয় ও ২৫শে ইহার কার্য্য বন্ধ করা হয়। ইহা হইতে বন্যাপীড়িত গ্রামবাসিগণকে উপস্থিত সাহায্য করা হইয়াছে। সেবকগণ নৌকাযোগে বদ্দিপুর, বাদল, বুধুল, গোবিন্দপুর, দিলেকাশ, আমুড়বাটী, অরবিন্দপুর, ঈশ্বরীপুর, কুড়োর ঘাট, ঘুঘুনি, রাণীবাজার, পঞ্চবটীতলা ও হাওয়াখানা গ্রামে যাইয়া চাল, ডাল, চপাটি, চিঁড়া, জমাট দুগ্ধ, কাপড় প্রভৃতি বিতরণ করেন। ১৫ই অগষ্ট হইতে ইহাঁরা ৩ দলে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে চাঁপাডাঙ্গা, রাজবোলহাট ও হরিহরপুরের দিকে গমন করেন এবং পথে যে সকল গ্রাম পড়িতে লাগিল, সেই গুলিতে সাহায্য করিতে করিতে বিভিন্ন স্থানে দামোদর পার হইয়া যথাক্রমে রামপুর, রসুলপুর ও খানাকুল কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত গমন করেন। তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৫০০ লোককে সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

৩। খানাকুল—কুড়কুড়ি।

বড়বাজার লোহাপটি বারোয়ারির কর্তৃপক্ষীয়গণের অনুরোধে ১৮ই অগষ্ট মিশন আর একদল সেবককে খানাকুল অঞ্চলের গ্রামবাসিগণকে উপস্থিত সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। উক্ত বারোয়ারির কর্তৃপক্ষীয়গণ মিশনের হস্তে ১০০/০ মন চাল, ১০ মন ডাল, ২ মন লবণ, সর্ষপ তৈল ২।০, আলু ২/০ মন এবং কিছু সাগু, বার্লি, জমাট দুগ্ধ ও মিছরি দেন। তাঁহারা চাঁপাডাঙ্গার ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কুড়কুড়ি গ্রামে ২০শে অগষ্ট উপস্থিত হন এবং ২১শে হইতে গ্রাম পরিদর্শনান্তে হেলান, তাঁতশাল, সেকেন্দরপুর প্রভৃতি প্রায় সাতটী গ্রামে প্রায় ২০০ পরিবারকে সাহায্য করেন। পরে তাঁহারা তাঁহাদের মধ্য হইতে এক দলকে

দিবাস্তপুর প্রভৃতি দূর দূর গ্রামসমূহের দিকে ৩৭/০ মন চাল ও ৩ মন ডাল দিয়া প্রেরণ করেন; আর মায়াপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী গ্রামসমূহেও ১৫মন চাল বিতরণ করা হয়। সেবকগণ লিখিতেছেন, এখানে অনেক লোক গৃহশূন্য হইয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য সাহায্যের বিশেষ আবশ্যক এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

৪। নারাণদাঁড়ি কেন্দ্র।

তমলুকের সাবডিভিজনল অফিসার শ্রীযুত শশিভূষণ বসু মহাশয়ের অনুরোধক্রমে ২৪শে অগষ্ট মিশন হইতে আর একদল সেবক নারাণদাঁড়ি যাত্রা করেন। তাঁহারা একদল ৪০মণ চাল, ২২মণ চিঁড়া, ১০ মণ ডাল, ৫ মণ লবণ, ২ মণ মুড়কি, ১ মণ গুড়, ২৪ টিন জমাট দুগ্ধ, ২ মণ চিনি, ৫টিন সর্ষপ ও কেরোসিন তৈল, তেঁতুল, ৫৬ ডজন গেঞ্জি ও কতকগুলি বস্ত্র লইয়া নৌকাযোগে উক্ত স্থানে যাত্রা করেন। আর একদল ষ্টিমারযোগে তাঁহাদের সহিত গেঁয়োখালিতে মিলিত হইয়া তথা হইতে পুনরায় নৌকা করিয়া খাল দিয়া গিয়া হল্‌দি নদী পার হইয়া অতি কষ্টে ২৬শে ঐ স্থানে উপস্থিত হন। তাঁহারা দেখিলেন, গ্রামগুলি দ্বীপে পরিণত হইয়াছে—লোকে অনেক স্থানে হেলা নামক শস্য ও গেঁড়ি গুগলি খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। তথায় এখন রীতিমত দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকের কুটীর এখনও জলমগ্ন—তাহারা বাঁধের উপর বাস করিতেছে। সেবকগণ বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক ব্যক্তি অনশনে মরিয়াছে—তাহার একমাত্র শিশু ডাকবাঙ্গালার সম্মুখে (যথায় সেবকগণ আছেন) আশ্রয় লইয়াছে। সেবকগণ পৌঁছিয়াছেন সংবাদ পাইয়াই বহু লোক দূর দূর গ্রাম হইতে সাঁতার দিয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল—তাঁহারা যাহাদিগকে নিতান্ত অসহায় মনে করিলেন, তাহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া গ্রাম পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, দ্রব্যাদি তাঁহাদের নিকট যাহা আছে, তাহা ৪।৫ দিনেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। ঐ স্থানে নৌকাযোগে ৩০০ মণ চাল পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ঐস্থানে আরও ২।৩টী কেন্দ্র খুলিতে হইবে এবং ভগবানপুরের ন্যায়

ঐস্থানের কার্য্যও অনেক দিন ধরিয়া চালাইতে হইবে। সহৃদয় ব্যক্তিগণের সত্বর সাহায্য প্রার্থনীয়।

টাকা কড়ি বা কাপড় (১) নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বা (২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১২।১৩, গোপাল নিয়োগীর লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা—

এই দুইটী ঠিকানার যে কোন ঠিকানায় পাঠাইলেই চলিবে।

৩০শে অগষ্ট, ১৯১৩

ইতি বশম্বদ
ব্রহ্মানন্দ
প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ,(হাওড়া)।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, অলৌকিক বিনয়, ভক্তি ও ত্যাগের পরম আদর্শ ৺দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার পবিত্র জন্মভূমি দেওভোগ (ঢাকা) গ্রামে মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পূজাপাঠ, সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। প্রায় সাত আট শত ভক্ত পরমানন্দে মহোৎসবে যোগদান করেন।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ডিট্রয়েট নামক স্থানে বিগত ১৫ই জুন হইতে ২২শে জুন পর্য্যন্ত জাতীয় 'নবচিন্তাসঙ্ঘের' (National New Thought Alliance) যে ত্রয়োদশবার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বামী অভেদানন্দ "জীবাত্মার আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আর উহার "বিদ্যালয় সম্মিলনী" (Convention at School) নামক অধিবেশনসমূহে তিনি "আধ্যাত্মিক ক্রমাভিব্যক্তি" এই সাধারণ নাম দিয়া ক্রমান্বয়ে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ বিষয়সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলির নাম এই :— (১) আত্মবিজয় (২) একাগ্রতা (৩) ব্রহ্মানুভূতি (৪) শ্বাসের আরোগ্যকারিণী শক্তি (৫) কর্ম্মই উপাসনা (৬) পরলোকসমস্যা মীমাংসার উপায় (৭) ঈশ্বর।

বিগত ৮ই জুলাই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য উক্ত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ পরলোকগত স্বামী স্বরূপানন্দের জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী প্রকাশানন্দ বিগত জুন ও জুলাই মাসে সানফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দিরে প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদান করেন:—

১লা জুন, আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। আমাদিগকে কি নিজ চেষ্টায় নিজ মুক্তিসাধন করিতে হইবে? আত্মোন্নতিসাধনরহস্য।

৮ই জুন, সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার অধিকারী কে? ন্যায্য ক্রোধ কাহাকে বলে? প্রত্যাদেশ (Revelation) কি সম্ভব?

১৫ই জুন, ঈশ্বরপ্রেম ও ভাবুকতা। আত্মার পুনসংস্কার। এই জন্মে পূর্ণতা লাভ করা কি সম্ভব?

২২শে জুন, অপরের বিশ্বাসে আঘাত করা উচিত নয় কেন? উপলব্ধির বিভিন্ন স্তর। নির্জ্জনবাস প্রবর্ত্তকগণের পক্ষে উপকারী কেন?

২৯শে জুন, সকলেই কি ধার্ম্মিক হইতে পারে? ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব। স্বকৃত বন্ধন।

৬ই জুলাই, আত্মার শক্তিসমূহের অভিব্যক্তির উপায়। দৃশ্যপ্রপঞ্চ। বিচার ও বিশ্বাস।

১৩ই জুলাই, আধ্যাত্মিক সাধনের কয়েকটি ইঙ্গিত। পুত্তলিকা কি কখন আমাদের আদর্শ হইতে পারে? রহস্যবিদ্যা ও কুসংস্কার।

২০শে জুলাই, সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা। অনন্তসম্মিলনে। নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি।

২৭শে জুলাই, সংসার না সন্ন্যাস? সম্পূর্ণ অহংত্যাগ কি সম্ভবপর? ভাবী সত্যযুগের ধারণা কি অযৌক্তিক?

স্বামী পরমানন্দ বোষ্টন বেদান্তসমিতিতে বিগত জুলাই মাসে প্রতি মঙ্গলবার কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রবিবাসরীয়

বক্তৃতাগুলিতে 'ধ্যান' এবং 'আত্মনির্ভর ও আত্মসমর্পণ' সম্বন্ধে হৃদয়-গ্রাহিণী আলোচনা করেন।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ষষ্ঠবার্ষিক (১৯১২ খৃষ্টাব্দের) রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বৎসর উক্ত সেবাশ্রমে ২১৭ জন রোগীকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে, ১৬ জন রোগীকে তাঁহাদের নিজ বাসস্থানে ঔষধপথ্যাদি দিয়া সেবা করা হইয়াছে এবং ৫৬৭৯ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চারি জন দরিদ্র ভদ্রমহিলাকে প্রতি মাসে ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে নিয়মিত সাহায্য করা হইয়াছে।

আশ্রমে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সেবা হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ১৫ জন খ্রীষ্টিয়ান ও ১৫৩ জন মুসলমানকে সেবা করা হইয়াছিল। সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণের মাসিক ও সাময়িক সাহায্যে আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ জমা ২০৭৭৲ খরচ ১৪৬৭।৫, উদ্বৃত্ত ৬০৯॥৶১৫। আশ্রমের এক্ষণে প্রধান অভাব নিজস্ব হাঁসপাতাল বাটী। আশা করি, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ইচ্ছায় এই অভাব অচিরে পূর্ণ হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট ৩০শে অগষ্ট তারিখে উহার বন্যা সাহায্যকার্য্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সাহায্যপ্রার্থনা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা এবারকার উদ্বোধনে অবিকল উদ্ধৃত হইল। উহা প্রকাশিত হইবার পর ঐ কার্য্যের যে প্রসার হইয়াছে, তাহার কতকটা সংক্ষিপ্ত আভাষ দেওয়া যাইতেছে। কাঁথি সবডিভিজনে ভগবানপুর, ইক্ষুপত্রিকা, মহম্মদপুর ও গোপীনাথপুর নামক স্থানে চারিটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথা হইতে প্রায় ৮১খানি গ্রামে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৭০৲ মণ চাল বিতরিত হইতেছে এবং তথায় আরও নূতন নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তমলুক সবডিভিজনের নারাণদাঁড়ি কেন্দ্র হইতে ২৬ খানি গ্রামে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২৪৷০ মণ চাল বিতরিত হইতেছে এবং উহা হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী নরঘাটে আর একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ স্থান হইতে আরও কয়েকখানি গ্রামে সাহায্যের বন্দোবস্ত হইতেছে। ঐ দুইস্থানের কেন্দ্রগুলির জন্য সম্প্রতি কলিকাতা হইতে প্রায় ৪২০ মণ চাউল প্রেরিত হইয়াছে।

খানাকুল—ক্ষুড়কুড়ি কেন্দ্র হইতে বড়বাজার লোহাপটি বারওয়ারি প্রদত্ত আর একশত মণ চাউল বিতরিত হইয়াছে। ঐস্থানে এক্ষণে

খানাকুল স্থানীয় সাহাযাসমিতির সহিত একযোগে কার্য্য করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর আর দুই জন সেবক বাঁকুড়া জেলায় হোদল-নারায়ণপুর গ্রামে স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাহায্য-কেন্দ্রের ভার গ্রহণার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

৩১শে অগষ্ট পর্য্যন্ত এই বন্যাসাহায্যকার্য্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে যে টাকা ও জিনিষপত্র আসিয়াছে, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

দেবগীতি—ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত পরলোক-গত মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চ্চনালয়ের সেবক-মণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।০

ভক্তপ্রাণের শতাধিক উচ্ছ্বাসগীতি। দার্শনিকতা এবং কবিত্বের মধুর মিলন ভক্তেরই মনোমন্দিরে। ব্যথিত পীড়িত সংসারে এমন দুই একটি কণ্ঠ মাঝে মাঝে অমৃতত্বের সংবাদ গাহিয়া উঠে বলিয়াই সে এখনও টিকিয়া আছে। 'দেবগীতি'তে সে সংবাদ আছে। গানের জীবন সুরে। সুরের মধ্যেই ভাবের সহিত পরিচয় হয়। কথা সেই সুরকে বাঁধিয়া রাখিবার যন্ত্রমাত্র। সুতরাং গানের শুধু কথা পড়িয়াই তাহাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়াছি বলা চলে না। দেবগীতির সকল গানের সুর শুনিবার অবসর আমাদের জোটে নাই। যে দুই একটি শুনিয়াছি, তাহাতেই আমরা মুগ্ধ, আরও পিপাসিত। প্রথম বন্দনাগীতিটি বাস্তবিকই অনুপম। আমরা আশা করি, সকলেই এই আনন্দ উপভোগ করুন।

প্রকাশকের লিখিত 'অবতরণিকা'টি অতি উপাদেয় হইয়াছে, ইহাতে ভক্তবরের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ, ছাপাও মন্দ হয় নাই। পুস্তকের প্রথমেই ভক্তবরের একখানি সুন্দর ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

ঢাকার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। কলিকাতা ১৬ নং সাগরধরের লেন হইতে শ্রীযামিনীমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রাদেশিক ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস উত্তরোত্তর সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আশা হয়, উত্তরকালে ইতিহাসের এই সূত্র জাতীয় জীবনগঠনে একটি প্রধান উপাদানের কাজ করিবে। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, সমস্ত বাঙ্গালী জাতি এই জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু অতঃপর এই ইতিহাস সম্পূর্ণ গড়িয়া তোলা বাঙ্গালীরই কাজ, আর এই কাজ একমাত্র বাঙ্গালী দ্বারাই হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালী এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আশাব বাণী মুকুলিত হইতে চলিয়াছে। ঢাকার ইতিহাসই ইহার সাক্ষী। গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডেই সফলতার যে সূচনা প্রদান করিয়াছেন, এই সূচনাই আমাদিগকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে প্রোৎসাহিত করিতেছে। আমরা সোৎসুকচিত্তে অপর খণ্ডগুলির আশায় রহিলাম।

এই প্রথম খণ্ড কতকটা গেজেটিয়র ধরণেব হইয়াছে। এত বহুল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ এতদূর পুংখানুপুংখ আলোচিত হইতে অল্পই দেখিয়াছি। যাবতীয় ভৌগোলিক বিবরণ, প্রাচীন কীর্ত্তি, শিল্প, ব্যবসায়, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বহু বিষয় বহু চিত্রসহ যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিকতামণ্ডিত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় গ্রন্থকার যথেষ্ট ভূয়োদর্শন এবং মৌলিক গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ঢাকার ইতিহাস চাব খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। দ্বিতীয় এবং অন্যান্য খণ্ডসমূহের আলোচ্য বিষয়ের আভাষ গ্রন্থকার এইরূপ প্রদান করিতেছেন—"দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু শাসনকাল হইতে বারভূঞার আমল পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে মোগল ও ইংরেজ শাসনকালের ইতিহাস লিখিত হইবে। চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন পরগণার বিবরণ, পল্লীবিবরণ এবং জমিদারদিগের বিষয় আলোচনা করিব।"

আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকারের এই সদুদ্দেশ্য সফল হউক।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—সাধারণ-শিক্ষা-প্রদ মাসিক পত্রিকা। বৈশাখ ১৩২০, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন এম্ এ বি এল। সেনগুপ্ত এণ্ড কোং কর্ত্তৃক ৬৮ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। সূচনায় পত্রিকার উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—"আমরা একান্ত প্রয়োজনীয়, সকলের জ্ঞাতব্য অথচ অতি পুরাতন তথ্যসমূহেরই আলোচনা করিব।" এবং "স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে যতদূর

সম্ভব সরল ভাষায় বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া, জনসাধারণের অজ্ঞতা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত করিতে পারিলেও আমাদের সমুদয় শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।”

আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই নবীন মাসিকখানি দীর্ঘ জীবন্ লাভ করিয়া এইরূপে দেশের সেবা করুন। বর্ত্তমান সংখ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ মন্দ হয় নাই।

বন্দনা—মাসিকপত্রিকা এবং সমালোচনার সমালোচনী। বৈশাখ ১৩২০, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। মাসিকখানি বিবিধ বিষয়ক, উদ্দেশ্য সাহিত্যসেবা। বর্ত্তমান সংখ্যার প্রবন্ধগুলি প্রায়ই সুলিখিত। এবারে সমালোচনার সমালোচনী কিছু বাহির হয় নাই। উহা কিরূপ জিনিষ দাঁড়ায়, দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত রহিলাম। আমরা এই নবীন মাসিকখানির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সংসার-সুহৃদ—মাসিক পত্র ও সমালোচনা। বৈশাখ ১৩২০, প্রথম ভাগ,প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক পণ্ডিক শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কবিকৌমুদী। কুণ্ডুর লেন, বেলগেছিয়া হইতে প্রকাশিত। উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম ও বিবিধ বিষয়িণী আলোচনা। মঙ্গলাচরণে লেখকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা সাম্প্রদায়িকতাদোষদুষ্ট দেখিলাম। আমাদের নিবেদন, সম্পাদক মহাশয় সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মমত প্রচারে ব্রতী হইলেও যেন অপর ধর্ম্মমতের উপর কটুভাষণে অতঃপর বিরত হন। বড়ই দুঃখের বিষয়, প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ দিয়া তাঁহার তথাকথিত সঙ্কীর্ণচেতা ভক্তগণ এখন এরূপ কথা বাহির করিতেছেন যে, যদি তিনি আজ সশরীরে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে নিশ্চিত আক্ষেপের সহিত বলিতেন, “প্রভো, এই সব ভক্তগণের হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর।”

হিন্দুসখা—মাসিক পত্র ও গ্রন্থপ্রচার। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজকুমার কাব্য-স্মৃতি-বেদ-তীর্থ প্রভৃতি। কৈকালা (হুগলি) হইতে বর্ত্তমানে প্রকাশিত। সামবেদ সংহিতার মূল, সায়নভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলি মন্দ নহে। বর্ণাশুদ্ধি ভবিষ্যতে যাহাতে উত্তমরূপে সংশোধিত হয়, সেই বিষয়ে যেন সম্পাদকবর্গের একটু বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

রামকৃষ্ণমিশন।

বন্যাপীড়িতগণের

সাহায্যভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকার।

(৩১শে অগষ্ট পর্য্যন্ত)

অমূল্যধন দত্ত	১০৲
দুর্গাদাস বসু, কলিকাতা	১৩০৲
সুরেন্দ্রনাথ বসু "	১০৲
যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত "	১০৲
কালিদাস দত্ত "	।৵০
দেবশঙ্কর মিত্র "	২০৲
হাইকোর্ট উকিল লাইব্রেরী	২৫০৲
নরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি "	১০৲
জনৈক বন্ধু "	৫৲
কৃষ্ণমোহন দে এণ্ড কোং "	১৫৲
যামিনীনাথ মণ্ডল "	১২॥০
৺হরিদাস দত্ত "	২৲
জনৈক বন্ধু "	৩৲
ভূপেন্দ্রকুমার বসু "	২০৲
রাহু ক্লাব "	৩০৲
দুর্গাদাস বসু "	২৪৲
বি, এন, চৌধুরী "	১৫৲
মাং হেড মাষ্টার, শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল "	৫০৲
জনৈক বন্ধু "	২৲
সোডার্ স্মিথ এণ্ড কোংর কর্ম্মচারিবৃন্দ "	১২৫৲
নন্দলাল সোম "	১৲
গোপালচন্দ্র দাস, কলিকাতা	১০৲
আলিপুর বার্ লাইব্রেরী "	৭০৲
তেজচন্দ্র বসু	১০৲
সেক্রেটরী, শিয়ালদহ বার্ লাইব্রেরী "	৫০৲
শরৎচন্দ্র সোম "	২৲
ডাক্তার এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি	২৲
রামকৃষ্ণ বসু "	২৫৲
এস্, এন্, মুখার্জ্জি "	৪৲
বিপিনবিহারী লাহার মাতা "	২৫৲
রেলীব্রাদার্স কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ "	৫০৲
জানকীনাথ সাহা "	৪০৲
গোবিন্দ সেনের গলির অধিবাসিগণ "	৩৯৲
মেটিরিওলজিক্যাল্ অফিসের কেরাণীবৃন্দ, আলিপুর "	৪৩৲
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির পরিবারস্থ মহিলাবৃন্দ, বেহালা	৩৲
ভেটারিনারী কলেজের ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা	৫৬।০
প্রিন্টিং ষ্টেশনারী কন্‌ট্রোলার কোংর কর্ম্মচারিবৃন্দ, কলিকাতা	১৯৩।০
মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউসনের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা	৭৫৲
মাং নরেন্দ্রনাথ হালদার	৫৪।০

রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়, ইটালী ৩২॥০
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দাসী
কলিকাতা ৩০৲
" মুক্তকেশী দাসী " ৫০৲
" মুক্তরাণী দাসী " ৫০৲
গোলাম রসুল " ৫৲
হুকুমচাঁদ মল্লিক " ৫৲
কৃষ্ণমোহন সুর " ১৲
সেক্রেটারী, বিবেকানন্দ
লাইব্রেরী " ৩৪৸০
আহিরীটোলার যুবকবৃন্দ ১৪৶১০
যতীশচন্দ্র হালদার, হাওড়া ২০৲
সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, বগুড়া ২৫৲
শিয়ালদহ ষ্টোর্স সেক্‌শন্ এক্-
জামিনার অফিসের মেম্বরগণ ২॥৶০
নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল, কলিকাতা ৪৩৲
দেবীপ্রসাদ শীল " ১১৲
মিহিরমোহন সেন " ১৶৫
ডাচ্ এসিয়াটিক্ ব্যাঙ্কের
কেরাণীবৃন্দ " ২৲
নবীনচন্দ্র দাস, ভোলা ১০৲
গোপালচন্দ্র দাস, কলিকাতা ৫৲
দেবশঙ্কর মিত্র, কলিকাতা ১৲
জিতেন্দ্রকুমার দত্ত, কলিকাতা ৪৫০
মেসার্স কেটেল্‌ওয়েল্ বুলেন্
এণ্ড কোং'র কর্ম্মচারিগণ ১০৯৲
ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্
ই বি এস্ আর্ আফিসের
কর্ম্মচারিগণ ৩০৲
শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ৪০৲

বার্ লাইব্রেরী, আলিপুর
(২য় দফা) ৮৬৲
বনবিহারী বসু, কলিকাতা ২৲
সুরেন্দ্রমোহন মিত্র, উত্তর
ব্যাটরা ৮৸৶০
আনন্দপ্রসাদ বসু, কলিকাতা ৸০
শ্রীশচন্দ্র মতিলাল " ২৲
অতুলচন্দ্র ঘোষ " ১৲
ভবানীপুর ক্লাব " ১০৲
মাং নায়ক সম্পাদক " ১।০
পূর্ণচন্দ্র শেঠ " ১০০৲
কেদার নাথ সাহা " ২৫০৲
মহেন্দ্রনাথ দত্ত " ৸০
চণ্ডীচরণ কুণ্ডু " ৫১৲
ট্রাফিক্ ম্যানেজার্‌স্ অফিস্, ই, বি,
এস্, আর্ " ১৫৲
মাখনলাল ঘোষ, সাঁইথিয়া ৯০॥০
মাখনলাল মুখার্জ্জি, কলিকাতা ৫৲
বসিরহাট বার্ এসোসিয়েসন্ ১০৲
প্রফুল্লকুমার সরকার, উড়িষ্যা ২১৲
যোগেন্দ্রনাথ রায়, বেঙ্গল
সেক্রেটেরিয়েট্ ১০৲
জি, সি, নন্দী, কলিকাতা ৫৲
ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ সেন,
দ্বারভাঙ্গা ১৲
শ্রীগুরুদেব-ধনভাণ্ডার, হুগলী ৩৲
ইউনিভার্স্যাল্ কোম্পানীর
কর্ম্মচারিগণ ২৫৲
মাতৃদ্বয় ৪৲
জনৈক বন্ধু ৫৲

নৈতিক শিক্ষা সম্মিলনী ২২৷৶১৫
বাগবাজার সোস্যাল্ ইউনিয়ন্ ৭৭৷৹
মাং ম্যানেজার বেঙ্গলী ৬০০৲
নিমতা সনাতনধর্ম্ম-
সাধিনী সভা ৩৭৷৷১৫
রজনীকান্ত সাহা, কলিকাতা ১৲
আশুতোষ কুণ্ডু ৬৪৷৹
মাং নায়ক-সম্পাদক (২য় দফা) ২০৲
দক্ষিণারঞ্জন সেন „ ১০৲
বিবেকানন্দ সোসাইটি „ ৫৲
মাখনলাল ঘোষ (২য় দফা),
সাঁইথিয়া ৬১৷৴৹
পঞ্চানন ঘোষ, কলিকাতা ১৷৹
রাধারমণ সেন, গোরখপুর ৬০৲
কনট্রোলার্ অব্ প্রিণ্টিং ষ্ট্যাম্প
ষ্টেশনারী আফিসের
কর্ম্মচারিগণ ৮৶১৫
মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দ (এন্
সি, ব্রাদারহুড্) কলিকাতা ১০০৲
রেলি ব্রাদার্স অফিসের
কর্ম্মচারিগণ ৫০৲
মাং নায়ক-সম্পাদক (৩য় দফা),
কলিকাতা ৩০০৲
যামিনীনাথ মণ্ডল „ ১০৲
সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, বগুড়া,
(২য় দফা) ১৫৲
হরিদাস দে, বারাকপুর ৫৲
আশুতোষ ঘোষ, কুচবিহার ৩৫৲
ধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম, নারায়ণগঞ্জ ৫৲
মনোমোহন ঘোষাল ৫০৲

নগেন্দ্রনাথ সরকার, রাঁচি ১৫৲
নগেন্দ্রনাথ রায় ১০৲
শৌর্য্যেন্দ্রকুমার রায় ৪৲
দ্বিজেন্দ্রকুমার চাটার্জ্জি ৯৲
এণ্ড্রু ইউল্ এণ্ড্ কোংর কর্ম্ম-
চারিগণ, কলিকাতা ৩৫৶৹
পূর্ণেন্দ্রনাথ কর „ ২৲
শুকদেবপুর হরিসভা ২৲
বান্ধব-ভাণ্ডার, কল্মা ৩০৲
এ, সি, গুপ্ত, কলিকাতা ২৲
জে, এন্, মল্লিক „ ১০৲
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য „ ২৫৲
বিজয়নাথ সরকার „ ৫০৲
রাহু ক্লাব (২য় দফা) „ ৩০৲
ফ্রেণ্ড্স্ ক্লাব, „ ২০৲
বি, এন, চৌধুরী „ ২০৲
আহিরীটোলার যুবকবৃন্দ ২০৲
বনবিহারী বসু „ ১৲
আলিপুর বার্ লাইবেরী
(৩য় দফা) „ ১৫৲
জনৈক বন্ধু ১০৲
মাং নরেন্দ্রনাথ হালদার কলিঃ ২৭৲
রেলী ব্রাদার্স (হাটখোলা)
কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ৫৫৲
শিয়ালদহ বার্ লাইব্রেরী
(২য় দফা) ১৭৲
দীননাথ বসুর পারিবারিক
দান, কলিকাতা ১০৲
শরৎ চন্দ্র সুর „ ১০৲
হেমচন্দ্র সুর „ ২৲

শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু „ ২৲

মাং বেণীমাধব পাল „ ৪০৲

বেণীমাধব পাল „ ১৵০

বড়বাজার ট্রেড্স্ এসোসিয়েশন্ ১০১৲

মাংবেঙ্গলীপত্রিকার ম্যানেজার ৭০৲

টাউন স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ২৫৲

বিধুভূষণ সমদ্দার, জলপাইগুড়ী ১০০৲

কামিনীকুমার চৌধুরী, কুমিল্লা ১৲

জি,পি ও করেস্পন্ডেন্স আফিসের হেড্ ক্লার্ক, কলিকাতা ১২৸০

মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, ঢাকা ১৲

ধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম, নারায়ণগ ৫৲

এন্, সি, চক্রবর্ত্তী, আগ্রা ২২।০

নন্দলাল ঘোষ, কাঁচড়াপাড়া ॥০

অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী, কল্‌মা ১০৲

রাধারমণ সেন, গোরক্পুর ৭০৲

রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় (২য় দফা) এন্টালি, কলিকাতা ২৭॥০

কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পরিবারস্থ জনৈক মহিলা, কলিকাতা ৬৵০

মাং সতীন্দ্রনাথ দত্ত „ ৮১।১০

মাং করুণাময় সরকার „ ৭/৭॥

বি, আই, ইঞ্জিনিয়ারিং আফিসের কেরাণীগণ, হাওড়া ৫০৲

রাধাকৃষ্ণ দে, কলিকাতা ৫৲

মাং নায়ক-সম্পাদক „ ১৲

সেক্রেটারি, বিবেকানন্দ লাইব্রেরী „ ৬৲

শ্যামাচরণ বীর „ ২৫৲

জনৈক বন্ধু „ ১৲

গোলাপ মা „ ১৲

জনৈক বন্ধু „ ১৲১৫

ফণীন্দ্রনাথ চাটার্জি, আন্দুলমৌরী ২৲

মহিমচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা ১০৲

ধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম, নারায়ণগঞ্জ ৫৲

ধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম, „ ১০৲

পশুপতি নন্দী, শিবপুর ২৲

মাং নীরেন্দ্রমোহন সেন, সোণারং ৩১॥০

দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জলপাইগুড়ি ৫৲

বরদাকুমার চৌধুরী, পুরী ৩৲

জিতেন্দ্রকান্ত মজুমদার, বর্ম্মা ২৲

হেডক্লার্ক, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, হাওড়া ১৲॥০

শশিভূষণ মাইতি, জাজপুর ১৲

নরেন্দ্রনাথ রায়, ছাপরা ১০৲

পূর্ণেন্দুমোহন বসু, ময়মনসিংহ ২৲

ত্রৈলোক্যনাথ মল্লিক, জলপাইগুড়ি ৫৲

হরগোবিন্দ ফৌজদার, শ্রীনগর (ঢাকা) ২৲

মাং হরিপদ ঘোষ, দিনাজপুর ১০৲

নিত্যগোপাল ঘোষ, কলিকাতা ২৫৲

গৌরগোপাল ঘোষ, „ ২৲

শান্তিরাম ঘোষ „ ৫৲

সারদাপ্রসাদ সামন্ত, হরিকাঠী ৫৲

তারাপ্রসন্ন রায়, বরিশাল ২৲

গোপালচন্দ্র পাল, কলিকাতা ১০৲

পি, সি, চাটার্জ্জির মাতাঠাকুরাণী, কলিকাতা ১০৲
ভেটেরেনারি কলেজের ছাত্রগণ, কলিকাতা ১৭৸০
ভি, এন্, মল্লিক এবং অপর ব্যক্তিগণ, কলিকাতা ২০৲
আলিপুর বার্ লাইব্রেরী, আলিপুর ১১৲
নগেন্দ্রনাথ পাল, চন্দননগর ৫৲
রূপী সিংহ, কলিকাতা ৩॥০
সুখেন্দ্র লাল চৌধুরী, রেঙ্গুন ১৲
মাখনলাল ঘোষ, সাঁইথিয়া ৩॥৴০
মাং বিধুভূষণ সমদ্দার, জলপাইগুড়ি ২০০৲
মাং প্রফুল্লচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, ঢাকা ১০৲
জনৈক বন্ধু ৪৲
বাথ্‌গেট্ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ, কলিকাতা ১০৲
আশুতোষ ঘোষ, বন্দীপুর ২৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১৲
ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, কলিকাতা ৫০৲
শশিভূষণ ঘোষ, „ ৫০৲
জনৈক বন্ধু „ ৬০৲
ঐ „ ৴০
ধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম, নারায়ণগঞ্জ ১০৲
নলিনীকান্ত কাঞ্জবিল, ধলা ১০৲
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুহৃৎসঙ্ঘের সভ্যগণ, চট্টগ্রাম ১৮৲
ডাক্তার ননীলাল বসু—ড্যাল্টন্‌গঞ্জ ২৫৲
রামকৃষ্ণ সোসাইটি, চট্টগ্রাম ২১৲
মালতী দেবী, কলিকাতা ১৲
কুঞ্জবিহারী বসু „ ১৲
বিজয়চন্দ্র বসু „ ১৲
চন্দ্রকান্ত চ্যাটার্জ্জি „ ১৲
মাং কার্য্যাধ্যক্ষ, বেঙ্গলি, (৩য় দফা) ১০০৲
নওগাঁও স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ ৪০৲
শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, দামকুমড়া ১০৸৴০
ধনপতি দাস বেরা, চককুমার ৫৲
সতীশচন্দ্র মণ্ডল, বাগচরা ৬॥০
হেড মাষ্টার, চঞ্চল স্কুল, চঞ্চল ৫৲
যোগেশগোবিন্দ মজুমদার, ঘেরিণ্ডা ৩২৲
খিদিরপুর ফ্লাড রিলিফ সমিতি ২০০৲
জনৈক বন্ধু ২৲
বিপিনবিহারী সা, বরানগর ১৭৲
প্রফুল্লকুমার দে, বেলিয়াঘাটা ৬৲
শচীন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ২০৲
নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় „ ৫৲
ভগবান্ দাস „ ১৬৲
দেশীয় ভাণ্ডার „ ২৲
সমবেদক „ ১০৲
ফ্লাড রিলিফ্ ওয়ার্কারবৃন্দ, বালি ২৫৲
অন্নদাময়ী দেবী, বেলুড় ১৫৲
কামাখ্যাচন্দ্র নাগ, দৌলতপুর ২৫

কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, শুকচর ৫৲
সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতা ৫৲
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিষ্ণুপুর ৩৲
দুর্গানাথ গাঙ্গুলী, কলিকাতা ১৷৶৹
জনৈক বন্ধু " ২৲
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় " ৬৲
সোডার্ স্মিথ্ কোংর
কর্ম্মচারিবৃন্দ ১৭৫৲
সুরেন্দ্রনাথ পত্রনবিশ " ৫৲
উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জোরহাট ২৲
কর্ম্মচারী, কুষ্টিয়া ষ্টেট রায় বি
বসু ১৲
ষ্টেশন ষ্টাফ, পাক্সা ৩৷৹
মিঃ আতাই ১০৲
ভি, ভি, বাপাত ৫৲
মিঃ পাত্কি ২৲
আনন্দ মজুমদার, বারিপদ ৫৲
ভূপতি গুহ, তেঘরিয়া ১০৲
রামকৃষ্ণ মিশন্, বরিশাল ৫০৲
ব্যানার্জ্জি মল্লিক এণ্ড কোং,
কলিকাতা ১০৲
কিং হ্যামিলটন কোং
কর্ম্মচারিগণ, " ৩০৲
বার্ লাইব্রেরী, খুল্না ২৫৲
মাং হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,
নৈনিতাল ৪০৲
সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চুঁচড়া ৫৲
গিরিবালা রায়, গৌহাটি ২৲
শচীন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ১০৲
কালীকুমার কুমার কলিকাতা ২৲

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঝিনেদহ
১০
বার্ লাইব্রেরী, খুল্না ৫০৲
বার্ লাইব্রেরি, বগুড়া ৭৫
স্বদেশী ভাণ্ডার, লাক্সৌ ৩৫৲
মেম্বার্, ৩২নং ইডেন্ হাঁসপাতাল
রোড, কলিকাতা ৬৸৹
একজন বন্ধু ৩৲
মোহিনীমোহন ধর, বারিপদ ২৷৹
বসন্তকুমার ঘোষ, সোণাগাছি ৫৲
বিভুচরণ গুহ, ঢাকা ৫৲
বগলাপ্রসাদ বিশ্বাস " ৩০৲
অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর
২০৲
চারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ২৲
শ্যামাচরণ ঘটক, ভবানীপুর ৪০৲
জে, দাসী " ৫০৲
খুচরা সংগ্রহ ।৹
অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, কুষ্টিয়া ২০৲
নারায়ণচন্দ্র পাল, রামকৃষ্ণপুর ৫৲
জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, বরানগর ১৲
বার্ লাইব্রেরী, বগুড়া ২০৲
বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়,
ভূতছাড়া ৫৲
পকগুন্ত চৈতন সিং, সুলতানপুর ১৲
একজন বন্ধু ৫০০৲
অমরনাথ পাল, পাংসা ২৲
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, দাউদনগর ৫৲
মসলা ব্যবসায়ী, বেলেঘাটা ৩৯১৶৹
সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, বগুড়া ২৫৲

দামোদর বন্যা ফণ্ড, হাজারিবাগ ১৩০৲		রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, মৈমনসিং, •	১২৫৲
জানকীনাথ ঘোষ, সিরাজগঞ্জ	১৲	অনন্তকৃষ্ণ সেন	১৯৷৹
বলাইচাঁদ দে, কলিকাতা	২৩৷•	চন্দ্রনাথ চৌধুরী	•৭৷•
পিপ্‌ল্‌স্ এসোসিয়েসন্ কুড়িগ্রাম	৩০৲	প্রভাসচন্দ্র ওঝা	১১৲
		অনুকূলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী	১৫৲
হেডমাষ্টার, কুড়িগ্রাম	৮৲	মাং আশুতোষ ঘোষ	•৪০৲
শ্রীমতী ইন্দুবালা রায়	৮৲	মাং অহিনচন্দ্র সুর	৩৲
বার্ন্ এণ্ড কোং'র কর্ম্মচারিগণ	১২৲	সতীশচন্দ্র মিত্র	১০৲
		বামকৃষ্ণ মিশন্, বরিশাল	৬০৲
অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী	২০৲	রজনীকান্ত পাল	১১৷৶•
মাদার্, মায়াবতী	৩০৲	বি, সি, ঘোষ	১৲
ধান্য আড়তদার সমিতি, চেৎলা	৩২৫৲	রামপ্রসাদ সেন	৫০০৲
		রিলিফ্ কমিটি, চট্টগ্রাম	৫০৲
দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲	রাজেন্দ্রলাল বল	৭১৷৶•
কালীচরণ ঘোষ	২	দীনেশচন্দ্র চৌধুরী	২৲
আর, কে, ব্যানার্জ্জী	৬৲	ক্ষীরোদচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী	৫৲
নন্দলাল ব্যানার্জ্জী	৫৲	কামদাপ্রসাদ চৌধুরী	৮৲
জে, পি, ইউনিয়ন্ লাইব্রেরীর সভ্যগণ	২৶•	ইন্দুভূষণ রায়	১০৲
		বন্ধুগণ, ৩ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্	১০৲
শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী	৪৲	রাজসাহী ভবানীপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ	৫০৲
আনন্দসুন্দর মজুমদার	৪৲		
হেমচন্দ্র ভৌমিক	৪৲	পিপ্‌ল্‌স্ এসোসিয়েসন্, কুড়িগ্রাম	১০৲
শৈলেশচন্দ্র গুপ্ত	১০৲		
প্যারীমোহন দাস	১০৲	অক্টেভিয়াস্ ষ্টীল্ এণ্ড কোং'র কর্ম্মচারিগণ	৮৫৶•
যোগেন্দ্রনাথ দাস	৫৲		
সমবেদক	৪৲	ব্রজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী	২৫০৲
রেবতীচরণ চক্রবর্ত্তী	৩৷•	ফকিরচন্দ্র দে	৫

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পাওয়া গিয়াছে—

প্রিয়নাথ রায় কলিকাতা কয়েকখণ্ড বস্ত্র।
জানকীনাথ সাহা " ১৫ খণ্ড বস্ত্র।
সেক্রেটরী, বিবেকানন্দ লাইব্রেরী, কলিকাতা ৪০ খণ্ড বস্ত্র।
করুণাময় সরকার, কলিকাতা ১৫সের চাউল, ছোলা ও ডাল ১৫ সের এবং কয়েকখণ্ড বস্ত্র।
ডাচ্ এসিয়াটিক্ ব্যাঙ্ক " ৯ বস্তা চিড়া মুড়কী এবং চাউল
বাগবাজার সোস্যাল্ ইউনিয়ন্ চাউল ৪ মণ, ১১৪ খণ্ড নূতন এবং৩৯ খণ্ড পুরাতন বস্ত্র।
নিমতা সনাতনধর্ম্মসাধিনী সভা ৪ খণ্ড বস্ত্র।
অখিলচন্দ্র শীল, কলিকাতা ২ মণ চাউল।
কণ্ট্রোলার অব প্রিণ্টিং ষ্টেশনারী এণ্ড ষ্ট্যাম্প কোংর কর্ম্মচারিবৃন্দ ২ খণ্ড কাপড়।
হরিচরণ দে, কলিকাতা ৮ শিশি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।
ভবানীপুর ক্লাব ৩ বস্তা চিঁড়া মুড়কী।
মাং নায়ক-সম্পাদক ২॥ মণ চাউল, ১ মণ ডাল, বুঁদিয়া ১০ সের, ১২ জোড়া কাপড়।
সোডার স্মিথ্ কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ—১ ডজন জমাট দুগ্ধ।
বিজয়চন্দ্র সিংহ, কলিকাতা স্মল বর্ডিজ্ঞ মল্টেড্ মিল্ক্ ২১

কাউস্ হেড্			" "	৬
দেশালাই	...	...	...	২ ডজন।
চিঁড়া ...	...	...	...	৩ মণ।
মুড়কী	...	...	...	২ মণ।

মাং নায়ক-সম্পাদক, কলিকাতা, কেথেরাইন্ এণ্ড মিক্শ্চার ১ ডজন।

মর্টন ইন্ষ্টিটিউসন, কলিকাতা, নূতন কাপড় ৩ জোড়া, পুরাতন কাপড় ৪ খানা, সার্ট এবং পাজামা ২৮, গেঞ্জি ২ ডজন, চাউল প্রায় ১৫ সের।
আশুতোষ ঘোষ, বন্দীপুর, ২৪ পরগণা, ১ বস্তা পুরাতন কাপড়।
ডাঃ রামলাল ঘোষ, থাঁড়ি মশুর ডাল ২ মণ, বস্তা ২ খানা।
এম্, চেটি—বেনিয়ান ৩ ডজন, কাপড় ২৩ খানা।
মাং জি, সি, বসু—অধ্যক্ষ বঙ্গবাসী কলেজ, চাউল ২ মণ, ডাল ১৫ সের।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের বেদান্ত-সাধন।

(স্বামী সারদানন্দ)

শান্তদাস্যাদি বিশেষ বিশেষ ভাবালম্বনে ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ বা মূর্ত্তিসকলের তীব্র ধ্যানে তন্ময় হইয়া ঠাকুর এতদিন অদ্বৈত-ভাবের আভাষ উপলব্ধি করিতেছিলেন। মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া তিনি এখন ঐ প্রকার সাধনের চরম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনকথা অতঃপর লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার এই কালের মানসিক অবস্থার কথা একবার আলোচনা করিয়া দেখা ভাল।

আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে, সাধককে সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দূর পরিহার করিয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধ ভক্ত তুলসীদাস যে বলিয়াছেন—যাঁহা রাম তাঁহা কাম (সকাম কর্ম্ম) নেহি *—একথা বাস্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনেতিহাস ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ভিত্তি কখনও তিলমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়াই তিনি যখনই যে ভাব সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতি স্বল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে সমর্থ

---

* যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি,
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
দুঁহু একসাথ্ মিলত নেহি,
রবি রজনী এক ঠাম॥
তুলসীদাস-কৃত দোঁহা।

হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন-ভূমির সীমা বহুদূরে পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার মন যে এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ঐরূপে বিষয়কামনা ত্যাগ করিয়া প্রায় একাদশ বৎসরকাল নিরন্তর ঈশ্বরলাভে সচেষ্ট থাকায়, অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিষয় স্মরণ, মনন বা চিন্তা করা উহার পক্ষে এককালে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। আবার কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎসার পরাৎপর বস্তু বলিয়া সর্ব্বতোভাবে ধারণা করায় উহা ইহকালে বা পরকালে তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসীন ও স্পৃহাশূন্য হইয়াছিল।

শুদ্ধ তাহাই নহে, সাংসারিক সকল বিষয় এবং নিজ শরীরের সুখ-দুঃখাদির কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র অনুধ্যানে তাঁহার মন এখন এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, মুহূর্ত্তমাত্রেই বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে সমাহৃত হইয়া, উহা ঐ বিষয়ে নিবিষ্ট হইত এবং উহাতেই আনন্দানুভব করিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও, উহার ঐ আনন্দের কিছু-মাত্র বিরাম হইত না এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধব্য বস্তু যে আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জন্যও উপস্থিত হইত না।

আর, জগৎকারণের প্রতি, 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' বলিয়া অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভর? ঠাকুরের মনে সেই অনু-রাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার শুধু যে সীমা ছিল না, তাহাই নহে, এবং উহাদিগের সহায়ে শুদ্ধ যে তিনি আপনাকে তাঁহার সহিত সপ্রেম সম্বন্ধে নিত্যযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও নহে, কিন্তু মাতার প্রতি বালকের ন্যায় তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতায় সাধক যে তাঁহাকে সর্ব্বদা নিজ সকাশে দেখিতে পায়, তাঁহার মধুর বাণী সর্ব্বদা কর্ণগোচর করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় এবং তাঁহার প্রবল হস্ত দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত হইয়া সংসারপথে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়

—একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য তাঁহারই আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে ঠাকুরের মন এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জগৎকারণকে ঐরূপে নিজ মাতার ন্যায় লাভ করিয়া এবং সর্ব্বদা নিজ সমীপে দেখিতে পাইযাও ঠাকুর আবার সাধন-পথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কেন? যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের যোগ-তপস্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তাঁহাকেই যদি আপনার হইতেও আপনার রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্য? ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে আমাদিগের মনেও একদিন ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হই নাই। তদুত্তরে তিনি তখন আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"দ্যাখ্, সমুদ্রের তীরে যে সর্ব্বদা বাস করে, তার যেমন কখন কখন মনে হয় যে, রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে কত কি রত্ন আছে, তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে ও মার কাছে সর্ব্বদা থেকেও আমার তখন তখন মনে হোতো, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী মাকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখ্‌বো। সেজন্যই যখন যে ভাবে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হোতো, সেই ভাবে দেখ্‌বার জন্য তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ধ'র্‌তাম্। কৃপাময়ী মাও তখন, তাঁর ঐভাব দেখ্‌তে,—উপলব্ধি ক'র্‌তে যা কিছু প্রয়োজন, তা নিজেই জুগিয়ে দিয়ে, করিয়ে নিয়ে, সেই ভাবে ও রূপে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের বা পথের সাধন করা হ'য়েছিল।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্ব্ব-ভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঐ প্রেরণা তাঁহার জীবনে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে অবস্থান কবিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কুমারের মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুইটি পুত্রেব মুখ চাহিয়া কোনরূপে বুক বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অনতিকাল পরে তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর পাগল হইয়াছে বলিয়া লোকে যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাঁহার দুঃখ-শোকেব আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়া নানা চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে তাহার ঐ ভাবের যখন কথঞ্চিৎ উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের ঐ অবস্থা আবার যখন উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, প্রথমে কামার-পুকুরে এবং পরে মুকুন্দপুরের প্রাচীন শিবালয়ে গমনপূর্ব্বক পুত্রের আরোগ্য-কামনায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্রের দিব্যোন্মাদ হইয়াছে জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেও, বৃদ্ধা সংসারে বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, যাহাদের জন্য এবং যাহাদের লইয়া তাঁহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আর উহাতে লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতি-পূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। আমাদিগেব অনুমান, ঠাকুরের মাতা ঐ সময়ে বা ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প করিয়া দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে উপস্থিত হন। বৃদ্ধার ঐ সংকল্প পূর্ণ হইয়াছিল এবং এখন হইতে দ্বাদশ বৎসরান্তে তাঁহার শরীরত্যাগের কালের মধ্যে তিনি পুনরায় কামারপুকুরে আর আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মন্ত্রে দীক্ষা ও রামলালা বিগ্রহ গ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেই হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটি ঘটনা আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। কারণ, ঘটনাটি তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐকালে শ্রীযুত মথুরের কালীবাটীতে অক্ষুণ্ণ অধিকার, এবং মুক্তহস্ত হইয়া তিনি এই সময়ে অন্নমেরু প্রভৃতি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রভূত অন্নদান করিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির অবধি না থাকায়, তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার অবর্ত্তমানে ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে ক্রটি না হয়, তদ্বিষয় বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়া উহা মুখ ফুটিয়া তাঁহাকে বলিতে এপর্য্যন্ত সাহসী হন নাই। ঠাকুরের যাহাতে শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করিয়া দিবার পরামর্শ হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া, বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐ কথার কিঞ্চিদাভাষ কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে বেগে ধাবিত হইয়াছিলেন! সুতরাং পূর্ব্বোক্তভাব মনে জাগরূক থাকিলেও মথুর ঐ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ সুযোগ লাভ করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—'ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে কখন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না? তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও।' সরলহৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐরূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়েরই অভাব অনুভব না করায়, কি যে চাহিয়া লইবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে

পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে বলিতে হইল, 'বাবা,—তোমার কল্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, যখন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব তখন চাহিয়া লইব।' এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁট্‌রা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন,—'দেখ্‌বে, এই দেখ, আমার এখন এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে, আর, তোমার কল্যাণে এখানে খাবার ত কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই ত তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ; তবে আর কি চাহি বল।" মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, 'যাহা ইচ্ছা কিছু লও' বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা ঠাকুরের মাতার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি অভাবের কথা মনে পড়িল, তিনি বলিলেন,—'যদি নেহাৎ দেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব হইয়াছে, তার জন্য এক আনার দোক্তা তামাক কিনে দাও।' বিষয়ী মথুরের চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়।'—এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্তা তামাক আনাইয়া দিলেন।

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হলধারীই মন্দিরে দেবীসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহার যৎসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া, তিনি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন ঠাকুরকে কিরূপ শ্লেষ করিতেন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন, এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐকথা নিবেদন করিয়া কিরূপে বারংবার আশ্বস্ত হইতেন, সে সকল কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। হলধারীর ঐরূপ শ্লেষপূর্ণ বাক্যে ঠাকুর একসময়ে ভাবাবেশে এক সৌম্যমূর্ত্তির দর্শন ও 'ভাবমুখে থাক্' বলিয়া প্রত্যাদেশও যে পাইয়াছিলেন, সে কথারও আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদিগের অনুমান, ঐ ঘটনা ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাবসাধনের সময় ঠাকুরকে স্ত্রীবেশাদি ধারণ করিতে এবং স্ত্রীভাবে

সর্ব্বদা থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। কারণ, পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী যে কালীবাটীতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্রচর্চ্চাও করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। শ্রীমৎ তোতা ও হলধারীর ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ চর্চ্চাকালে ঠাকুর যে, একদিন, জায়া ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, একথাও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। শ্রীমৎ তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭২ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। উহার দুই এক মাস পরে সম্ভবতঃ সন ১২৭৩ সালে হলধারী শারীরিক অসুস্থতাদি কারণ নিবন্ধন কালীবাটীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামকুমারের পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন।

ভক্তের স্বভাব, তাঁহারা সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভে কখন প্রয়াসী হন না। ভাববিশেষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের নানা রূপ-গুণাদির মহিমা সম্ভোগ করিতেই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরামপ্রসাদের 'চিনি হতে চাহি না মা, চিনি খেতে ভালবাসি'-রূপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া সর্ব্বকাল প্রসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইবার পরেই ঠাকুরের ভাবাতীত অদ্বৈতাবস্থা লাভের জন্য প্রয়াস, অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভাবিবার পূর্ব্বে আমাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদম্বার বালক, ঠাকুর, এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহারই মুখ চাহিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে যে ভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেই ভাবেই তখন পরমানন্দে চালিত হইতেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও সেজন্য তাঁহার সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব

অভিনব আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। জগদম্বার নিয়োগানুসারে ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার সাধনের শেষে সেই উদ্দেশ্যবিশেষের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়াও কিঞ্চিৎ পৃথক্ থাকিয়া তৎপ্রদত্ত লোককল্যাণসাধন-রূপ সুমহৎ দায়িত্ব সানন্দে বহন করিয়াছিলেন।

মধুরভাব সাধনের পরেই ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সাধনের যুক্তিযুক্ততা আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবস্থিত। কারণ, ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠা লাভে ভাবরাজ্যের চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈত-ভূমি ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর হইবে?

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতেই যে, ঠাকুর এখন অদ্বৈতভাব সাধনে অগ্রসব হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় সম্যক্ বুঝিতে পারিব। ঠাকুরের শ্রীমুখেই আমরা ঐ ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি।

পুণ্য সাগরসঙ্গমে স্নান ও শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ তোতা এইকালে পঞ্জাবপ্রদেশ হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। কারণ, ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মারাম পুরুষদিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে সমগ্র জগৎকেই ব্রহ্ম বলিয়া যে অনুভব হইয়া থাকে এবং জগদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ দেশ কাল ও পদার্থে তাঁহার মায়া সংযোগে উচ্চাবচ প্রকাশও যে তাঁহারা ঐকালে উপলব্ধি করিয়া দেবস্থান, তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, একথা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঐরূপ ভাবের প্রেরণাতেই যে, এখন দেব ও তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ঐ তীর্থদ্বয়-দর্শনান্তে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পুনরায় ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তাঁহার নিয়ম ছিল না; অতএব কালীবাটীতেও তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত করিবেন

বলিয়াই আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা যে, তাঁহার অচিন্ত্যলীলায় তদীয় জ্ঞানের মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা নিজ বালককে বেদান্ত সাধন করাইবেন বলিয়া তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথা তিনি প্রথমতঃ কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীমৎ তোতাপুরী কালীবাটীতে আগমন করিয়া প্রথমেই ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অন্য সাধারণের ন্যায় সামান্য একখানি বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া অন্যমনে ঠাকুর তখন তথায় এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল বদনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন, বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তম অধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। 'তন্ত্রপ্রধান বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে?'—ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমৎ তোতা বিস্ময় কৌতুহলে আবিষ্ট হইয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্ত সাধন করিবে?"

জটাজূটধারী দীর্ঘবপুঃ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর করিলেন,—"কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না, আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ, আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

ঠাকুর ঐ কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া, ধীরে ধীরে ৺জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন,—"যাও, শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।"

অর্দ্ধবাহ্যভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে তোতাপুরী গোস্বামীর সমীপে আসিয়া তাঁহার মাতার ঐরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতা ৺দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে ঐরূপে

মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া, শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ভাবে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐ প্রকার স্বভাব অজ্ঞতা ও কুসংস্কার-নিবন্ধন হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিলেন। ঐরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহার অধরপ্রান্তে একটু করুণা ও ব্যঙ্গপ্রসূত হাস্যের রেখা যে এখন দেখা দিয়াছিল, একথাও আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। কারণ, শ্রীমৎ তোতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেব দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সংযত সাধকের ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিত না। আর ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া?—গোস্বামীজি উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধকের নিজ পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর ও ব্রহ্মশক্তি মায়ার কৃপাপূর্ণ সহায়তা প্রার্থনার কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্যও তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন না, এবং যাহারা ঐরূপ করে, তাহারা অজ্ঞানতা-প্রসূত সংস্কারবশতঃ করিয়া থাকে বলিয়া ভাবিতেন।

সে যাহা হউক, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ঠাকুরের মনের পূর্ব্বোক্ত সংস্কার অচিরেই দূর হইবে ভাবিয়া তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন,—বেদান্ত সাধনে উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—গোপনে ঐরূপ করিলে যদি হয় তাহা হইলে ঐরূপ করিতে তাঁহার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে ঐরূপ করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজি উহাতে ঠাকুরের ঐরূপ আচরণের কারণ সবিশেষ বুঝিতে পারিলেন এবং

"উত্তম কথা, শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব" বলিয়া কালীবাটীর উদ্যানের উত্তরাংশে অবস্থিত রমণীয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্ব্বক কয়েকদিন অবস্থানের জন্য তথায় আপন আসন বিস্তীর্ণ করিলেন।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি খণ্ডন। *

(১০)

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ)

—:—

অদ্বৈতবাদী বলেন, বেদান্তে জ্ঞানই মোক্ষের উপায়স্বরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের এই কথাটী খণ্ডন করিবার জন্য আচার্য্য রামানুজ বলেন,—বেদান্তে তদুদ্দেশ্যে উপাসনাই বিহিত হইয়াছে, বেদান্তের জ্ঞানানুষ্ঠানবোধক যে বেদন শব্দ আছে, তাহার অর্থ উপাসনা। সুতরাং অদ্বৈতবাদী এই বেদন শব্দের উল্লেখ করিয়া বেদান্তে যে জ্ঞানানুষ্ঠান বিহিত, তাহা প্রমাণ করিতে পারেন না। অবশ্য একথা বলায় যে, কি ফল লাভ হইল, তাহা একাধিকবার বলা হইয়াছে, তথাপি সে সব কথা স্মরণ করিতে সহজ হইবে বলিয়া সংক্ষেপে দুই এক কথায় তাহার একটু পুনরাবৃত্তি করা যাউক। ইহার ফলে অদ্বৈতবাদীর যে ব্রহ্ম, তাহা নির্গুণ হইয়া যায়, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, বন্ধ, মোক্ষ, সাধন ও সংসার প্রভৃতি মায়া বা ভ্রম-বিশেষের খেলা, এইরূপ সিদ্ধান্ত লাভ হয়। অন্যদিকে আচার্য্য রামানুজমতে জীব-পদার্থটী ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ হয়, ব্রহ্ম সগুণ হন, বন্ধ, মোক্ষ, সাধন ও

---

* এই শ্রুতিবিচারটী দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া এই সংখ্যায় সমুদয় প্রকাশিত হইল না—আগামী বারে ইহা শেষ হইবে।

সংসার প্রভৃতি যাহা কিছু, সব জীবের কর্ম্মফল ও ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মিলনে সংঘটিত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তলাভ ঘটে।

আচার্য্য রামানুজ উক্ত নিজ মতটী প্রমাণ করিবার জন্য সমগ্র উপনিষৎ হইতে তিনটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং অদ্বৈতবাদীও তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রুতির বিচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই প্রবন্ধে অবশিষ্ট তৃতীয় শ্রুতিটী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই তিনটী শ্রুতিতে আচার্য্য রামানুজ দেখাইতে চাহেন যে, একটী প্রসঙ্গের উপক্রমোপসংহারে "বেদন" ও "উপাসনা" এই দুইটী শব্দ যথারুচি প্রযুক্ত হওয়ায়,—ব্যতিকর ভাবে অর্থাৎ উল্টাপাল্টাভাবে ব্যবহৃত হওয়ায়,—ইহারা অভিন্ন পদার্থ বা একার্থক; এবং উপাসনা শব্দে বিধি দেখা যায় বলিয়া বেদনের অর্থ উপাসনাই হইবে, পরন্তু উপাসনার অর্থ বেদন বা জ্ঞান হইবে না। এসব কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে এ স্থলে বিস্তৃতভাবে বলিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করা অনাবশ্যক।

এখন দেখা যাউক, উক্ত তৃতীয় শ্রুতিসম্বন্ধে আচার্য্য রামানুজ কি বলেন, এবং অদ্বৈতবাদী তাহার উত্তর কি দিয়া থাকেন।

আচার্য্য রামানুজ বলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে যে রৈক ও জানশ্রুতির উপাখ্যান আছে, তাহাতে বেদন ও উপাসনা এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—'যস্তদ্বেদ, যৎ স বেদ, স ময়ৈতদ্ উক্তঃ,' এই কথা বলিয়া 'অনু মে এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাম্ উপাস্সে' এই কথা বলা হইয়াছে।' ইহার আক্ষরিক অর্থ এইরূপ—'যিনি তাহা জানেন, যাহা তিনি জানেন, তিনি মৎকর্ত্তৃক এই কথিত হইলেন' এই কথা বলিয়া—'হে ভগবন্, আমাকে এই দেবতাসম্বন্ধে উপদেশ দিন্, যে দেবতাকে (আপনি) উপাসনা করেন' —ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এস্থলে দেখা যাইবে, প্রথম বাক্যে 'বেদ' শব্দ দুইবার এবং পরের বাক্যে উপাসনাবোধক শব্দটী একবার রহিয়াছে। প্রথম বাক্যের দুইটী 'বেদ' শব্দ উপক্রমমধ্যে গণ্য এবং শেষ বাক্যের

'উপাসসে' শব্দটী উপসংহারমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এখন উপক্রম এবং উপসংহার-বাক্যে একশব্দ বা একার্থক শব্দ থাকা নিয়ম বলিয়া উক্ত 'বেদ' এবং 'উপাসনা' শব্দদ্বয় একার্থক হওয়া উচিত। অবশ্য একার্থক হইলে কি লাভ হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন; তথাপি বলি যে, ইহার ফলে 'বেদান্তে উপাসনা বিহিত', ইহাই প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

এখন দেখা যাউক, অদ্বৈতবাদী এতদুত্তরে কি বলিতে পারেন।

অদ্বৈতবাদী বলেন,—এ শ্রুতির দ্বারা বেদান্তোক্ত জ্ঞান কখন উপাসনা হইতে পারে না। কারণ, এ স্থলটী বেদান্তোক্ত জ্ঞানের প্রসঙ্গই নহে। এস্থলে আমাদের মতে উক্ত বেদন শব্দে উপাস্য উপাসক ও উপাসনা-বিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞাননহে। সুতরাং এই বেদনকে উপাসনা বলিতে আমরা আপত্তি করি না। আর যদি বল,এই শ্রুতিতে বেদনের অর্থ উপাসনা বলিয়া অন্য নির্গুণব্রহ্মবোধক শ্রুতিপ্রতিপাদ্য জ্ঞানও উপাসনা হইয়া যাইবে, তাহা হইলে বলিব, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক্ষণে একে একে এই দুইটী পক্ষই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কিন্তু এই কথাটী প্রমাণ করিতে হইলে দেখা উচিত, শ্রুতি এস্থলে কি ভাবে কি বলিতেছেন।

জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস। স হ সর্ব্বত আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্ব্বত এব মেঽৎস্যন্তীতি ॥ ১ ॥

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংসো হংসমভ্যুবাদ—হো হোয়ি ভল্লাক্ষ! ভল্লাক্ষ! জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ॥ ২ ॥

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচ কম্বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি ॥ ৩ ॥

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৪ ॥

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব স হ সংজিহান এব ক্ষত্তার-

মুবাচাঙ্গারে হ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি, যোঁহু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি ॥ ৫ ॥

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি, যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি, যস্তদ্ বেদ, যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥৬॥

স হ ক্ষত্তান্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় তং হোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমর্চ্ছেতি ॥ ৭ ॥

সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কষমাণমুপোপবিবেশ তং হাভ্যুবাদ ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বা রৈক্ক ইতি, অহং হ্যরা ৩ ইতি হ প্রতিজজ্ঞে স হ ক্ষত্তাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় ॥ ৮ ॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যুবাদ ॥১॥

রৈক্কেমানি ষট্শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথোঽনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্স ইতি ॥২॥

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তদু হ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥৩॥

তং হাভ্যুবাদ রৈক্কেদং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথ ইয়ং জায়ায়ং গ্রামো যস্মিন্নাস্সেঽন্বেব মা ভগবঃ শাধীতি ॥৪॥

তস্যা হ মুখমুপোদ্গৃহ্নন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি। তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস স তস্মৈ হোবাচ ॥৫॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বায়ুর্ব্বাব সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্য্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি ॥১॥

যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপি যন্তি বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্ক্ত ইত্যধিদৈবতম্ ॥২॥

অথাধ্যাত্মম্। প্রাণো বাব সংবর্গঃ স যদা স্বপিতি প্রাণমেব

বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি ॥৩॥

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু ॥৪॥

ইহার পর একটী আখ্যায়িকার সাহায্যে এই বিদ্যার স্তুতি করা হইয়াছে। আমরা আখ্যায়িকার অংশ বাদ দিয়া ইহার ফলশ্রুতিবোধক বাক্যটী মাত্র উদ্ধৃত করিলাম, যথা ;—

"তস্মা উ হ দশান্যে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ কৃতম্, তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশ কৃতং সৈষা বিরাডন্নাদী, তয়েদং সর্ব্বং দৃষ্টং সর্ব্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবতি, অন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥৮॥

অর্থাৎ—পূর্ব্বকালে জনশ্রুতের পুত্রের পৌত্র রাজা জানশ্রুতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানশীল, বহুদাতা এবং বহুপাক্য (অর্থাৎ যিনি অতিথিগণের জন্য বহু অন্ন পাক করান) ছিলেন। সকল দিক্ হইতে লোকেরা আসিয়া আমার অন্ন ভক্ষণ করিবে, এই মনে করিয়া সর্ব্বদিকে পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।১।

কোন সময়ে হংসরূপধারী ঋষিগণ রাত্রিকালে আকাশে তাঁহার দৃষ্টি-পথে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হংস অগ্রগামী হংসকে এইরূপ বলিল যে, ভোঃ ভোঃ ভল্লাক্ষ! ভল্লাক্ষ! (মন্দদৃষ্টি লোককে ভল্লাক্ষ বলে) পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ আকাশে সমানভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা স্পর্শ করিও না। তাহা যেন তোমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে।২।

অগ্রগামী হংস পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সেই হংসকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"অরে! এবংবিধ অবস্থাপন্ন এই কাহাকে তুমি সযুগ্বা (অর্থাৎ চলনোপযোগী ক্ষুদ্র শকট দ্বারা পরিচিত) সেই রৈক্কের ন্যায় বলিতেছ? (তখন পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হংস জিজ্ঞাসা করিলেন)—তুমি যাহার কথা বলিতেছ, সেই সযুগ্বা রৈক্ক কি প্রকার?।৩।

চতুরঙ্কবিশিষ্ট কৃতনামক পাশক বিজয়ী হইলে তদপেক্ষা অল্পাঙ্ক-বিশিষ্ট তিন দুই এক অঙ্ক যুক্ত ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামক পাশকসমূহ যেরূপ তাহার অধীন হয়, তদ্রূপ সেই সমস্তই রৈক্কে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। [কি অন্তর্ভূত হয়, তাহা কথিত হইতেছে] জনমণ্ডলী যাহা কিছু

উত্তম কর্ম্ম করে [তৎসমস্ত]। সেই রৈক যাহা জানে, অপর যে কোন লোকও তাঁহা জানিলে তাহার সম্বন্ধেও এইরূপ ফলই হইয়া থাকে। সেই রৈক আমা কর্ত্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইলেন।৪।

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি শয্যা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সারথিকে বলিলেন,—"অহে [হংস] সযুগ্বা রৈকের ন্যায় [আমাকে] বলিয়াছে। [সারথি জিজ্ঞাসা করিলেন] যিনি (ঐ প্রকার উক্ত হইয়াছেন) সেই সযুগ্বা রৈক কি প্রকার ? ।৫।

৬ষ্ঠ শ্লোকের অর্থ ৪র্থ শ্লোকের ন্যায় ॥৬

সেই ক্ষত্তা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া "জানিতে পারিলাম না" বলিয়া ফিরিয়া আসিল; রাজা তাহাকে বলিলেন—"অহে,যেখানে ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতে হয়, সেখানে তাহার নিকট যাও, অর্থাৎ সেই অরণ্যাদি প্রদেশে রৈকের অনুসন্ধান কর"।৭।

সেই ক্ষত্তা, শকটের অধোদেশে পামা (চুলকাণিবিশেষ) চুলকাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, আপনিই কি সেই সযুগ্বা রৈক ? তিনি অনাদরে বলিলেন—অরে, আমিই (সেই রৈক)। অনন্তর সেই ক্ষত্তা "জানিয়াছি" মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।৮। ইতি ১ম খণ্ড

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি, ছয়শত গো, স্বর্ণময় কণ্ঠহার এবং অশ্বতরীযুক্ত রথ—এ সমস্ত লইয়া [রৈক-সমীপে] গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—।১।

হে রৈক,এই ছয়শত গো, এই স্বর্ণময় কণ্ঠহার, এবং এই অশ্বতরীযুক্ত রথ (এই সমুদয় আপনার নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, আপনি গ্রহণ করুন, এবং) আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, সেই দেবতাকে আমায় উপদেশ দিন।২।

রৈক তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে শূদ্র ! এই বাহনযুক্ত শকটাদি গোসমূহের সহিত তোমারই থাকুক। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ঋষির অভিপ্রায় অবগত হইয়া সহস্র গো, স্বর্ণহার, অশ্বতরীযুক্ত রথ এবং একটী কন্যা, এই সমস্ত লইয়া পুনশ্চ তাঁহার নিকট গমন করিলেন।৩।

[জানশ্রুতি] তাঁহাকে বলিলেন—হে রৈক, এই সহস্র গো, এই রত্নহার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই ভার্য্যা (আমার কন্যা) এবং আপনি যেখানে বাস করেন, সেই গ্রাম, এই সমস্ত আপনার নিমিত্ত মনে মনে কল্পিত করিয়া রাখিয়াছি, [আপনি গ্রহণ করিয়া] আমাকে বিদ্যা উপদেশ করুন ! ৪

সেই রাজকন্যার মুখকেই বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত উপায় মনে করিয়া অথবা সেই রাজকন্যার মুখটী উঠাইয়া ধরিয়া রাজাকে বলিলেন,—হে শূদ্র ! তুমি যে এই সমস্ত গো আনয়ন করিয়াছ, এই উপায়েই তুমি আমাকে কথা বলাইতেছ। যে সমস্ত গ্রামে রৈক বাস করিতেন, এই সমস্ত গ্রাম মহাবৃষ প্রদেশে "রৈকপর্ণ" নামে প্রসিদ্ধ। জানশ্রুতি সেই গ্রামসমূহ রৈককে দান করিলেন, [তাহার পর] রৈক তাঁহাকে (জানশ্রুতিকে) বিদ্যার উপদেশ করিলেন। ৫

ইতি তৃতীয় খণ্ড।

[এখন সংবর্গগুণযোগে বায়ু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা বর্ণিত হইতেছে—] বায়ুই সংবর্গ, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকে সমবেত করে অথবা বিনষ্ট করে বলিয়া বায়ুই 'সংবর্গ'পদবাচ্য। দেখ, অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হয়, তখন তাহা বায়ুতেই বিলীন হয়, সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন তাহাও বায়ুতেই বিলীন হয়, এবং চন্দ্র যখন অস্তমিত হয়, তখন তাহাও বায়ুতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। ১

যখন জলসমূহ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন সে সমস্ত বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বায়ুতেই বিলীন হয় ; কেননা, বায়ুই এই অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে সংহার করিয়া থাকে ; [অতএব উহা সংবর্গপদবাচ্য]। ইহা হইতেছে অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা। ২

অনন্তর অধ্যাত্ম [উপাসনা কথিত হইতেছে—] প্রাণই সংবর্গ ; কেননা, পুরুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণেই বিলীন হয়, চক্ষুঃ প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে, এবং মনও প্রাণে বিলয় প্রাপ্ত হয়, কারণ, প্রাণই এই সমস্তকে (বাগাদি ইন্দ্রিয়কে) সংবরণ করিয়া থাকে। ৩

সেই এই দুইটী 'সংবর্গ অর্থাৎ সংবর্জ্জনগুণযুক্ত, দেবগণের মধ্যে বায়ু, আর বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণ। ৪

[ভৃত্যগণ] তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়াছিল [এখন শ্রুতি নিজেই বিদ্যা-ফলের উপসংহার করিতেছেন] সেই এই পৃথক্ পাঁচটী এবং অপর পাঁচটী অর্থাৎ অগ্ন্যাদি পাঁচ আর বাগাদি পাঁচ মিলিতভাবে দশ হইয়া সেই প্রসিদ্ধ "কৃত"সংজ্ঞক হয়। সেইহেতু কৃতসংজ্ঞক সেই দশটীই সর্ব্বদিক্‌স্থিত অন্নস্বরূপ, এবং সেই এই দশটীই অন্নভোগী বিরাট্‌স্বরূপ। সেই বিরাট্ দ্বারাই দশদিক্‌স্থিত সর্ব্ব অন্ন উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। যিনি উক্ত প্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনিও সর্ব্ব দিকে অন্ন দেখিতে পান, এবং নিজেও অন্নভোক্তা হন। উপাসনা-সমাপ্তি-সূচনার্থ "য এবং বেদ" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে। ৮ *

এই শ্রুতি হইতে আমরা আমাদের বিচারের উপযোগী এই কয়টী কথা জানিতে পারি ;—

১। রৈক্কের তেজ স্বর্গলোকব্যাপী ছিল, এবং তাঁহার প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তাহার অতিক্রমকারীকে তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলে। এই তেজের কথা শুনিয়া রৈক্কের পরিচয় জানিবার ইচ্ছা হয়।

২। রৈক্কের পরিচয় হইতে জানা যায় যে,—

(ক) তিনি সংবর্গ-বিদ্যাবিৎ ও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(খ) তিনি লোকের অনুষ্ঠেয় সমুদয় পুণ্যকর্ম্মেরই ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩। রৈক্কের যে জ্ঞান ছিল, তাহা অপরব্রহ্মবিষয়ক অথবা পরব্রহ্ম-বিষয়ক, তাহা যুক্তিবলে ও প্রকরণ-সাহায্যে স্থির করিতে পারিলে, বর্ত্তমান বিচারে সাহায্য হইবে। যে বাক্যে এই জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই—"যঃ তৎ বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদ্ উক্ত ইতি।" অর্থাৎ "যিনি তাহা জানেন, যাহা তিনি জানেন, তিনি মৎকর্ত্তৃক এই

* এই অনুবাদটী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়কৃত সানুবাদ সভাষ্য ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪০১-৪২৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল। প্রাপ্তিস্থান—লোটাস্ লাইব্রেরী ২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

কথিত হইলেন” ইত্যাদি। কারণ, রৈকের জ্ঞান যদি পরব্রহ্মবিষয়ক হয়, তাহা হইলে রামানুজাচার্য্যের পক্ষে একটু সুবিধা হইবার সম্ভাবনা, নচেৎ নহে।

৪। জানশ্রুতি, রৈকের পরিচয় পাইয়া, রৈককে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, রৈকের উক্তপ্রকার সিদ্ধি ও জ্ঞানের যাহা সাধন বা উপায়, তাহাই রাজার জিজ্ঞাসার বিষয়, অন্য কিছু নহে। কারণ, তাঁহার প্রশ্ন এই,—“হে ভগবন্, আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, তাহা আমায় বলুন।” যথা “অনু মে এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাম্ উপাস্সে”।

এখন এই কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রৈকের জ্ঞান পরব্রহ্মের জ্ঞানই নহে, পরন্তু উপাসক উপাস্য ও উপাসনা-বিষয়ক অপরব্রহ্মজ্ঞানমাত্র, সুতরাং এ জ্ঞানের সহিত উপাসনার অভেদ সিদ্ধ হইলে, আমাদের কোন ক্ষতি নাই।

প্রথমতঃ দেখা গিয়াছে, রৈকের স্বর্গলোকব্যাপী অনতিক্রম্য তেজের কথা শুনিয়া রাজার রৈককে অন্বেষণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এই তেজের জন্য রৈক যে পরব্রহ্মজ্ঞ হইবেন, এমন কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, ইহা অন্য সাধনেও হইতে পারে। শ্রুতিমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞের যে সব লক্ষণ আছে, তাহাতে এরূপ কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা এইরূপ তেজঃ ব্রহ্মজ্ঞের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সারথি যখন রৈককে অন্বেষণ করিয়া পান নাই, তখন রাজা সারথিকে ব্রাহ্মণ-দিগের স্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে বলিলেন। এস্থলে রৈককে ব্রাহ্মণ বলায় যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। কারণ, ব্রাহ্মণ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞ হয় না। তৃতীয়তঃ, হংসের মুখে রৈক সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাই তাহা হইলে এখন বিচার্য্য। এস্থলে রৈক সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই ;—

“যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্তি এবং এনম্ সর্ব্বং তদভিসমেতি, যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি, যঃ তদ্ বেদ যৎ স বেদ, সময়ৈতদ্ উক্ত ইতি।”

অর্থাৎ—চতুরঙ্কবিশিষ্ট কৃত-নামক পাশক-বিজয়ী হইলে, তদপেক্ষা অল্প অঙ্কবিশিষ্ট (তিন দুই এক অঙ্ক যুক্ত) ত্রেতা দ্বাপব ও কলি নামক পাশক যেরূপ তাহাব অধীন হয়, তদ্রূপ সেই সমস্তই রৈক্বে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। [কি অন্তর্ভূত হয়, তাহা কথিত হইতেছে] জনমণ্ডলী যাহা কিছু উত্তম কর্ম্ম করে [তৎসমস্ত]। সেই রৈক যাহা জানে, অপর যে কোনও লোকও তাহা জানিলে, তাহার সম্বন্ধেও এইরূপ ফলই হইয়া থাকে। সেই রৈক আমা কর্ত্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইলেন।

আচার্য্য শঙ্কর ইহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতে রৈক্বের জ্ঞান যে জ্ঞেয় পরব্রহ্মজ্ঞান, তাহা বলা যায় না। কারণ, "জনমণ্ডলী যাহা কিছু উত্তম কর্ম্ম করে, তৎসমস্ত রৈক্বে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেই রৈক যাহা জানেন, তাহা অপর ব্যক্তি জানিলে ঐ ফললাভ হয়।" একথায় রৈক্বের জ্ঞানের বিষয় এমন কোনও কর্ম্ম, যাহার ফল জনমণ্ডলীর অনুষ্ঠিত সমুদয় সাধুকর্ম্মের ফলজাতীয় কোন ফল ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। যদি বলা যায়, এ কথায় রৈক্বের জ্ঞানের বিষয় যে কর্ম্ম, তাহা যে, জনমণ্ডলীর অনুষ্ঠিত সমুদয় সাধুকর্ম্মজাতীয়, তাহা কে বলিল? কারণ, রৈক্বে ঐ সাধুকর্ম্মের অন্তর্ভাবের কথা আছে বলিয়া যে তাহা একজাতীয় হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে বলিব, তাহা যে তজ্জাতীয় নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি?

মনে কর, একজন একজনের পরিচয় দিবার কালে যদি বলে যে "সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ ফল লাভ করিয়াছে, সে যাহা জানে, তাহা যদি অপর কেহ জানে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও ঐ ফল লাভ করিবে" ইত্যাদি। তাহা হইলে এস্থলে ঐ ব্যক্তির জ্ঞান পরীক্ষার বিষয় ভিন্ন অন্য জ্ঞান কি না, তাহা কি নিশ্চয় হয়? কখনই না। বরং ইহাই সম্ভব যে, ঐ জ্ঞান পরীক্ষার বিষয়সংক্রান্ত জ্ঞান, কারণ, পূর্ব্বেই পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে।

সুতরাং এতদ্দ্বারা রৈক্বের জ্ঞান যে, প্রকৃত পরব্রহ্মজ্ঞান, তাহা নিশ্চয় হয় না। বরং সাধুকর্ম্মের কথা পূর্ব্বে বলায় তাহা সাধুকর্ম্ম-বিষয়ক হওয়াই সম্ভব। যদি বলা হয়, সাধুকর্ম্মফলের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানও

কেন থাকুক না; কারণ, শাস্ত্রেই আছে, ব্রহ্মজ্ঞানজন্য সুখ সকল সুখের উপর। তাহা হইলে বলিব, কর্ম্মের ফল ও জ্ঞানের ফল এক নহে, রৈক্কের কর্ম্ম এমন কর্ম্ম হইতে পারে, যাহার ফল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রেষ্ঠ হইলেই যে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। সাধুকর্ম্মের ফল পুণ্য সুখ প্রভৃতি। উহা অনিত্য, ভোগশেষে ক্ষয় পায়। কিন্তু জ্ঞানের ফল সেরূপ নহে, উহা নিত্য এবং উভয়বাদি-স্বীকৃত। সুতরাং রৈক্কের জ্ঞান যে পরব্রহ্মবিষয়ক চরম জ্ঞান, তাহা প্রমাণ হয় না, বরং কর্ম্মের কথা পূর্ব্বে থাকায়,তাহা কোন শ্রেষ্ঠ উপাসনা হইতে পারে। তাহার পর দেখ, রৈক্কের উক্ত কর্ম্মের ফলের পরিচায়ক যে সব কথা রহিয়াছে, তাহা অনতিক্রমণীয় দ্যুলোকব্যাপী তেজ, অন্য কিছু নহে। ইহা ভৌতিক পদার্থ সুতরাং রৈক্কের জ্ঞান ভৌতিক জ্ঞানই হইবে, বলিতে হয়। সুতরাং পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রাখিয়া বলিতে গেলে, অর্থাৎ উক্ত তেজের সঙ্গে সাধুকর্ম্মকে মিলাইয়া রৈক্কের জ্ঞানের বিষয়টী কি তাহা বুঝিতে গেলে, উহা পুণ্য ও সুখ প্রভৃতি জাতীয় ফলোৎপাদক কর্ম্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এইজন্য বলি, রৈক্কের জ্ঞান প্রকৃত পরব্রহ্মজ্ঞান নহে। পরন্তু উপাসনা উপাস্য ও উপাসক-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। তাহার পর আবার দেখ, রৈক্কের উক্ত তেজ ও যাবৎ সাধু কর্ম্মের ফল লাভের কথা শুনিয়া রাজা রৈক্ককে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাও দেবতাবিশেষের উপাসনা—জ্ঞান নহে। জ্ঞান হইলে প্রশ্নটী হইত,—আপনি কোন্ বস্তু জানায় আপনার এরূপ শক্তিলাভ ঘটিয়াছে? কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বাক্য এই "আপনি কোন্ দেবতার উপাসনা করেন" ইত্যাদি। সুতরাং রৈক্কের জ্ঞানের বিষয় যে উপাসনাজাতীয় কর্ম্মবিশেষ, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার পর, রৈক্ক যে উপদেশ দেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি কর। তথায় বলা হইতেছে,—বায়ুই সংবর্গ, যেহেতু অগ্নি যখন উপশান্ত হয় তখন তাহা বায়ুতেই লয় পায়, সূর্য্য যখন অস্ত যায় তাহা তখন বায়ুতেই লয় পায়, চন্দ্র যখন অস্ত যায়, তখন তাহা বায়ুতেই লয় পায়। সংবর্গ শব্দের অর্থ—যাহা সংবরণ করে, সংগ্রহ করে অথবা সংহার

করে, তাহাই সংবর্গ। এখানে দেখ, যাহা সংহার প্রভৃতি করে, তাহা ব্রহ্ম হইলেও পরব্রহ্ম নহে, কারণ, পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি। আর বায়ুতে উক্ত অপরব্রহ্মের সেই ভাবটীর আরোপ করিয়া বায়ুকেই তদ্রূপে ভাবিতে বলা হইতেছে বলিয়া, ইহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কারণ, আমরা এভাবে বায়ুকে না ভাবিলেও চলে। চক্ষের সম্মুখে ঘটবস্তুটী আসিলে, এবং কোন বাধা উপস্থিত না হইলে, যেমন তাহাকে ঘট বলিতেই বাধ্য হই, এস্থলে সেরূপ নহে। এইজন্য ইহা উপাসনার কথা, আরোপবুদ্ধির কথা, কর্তৃতন্ত্রজ্ঞানের কথা, বস্তু-তন্ত্রজ্ঞানের কথা নহে, সুতরাং রৈক্ককে প্রকৃত পরব্রহ্মজ্ঞ বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না। কারণ, উপাস্য ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নহে, উহা সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মই প্রকৃত ব্রহ্ম। কারণ, উহা সগুণের মূল, এবং সগুণ ব্রহ্ম জীবের অজ্ঞান পর্য্যন্ত স্থায়ী। তাহার পর আরও দেখ, এই সংবর্গ-বিদ্যায় যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা সর্ব্বদিকে অন্নলাভ ও অন্নভোক্তা হওয়া, অন্য কিছু নহে। বল দেখি, ইহা কি ব্রহ্মজ্ঞানের ফল? তাহার পর রৈক্কের যে চরিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাই কি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞের অনুরূপ? রাজপ্রদত্ত অল্প ধনে প্রথমবারে তাঁহার মন উঠিল না,—শেষে রাজা যখন বহু ধন ও রাজকন্যা প্রদান করেন, তখন তিনি উহা গ্রহণ করেন। রাজাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অথচ তিনি মহাদাতা, পরোপকারী, ও দ্যুলোকব্যাপী এমন তেজে তেজস্বী যে, ঋষিগণ তাহা অতিক্রম করা উচিত কি না, তাহা সহজে বুঝিতে পারেন নাই। অবশ্য এতদ্দ্বারা রৈক্ককে সাধারণ লোক না বলিলেও যে তাঁহার ভোগলালসা ছিল, তাহা নিশ্চয়। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞের ভোগ থাকিতে পারে, কিন্তু ভোগ-লালসা থাকে না। এই সকল কারণে রৈক্কের জ্ঞান প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান নহে এবং তজ্জন্য এই প্রসঙ্গে উক্ত বেদনাখ্য জ্ঞানটী উপাসনা হইলেও, আমাদের অভীষ্ট বেদান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান যে বেদান্তে উপদিষ্ট হয় নাই, তাহা বলা যায় না।

কুরুক্ষেত্র।

১৩১৮ সাল ৩০শে আশ্বিন, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট অর্থাৎ আম্বালা ছাউনির টিকেট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। এই গাড়ী দেরাদুন হইতে লাহোর পর্য্যন্ত যায়। এই গাড়ীতে উঠিলে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। নতুবা লাক্‌সার জংশন ও সাহারাণপুর ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইতে হয়। গাড়ীতে বড় ভিড়। লাকসার জংশনে আমাদের গাড়ীতে ৩।৪টী বাঙ্গালী ভদ্রলোক উঠিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রুড়কী-যাত্রী। তাঁহারা রুড়কীতেই অবস্থান করেন। আম্বালার পথে দুইটী ষ্টেশনই উল্লেখযোগ্য,—রুড়কী ও সাহারাণপুর। রুড়কীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজই ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র উচ্চশ্রেণীর পূর্ত্ত-বিদ্যালয়। রুড়কীতে গঙ্গার কাটা খালের প্রধান কল ও আফিস। সাহারাণপুর যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত সাহারাণপুর জিলার প্রধান নগর। হরিদ্বার সাহারাণপুর জিলারই অন্তর্গত। সাহারাণপুরে আউধ্ এণ্ড্ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে শেষ হইয়াছে এবং এখান হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে। সাহারাণপুর রেলষ্টেশনে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক দূর হইতে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া আনন্দবিহ্বলচিত্তে আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তিনি এ অঞ্চলেই চাকুরী করেন। আমাদিগকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। এ দূরদেশে বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ হইলে, স্বভাবতঃই পরস্পরের বড় আনন্দ হয়।

রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় আমরা আম্বালা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় আম্বালা হইতে একটী গাড়ী থানেশ্বরের দিকে রওনা হয়। রাত্রে অপরিচিত স্থানে যাওয়া সুবিধাজনক নহে, বিশেষতঃ একটী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, কুরুক্ষেত্রে চোরের ভয় আছে, এজন্য রাত্রি আম্বালাতেই কাটাইলাম। আম্বালা পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত আম্বালা জিলার প্রধান নগর। এইস্থানে ইংরেজ

সৈনিকদিগের একটী ছাউনি আছে। আম্বালা নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং দিল্লী-আম্বালা-কালকা রেলওয়ের জংশন। ষ্টেশনটী বৃহৎ ও দেখিতে বেশ সুন্দর। আম্বালা একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান এবং সমুদ্রসমতল হইতে ১০৪০ ফিট্ উচ্চ।

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, সেই সময় কুরুক্ষেত্রে সাড়ে সাত লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আগামী ৫ই কার্ত্তিক সূর্য্যগ্রহণ, রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ বলিয়া এই বৎসর চূড়ামণি যোগ। এই উপলক্ষে বহু যাত্রী কুরুক্ষেত্রে যাইতেছে। এবৎসর কুরুক্ষেত্রে যাহাতে বেশী লোক-সমাগম না হয়, তজ্জন্য রেলওয়ে কোম্পানী কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বরের টিকিট দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ ভারতবর্ষে আসিবেন ও দিল্লীতে দরবার হইবে, সুতরাং কুরুক্ষেত্রে বহুলোক-সমাগম হইলে পাছে সংক্রামক রোগ দেখা দেয়, সম্ভবতঃ সেই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রের টিকেট্ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। কারণ, ইতিপূর্ব্বে দিল্লী নগরীতে কলেরা দেখা দিয়াছিল। আমরা যখন লাক্‌সার জংশনে পৌঁছি, সেই সময় জনৈক রেলকর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন যে, আম্বালা হইতে কুরুক্ষেত্রের টিকেট দেওয়া হইবে না। ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সাহারাণপুর ষ্টেশনে একটী রেল-কর্ম্মচারীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রের টিকেট দেওয়ার জন্য তৎপূর্ব্বদিন টেলিগ্রামে আদেশ আসিয়াছে। ঈপ্সিত স্থানে যাইতে পারিব ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতের গাড়ীতে থানেশ্বরের টিকেট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে বিশেষ ভিড়, সুতরাং উঠিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আমরা যে গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে কুরুক্ষেত্র যাইতেছিলেন, ভদ্রলোকটী আম্বালায় অবস্থান করেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে গাড়ীতে উঠিতে ও বসিতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। গাড়ী প্রথমতঃ

পূর্ব্বদিকে যাইয়া পরে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে যাইতে লাগিল। আমি কুরুক্ষেত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে পথিপার্শ্বস্থ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বেলা ৯ ঘটিকার সময় থানেশ্বর জংশনে পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার দ্বারে যাইয়া দেখিলাম যে, হুলস্থুল কাণ্ড, জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া কঠিন। রেলষ্টেশনের বাহিরে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের তাবু। কুরুক্ষেত্র-যাত্রীদের প্রত্যেককে এক আনা কর দিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর নিকট রসিদ লইতে হয়, নতুবা যাইতে দেওয়া হয় না। আমরাও পয়সা দিয়া রসিদ লইলাম। পরে অতিকষ্টে লোকারণ্য ভেদ করিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। গয়া, প্রয়াগ, হরিদ্বার ও হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে যেরূপ বৃহৎ ও সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে, কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মশালা তেমন নয়। উহা ইষ্টকনির্ম্মিত ও প্রাচীরবেষ্টিত বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশ কুঠরীতেই কবাট নাই। আমরা ভাগ্যক্রমে একটী হিন্দুস্থানীর সাহায্যে একটী কবাটযুক্ত কুঠরী পাইয়া উহা অধিকার করিয়া লইলাম এবং মনে মনে ধর্ম্মশালা-স্থাপয়িতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। বহু লোক-সমাগমের কালে এরূপ স্থান পাওয়া দুর্ঘট। আমরা আশাতিরিক্ত সুবিধা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

কুরুক্ষেত্র ভারতের মহাতীর্থ। কুরুক্ষেত্র ভারতের মহাশ্মশান। ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়-শোণিতে পাঁচটী হ্রদ পরিপূর্ণ এবং শোণিত দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরামের শোণিততর্পণে পিতৃপুরুষগণ পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে বর-গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়বিনাশের পাপ হইতে মুক্তিলাভ এবং তৎকৃত শোণিতহ্রদের তীর্থরূপে পরিণতি —এই দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন। পিতৃগণ 'তথাস্তু' বলিয়া বরপ্রদান করিলেন। পঞ্চহ্রদ ও তৎসমীপস্থ ভূভাগ মহাতীর্থরূপে পরিণত হইল। দ্বাপরের অবসানে ও কলির প্রারম্ভে এই পবিত্র-ভূভাগে কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ সংঘটিত এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য কালকবলে নিপতিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে মহাভারতের আদি পর্ব্বে

যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। উগ্রশ্রবানন্দন সৌতি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"শৃণুধ্বং মম ভো বিপ্রা ব্রুবতশ্চ কথাঃ শুভাঃ।
সমন্তপঞ্চকাখ্যং চ শ্রোতুমর্হথ সত্তমাঃ॥
ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অসকৃৎ পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ॥
স সর্ব্বং ক্ষত্রমুৎসাদ্য স্ববীর্য্যেণানলদ্যুতিঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রুধিরহ্রদান্॥
স তেষু রুধিরাম্ভঃসু হ্রদেষু ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পিতৄন্ সংতর্পযামাস রুধিরেণেতি নঃ শ্রুতম্॥"

* * *

"হ্রদাশ্চ তীর্থভূতা যে ভবেযুর্ভুবি বিশ্রুতাঃ।
এবং ভবিষ্যতীত্যেবং পিতরস্তমথাব্রুবন্॥"

* * *

"তেষাং সমীপে যো দেশো হ্রদানাং রুধিরাম্ভসাম্।
সমন্তপঞ্চকমিতি পুণ্যং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্॥"

* * *

"অন্তরে চৈব সংপ্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥
তস্মিন্ পরমধর্ম্মিষ্ঠে দেশে ভূদোষবর্জ্জিতে।
অষ্টাদশ সমাজগ্মুরক্ষৌহিণ্যো যুযুৎসবঃ॥"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

পরশুরামের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। ইহা একটী পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ চরণের গুলফ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। সেই হেতু ইহা একান্ন মহাপীঠের এক পীঠ।

কুরুক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ। দিল্লী-আম্বালা কালকা রেলওয়ে কুরুক্ষেত্রের ভিতর দিয়া গিয়াছে। থানেশ্বর, আমিন, তিরৌরি, কর্ণাল, পানিপথ প্রভৃতি ষ্টেশন কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। ইহা বর্ত্তমান যুগের একটী

প্রধান ঐতিহাসিক লীলাক্ষেত্র। মহম্মদ গজনী সপ্তদশ বার ভারত আক্রমণ করতঃ যে সকল হিন্দু দেবমন্দির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে থানেশ্বরের মন্দির অন্যতম। সেই সময়ে এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব অতুলনীয় ছিল। সুলতান মহম্মদ থানেশ্বরের মন্দির আক্রমণ করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া, লাহোরের রাজা অনঙ্গপাল সুলতান মহম্মদের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া মন্দির রক্ষা করার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলতান মহম্মদ তাহাতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর অনঙ্গপাল সমীপবর্ত্তী ভূভাগের হিন্দুরাজাদিগকে মন্দিররক্ষার জন্য সমবেত হইতে আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সুলতান মহম্মদ মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং অগণিত ধনরাশি লইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, পথে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজপ্রমুখ হিন্দুরাজগণকর্ত্তৃক থানেশ্বরে আক্রান্ত হইয়া পরাস্ত হন এবং গুরুতররূপে আহত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। সেই সময় হিন্দুরাজগণ অভ্যন্তরীণ কলহে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কনৌজরাজ জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের সহিত শত্রুতাসাধন জন্য মহম্মদ ঘোরীর সহিত মিলিত হইলেন। থানেশ্বরে যুদ্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিহত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাজলক্ষ্মী চিরতরে ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

কুরুক্ষেত্র দেখিবার সাধ বহুদিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। যখন আম্বালা হইতে রওনা হই, তখন প্রাণের ভিতর কি যে ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কত যুগযুগান্তরের স্মৃতি আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামানন্তর আমরা দর্শনার্থ বাহির হইলাম। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সর্ব্বপ্রথমে থানেশ্বর মহাদেবের মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। থানেশ্বর মহাদেবের মন্দির ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। কুরুক্ষেত্র বহুবিস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তরের মধ্যে বিরল-সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুরাজি। সূর্য্য-

গ্রহণ উপলক্ষে এই সময় লোক-সমাগম হইয়াছে, নতুবা অন্য সময় এই স্থান নির্জ্জন ও নিঃশব্দ থাকে। যতদূর চক্ষু যায়, প্রান্তরের পর প্রান্তর ও অরণ্যানী। কুরুক্ষেত্রের মৃত্তিকা রক্তাভ। শুনিয়াছি—এই স্থান নিতান্ত অনুর্ব্বর। এই স্থানে ফসলাদি জন্মে না এবং লোক তিষ্ঠিতে পারে না। কুরুক্ষেত্রে আসিলে প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। এই মহাশ্মশানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রাণে কি এক উদাস ভাব উপস্থিত হয় ও হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠে! জগতের নশ্বরত্ব ও সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ে আপনা আপনি জাগরূক হয়। কত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রাণীর রক্তে কুরুক্ষেত্র রঞ্জিত হইয়াছে। ভারতের ক্ষত্রিয়কুল এই মহাশ্মশানে চিরনিদ্রিত রহিয়াছেন। কত রাজবংশের, কত জাতির উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি, প্রতিষ্ঠা ও বিনাশ কুরুক্ষেত্রের সহিত সম্বদ্ধ। ভারতের ভাগ্যচক্র এই মহাক্ষেত্রে বিঘূর্ণিত হইয়াছে। এই কুরুক্ষেত্র মহাপবিত্র সাধনাক্ষেত্র। দেবমাতা অদিতি কুরুক্ষেত্রে বহুকাল তপস্যা করিয়া ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিবার বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ভগবান্ বামনরূপে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে কত সাধু মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং এই স্থানে কত যাগযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে।

আমরা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন স্থানে ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার আকার ধারণ করিয়াছে। আরও কতদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম—একটী হ্রদ। ইহার তীরে নানা সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছেন। হ্রদের পশ্চিম তীরে বহুপ্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সর্ব্ববিধ্বংসী কালের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তরতীরে অনেকগুলি স্নানের ঘাট, মধ্যে মধ্যে সুন্দর ও সুগঠিত বিভিন্ন সময়ের মন্দির। হ্রদের দৈর্ঘ্য একমাইল ও প্রস্থ পোয়া মাইল হইবে। আরও কতদূর অগ্রসর হইয়া থানেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

থানেশ্বরের মন্দির তেমন জমকাল না হইলেও, দেখিতে বেশ সুগঠিত ও সুদৃঢ়। এই মন্দির খুব নির্জ্জন। মন্দিরের সম্মুখে পূর্ব্ব দিকে একটী জলাশয়। ইহার চারি পাড প্রস্তরের সোপানে বাঁধা। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পাড়ে বহুপ্রাচীন বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ। এই স্থানে আসিলে প্রাণে কেমন প্রশান্ত ভাব উদিত হয়। ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপের পর অট্টালিকাস্তূপ দর্শন করিয়া জগতের নশ্বরতা হৃদয়ে আপনা আপনি উপলব্ধি হয়। আবার এই মহাশ্মশানে মহাকালের মন্দিরে আসিলে, প্রাণ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। পুণ্যভূমি বারাণসীর শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ দেখিয়া প্রাণে আনন্দ হয়। থানেশ্বর মন্দির ও থানেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখিয়া প্রাণে গভীর বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতেই বামদিকে অষ্টভুজার মূর্ত্তি। মন্দিরের অভ্যন্তরে থানেশ্বর শিবলিঙ্গ। মন্দিরের ভিতর একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান আছে। ঘণ্টা একবার নাড়িয়া ছাড়িয়া দিলে কতক্ষণ ঢং ঢং ঢং ধ্বনি হইতে থাকে। সেই ধ্বনি কেমন গম্ভীর ও প্রাণের ভিতর কি এক ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহা বর্ণনাতীত।

থানেশ্বর—স্থাণ্বীশ্বর নামের অপভ্রংশ। দেবতার নামানুসারে স্থানের নাম—থানেশ্বর হইয়াছে। থানেশ্বর মহাদেব পীঠক্ষেত্রের অধীশ্বর ও দেবী ভদ্রকালী পীঠক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কুন্তীদেবী থানেশ্বর মহাদেবের পূজা করিতেন। মন্দিরের সম্মুখে যে জলাশয় আছে, তাহা প্রাচীনকালে যজ্ঞকুণ্ড ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কুণ্ডের জল খুব গভীর। যাঁহারা ইহাতে অবগাহন করিয়া স্নান করিবেন, তাঁহাদের বেশী দূরে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কুণ্ডে বৃহৎ কচ্ছপ আছে।

থানেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া তথা হইতে ৺ভদ্রকালীর মন্দিরে গেলাম। ভদ্রকালীর মন্দির—থানেশ্বরের মন্দির হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। এই স্থানটীও খুব নির্জ্জন। মন্দির প্রাচীরবেষ্টিত। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রাচীরের বাহিরে একটী পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পাড় হইতে জলাশয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী। পুষ্করিণীর জল ভাল

নহে। প্রাচীরাভ্যন্তরে মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ ইন্দারা। মন্দিরের নিকট একটী বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ। মন্দিরটী আয়তনে তেমন বৃহৎ নহে। মন্দিরাভ্যন্তরে পাষাণময়ী কালিকা-মূর্ত্তি। বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এমন সুন্দর মূর্ত্তি খুব কমই দেখা যায়। মূর্ত্তিটী বেশী বড় নহে। উহা দক্ষিণা-কালীর মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল। মুখ বেশ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ও স্নিগ্ধ। মন্দিরদ্বারের পূর্ব্বদিকে প্রাচীরগাত্রে একটী বৃহৎ কালিকা-মূর্ত্তি অঙ্কিত। এই মূর্ত্তিটী অতি ভয়ঙ্করী। কুন্তলরাশি আলুলায়িত, নয়নত্রয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—যেন বিশ্ব-সংহারিণী মূর্ত্তিতে দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বারের পশ্চিমদিকে প্রাচীরগাত্রে মহাবীরজির মূর্ত্তি অঙ্কিত। আদ্যা-স্তোত্র নামক সুপ্রসিদ্ধ দেবীস্তোত্রে ভদ্রকালীর উল্লেখ আছে, যথা,—

"কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।" ৺ভদ্রকালীর মন্দিরের পশ্চিমে আর একটী মন্দির আছে—ঐ মন্দিরটী দ্বিতল। উপরের তলায় গঙ্গা ও সরস্বতীর মূর্ত্তি আছে।

ভদ্রকালীর মন্দিরের মোহান্তটী বেশ ভদ্র ও অমায়িক বলিয়া বোধ হইল। তিনি বাঙ্গালীদিগকে বিশেষ যত্ন করেন। হিন্দুস্থানী যাত্রী অপেক্ষা বাঙ্গালী যাত্রিগণ অধিকতর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ভদ্রকালী-দেবীর পূজা দিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। ভদ্রকালীর বাড়ীতে আসিয়া মনে হয়, যেন বঙ্গদেশে কোন কালীমন্দিরে আসিয়াছি। ভদ্র-কালীর বাড়ীতে যশোহরজিলা-নিবাসী কয়েকটী স্ত্রীলোক ও পুরুষ যাত্রীকে মোহান্ত স্থান দিয়াছেন দেখিলাম। মোহান্ত আমাকে বলিয়া দিলেন, যদি কোন বাঙ্গালী যাত্রীর কুরুক্ষেত্রে অবস্থানের অসুবিধা হয়, তবে তিনি ভদ্রকালীর মন্দিরে স্থান করিয়া দিবেন।

ভদ্রকালীর মন্দির দর্শন করিয়া তথা হইতে দ্বৈপায়ন হ্রদে উপস্থিত হইলাম। দ্বৈপায়ন হ্রদে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যে অগণিত যাত্রীর সমাবেশ হয়, তাঁহারা দ্বৈপায়ন হ্রদে স্নান করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ প্রত্যহ স্নান ও তর্পণকালে যে পঞ্চ মহা-তীর্থের আবাহন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কুরুক্ষেত্র একটী; যথা,—

"কুরুক্ষেত্রগয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥"

আমি থানেশ্বর মন্দিরের সম্মুখস্থ কুণ্ডে প্রথমতঃ স্নান করিয়াছিলাম, এই স্থানে পুনরায় অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথিগণ এবং দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইলে পর, দুর্য্যোধন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণ-রক্ষার্থ এই হ্রদে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে হ্রদ হইতে বাহির হইয়া ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ভীমের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন হয়।

"যতীশ্বর" কুরুক্ষেত্রের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। স্থানটীর নাম "যতীশ্বব" কি "জ্যোতিঃসব" তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ইহা দ্বৈপায়ন হ্রদ হইতে অনুমান ৬ কি ৭ মাইল দূরে ও দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই স্থান হিন্দুর নিকট বড় পবিত্র। কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে যুদ্ধার্থ সমবেত কুরুপাণ্ডবসৈন্য দর্শন করিয়া যখন অর্জ্জুনের চিত্ত বিষাদে অভিভূত হইয়াছিল এবং কুলক্ষয় ও ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অর্জ্জুন যখন যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন এই স্থানে ভগবানেব শ্রীমুখ হইতে অর্জ্জুনের মোহ অপনোদনেব জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য অমৃতময়ী "ভগবদ্গীতা" প্রকাশিত হইয়াছিল। এই স্থানে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই মহাতীর্থ দর্শন করিবার জন্য অপরাহ্নে গাড়ী করিয়া রওনা হইলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল প্রান্তরের পর প্রান্তর, বনের পর বন। এ বনের দৃশ্য মনোহর। এই বিস্তৃত প্রান্তর ও অরণ্যানী ভেদ করিয়া সুন্দর রাজপথ পিহোবা ও অন্যান্য স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। সন্ধ্যাসমাগমে অস্তাচল-গমনোন্মুখ সূর্য্য রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে পশ্চিম গগন গাঢ় রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রকৃতি গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। এ হেন সময়ে সেই বিজন প্রান্তর ভেদ করিয়া যখন চলিতে লাগিলাম, তখন অতীতের স্বপ্নময়ী স্মৃতি আসিয়া হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। মানসনেত্রে

অতীতের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম,—অগণিত কুরু ও পাণ্ডব-সৈন্যে প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, জয়দ্রথ, ভীম, অর্জ্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথিগণ সেই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। রণকোলাহলে যুদ্ধপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম, কালপ্রেরিত হইয়া ক্ষত্রিয়কুল রণযজ্ঞে জীবন আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আর দেখিলাম —সেই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত হয়, যিনি সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, দেখিলাম—সেই লীলাময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুনের রথে সারথিরূপে দণ্ডায়মান। দেখিলাম,—সেই অষ্টাদশদিনব্যাপী মহাযুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে রক্তনদী প্রবাহিত হইয়াছে, মনুষ্য, গজ, অশ্ব প্রভৃতির মৃতদেহ সেই রক্তস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কুরু ও পাণ্ডব-সৈন্যের অধিনায়ক ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমর-শয্যায় শায়িত হইয়াছে। শৃগাল, কুক্কুর, শকুনির রবে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে ভীষণ চিতা জ্বলিয়াছে। কুরুকামিনীকুলের করুণ আর্ত্তনাদে অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে। মহাশ্মশানে লীলাময়ী ধ্বংসরূপিণীর মহালীলার অবসান হইয়াছে। এ মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলে প্রাণে কি বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়!

যখন "যতীশ্বরে" উপস্থিত হইয়াছি, তখন সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকারে পৃথিবী আবৃত হইয়াছে। যতীশ্বরে একটী মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মূর্ত্তি। অর্জ্জুন রথোপরি উপবিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ সারথি-বেশে দণ্ডায়মান। ভগবান্ যে অবস্থায় অর্জ্জুনকে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন, যে অবস্থায় অর্জ্জুন ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত "ভগবদ্গীতা" শুনিয়াছিলেন, এ সেই অবস্থারই মূর্ত্তি। মন্দিরের অনতিদূরে অশ্বত্থ প্রভৃতি কএকটী বৃক্ষ একত্রিত হইয়া পঞ্চ-বটীর আকার ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণে একটী জলাশয়। সোপানাবলী তীর হইতে জলাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এ স্থানে আসিয়া প্রাণে কি ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহার ভাষা নাই, তাহা

হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জিনিষ। "যতীশ্বরে" যাহা দেখিয়াছি ও যাহা প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার সুখময়ী স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

কুরুক্ষেত্রে দর্শনীয় অনেক স্থান আছে। দীর্ঘকাল না থাকিলে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া না দেখিলে, সমস্ত স্থান দেখা সম্ভবপর নহে। সপ্তরথীর সহিত অভিমন্যুর যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অন্যায় যুদ্ধে যে স্থানে অভিমন্যু নিহত হইয়াছিলেন, তাহার আধুনিক নাম "আমিন"। আমিনে একটী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

ভীষ্মের শরশয্যাস্থান ও বাণগঙ্গা দর্শনযোগ্য। ভীষ্ম পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিলে পর, অর্জ্জুন শরক্ষেপ দ্বারা ভূগর্ভ বিদীর্ণ করতঃ যে স্থানে দ্রবময়ী গঙ্গার আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, তাহাই বাণগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। আমি সময়াভাবে আমিন, ভীষ্মের শরশয্যা ও বাণগঙ্গা দর্শন করিতে পারি নাই। "পিহোবা"র শিবমন্দির এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি "থানেশ্বর-কৈথান শাখা রেলপথ" নামে যে রেলপথ হইয়াছে, তাহাতে পিহোবা রোড্ নামে একটি ষ্টেশন হইয়াছে। উক্ত ষ্টেশন হইতে পিহোবার মন্দির অধিক দূর নহে। আমি এইস্থানে যাইতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। যাঁহারা কুরুক্ষেত্র যাইবেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন পিহোবার মন্দির দর্শন করিয়া আসেন।

কুরুক্ষেত্রের মধ্যে অন্যূন চারিশত মন্দির ও দর্শনীয় স্থান আছে।

কুরুক্ষেত্র ও তৎসমীপবর্ত্তী ভূভাগ প্রাচীনকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভি-হিত হইত। পুণ্যসলিলা সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যথা,—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" মনু

দেবনদী সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী দেবতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে দেশ, তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই কুরুক্ষেত্র।

"দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে॥"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, একাশীতিতম অধ্যায়।

"উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী; যাহারা এই কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহাদিগের সুরলোকে বাস করা হয়।"

৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

ব্রহ্মাবর্ত্ত ভারতীয় সাধনা ও অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্তের শিক্ষা ও দীক্ষা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সমস্ত ভারতের আদর্শ ও অনুকরণীয় ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যমুনিঋষিদিগের পবিত্র আশ্রমে পরিব্যাপ্ত ছিল। ব্রহ্মবিৎ ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমন্তরীক্ষে চ পুষ্করম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে॥
পাংসবোঽপি কুরুক্ষেত্রাদ্বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্॥
কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহং।
অপ্যেকাং বাচমুৎসৃজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্।
তস্মিন্ বসন্তি যে মর্ত্ত্যা ন তে শোচ্যাঃ কথঞ্চন॥
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং
রামহ্রদানাং চ মচক্রুকস্য চ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং
পিতামহস্যোত্তরবেদিরুচ্যতে॥"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

"পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ, অন্তরীক্ষের মধ্যে পুষ্কর এবং ত্রিলোকীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ। কুরুক্ষেত্রের বায়ুসমুত্থিত ধূলিকণাও

সকল পাপাত্মাকে পরমগতি প্রদান করে। যে ব্যক্তি একবার কহে যে, 'আমি কুরুক্ষেত্রে গমন ও বসতি করিব,' সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র ও ব্রহ্মর্ষিসেবিত স্থান; যে সকল মনুষ্য তথায় বাস করে, তাহারা কদাচ শোচনীয় হয় না। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক এই কয়েক স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চক; উহাই পিতামহের উত্তরবেদী বলিয়া বিখ্যাত।"

৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নরপতি মান্ধাতা কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

তস্যৈতদ্দেবযজনং স্থানমাদিত্যবর্চ্চসঃ।
যস্য পুণ্যতমো দেশো কুরুক্ষেত্রস্য মধ্যতঃ॥"

মহাভারত, বনপর্ব্ব।

সেই সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন মহীপতির (মান্ধাতার) এই দেবযজন স্থান, এই পরম পবিত্র প্রদেশ কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগ।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি। কিন্তু হায়! দ্বাপরের অবসানে এই কুরুক্ষেত্রে যে মহাশোণিতযজ্ঞ হইয়াছিল, তাহারই ফলে ভারত মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এই মহাশোণিতযজ্ঞ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া মহাবীর কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া ইহার যে পূর্ব্বাভাষ দিয়াছিলেন, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। আমরা মহাভারত হইতে ইহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিব।

"ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য বার্ষ্ণেয় শস্ত্রযজ্ঞো ভবিষ্যতি।
অস্য যজ্ঞস্য বেত্তা ত্বং ভবিষ্যসি জনার্দ্দন॥
আধ্বর্য্যবং চ তে কৃষ্ণ ক্রতাবস্মিন্ ভবিষ্যতি।
হোতা চৈবাত্র বীভৎসুঃ সন্নদ্ধঃ সকপিধ্বজঃ॥
গাণ্ডীবং স্রুক্ তথা চাজ্যং বীর্য্যং পুংসাং ভবিষ্যতি.

ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং স্থূণাকর্ণং চ মাধব।
মন্ত্রাস্তত্র ভবিষ্যন্তি প্রযুক্তা সব্যসাচিনা॥

* * *

স চৈব তত্র ধর্ম্মাত্মা শশ্বদ্রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
জপৈর্হোমৈশ্চ সংযুক্তো ব্রহ্মত্বং কারয়িষ্যতি॥
শঙ্খশব্দাঃ সমুরজা ভের্য্যশ্চ মধুসূদন।
উৎকৃষ্টসিংহনাদশ্চ সুব্রহ্মণ্যো ভবিষ্যতি॥

* * *

অসয়োহত্র কপালানি পুরোডাশা শিরাংসি চ।
হবিস্তু রুধিরং কৃষ্ণ তস্মিন্ যজ্ঞে ভবিষ্যতি॥

* * *

দীক্ষিতো ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽত্র পত্নী চাস্য মহাচমূঃ।
যদা দ্রক্ষ্যসি মাং কৃষ্ণ নিহতং সব্যসাচিনা।
পুনশ্চিতিস্তদা চাস্য যজ্ঞস্যাথ ভবিষ্যতি॥
দুঃশাসনস্য রুধিরং যদা পাস্যতি পাণ্ডবঃ।
আনন্দং নর্দতঃ সম্যক্ তদা সুত্যং ভবিষ্যতি॥
যদা দ্রোণং চ ভীষ্মং চ পাঞ্চাল্যৌ পাতয়িষ্যতঃ।
তদা যজ্ঞাবসানং তদ্ভবিষ্যতি জনার্দ্দন॥
দুর্য্যোধনং যদা হন্তা ভীমসেনো মহাবলঃ।
তদা সমাপ্যতে যজ্ঞো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য মাধব॥
স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য সঙ্গতাঃ।
হতেশ্বরা নষ্টপুত্রা হতনাথাশ্চ কেশব॥
রুদন্ত্যঃ সহ গান্ধার্য্যা শ্বগৃধ্রকুররাকুলে।
স যজ্ঞেঽস্মিন্নবভৃথো ভবিষ্যতি জনার্দ্দন॥

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

"হে বৃষ্ণিনন্দন, দুর্য্যোধনের যে শস্ত্রযজ্ঞ হইবে, তুমি তাহার উপদেষ্টা ও অধ্বর্য্যু হইবে; বর্দ্ধিত-কলেবর কপিধ্বজ এই যজ্ঞে হোতৃপদ গ্রহণ করিবেন; গাণ্ডীব স্রুক্ ও পুরুষকার আজ্য-স্থানীয় হইবে, সব্যসাচি-

প্রযুক্ত ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রসকল যজ্ঞের মন্ত্র হইবে। * * *

জপহোমপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির• ব্রহ্মা হইবেন; শঙ্খশব্দ, মুরজশব্দ, ভেরীশব্দ ও সিংহনাদ উৎকৃষ্ট মঙ্গলধ্বনি হইবে।

* * *

অসিসকল কপাল ও মস্তকসকল পুরোডাশের পাকপাত্র এবং রুধির হবিঃস্থানীয় হইবে। দুর্য্যোধন এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন, এই মহতী সেনা তাঁহার পত্নী হইবে।

হে কৃষ্ণ, যখন তুমি আমাকে ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইতে দেখিবে, তখন পুনরায় এই যজ্ঞের অগ্নিচয়ন হইবে। যখন ভীমসেন সিংহনাদ-সহকারে দুঃশাসনের রুধির পান করিবেন, তখন সোমরস-পান সমাপন হইবে। যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণ এবং ভীষ্মকে নিপাতিত করিবেন, সেই সময়ে এই যজ্ঞের বিশ্রাম হইবে। যখন মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে সংহার করিবেন, তখন তাঁহার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবে। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ ও পৌত্রপত্নীসকল একত্র মিলিত এবং স্বামিহীন, পুত্রহীন ও নাথহীন হইয়া গান্ধারী সমভিব্যাহারে কুক্কুর গৃধ্র ও কুররসঙ্কুল রণক্ষেত্রে রোদন করিবেন, তখন এই যজ্ঞের অবভৃথ-স্নান সমাধান হইবে।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ঘোর অমঙ্গলসূচক সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল ও ভারতভূমি অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল। সেইদিন ভারতে যে অন্ধকার আসিয়াছিল, তাহা আর দূরীভূত হইল না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর হইতে ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতেই ভারতের গৌরব বিলুপ্ত। হিন্দু-সভ্যতা সেই সময় হইতে জীবনীশক্তি হারাইয়াছে। অতঃপর ভারতে হিন্দু-সভ্যতার যে ক্ষীণরশ্মি সময় সময় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিবিড়-জলদজালমধ্যবর্ত্তী বিদ্যুতের ক্ষীণ আলোকের ন্যায়। হিন্দু জাতীয় জীবন সেই সময় হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র আবহমান কাল হইতেই ভারতে প্রসিদ্ধ। মধ্যযুগে

কালিদাসের সময়েও কুরুক্ষেত্র পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ভূভাগ ছিল। কালিদাস তাঁহার রচিত মেঘদূত নামক কাব্যে তদানীন্তন উত্তর ও মধ্যভারতের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। মেঘদূতে কালিদাস কুরুক্ষেত্রের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

"ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথ চ্ছায়য়া গাহমানঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং সিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি॥"

মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ, ৪৮শ শ্লোক।

"অতঃপর তুমি ব্রহ্মাবর্ত্তনামক জনপদে ছায়াদ্বারা প্রবেশ করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের রণভূমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে, যে স্থানে অর্জ্জুন রাজাদিগেব মুখমণ্ডলে শত শত নিশিত শরসমূহ বর্ষণ করিয়াছিলেন, যেমন তুমি কমলসমূহের উপর ধারা বর্ষণ করিয়া থাক।"

কুরুক্ষেত্র বর্ত্তমান সময়েও ভারতেব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাণিপথক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদী ও তাঁহার এক লক্ষ সেনা পরাভূত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি আকবর পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে সের সাহের পরবর্ত্তী আফগানদিগকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের রণপ্রাঙ্গণে আহম্মদ শাহ দুরাণী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে পরাভূত করিয়া মহারাষ্ট্র-শক্তি খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির সাহ "কর্ণালের" যুদ্ধক্ষেত্রে দিল্লীর তদানীন্তন বাদসাহ মহম্মদ সাহকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিরৌরী ও থানেশ্বরে ১১৯১ ও ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কুরুক্ষেত্র বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত কর্ণাল জিলার অন্তর্ভুক্ত। কর্ণাল জিলার প্রধান নগর কর্ণাল। এই নগর কর্ণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

ইদানীং "থানেশ্বর জংসন" ষ্টেশনের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "কুরুক্ষেত্র

জংসন" নাম হইয়াছে। • এবং "থানেশ্বর-কৈথাল" শাখা রেলপথে "কুরুক্ষেত্র" নামে যে ষ্টেশন ছিল, তাহার নাম "থানেশ্বর সিটি" অর্থাৎ "থানেশ্বর সহর" হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন বি, এল।

কথা উপনিষৎ।

[তৈত্তিরীয়োপনিষৎ]

ভৃগুবল্লী।

সত্যলাভ।

শান্তিপাঠঃ।

॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ ॥
॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

পরংব্রহ্ম আমাদিগকে—গুরু শিষ্য উভয়কে—রক্ষা করুন এবং প্রতিপালন করুন। গুরু যেন নিরালস্য হইয়া আমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিদ্যা প্রদান করেন এবং আমরাও যেন নিরাপদে উপদিষ্ট হইয়া আত্ম-তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। তিনি আমাদিগকে বিদ্যা ও উপদেশ গ্রহণে সমর্থ করুন। তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যে বিদ্যাভ্যাস দ্বারা তেজস্বী হইয়াছি, সেই বিদ্যা এবং গৃহীত উপদেশসকল সফল হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হউক। পরন্তু ইহাও আমাদের প্রার্থনীয় যে, কখন যেন আমাদিগের পরস্পরের বিদ্বেষভাব না জন্মে ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

---

(১)

"গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্ শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।"

আশ্রম। সমস্ত ভারতবর্ষই আশ্রম—পবিত্র বিভুমন্দির, বিভুগানে মুখরিত। তা'রি মাঝে, বিরাটের মাঝে—বিরাট্ই ঘনীভূত, একটি আশ্রম। বিপুলের সাথে তা'র যোগ—মহর্ষি বরুণের আশ্রম। আশ্রম নিভৃত, শান্ত, ফলে ভরা শ্যামল ছায়ায় ঢাকা, ফুলফোটা কোমল মধুর গন্ধে ঘেরা, মৃদুল সমীরে ঢুলু ঢুলু, সকাল সাঁঝে পাখীর ডাকে মুখরিত। অদূরে আশ্রম-তটিনী—ক্ষীরনাড়ী—স্নেহধারা। কোন্ সুদূরের মহান্ কোন্ মূর্ত্তি কোন্ পবিত্র কথা আশ্রম-আকাশে আলোক ফুটাইয়া তুলিতেছে, বাতাস বহিয়া আনিতেছে। সে রূপের সাথে, সে কথার-সাথে একীভূত হইয়া যাইতেছে—তাপসের মানসপ্রতিমা, নিজ হৃদয়গাথা। এমনি আশ্রমে ঋষি বরুণ ব্রহ্মানন্দে ভরপুর।

স্নিগ্ধ প্রভাতে মহাতাপস ব্রহ্মারাধনায় নিমগ্ন। হেন কালে ঋষির প্রিয়পুত্র পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভক্তি নিবেদিয়া পিতার—গুরুর—চরণ বন্দিল।

"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি—ভগবন্! পিতঃ! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন।"

পিতা পুত্রের শির চুম্বন করিলেন। বলিলেন,—

"বৎস! সৌম্য! এই যে নিখিল বিশ্ব দেখিতেছ, ইনিই ব্রহ্ম। উপাসনা কর।

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—তপস্যা কর, জানিতে পারিবে।"

গুরু শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিষ্য গুরুর চরণধূলি মাথায় লইল।

(২)

এই যে নিখিল বিশ্ব বিস্তৃত রহিয়াছে,—ইনিই ব্রহ্ম। ভৃগু—সেই ব্রহ্মের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল।

বিপুল বিস্তৃত বিশ্ব—ব্রহ্ম, কুটীরের মাঝে বসিয়া তাঁ'র তপস্যা নয়! সে যে গন্ধ, সে যে বর্ণ, সে যে গান, সে যে স্পর্শ, সে যে রস। নয়ন

দেখিবে তাঁর রূপ, নাসিকা করিবে আঘ্রাণ, শ্রোত্র শুনিবে তাঁর গান, জিহ্বা করিবে রস গ্রহণ, স্পর্শ করিবে শরীর। সে ত কুটীরের মাঝে নয়, সে যে বিশ্বব্যাপী প্রেমাভিনয়। এ যে তটিনী হইয়া বহিতে হইবে, উধাও হইয়া দিশিদিশি বাতাসের সাথে ছুটিতে হইবে, ছাড়া বনের পাখীর মত আনন্দে জগৎ প্লাবিয়া গাহিয়া বেড়াইতে হইবে, শিখর হইতে শিখরে ছুটিতে হইবে, নীল সাগরে মেঘ-উড়ানো পালের নৌকায় চড়িয়া ভাসিতে হইবে, সুদূর তারার রাজ্যে দ্বারে দ্বারে অতিথি হইতে হইবে! সে ত কুটীরের মাঝে নয়।

ভৃগু সেই বিরাট্ তপস্যায় রত হইল।

স্বচ্ছ শুভ্র শরৎ,— কুয়াসার শিশির, ঢলঢল-যৌবন বসন্ত, তপ্ত গ্রীষ্ম, মেঘ-ডুরু-ডুরু ঝর-ঝর বরিষা একে একে চলিয়া গেল। রুদ্র-ভীষণ,— শান্ত-কোমল, স্নিগ্ধ-মধুর, কত রূপ, কত রস, কত গান, নয়ন মন ভুলাইয়া, ব্যাকুল করিয়া শরৎ শিশির বসন্ত বরষা চলিয়া গেল।

বর্ষ পূর্ণ হইল। বর্ষ পূর্ণ হইল, ভৃগু নিখিল বিশ্ব—ব্রহ্মকে জানিল। জানিল,—এ ব্রহ্ম—শরীর, অন্নময়। অন্নময় শরীর, অন্নময় বিরাট্ বিশ্ব।*

অন্ন হইতে শরীর হইয়াছে। এই বিরাট্ বিশ্বশরীর ব্রহ্মের অন্নময় শরীর। ক্ষুদ্র শরীর সেই বিরাটেরই ছায়া—নয়নের পাওয়া, শ্রোত্রের পাওয়া, ঘ্রাণের পাওয়া, স্পর্শের পাওয়া। বাহির দিয়া বাহিরকে পাওয়া, স্থূলের পাওয়া স্থূলকে। এখানেই ত শেষ নয়, আরও আছে, আরও পাইতে হইবে।

ভৃগু বলিয়া উঠিল,—

"এ শুধু শরীর, আমি ব্রহ্মের শরীর জানিয়াছি, শুধু শরীরই ত ব্রহ্ম নয়। শুধু এ নয়, এ নয়, আরও, আরও, আমাকে আরও জানিতে হইবে।"

* "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি"

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ভৃগুবল্লী, দ্বিতীয় অনুবাক।

(৩)

বৎসরান্তে ভৃগু আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিল।

"বৎস! তপোধন!"

"ভগবন্! তাত!"

পিতা পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিলেন।

ভৃগু চরণধূলি মাথায় লইল। বলিল,—

"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি—ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করুন। যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমার ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় নাই।"

"বৎস! এতদিনে কি জানিলে, কি শিখিলে?"

"শিখিলাম—জানিলাম, ব্রহ্ম অন্নময় ইহাতে জানা গেল না।* পিতঃ! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন।"

"তপস্যা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—তপস্যা কর, জানিতে পারিবে।"

ভৃগু পিতার বাক্য মাথা পাতিয়া লইল।

গুরু শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(৪)

অন্নময় ব্রহ্ম। এই যে বিচিত্রতা, এই যে পরিবর্ত্তন, এই যে গতি, এ ত শরীর নয়, এ যে শক্তি, এ যে সজীবতা। শরীরের মাঝে কা'র এ লীলা?

কে এ, কে এ? এ ত শরীর নয়।

ভৃগু তপস্যায় মগ্ন হইল।

কাহার ইচ্ছায় নয়ন দেখিতেছে, কাহার ইচ্ছায় শ্রোত্র শুনিতেছে, কাহার ইচ্ছায় জিহ্বা আস্বাদন করিতেছে, কাহার ইচ্ছায় নাসিকা আঘ্রাণ করিতেছে? এই ক্ষুদ্র এবং বিরাট্ শরীরে যিনি রহিয়াছেন, কে তিনি?

---

* নৈতাবতা বিদিতং ভবতি।

—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

কাহার তেজে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, মৃত্তিকা ওষধি উৎপন্ন করিতেছে, সলিল প্রবাহিত হইতেছে? কে তিনি? এই অন্নময় শরীরের পশ্চাতে কে ইনি?

ভৃগু জানিলেন,—এক প্রাণ—প্রাণময় ব্রহ্ম। *

প্রাণময় ব্রহ্ম অন্নময় ব্রহ্মকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। নিখিল শরীর মাঝে এক প্রাণ, এক সজীবতা—প্রাণময় ব্রহ্ম।

(৫)

প্রাণময় ব্রহ্ম, আধার তা'র অন্নময় ব্রহ্ম।

আলোকে বাতাসে প্রাণ, ভূধরে সলিলে প্রাণ, গ্রহ-তারায় সবিতায় প্রাণ, কত প্রাণ বিশ্বে?

সলিল শুকাইয়া যায়, কুসুম ঝরিয়া যায়, বাতাস বহিয়া মরিয়া যায়, আলোক জ্বলিয়া নিভিয়া যায়, গন্ধ ফুরাইয়া যায়, হাসিটি মিলিয়া যায়। যায়, যায়, কোথায় যায়? প্রাণ মরে কি? মরিয়া কোথায় যায়?

এত সুন্দর মরে কেন? মরে যদি তা'তে প্রাণ কেন? বিনাশ, বিনাশ, তবে প্রাণময় কেন? এ যে নাশময়!

না, না, তা নয়। প্রাণ—তা'র আবার নাশ কি? কখনো না, কখনো না। এখনো জানা হইল না। আরও আছে, আরও জানিতে হইবে।

(৬)

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে—কত বৎসর! ভৃগু তপস্যান্তে পিতার চরণে আসিয়া উপনীত হইল।

বৃদ্ধ তাপস ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দরসপানে ভরপূর।

ভৃগু পিতার চরণধূলি মাথায় লইল।

---

* প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি।
প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।
—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ভৃগুবল্লী, তৃতীয় অনুবাক।

"বৎস! তপোধন!"

"ভগবন্! তাত!"

পিতা পুত্রের শিরে কল্যাণহস্ত স্পর্শ করিলেন।

ভৃগু নীরবে চরণ বন্দনা করিল। বলিল,—

"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি—ভগবন্! আমায় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। যাহা জানিয়াছি, তাহাতে আমার ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। আমায় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন।"

"বৎস। এতদিনে কি জানিলে?"

"জানিলাম,—ব্রহ্ম অন্নময়, ব্রহ্ম প্রাণময়। শুধু এ নয়,আরও আছে, আরও জানিতে হইবে।"

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—বৎস! তপস্যা কর—জানিবে।"

ভৃগু পিতার আদেশ মাথা পাতিয়া লইল। চরণধূলি চুম্বন করিল।

বরুণ শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(৭)

এই যে প্রাণময় ব্রহ্ম—বিশ্ব—এর মূলে কে? কে এই বিচিত্রগতি বিচিত্র প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন? কে তিনি?

ভৃগু তপস্যায় মগ্ন হইল।

এই অসীম জগতে অসীম জীব জীবিত রহিয়া বৰ্দ্ধিত হইতেছে। আবার এ সকলের প্রলয়কাল—বিনাশকাল উপস্থিত হইবে। এক হইতে সকলের উৎপত্তি হইতেছে, আবার একেতেই গিয়া লয় প্রাপ্ত হইবে।

কুসুম শুকায় না, জ্যোৎস্না ফুরায় না, আলোক নিভিয়া যায় না, বাতাস মরিয়া যায় না। সকল সৌন্দর্য্য, সকল গতি, সকল শক্তি এক শক্তিময় সৌন্দর্য্যময়ে গিয়া আশ্রয় লাভ করে, আবার তাহা হইতে সমুদ্ভূত হয়।

একই বিরাট্ প্রাণ বহুধা হইয়াছে, একই বিরাট্ প্রাণের মাঝে বিচিত্র প্রাণের খেলা।

ভৃগু জানিল, বুঝিল, চিনিল। চিনিল,—ইনিই মনোময় ব্রহ্ম।

অন্নময় ব্রহ্ম, তাঁ'র পশ্চাতে প্রাণময়, তাঁ'র পশ্চাতে ইনি।—মনোময়।*

ভৃগু বলিয়া উঠিল, "আমি চিনিয়াছি, জানিয়াছি। মনো ব্রহ্মেতি।"

(৮)

এক হইতে সমস্তের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার একেতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এই যে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র প্রাণ, সবই সেই একের মাঝারে। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনো কিছু নাই, তিনিই সব। তিনি এক অদ্বিতীয়।

এই যে এক অদ্বিতীয়, কোথায় তাঁ'র আদি? কোথায় অন্ত? তিনি কবে হইয়াছেন, কবেই বা লুপ্ত হইবেন? কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথায়ই বা যাইবেন?

জানা হইল না, সন্দেহ বিদূরিত হইল না। আরও জানিতে হইবে। আরও আছে, এখানেই শেষ নয়।

(৯)

ভৃগু পিতার চরণ বন্দনা করিল।

"বৎস! তপোধন!"

"ভগবন্! তাত!"

বরুণদেব পুত্রের শির চুম্বিলেন।

ভৃগু পিতার চরণরেণু মাথায় লইল। বলিল,

"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি—ভগবন্! আমায় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার ব্রহ্ম-তত্ত্ব-পরিজ্ঞানের পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। যতই শুনিতেছি, ততই আমার ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-পিপাসা বলবতী হইতেছে।"

"বৎস! এতদিনে কি জানিলে?"

---

* "মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ভৃগুবল্লী, চতুর্থ অনুবাক।

"জানিলাম, ভগবন্‌! ব্রহ্ম অন্নময়, ব্রহ্ম প্রাণময়, ব্রহ্ম মনোময়। শুধু এ নয়, আরও আছে, আরও জানিতে হইবে।"

বরুণ পুত্রের মস্তকে হস্তস্পর্শ করিলেন। বলিলেন,—

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—বৎস! তপস্যা কর—জানিতে পারিবে।"

ভৃগু আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিদায় লইল।

(১০)

এই যে অদ্বিতীয় মনোময় ব্রহ্ম, যিনি সকলের আদিতে, যাঁহা হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যাঁহাতে আবার সকল বিশ্রাম লাভ করিবে, তিনি কেমন?

ভৃগু তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল।

এই যে প্রলয়, এই যে বিনাশ, যাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশ্বসংসারে সংঘটিত হইতেছে, এ ত বিনাশ নয়, প্রলয় নয়। প্রলয়েরও আদি, নাই, সৃষ্টিরও আদি নাই, অনন্ত প্রলয়, অনন্ত সৃষ্টি। প্রলয়ই সৃষ্টি। যিনি অনন্ত সৃষ্টির কারণ, তিনিও অনন্ত। যিনি অনন্ত সতের মূল তিনিও সৎ। যিনি অনন্ত চেতনার জনক, তিনিই পরম চিন্ময় পিতা।

ভৃগু বলিয়া উঠিল,—"ইনিই সেই। ইনিই সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম, অনাদিনিধন, সত্যময়, চিন্ময়।"*

(১১)

সৎ, চিৎ, বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম।

সকল বিচিত্রতা লইয়া তিনি এক অখণ্ড সত্য। তিনি এক বিরাজমান চেতনা। এই যে চেতনা, এই যে সৎ এর সার্থকতা কোথায়? কেন তিনি এমন? কোন্‌ প্রয়োজন তাঁ'র এই বিচিত্র সুর বাজাইয়া? এই প্রকাশের সার্থকতা কোথায়?

এখনও জানা হইল না! পিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না! আরও আছে, আরও জানিতে হইবে।

ভৃগু পিতার আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিল।

---

* বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ভৃগুবল্লী, পঞ্চম অনুবাক।

(১২)

আশ্রমে আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিল।

"বৎস! তপোধন!"

"ভগবন্! তাত!"

"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি—ভগবন্! আমায় ব্রহ্মবিজ্ঞান' বিষয়ে উপদেশ করুন। আমি যেন আপনার উপদেশে দীক্ষিত হইয়া সেই অনাদিনিধন জগন্নাথের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারি। আমায় উপদেশ করুন।"

"বৎস! এতদিনে কি জানিলে?"

"জানিলাম, ভগবন্! তিনি সৎচিৎস্বরূপ, বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম। শুধু এ নয়, আরও আছে, আরও জানিতে হইবে!"

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—বৎস! তপস্যা কর, জানিতে পারিবে।"

ভৃগু পিতার চরণধূলি চুম্বন করিল। পিতা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(১৩)

এই যে নিখিল বিশ্ব, তা'তে কত রূপ, কত রস, কত গন্ধ, কত ছন্দ, কত নৃত্য! গ্রহতারা, আকাশ বাতাস, আলো আঁধার তালে তালে নৃত্য করিতেছে! বিশ্বজননী ঐ নীল অঞ্চলখানির ভিতর দিয়া স্তনটি বাহির করিয়া ক্ষীরধারা সমস্ত বিশ্বে বর্ষণ করিতেছেন। চন্দ্রের স্নিগ্ধ চুম্বনে, ধরণীর শ্যামলতায়, সাগরের নীলিমায়—এ চুম্বন, এ সোহাগ কা'র?

ভৃগু তপস্যায় মগ্ন হইল।

গ্রহ তারা, আকাশ মেঘ, সাগর ভূধর, স্থাবর জঙ্গম—প্রত্যেক পরমাণুটি সকলেই এক মহানন্দে নৃত্য করিতেছে,সকলকে লইয়া বিশ্বপতি প্রেমময় স্বামী মাঝখানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছেন। কত আনন্দ! কত অমৃত! কত প্রেম!

ভৃগু আপনা ভুলিয়া সেই নৃত্যে—সেই মহোৎসবে, সেই মহামিলনে যোগ দিল। অন্তরে বাহিরে আনন্দ। ভৃগু বুঝিল, জানিল—সার্থকতা এইখানেই, আনন্দেই সার্থকতা।

ভৃগু আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ইনিই সেই, অন্তরের অন্তরতম, প্রাণের প্রিয়তম, মনের শান্তি, আত্মার কল্যাণ, অচ্ছেদ্য প্রেমডোরে তাঁ'র সাথে আমি বদ্ধ। আমি তাঁহারি, আমি তাঁহারি। আমি জানিয়াছি, চিনিয়াছি—'আনন্দো ব্রহ্মেতি,' আমি ধন্য আজি, আর ধন্য তিনি যিনি আমার মাঝারে নিত্য, আনন্দময়, প্রেমময়।"*

আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া ভৃগু পিতার চরণে লুটিয়া পড়িল।

"ভগবন্! পিতঃ!"

"বৎস! বাপ আমার।"

"আমার তপস্যা পূর্ণ হইয়াছে, আমি পাইয়াছি, আমি সত্যলাভ করিয়াছি।"

বরুণ ছল ছল নয়নে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, মুখ চুম্বন করিলেন, পুত্র পিতার বক্ষের মাঝে বিলীন হইয়া আপনাকে সঁপিয়া দিয়া হারাইয়া ফেলিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাল্মীকি-উপাখ্যান।

কৃত্তিবাস স্বরচিত রামায়ণে এমন অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, যাহা মূল রামায়ণে নাই। ঐ সকল কথা তিনি নিজ কল্পনাবলেই হউক অথবা অন্য কোন স্থান হইতে গ্রহণ করিয়াই হউক ডালপালা রূপে মূল রামায়ণের গুঁড়িটাতে লাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না বলিয়া যে সেগুলি সব সময়েই একেবারে উড়াইয়া দিবার, তাহা নয়। কারণ, দেখা যায়—তাঁহার ঐরূপ কল্পনাগুলি প্রায়ই বে-জাগ না হইয়া বেশ লাগ-সই হইয়াছে। অর্থাৎ রামায়ণের ভিতরকার

---

* আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।
—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ভৃগুবল্লী, ষষ্ঠ অনুবাক।

মর্ম্মগত কথাটি উহাদিগের সহায়ে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং প্রযোক্ত বিষয় উহাদিগের দ্বারা নিষ্প্রভ বা জটিল হইয়া যায় নাই। গঙ্গার উৎপত্তির উপাখ্যানটি যে তাঁহার এইরূপ একটী কল্পনা তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। * আজ আবার তাঁহার কল্পিত আর একটী উপাখ্যান লইয়া আমার যুক্তির সমর্থন করিবার চেষ্টা করিব।

উপাখ্যানটী বাল্মীকির পূর্ব্বজীবন-ঘটিত ও সংক্ষেপে এই। বাল্মীকি পূর্ব্বে চ্যবনপুত্র রত্নাকর ছিলেন ও দস্যুবৃত্তি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। অতএব দীর্ঘ-শুভ্র-জটাজুট, শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত বদন, চন্দন-চর্চ্চিত-ললাট, সাত্ত্বিক জ্যোতিঃপূর্ণ, সৌম্যমূর্ত্তি যে ঋষি প্রবরের চিত্র বাল্মীকি নাম শ্রবণ মাত্রেই মানসপটে উদিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে এখানে কাঁধে বাড়ী, বিকটদর্শন, এক ডাকাতের ছবি মনে আনিতে হইবে। এই মুনিবংশজ দস্যু একদা আর কোন পথিক ঠেঙ্গাইতে না পাইয়া পথিক-বেশী ব্রহ্মা ও নারদের উপর যষ্টি চালাইতে উদ্যত হন। কিন্তু এ বড় শক্ত পাল্লা—হাতের লাঠি হাতেই রহিয়া গেল—পথিকদ্বয়ের পরিবর্ত্তে হতবুদ্ধি দস্যুর কিংকর্ত্তব্যজ্ঞানটাই জখম হইয়া গেল।

মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, মার কেন? তোমার কি ক'রেছি আমরা?" দস্যু উত্তর করিল, "করিবে আবার কি? তোমাদের মারিয়া তোমাদের যা কিছু আছে লুঠিয়া লইব—তোমাদের সঙ্গে আমার এই চিরন্তন সম্বন্ধ তা কি তোমাদের জানা নাই?" ব্রহ্মা বলিলেন—"না বাপু—এখন বল দেখি আমাদের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইবার আবশ্যক কি?" "আবশ্যক? মূর্খ বলে আবশ্যক কি? তোমার ঘরে বুঝি বাপ মা, ছেলে পরিবার কেউ নেই? নেহাৎ লক্ষ্মী- ছাড়া, ত্রিসংসারে কেউ নেই—এ রকম না হ'লে কি আর এমন কথা বলে?"

"ওঃ বুঝেছি—তোমার আত্মীয়বর্গকে প্রতিপালনের জন্যে এইরকম ব্যবস্থা ক'রেচ। সাধু, সাধু—উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। তবে কিনা এই কাযগুলা—এই নরহত্যা, পরদ্রব্যলুণ্ঠন—এইগুলা অতি গর্হিত;

* ১৩১৯ সালের আষাঢ় মাসের উদ্বোধনে "ইতিহাস-বনাম-রূপক" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সাদা কথায় এগুলো মহাপাপ, তা মনে আছে ত?" "থাকল তা হ'ল কি?" "ব'লি এ গুলির শাস্তি সব তোমাকেই ভুগ্‌তে হবে, তা মনে আছে ত'?" "কেন? আমি কেন সব ভুগ্‌তে যাব?" "তবে কে তোমার হ'য়ে ভুগ্‌বে?" "কেন? যাদের জন্যে এত কাণ্ড ক'র্‌চি তারা—এটাও বুঝি ব'লে দিতে হয়—বলিহারি বুদ্ধি বাবা।" "আহা চট কেন বাপু? ব'লি তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হ'য়েচে কি? না হ'য়ে থাকে ত, একবার জিজ্ঞাসা ক'রে এস দেখি।" "মন্দ নয়, আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে যাই, আর তোমরা স'রে পড় আর কি। ভারি চালাক দেখ্‌চি।" "ওহে বাপু এত ভয় কেন?—তোমায় কথা দিলাম স'রে প'ড়ব না—আর যদি মনে ক'র্‌তাম ত' তোমার সামনেই স'রে প'ড়তাম—সে ক্ষমতাও কিছু কিছু রাখি তাত' দেখ্‌লে। এখন যাও সত্বর জিজ্ঞাসা ক'রে এস'—এই আমরা গাছতলায় ব'সলাম, যতক্ষণ না তুমি এস ততক্ষণ উঠবনা"—এই বলিয়া ব্রহ্মা ও নারদ গাছতলায় বসিলেন।

রত্নাকর দেখিলেন—না এরা পালাবার পাত্র নয়। সুতরাং তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যাইলেন—বেশ নিশ্চিন্ত মনেই যাইলেন। তাহার পর কেমন করিয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী—একে একে তাঁহার প্রশ্নের নির্ম্মম অপ্রত্যাশিত জবাব দিলেন ও তাঁহার পাপের ভাগ লইতে একেবারে অস্বীকার করিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রশ্নটা বাড়ী যাইবার সময় রত্নাকরের যতই সহজ ও ছোট ঠেকিয়াছিল, বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় ঠিক ততই জটিল ও প্রকাণ্ড ঠেকিল। "আমার এই দুষ্কৃতের ফল কে নেবে গো—কার জন্য এত নরহত্যা ক'রে ম'লাম গো—আমার কি হবে গো"—এইরূপ একটা অস্ফুট, অব্যক্ত আর্ত্তনাদ তাঁহার প্রাণের মর্ম্মস্থলকে যেন আলোড়িত করিতে লাগিল।

যখন রত্নাকর ব্রহ্মানারদের কাছে অধোমুখে ফিরিলেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। "কেমন বাপু দেখ্‌লে ত'?"—ব্রহ্মার এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র রত্নাকর তাঁহার পা জড়াইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে—

তোমরা সামান্য লোক নও বুঝিয়াছি—এখন আমায় রক্ষা কর। যে অন্তর্দ্দাহের আগুন জ্বালাইয়া দিলে, তাহা নিভাইবার ব্যবস্থা তোমাদেরই করিতে হইবে—নচেৎ ছাড়িব না”—এই বলিয়া তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া করুন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তাহার পর ব্রহ্মা তাঁহাকে কমণ্ডলুর জলে স্নান করাইয়া রামমন্ত্র তাঁহার কাণে দিলেন—অনেক করিয়া তবে নামটা রত্নাকর উচ্চারণ করিতে পারিলেন। “যতদিন না আবার আসি ততদিন তন্ময় হইয়া ঐ মহামন্ত্র জপ কর”—এই বলিয়া পিতাপুত্রে অন্তর্হিত হইলেন।

এইবার রত্নাকর সেই রামনামরূপ মহামন্ত্র জপে বসিলেন। তদ্গতচিত্তে, একান্তমনে, ঘরবাড়ী ছাড়িয়া, সংসার-সুখ ভুলিয়া, প্রাণের সহিত সেই মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। প্রথমে পাপমুক্তিকামনা ও অন্তর্নির্ব্বেদে আশা আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি, সব মনোমধ্য হইতে মুছিয়া গেল, রহিল কেবল মন আর রাম-নাম। তাহার পর মন বুদ্ধি, চেতনা, অন্তর্জগত, বহির্জগৎ, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়, সব লোপ পাইয়া গেল—সেই রাম-নামে। পরে বহুবৎসর বিগত হইলে ব্রহ্মা আবার যখন সেই স্থানে আসিলেন, তখন দেখিলেন কোথায় বা রত্নাকর আর কোথায় বা সেই বৃক্ষ যাহার মূলে তাঁহাকে বসিয়া জপারম্ভ করিতে দেখিয়াছিলেন—সেই স্থানের সবই গিয়াছে—তৎপরিবর্ত্তে হইয়াছে এক বল্মীক-স্তূপ—আর আছে, যাহা যাইবার নয়, সেই রাম-নাম। জলস্থল আকাশ, বায়ু, অণু পরমাণু, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন রাম নামে ভোরপুর হইয়া আছে, কে যেন তাঁহার সৃষ্টির সব তারগুলা আজ রাম নামের সুরে গাঁথিয়া প্রাণস্পর্শী, মধুর রকমের ঝঙ্কার দিতেছে। ক্ষণকাল ধরিয়া ব্রহ্মা আপনা ভুলিয়া সেই রামনামসমুদ্রে নিমজ্জমান রহিলেন। তারপর আত্মস্থ হইয়া বিশেষ অনুসন্ধানে দেখিলেন ঐ রামনাম সেই বল্মীক-স্তূপ হইতেই বহির্গত হইতেছে। তখন ইন্দ্রদেবকে ডাকিয়া কয়েক দিবস ধরিয়া বৃষ্টি করাইয়া স্তূপ হইতে সেই মহামন্ত্রের কেন্দ্রটীকে বাহির করিলেন। দেখিলেন কঙ্কালসার, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে দিব্য-জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। খাদ, মলামাটী সব কাটিয়া গিয়া খাঁটী

কাঁচা সোণার স্বাভাবিক আভাটী বাহির হইয়া পড়িতেছে। আর তাহার অন্তস্তল হইতে সেই রাম-নাম। উহাতে সাধারণ চেতনার নামগন্ধও নাই কারণ চৈতন্য-জ্ঞান সেই মহামন্ত্রে লীন রহিয়াছে কেবল সেই চৈতন্যময় "রাম-রাম-রাম"। "উঠ বৎস" ব্রহ্মা ডাকিলেন ও স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মার স্পর্শে ঐ দেহে আবার চেতনা ফিরিয়া আসিল, এবং রত্নাকর উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইয়া বলিলেন—"প্রভো কি মন্ত্রই দিয়াছিলেন—এই মন্ত্রবলে কি ছিলাম, দেখুন কি হ'য়েছি।" এই বলিয়া গলদশ্রুলোচনে আবার সেই অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

"বৎস, সার্থক তোমাকে রাম-মন্ত্র দিয়াছিলাম—তোমা হইতেই ত্রিভুবনে রাম নাম প্রচার হইবে ও তুমিই শ্রীরামলীলা বর্ণনের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। নারদ তোমাকে সেই লীলার আভাস দিবেন"। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

তাহার পর ক্রৌঞ্চমিথুনের ব্যাপার। এখানটী মূল রামায়ণের সহিত মিলে। নির্দ্দয় ব্যাধ কর্ত্তৃক আকস্মিক ক্রৌঞ্চমিথুন হনন দেখিয়া ঋষিবরের হৃদয় ব্যধবান-বিদ্ধ পক্ষিযুগলেরই ন্যায় ক্ষত বিক্ষত ও বেদনা-ক্লিষ্ট হইল। সেই বেদনার তীব্র ঝঙ্কারে হৃদয়তন্ত্রীর অন্তর্নিহিত দুই একটা তার কোন এক অজ্ঞাত অথচ অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ফলে অজ্ঞাতসারে অনুষ্টুপ ছন্দোবদ্ধ বিখ্যাত "মা নিষাদ" নামক শ্লোক তাঁহার মুখ হইতে বিবচিত হইল। এমন সময়ে নারদ ঋষি আসিয়া ঐ ছন্দেই পবিত্র রামায়ণ গ্রথিত করিতে উপদেশ দিলেন ও রামায়ণের আভাষ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তাহার পর নারদের উপদেশানুযায়ী রামায়ণ প্রণয়ন। এইখানে আবার কৃত্তিবাসের কল্পনা খেলিল। নারদ বলিয়া গেলেন যে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইবার এখনও ষাট হাজার বৎসর বিলম্ব আছে, তবে তুমি এখন হইতে তোমার চরিতাখ্যানে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে, তিনি আসিয়া তাহাই করিবেন। "রাম না হইতে রামায়ণে"র যে প্রবাদ আছে, তাহার মূল এই।

এখন কবির এই কল্পনাগুলি কেবলমাত্র অসার, অলীক একটা খেয়াল বা ইহার কোন মূল্য আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। এই কল্পনার মর্ম্মগত কথাটা কি বা কোন্ অন্তর্নিহিত তত্বটি ইহা ফুটাইয়া তুলিয়াছে?

প্রথমতঃ দস্যু রত্নাকরের ঋষি-বাল্মীকিতে পরিণত হইবার কথা। ইহার ভিতর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অতি গূঢ়তম দুই একটী তত্ব নিহিত আছে দেখিতে পাই। সেটী নাম-মাহাত্ম্য বা সমাধিতত্ব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বলিতেন,—"সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কতদিন? যতদিন না ঈশ্বর নামে অশ্রু আব পুলক হয়। একবার ওঁ রাম বলিতে যদি চক্ষে জল আসে, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো যে, তোমাব কর্ম্ম শেষ হ'য়েছে আব সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌তে হবে না।" আবার—"সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়।" সদ্‌গুরুর কৃপায়, আন্তরিক অনুতাপে ও পূর্ব্বসুকৃতিবলে বাল্মীকি যে কেবলমাত্র নর-হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এমন নয়, পরন্তু যে অবস্থায় একেবারে কর্ম্ম, সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতি নামমন্ত্রে লয় হয় ও সমাধি হয়, সাধকের অভীপ্সিত সেই চরম অবস্থায় নীত হইলেন। ব্রহ্মা রামনামের অমৃত ছিটাইয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তাহার মধ্যে রত্নাকর-বীজ উপ্ত হইয়া সেই অপূর্ব্ব ক্ষেত্রের রস ও সার টানিয়া টানিয়া রামায়ণ-সুধা-নিস্যন্দী বাল্মীকি-মহীরুহ-রূপে গজাইয়া উঠিল।

রামনাম দুটী অক্ষরযুক্ত একটী কথা মাত্র নয়, ইহার মধ্যে যাবতীয় যাগ-যজ্ঞ সন্ধ্যা-গায়ত্রী প্রভৃতি সাধনা অন্তর্নিহিত। ইহাতে অসীম আধ্যাত্মিক শক্তিপুঞ্জ সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত। নামের সহায়ে কেন্দ্রীভূত ঐ শক্তি যাঁহার মন গ্রহণে সমর্থ হয় তাঁহাতে মানব-অন্তরে নিহিত জ্ঞাতাজ্ঞাত সমগ্র শক্তির সম্প্রসারণ ও কেন্দ্রীকরণের ক্ষমতা বিকশিত হয়, তিনিই আধ্যাত্মিক জগতে সিদ্ধ পুরুষ। রত্নাকরের ন্যায় এমনই করিয়া যাঁহারা নিজেকে ও নিজের কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি—সর্ব্বস্বকে এক মহামন্ত্র মধ্যে নিহিত দেখিতে সমর্থ হন, তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়া এমনই এক অমৃত-নিস্যন্দী মহা মহীরুহরূপে জগতের কল্যাণার্থ

সমুদিত হইয়া থাকেন। এই কথায় ভক্ত কৃত্তিবাস অনেক ভক্ত সাধকের সিদ্ধিলাভের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের আভাস দিয়া গিয়াছেন। সমগ্র পঞ্চ-বিংশতি-তত্ত্ব সমন্বিত বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎটাকে একেবারে গুটাইয়া, সংহৃত করিয়া, এক নামমন্ত্র মধ্যে নিহিত করা,—এই অপূর্ব্ব উচ্চতম তত্ত্ব হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না। নানাভাবে সম্প্রসারিত আত্মশক্তিকে নামশক্তিপ্রভাবে সংহৃত করিয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ, বা চরম ঘনীকরণটাই হইল মন্ত্রজপের সার কথা। এই সার কথাটী কৃত্তিবাস বাল্মীকি-উপাখ্যানে যেরূপ সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, শত সহস্র দার্শনিক ব্যাখ্যাদ্বারা সেইরূপ হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

কথিত আছে প্রথমেই রত্নাকরের মুখে রাম নাম বাহির হয় নাই। "মরা-মরা" বলিতে বলিতে তবে রাম নাম বাহির হইয়াছিল। কিন্তু আসল জিনিষটা যখন পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মশক্তির কেন্দ্রীকরণ দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মসংহরণ বা আত্মলোপকরণ তখন প্রথম উচ্চারণটা যেমন করিয়াই হউক না কেন তাহাতে বড আসিয়া যায় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আর একটী সুন্দর কথা এইখানে মনে আসে। "মিছ্‌রীর রুটী সিদে ক'রেই খাও আর আড় ক'রেই খাও, মিষ্টি লাগ্‌বেই লাগ্‌বে।" তেমনি এস্থলেও বলা যাইতে পারে রামনাম "মরা-মরা" বলিতে বলিতেই জপ কর আর "রাম-রাম" বলিতে বলিতেই জপ কর, ফল হইবেই হইবে,—ইহার মিষ্টতাতে আত্মাটা ভোরপুর হইয়া যাইবেই যাইবে।

তাহার পর ক্রৌঞ্চমিথুন বধের কথা। গভীর বেদনাই রামায়ণ-প্রণয়নের অব্যবহিত পূর্ব্ব কারণ। এক বেদনায়—নিজকৃত নর-হত্যাদি নিমিত্ত অন্তর্বেদনায়—বাল্মীকির নিজের রামামৃতপানে আসক্তি জন্মিয়া সিদ্ধিলাভ ও অমরত্বলাভ; অপর বেদনায়—নির্দ্দোষী জীবের উপর আকস্মিক অত্যাচার দর্শনের বেদনায়—জগৎকে সেই রামামৃত পান করাইবার নিমিত্ত তাঁহার চিরন্তন ব্যবস্থা। অনেক সময়ে দেখা যায় আশপাশের শত সহস্র হস্ত খুঁড়িয়াও জল পাওয়া যায় না। কিন্তু ঠিক জায়গাটাতে ঘা পড়িলে, হয় ত একখানা মাত্র পাথর সরাইলেই, রুদ্ধ

উৎসের মুখ খুলিয়া গিয়া সুশীতল প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। এইরূপ এক এক অমৃতের উৎস পাথরচাপা বুক লইয়া সেই এক ঘায়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া ধরিত্রীর মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিতে থাকে এবং অবসর উপস্থিত হইলে যাই সেই "ঘা"টী পায় অমনি জগতের সরসতা সম্পাদন ও পিপাসা নিবারণের একটা পাকা ব্যবস্থা হইয়া যায়। কারণ, দেখা গিয়াছে কোন কোন মহাপুরুষের মর্ম্মস্থলে ঐরূপ একটা বেদনার আঘাতে সংসারী জীব বহুবার মৃত্যুপথ হইতে অমৃতের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। বুদ্ধদেবের নগর ভ্রমণ করিতে যাইয়া জীবের দুর্দ্দশা দর্শনরূপ ঘটনা—ঐরূপে আঘাত খাইয়া অমৃতোৎস খুলিয়া যাইবার আর এক দৃষ্টান্তস্থল। তাহার ফলেও সংসারের জীব সে সময়ে অমৃত পাইয়াছিল।

তাহার পর রাম না হইতে রামায়ণের কথা—ষাটহাজারবর্ষ পূর্ব্বে গাছতলায় বসিয়া এক বৃদ্ধ তপস্বী যাহা লিখিয়া গেলেন, স্বয়ং ভগবান্ তাহারই ফলে অবতীর্ণ হইলেন ও ঠিক তদুক্ত লীলাগুলিই করিয়া গেলেন। এটা রামায়ণ প্রণেতা ঋষির পক্ষে যেমন শ্লাঘা ও গৌরবের কথা ভগবান্ রামচন্দ্রের পক্ষেও তেমনি বিনয়ের পরাকাষ্ঠার কথা। অবশ্য সাধারণভাবে ধরিতে গেলে ঐ কথা অসম্ভব বটে তাহাতে সন্দেহ নাই। হউক অসম্ভব, কিন্তু ইহার ভিতর যে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক শিক্ষাটী নিহিত আছে সেটীকে আমরা ছাড়িব কেন? যদি সত্য সত্যই কেহ এমন আদর্শ সাধক হন যে এক নামের মধ্যেই সমস্ত বহির্জ্জগৎটাকে একেবারে লোপ করিতে পারেন, এবং স্বয়ং বল্মীকময় হইয়া সমস্ত সৃষ্টিটাকে সেই অমৃতময় রামনামে অনুস্যূত করিতে পারেন, তবে তাঁহার কথা ভগবান না শুনিবেন কেন? আদর্শ ভক্ত, নিজ ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে, চতুর্ভুজ দিয়া,—শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম বা ধনুর্ব্বাণ দিয়া,—মাথায় কিরীট, গলে বনমালা, হৃদয়ে কৌস্তুভমণি দিয়া,—নবজলধরকান্তি দিয়া—ও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত শ্রীচরণাদি দিয়া ভগবানকে ত অহরহ নানা বিগ্রহ ধারণ করাইতেছেন। ভগবান্ ভক্ত কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যদি ঐরূপ হইতে পারেন, তবে ঐরূপ ভক্তের কথানুযায়ী নিজ লীলা

প্রকট করিতে পারেন না কি? যিনি রামনাম সাধনা দ্বারা ঐরূপ অপূর্ব্বভাবের নিজ অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির চরম বিকাশ করিতে পারিয়াছেন এবং জীবের বেদনায় নিজ ক্ষতহৃদয়ের শোণিতধারা দ্বারা সেই শক্তিটিকে আরও পুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তিনি কি সেই শক্তির বলে ভগবান্‌কে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন না?

ষাট হাজার বর্ষ পূর্ব্বেই হউক বা ষাট দিন পূর্ব্বেই হউক আসল কথাটা হইল ঐ শক্তির বিকাশ এবং টানের জোর কতখানি। প্রসিদ্ধ আছে—জগন্নাথ দেবের রথ সাধারণ লোক হাজার হাজার একত্র হইলেও এক হাত টানিয়া আনিতে পারে না। আবার যথার্থ ভক্ত একাই স্পর্শমাত্র সহস্র সহস্র হাত টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন। ঐরূপ বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন কোন ভক্ত যদি আসিয়া ভগবান্‌কে টান দেন ত তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়া আসিতেই হইবে ও যেদিকে তিনি টানিবেন সেই দিকে যাইতেই হইবে। ঐরূপ প্রবল টানের চোটে ভগবান্‌কে বহুবার নরসিংহাদিরূপে স্ফটিক স্তম্ভাদির মধ্যে আবির্ভূত হইতে হইয়াছিল। কারণ ঐরূপ ভক্তের টান বড় টান।

ভগবান্ যে যুগে যুগে নানারূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন সে এই আধ্যাত্মিক টানের বলে। যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উত্থানে শত শত ভক্তের হৃদয় হইতে আকুল আহ্বান উঠিতে থাকে—"কোথা হে ধর্ম্মের উদ্ধর্ত্তা! অধর্ম্মনাশন! সাধু পরিত্রাতা! দুষ্কৃতবিনষ্টা! এক বার নামিয়া আইস,"—তখনই সেই সমষ্টীকৃত টানের জোরে, সেই মহা মন্থনের চোটে, ভগবানের অনন্ত বিশ্বরূপ সান্ত, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে জমাট বাঁধিয়া চিৎসমুদ্র হইতে উত্থিত হয়। বাল্মীকি সেই শত সহস্র আকুল আহ্বানকারী ভক্তবৃন্দের প্রতিনিধি স্বরূপ, একাতেই এক সহস্র। তাঁহার মহনুদার হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রসূত আহ্বানের আকর্ষণ—শত সহস্র আর্ত্তের কেন্দ্রীভূত আর্ত্তনাদের আকর্ষণাপেক্ষা সমধিক প্রবল। রাম নামের মধ্যে তিনি আপনার সর্ব্বস্ব লীন বা লোপ করিয়াছিলেন,

এবং নৃশংস ব্যাধের দুর্ব্বল জীবের উপর অত্যাচারে তাঁহার হৃদয়ের মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ আর্ত্তনাদ ছুটিয়াছিল। সেই আর্ত্তনাদ ছন্দোভূত হইয়া অন্তঃসলিলরূপে রামায়ণের ছত্রে ছত্রে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এ হেন ভক্তের ডাকে, এ হেন আর্ত্তনাদের টানে সেই অত্যাচারীর শাসনকারী, আর্ত্তের সহায়, ভগবান্ রামচন্দ্র যে নামিয়া আসিবেন বা তাঁহার কথা শুনিবেন ইহাতে বিচিত্র কি ?

জ্ঞানমার্গের সাধক বলিবেন সিদ্ধ হইবার পর বাল্মীকি পরম জ্ঞানী ও ত্রিকালদর্শী হইয়া দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভগবানের অবতীর্ণ হইয়া ঐরূপ লীলা প্রকটনের কথা সেই অভ্রান্ত দৃষ্টির বলে দেখিতে পাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের পরম ভক্ত কৃত্তিবাস বোধ হয় ভক্তির দিক হইতেই এই উপাখ্যানটীর অবতারণা করেন, আর ঐ হিসাবে এটী যেমন সুন্দর তেমনই উচ্চভাবে পূর্ণ।

শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজা।

হৃদয়ের সরস ভাব হইলেই প্রকৃত পূজা সম্ভব। কিন্তু হৃদয় ত সরস হয় না—উহা সদাই মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতেছে—কদাচ কখন ওয়েসিসের মত উহাতে সরসভাব দেখা দেয়। তাই পূজাপদ্ধতির সৃষ্টি—তাই অনুষ্ঠানের বাহুল্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে। যাঁহারা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চীৎকার করেন, তাঁহারা হয় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসাধনের বিরোধী, নয় নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতির পক্ষপাতী। আর এক অবস্থায় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চীৎকার দেখা যায়। যখন মানুষ বারবার অনুষ্ঠান করিয়াও হৃদয়ের সরস ভাব জাগাইতে পারিতেছে না—এমন হয়, তখন তাহার প্রাণ ক্ষণকালের জন্য যেন সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠে—তখন সে খানিকক্ষণের জন্য সব অনুষ্ঠান ছাড়িয়া উহার মূল ভাবটী ধরিবার জন্য ছটফট করিতে থাকে—কিন্তু যখন সে কিয়ৎ-পরিমাণে হৃদয়ে ভাবোদ্দীপনে কৃতকার্য্য হয়, তখন আবার তাহার সেই

হৃদয়গত ভাব পুরাতন বা নূতন কোন অনুষ্ঠান-বিশেষেরই আশ্রয়ে আত্ম-প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই সর্ব্বভাবাতীত সমাধি অবস্থা লাভ না করিতে পারিলে, সর্ব্বানুষ্ঠানের অতীত হওয়া যাইতে পারে না।

আবার একজনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, অপরের পক্ষে তাহা কৃত্রিম। একজনের ভিতরে যে ভাবের প্রকাশ হইল, যদি অপর দশজনে তাহা স্বায়ত্ত করিতে যায়, তবে তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় উহা যে অল্প বিস্তর কৃত্রিমভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকেই 'ভাব আরোপ করা' বলে। এই ভাবের আয়ত্তীকরণ আবার দ্বিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে। উক্ত ভাবসম্পন্ন পুরুষের বাহ্য কার্য্যকলাপ আচার ব্যবহারাদির অনুকরণ চেষ্টা, অথবা চিন্তা দ্বারা ভিতরের ভাব ধারণার চেষ্টা। ইহাতে সদাই বিপদাশঙ্কা এই যে, এই জগতে—এই মায়ার রাজ্যে—তমোগুণ বা নিশ্চেষ্টতার এতই প্রাবল্য যে, যতই উচ্চভাব হউক না কেন, উহার চিরকালই নিরর্থক বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উহা নিবারণ করিবার একমাত্র উপায়—নিজ ধর্ম্মজীবনকে সতেজ ও সরস রাখিবার অবিরাম চেষ্টা—সদাই মনে রাখিবার চেষ্টা—আমরা জড়যন্ত্রমাত্র নহি—আমরা চিন্তাশীল মানুষ। তাই বলি, শুধু অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলেও হয় না, আবার কেবল নিয়মিতভাবে জড়যন্ত্রের মত অনুষ্ঠান করিয়া গেলেও হয় না—চাই জীবন—চাই ভাব—চাই আমৃত্যু অহরহ কঠোর চেষ্টা।

যাহা হউক, আমরা আজ এই শারদীয়া পূজার দিনে পূজার তত্ত্ব একটু আধটু আলোচনা করিতে চাই। আমাদের বাঙ্গলা দেশে যে পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত, তাহাতে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক—তিন ভাবেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটস্থাপনাদির মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ বৈদিক—অন্যান্য স্থলেও নানা বৈদিক মন্ত্র সংগৃহীত হইয়া পদ্ধতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। পূজার প্রণালীটী সম্পূর্ণ তান্ত্রিক—পূজা করিতে গেলেই কয়েকটী বিশিষ্ট ক্রিয়া করিতে হয়, সংক্ষিপ্ত পূজায় এই ক্রিয়াবিশেষের সংখ্যার অল্পতা ও বিস্তারিত পূজায় আধিক্য—এইমাত্র। অদ্বৈতবাদ

এই তান্ত্রিক পূজা-প্রণালীর দার্শনিক ভিত্তি। আবাহন করিতে হয় হৃদয় হইতে, বিসর্জ্জন করিতে হয় হৃদয়ে। প্রথমে মানস পূজা, তার পর বাহ্য পূজা। আবার ভূতশুদ্ধি নামক ক্রিয়ার ত মূল তাৎপর্য্যই অদ্বৈত ভাবনা—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব মূল শক্তিসহ নিজ কারণ পরমাত্মায় বিলীন হইল—ইহাই ঐ স্থলে মূল ভাবনার কথা। সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূল কথা—শুদ্ধি। এই শুদ্ধিকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—মন্ত্রশুদ্ধি, দেবতাশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি। প্রত্যেক ক্রিয়ার খুঁটিনাটি তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিলেও এটুকু বেশ বোধ হয় যে, সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূলই ভাবনা—সুতরাং সেগুলিকে এক প্রকার যোগেরই বিভিন্ন অঙ্গ বলা যাইতে পারে। এই ভাবনার প্রধান সহায়ক মন্ত্র—অন্যান্য স্থূল দ্রব্যাদি আনুষঙ্গিক। পূজাপদ্ধতির মধ্যে যে পৌরাণিক উপাদানের কথা বলিয়াছি, উহা ভক্তিরসাত্মক। এই অংশের মধ্যেই আগমনী, বিজয়াদির উদ্ভব—এই অংশেই ভক্ত দেবীকে সম্বোধিয়া বলে,—'সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ'। ভক্ত চিরকালই ভগবান্‌কে পিতা মাতা পুত্র কন্যা স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি সাংসারিক সম্বন্ধের কোন একটীতে বাঁধিতে চায়—সে তত্ত্বের ধার ধারিতে বড চাহে না—হৃদয়—হৃদয়কেই সে বড় করিয়া দেখে। সংসারে সে যে সকল সম্বন্ধে পরম সুখ বোধ করে, ঈশ্বর বাস্তবিক আমাদের সহিত সেই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ—ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই ভক্ত শারদীয়া পূজার আগমনের সূচনায়ই মায়ের আগমনী গাহিতে ও শুনিতে বড়ই ভালবাসে। সে সেই জগজ্জননীকে কখন মাতৃভাবে, আবার কখন কন্যাভাবে ভাবিয়া সুখ পায় আর যদি কেহ রামপ্রসাদ বা শৈলেশ্বরের মত অকপট ভক্ত হয়, তবে সত্য সত্যই মা আসিয়া তাহার বেড়া বাঁধিয়া দেন বা বলেন,—

'বাপ নন্দীরে গিরিমন্দিরে যেতে আমার আর নাই বাসনা।
আর এক পিতামাতা আছে কাঁদিবে তারা দুজনা।
তারা তারা ব লে তারা, হ'য়ে আছে দিশেহারা।
এখন যদি যায় না তারা, তারা-নাম আর কেউ লবে না।'

তাই বলি, হে ভক্তসাধক, আর কিছু না পার, তাঁহাকে একবার এই

শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার চেষ্টা কর। বল—মা, আমি শাস্ত্র জানিনে, জপ, তপ জানিনে, ভজন পূজন জানিনে—আমি পুণ্য পাপ চাইনে; শুচি অশুচি চাইনে, জ্ঞান অজ্ঞান চাইনে—দে মা, তোর চরণে শুদ্ধা ভক্তি। কোথায় পাব মা প্রতিমা, কোথায় পাব উপকরণ দ্রব্য-বাহুল্য, তুই মা নিজগুণে হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হ'য়ে হৃদয়ান্ধকার দূর ক'রে দে।

যাহা হউক, পূজার কথা বলিতেছিলাম। শাস্ত্রে বলে,—

'অর্চ্চকস্য তপোযোগাৎ দ্রব্যস্য চাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি' ॥

বৈধী পূজায় তিনটী ব্যাপারের একান্ত আবশ্যকতা। অর্চ্চক—যিনি পূজা করিবেন—তাঁহার তপস্বী হওয়া প্রয়োজন। যিনি নিজ ইন্দ্রিয়মনাদি সংযত করিতে না পারিয়াছেন—তিনি হৃদয়-দেবতাকে জাগাইবেন কি করিয়া—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।' যাঁহার ভাবনায় অভ্যাস হয় নাই, তিনি শুধু উপর উপর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জানিলে বা মন্ত্র মুখস্থ করিলে বা উহার অর্থ বুঝিলেই, যথার্থ পূজকপদবাচ্য হইতে পারেন না। এই পূজকবৃত্তি যেন ব্যবসাদারি হইয়া না দাঁড়ায়—যতই ব্যবসাদারি দাঁড়াইবে, ততই আর মূলভাবের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না। বুঝিতে হইবে, পূজায় সকলের অধিকার। শুধু ব্রাহ্মণ নহেন, স্ত্রী শূদ্র সকলেরই অধিকার—যদি তাহার তপোযোগ থাকে। তপস্যা চাই, মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ চাই—তবেই সে পূজার যথার্থ অধিকারী। পৌরোহিত্যব্যবসায়িগণ যদি নিভৃতে বসিয়া, পূজাকালীন নিজের কি গুরুতর দায়িত্ব, একবার ভাবিয়া দেখেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা উহাতে অধিকারী হইবার জন্য আরও সচেষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। যথার্থ অর্চ্চকই প্রতিমার যথার্থ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন—নতুবা কতকগুলি মন্ত্র আওড়ানই সার হয়।

তার পর প্রতিমাখানি সুদৃশ্য হওয়া চাই। প্রতিমাখানি এমন হওয়া চাই, যেন দেখিলেই সেই জগজ্জননীর স্মৃতি আপনিই স্মরণপথে উদিত হয়। সুতরাং যে সে কুম্ভকার-নির্ম্মিত হইলেই প্রতিমা হয় না।

প্রতিমা-নির্ম্মাতা যদি সাধক হয়, তবেই প্রতিমাখানি যথার্থ পূজার উপযোগী হইবে। এখনও এমন এক একজন সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি স্বয়ং প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। প্রতিমা সাধক-হৃদয়ের ভাবময়ী প্রতিমারই বহিঃপ্রকাশমাত্র। সুতরাং সাধক ব্যতীত ঠিক ঠিক ভাবপ্রকাশক প্রতিমা কে গঠন করিতে পারে? অবশ্য ইহাতে সাধকের কুম্ভকারবৎ শক্তি থাকারও প্রয়োজন এবং সর্ব্বস্থলে সকল সাধকের তাহা থাকা সম্ভব নহে, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিমা গঠনে সমর্থ না হইলেও অন্ততঃ তাহার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন ও তাহাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করিতে পারেন। নতুবা ফাঁকি দিয়া সব কায সারিতে গেলে,আসল কাযের সময় নিজেকেও ফাঁকে পড়িতে হয়।

তৃতীয়তঃ, দ্রব্যবাহুল্য। অবশ্য এই সকল বাহ্য পূজা প্রধানতঃ রাজসিক গৃহস্থ ব্যক্তিরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া এই দ্রব্যবাহুল্যের কথা বলা হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি পূজার আয়োজনে কখনও যেন বিত্তশাঠ্য না করেন। দেবনিবেদিত দ্রব্যে সর্ব্বসাধারণের—বিশেষতঃ যথার্থ অভাব-গ্রস্ত সকলেরই অধিকার, সুতরাং দ্রব্যবাহুল্যে যে অধিকসংখ্যক দরিদ্র-রূপী নারায়ণের তৃপ্তি, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে আজকালকার মত পুরোহিত ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে বণ্টনের জন্য দ্রব্যবাহুল্যে বিশেষ কোন ফল দেখা যায় না। ইহার আর একটা দিক্ আছে;—দ্রব্যবাহুল্যের সহিত একটা মহান্ ভাবের—প্রকাণ্ড ভাবের যোগ আছে—বিশেষতঃ, যদি ঐ দ্রব্যাদি সজ্জায় কিঞ্চিৎ শিল্পের পরিচয় থাকে। এইরূপ শিল্প যে ভক্তিভাববৃদ্ধির সহায়ক, তাহা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে পূজায় বলিদান সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। সমগ্র শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মানুশীলনে বুঝা যায়,—এই বলিদান বা জীবহিংসা পূজার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নহে। 'কামক্রোধৌ বলিং দদ্যাৎ'—ইহাই যথার্থ সাত্ত্বিক বলি। তবে একথাও বলা আবশ্যক, যাঁহারা অন্য সময়ে মাংসাদি ভোজনে অবিরত, অথবা অন্য প্রকারে সদা

হিংসাপরায়ণ, তাঁহাদের 'দেবোদ্দেশ্যে' বলিদানের বিরুদ্ধাচরণ হাস্যজনক ব্যাপার। একবার জনৈক মুসলমানকে এইরূপ বলিদানের বিরুদ্ধে বলিতে শুনিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারি নাই।

পূর্ব্বে দরিদ্র নারায়ণ পূজার কথার সামান্য উল্লেখ করিয়াছি। ইহাই বর্ত্তমানকালের উপযোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা। ভগবান্ কপিল তদীয় মাতা দেবহূতিকে উপদেশ দিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি অপর প্রাণীতে দ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার পূজা ভস্মে ঘি ঢালার মত—তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। তুমি জীবন্ত নরনারীকে ভগবানের প্রতিমা বলিয়া ভাবিয়া তাহাদের সেবা করিতে পার না, তুমি আবার মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীকে আবাহন করিবে কিরূপে? ভালবাসাই পূজাব মূল—সেবাই সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি। শুধু 'কাঙ্গালী বিদায়' বা 'কাঙ্গালী ভোজন' নহে, প্রকৃত 'দরিদ্র-নারায়ণ'-সেবা। এখানেও ভাবই মুখ্য—বাহিরের অনুষ্ঠান যেরূপই হউক, কিছু আসিয়া যায় না, অথবা সংখ্যাতেও কিছু আসে যায় না—মূল কথা হইতেছে ভাব—সেই ভাবটী হৃদয়ে আনয়নের চেষ্টাই আসল কথা। নতুবা লক্ষ কাঙ্গালী বিদায় করিয়া বা স্তূপাকার চন্দন, বিল্বদল, ফলমূল নৈবেদ্য ভোগরাগাদি দিয়াও তোমার পূজা সিদ্ধ হইবে না। অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য—বেদান্ত বলেন,—ক্রিয়া দুই প্রকারে হইতে পারে—অজ্ঞানপূর্ব্বক ও জ্ঞানপূর্ব্বক। অজ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানেও ফল হয়—তবে জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠানে উহা পরিবর্ত্তিত হয়। তাই বলি ভাই, এস, আমরা প্রথম এই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্ হই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এতাবৎকাল যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা একেবারে বৃথা নহে; আমরা তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথানুসরণ করি, কিন্তু আরও উত্তমরূপে, আরও শ্রদ্ধার সহিত, আরও অনুরাগের সহিত যেন আমরা পূজাদির অনুষ্ঠানে অগ্রসর হই; আর প্রতি মুহূর্ত্তে যেন পূজার চরম উদ্দেশ্য আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে যে, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে সমগ্র বিশ্বের সহিত আপনাকে এক করিয়া ফেলিতে হইবে সমগ্র বিশ্বের সহিত, বিশ্বেশ্বরের সহিত, তাদাত্ম্য লাভ করিতে হইবে।

দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন আমরা যে পরস্পরকে, এমন কি, শত্রুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া থাকি, উহা যেন কেবল বাহিরের একটা লৌকিক ব্যাপারেই শেষ না হয়, উহা যেন হৃদয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি জনিত প্রেমসম্ভূত হয়। যেন হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে পারে—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

যেন দেবীকে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎকার করিয়া বলিতে পারে,—সর্ব্বস্বরূপে! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে! যেন বৈদিক ঋষির স্বরে স্বর মিশাইয়া গাহিতে পারে,—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধী মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

যেন সর্ব্বশেষ শান্তিজল গ্রহণের সময় হৃদয়ে যথার্থই শান্তির আবির্ভাব হয়।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১২ই আশ্বিন পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যাপীড়িতগণের সাহায্য-কার্য্যের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইল। আশ্বিনের উদ্বোধনে এ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। কাঁথি সবডিভিজনে গোপীনাথপুর ও মহম্মদপুর নামক স্থানে এখনও সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আপাততঃ ৩টী সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; যথা,—ভগবানপুর, ইক্ষুপত্রিকা ও বড়বড়িয়া। এই তিনটী কেন্দ্র হইতে

সাপ্তাহিক বিতরণের যে শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা গেল, ৪৮টী গ্রামে ৯১৭ জনকে ৪৫৴০ মণের উপর চাল সাহায্য করা হইয়াছে। গ্রামপরিদর্শন শেষ হইলে, প্রত্যেক কেন্দ্রের গ্রাম-সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এবং নূতন নূতন কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে। তমলুক সবডিভিজনের অন্তর্গত নারাণদাঁড়ি কেন্দ্রের শেষ সাপ্তাহিক বিতরণে ৩১টী গ্রামে প্রায় ৮০০ জনকে প্রায় ৬৬৴০ মণ চাল দেওয়া হইয়াছে। আর উহা হইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তী নবপ্রতিষ্ঠিত চণ্ডীপুর কেন্দ্র হইতে ২৭খানি গ্রামে ৫৯৪ জনকে ২২৴০ মণ চাল সাহায্য করা হইয়াছে। যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই ঐ সকল স্থানে ঘোর দুর্ভিক্ষ হইবে। সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে এবং সাহায্য কার্য্যও প্রায় বৎসরাবধি চালাইতে হইবে।

বাঁকুড়া হোদলনারায়ণপুর কেন্দ্রের সাপ্তাহিক বিতরণে ২৫ খানি গ্রামের ৪৮৫ জনকে ২৫৴০ মণ চাল সাহায্য করা হইতেছে এবং গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য কিছু কিছু দেওয়া হইতেছে। এদিকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল—সম্ভবতঃ একমাস সাহায্য করিলেই চলিবে।

খানাকুল—কুড়কুড়ি কেন্দ্রের কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে। ঐ স্থানের কার্য্যের জন্য বেঙ্গলি অফিস হইতে প্রাপ্ত ৩০০্ টাকা খানাকুল স্থানীয় সাহায্য-সমিতির হস্তে প্রদান করা হইয়াছে।

এবার ১লা হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে টাকা ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইল। এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যের জন্য মিশনের হস্তে প্রায় ১৭০০০্ টাকার উপর আসিয়াছে। কিন্তু কার্য্য ক্রমে বাড়িয়া যাইবে এবং বহুদিন ধরিয়া সাহায্য করিতে হইবে—সুতরাং সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র সাহায্য পাঠাইয়া মিশনকে যথাযোগ্যভাবে সেবাকার্য্যে সমর্থ করুন। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

১। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া)

বা

২। কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার, কলিকাতা।

বাঁকুড়ায় কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে একটী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দামোদরের ভীষণ বন্যায় বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী থানার অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়ায় উক্ত সেবাশ্রমের সম্পাদক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উঁহার কয়েকজন সেবক বিগত ১২ই ভাদ্র হইতে হোদলনারায়ণপুর নামক স্থানে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় বন্যামোচন সমিতি ও অন্যান্য সমাজ ও স্থানীয় ভদ্র মহাশয়গণের সাহায্যে এ সকল গ্রামে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৩৷৶৫ টাকা, ৫৪॥৹ মণ চাল, ১৩৴৹ মণ ডাল, ২৴ লবণ, এবং ২০৫ খানি নূতন ও পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করেন। প্রথমবারে ১২ই হইতে ২১শে ভাদ্র পর্য্যন্ত ৩০ খানি গ্রামে ৫৩৮টী পরিবারে ১৯৩৪ জন লোককে ৩৮৷২৸৹ চাল, এবং কিছু কিছু ডাল ও লবণ বিতরিত হয়। অবস্থানুসারে একদিন হইতে ছয় দিনের উপযোগী চাল দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার ২২শে হইতে ৩১শে ভাদ্র পর্য্যন্ত ১৬ খানি গ্রামে ৮৫টী পরিবারে ২২১ জন লোককে ২৪।১ চাল ও পূর্ব্বের ন্যায় ডাল লবণ দেওয়া হয়। বিশেষ অভাবগ্রস্ত লোককে বস্ত্র সাহায্যও করা হইয়াছিল। বিগত ১লা আশ্বিন হইতে রামকৃষ্ণ মিশন ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত কনখল রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমের দ্বাদশ বার্ষিক রিপোর্টের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের কতিপয় শিষ্যকর্ত্তৃক ইহা সামান্যভাবে স্থাপিত হয়। বিধাতার ইচ্ছায় এবং স্বদেশবাসীর আনুকূল্যে সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুর আজ বৃহৎ মহীরুহে পরিণত। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পীড়িত নারায়ণগণের সর্ব্ববিধ সেবা—ইহাই সেবাশ্রমের নিষ্কাম ব্রত। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩৪৪ জন নরনারী সেবাশ্রমের সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১৬ জন আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছেন। রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতের সর্ব্বস্থান হইতেই, এমন কি, সুদূর মান্দ্রাজ ও কাবুল হইতেও, লোক আসিয়া

এখান হইতে ঔষধপথ্যাদির সাহায্য পাইয়াছে। এই বৎসর আশ্রম চাঁদা হিসাবে ৫৬৪৲ টাকা এবং এককালীন দান হিসাবে ২৭২ ৶০ টাকা পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৪৭০৲ টাকা মূল্যের ঔষধাদি, ৩৫৬৲ টাকার পথ্যাদি, ৪৪৭৸৶১৫ টাকা অন্যান্য-দ্রব্যাদি বাবদে, এবং ২৪৭৷০ উৎসব উপলক্ষে পাইয়াছেন। এই বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩৪৯৷৶৫ টাকা সাধারণ খরচ হইয়াছে এবং উৎসবে ২০৫৴০ ব্যয়িত হইয়াছে। থাইসিস্ ওয়ার্ডের কাজ চলিতেছে, ২টী রোগীর থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিশেষ আনন্দের বিষয়, গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে সেবাশ্রমের উদার কার্য্যের প্রশংসা ও পোষকতা করিয়াছেন। এক্ষণে সেবাশ্রম আরও তিনটী ওয়ার্ডের জন্য সহৃদয় সাধারণের নিকট আবেদন করিতেছেন:—

(১) সাধু-ব্যতিরিক্ত রোগিগণের জন্য একটী ওয়ার্ড, (২) কলেরা ওয়ার্ড, এবং (৩) অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য একটী ওয়ার্ড। এই তিনটী ওয়ার্ডেরই বিশেষ আবশ্যকতা। প্রবাসে অসহায় পীড়িত নারায়ণগণের দুরবস্থার কথা যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, আশা করি, তাঁহারা সেবাশ্রমের এই অভাব দূরীকরণে পশ্চাৎপদ হইবেন না। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম, কনখল পোষ্টাফিস, জেলা সাহারানপুর, অথবা ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস্।

রামকৃষ্ণমিশন।

বন্যাপীড়িতগণের

সাহায্যভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকার।

(১লা হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত।)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, কলিকাতা	২৲	এ চাটার্জ্জি, বাগাহা	৫৲
শ্রীবগলাচরণ বিশ্বাস, হাওড়া	২৲	শ্রীবেণীমাধব বিশ্বাস, চৌমুহনী	১৲
মহারাণী সাহেবা, টিহিরী	৫০৲	মাং শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাইনিতাল	১৫০৲
শ্রীবগলাপ্রসাদ বিশ্বাস, নবাবগঞ্জ	৩০৲		

রামকৃষ্ণ সেবকসমিতি,
রেঙ্গুণ ১৯:৲
রামচন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স, লাহোর ৫০৲
বি, আই, এস, এন, কোং,
ইং-বিভাগ, সালকিয়া ১১৷৶০
জনাই বিদ্যালয়, জনাই ২২৲
শ্রীশ্যামলাল কুণ্ডু, পাংসা ৫৲
শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য,
নাগরপুর ২৲
শ্রীমতী হেমলতা রায়, গৌহাটী ২৲
শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী,
চাকনগর ১৲
মাং যদুপতি চট্টোপাধ্যায়,
শিলিগুড়ী ২৫০৲
এ, এম্, এস্, আয়ার, রেঙ্গুন ২৲
শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, হাজিপুর ৫৭৷৶০
এন্, সি, মজুমদার,
মোজাহিদপুর ২৷০
শ্রীপ্রসন্নকুমার মিত্র, আরা ২২৲
শ্রীত্রিবেণীচরণ শূর,
পাইকপাড়া ২১৲
পিপল্‌স্ এসোসিয়েসন,
বাগেরহাট ২৫৲
শ্রীদীনবন্ধু পাইন, শিয়ানগর ৫০৲
শ্রীরাসবিহারী ঘোষাল,
বারাকপুর ৬৲
শ্রীবিনোদবিহারী সাধুখাঁ,
ভবানীপুর ৫৲

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার,
ইনায়েতপুর ৭৲
বি, পি, চক্রবর্ত্তী, মন্তিহারী ২৲
পতিসাব উচ্চ ইং বিদ্যালয়ের
ছাত্রগণ, পতিসার ৫৷০
শ্রীনরসিংহ বসু, রেঙ্গুন ৫৲
আর, কে, ব্যানার্জি, দিল্লী ১৲
চিকনদী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ,
চিকনদী ১৩৲
শ্রীদাশরথি কুমার, কলিকাতা ৭৲
কে, কে, দেবী, ভাটপাড়া ৫৲
সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার, নরুণ্ডী ৩৲
এম্, গোবিন্দজি, বোম্বাই ৫৲
শ্রীযাদবচন্দ্র মহান্তী, হিরবান্ধা ৫৲
সাধুহাটী উচ্চ ইং বিদ্যালয়,
সাধুহাটী ৬/০
শ্রীনগেন্দ্রকুমার ঘোষ, বোডা ২৲
বি, সি, বিশ্বাস, খিদিরপুর ২৲
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা ৫৲
শ্রীরাসবিহারী বসু, দেরাদুন ৩০৲
শ্রীহরিকুমার রাথুড়ী, টিহিরী ১৫৲
শ্রীনূতনানন্দ, টিহিরী ১০৲
শ্রীভবানী দত্ত, ঐ ৬৲
শ্রীগোবিন্দ সিংহ, ঐ ৫৲
শ্রীরবি দত্ত, ঐ ৫৲
লালা লজপত রায়, লাহোর ৫৲
মাং করম খাঁ, টিহিরী ১৲

পি, এচ, বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, • •
টিহিরী ৩৲
শ্রীআশুতোষ ঘোষ,
মাথাভাঙ্গা ৩৫৲
গনৌরী সা, • মিহিজাম ৫৲
শ্রীঅবনীকান্ত গুহ, ঢাকা ৪।৶•
এন, কে, দাসগুপ্ত বর্ম্মা ২৬৸৶•
শ্রীসত্যচরণ বসু, নাগপুর ৪৲
জি, কে, আয়ার, সাক্ষিগোপাল ১৲
রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী,
ময়মনসিংহ ৫০৲
টি, দিপচান্দ, সক্কর ৫৲
জনৈক সমবেদক, এলাহাবাদ ১১৸৴০
টী, পি, ব্যানার্জ্জি, বেনারস ১০৲
শ্রীশশধর মজুমদার, শিলং ২৲
বার লাইব্রেরী, বগুড়া ৩০৲
সি, কাঠারি, সান্তাহার ১০৲
এ, সি, চৌধুরী, ময়মনসিংহ ৬০৲
শ্রীরামগোপাল ঘোষ,
মগরাহাট ৪০৲
শ্রীমণীন্দ্রনাথ চন্দ্র, বেলেঘাটা ৩৫৲
জনৈক সমবেদক, কোদর্ম্মা ১॥•
শ্রীচন্দ্রভূষণ বিদ্যালঙ্কার,
হাতুগঞ্জ ৭৶০
বি, আই, এস, এন্, কোং, ইলেক্‌-
ট্রিক্ বিভাগ, কলিকাতা ২০৲
বঙ্গ-বন্যা মোচন-সমিতি,
রেঙ্গুন ২৫০৲

মহেশ্বর সেবাশ্রম, মহেশ্বরপুর ২০৲
ভবানীশঙ্কর এণ্ড মুণ্ডকর,
মেঙ্গালোর ৪০৲
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ফিরোজপুর ৭।০
আর, এম্, বসু, রেঙ্গুন ১০০৲
শ্রীজয়গোপাল অস্থানা, গোরখপুর ৯।০
মাং নরসিংহ বসু, রেঙ্গুন ৫৲
শ্রীপ্রভাচরণ সিংহ, সম্বলপুর ১০৲
শ্রীপূর্ণশশী বন্দ্যোপাধ্যায়,
বাহারকুটি ১০৲
সেক্রেটরী, বেঙ্গল বি, সি,
লিমিটেড্, কলিকাতা ৬৲
ভি, এম্, সরকার, বাগাহা ১৸৶০
টি, ওয়াই, দিহেনকার,
বিলাসপুর ৫৲
ইয়ঙ্গ এণ্ড কোং, কলিকাতা ২৲
কে, এন্, সোম, পোর্টব্লেয়ার ১৲
শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, বাগাহা ২৲
দানসমিতি, মিহিজাম ৩০৲
মাং চন্দ্রকান্ত মজুমদার, শিলং ৫০৲
এচ্, এন্, ভাদুড়ীর মাতাঠাকুরাণী,
তেতুলিয়া ২৲
এ, সি, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং,
বাগাহা ৬৸৶০
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রয়ড়া ১২॥০
শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,
মিহিজাম ২৲
এচ্, পি, মিত্র, আলমোড়া ২৲

মাং স্বামী করুণানন্দ,বেলুড় ৪৪॥৵০
শ্রীমতী দমনকুমারী দাসী, কলিকাতা ৫৲
শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার, কলিকাতা ১৲
কতুলপুর উচ্চ ইং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, কতুলপুর ২০৲
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বুধপাঠা ৫৲
উৎকর্ষসমিতি, বারুইপুর ৪৲
শ্রীমূর্ত্তিনাথ রায়, লক্ষ্ণৌ ১৲
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ খাঁ, মহাদেবপুর ৫৲
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত, বাইরী ২৲
শ্রীহরিদাস সিংহ, ছাপরা ১৲
মাং রাধারমণ সেন, গোরখপুর ৫০৲
মাং শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী ঘোষ, বরাদিয়া ৩২৷৵০
মাং সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বাঙ্গরা ১০৲
এফ্, কে, নাগ, ৪৫নং সুকিয়াষ্ট্রীট্ ১০৲
মাং রামপ্রসাদ কিশেন, মিরাট ১০৲
মাং প্রধান শিক্ষক, রায়কালী মধ্য ইং বিদ্যালয় ১৫৲
মাং ডাক্তার কানাইলাল রায়, কারকেরিয়া, হাতীগড় ৬৸০
মাং রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ৫০৲
জনৈক বন্ধু, ১৲
ইণ্ডিয়ান্ ফুটবল্ এসোসিয়েসন্ মাং রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার, ১২নং সার্পেণ্টাইন্ লেন ১৫০৲
মাং এন্, কে, দাস, ১২নং সার্পেণ্টাইন্ লেন ৩৸০
ইষ্ট্ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক হুজুরী মালের গলি এবং ফর্ডাইস্ লেন হইতে সংগৃহীত চাঁদা, ১১॥০
ইষ্ট্ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ, সার্পেণ্টাইন্ লেন্ ১৯৲
বাগবাজার সোসিয়াল্ ইউনিয়ান্ ১০০৲
মাং সুরেশচন্দ্র সাহা, ১৯নং কুমারটুলি ১৫৲
রবীন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ২।৬।১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ ১৲
আলিপুর বার লাইব্রেরী ১৪৲
সুধীরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছারহাটা-রামকৃষ্ণ দরিদ্রভাণ্ডার ১৲
শিক্ষক এবং ছাত্রগণ, যে, জি, বিদ্যালয় ইব্রাহিমপুর ১০৲
শিক্ষক এবং ছাত্রগণ, উচ্চ ইং বিদ্যালয় গুপ্তিপাড়া ৮॥০
ছাত্র-সমিতি, সাতকানিয়া উচ্চ ইং বিদ্যালয়,চট্টগ্রাম, মাং কার্য্যাধ্যক্ষ, বেজলি ১০০৲
ট্র্যাফিক ম্যানেজারের আফিস্, ই, বি, এস্,আর শিয়ালদহ ২২৲

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা ১৲
মাং রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ৭০৲
ঐ ঐ ঐ ৮০৲
শ্রীমতী শুভাননী দেবী,তারপুর. ৫৲
গোপালচন্দ্র পাল, ১৫৮নং
অপার চিৎপুর রোড ১০৲
মর্টন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং
ছাত্রবৃন্দ; কলিকাতা ২৩৷৷০
লালা লজপত রায়. পাঞ্জাব
হিন্দুদুঃখ-নিবারণী সমিতির পক্ষ
হইতে ১৫০৲
রেলি ব্রাদর্সের হেডঅফিসের
কর্ম্মচারিগণ কলিকাতা ৫০৲
জনৈক বন্ধু ৫৲
শান্তিরাম ঘোষ, ৫৭নং
রামকান্ত বসুরষ্ট্রীট, ১০৲
শম্ভুনাথ ক্ষেত্রী, ৪৫নং জোড়া-
পুকুর স্কোয়ার লেন্ ৫৲
আলিপুর বার লাইব্রেরী ৮৲
ষ্টীমার আফিসের কর্ম্মচারিগণ,
চাঁদপুর ১০
জনার্দ্দন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ,
মালা ৫৲
মাং রাধানাথ চক্রবর্ত্তী,রামরতন
উচ্চ ইংরাজীবিদ্যালয়, দত্তপাড়া ৫৲
আলিপুর বার লাইব্রেরী ১০৲
বিহারীলাল মণ্ডল, মাঝি ১৲

মাণিকলাল দে, বড়াল ১
রামকৃষ্ণ মিত্রকোম্পানি,
আহমদাবাদ ১০১৲
বেনারস রিলিফফণ্ড সমিতির
সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ,
মাংসার্ভ্যাণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসা-
ইটির সভ্যগণ,এলাহাবাদ ৫০০৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৫০৲
ই, আই, আর বুকিংসেক্সন,
বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি
১০৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ৫৲
দেশী কেরাণীবৃন্দ, এনড্রুইয়ুল
এণ্ড কোং, কলিকাতা ৫৷০
ডাক্তার সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
৩।২ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন ২৫৲
সভাপতি, কলিকাতা তাম্রকূট
ব্যবসা সমিতি, ১০নং
কলুটোলা ষ্ট্রীট ৫০৲
যামিনীনাথ মণ্ডল, ১২ নং
যদুনাথ মিত্রের লেন ৩৲
রাজা হৃষীকেশ লাহা,এবং বি,
চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক বর্দ্ধমান
সেণ্ট্রাল ফ্লাড রিলিফ কমিটি,
১৮নং বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট ৫০০৲
গোপালচন্দ্র পাল, ১৫৮ অপার
চিৎপুর রোড ২০৲
দি বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী, ১২
রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

লেন ৩১॥০

মাঃ রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ৬০৲

মাঃ রামগোপাল চক্রবর্ত্তী, প্রধান শিক্ষক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ ৯৴০

কৃষ্ণকুমার দত্ত, কন্‌ট্রাক্টর, ভামো ৫৲

মাঃ ললিতমোহন দাসগুপ্ত, সম্পাদক দামোদর বন্যা মোচন সমিতি, মুরাপাড়া ৫০৲

রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ৩০৲

সুশীলকুমার সিংহ, ক্যাপিট্যাল্ অফিস্, কলিকাতা ২৲

শ্রীমতী সুষমা সেন, বাঁচি ১৲

সব্‌ইনস্পেক্টর এবং সব্‌রেজিষ্ট্রার্ মাঃ প্রধান শিক্ষক, চঞ্চল উচ্চ ইং বিদ্যালয় ৭৲

হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, সম্পাদক, রাজ-উচ্চ ইং বিদ্যালয়ের বন্যামোচন ভাণ্ডার, কান্দি ২৫৲

মাঃ কার্য্যাধ্যক্ষ, বেঙ্গলি ৩০০৲

মাঃ রাধারমণ সেন, গোরখপুর ৭০৲

৺প্রমীলাসুন্দরী দেবী, শান্তি কুটীর, অম্বালা ২০।৴০

মাঃ রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ১০০৲

মাঃ এ, সি, গুপ্ত, রেঙ্গুন ২০৲

মাঃ অশ্বিনীকুমার নিয়োগী, কাকুরা ৪

ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ্; বি, এন্, আর গার্ডেন্‌রিচ্, কলিকাতা ৫।৴০

মাঃ ব্যোমকেশ শেঠ, অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, বসাক সমিতি, ৩ নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট ১০০৲

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী আফিস, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের আয় হইতে ১০

মাঃ প্রধান শিক্ষক, শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল ৩০৲

মাঃ কানাইলাল রায়, খারপেরিয়া বাগান ৩৲

মাঃ রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ৪০৲

চিৎপুর গুড়স্‌সেডের কর্ম্মচারী-গণ ই, বি, এস, আর ৩৫৲

মাঃ প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিহরদী ২।৴০

রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ২০৲

এন্, এন্, ঘোষ, এলাহাবাদ ১৲

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীচৌধুরাণী, ঢাকা ১২॥০

মাঃ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নায়ক আফিস্, কলিকাতা ১৷০

যে সকল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে—

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সহকারী সম্পাদক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ,—দুই বাক্স পুরাতন বস্ত্র।

শ্রীব্রজলাল চক্রবর্ত্তী, কানপুর—১প্যাকেট টুইল্‌সার্ট, জুটকোট্ এবং গেঞ্জি প্রভৃতি বারটী।

শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, রামকৃষ্ণপুর সাহায্যভাণ্ডার—দুই বস্তা পুরাতন কাপড়।

নগেন্দ্রনাথ রায়,ময়মনসিংহ,—একটী সোনার চেন।

বিপিনবিহারী সাহা, ৫ খানা কাপড়।

বালী বন্যামোচন সমিতি ৫০ খানা পুরাতন কাপড়।

ভবানীপুব মধ্যইংবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ—৫ খানা কাপড়।

মাং কার্য্যাধ্যক্ষ, বেঙ্গলি—১ বস্তা পুরাতন কাপড় এবং ১ বাক্‌স বিলাতি দুগ্ধ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ধাড়া, নাটশাল, গেঁয়োখালী,১বস্তা চাউল্। বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং—দুই বোতল গোলঞ্চ নির্য্যাস, দুই বোতল একোয়া টাইকোটিস্, দুই বোতল এণ্টিম্যালেরিয়েল্ মিক্‌শ্চার .বোতল কুইনাইন হাইড্রোং.ব্রামাইড্, পাঁচ বোতল এডোয়ার্ডস্ টনিক্, ১কোটা পার্গেটিভ কেপসিউল্‌স্, .১ টিন ভেসেলিন্ ইয়ালো, ১ বোতল কার্ব্বলিক এসিড,১ পাউণ্ড বোরিক্ এসিড্, ১প্যাক বোরিক্ কটন্,দুই বোতল মাইথিলেটেড্ স্পিরিট্।

রামকৃষ্ণ মিল এণ্ড কোং,আহামেদাবাদ ৫০ জোড়া নূতন কাপড়।

শ্রীযদুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ী,—১ বাক্‌স চা।

দি বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী, ১২নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন—১ বস্তা পুরাতন কাপড়।

মাং কার্য্যাধ্যক্ষ বেঙ্গলি—১ বস্তা পুরাতন কাপড়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১ রামকান্ত বসুর প্রথম লেন ১ শিশি সর্পাঘাতের ঔষধ।

মাং শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নায়ক কার্য্যালয় ৮ বস্তা চিড়া এবং মুড়কী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের বেদান্তসাধন।

(স্বামী সারদানন্দ)

অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ কার্য্য সমাধা হইলে শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদান করাইলেন। সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমস্ত লোক প্রাপ্তির আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জ্জন করেন বলিয়াই যে শাস্ত্র তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে আপন প্রেত-পিণ্ড আপনি প্রদান করিতে বলিয়াছেন একথা বলা বাহুল্য।

ঠাকুর যখনি যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন তখনি নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তিনি যেরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহাই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ তোতা তাঁহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতেছিলেন তাহাই যে, তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি। শ্রাদ্ধাদি পূর্ব্বক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়া রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরুনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ-ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের উদয় হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হইলেন। পূর্ব্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং সনাতন কাল হইতে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগরূপ যে ব্রত গুরুপরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতাবলম্বনের পূর্ব্বোচ্চার্য্য

মন্ত্রসকলের পূত-গম্ভীর ধ্বনি পঞ্চবটীর বন উপবনসকলকে মুখরিত করিয়া তুলিল। পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর স্নেহসম্পূর্ণ কোমল বক্ষ সেই ধ্বনির সুখস্পর্শে স্পন্দিত হইয়া তাঁহাতে নূতন জীবনের অপূর্ব্ব সঞ্চার প্রকাশিত করিল; এবং বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহুজনহিতায় প্রকৃত সাধক সর্ব্বস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন জানিয়াই তিনি যেন আনন্দকলগানে সে সংবাদ দিগন্তে বহন করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্য অবহিতচিত্তে তাঁহাকে অনুসরণ পূর্ব্বক সেই সকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হইল—

"পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক্। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক্। অথণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক্। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্য বর্ত্তমান পরমাত্মন্, দেবমনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণাযোগ্য বালক সেবক, হে সংসাররূপদুঃস্বপ্নহারিন্ পরমেশ্বর, দ্বৈতপ্রতিভাসরূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে প[illegible]াত্মন্, আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহু[illegible] প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া ত্বদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্ব্বপ্রেরক দেব, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর। সূর্য্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বারি, ব্রীহিযবাদি শস্য, বনস্পতিসমূহ, জগতের সমগ্র পদার্থ তোমার নির্দেশে অনুকূল প্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভে সহায়তা করুক্। হে ব্রহ্মণ্, তুমিই জগতে বিশেষ শক্তিমান্ নানা রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। নিজ শরীর মন শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানধারণের যোগ্যতা লাভের জন্য আমি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছি— প্রসন্ন হও!" *

* বিরজাহোম মন্ত্রের ভাবার্থ।

অনন্তর বিরজা হোম আরব্ধ হইল—"পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ-রূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি, আমাতে অবস্থিত বায়ুসকল শুদ্ধ হউক, আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় রূপ কোষ-পঞ্চ শুদ্ধ হউক্, আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধপ্রসূত, আমাতে অবস্থিত বিষয়-সংস্কার-সমূহ শুদ্ধ হউক্, আহুতি দ্বারা রজোগুণসুলভ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্ম্মাদি শুদ্ধ হউক্, আহুতি দ্বারা রজোগুণসুলভ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"হে অগ্নিশরীরে শয়ান, জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ পুরুষ, জাগ্রত হও, হে অভীষ্টপূরণকারী, আমার সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-প্রতিবন্ধ নাশ পূর্ব্বক গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান বিশেষ ভাবে দাও, আমাতে যাহা কিছু অবস্থিত সে সকল শুদ্ধ হউক, আহুতি দ্বারা রজঃপ্রসূত মলিনতা বিদূরিত হইয়া আমি জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি, দারা, পুত্র, সম্পৎ, লোকমান্য, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

ঐরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর, 'ভূরাদি সকল লোক লাভের প্রত্যাশাই আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম' এবং 'জগতের সর্ব্ব-ভূতকে অভয় প্রদান করিতেছি'—বলিয়া হোম পরিসমাপ্ত হইল, এবং শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমান কাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন, কাষায়

ও নামে * ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোতার নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে এখন, বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্ব্বথা অপরিচ্ছিন্ন এক মাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজ-প্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ, সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নাম-রূপের সীমা লইয়া যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরপরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহ-বিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধিসহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর, দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমি জ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। "যে জ্ঞানাবলম্বনে এক অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র, যাহা অল্প তাহা তুচ্ছ। তাহাতে পরানন্দ নাই। যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা বা মহান্, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্ব্বথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছেন, কোন্ মন-বুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে?"

শ্রীমৎ তোতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্তবাক্যসহায়ে

* আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষা দানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত সেবক, শ্রীযুত মথুরানাথই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটাই আমাদিগের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

ঠাকুরকে সেদিন যে সমাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যেন সেদিন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "দীক্ষা প্রদান করিয়া ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্ব্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডী ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌-ঘনোজ্জ্বল মূর্ত্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল! সিদ্ধান্তবাক্য-সকলের শ্রবণ, মনন করিয়াও যখন ধ্যানে বসিয়া উপর্য্যপরি ঐরূপ হইতে লাগিল তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেঁও, হোগা নেহি' অর্থাৎ—কি? হইবে না, এত বড় কথা? বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচীর ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্।' তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম! তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না, একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম!"

ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটেই উপবিষ্ট রহিলেন। পরে নিঃশব্দে কুটীরের বাহিরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে এজন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের অনতিদূরে পঞ্চবটীতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন!

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন করিয়া দিবসত্রয় ঐরূপে অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না! তখন বিস্ময়কৌতূহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গল মোচন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—যেমন বসাইয়া গিয়াছিলেন ঠাকুর সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিঃপূর্ণ। বুঝিলেন—বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প—নিবাত-নিস্পন্দ প্রদীপবৎ তাহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে!

সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—যাহা দেখিতেছি তাহা কি বাস্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই তিন দিবসে আয়ত্ত করিলেন? সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি না, নাসিকাদ্বারে বিন্দুমাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি না, বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠ-খণ্ডের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারম্বার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না! তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

যহ ক্যা দৈবী মায়া—সত্য সত্যই সমাধি, বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের

চরম ফল, নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে!—দেবতার একি অত্যদ্ভুত মায়া!

অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ওম্' মন্ত্রের সুগম্ভীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল জল ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরে শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নির্ব্বিকল্প ভূমিতে তাঁহাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া শ্রীমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র* সবিস্তারে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঠাকুরের মনে দৃঢ় সংকল্প উপস্থিত হইল, তিনি এখন হইতে নিরন্তর নির্ব্বিকল্প অদ্বৈত ভূমিতেই অবস্থান করিবেন। কিরূপে তিনি ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—জীবকোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয় মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—এবং কিরূপে কাহার সহায়ে ঐ কালে তাঁহার শরীর রক্ষিত হইয়াছিল, সে সকল কথাও আমরা পাঠককে অন্যত্র † বলিয়াছি। অতএব বেদান্তোক্ত অদ্বৈত-ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুর অতঃপর কি করিয়াছিলেন তাহাই আমরা পাঠককে বলিতে এখন প্রবৃত্ত হই।

---

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৮ম অধ্যায় ২৪৮—২৭০ পৃঃ।

† গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ ২য় অধ্যায় ৪৮—৫৭পৃঃ।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি খণ্ডন।

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রৈক্কের ভোগলালসা থাকায় রৈক প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন—তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় নাই, ইত্যাদি। কিন্তু একথায় একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আপত্তিটী এই যে, রৈক্কের ঐ ভোগলালসা প্রকৃত অজ্ঞজনোচিত ভোগলালসা নহে, উহা তাঁহার প্রারব্ধ ভোগ মাত্র। উহাতে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের কোন বাধা উৎপাদন করিতে পারে না, ইত্যাদি। এই আপত্তির উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, যে রৈক্কের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, যে রৈক্কের সমগ্র জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সমুদায় সাধু-কর্ম্মের ফললাভ ঘটিয়াছে, তাঁহার আবার সংসারভোগরূপ প্রারব্ধ ভোগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহা কি অসম্ভব কথা নহে? জ্ঞানীব্যক্তির যে প্রারব্ধ ভোগ তাহা কখন স্বেচ্ছাকৃত হয় না, তাহা পরেচ্ছাকৃত হইয়া থাকে। রাজা জ্ঞানশ্রুতি যদি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সংসারী করিতেন তাহা হইলে তাঁহার এই ভোগকে প্রারব্ধভোগ বলা যাইতে পারিত। বস্তুতঃ তাহা ঘটে নাই, রৈক্কই স্বয়ং সংসারী হইতে চাহিতেছেন। সুতরাং এই ভোগলালসাকে প্রারব্ধ ভোগ বলিয়া রৈক্কের ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান—পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান—তাহা বলা যায় না। সুতরাং রৈক্কের প্রসঙ্গে বেদন ও উপাসনার একার্থে প্রয়োগ দেখিয়া এই প্রসঙ্গটীকে নিদর্শন করিয়া বেদান্তের বেদন বলিতে উপাসনা বুঝিতে হইবে এ কথা বলা চলে না।

যাহা হউক রৈক্ক যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ নহেন, একথা আচার্য্য শঙ্করের অর্থ অনুসারে বলা হইল। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ মতে উক্ত শ্রুতিবাক্যটী এমন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যে তদনুসারে

রৈককে ব্রহ্মজ্ঞ বলিতে ইচ্ছা হইতে পারে। কারণ আচার্য্য শঙ্কর "যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" এই বাক্যের "যৎ" পদটীর অর্থ "রৈকের জ্ঞান" এইরূপ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ করেন নাই যথা,—

"এবম্ এনং রৈকং কৃতায় স্থানীয়ং ত্রেতাদ্যয়স্থানীয়ং সর্ব্বং তদ্ অভিসমেতি অন্তর্ভবতি রৈকে। কিং তৎ? যৎকিঞ্চ লোকে সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সাধু শোভনং ধর্ম্মজাতং কুর্ব্বন্তি, তৎ সর্ব্বং রৈকস্য ধর্ম্মে অন্তর্ভবতি, তস্য চ ফলে সর্ব্বপ্রাণীধর্ম্মফলমন্তর্ভবতি ইত্যর্থঃ। তথা অন্যোঽপি কশ্চিৎ যঃ তৎ বেদ্যং বেদ। কিং তৎ? যৎ বেদ্যং স রৈকঃ বেদ, তদ্বেদ্যমন্যোঽপি যো বেদ, তমপি সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মজাতং তৎফলং রৈকম্ ইব অভিসমেতি ইতি অনুবর্ত্ততে, সঃ এবংভূতঃ অরৈকোঽপি ময়া বিদ্বান্ এতদুক্তঃ এবম্ উক্তঃ, রৈকবৎ স এব কৃতায়স্থানীয়ো ভবতি ইত্যভিপ্রায়ঃ॥"

ইহার অর্থ—"এইরূপ কৃত নামক অয় স্থানীয় এই রৈকে ত্রেতাদি স্থানীয় সেই সমস্তই অন্তর্ভূত হয়। (যাহা অন্তর্ভূত হয়) তাহা কি? জগতে সমস্ত লোকে যাহা কিছু সাধু অর্থাৎ উত্তম কর্ম্ম করে তৎসমস্ত রৈকে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিগণের ধর্ম্মই রৈকের কর্ম্মফলে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সেইজন্য যে কোনও লোক সেই জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয়, সেই জ্ঞাতব্য বিষয়টা কি? যে জ্ঞাতব্য বিষয় সেই রৈক জানে। অন্য যে কোন লোকও সেই জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয়, সমস্ত প্রাণীর ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তৎফল রৈকের ন্যায় তাহাতেও অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। (এখানেও সেই) অভিসমেতি ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়াছে। রৈক ব্যতীত এবম্ভূত অপর বিদ্বানও আমা কর্ত্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইল। অভিপ্রায় এই যে রৈকের ন্যায় সে লোকও কৃতায়স্থানীয় হইয়া থাকে।"

এস্থলে উক্ত "তৎ" শব্দে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ব্রহ্ম নহে পরন্তু (রৈকোক্ত সংবর্গ বিদ্যা স্মরণ করিলে বলিতে পারা যায় যে) উহা সমুদয় সাধু কর্ম্মের ফলবিপায়ক রৈকের উপাসনারূপ কোন কর্ম্ম বিশেষ।

কিন্তু আচার্য্য রামানুজ শ্রীভাষ্যমধ্যে এই শ্রুতির অর্থ প্রদান করেন নাই, অথবা তিনি আচার্য্য শঙ্করের মত প্রধান উপনিষদ গুলির ভাষ্যও লেখেন নাই। তবে তাঁহার ভাষ্যের টীকাকার পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য্য ইহার যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, আচার্য্য রামানুজ মতে উক্ত "যৎ" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। যথা—"যঃ তদ্ বেদ তস্য ব্রহ্মণো বেদিতা যো রৈকঃ,যদ্ বেদ তস্য রৈকস্য বেদ্যং যদ্ ব্রহ্ম, স বেদিতা রৈকঃ এতদ্ বেদ্যং চ উভয়ং তব ময়া উক্তমিত্যর্থঃ।"

শ্রুতপ্রকাশিকা।

অর্থাৎ—"সেই ব্রহ্মের বেদিতা যে রৈক,এবং সেই রৈকের বেদ্য যে ব্রহ্ম, সেই বেদিতা রৈক এবং এই বেদ্য, এই উভয়ই তোমার নিকট মৎকর্তৃক কথিত হইল।"

এখন বলা যাইতে পারে, আচার্য্য শঙ্করের অর্থ মানিতে হইবে আর আচার্য্য রামানুজের অর্থ মানিব না, ইহার প্রমাণ কি? আচার্য্য রামানুজের মত অবলম্বনে রৈককে ব্রহ্মজ্ঞ বলিলে দোষ কি?

এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে উভয় প্রকার অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে এস্থলে আচার্য্য শঙ্করের অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। কারণ প্রথমতঃ রৈকের চরিত্রটী প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞের অনুকূল নহে, কারণ তাঁহার ভোগেচ্ছা ছিল, এ সব কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রৈক যে বিদ্যাটী উপদেশ দিলেন সেই বিদ্যাটীতে ব্রহ্মের লক্ষণ প্রভৃতি কিছুই বর্ণিত হয় নাই। উহার যে ফল কথিত হইয়াছে তাহাও ইহলৌকিক সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছু নহে এবং উহাতে অধিকন্তু ধ্যানেরই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এ সব কথাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কেবল উক্ত শ্রুতি বাক্যটীর অর্থ বিচার করিলে আচার্য্য শঙ্করের অর্থে যেরূপ সঙ্গতির শৃঙ্খলা দেখা যাইবে আচার্য্য রামানুজসম্মত অর্থে তাহা দেখা যায় না। দেখ আচার্য্য শঙ্করের অর্থে "এনং তৎ সর্ব্বং অভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যঃ তদ্‌বেদ যৎ স বেদ" এই বাক্যাবলীকে অন্বয় করিয়া এইভাবে সাজান হয়, যথা,—এনং তৎ সর্ব্বং অভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি

যৎ স বেদ, যস্তদ্বেদ (তমপি তৎসর্ব্বমভিসমেতি)।" ইহাতে "যস্তদ্বেদ" এই অংশটী "যৎ স বেদ" এই অংশের পরে বসিল এবং "তমপি তৎ সর্ব্বং অভিসমেতি" এইটুকু উহ্য করা হইল। ইহার ফলে "যস্তদ্বেদ" এই বাক্যের সহিত "যৎ স বেদ" এই বাক্যের এবং পূর্ব্বোক্ত অভিসমেতি ক্রিয়ার একটী সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, আর তাহার ফলে ইহার অর্থ হইয়াছে, 'ইহাকে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে যাহা কিছু প্রজাগণ সাধু কর্ম্ম করে, যাহা তিনি অর্থাৎ রৈক্ক জানেন তাহা অন্য যিনি জানেন, তাঁহাকেও সেই সমস্ত সাধুকর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।' ইহাতে দেখা যাইবে উক্ত শ্রুতিবাক্যস্থ চারিটী "যৎ" ও "তৎ" অর্থাৎ, 'যাহা' ও 'তাহা'র একটী সঙ্গত সম্বন্ধ রহিয়াছে। এবং তাহার ফলে রৈক্ক সম্বন্ধে সমুদায় সাধুকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তিরূপ একটী মাত্র পরিচায়ক গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ মতে "এনং তৎ সর্ব্বং অভিসমেতি যৎকিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" এই বাক্যের সহিত "যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" এই বাক্যের ওরূপ সম্বন্ধ নাই। কারণ তাঁহার মতে "যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" বাক্যের যৎ ও তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, রৈক্কের বেদ্য ও অনুষ্ঠীযমান ধর্ম্ম নহে। এবং "যস্তদ্ বেদ" বাক্যের সহিত অভিসমেতি ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। ইহার ফলে রৈক্ক সম্বন্ধে যে পরিচায়ক গুণের উল্লেখ করা হইল, তাহা একটী নহে, পরন্তু দুইটী, যথা, একটী গুণ সমুদায় সাধুকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তিরূপ, অপরটী ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং এ মতে এইরূপই অর্থ হয়—"ইহাকে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হয় যাহা কিছু প্রজাগণ সাধুকর্ম্ম করে এবং যে রৈক্ক তাঁহাকে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে জানেন এবং সেই রৈক্ক যাঁহাকে অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে জানেন সেই বেদিতা রৈক্ক ও এই বেদ্য ব্রহ্ম এতদুভয়ই কথিত হইল।"

এখন দেখ এই উভয় অর্থের কোন্‌টী ভাল। অদ্বৈতবাদী বলেন আচার্য্য শঙ্করের অর্থে যখন সমগ্র বাক্যে একটা সম্বন্ধ থাকিতেছে এবং যখন রৈক্কের ভোগ-ইচ্ছা প্রভৃতি রহিয়াছে—এবং রৈক্কোক্ত বিদ্যা যখন পুরুষেচ্ছাধীন ব্যাপার হইতেছে, তখন রৈক্কের জ্ঞান পরব্রহ্মজ্ঞান কি করিয়া হইতে পারে? এজন্য আচার্য্য শঙ্করের অর্থই ভাল। যদি

বল উক্ত সঙ্গতি না থাকাতেই আচার্য্য শঙ্করের অর্থ যে শ্রেষ্ঠ হইবে তাহার প্রমাণ নাই। তাহা হইলে বলিব, না, সঙ্গতি না থাকাই কেবল শ্রেষ্ঠতার হেতু নহে; কিন্তু সঙ্গতির সহিত রৈক্কের চরিত্র প্রভৃতি বিষয়গুলি মিলিত করিলে আচার্য্য শঙ্করের অর্থই শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। তাহার পর দেখ "যস্তদ্ বেদ যৎ স বেদ" এই বাক্যের যৎ ও তদ্ পদদ্বয়কে ব্রহ্ম বলিতে গেলে পূর্ব্বে এই প্রকরণে ব্রহ্মের কথা থাকা উচিত, কিন্তু এ প্রকরণে তাহা নাই। যদি বল "তৎ" শব্দে প্রসিদ্ধ বস্তু বুঝায় এবং বেদান্তে ব্রহ্মই তাৎপর্য্য এজন্য "তৎ" শব্দে ব্রহ্ম বুঝাইতে পারে, তাহা হইলে বলিব হাঁ, তাহা সত্য, কিন্তু যদি উহার অগ্রে অন্য কিছু বুঝাইবার সম্ভাবনা না থাকে। দেখ একটু পূর্ব্বেই যখন রৈক্কের অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্মের কথা রহিয়াছে, এবং পরে যখন যৎ শব্দের দ্বারা রৈক্কের উক্ত জ্ঞেয় বিষয়ের কথা রহিয়াছে, তখন সন্নিকটবর্ত্তী সেই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া কেন দূরবর্ত্তী সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্যভূত ব্রহ্ম শব্দ এখানে টানিয়া আনিবে? অর্থ সম্ভব না হইলে যদি ওরূপ করিতে হয় কর, কিন্তু তাহা না হইলে কেন তাহা করা হইবে? যদি বল আমাদের মতেও যখন "অভিসমেতি" ক্রিয়াপদটী উহ্য করিয়া অর্থ করিতে হইতেছে, তখন "যৎ" ও "তৎ" শব্দের অর্থে সমগ্র বেদান্তের তাৎপর্য্যভূত ব্রহ্ম পদার্থ টী বুঝিলে কি এতই দোষ হইল? দেখ জানশ্রুতির মত রাজার যদি কিছু অভাব থাকে তাহা হইলে তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং এতদ্দ্বারা যে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা হয়, তাহা অকিঞ্চিৎকর;—তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। দেখ অভিসমেতি ক্রিয়াটী উহ্য করায় ঋষি বাক্যের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকে, আর না করিলে উহা বিচ্ছিন্ন হয়। দেখ বিচ্ছিন্ন করা উদ্দেশ্য হইলে বক্তা বিচ্ছেদবোধক শব্দ প্রয়োগ করে, এস্থলে তাহা নাই, সুতরাং বৃথা তাহা কেন করা হয়? তাহার পর জানশ্রুতির অভাব যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই বা তোমায় কে বলিল? তাহার তেজ অপেক্ষা রৈক্কের তেজ অধিক শুনিয়া সেই তেজই যে তাহার অভাব নহে তাহা তোমায় কে বলিল? বাস্তবিক সেই অভাবজনিত দুঃখ বশতই তাহাকে রৈক্ক

শূদ্র বলিয়াছেন। সুতরাং দোষ কোন পক্ষে তাহা তুমিই বল? তাহার পর এতদ্ব্যতীত আচার্য্য রামানুজ সম্মত অর্থে অন্য দোষও আছে, দেখ উক্ত মতে "যে রৈক (তৎপদ বাচ্য) ব্রহ্ম জানে এবং (যদ্‌পদ বাচ্য) যে ব্রহ্ম রৈক জানে, সেই রৈক ও ব্রহ্মের কথা বলা হইল" এই কথার বক্তব্য বিষয় রৈক ও ব্রহ্ম এই উভয়ই হইতেছে। কিন্তু দেখ হংসরূপী ঋষিগণের মধ্যে পশ্চাৎবর্ত্তী হংসরূপী ঋষি অগ্রবর্ত্তী হংসরূপী ঋষিকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার বিষয় কেবলই রৈক, পরন্তু ব্রহ্ম ও রৈক এতদুভয় নহে, সুতরাং আচার্য্য রামানুজ সম্মত অর্থে প্রশ্নাতিরিক্ত উত্তর প্রদানরূপ একটী দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, এটী যে একটী মহাদোষ। তাহার পর দেখ আরও দোষ আছে। "যস্তদ্ বেদ যৎ স বেদ" ইহার অর্থ "যে রৈক সেই ব্রহ্মকে জানে, যে ব্রহ্ম সেই রৈক জানে" এরূপ করিলে উভয় বাক্যেরই কর্ত্তা ও কর্ম্ম অথবা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, আর তাহা না হইলে দুইটী বাক্যের প্রয়োজন কি? একটী বাক্যের দ্বারাই ত সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। উভয় স্থলেই কর্ত্তা রৈক এবং কর্ম্ম—ব্রহ্ম, উভয় স্থলেই উদ্দেশ্য রৈক এবং বিধেয় ব্রহ্ম জানা, সুতরাং নিরর্থক এক কথা দুইবার কথিত ইহা কেন স্বীকার করিব? তাহার পর এতদ্ শব্দে শঙ্কর মতের অর্থ "এইরূপ" কিন্তু রামানুজ মতে ইহার অর্থ "এই রৈকবেদ্য ব্রহ্ম।" এখন এই অর্থে "যৎ" শব্দের দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে "এতদ্" শব্দের দ্বারা তাহাকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ যৎ পদের সঙ্গে এতৎ পদের সম্বন্ধ স্থাপন করা হইতেছে। কিন্তু ভাব দেখি যদি রৈক ও ব্রহ্ম উভয়ই বক্তব্য বিষয় হয় তাহা হইলে "স ময়া এতদ্ উক্ত" এরূপ বলা অপেক্ষা "স এতৎ চ ময়া উক্ত" এইরূপ হওয়া কি সঙ্গত নহে। যদি বল অন্বয় পদ্ধতি অনুসারে "ময়া" শব্দের পূর্ব্বে এতদ্ শব্দটী বসাইতে পারা যায়, তাহা হইলেও কি আবার "চ" শব্দের আবশ্যক হয় না? বল দেখি এই "চ" শব্দের জন্য আচার্য্য রামানুজ সম্মত অর্থ কি দুষ্ট হইতেছে না? আমরা যেমন পূর্ব্বে অভিসমেতি ক্রিয়া উহ্য করিয়াছিলাম তোমরাও এখানে

তদ্রূপ "চ" এবং "উভয়" শব্দ উহ্য করিলে। আমাদের অভিসমেতি পদ বাক্য মধ্যেই আছে তোমাদের তাহা তথায় নাই। তাহার পর দেখ তুমি "যৎ" ও "তৎ"কে ব্রহ্ম বলিয়া এক করিয়া "এতদ্" শব্দের দ্বারা "যৎ" ও "তদের" নিজ সম্বন্ধকে রক্ষা করিতেছ, কিন্তু আমাদের মতে তাহা করিতে হয় না, 'যৎ'পদের সহিত 'তৎ'পদেরই সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। কারণ আমরা বলি "সে যাহা জানে তাহা যে জানে তাহারও সেই ফললাভ হয়"। বল দেখি যৎপদের সহিত তৎপদেব সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ কি এতৎপদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ? সুতরাং এ পথেও আমাদের অর্থই কি ভাল হইল না? তাহার পর শেষ কথা—উপনিষদে এরূপ স্থলে দেখা যায় একজনের কথা বলিয়া. তদবলম্বনে অপব সাধারণেরও সেই ফল হয় বলিয়া অপরের মনে একটা রুচি উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়। যেমন "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" বলিয়া "ভাতি চ তপতি চ য এবং বেদ" এইরূপ কথা আছে। অনেকেই জানেন এইরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদের প্রায় প্রতি পত্রে আছে, সুতরাং অভিসমেতি ক্রিয়া উহ্য না করিয়া আচার্য্য রামানুজ মতে অর্থ করিলে উপনিষদের এই প্রথাটি ভঙ্গ হইয়া গেল সুতরাং বল দেখি কোন্ অর্থটী ভাল? যাহা হউক আর কথা বৃদ্ধি করিয়া কাজ নাই। চারিদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে আচার্য্য শঙ্করের অর্থই ভাল বোধ হইবে অর্থাৎ রৈক্ক যে পর-ব্রহ্মজ্ঞানী তাহা প্রমাণ হয় না। আর যদি বল রৈক্কের অনুষ্ঠীয়-মান ধর্ম্ম বা সাধন যখন সম্বর্গ বিদ্যা অর্থাৎ যখন এই বিদ্যার বিষয় বায়ুতে সম্বর্গ দৃষ্টি করা এবং যখন সম্বর্গ শব্দের অর্থ সর্ব্বলয়সাধক পদার্থ, তখন ইহাতে প্রকারান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানেরই কথা উপদিষ্ট হইতেছে বলিতে হইবে। সুতরাং আচার্য্য রামানুজ মতে যৎ ও তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম করিলে ক্ষতি নাই।—তাহা হইলে বলিব যে এস্থলে এই ব্রহ্মদৃষ্টির লক্ষ্য মুখ্য ব্রহ্ম নহে পরন্তু গৌণ ব্রহ্ম, কারণ সম্বর্গ শব্দের অর্থ সর্ব্বলয়ের আশ্রয়। ইহা হইতে পূর্ণ ব্রহ্মভাব উদিত হইবেই এমন কোন নিয়ম নাই। দেখ, সর্ব্বলয়াশ্রয় কোন জড় পদার্থও হইতে পারে, এস্থলে বায়ুর কথা হইতেছে, সুতরাং সর্ব্ব শব্দ বায়ুকে লইয়া বুঝাইতে পারে না। সুতরাং

ব্রহ্ম সর্ব্বলয়াশ্রয় অথচ জ্ঞানস্বরূপ, আত্মস্বরূপ, এরূপ কথা বলা আবশ্যক হইতেছে, এজন্য সম্বর্গপদ হইতে পূর্ণব্রহ্ম পাওয়া যায় না। যদি বল সর্ব্বলয়াশ্রয় বলিলে ব্রহ্মবুদ্ধির উদ্রেক হওয়াই উচিত, কারণ ব্রহ্মই তজ্জন্য প্রসিদ্ধ, তাহা হইলে বলিব—এস্থলে বায়ুকে সর্ব্বলয়াশ্রয় বলিয়া ভাবিতে বলা হইতেছে, সুতরাং বায়ুকে ছাড়িয়া ব্রহ্মে সর্ব্বলয়াশ্রয় বুদ্ধি কি করিয়া উদিত হইবে? বায়ুতে এই বুদ্ধি উদিত হইলে বায়ুর ধর্ম্ম ও সর্ব্বলয়াশ্রয়ত্ব ধর্ম্ম একত্র মিশ্রিত হইবে, কিন্তু যেহেতু বায়ুর ধর্ম্ম জ্ঞানস্বরূপতা বা প্রকাশস্বরূপতা নহে সেই হেতু এ উপায়ে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে। অধিক কি বিবেচনা করিয়া দেখ এই বিদ্যার ফল যখন সর্ব্বদিকে অন্ন দেখিতে পাওয়া এবং স্বয়ং অন্নভোক্তা হওয়া, তখন এ বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মলাভ করাও দুরাশা অথবা শ্রুতির অভিপ্রায়ও নহে বলিতে হইবে। এইজন্য বলি এস্থলে রৈক্কের জ্ঞান প্রকৃত পরব্রহ্মজ্ঞান নহে। আচার্য্য রামানুজমতে রৈক্কের জ্ঞানকে পরব্রহ্মজ্ঞান বলায় শ্রুতির অর্থ বিকৃত করা হইয়াছে এবং রৈক্কের স্তুতিবাদ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই শ্রুতি অবলম্বনে বেদান্তে বেদন শব্দের অর্থ—উপাসনা আর তজ্জন্য বেদান্তে উপাসনা বিহিত এবং জ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই একথা বলা অসঙ্গত হইতেছে।

আর যদি উক্ত দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়া আচার্য্য রামানুজসম্মত অর্থ রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলেও আমরা দেখাইতে পারি যে, এ শ্রুতির দ্বারা আচার্য্য রামানুজের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। দেখ, তোমরা চাহ এই শ্রুতিতে রৈক্ককে প্রকৃত পর-ব্রহ্মজ্ঞানী প্রমাণ করিয়া রৈক্কের জ্ঞানটীকে উপাসনাত্মক জ্ঞান বলিবে, কারণ এখানে "যস্তদ্বেদ" বাক্যের বেদনাখ্য জ্ঞানের সহিত "অনু মে ভগবো শাধি যাং দেবতা উপাস্সে" এই বাক্যের উপাসনার উপক্রম উপসংহার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে আমরা বলিব—না তাহাও হইতে পারে না। কারণ রৈক্কের জ্ঞানকে যদি প্রকৃত পরব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞানের সহিত উক্ত উপাসনার উপক্রমোপ-সংহার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। ইহার কারণ এই জ্ঞান রৈক্কের সিদ্ধির

সহিত পঠিত এবং যে উপাসনার কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তাহা তাহার সাধন হইয়া যাইবে! দেখ জনমণ্ডলীর যাবৎ সাধুকার্য্যের ফল রৈক্ককে আশ্রয় করিয়াছে বলিলে কি রৈক্কের সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করা হইল না, এবং তদ্রূপ তিনি ব্রহ্ম জানেন একথাও ঐ সঙ্গে বলায় এই ব্রহ্মজ্ঞানও কি সিদ্ধির শ্রেণীভুক্ত হইতেছে না? তাহার পর এই সিদ্ধির কথা শুনিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "মহাশয় আপনি কোন্ দেবতার উপাসনা করেন" তাহা হইলে এই উপাসনা ব্যাপারটী কি উক্ত সিদ্ধি সমূহের সাধন বলিয়া বোধ হয় না? যেহেতু এইরূপ প্রতীতি স্বাভাবিক সেই হেতু রৈক্কের জ্ঞানের সহিত রৈক্কের উপাসনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, আর এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হওয়ায়, কার্য্যরূপী রৈক্কের জ্ঞানের সহিত কারণরূপী রৈক্কের উপাসনার উপক্রমোপসংহার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং রৈক্ককে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিলেও এই শ্রুতির দ্বারা বেদান্তের বেদনাখ্য জ্ঞান উপাসনাপর একথা সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য বলি এই শ্রুতি বলে আচার্য্য শঙ্করের অর্থ দ্বারাও আচার্য্য রামানুজের মতটী থাকে না, আর তাঁহার টীকাকার সুদর্শনাচার্য্যের কথা ধরিয়াও আচার্য্যরামানুজমতটী সিদ্ধ হয় না।

এখন আমরা অবশিষ্ট পক্ষটী আলোচনা করিব। সে পক্ষটী এই — আচার্য্য রামানুজের পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে যে, হউক, রৈক্কর জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নহে, তাহাতে ক্ষতি নাই। পরন্তু এস্থলে যেমন বেদন অর্থ উপাসনা হইল, তদ্রূপ অন্য স্থলেও বেদান্তের বেদনাখ্যজ্ঞানকে উপাসনা বলা হইবে না কেন? যেমন যেখানে তত্ত্বমসি, সত্যজ্ঞানমনন্তং বাক্য আছে সে স্থলে ঐ বাক্যের দ্বারা যাহা জানান হইতেছে তাহা উপাসনার উদ্দেশ্যেই জানান হইয়াছে, জীব ও ব্রহ্ম এক ইহা জানাইবার জন্য নহে। তাহা হইলে বলিব, না, তাহা নহে। কারণ ব্রহ্মজ্ঞের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া নিষেধ করা হইয়াছে, যথা সে তখন কি দিয়া কি দেখিবে, কি দিয়া কি শুনিবে, ইত্যাদি। যখন দ্বৈতের ন্যায় হয় তখন একজন অপরকে দেখে ইত্যাদি। বেদান্তে জ্ঞান উপদিষ্ট না হইলে এই ক্রিয়ারহিত অবস্থা উপাসনা দ্বারায় কি করিয়া সম্ভব হইবে?

কারণ উপাসনা কর্ত্তৃতন্ত্র, কর্ত্তার ইচ্ছাধীন, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, বস্তুর সত্তাধীন। উপাসনাতে ধ্যাতৃধ্যানধ্যেয় ভাব থাকে, জ্ঞানে তাহাও বিলুপ্ত হয়। আর যদি বল উপাসনাতেও ঐ ভাব ধ্যেয় হইবে, তাহা হইলে বলিব তোমার উপাসনার অর্থ এইবার জ্ঞান হইয়া গেল, কিন্তু জ্ঞান বা বেদনের অর্থ উপাসনা আর হইল না। এরূপ হইলে তোমার সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। ফল কথা অদ্বৈতবোধক অন্য যাবৎ শ্রুতির অন্যথা ব্যাখ্যা সম্ভব কিন্তু এরূপ শ্রুতির অন্যথা ব্যাখ্যা অসম্ভব। সুতরাং বেদান্তের বেদনাখ্য জ্ঞান শব্দে সর্ব্বত্র উপাসনা বুঝিতে হইবে আচার্য্য রামানুজ মতে একথা স্বীকার করা যায় না। তবে এখানে একটা কথা বলা চলে যে তোমরা ব্রহ্মের পরাপর ভেদ মান না—কিন্তু তদুত্তরে আমরাও অনেক কথা বলিতে জানি তাহা এখন থাকুক, যথাস্থানে হইবে।

এতদূরে আসিয়া দেখা গেল আচার্য্য রামানুজ বেদান্তের বেদনকে উপাসনা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য যে তিনটী শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহারা কেহই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করে না। তাঁহার প্রথম শ্রুতিটী "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্ম-বর্চ্চসেন"। ছান্দোগ্য ৩।১৮।৩

ইহাতে আমরা দেখিয়াছি ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গই নহে, তাঁহার দ্বিতীয় শ্রুতিটী এই—"ন স বেদ অকৃৎস্নোহি এষ, আত্মেত্যেবোপাসীত।" বৃহদারণ্যক ১।৪।৭

ইহাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, ইহার বেদনের সহিত উপক্রমোপ-সংহার সম্বন্ধই নাই, এবং তাঁহার এই প্রবন্ধে বিচারিত তৃতীয় শ্রুতিটী হইতেও দেখা গেল, ইহাও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকরণ নহে। এতদর্থে উদ্বোধন আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। সুতরাং আচার্য্য রামানুজের এ প্রয়াসটী বৃথা হইয়া পড়িল।

অধিক কি, আচার্য্য রামানুজের উদ্ধৃত এই তিনটী শ্রুতির একটী শ্রুতিও তাঁহার নিজের পরিশ্রমের ফল নহে। এগুলি আচার্য্য শঙ্কর নিজ গ্রন্থে বিচার করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যথা

আচার্য্য রামানুজের প্রথম ও তৃতীয় শ্রুতিদ্বয় আচার্য্য শঙ্করের সূত্রভাষ্য ৪।১।১ সূত্রে দেখা যায় এবং দ্বিতীয় শ্রুতিটী বৃহদারণ্যকভাষ্যে বিচারিত হইয়াছে। এই বিচারগুলি পড়িলে দেখা যায় আচার্য্য রামানুজ যেন আচার্য্য শঙ্করের কথাগুলি পর্য্যন্ত লইয়া ফেলিয়াছেন এবং তিনি নূতন কথা কিছু বলেন নাই। নিম্নে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে একটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রুতিসম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের বাক্য যথা,— বিদ্যুপাস্ত্যোশ্চ বেদান্তেষব্যতিকরেণ প্রয়োগো দৃশ্যতে। ক্বচিদ্ বিদিনোপক্রম্যোপাস্তিনোপসংহরতি যথা "যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত" ইত্যত্র "অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাম্ উপাস্স" ইতি, ক্বচিৎ চ উপাস্তিনোপক্রম্য বিদিনোপসংহরতি যথা "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যত্র "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ" ইতি। ৪।১।১

অর্থাৎ বেদন ও উপাসনায় বেদান্তে অব্যতিকরপূর্ব্বক প্রয়োগ দেখা যায়। কোথাও বেদনের উপক্রম করিয়া উপাসনায় উপসংহার করা হইয়াছে যথা "যস্তদ্ বেদ, যৎ স বেদ স ময়ৈতদ্ উক্তঃ" এস্থলে "অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাং উপাস্স" ইত্যাদি (বাক্য দেখা যায়), এবং কোথাও উপাসনার দ্বারা উপক্রম করিয়া বেদনদ্বারা উপসংহার করা হয়, যথা "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" এস্থলে "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ" ইত্যাদি (বাক্য দেখা যায়)।

আর এই প্রসঙ্গ আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্যে কি ভাবে আছে দেখ,—বিদ্যুপাস্ত্যোর্ব্যতিকরেণ উপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যত্র "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ"। "ন স বেদ অকৃৎস্নো হ্যেষ, আত্মেত্যেবোপাসীত। যস্তদ বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদ্ উক্ত" ইত্যত্র "অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাম্ উপাস্স" ইতি।

অর্থাৎ বেদন ও উপাসনার ব্যতিকরপূর্ব্বক প্রয়োগ দেখা যায়

বলিয়া "যথা—মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" স্থলে "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ (তৎপরে) ন স বেদ অকৃৎস্নো হ্যেষ আত্মেত্যেবোপাসীত," (এবং তৎপরে) "যস্তদ্ বেদ, যৎ সবেদ, সময়ৈতদুক্তঃ" এস্থলে "অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতাং উপাস্স" (এইরূপ আছে)।

এস্থলে উভয়ের উদ্ধৃত শ্রুতির অংশগুলি, এবং "বিদ্যুপাস্ত্যোঃ" ও "ব্যতিকর" পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। "ন স বেদ অকৃৎস্নো হ্যেষ আত্মেত্যেবোপাসীত" শ্রুতিটী বৃহদারণ্যকভাষ্যে আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধার করিলাম না।

এজন্য মনে হয় আচার্য্য শঙ্করকৃত অর্থই প্রাচীনসম্মত এবং তাহাই শ্রদ্ধেয়।

কিন্তু ইহাতে একটা কথা আচার্য্য রামানুজের পক্ষে অনুকূল হইতেছে যে আচার্য্য শঙ্কর নিজ গ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষরূপে যে বৃত্তিকারের মত খণ্ডন করিয়াছেন আচার্য্য রামানুজ তাহাই যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্বারা আচার্য্য রামানুজের মত যে বৃত্তিকারের সম্মত তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই গুণ-কীর্ত্তনের সঙ্গে আবার অন্য কথাও আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা এই যে, আচার্য্য রামানুজ অনেক স্থলে শঙ্করোক্ত বৃত্তিকারের মত এবং অনেক স্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে আচার্য্য শঙ্কর বৃত্তিকারের মতের কোন উল্লেখ করেন নাই সেখানেও মধ্যে মধ্যে আচার্য্য রামানুজ, শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে পৃথক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথাস্থলে আমরা এসব কথা যথারীতি প্রমাণ করিব। যাহা হউক এতদ্বারা এই সিদ্ধ হয় যে, হয় আচার্য্য শঙ্কর অনেক স্থলে বৃত্তিকারের মত উল্লেখ করেন নাই, আর না হয়, আচার্য্য রামানুজ অনেক স্থলে নিজের কথা বা শোনা কথাকে বৃত্তিকারের মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু যে শঙ্কর নিজ গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত মতভেদ স্থলে বৃত্তিকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তিনি যে, স্থলে স্থলে বৃত্তিকারের মত গোপনে রাখিবেন তাহা বোধ হয় না। অবশ্য একথা

একদিন ভাবিতে পারা যাইত যদি কোথাও আচার্য্য রামানুজ আচার্য্য শঙ্করের এইরূপ ব্যবহারের নিদর্শন দেখাইতে পারিতেন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন যে, আচার্য্য শঙ্কর সর্ব্বত্রই বৃত্তিকারের মত অনুসরণ করিয়াছেন এবং মতভেদস্থলে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। অধিক কি, আচার্য্য রামানুজ যে বৃত্তিকারের বৃত্তিগ্রন্থখানি আদৌ চক্ষে দেখেন নাই তাহা তাঁহার জীবনী ও শ্রীভাষ্য দেখিলেই বুঝা যায়। তিনি ভাষ্যপ্রারম্ভে স্পষ্টই বলিয়াছেন "ভগবদ্ বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।" অর্থাৎ ভগবদ্‌বোধায়ন কৃত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি পূর্ব্বাচার্য্যগণ সংক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, সেই মতানুসারে সূত্রাক্ষর-সমূহ ব্যাখ্যাত হইতেছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আচার্য্য-রামানুজ সর্ব্বত্র বৃত্তিকারের মত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। এবং তজ্জন্য আচার্য্য শঙ্করের অর্থই শ্রদ্ধেয়।

আচার্য্য রামানুজ যে বৃত্তিকারের মত সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার মত যে সম্যক অবগত নহেন তাহার একটী নিদর্শনও বেশ পাওয়া যায়। আমরা শ্রীভাষ্যের যেস্থানটী বিচার করিতেছি ইহার একটু পরেই দেখা যায় আচার্য্য রামানুজ একটী স্থলে বাক্যকারের মত উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু বৃত্তিকারের কথা উদ্ধৃত করেন নাই। যিনি বৃত্তিকারের মত লইয়া ব্যাখ্যা ব্যাপারে এত আড়ম্বর করিতেছেন, তিনি এস্থলে বৃত্তিকারকে ছাড়িয়া এক অপ্রসিদ্ধ এবং পরবর্ত্তী বাক্যকারের মত উদ্ধৃত করিলেন ইহা কি তাঁহার পক্ষে বৃত্তিকারের মতের অনুসরণের পরিচয়? বাক্য-কারের গ্রন্থ আজ বিলুপ্ত; কেহ বলে তিনি ভর্তৃহরি, কেহ বলে তিনি দ্রমিড়াচার্য্য, কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা তাহা নির্ণয়ের উপায় এখনও পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ফলতঃ তিনি যে বৃত্তিকারের মত বৃত্তিকারের গ্রন্থ হইতে অবগত হন নাই এবং সে অবগতিও সম্যক নহে তাহাতে বড় বেশী সন্দেহ হয় না।

যাহা হউক শ্রীভাষ্যের লঘুসিদ্ধান্ত পক্ষে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় বাদ

প্রমাণের জন্য আচার্য্য রামানুজ যে, বেদান্তে উপাসনাখ্যজ্ঞান বিহিত বলিয়াছেন, এবং তাহার জন্য তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণের সারবত্তা যে কতদূর তাহা এতক্ষণে এক প্রকার সমালোচিত হইল। ইহার পরই তিনি এতৎসংক্রান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অদ্বৈতবাদখণ্ডনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না, পরন্তু স্বমতস্থাপনপ্রবৃত্তিই পরিলক্ষিত হয়। অদ্বৈতবাদীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার উত্থাপিত অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধে আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি মাত্র, তাঁহার মত খণ্ডনে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং আমরা ঐ অংশের বিরুদ্ধে কিছু বলিব না; পরন্তু পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাহার যুক্তির শৃঙ্খলা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা স্থলে স্থলে অদ্বৈত মতের সিদ্ধান্তগুলির তুলনা করিব মাত্র। সুতরাং এস্থলে আমরা আমাদের আলোচিত বিষয়েব একটী সংক্ষিপ্ত সারসংকলন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

অদ্বৈতবাদী বলেন মুক্তির কারণ বেদান্তোক্ত বেদনাখ্য জ্ঞান। বেদান্তোক্ত উপাসনাখ্য জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, পবন্তু তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয় বলিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্মেরও মুক্তিপ্রদানে সামর্থ্য নাই পরন্তু উহাও উপাসনার ন্যায় পরম্পরা সম্বন্ধে কারণপদবাচ্য হয়।

রামানুজাচার্য্য বলেন—মুক্তির কারণ বেদান্তোক্ত উপাসনাখ্যজ্ঞান এবং বেদোক্তকর্ম্ম উভয়ই মিলিত হইয়া হয়। বেদান্তোক্ত বেদনাখ্য জ্ঞান ও উপাসনাখ্য জ্ঞান পৃথক্ নহে এবং বেদান্তে বেদনাখ্যজ্ঞান বলিয়া পৃথক্ কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রথম—বেদান্তোক্ত উপাসনাখ্যজ্ঞান এবং বেদোক্ত কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া মুক্তির কারণ হয় না, পরন্তু চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় মাত্র, চিত্তশুদ্ধি না হইলেও বেদান্তোক্ত বেদনাখ্য জ্ঞান জন্মে, কিন্তু তাহার প্রকাশ বা উহা অপরোক্ষ হয় না। দ্বিতীয়—বেদান্তে বেদনাখ্য জ্ঞানের বহুস্থল আছে। এসব স্থলের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। রামানুজাচার্য্য বলেন—যদিই ঐ জ্ঞান বেদান্তে আছে

বলিয়া স্বীকার করা ন্যায় তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের প্রকাশের জন্য উপাসনাদি আবশ্যক, সুতরাং জ্ঞানের সহিত উপাসনার সংমিশ্রন ঘটিল, এবং উপাসনার সহিত কর্ম্মের সংমিশ্রন অদ্বৈতবাদীর মতেও আবশ্যক বলিয়া জ্ঞানের সহিত কর্ম্মেরও সংমিশ্রণ অনিবার্য্য হইল। অগত্যা জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ সিদ্ধ হইল।

অদ্বৈতবাদী বলেন—ঐ জ্ঞানের প্রকাশের জন্য ধ্যানাদি জ্ঞানপ্রকাশ-সহায়ক অনুষ্ঠান মাত্র আবশ্যক।

রামানুজাচার্য্য বলেন—ঐ ধ্যানই তাঁহাদের মতে উপাসনা।

অদ্বৈতবাদী বলেন—ঐ ধ্যান ও উপাসনা সর্ব্বত্র এক জিনিস নহে। এজন্য উহাকে উপাসনা বলা হয় না। স্থলবিশেষে উপাসনা শব্দে ঐ ধ্যানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এজন্য স্থলবিশেষে এ কথা স্বীকার্য্য, সর্ব্বত্র নহে। যদি প্রতিপক্ষ উপাসনা শব্দে ধ্যান ভিন্ন আব কিছু না গ্রহণ করেন তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর তাহাতে আপত্তি নাই।

রামানুজাচার্য্য বলেন—জ্ঞানের প্রকাশেব জন্য ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে তাঁহাব পক্ষে কর্ম্মাদি সবই আবশ্যক হইবে, সুতরাং জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সংমিশ্রণ অনিবার্য্য।

অদ্বৈতবাদী বলেন—ধ্যানীর জীবনযাত্রানির্ব্বাহ প্রাবব্ধ কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে, তজ্জন্য যে কর্ম্ম আবশ্যক তাহা সে শাস্ত্রীয় বৈধকর্ম্ম বলিয়া করে না। প্রাবব্ধ অনুসারে বৈধকর্ম্ম করিলে তাহার হেতু শাস্ত্রীয় বিধি নহে, পরন্তু তাহা প্রারব্ধ হইয়া থাকে। অধিকন্তু তাহার ধ্যানের যাহা বিষয় তাহাতে কর্ত্তৃত্বজ্ঞানেব বিলোপই সাধন করিয়া থাকে সুতরাং সে ধ্যান নামক জ্ঞানানুষ্ঠানের সহিত কর্ম্মের সংমিশ্রণ ঘটে না।

রামানুজাচার্য্য বলেন—যাহারা প্রারব্ধ অনুসারে শাস্ত্রীয় বিধি মানিয়া কর্ম্ম কবে তবে তাহাদের পক্ষে জ্ঞানকর্ম্মের সংমিশ্রণ স্বীকার করিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদী বলেন—এরূপ ব্যক্তি ধ্যানের অধিকারী হয় নাই,

ইহাদিগের মনন পর্য্যন্ত অধিকার স্বীকার করা হয়। ধ্যান বা নিদিধ্যাসন-অভ্যাসীর অধিকার অতি উচ্চ বুঝিতে হইবে।

রামানুজাচার্য্য বলেন—জ্ঞান যখন মানসিক ক্রিয়া এবং উপাসনাও যখন তাহাই, তখন আবাব উহাদের ভেদ স্বীকার করা কেন ?

অদ্বৈতবাদী বলেন—জ্ঞানক্রিয়া বস্তুর স্বরূপের অধীন, উপাসনা কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন। সুতরাং ভেদ আছে।

রামানুজাচার্য্য বলেন—জ্ঞানকে স্থায়ী করিবার জন্য যখন ধ্যান প্রয়োজন, তখন সে ধ্যানও ত কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানানুষ্ঠানের যাহা উপায় তাহাব সহিত উপাসনাব কোন ভেদ থাকিল না, অগত্যা জ্ঞানের সহিত আবার উপাসনার সংমিশ্রণ হইল এবং উপাসনার সহিত কর্ম্মের সংমিশ্রণ উভয় পক্ষেই স্বীকার করা হয় বলিয়া জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ সিদ্ধ হইল।

অদ্বৈতবাদী বলেন—ঐ ধ্যান কর্ত্তার ইচ্ছাধীন হইলেও উপাসনার ন্যায় কর্ত্তার ইচ্ছাধীন নহে। একটা ঘটকে ঘট বলিয়া জানিয়া "ঘট" "ঘট" ধ্যান করিলে যেরূপ হয়, একটা ঘটকে পট বলিয়া ধ্যান করিতে থাকিলে কি একরূপ কার্য্য করা হয় ? একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক—মনকে ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করা, আর ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করা উভয়ই উপাসনা, কিন্তু প্রথমটা যতটা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন, শেষটা ততটা নহে। কারণ মন প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নহে, কিন্তু ব্রহ্ম—ব্রহ্মই বটে। লোকে ঘটকে ঘট বলিতে বাধ্য হয় কিন্তু পট বলিতে বাধ্য হয় না। সুতরাং মানসিক ক্রিয়া-অংশে ধ্যান, জ্ঞান ও উপাসনা এক হইলেও ভেদ আছে।

রামানুজাচার্য্য বলেন—বেদান্ত যখন বেদের অংশ, এবং বেদান্তে যখন উপাসনা ও জ্ঞান উভয়ই কথিত হইয়াছে এবং বেদান্ত ভিন্ন অংশে যখন কর্ম্ম বিহিত রহিয়াছে তখন একজনের পক্ষে এই তিনটিই প্রয়োজন হইবার কথা।

অদ্বৈতবাদী বলেন—উহা একজনের পক্ষে একই কালে প্রয়োজন হয় না। অধিকারীর উন্নতির মাত্রা অনুসারে প্রয়োজন ভেদ হয়।

প্রতিবাদী, বেদ বেদান্ত হইতে এমন প্রমাণ দেখাইতে পারেন না যে উহা একজন অধিকারীর পক্ষে একই কালে প্রয়োজন, অন্যথা গতি নাই। পক্ষান্তরে আমরা তাহা দেখাইতে পারি। (ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য।)

রামানুজাচার্য্য বলেন—বেদান্তে যখন ধ্যান এবং উপাসনা এই উভয়েরই বিধি রহিয়াছে, তখন উহারা একজাতীয়, উহাদের মধ্যে ভেদ কল্পনা বাহুল্য।

অদ্বৈতবাদী বলেন—ধ্যানের বিধি ও উপাসনার বিধি এক প্রকার বিধি নহে। ধ্যানের বিধির আবশ্যকতার হেতু সাধক নিজেই বুঝিতে পারে কিন্তু উপাসনার সময় সেরূপ ঘটে না। শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রথমটী নিয়ম বিধি, দ্বিতীয়টী অপূর্ব্ব বিধি।

রামানুজাচার্য্য বলেন—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ বেদান্তের অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাস ও জৈমিনি উভয়ে মিলিয়া কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা নামক এক মীমাংসা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদী বলেন—উভয়ে এক বেদের মীমাংসা করিযাছেন বলিয়া উহাঁরা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদের পক্ষপাতী তাহা প্রমাণিত হয় না। (বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)

রামানুজাচার্য্য বলেন—জ্ঞানকর্ম্মের মিলনে মুক্তি হওয়ায় মুক্তিতে কর্ম্মজন্যত্ব নিবন্ধন অনিত্যত্ব-আশঙ্কা হয়, এজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়-বাদীদিগের পথ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। পরন্তু জ্ঞানকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় মুক্তি হয়, বলিলে উক্তপ্রকারে মুক্তির অনিত্যত্ব-আশঙ্কা থাকে না। কারণ নিত্য ভগবানের কৃপায় ফল নিত্যই হয়।

অদ্বৈতবাদী বলেন—ভগবৎকৃপাই যদি মুক্তির হেতু হয় তাহা হইলে জীবের চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হইতে পারে না। আর চেষ্টার ফলে যদি মুক্তি হয় তাহা হইলে ভগবৎকৃপা হেতু হইতে পারে না। উভয়ের সংমিশ্রণ ও হেতু হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে এই সংমিশ্রনের নিয়ামক তৃতীয় কর্ত্তা আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে ব্যাসদেবই ভগবৎ-

কৃপাকে প্রাবৃটের পর্জ্জন্যস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এ নূতন পথ পথই নহে।

পরিশেষে অদ্বৈতবাদী বলেন বেদান্তোক্ত বেদনাখ্য জ্ঞানে যখন জীবের কর্ত্তৃত্বের বিলোপসাধন করে তখন তাহার সহিত কর্ত্তৃত্বজ্ঞান মূলক উপাসনা বা কর্ম্মের কোন প্রকার সংমিশ্রণ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে রামানুজাচার্য্য বলেন—জীবের কর্ত্তৃত্বজ্ঞান বিলোপ-সাধনের অযোগ্য, জীব নিত্য ও ঈশ্বর নিযোজ্য; সুতরাং তাহার অনুকূল কর্ত্তৃত্বও নিত্য। কিন্তু এ বিষয়টী এ প্রসঙ্গের কথা নহে বলিয়া রামানুজাচার্য্য নিজ শ্রীভাষ্যের মহাসিদ্ধান্ত পক্ষ নামক প্রকরণে বিচার করিতে করিতে অদ্বৈত মত খণ্ডন করিবেন। সুতরাং আমরাও অদ্বৈতবাদীর পক্ষ হইতে যথাস্থানে এসব কথার উত্তর দিব। লঘু সিদ্ধান্তপক্ষে উভয় পক্ষের বিচারের বিষয়গুলির সূত্র এইরূপ।

ফল কথা ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রটীর প্রথম পদ "অথ" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া আচার্য্য রামানুজ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ স্থাপনে প্রযত্ন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানকর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদ মতটী খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থির করিবেন। আচার্য্য রামানুজমতে অথ শব্দের অর্থ বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের জ্ঞানের অনন্তর, আচার্য্য শঙ্করমতে ইহা সাধন চতুষ্টয়ের অনন্তর। কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান থাকিলেও যদি সাধন চতুষ্টয় না থাকে তাহা হইলে সাধকের বেদান্তোক্ত জ্ঞান হৃদয়ে বিকশিত হইবে না, পক্ষান্তরে সাধন চতুষ্টয় থাকিলে কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান না থাকিলেও তাহা সম্ভব, থাকিলেও ক্ষতি নাই। এই সাধন চতুষ্টয় যথা, ১। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ২। বৈরাগ্য, ৩। শমদম উপরতিতিতীক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান নামক ষট্‌সম্পত্তি, এবং ৪। মুমুক্ষুত্ব। ইহাদের অর্থ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। শেষ কথা, অদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যের আপত্তিগুলি অকাট্য বলিয়া বিবেচনা করেন না।

কাশীতে শঙ্কর।

(৩)

বিশ্বনাথ দর্শনের পর যতীশ্বর শঙ্কর অন্নপূর্ণা দর্শন করিতে চলিলেন। সন্ন্যাসীদর্শনমানসে সমাগত জনমণ্ডলী মহাজনতা করিয়া মন্দিরের চারিদিকে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অন্নপূর্ণা দর্শনে আর কোন অসুবিধা হইল না। কারণ বিশ্বনাথের মন্দিরের পার্শ্বেই জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির এবং বিশ্বনাথের পুরোহিত স্বয়ংই তাঁহাকে অন্নপূর্ণা দর্শনের জন্য লইয়া যাইতেছেন। সকলেই নবাগত সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য উৎসুক, সন্ন্যাসীর মুখনিঃসৃত ভগবৎস্তোত্র তখনও অনেকের কর্ণকুহরে যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তাহারা তাই মকরন্দলোলুপ মধুকরের ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিল। তরণীসঞ্চালনে জলরাশির ন্যায় বিশ্বনাথের মন্দিরের জনতা আজি ভবসাগরতরণী শঙ্করকে বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। অনেকেই জনতামধ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইয়া বিরক্তচিত্তে ফিরিয়া গেল। আবার কেহ বা অতিকষ্টে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচার্য্যের দর্শনলাভে সমর্থ হইল। কিন্তু সন্ন্যাসীবেশ দেখিলেই কি সন্ন্যাসী দর্শন করা হয়, যাহার হৃদয়ে সে ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে তাহারই তাহা সম্ভব, অপরের নহে। এজন্য সকলেরই ভাগ্যে সন্ন্যাসী দর্শন ঘটিল না। সন্ন্যাসী-বেশ দেখিয়া কেহ কেহ মনে মনে তাঁহার পদধূলি লইল, কেহ বা ভাবিল সময়মত দেখা যাইবে, সন্ন্যাসী ঠাকুর ওষুধ বিষুধ কিছু জানে কিনা; আবার কেহ বা ভাবিল এক বালক সন্ন্যাসী দেখিবার জন্য এত ভীড়!

শিষ্যপরিবৃত শঙ্করকে লইয়া বিশ্বনাথের পুরোহিত দেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবীর পুরোহিত ইতিমধ্যেই জনতা দেখিয়া উদ্গ্রীব হইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিলেন, এক্ষণে বিশ্বনাথের পুরোহিত সঙ্গে এক সন্ন্যাসীকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ংই সেই জনসমাগম অপসারিত করিয়া দিলেন। শঙ্কর অনায়াসে মন্দির মধ্যে দেবীর পাদপদ্ম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

সদ্যপিঞ্জরমুক্ত-পক্ষীকুল যেমন উত্তরোত্তর সুমিষ্ট ফল আস্বাদনের নিমিত্ত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনকালে নিরতিশয় উৎফুল্ল হয়, গুণাতীত শঙ্করের উন্মুক্ত প্রবৃত্তি নিচয় বিশ্বনাথ দর্শনান্তে অন্নপূর্ণাদর্শনে আজ তদ্রূপভাব ধারণ করিয়াছে। শৈলশৃঙ্গসমাসীন ব্যক্তি জলধিবক্ষে অরুণোদয় দর্শনানন্তর পূর্ণশশীর দর্শন পাইলে যেমন পুলকিত হয়, আজ বিশ্বপিতা বিশ্বনাথ দর্শনানন্তর বিশ্বমাতা অন্নপূর্ণাদর্শনে যতিরাজের মনের সেই অবস্থা। অথবা বিদেশপ্রত্যাগত পুত্র পিতৃদর্শনান্তে জননীদর্শনে যেমন আনন্দে বিহ্বল হয় যতিরাজ শঙ্করের প্রবৃত্তি নিচয়েরও আজ সেই অবস্থা। তিনি আজ সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণ বৃত্তিব উল্লাস দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবৃত্তিনিচয় যেরূপে তাঁহাকে চালিত করিতেছে, তিনি কেবল তাহাই করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর দেবীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং নতজানু হইয়া কিয়ৎকাল দরবিগলিত নেত্রে দেবীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্কর একবার দেখিলেন বিশ্বজননী একহস্তে অন্নপূর্ণ পাত্র লইয়া অপর হস্তে বিশ্বসন্তানকে অন্নদানে উদ্যত। কখন দেখিলেন জননীর হৈমকান্তি আনন্দভাবে এতই সমুজ্জ্বল হইয়া ঢল ঢল করিতেছে, যে মায়ের মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কার প্রভৃতি তাহাব নিকট ম্লান হইয়া যাইতেছে। কখন দেখিলেন জননীর পদ্মপলাশ নয়ন হইতে যেন অপার করুণা রাশি বর্ষিত হইতেছে, কখন দেখিলেন মায়ের তাম্বুলরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠে এক অপূর্ব্ব স্মিত বিকসিত হইয়া সন্তানকে যেন অন্নগ্রহণের জন্য আহ্বান করিতেছে। শঙ্কর মায়ের অপূর্ব্বরূপ দেখিয়া যেন একেবারে বিভোর।

মায়ের এই অপূর্ব্ব অন্নদামূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে শঙ্করের মনে সহসা এক ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন "আচ্ছা, কাশীতে মায়ের এ মূর্ত্তি কেন? বিশ্বেশ্বরের নিকট জননীর এ প্রকার রূপ কেন? যেখানে সাধকহৃদয়ে স্থূলভে স্বরূপের প্রকাশ হয়, সে ক্ষেত্রে মা আমার কাশীশ্বরী না হইয়া অন্নপূর্ণা কেন হইলেন? যেখানে বিশ্বের ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া শিব বিশ্বেশ্বর হইয়াছেন সেখানে মা জগদ্ধাত্রী বা বিশ্বেশ্বরী

না হইয়া অন্নপূর্ণা হইলেন কেন?" উপযুক্ত সন্তান মায়ের অনুগত হইলে কি মায়ের মহিমা বুঝিতে তার বিলম্ব হয়? অমনি শঙ্করের দৃষ্টি মায়ের অন্নপূর্ণ পাত্রের উপর পড়িল। কে যেন শঙ্করকে বলিয়া দিল, "মা এখানে অন্নপূর্ণা কেন জান? মা দেখিলেন আমাদের পিতা নানারূপে নানাস্থানে সন্তানকে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেও সন্তানের অসামর্থ্য প্রযুক্ত তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, তাই মা আজ সন্তানের দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য বলের নিদান অন্ন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রুতিদেবী ঘোষণা করিয়াছেন অন্নই ব্রহ্ম, অন্ন হইতে সমস্ত জন্মে। বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, মেধা স্মৃতি বল, ধৃতি বল, যা কিছু বল, সবই অন্নের অধীন। তাই মা কাশীক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরের নিকট অন্য মূর্ত্তিতে না থাকিয়া অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। মায়ের দেওয়া অন্ন পবিত্র অন্ন। সে অন্ন খাইলে হৃদয় পবিত্র হইবে, বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে। তাই মা এখানে অন্নদামূর্ত্তিতে থাকিয়া সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছেন। ধন্য মায়ের কৃপা! মায়ের জিনিস মা না দিলে কাহার সাধ্য তাহা পায়, মুক্তি বল, জ্ঞান বল, ঐশ্বর্য্য বল সব তাঁহাদের জিনিস, তাঁহারা না দিলে, শুধু দেওয়া কেন, দিয়া রক্ষা করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত না দিলে, কে তাহা লইতে পারে, কাহারই বা তাহা স্থায়ী হইবে? তাই মা কাশীতে দয়াময়ী অন্নপূর্ণা, তাই মা কাশীতে সন্তানের সর্ব্বদুঃখহরা অন্নদা। শঙ্কর মায়ের মূর্ত্তিরহস্য বুঝিলেন, তিনি ভাবিলেন, মা তোমার অন্ন খাইয়া সকলের সকলই সম্ভব, কিন্তু মা আমি তোমার ভিখারী সন্তান! আমায় মা এমন দুমুঠা অন্ন দাও যাহাতে আমার জ্ঞান বৈরাগ্য হয়, যাহাতে মা তোমার চরণে আমার মতি অচলা হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কবিত্বপাথার উথলিয়া উঠিল, ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব স্তোত্রাকারে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী,
নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ১।

দেবি অন্নপূর্ণে! তুমি নিরন্তর সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ, স্বীয় হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছ, তুমি সৌন্দর্য্যের রত্নাকরস্বরূপ, তুমি ভক্তবৃন্দের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাক, তুমি সাক্ষাৎ মহেশ্বরী, তুমি হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছ? তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং তুমি অন্নপূর্ণেশ্বরী ও জগতের জননী, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষাপ্রদান কর ॥ ১ ॥

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ২ ॥

দেবি অন্নপূর্ণে! তুমি নানাপ্রকার বিচিত্র রত্নদ্বারা স্বীয় অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিয়াছ, তুমি স্বর্ণখচিত বসন পরিধান করিয়া মুক্তাময় হারদ্বারা কুচকুশল সুশোভিত করিয়াছ, তোমার সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম ও অগুরু অনুলিপ্ত করিয়া স্বীয় দেহের কান্তি বৃদ্ধি করিয়াছ। তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং তুমিই অন্নপূর্ণেশ্বরী ও জগতের মাতা; তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ ॥

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী.
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৩ ॥

দেবি! তুমি যোগিবৃন্দের আনন্দদাত্রী, ভক্তগণের শত্রুধ্বংসকরী, ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির আভাধারণকারিণী, ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্রী, ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছিতকরী ও ঐশ্বর্য্যদাত্রী। জননি! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের জননী, কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও ॥ ৩ ॥

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।

মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি কৈলাসপর্ব্বতের কন্দর মধ্যে স্বীয় আলয় স্থাপন করিয়াছ। মাতঃ! তুমিই গৌরী, তুমিই উমা, তুমিই শঙ্করী এবং তুমিই কৌমারীরূপ ধারণ করিয়াছ, তুমিই নিগমার্থ প্রকাশ করিয়াছ, তুমিই ওঙ্কার বীজস্বরূপা। দেবি! তুমি মোক্ষধামের দ্বারস্থ কপাট উদ্ঘাটন কর এবং তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের মাতা, জননি! তুমি আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা দাও ॥ ৪ ॥

দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥

দেবি! তুমি দৃশ্যাদৃশ্য অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জীবের আহার প্রদান করিতেছ, এই ব্রহ্মাণ্ড তোমারই জঠর মধ্যে নিহিত আছে, তোমারই লীলাতে সকল জীব নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, তুমিই বিজ্ঞানরূপ প্রদীপের অঙ্কুর স্বরূপ, তুমি শ্রীবিশ্বনাথের প্রীতি বর্দ্ধন কর। মাতঃ অন্নপূর্ণেশ্বরি! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা, তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

উর্ব্বীসর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী,
বেণীনীলসমানকুন্তলধরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি অবনীমণ্ডলস্থ জনসমূহের ঈশ্বরী, তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, তুমিই জগতের জননী, তুমিই সকলকে অন্ন প্রদান করিয়া থাক। তোমার নীলবর্ণ কুন্তলসকল বেণীরূপে শোভা পাইতেছে, তুমিই জীবগণের আনন্দবর্দ্ধন কর এবং তুমিই লোকের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া থাক। হে জননি! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৬ ॥

আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী,
কাশ্মীরা ত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরা শর্ব্বরী।
কামকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৭॥

দেবি! লোকে দীক্ষিত হইয়া যাহা কিছু শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা তুমিই বর্ণনা করিয়া উপদেশ প্রদান কর, তুমিই মহাদেবের ভাবত্রয় বিধান করিয়াছ, তুমি কুঙ্কুমবর্ণা, তুমিই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের ঈশ্বরীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমিই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন রূপে অবনীতলে প্রবাহিতা হইতেছ, নিত্যবস্তুসকলও তোমা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, তুমিই প্রলয়রাত্রিস্বরূপা। তুমিই পুরুষকে কামনাপ্রবণ কর এবং কামনাশালী পুরুষের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ফল প্রদান কর এবং তুমিই সকলের উন্নতি বিধান করিতেছ। তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের মাতা। হে মাতঃ! তুমি করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর॥ ৭॥

দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,
বামস্বাদুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৮॥

দেবি। তুমি সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র রত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছ, তুমি দক্ষরাজগৃহে তনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলে, তুমি একমাত্র জগতে সুন্দরী, তুমিই আপন সুন্দর সুস্বাদু পয়োধর প্রদান করিয়া জগতের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছ, তুমি সকলকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ, তুমি ভক্তসাধারণের অভীষ্ট প্রদান কর ও তাহাদের অবস্থার কল্যাণ সম্পাদন করিতেছ। মাতঃ অন্নপূর্ণে! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। ৮॥

চন্দ্রাকানলকোটিকোটিসদৃশী চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী,
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।

মালাপুস্তকপাশাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥

দেবি! তুমি কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভাশালিনী, তোমার অধর চন্দ্রাংশু এবং বিম্বের (তেলাকুচার) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তুমি চন্দ্রার্কের বর্ণ প্রদান করিয়াছ, তুমি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের ন্যায় ভাস্বর কুণ্ডলযুগল কর্ণে ধারণ করিয়াছ। জননি! তুমি চতুর্ভুজা, মালা, পুস্তক, পাশ, ও অঙ্কুশধারিণী, তুমি কাশীর অধীশ্বরী, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৯ ॥

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী,
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরশ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥

মাতঃ। তুমি ক্ষত্রিয়কুল পরিত্রাণ করিয়াছ, তুমিই সকলকে অভয় প্রদান কর, তুমি জীবগণের জননী, তুমি করুণার সাগরস্বরূপা, তুমি ভক্তবৃন্দকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাক, এবং নিরন্তর সকলের কল্যাণ বর্দ্ধন কর। জননি। তুমি বিশ্বেশ্বরেরও শ্রীবর্দ্ধন করিতেছ, তুমিই দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া তাহাকে রোদন করাইয়াছ, এবং তুমিই ভক্তগণের রোগসকল বিনাশ কর। হে অন্নপূর্ণে! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষাপ্রদান কর ॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি ॥ ১১ ॥

হে অন্নেপূর্ণে! তুমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণতুল্য প্রিয় পত্নী। হে পার্ব্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দান কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জ্জন দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারি আমার এই বাসনা পূর্ণ কর ॥ ১১ ॥

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥

পার্ব্বতীদেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা, শিবভক্তবৃন্দ আমার বান্ধব এবং ত্রিলোকই আমার স্বদেশ ॥ ১২ ॥

স্তোত্র সমাপ্ত হইল, শঙ্কর নিস্তব্ধ হইলেন, কিন্তু অশ্রুধারা তখনও থামিল না, তিনি যে অবস্থায় ছিলেন তদবস্থাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দ এই অদ্ভুতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ। আজ জনসাধারণ দেবীর মন্দিরে যাহা দেখিল তাহা আর কখন দেখে নাই।

দেবীর পুরোহিত প্রথমে এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন, তিনি শঙ্করের সম্মুখে পুষ্পপাত্র স্থাপিত করিয়া শঙ্করকে দেবীর পূজার জন্য অনুরোধ করিলেন। শঙ্করও মনের সাধ মিটাইয়া যথারীতি দেবীর পূজা সম্পাদন করিলেন। গুরুর অনুসরণ করিয়া শিষ্যগণও একে একে জগন্মাতার পূজা করিলেন। শিষ্যগণের পূজাশেষে শঙ্কর জননীকে পুনরায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং যথারীতি মন্দিরপ্রদক্ষিণ করিয়া ধীরে ধীরে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনতার কিয়দংশ কৌতূহলবশে কিয়দ্দূর শঙ্করের পশ্চাদগামী হইল। শিষ্যবৃন্দ যোগীবরের মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে তখন কালভৈরব দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। শঙ্করও তথাস্তু বলিয়া কালভৈরব দর্শনোদ্দেশে তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পথে যাইতে যাইতে শঙ্কর দেখিলেন কাশীধামে কুটিল ও সঙ্কীর্ণ রাজপথের অন্ত নাই। পথের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, পরিচ্ছন্ন, অপরিচ্ছন্ন, সজ্জিত, অসজ্জিত, পুরাতন, নূতন বিবিধ আকারের বিচিত্রতাপূর্ণ দেবালয় ও বাসভবনসমূহ। মধ্যে মধ্যে বিবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ বিপণিশ্রেণী নানাজাতীয় ক্রেতৃগণের কোলাহলে নগরীর শোভার বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও বা বালকের কমনীয় কণ্ঠের বেদগান, কোথাও ঘণ্টাধ্বনিবিমিশ্রিত হর হর বোম্ বোম্ রোল, কোথাও বা ভিক্ষুকের উচ্চকণ্ঠে কাতর প্রার্থনা, এবং কোথাও বা ফিরিওয়ালার চীৎকারধ্বনি সুদূর কেরল দেশবাসী যুবক সন্ন্যাসীর

চিত্তে মধ্যে মধ্যে এক অনন্যভূতপূর্ব্ব ভাব উৎপাদন করিতেছে। সংযমী শঙ্কর কিন্তু এ সমস্ত মায়ার খেলা মনে করিয়া মৃদুহাস্যে এ বৈচিত্র্যের বিচিত্রতা হরণ করিতেছেন।

ক্রমে শঙ্কর কালভৈরবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এ স্থানে জনসমাগম অপেক্ষাকৃত অল্প। শঙ্কর শিষ্যগণসহ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ কতিপয় সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে এক বালক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সকলেই বিস্মিতনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে অনেকেরই ইচ্ছা হইল তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইতিবৃত্ত কিছু জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদের কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শঙ্কর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমাগত জনসাধারণ সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে পথ প্রদান করিল। শঙ্কর নিজ আশ্রমোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবান কালভৈরবের পূজা করিলেন এবং কাশিকাপুরাধিনাথের শ্রীচরণে এই চিত্তোন্মাদকারী স্তব কুসুমাঞ্জলী প্রদান করিলেন।

দেবরাজসেব্যমানপাবনাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
ব্যালযজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্।
নারদাদিযোগিবৃন্দবন্দিতং দিগম্বরং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥ ১

সুররাজ ইন্দ্র যাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম সেবা করেন, যাঁহার গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত লম্বমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বজীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিগণ সর্ব্বদা যাঁহার বন্দনা করেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর দিগম্বর কালভৈরবকে ভজনা করি॥ ১॥

ভানুকোটিভাস্বরং ভবাব্ধিতারকং পরং
নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্।
কালকালমম্বুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥ ২

যিনি কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, যিনি সংসার সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করেন (যাঁহার সেবা করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে

হয় না), যিনি পরব্রহ্মস্বরূপী, যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলষিতার্থ প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতান্তেরও অন্তকস্বরূপ (যিনি ভক্তবৃন্দের যমভয় বিনাশ করেন), যাঁহার নেত্র পদ্মদলসদৃশ কিংবা চন্দ্র যাঁহার নয়নরূপে বিদ্যমান আছেন, যাঁহার করে অক্ষমালা ও শূল শোভা পাইতেছে, এবং যিনি জন্মমৃত্যুরহিত, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

শূলটঙ্কপাশদণ্ডপাণিমাদিকারণং
শ্যামকায়মাদিদেবমক্ষরং নিরাময়ম্।
ভীমবিক্রমম্প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৩

যাঁহার করে শূল, টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ) পাশ ও দণ্ড বিদ্যমান, যিনি জগতের আদি কারণ, যাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি ক্ষয়োদয়শূন্য, যিনি অবিনাশী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি অদ্ভুত নৃত্য করিতে ভালবাসেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং
ভক্তবৎসলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্।
নিক্কণন্মনোজ্ঞহেমকিঙ্কিনীলসৎকটিং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৪

যিনি স্বীয় ভক্তগণকে ইহকালে নানারূপ ভোগ করাইয়া অন্তিম সময়ে মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে প্রিয়জ্ঞান করেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর, যাঁহার কটিদেশ শব্দায়মান, সুন্দর, ক্ষুদ্র স্বর্ণঘন্টিকায় সমাবৃত, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মসেতুপালকং ত্বধর্ম্মমার্গনাশকং
কর্ম্মপাশমোচকং সুশর্ম্মদায়কং বিভুম্।
স্বর্ণবর্ণশেষপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৫

যিনি ধর্ম্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্ম্ম মার্গ দূর করিয়া দেন, যিনি ভক্তগণের কর্ম্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান করেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার সুবর্ণবর্ণ অঙ্গ নাগপাশে সমলঙ্কৃত আছে, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি॥ ৫॥

রত্নপাদুকাপ্রভাভিরামপাদযুগ্মকং
নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্।
মৃত্যুদর্পনাশনং করালদংষ্ট্রমোক্ষণং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥ ৬

যাঁহার চরণদ্বয় রত্নপাদুকার প্রভায় অতীব রমণীয় হইয়াছে, যিনি নিত্য (অনন্তকালস্থায়ী), যিনি অদ্বিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, যিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, যিনি কৃতান্তের দর্প হরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তগণকে করাল কালদশন হইতে মুক্তি দেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কাল-ভৈরবকে ভজনা করি॥ ৬॥

অট্টহাসভিন্নপদ্মজাণ্ডকোষসন্ততিং
দৃষ্টিপাতনষ্টপাপজালমুগ্রশাসনম্।
অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপালমালিকন্ধরং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥ ৭

যাঁহার অত্যুচ্চ হাস্যে ব্রহ্মাণ্ডকোষ ভগ্ন হয়, যাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রে পাতকরাশি দূরে পলায়ন করে, যাঁহার উগ্রশাসন সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, যিনি স্বীয় সেবককে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, যাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা বিরাজিত, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি॥ ৭॥

ভূতসঙ্ঘনায়কং বিশালকীর্ত্তিদায়কং
কাশিবাসিলোকপুণ্যপাপশোধকং বিভুম্।
নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥ ৮

যিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তগণকে অতুল কীর্ত্তি

প্রদান করেন এবং যিনি কাশীবাসিগণের পাপপুণ্য শোধণ করেন (কাশীবাসীদিগের পাপপুণ্য নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন), যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং
জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবর্দ্ধনম্।
শোকমোহদৈন্যলোভকোপতাপনাশনং
তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রিসন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥ ৯

যাঁহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই মনোহর কালভৈরবাষ্টক পাঠ করেন তাঁহাদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞান সঞ্চিত হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র পুণ্যরাশি প্রবর্দ্ধিত হয়, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ, কোপ এবং তাপ বিনাশ পায় এবং তাঁহারা কালভৈরবের পাদপদ্ম সন্নিধানে গমন করেন ॥ ৯ ॥

স্তোত্র সমাপ্ত করিয়া যোগীবর শঙ্কর ভগবান কালভৈরবচরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং সশিষ্যে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন। এদিকে মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। শিষ্যগণ সেদিনের মত যোগীবরকে দেবদর্শনে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যোগীশ্বর শঙ্কর শিষ্যগণের ইচ্ছায় সম্মতি প্রদান-পূর্ব্বক মণিকর্ণিকার নিকটবর্ত্তী একটী নির্ম্মল স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে গঙ্গাতীরে আসিয়া একটী বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলেন। কাশীতে যতদিন শঙ্কর অবস্থিতি করিয়াছিলেন এই বৃক্ষমূলই তাঁহার বাসভবন হইয়াছিল।

শঙ্কর উপবেশন করিলে শিষ্যগণ ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের ফিরিবার পূর্ব্বেই বিশ্বনাথের পুরোহিত যোগীবরের অন্বেষণ করিয়া বিশ্বনাথের প্রসাদ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বে শিষ্যগণ যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন বিশ্বনাথের পুরোহিত কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে প্রচুর আহার্য্য লইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কিন্তু যোগীবর ধ্যানস্থভাবে অবস্থান

করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটী বলিয়া উঠিলেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাম্ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
একান্ত অন্তরে চিন্তা করে যে আমার
আমিই বহন করি যোগ ক্ষেম তার॥

শ্রীমতী—

"কাশীপঞ্চক।"

(শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।)

১

দিবানিশি ব্যোম্ ব্যোম্, ধ্বনিছে প্রণব ওঁ,
মহান্ উদাত্ত স্বর বাজে চারিভিতে।
অবিমুক্ত বারাণসী, বেষ্টিতা 'বরুণা', 'অসি',
শোভিছে শিবের কাশী ওই অবনীতে।
শত শত ঋষি মুনি, শত শত মহাজ্ঞানী,
তপোরত, ধ্যানরত, প্রেমের আহ্বানে।
বেদ বেদান্তের পাঠ, ব'সেছে জ্ঞানের হাট,
বিশ্বের অজ্ঞান নষ্ট সে মঙ্গল গানে!
আঁখি মেলি দেখ চেয়ে, ছুটিছে পাগল হ'য়ে
বিশ্ববাসী নর নারী বারাণসী পানে।
সংসার বিলাস ভোগ, লালসার মহাযোগ
তুচ্ছ করি ধেয়ে আসে কি অজ্ঞাত টানে!
বদ্ধ জীব মুক্তি চায়, পিঞ্জরের পাখী প্রায়,
অহরহ ছুটাছুটি শিবত্বের আশে!
আনন্দ-কানন নামে গৌরীপীঠ মোক্ষধামে
প্রাণের অব্যক্ত টানে বিশ্ববাসী আসে!

২

চারি যুগ সম ভাবে বর্ত্তমান কেবা, কবে,
ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, চিন্ময়, অব্যয়!
কত রাজা, রাজ্য গেল, বিজেতা বিজিত হ'ল
চির পুরাতন কাশী নিত্য জ্যোতির্ম্ময়।
সেই সে প্রণব-ধ্বনি, ব্যোম্ ব্যোম্ রব শুনি
'হর', 'হর', 'শিব', 'শিব' প্রাণ সঞ্জীবন।
অশরীরী দেব কত, শূন্যে ভ্রমে অবিরত,
মানব-কল্যাণ তরে প্রেমে নিমগন!
নাই তৃষ্ণা, নাই ক্ষুধা, বিতরিছে প্রেম-সুধা,
অন্নদা দাঁড়ায়ে সদা অন্নদান করে!
কণিকা ভোজনে যার, ক্ষুধা নাহি রহে আর,
ভবক্ষুধা দূরে যায় চিরদিন তরে।
আনন্দ-কাননে তাই নিরানন্দ লেশ নাই,
সদা ভ্রমে সদানন্দ প্রেম-প্রেরণায়!
পশু পক্ষী কীট আদি নর নারী নিরবধি
প্রেমানন্দে বাস করে শিবের কৃপায়!

৩

যে দিকে ফিরাই আঁখি শত শত কীর্ত্তি দেখি
স্তূপীকৃত পুঞ্জীকৃত শোভে কীর্ত্তিরাশি!
কীর্ত্তির মেখলামালা পরিয়া ভুবনোজ্জ্বলা
ভাগীরথীবক্ষে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কাশী।
অযুত সোপানে ঘেরা, শোভে গঙ্গা মনোহরা,
লক্ষ লক্ষ লোক ধায় পূতবারি আশে!
পুণ্যতোয়ে ক'রে স্নান সন্ধ্যার বন্দনা গান
গাইছে ভকতগণ অনুরাগোল্লাসে!
স্বর্ণচূড় কোটী কোটী শ্রীমন্দির পরিপাটী
তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ নয়ন শোভন!

বাজে ঘণ্টা, বাজে শাঁখ, ডমরু ধ্বনিছে লাখ,
নিনাদিত মহারোলে অনন্ত গগন!
বিল্বদলে সাজি ভরা, ফুলমালা মনোহরা
ল'য়ে চলে নর নারী বিশ্বনাথ পাশে!
গঙ্গাধর শিরোপরি গঙ্গাবারি-পূর্ণ ঝারি
ঢালে অবিরত সবে জীবন্মুক্তি আশে!

৪

দূর অতীতের স্মৃতি, এখনো উজ্জ্বল অতি,
এখনো পাইবে চিহ্ন বৈদিক যুগের ;
প্রতি স্থানে, প্রতি ঘাটে, প্রতি কুণ্ডে, প্রতি মঠে
পুরাতন কীর্ত্তি গাঁথা আর্য্য-ঋষিদের।
এই সেই বারাণসী, যথা প্রজাপতি আসি
দশ-অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল সমাপন!
এই সেই পুণ্যভূমি যাহার শ্মশান চুমি
রাজা হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তি করিল অর্জ্জন।
কত শাস্ত্র, কত ভাষ্য, জ্ঞান ভক্তি সুরহস্য,
কত যে হইল সৃষ্টি কে পারে বর্ণিতে।
সনাতন ধর্ম্মধাত্রী, জ্ঞান ভক্তি মুক্তিদাত্রী,
কাশীর সমান পুরী নাই অবনীতে।
মণিকর্ণিকার ঘাটে সে মহা শ্মশানপাটে
এখনো গাইছে হর 'হরেকৃষ্ণ রাম'!
বদ্ধ জীব মুক্ত হয়, শিবেতে সাজুজ্য পায়
শুনিয়া দক্ষিণ কাণে রামকৃষ্ণ নাম!

৫

শঙ্কর শঙ্কর নামে এসেছিল এই ধামে,
উদ্ধারিতে বেদ-ধর্ম্ম, ব্রহ্মবিদ্যাধন।
যাঁর পূত মহিমায় নর ব্রহ্মজ্ঞান পায়
মহান্ অদ্বৈতবাদ হইল স্থাপন!

কহে সনাতন বেদ জীব শিবে নাই ভেদ,
সেই সে পরম জ্ঞান পাইল মানব!
কাশী ভিন্ন কোথা আর পাবে হেন সমাচার,
বেদসার পুরাতন 'তত্ত্বমসি' রব!
লভি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান হও জীব আগুয়ান
পরকে আপন জেনে কর আলিঙ্গন।
জীবন্মুক্তি তব ঠাঁই অন্য মুক্তি-কায নাই
'আত্ম-পর' 'পরব্রহ্মে' হউক মিলন!
এস আছ কে কোথায় জ্ঞানহীন জড়প্রায়,
লভ লভ মহাজ্ঞান কাশীর কল্যাণে!
ফেলে দাও মত যুক্তি, নিশ্চয় কৈবল্য মুক্তি,
পাবে তুমি মহানন্দে শিব-সন্নিধানে!

ভারতের সাধনা।

(১২)

শিক্ষাসমন্বয়।

গতবারের (একাদশ) প্রবন্ধে শিক্ষাসমন্বয়ের কথা শেষ হয় নাই, সেইজন্য এবারকার প্রবন্ধের শিরোনামা একরূপই রহিল।

গতবারের প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি, ভারতীয় শিক্ষার (culture এর) দৃষ্টিতে জড়জগৎ একটা বিরাট জড়যন্ত্রমাত্র নহে; ভারতীয় শিক্ষা স্থূলসূক্ষ্ম জড়কার্য্যসমষ্টির ভিতরে অব্যক্তকারণরূপিণী প্রকৃতির অধিষ্ঠান স্বীকার করে,—সে প্রকৃতি চিন্ময়ী, ভাববিলাসিনী, অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগম্যা। প্রকৃতি বা কার্য্যময় জগৎ ভারতীয় শিক্ষায়, পাশ্চাত্যশিক্ষার মত, একটা বিরাট জড়যন্ত্ররূপে গ্রাহ্য হয় না বলিয়া, ভারতীয় শিল্পবিজ্ঞানাদির গতি ও প্রকৃতি উভয়ই আলাদা। কিন্তু তথাপি কারণবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে না হউক, কার্য্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যশিক্ষার

সহিত ভারতীয় শিক্ষা একযোগে কার্য্য করিতে পারে, কেবল স্মরণ রাখিলেই হইল যে পাশ্চাত্য কার্য্যবিজ্ঞানে একটা sequence (কার্য্য-কারণ-পুট) এর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীকে কারণ বা cause বলিলেও, উহা প্রকৃতপক্ষে "নিমিত্তমপ্রযোজকং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"। (১০ম ও ১১শ প্রবন্ধ)।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষা জীবজগৎসম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য। পাশ্চাত্য জীবন-বিজ্ঞান (biology) আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় গুরুতর প্রভাব বিকীর্ণ করিতেছে। ইহার যেন একটী প্রান্তে বনিয়াদরূপে জড়বিজ্ঞান অবস্থিত, এবং অপরপ্রান্তে মনোবিজ্ঞান, চারিত্রবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাগুলি বিজৃম্ভিত হইতেছে। কিন্তু জড়বিজ্ঞান হইতে সুরু করিয়া, জীবনবিজ্ঞানের ভিতর দিয়া যতই অপর প্রান্তের বিদ্যাগুলির দিকে আমরা বেশী অগ্রসর হই, ততই ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের এলাকা অতিক্রম করিতে হয় এবং বিষয়ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। মনোবিজ্ঞানেও ঐন্দ্রিয় স্থূল প্রত্যক্ষ অপেক্ষা আন্তর প্রত্যক্ষ বা introspection এর প্রয়োজনই বেশী দেখা যায়। এই কারণে, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে ষোল আনা অবলম্বনরূপে লইতে পারে না বলিয়া, এই সমস্ত বিদ্যা পাশ্চাত্য শিক্ষা বা cultureএর অঙ্গভূষণ বটে, কিন্তু ঐ শিক্ষার উপর জড়বিজ্ঞানের মত অভিভাবকতা করিতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় জীব জীবের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করে, তাহা প্রকৃতভাবে বুঝিতে হইলে এই সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় লইলে চলিবে না; এ সমস্তের মধ্যে theory বা ফাঁকা মতামত প্রচুর মিলিবে, কিন্তু যে তত্ত্ব প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষিত পাশ্চাত্যদের মধ্যে জীবজগতের প্রতি প্রয়োগযোগ্য দৃষ্টি গড়িয়া দিতেছে, সে তত্ত্বের উদ্ভবস্থান অন্যত্র, সে তত্ত্ব রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্রের সংযোগে জন্মলাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্যে দিব্য তত্ত্বালোকে মানুষকে মানুষ চিনে নাই, অর্থাৎ সে দেশে আদিম যুগ হইতে সাধারণী শিক্ষার মূলে এমন কথা ধ্বনিত হয় নাই, যথা—যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং

ততো ন বিজুগুপ্সতে। * প্রাকৃত মানুষ মানুষকে চিনে ব্যবহারের খাতিরে, অর্থাৎ পরস্পর একটা আদানপ্রদান আছে বলিয়া। পাশ্চাত্যের আদিযুগে ঐরূপ প্রাকৃত মানুষ প্রাকৃতভাবেই মানুষকে চিনিয়াছিল, তত্ত্বজ্ঞ ঋষির দ্বারা কোনরূপ জীবনাদর্শের আলোক তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারক্ষেত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হইত না। জীবের সহিত জীবের ব্যবহার বলিতে নানা রকমের আদানপ্রদান বুঝায়, রজোগুণী স্বার্থান্ধ হইয়া এই আদানপ্রদানের মধ্যে "আদান", "আদায়" বা স্বাধিকারের উপর বেশী ঝোক দেয়, সত্ত্বগুণী "প্রদান", "ত্যাগ" বা স্বধর্ম্মের উপর বেশী ঝোঁক দেয়। পাশ্চাত্যের আদিম মানুষ রজঃপ্রবণ ছিল, তাই নিজের ও পরের স্বাধিকার হিসাব করিতে করিতে সমাজ গড়িয়াছিল। স্বাধিকার বা rightএর হিসাব তাহার সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের মূলগ্রন্থি ছিল। সমাজের নানা অঙ্গের, নানা শ্রেণীর নানা ব্যক্তির স্বাধিকারকে সমঞ্জসীভূত করিয়া রাখাই পাশ্চাত্যের চিরন্তন সমাজ-সমস্যা। কিন্তু স্বাধিকারবিরোধ যখন একবার দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহা নির্ব্বাপিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইউরোপের ইতিহাসে এই স্বাধিকার-বিরোধের যে কতবার কত রকমের মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া দেখিবার জিনিস বটে, কিন্তু সেই ইতিহাসে একথা বেশ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যদি ইউরোপে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার না করিতেন, তবে খ্রীষ্টীয় যুগের পূর্ব্বে যে সমস্ত শক্তি স্বাধিকারসামঞ্জস্যের পক্ষে ইউরোপে কার্য্য করিতেছিল, কেবল তাহাদের সাহায্যে ইউরোপীয় সমাজ আর বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। রজোগুণাধিক্যে স্বাধিকারবিরোধ (conflict of rights) ধূমায়িত হয়, সে রজঃ-প্রবণতাকে কথঞ্চিৎ সংযত না করিতে পারিলে পাশ্চাত্যের সমাজ শান্তি বা স্থিতি লাভ করে না। প্রাচীন ইউরোপের যে উপচীয়মান রজঃপ্রবণত্বকে গ্রীসীয় ও রোমীয় সভ্যতার প্রভাব ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। যে দুর্দ্দান্ত পাশবিক রজোভাব একদিন ইউরোপকে বর্ব্বরতার অন্ধকারে ডুবাইতেছিল

ভগবান যিশুর জীবনমন্থনে উদ্ভূত বিপুল সত্ত্বামৃত সেই রজোভাবকে এমন কায়দায় ফেলিয়া আয়ত্ত করিয়া লইল যে ইউরোপ নবজীবন লাভ করিল। তারপর ইউরোপীয় সমাজসমূহে, নানা দিকে, সকল পক্ষের স্বাধিকারভোগের মধ্যে নানারূপ সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় জীব জীবের প্রতি কিরূপ দৃষ্টিতে নিত্য ব্যবহার সম্পন্ন করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্যশিক্ষায় ব্যবহারনীতি ও রাজনীতির প্রভাবই মানুষের প্রতি মানুষের সম্বন্ধ ও দৃষ্টি নির্ণীত ও গঠিত করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা বা culture প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়ায়, অনুমানজনিত বা বিচারজনিত তত্ত্বলাভের উপর দাঁড়ায় না। সেইজন্য ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের এলাকামধ্যে মানুষের প্রতি মানুষ যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, সেই ব্যবহারের বহুকালসঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতেই পাশ্চাত্য-শিক্ষা জীবজগৎ-সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐ বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্র ও রাজনীতি-শাস্ত্রে নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে ভারতীয় শিক্ষা জীবের প্রতি জীবের প্রযোজ্য দৃষ্টিটা গড়িয়া তুলে নাই। যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে ভারতীয় শিক্ষা ঐ দৃষ্টি গঠিত করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বেদ বলিতেছেন, তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত। এই একত্বের অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া ভারতীয় সাম্যবাদে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহা পাশ্চাত্য সাম্যবাদে আমরা দেখিতে পাই না।

পাশ্চাত্য সাম্যবাদ ভোগাধিকারের সাম্য লইয়া, ভারতীয় সাম্যবাদ বস্তুগত অভেদতত্ত্ব লইয়া; ভোগাধিকারের সাম্য একটা কাল্পনিক লক্ষ্যমাত্র, সেরূপ সাম্য বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ হয় না—কেবল ভাবিয়া লইলে সমাজের একটা শান্তি ও গতিশীলতা থাকে; কিন্তু সর্ব্বজীবে অভেদতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়, সেরূপ প্রত্যক্ষের একটা সাধনা আছে। এই সাধনার ফলে এমন সাম্যদৃষ্টি লাভ করা যায় যে মানুষে মানুষে শতরকম ব্যব-হারিক ভেদ থাকা সত্ত্বেও সে ভেদ বিষহীন সর্পের মত সমাজের নানা

প্রীতিবন্ধনের অনিষ্ট করিতে পারে না। পাশ্চাত্য সাম্যদৃষ্টি ভোগে, ঐহিক প্রতিপত্তিতে, সমকক্ষতা প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত, কিন্তু তথাপি প্রকৃতির অলক্ষ্য নিয়মে ভোগে ছোট বড় থাকিয়া যায়,—কেবল তৃপ্তি এই থাকে যে ভোগ সমান না হইলেও, ভোগাধিকার ত সমান, এখন যোগ্যতা সমান করিতে পারিলেই, ভোগও সমান হইয়া যাইবে,—কিন্তু হায়! প্রকৃতি যোগ্যতা সমান করিতে দেয় না। ভারতীয় সাম্যদৃষ্টি ভোগের ছোট-বড় লক্ষ্যই করে না, ভোগাধিকারের হিসাবও করে না; এ জগতে যার যেমন প্রবৃত্তি ও উদ্যম, তার সেইরূপ ভোগ ও সিদ্ধি, স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে; যার প্রাক্তন কর্ম্মফল যেরূপ তাঁর বর্ত্তমান জীবনের ভোগ সেইরূপ হইবে, এই ঘূর্ণায়মান কর্ম্মচক্রে ঘুরপাক ত অমনিতেই খাইতে হয়, সেজন্য আবার সামাজিক ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত কেন করিব? তার চেয়ে যে ত্যাগ ও সংযমের বলে এই কর্ম্মচক্রকে ফাঁকি দেওয়া যায়, সেই ত্যাগ ও সংযমের হিসাবে সমাজ গড়িতে হইবে। এইজন্য স্বাধিকারের হিসাব করিতে করিতে সমাজ না গড়িয়া, ভারত স্বধর্ম্মের হিসাব ধরিয়া সমাজ গড়িয়াছে,—বলিয়াছে, যার স্বধর্ম্ম বড, সেই বড়, যার স্বধর্ম্ম ছোট, সেই ছোট; যে ত্যাগে বড়, সেই বড়, যে ত্যাগে ছোট, সেই ছোট; অর্থাৎ যদি ব্যবহারিক জগতের অকাট্য নিয়মে সমাজে বড় ছোট দেখিতেই হয়, তবে ছোট হইতে বড় হইবার এমন একটী সোপান বিলম্বিত করা যাউক, যাহা দ্বারা মানুষ সত্য সত্যই, আসল হিসাবে, বড় হইতে পারে,—যে সেতুদ্বারা মানুষ ভেদমূলক সর্ব্বব্যবহার-ধন্দ উত্তীর্ণ হইতে পারে। ভেদ-জঞ্জাল অতিক্রম করিবার ইহা ভিন্ন উপায় নাই। ভারতীয় সাম্যবাদ প্রকৃতই চক্ষুষ্মান্, সেইজন্য ভোগাধিকারের হিসাব করিয়া সামাজিক শ্রেণী বা থাক্ নির্দ্দেশ করিতে যায় নাই, বড়-ছোট হিসাব করিবার জন্য সমাজের হাতে স্বধর্ম্মের মাপকাটী দিয়াছে।

পাশ্চাত্য সাম্যবাদ চায় সমস্ত মানুষকে ভোগাধিকারে সমকক্ষ দেখিতে; তার কাল্পনিক দৃষ্টির দৌড় তুল্যতা পর্য্যন্ত, বেদোক্ত একত্বের

খোঁজ খবর সে তত রাখে না। মানুষের সাংসারিক অবস্থার তুল্যতা বা সাম্যই যার লক্ষ্য, তাকে, সব সময়ই যুদ্ধার্থী হইয়া থাকিতে হয়, কারণ সমাজে ঐরূপ তুল্যতা বা সাম্য সর্ব্বদা ভাঙ্গিয়াই রহিয়াছে, সামাজিক মর্য্যাদাদানে তারতম্য সর্ব্বদাই রহিয়াছে, সর্ব্বদাই পদ, কুল, শীলের মধ্যে ছোট-বড় থাকিয়া যাইতেছে। সকল মানুষ সংসারে সমান শক্তি লইয়া জন্মায় না, অতএব নানা বিষয়ে সামর্থ্যের তারতম্য থাকিলে অধিকারের তারতম্য থাকিবেই, সব রকমেরই গণ-তন্ত্র বা সাধারণ তন্ত্র নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য আপনারই বিগ্রহে উচ্চ নীচ অনভেদ গড়িতে বাধ্য। কিন্তু সে কথা বলিলে কি হয়, পাশ্চাত্য সাম্যবাদের পক্ষে সকল রকম বৈষম্যই অসহনীয়, সেইজন্য পাশ্চাত্য সাম্যবাদীর সর্ব্বদাই "যুদ্ধং দেহি" ভাব, সর্ব্বদাই তাহারা বিরোধ-ধনুর জ্যা টানিয়া বসিয়া আছে। দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবটী আমাদের দেশেও সঞ্চারিত হইয়া পড়িতেছে, মনুষ্যজীবনের বাহিরের বৈষম্যগুলি আমাদের হিসাবেও অত্যধিক গণ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সমস্ত বৈষম্য মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সে সমস্তের মূলে কোনও সমাজনীতি বা সাময়িক প্রয়োজন নিহিত ছিল বা আছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অগ্রেই আমরা উচ্চ-বর্ণাদির স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া উত্তেজিত হইতেছি। এ সমস্ত অসহিষ্ণুতার ফল, বাস্তবিকই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে মনুষ্যজীবনের বাহিরের বৈষম্যগুলির প্রতি আমাদের মনে একটা যেন অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়িয়াছে, ভাব এই যে পাশ্চাত্য সাম্যবাদ যেমন social equals গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর, আমরাই বা কেন সেরূপ না হইব? ভারতীয় সাম্যবাদ যে কিংস্বরূপ, তাহার মধ্যে ভোগাধিকারের হিসাব আছে কি না, পাশ্চাত্য সাম্যবাদ অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠতর ও ভারতীয় সমাজ ও সাধনার পক্ষে যোগ্যতর কি না, এত কথা ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর নাই। সামাজিক সম্মান একটা ভোগ্য বিষয়, ভারতীয় সমাজে যাহাদের স্বধর্ম্মের গুরুত্ব বেশী ছিল, অর্থাৎ যাহারা ত্যাগে বড় ছিল, তাহাদের নিকট ঐ সম্মান অযাচিতভাবে উপস্থিত হইত। এখন অবশ্য

সমাজের অধঃপতিত অবস্থায় স্বধর্ম্মও বিগড়াইয়াছে, সম্মানের যাচকতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু যাঁরা সমাজসংস্কারে উদ্যোগী, তাঁরা ঐ সম্মানকেই পাশ্চাত্যদের হিসাবানুযায়ী একটা ভোগাধিকারের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং সামাজিক সম্মানের সোপানে অধস্তন জাতিদের উন্নয়নের জন্য তাহাদের পক্ষ হইতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদের অভিযোগ এই যে আমরাই সমগ্র সামাজিক সম্মানটী ভোগ করিব, আর নীচ জাতিরা তাহার অংশ পাইবে না, এ বড় অত্যাচারের কথা। ইহা ছাড়া সমাজের নানা জাতি বাহিরের একটা চিহ্ন বা ভেক ধারণ করিয়া, যাহাতে সামাজিক সম্মান বেশী করিয়া লাভ করে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। চারিদিকে সামাজিক সম্মান বা মর্য্যাদার একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। নীচ জাতিদের মধ্যে যদি কেহ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিল, তবে ত কথাই নাই—তার অসহিষ্ণুতা শতগুণে বাড়িয়া গেল, সে নিজে ও তার পক্ষ হইতে অগণ্য লোক সামাজিক সম্মানের দাবীতে তুমুল আন্দোলন তুলিল। এই যে সামাজিক সম্মানের জন্য তীব্র আগ্রহ ইহার সঞ্চার অবশ্য ইংরাজাগমনের পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে সুরু হইয়াছে। যখন বৌদ্ধযুগের সমাজ-ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া নূতন করিয়া বৈদিকতার প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল, সেই সময় সামাজিক আভিজাত্য ও সম্মানের নূতন নূতন হিসাব গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে ত কৌলিন্য লইয়া একটা বিরাট ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। অতএব সামাজিক সম্মানের উমেদারী কতকটা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেশে সুরু হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেকালে ঐ সম্মানের ভাগাভাগি বা বণ্টন রাজারাজড়াদের উপর নির্ভর করিত, সেইজন্য ঐ উমেদারী কাড়াকাড়িতে পরিণত হইতে পারে নাই। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সর্ব্বত্রই মানুষ ভোগাধিকার লইয়া নিজ নিজ নখদংষ্ট্রা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে শিখিতেছে, এ অবস্থায় সামাজিক সম্মানের জন্য কে আর উমেদারী করিবে এবং কোথাই বা করিবে; তাই দেখিতেছি সর্ব্বত্র কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি, আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র দেশে ভীষণ, চিরস্থায়ী বিরোধের বিষ সঞ্চারিত হইতেছে।

আমাদের আপত্তি এই যে সমগ্র ভাবটাই আমাদের দেশের শিক্ষা বা culture এর বিরোধী। ভারতীয় শিক্ষা মানুষের সম্মুখে একটা সামাজিক সম্মানের সোপান খাড়া করিয়া দিয়া, উহাতে উঠিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষকে প্রলুব্ধ বা উত্তেজিত করে নাই; ভারতীয় শিক্ষা সামাজিক উন্নতির এমন অর্থ করে নাই। প্রকৃতির পক্ষপাতহীন বিধিতে যিনি সমাজের যে কক্ষে জন্মহেতু অবস্থিত, সেই কক্ষ সম্বন্ধে দ্রোহী না হইয়া সন্তোষপরায়ণ হওয়াই ভারতীয় শিক্ষার অঙ্গ। উপনিষদে দেখা যায় যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের নিকট যখন ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত, তখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়া নিজের সামাজিক হীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, অর্থাৎ যোগ্যতায় বড় বলিয়া সামাজিক সম্মানে বড় হইতে ব্যস্ত হইতেছেন না। মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধ জ্ঞানে ও শিক্ষাগরিমায় ঋষিতুল্য হইয়াও জাতিপেশা ছাড়িতে অধৈর্য্য হন নাই, অথবা সামাজিক সম্মানের জন্য ব্যস্ত হন নাই। আর আধুনিক হিন্দুসমাজেও দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ নাগমহাশয় অধ্যাত্মরাজ্যে ব্রাহ্মণত্ব অতিক্রম করিয়াও সামাজিক হিসাবে আপনার "শূদ্র" পরিচয় সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যথাযুক্ত সম্মান দিতে ভ্রমক্রমেও ত্রুটি করিতেছেন না। বাহিরে সমাজ যেরূপই ছাপ দিক্ না কেন, ভিতর হইতে বড় করিয়া তোলাই ভারতীয় শিক্ষার সুকৌশল। ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে নিম্নজাতিও শিক্ষাভিমানী হইয়া উঠে না, সামাজিক সম্মান দখল করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে না, অন্ততঃ একটা জন্ম নিরুদ্বেগে অপেক্ষা করিবার মত ধৈর্য্য সে শিক্ষার দ্বারা যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়।

বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় শিক্ষাব দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইতেছে। আমরা অষ্টম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে সমাজের যেরূপ স্তরেই যিনি অবস্থিত হউন, ভাবতীয় শিক্ষায় তাহার সামর্থ্যানুযায়ী অধিকার বর্ত্তমান যুগে স্বীকৃত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে সকল শ্রেণীর নজর সামাজিক সম্মানের দিক হইতে ফিরাইয়া যাহাতে ভারতীয় শিক্ষার প্রতি নিপতিত হয়, সামাজিক সম্মান কে কত দখল করিয়া বসিবে তাহার

হিসাবগুলা ভুলিয়া যাহাতে ভারতীয় শিক্ষা কে কতটা গ্রহণ করিতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হয়—সেইরূপ দেশব্যাপী উদ্যম ও আন্দোলনেই দেশের ও সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত সমাজসংস্কারক হইতে চান, তাঁহারা সম্মানের কাড়াকাড়ি হইতে সমাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভারতীয় শিক্ষার কাড়াকাড়িতে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করুন, ইহাই বাঁচিবার পথ, অন্যথা কেবল সম্মান ও কর্ত্তৃত্বের কাড়াকাড়ি করিতে চারিদিকে সম্মিলনী গড়িবার আন্দোলনের দ্বারা সামাজিক সংঘর্ষ ও মৃত্যুর পথকেই আরও সুগম করা হইবে। সকল শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার প্রচার করিবার জন্য সমগ্র সমাজ কটিবদ্ধ হউন। সকল বর্ণকে ভারতীয় শিক্ষায় উন্নীত করিয়া তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের সঞ্চার করাই প্রাচীনতম সমাজ-স্রষ্টাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের নানা উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদের উপর পাহারা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না। যিনি ভারতীয় সমাজতত্ত্বের এই মূল কথাটী বুঝেন নাই, তিনি যেন "সমাজ" "সমাজ" করিয়া বৃথা বাহ্বাস্ফোট না করেন।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে ভোগাধিকারের হিসাব স্থান পায় নাই। এ সত্যটী মূলমন্ত্রের মত আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক। ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূলসূত্র স্বধর্ম্মপালন। পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্র বলেন, স্বধর্ম্ম ও স্বাধিকার, duty ও right, একই জিনিসের এপিট আর ওপিট, যার right আছে তার dutyও আছে; বেশ কথা। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য সামাজিকের বোঝাপড়া স্বাধিকার বা right লইয়া, স্বধর্ম্ম বা duty লইয়া নহে; ফলে স্বাধিকারের দিক দিয়াই সমাজের বিধি ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, স্বাধিকারের দিক দিয়াই প্রত্যেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিতেছে। স্বধর্ম্মের হিসাব বা স্বধর্ম্মের প্রসঙ্গ ধর্ম্মযাজক বা ধর্ম্মোপদেষ্টার মুখেই শুনা যায়; স্বধর্ম্ম সমাজবিগ্রহে তোমার স্থান নির্দ্দেশ করিবে না, বা গতি নির্দ্দেশ করিবে না;—স্বধর্ম্মের ভরসা তোমার আমার মর্জ্জির উপর, তাহার কোনও জবরদস্তি নাই।

পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব right বা স্বাধিকারের দিক দিয়া সমাজের বিধি-

ব্যবস্থা গড়িয়াছে, ভারতীয় সমাজতন্ত্র duty বা স্বধর্ম্মের দিক দিয়া বিধি-ব্যবস্থা গড়িয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদি কার কি স্বধর্ম্ম তাহাই বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন; সমাজ, পঞ্চায়েৎ বা ধর্ম্মাধিকরণ সর্ব্বদা দেখিবেন কে স্বধর্ম্মপালন করিতেছেন, কে করিতেছেন না। যিনি স্বধর্ম্ম পালন করিতেছেন না, তিনি দণ্ডনীয়; তাঁহার স্বধর্ম্মলঙ্ঘনের ফলে যিনি উৎপীড়িত তিনি ধর্ম্মাধিকরণে বিচারার্থী হইতেন। প্রাচীন কালে law-suit বা case কাহাকে বলিত?

স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞি ব্যবহারপদং হি তৎ।
(যাজ্ঞবল্ক্য)

স্মৃতি ও আচারের বিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারা কেহ যখন উৎপীড়িত হইয়া, রাজার নিকট আবেদন করিয়া বিচারার্থী হন, তখন তাহাকে ব্যবহারপদ বা case বলে। অতএব যিনি অর্থী বা বাদী তিনি তাঁহার স্বাধিকারাভিমানের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইতেন না, স্মৃতি ও আচার যাহাকে স্বধর্ম্ম বলিয়া কাহারও পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, সেই স্বধর্ম্মের লঙ্ঘন হেতু অপর একজন যখন ধর্ষিত, তখন এই উৎপীড়ন ধর্ম্মাধিকরণের গোচরীভূত করা হইত।

এইরূপ ভাবে স্বধর্ম্মের দিক দিয়া মানুষে মানুষে আদান-প্রদানের হিসাব রাখা ভারতীয় সমাজনীতির বিশেষত্ব। সকল প্রকার ভারতীয় সমাজবন্ধনের মূলসূত্র স্বধর্ম্ম। গৃহে বা সমাজে তোমাতে আমাতে যে মেলামেশা হয়, তাহাতে তুমি দেখিতেছ আমার প্রতি তোমার কি স্বধর্ম্ম, আমি দেখিতেছি তোমার প্রতি আমার কি স্বধর্ম্ম, অর্থাৎ, তোমাকে আমার কি দিবার তাহাই আমার দ্রষ্টব্য, এবং আমাকে তোমার কি দিবার তাহাই তোমার দ্রষ্টব্য। কিন্তু পাশ্চাত্যে ব্যবহারনীতি ও রাজনীতি যেরূপ ব্যবস্থা গড়িয়া দিয়াছে, তাহার ফলে ঐরূপ ক্ষেত্রে তুমি দেখিবে আমার সম্বন্ধে তোমার কি স্বাধিকার এবং আমি দেখিব তোমার সম্বন্ধে আমার কি স্বাধিকার, অর্থাৎ তোমার নিকট আমার কি পাইবার আছে, তাহাই আমার দ্রষ্টব্য এবং আমার কাছে তোমার

কি পাইবার আছে, তাহাই তোমার দ্রষ্টব্য। পরস্পর সামাজিকদের মধ্যে এই যে দুই রকম দৃষ্টির কথা বুঝা যাইতেছে, ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে ভারতীয় সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের প্রকৃতি ও ধাতুই আলাদা?

অথচ আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে এই গভীর পার্থক্যের কথা আমরা হিসাবের মধ্যেই আনি না। ফলে পাশ্চাত্য স্বাধিকার-ভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বন্যার জলের মত ঢুকিয়া বসিয়াছে, স্বাধিকার দখল করিবার উচ্চ রোলে সমাজের সদর অন্দর হাট ঘাট বাট সব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে,—পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে আদালতে দৌড়িতেছে, চারিদিকেই চাচা আপন বাঁচা। সমাজ ত ভাঙ্গিয়াছিলই,—স্বধর্ম্মলঙ্ঘনের প্রতীকারসাধনে সমাজ ত পঙ্গু হইয়াছিলই,—তাহার উপর স্বাধিকারভাবের বিষ সমাজের রক্তে ঢুকিয়া গিয়াছে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ফোড়া, দেহ পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে। শাস্ত্র স্বধর্ম্মের ঘোর বিপ্লব কল্পনা করিয়া ভারতকে আশ্বাস দিয়াছিল যে অবতার-পুরুষ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে প্রয়োজনমত আসিবেন, কিন্তু এই পাশ্চাত্য স্বাধিকারভাবরূপ বিষের কথা বুঝি শাস্ত্রও কল্পনা করিতে পারেন নাই!

অবশ্য পাশ্চাত্যের পক্ষে স্বাধিকারভাব বিষ না হইয়া পথ্যই হইয়াছে। পাশ্চাত্যের ধাতুই আলাদা। জীববিবর্ত্তনের একটা গোড়ার কথা জীবে জীবে স্বার্থবিরোধ। অবিদ্যায় এক বহু হয়, অবিদ্যায় বৈষম্য ঘটে; জীব-বিবর্ত্তনে সকল বৈষম্যের মধ্যে স্বার্থবৈষম্য একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই স্বাভাবিক স্বার্থবিরোধের স্রোতে পাশ্চাত্য আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, শেষে স্বার্থের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হিসাব গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য একটা কূল পাইয়াছে। পাশ্চাত্যসমাজে সর্ব্ববিধ বিবর্ত্তনের গতি বিরোধ হইতে সামঞ্জস্যের দিকে; স্বাধিকারভাব লইয়া সমাজের বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তোলা, এ রকম সমাজেই পোষায় অন্যত্র নহে।

ভারতীয় শিক্ষায় সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি কি, তাহা ভারতীয় স্বধর্ম্মবাদ ও ভারতীয় সাম্যবাদ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভারতীয় অব্যক্তবাদের (theory of involutionএর) কথা বলিয়াছি। ভারতীয় জীবনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থাৎ সকল বিজ্ঞানের মূলেই ঐ অব্যক্তবাদ বিদ্যমান থাকিয়া ভারতীয় শিক্ষার একটা গভীর বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। জীবন-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদই যদি তুমি কেবল স্বীকার কর, তবে জগতের জীব জানোয়ারের প্রতি নিতান্ত একটা ব্যবহারিক দৃষ্টি ছাড়া আর কোন রকম দৃষ্টি প্রয়োগ করিবার পথ তোমার থাকিবে না, কিন্তু যদি জীবনবিজ্ঞান অনুশীলন করিবার কালে ভারতীয় অব্যক্তবাদও স্বীকার কর, অর্থাৎ যদি সকল প্রকার অব্যক্ত, ব্যবহারিক, জৈবিক বিচিত্রতার মধ্যে একই স্বরূপ-সত্তাকে অব্যক্ত কারণরূপে অধিষ্ঠিত দেখিবার সাধনায় যত্নবান থাক, তবে জগতের জীবজানোয়ারের প্রতি তোমার দৃষ্টি অন্য রকম হইয়া যাইবে। ভারতীয় শিক্ষা জীবের প্রতি জীবের দৃষ্টিকে পরমার্থের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে, ভারতে সেই জন্য সংসারও ধর্ম্মক্ষেত্র,—সেই জন্য এখানে ব্যবহারিক পারমার্থিকের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া আছে।

ভারতীয় সাম্যবাদের বিশেষত্বও অব্যক্তবাদের সুফল। মানুষে মানুষে সমান কেন? উত্তরে ভারত বলিয়াছে, তাহারা অব্যক্ত স্বরূপে এক, যদিও ব্যক্ত লক্ষণে ভিন্ন, পাশ্চাত্য বলিয়াছে, ব্যক্ত দেহমন-চিত্তের সর্ব্ববিধ ভোগে মানুষের সমান অধিকার থাকাই ন্যায়সঙ্গত, অতএব সাম্যবাদই শ্রেষ্ঠ বাদ। পাশ্চাত্য অব্যক্তবাদ বুঝে না, বুঝিতে পারে না, সেই জন্য বহুযুগের গড়া-পিটা একটা ন্যায়বুদ্ধির উপর সাম্য-বাদকে দাঁড় করাইয়াছে। এই বেলে মাটির ভিত্তির উপর সাম্যনীতি গড়িয়া পাশ্চাত্যকে সর্ব্বদাই সামাল-সামাল ও খবরদারি করিতে হইতেছে।

ভারতীয় সমাজবন্ধনের মূলসূত্র স্বধর্ম্মভাবেও অব্যক্তবাদের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষে মানুষে সামাজিক সম্বন্ধ আদানপ্রদান লইয়া। মানুষ অহং-তন্ত্র জীব, অহংএর স্থিরতা আছে বলিয়াই আর সমস্তের একটা ধার-করা নিশ্চয়তা। এ

অবস্থায় স্বভাবতঃ মানুষে মানুষে আদান প্রদান সম্বন্ধে, প্রত্যেকে আদানের ভরসাকেই মূল ভরসা, মূল খুঁটি, বলিয়া ধরিয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা ঠিক উল্টা বুঝাইল কিসের জোরে? প্রদানের জন্য, দিয়া দিবার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করা, আর গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে বলা একই কথা বলিয়া মনে হয়। এ রকম ঝাঁপ দিবার শিক্ষায় সমগ্র সমাজকে শিক্ষিত করার মূলে কি রহস্য নিহিত রহিয়াছে? রহস্য আর কিছু নয়,—এক অখণ্ড স্বরূপসত্তার প্রত্যক্ষ।

যদি তুমি ও আমি স্বরূপে এক হই, তবে আদান ও প্রদানের চরম গতি ও ফল এক হইয়া যায়। অতএব স্বধর্ম্মভাব যখন সর্ব্বদাই তোমাকে কি দিতে হইবে ইহাই আমাকে হিসাব করাইতেছে, তখন সর্ব্বদাই একটা অনিশ্চয়তায় আমাকে ঝাঁপ দিতে হইতেছে না, আমি তোমার প্রতি স্বধর্ম্ম করিতে যাইয়া নিজেরই প্রতি স্বধর্ম্ম করিতেছি,—আমার ত্যাগ ত্যাগ নহে, আত্মসম্ভোগ। মূলের এই রহস্যটী জানা ছিল বলিয়াই, ভারতের প্রাচীন সমাজস্রষ্টারা সমাজকে স্বধর্ম্মভাবের মধ্য দিয়া অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করাইতেন, স্বাধিকারের হিসাবগণ্ডা শিখাইতেন না। যদি বল সব মানুষ যখন স্বরূপে এক, তখন আদান প্রদান সম্বন্ধের মধ্যে প্রদানের মত আদানের চরম ফলও ত এক? এক বটে, কিন্তু আদান বা আদায়ের ভিতরকার ভাবটী অহংতত্ত্বমূলক, অহঙ্কারের পরিপোষক। যে অহংভাব বা অহঙ্কার অবিদ্যাবৃক্ষের শিকড়তুল্য, যে অহংভাব থাকিতে মায়াজঞ্জালের নিবৃত্তি নাই, যে অহংভাবকে নিঃশেষে উৎপাটন করাই সমস্ত পরমার্থসাধনার স্ফুট বা অস্ফুট লক্ষ্য, সমাজবন্ধনের যেরূপ মূলসূত্র অবলম্বন করিলে সেই অহংভাবের পরিপোষকতা করা হয়, ভারতীয় শিক্ষা সেরূপ মূলসূত্র গোড়া হইতেই পরিহার করিয়াছে, তাই "আদান" বা আদায়কে খুঁটি ধরিয়া মানুষে মানুষে সকল প্রকার সম্বন্ধ তাঁহারা সমাজে প্রবর্ত্তিত করেন নাই।

স্বাধিকারভাব ভেদকে প্রশ্রয় দেয়, ভেদকে বজায় রাখে, সেইজন্য উহা রাজসিক; স্বধর্ম্মভাব অভেদকে উদ্বোধিত, উদ্রিক্ত করে, সেইজন্য উহা সাত্ত্বিক। স্বাধিকারসামঞ্জস্যের অনুকূলে যে উত্তম, উহা রজো-

নিয়ন্ত্রিত সত্ত্বের স্ফুরণ করে; স্বধর্ম্মপালনের জন্য উদ্যমপ্রকাশে সত্ত্ব নিয়ন্ত্রিত রজোভাবের লীলা হয়। ভারতীয় সমাজ সুস্থাবস্থায় সত্ত্ব-রজের ক্রীড়াভূমি, পাশ্চাত্যসমাজ সুস্থাবস্থায় রজঃসত্ত্বের ক্রীড়াভূমি।

ভারতীয় শিক্ষায় সমাজবিজ্ঞানের স্থান অতি উচ্চ ও মর্য্যাদামূলক। আধুনিক যুগে এই সমাজবিজ্ঞানের নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে; সে ব্যাখ্যায় আধুনিক বিদ্বজ্জনসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ত্তমানপ্রবন্ধে আমরা সেই সমাজবিজ্ঞানের দুই একটী মূল-সূত্রের ইঙ্গিতমাত্র করিতে পারিয়াছি, কিন্তু ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভেদ বুঝা যায়। কিন্তু সমাজবন্ধনের মূলসূত্রে প্রভেদ থাকিলেও, অর্থাৎ পাশ্চাত্যে সমাজবন্ধনের মূলসূত্র স্বাধিকারভাব এবং ভারতে সে সূত্র স্বধর্ম্মভাব হইলেও, সমাজবন্ধনের কৌশল সম্বন্ধে পরস্পর বহু স্থলে আদান প্রদান চলিতে পারে। অতএব ভারতীয় শিক্ষার পক্ষে পাশ্চাত্য সমাজবন্ধনের কৌশলগুলি অনুধাবনযোগ্য। এই সকল কৌশলের সাহায্যে পাশ্চাত্যের সামাজিকগণ organised বা ব্যূহবদ্ধভাবে স্বাধিকারভাবের পুষ্টিসাধন, স্বাধিকার নিরূপণ, স্বধর্ম্ম সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ করে, তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া দেখার প্রয়োজন আছে, কেননা স্বধর্ম্মভাবের পুষ্টিসাধন, স্বধর্ম্ম নিরূপণ, স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য organised বা ব্যূহবদ্ধ-ভাবে সাধিত হওয়া আমাদের দেশেও বর্ত্তমান যুগে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই organisation বা ব্যূহবদ্ধভাব ভাব পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে আমাদিগকে আহরণ করিতে হইবে, যদিও ঐ ব্যূহরচনার লক্ষ্য ও প্ররোচকভাব উভয়ই পাশ্চাত্য সমাজনিহিত ভাব ও লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ আলাদা।

জড়জগৎ ও জীবজগৎ সম্বন্ধে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা কিরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করে, তাহা আমরা সংক্ষেপে দুইটী প্রবন্ধে আলো-চনা করিলাম। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য কোথায়, তাহা এই দুই প্রবন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশদভাবে আমরা দেখিলাম

এবং ইহাও দেখিলাম যে উভয়বিধ শিক্ষার (culture এর) মধ্যে ন্যূনাধিক সংযোগ ও সমন্বয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আবশ্যকমত ও যথাসম্ভব আত্মসাৎ করিয়া ভারতীয় শিক্ষার যে যুগোচিত নবাভ্যুদয় সংঘটিত হইবে, দেশের বর্ত্তমান কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলা সম্ভব। "শিক্ষাকেন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় শিক্ষাপ্রচারের যোগ্য কেন্দ্রের কথা বলিয়াছি; ঐ শিক্ষাপ্রচারের বন্দোবস্ত বর্ত্তমানে কিরূপ করিয়া তোলা সম্ভব, তাহাই আগামীবারে আলোচ্য বিষয়।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

প্রায় ১০।১১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নানা মনোরম তীর্থস্থান দর্শন করিতেছি, কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধগণের আবাসভূমি উত্তরাখণ্ড দর্শন এখনও ভাগ্যে ঘটে নাই, এই চিন্তা মনকে সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল রাখিত। কত চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু নানা বিঘ্নবশতঃ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। অবশেষে নারায়ণের কৃপায় বর্ত্তমানবর্ষে এই সুযোগ ঘটিল।

প্রাকৃতিক সুষমায় এবং ভাবগাম্ভীর্য্যে উত্তরাখণ্ড বাস্তবিক অতুল-নীয়। হরগৌরী এবং নারায়ণের নিত্য বিহারভূমি বলিয়া উত্তরাখণ্ড হিন্দুর সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে আদৃত। এই কারণেই বোধ হয় আর্য্যগণ ইহাকে "দেবভূমি", "তপোবন" ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের অভ্রভেদী কিরীট চিরহিমানীমণ্ডিত নগাধিপ হিমালয়ই এই উত্তরাখণ্ডের সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর। হিমালয় আর্য্যগণের দেবতা। ইহারই অনন্ত শান্তিপূর্ণ পরম রমণীয় ক্রোড়ে আর্য্যগণের সনাতন ধর্ম্মের বিকাশ। এই স্থান হইতেই পরম শ্রেয়স্কর

বৈদিক মন্ত্রাদি গীত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। ইহারই উৎসঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া আর্য্য ঋষিগণ ভয় ও নৈরাশ্য বিনাশকারী "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ" ইত্যাদি মহাগান গাহিয়া ভারতের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। জগজ্জননী উমা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এই মহান গিরিরাজকে পবিত্র করিয়াছিলেন। পুণ্যসলিল সিন্ধু, পতিতপাবনী জাহ্নবী, প্রেমপূরিতা যমুনা সরস্বতী প্রভৃতি কত শত নদ নদী ইহার অনন্ত তুহিনরাশি হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিকে পবিত্র করিতেছে। এখনও ইহার বিজন গহ্বরসমূহে কত সাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করিতেছেন কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে। ভাষা হিমগিরির শোভা সম্পদ বর্ণনা করিতে শক্তিহীনা। বস্তুতঃ উত্তরাখণ্ড ভারতের গৌরব, আবার হিমালয় উত্তরাখণ্ডের গৌরব। যে হিন্দু এই হিমালয় দর্শন না করিয়াছেন সম্যক ভারত দর্শন এখনও তাঁহার অদৃষ্টে হয় নাই।

বিগত ১৮ই মে তারিখে বেলা ৩টার সময় আমি কলিকাতা হইতে মোগলসরাই এক্সপ্রেসে বহুদিনবাঞ্ছিত ৺কেদার বদরী দর্শনে যাত্রা করি। শুনিয়াছিলাম আষাঢের শেষ হইতে শ্রাবণের শেষ পর্য্যন্ত কেদার বদরী দর্শনের উপযুক্ত সময়। এই সময় তুষাররাশি গলিয়া পথ ঘাট পরিষ্কার হইয়া যায় এবং শীতও অনেক কমিয়া যায়। ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী প্রভৃতি নদীগুলির কলেবর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। নানাবিধ বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট সুরভি কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া পথের অলৌকিক শোভা সম্পাদন করে। এই সময় হিমালয়ের যে অপূর্ব্ব শ্রী পরিস্ফুট হয় সেরূপ আর কোন সময় হয় না। এই হেতুই বোধ হয় এই স্থানে শ্রাবণ মাসে কল্পবাস করিবার প্রথা প্রচলিত। বিলম্ব করিলে পাছে যাওয়া না হয় এই জন্য আমি শ্রাবণের অপেক্ষায় থাকিতে পারি নাই। বিশেষতঃ আমার চারিজন সহযাত্রী বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসেই অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে মনে করিতেছিলেন। আমারও তাঁহাদের সদ্রূপ সুযোগ এইরূপ দীর্ঘ ও অজ্ঞাত পথে ছাড়িবার ইচ্ছা ছিল না। আমার দু একজন গুরুস্থানীয়া এবং আমার স্ত্রী আমাদের

সঙ্গ লইবার জন্ত মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে আবার নিষেধ করিলেন, আর আমারও পথ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে ভরসা হইল না। কিন্তু পথে বাহির হইয়াই আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম যানের ব্যবস্থা থাকিলে স্ত্রীলোক লইয়া যাওয়ায় কোন অসুবিধা নাই। অধিকন্তু রন্ধনাদির খুব সুবিধা হয়।

১৯শে মে সোমবার প্রাতে ৮টার সময় আমরা মোগল সরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হই। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল ত্যাগ করিয়া আউধ্-রোহিলখণ্ড রেলে চড়িতে হইবে। গাড়ী আসিতে এখনও দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে দেখিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ষ্টেশনের নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় এক হোটেলে আহার করিয়া লইলাম। হোটেলটী একজন হিন্দুস্থানীর দ্বারা চালিত; ইহার বন্দোবস্ত মন্দ নহে, প্রত্যেক ব্যক্তির ।১০ লাগে। পরে দশটার গাড়িতে উঠিয়া বৈকাল ৪টার সময় লক্ষ্ণৌ নগরীতে উপস্থিত হই। সহরটী দেখিবার জন্য অদ্য এইখানে একটী বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমিনাবাদ পার্ক ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি দেখিয়া আসিলাম। পার্কটী বড় সুন্দর; পার্কের চতুর্দ্দিকের বাটীগুলিও প্রকাণ্ড এবং জমকাল। যেন কলিকাতা বলিয়া ভ্রম হয়। পরদিন প্রাতে নবাবি আমলের প্রাসাদাদি দেখিয়া আসিলাম। কেশববাগ, ইমামবাড়া, তাইখানা, তস্‌বীর বুরুজ, স্নানাগার, নাচ মন্দির, মচ্ছীভবন, হাওয়াখানা প্রভৃতি সমস্ত দেখিলাম। নবাবগণের বাস ভবনগুলি দেখা হইল না, কারণ সে গুলিতে লোক বাস করে এবং সাধারণের সেখানে গতায়াত নিষেধ। এই সকল প্রাসাদ দেখিয়া বোধ হইল এখানকার নবাবগণ দিল্লীর বাদসাহগণের অপেক্ষা কোন অংশে কম সুরুচিসম্পন্ন বা ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে স্থান রেসিডেণ্টের নিবাস ছিল তাহার নাম বিলিগার্ড, সে স্থানটী অতি যত্নের সহিত দেখিয়াছিলাম। বিদ্রোহের সময় স্থানীয় সমস্ত ইংরাজগণ এবং তাঁহাদের পক্ষীয় দেশীয় সৈন্যগণ ইহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীগণ ইহা অবরোধ পূর্ব্বক

যেভাবে ভগ্ন করিয়াছিল তদবস্থাতেই ইহা এখনও বর্ত্তমান। গৃহগুলির এমন অতি কম স্থানই আছে যেখানে গুলির বা গোলার ধ্বংসশক্তির পরিচয় নাই। এই নগরীর আধুনিক অনেক বড় বড় বাড়ী ও সরকারী আফিস প্রভৃতি প্রাচীন গম্বুজ ও মিনার ওয়ালা বাড়ীর অনুকরণে গঠিতা তাহাতে সহরটীর শ্রী অতি মনোরম হইয়াছে। কলিকাতার বাড়ীগুলির কতক এরূপভাবে গঠিত হইলে বড় সুন্দর হইত। সহরের এক পার্শ্ব দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিতা। ইহার জল এত কদর্য্য, যে কোন ভদ্রলোক ইহা স্নানার্থ পর্য্যন্তও ব্যবহার করেন না। ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যা অঞ্চলের এই সহরে খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য কম ছিল। কিন্তু এখন আর সেরূপ নাই। এখানে অনেক বাঙ্গালীর বাস আছে।

২০শে মে বৈকাল বেলা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্জাব মেলে ভোর ৭॥০ টার সময় উমা মহেশ্বরের বিচিত্র লীলাভূমি, মুনিঋষিগণের তপস্যার স্থল পরম পবিত্র উত্তরাখণ্ডের দ্বার স্বরূপ হরিদ্বারে উপস্থিত হই। বাস্তবিক হিমালয়ে প্রবেশ করিবার ইহার ন্যায় সুন্দর আর দ্বিতীয় পথ নাই। বৈষ্ণবগণ ইহাকে হরিদ্বার এবং শৈবগণ হরদ্বার বলিয়া থাকেন। পৌরাণিকগণ ইহাকে মায়াপুর বা গঙ্গাদ্বার বলিয়া গিয়াছেন। সাত শতাব্দীর মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে গঙ্গাদ্বার নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিখ্যাত চীন পর্য্যটক হুয়েন্থসাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার নাম ম-ইউ-লো (সম্ভবতঃ ময়ুর বা মায়াপুর) লিখিয়াছেন। আবুল ফজল তৎকৃত ইতিহাসে ইহাকে মায়া বা হরিদ্বার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত এবং সমুদ্রতল হইতে ১০৪৫ ফিট উচ্চে অবস্থিত।

কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে এ অঞ্চলে বারিপাত হওয়ায় বেশ শীত অনুভব করিলাম। যখন ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম, তখনও বেশ অন্ধকার রহিয়াছে। সুতরাং প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কম্বল মুড়ি দিয়া সকলে শুইয়া রহিলাম। সকাল হইলে আমাদের একটী বন্ধু বলিলেন যে এখানে তাঁহার পরিচিত স্বামী কেশবানন্দের আশ্রম আছে, কোন ধর্ম্মশালায় না যাইয়া সেই স্থানে আশ্রয় লইলে ভাল হয়। সকলে তাহাই

স্থির করিলে জিনিস পত্র লইয়া স্বামীজির আশ্রমে যাওয়া গেল। আশ্রমটী বেশ নির্জ্জন এবং সুন্দর স্থানে গঙ্গার নীলধারার উপর অবস্থিত। স্বামীজি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং অতি অমায়িক ব্যক্তি। লোকজনকে খাওয়াইতে তাঁহার বড়ই প্রীতি দেখিলাম। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে বুলিয়া বোধ হইল, কারণ অনেকগুলি রুগ্ন ব্যক্তি রোগমুক্তির আশায় এখানে রহিয়াছেন এবং তাহাদের উপকারও হইতেছে শুনিয়াছি। আমাদের থাকিবার জন্য তিনি একদিক খোলা একটি ছোট চালা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। স্থানটী আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আমরা নীলধারায় স্নান করিতে গেলাম। ইত্যবসরে কেদার ও বদরীর পাণ্ডাদ্বয় আসিয়া স্বামীজির সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। দুইজনে মিলিয়া একটী গোমস্তা ঠিক করিল, সে আমাদের সহিত কেদার বদরী যাইয়া ফিরিবার পথে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত আসিবে। অবশ্য তজ্জন্য তাহাকে কিছুই দিতে হইবে না। আর স্থির হইল যে বদরীর পাণ্ডা আমাদের মোট লইয়া যাইবার কুলীর বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

যাহা হউক ক্লান্ত থাকায় আমরা আর এই বেলা কোথাও বাহির বাহির হই নাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বৈকালের পূর্ব্বেই গঙ্গার তটাবস্থিত প্রজাপতি দক্ষের রাজধানী কনখলধামে বেড়াইতে গেলাম। এই স্থানে মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন। সতীকুণ্ড, দক্ষেশ্বর শিব, এবং বহু মন্দির, আখড়া ও মঠাদি কনখলের ধর্ম্মসম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে। হরিদ্বারের পাণ্ডাগণের বাড়ী এইখানে। মাঝে মাঝে এক একটী বাড়ীতে স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শনাদি করিয়া রুগ্ন সাধু সন্ন্যাসী ও সাধারণের পরিচর্য্যার্থ স্থাপিত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দর্শন করিলাম। সেবাশ্রমের কার্য্যে এখানকার ইতর ভদ্র সকলের শ্রদ্ধা আছে। রোগীগণ গৃহের ন্যায় সেবা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কনখল হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে আর্য্য সমাজীগণের প্রতিষ্ঠিত 'গুরুকুল' নামক আশ্রম। এই আশ্রমে উক্ত সমাজের

বালকগণ প্রাচীন কালের গুরুগৃহের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। শুনিলাম এই আশ্রম সুন্দর কার্য্য করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় আমরা হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে আসিলাম। গঙ্গার দৃশ্য এইখানে বড়ই সুন্দর। অপরাহ্ণে যখন বিস্তর সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ এইখানে বেড়াইতে আসেন, সে সময় স্থানটীতে যেন আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। কোথাও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, কোথাও ধর্ম্মবিষয়ক গান, বক্তৃতা বা বিচারাদি হইতেছে, আবার কোথাও পূজাদি হইতেছে। সন্ধ্যার সময় ঘাটের উপরিস্থিত মন্দিরসমূহে আরাত্রিক ও ঋষিকুলের বালকগণ কর্তৃক গীত স্তব প্রাণে এক মধুর ভাব আনিয়া দেয়। কুম্ভমেলা ও অন্যান্য যোগের সময় যাত্রীগণ এই ঘাটেই স্নান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহারাজা মানসিংহ একটী ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঘাটটীকে বেশ বড় করিয়া দিয়াছেন। এই ঘাটের কিছু উত্তর হইতে তীর্থাদি সমস্ত আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে ১ মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে ভীম ঘোড়া নামক একটী কুণ্ড আছে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের ঘোড়া এইস্থানে সজোরে এক পদাঘাত করে, তাহাতে পর্ব্বতগাত্রে একটী গহ্বর হয়। সেই গহ্বর ক্রমশঃ কুণ্ডে পরিণত হয়। নিকটেই গৌরীশঙ্করের এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে। কিছুদূর আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের অদূরে গঙ্গা দুই ধারায় বিভক্ত হওয়ায় মধ্যস্থলে এক দ্বীপ হইয়াছে। এই দুই ধারা আবার কনখলের নিকট গিয়া মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমধারার তীরে যাবতীয় তীর্থাদি অবস্থিত। নীল ধারা পূর্ব্বধারার অন্তর্গত। বিষ্ণুপাদ বা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের কিছু দক্ষিণে কুশাবর্ত্ত ঘাট; এইখানে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে হয়। ইহার পর সর্ব্বনাথ মহাদেবের মন্দির; তৎপরে ভৈরব মন্দির। ইহার দক্ষিণে মায়াদেবীর মন্দির। মায়া (দুর্গা) দেবীর তিনটী মস্তক ও চারি হস্ত, দেবীর নিকটে অষ্টভুজ শিব আছেন। মন্দিরের দরজায় একখানি খুব প্রাচীনকালের পাষাণলিপি আছে। অধুনা মায়াদেবীর মন্দির এবং ইহার দক্ষিণের কতকটা স্থান মাত্রকে মায়াপুর কহে। পুরাণ কথিত সাতটী মোক্ষক্ষেত্রের মধ্যে ইহা একটী, যথা :—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকাঃ॥"

মায়াপুরের দক্ষিণে গণেশঘাটের নিকট ইংরাজরাজ গঙ্গার কতকটা জল খাল কাটিয়া রুড়কীর দিকে লইয়া গিয়াছেন। কুশাবর্ত্ত ঘাটের অপর পারে পর্ব্বতের উপর গণেশ, চন্দ্র এবং সূর্য্যমূর্ত্তিবিশিষ্ট একটী প্রস্তর ত্রিশূল আছে এবং ইহার নিকটেই সূর্য্যকুণ্ড। ষ্টেশনের নিকট পাহাড়ের উপর বনমধ্যে বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। নীল ধারার উপর আমাদের আশ্রমের অপর পারে চণ্ডীর পাহাড়, ইহা প্রায় ১৯৩০ ফিট উচ্চ। এইখানে চণ্ডী মাতার, নীলকেশ্বর মহাদেবের এবং পিছোড়নাথ মহাদেবের মন্দির আছে।

পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক কেশবানন্দজির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডঘাটের নিকট এই স্থানের তীর্থগুরুর বাসায় আসিলাম। আজ ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে স্নান ও কুশাবর্ত্তঘাটে পিতৃপুরুষের প্রীত্যর্থ ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিলাম। অন্য পথে সুবিধা হইবে ভাবিয়া লাঠি ও দুএকটী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইলাম। বৈকালের পূর্ব্বেই পাণ্ডা আসিয়া তাহার প্রাপ্যাদি লইয়া গেল। এখানে পাণ্ডাদের বিশেষ কোন পীড়ন নাই। বৈকালে গঙ্গাতটে বেড়াইতে গেলাম। অনেকক্ষণ সেইস্থানে ছিলাম। সেই বিপুল ধর্ম্মাকৃষ্ট জনসংঘ, সেই পুণ্য আনন্দ হিল্লোল, সেই নির্ম্মল বায়ু, সেই বীচি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিণীর শ্রুতিসুখকরকুলকুল ধ্বনি ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। হরিদ্বারের ন্যায় মধুর ভাবোদ্দীপক তীর্থ অতি বিরল।

ক্রমশঃ

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সেবকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, মিশনের বন্যাকার্য্যের পরিসর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। বাঁকুড়া জেলার হোদল নারায়ণপুর কেন্দ্রের কার্য্য কুটীর নির্ম্মাণাদির পর ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিলেও কাঁথি ও তমলুক মহকুমার দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নূতন কেন্দ্র স্থাপন ও চাউল সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্য ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। এখন বুঝা যাইতেছে যে, কেবল খাদ্যাদি বিতরণের দ্বারা দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট নিঃস্বব্যক্তিদিগের নিঃসহায় অবস্থার কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি করা সম্ভব নহে। তাহাদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করা আবশ্যক। যেখানে আউস ধান্যের চাষ হইতে পারে,সেখানে বোরো ধান বিতরণ করা ছাড়া স্থানে স্থানে দেশকালোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পাদি প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক মনে হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সকল স্থানেই বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক চাউল বিতরণেব পরিমাণ যে বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তমলুকের নারাণদাঁড়ি কেন্দ্র হইতে ৪৯টি গ্রামের ৮৯৭ জনকে এবং চণ্ডীপুর কেন্দ্র হইতে ৪১টি গ্রামের ১১০০লোককে প্রতিদিনের খাদ্য হিসাবে সাপ্তাহিক চাউল বিতরণ করা হইতেছে। চণ্ডীপুর বিতরণের পরিমাণ সম্প্রতি আরও বাড়িবার কথা। কাঁথি মহকুমার ৪টি কেন্দ্র হইতে খাদ্যবিতরণ করা হয়। তন্মধ্যে ভগবানপুর হইতে ৩২টি গ্রামে ৫১৭জন, ইক্ষুপত্রিকা হইতে ১৩টী গ্রামে ২৩০ জন বড়বড়িয়া হইতে ৭টী গ্রামে ১৩০ জন, এবং খগা হইতে ৬টী গ্রামে ১০০ জন প্রাত্যহিক খাদ্য পাইয়া থাকে। কাঁথি মহকুমারও বিতরণের পরিমাণ আরও বাড়াইতে হইতেছে। ভগবানপুরে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টগণ ৺পূজার কয়দিন একত্র বসিয়া পরিতোষ সহকারে প্রসাদ পাইয়াছিল। হাবড়া রামকৃষ্ণপুর ঘাট হইতে কাঁথি ও তমলুকের কেন্দ্র গুলিতে ক্রমাগত চাউল সরবরাহ করিবার জন্য দুইখানি বৃহৎ নৌকার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

বাঁকুড়ার হোদল নারায়ণপুর কেন্দ্র হইতে ৩০টি গ্রামের ৫৩০ জন ব্যক্তিকে প্রাত্যহিক খাদ্য বিতরণ করা হয়, কিন্তু এখানকার রিপোর্টে প্রকাশ যে খাদ্যাদি বিতরণ অপেক্ষা গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এই কেন্দ্র হইতে অধিক অর্থ ব্যয় করা হইতেছে।

যতদিন না বন্যাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জীবিকার্জ্জনের সাবেক উপায় অবলম্বন করিতেছে অথবা তাহাদের জন্য নূতন কিছু উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে আমরা এই বন্যাকার্য্য চালাইতে পারি এই উদ্দেশ্যে আমরা যতদূর অর্থসাহায্য পাইয়াছি কার্য্যের পরিসরও ততদূর বাড়াইতে পারিয়াছি। এখন অর্থের অনটনে যদি কোনস্থানের সেবাকার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত স্থানে নিঃসহায় লোকদের জন্য এযাবৎ যত পরিশ্রম করা হইয়াছে সবই পণ্ড হইয়া যাইবে। এইরূপ গভীর আক্ষেপের কারণ যাহাতে উপস্থিত না হয়, সেইজন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য, ম্যানেজার উদ্বোধনের নামে, কিম্বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ, জেলা হাওড়া, এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাপীড়িতগণের সাহায্যভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকার।

১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

বি, সি, ঘোষ, পাঁগড়ে	১৫৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, চণ্ডীপুর	১৲
এন, সীতারামইয়া, মসলিপত্তন	১৷০
শ্রীআনন্দ সুন্দর মজুমদার, বারিপোদা	৩৸০
শ্রীকামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীপুর	৮৲
এ, ডুরাস্বামী আয়ার, নন্দ্যাল	১০৲
আর, রামস্বামী আয়ার, রেঙ্গুন	২৫৲
শ্রীকালীপদ রায়, সাজাদপুর	১৲
বৈশ্য যুবক সমিতি, মিরাট	১০০৲
মাঃ শ্রীহরিদাস বসু, কাথা	২৫৲
শ্রীকালিদাস সরকার, বেলগাছি	২৲
শ্রীগোপালচন্দ্র গুপ্ত, বালিয়াডাঙ্গা	২৲
মাঃ শ্রীশশধর মিত্র, মেকলিগঞ্জ	৪৫৲
মাঃ শ্রীআনন্দচন্দ্র চৌধুরী, গৌরীপুর	২৫৲
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র বল্লভ ঘোষ, বলরামপুর	৫০৲
মাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দাস, ঢাকা	৩০৷৵০
জনার্দ্দন ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রগণ, মালা	৫৲
আদর্শ লাইব্রেরী, যত্যাদিপুর	৪৲
শ্রীতারক নাথ রায়, কাথিয়াড়ি	২৲
শ্রীবরদাশঙ্কর চৌধুরী, মহাজন	১৮৷৵০
শ্রীমতী রাধারাণী মজুমদার, বারিপোদা	১০৸০
শ্রীচন্দ্রকুমার কীর্ত্তনীয়া, গোলাবাড়ী	১৲
সেক্রেটারী, বনগাম বার লাইব্রেরী, যশোহর	২০৲
ডাক্তার এন, বোস, সুলতানগঞ্জ	২৫৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নেত্রকোণা	৯৸০
এস, এস, শর্ম্মা, পার্ব্বতীপুর	২৫৲
মাঃ শ্রীললিত মোহন বসু, নড়াইল	১০০৲
„ শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখার্জ্জি, ডিহিরী	৭২৲
„ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মৈত্র, চাটিনগ্রাম	২২৷০
মেসার্স্ সেন এণ্ড সন্স, দার্জ্জিলিঙ্	৪৲
শ্রীইন্দুভূষণ রায়, কুড়িগ্রাম	৩৲
শ্রীক্ষীরোদনাথ তেওয়ারী, গড়বেতা	২৲
কোতয়ালীপুরের স্কুলের ছাত্রগণ	১৮৲
সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার, চুঁচুড়া	১০৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, রাণীগ্রাম	৯৵০
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৌলিক, ডিমলা	২৲
শ্রীসরকত উল্লা খাঁ সাহেব, বগুড়া	৫৲
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ময়মনসিংহ	২৷৵০
শ্রীললিতমোহন বসু, মুন্সেফ, নড়াইল	১০৲
সনগু ভ্যালীর চা কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ, রেঙ্গুন	১৮৲
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায়, বেড়া	৬৷৵০
শ্রীকালিদাস পাল, বাণী স্কুল	১৷৴০
রামকৃষ্ণ সেবকসমিতি রেঙ্গুন	৩৫৲
সুহৃদ্ পরিষদ, মুবাদপুর	২৭৷৵০
শ্রীনলিনী কুমার ঘোষ মুক্তাগাছা	৭৲
শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী, জয়নগর	৫৲
শ্রীপ্রমথনাথ মুন্সী, বগুড়া	৫০৲
মেসার্স্ কিং হ্যামিলটন্ এণ্ড কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ, কলিকাতা	২০৲
বেঙ্গল ফ্লাড রিলিফ ফণ্ডের সেক্রেটারী, রেঙ্গুন	৫০০৲

লক্ষ্মীপুর হাই স্কুলের ছাত্রগণ	১৸/০
লক্ষ্মীপুরের ব্যবসায়ীগণ	৬।০
সেক্রেটারী, পিপলস্ এসোসিয়েসন, কাগের হাট	১১।০
সোণাকান্দি হাইস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ	৩৪৲
বঙ্গরমণী, ভবানীপুর	৫০৲
ডাক্তার বি, এম, বসু, মৌলমেন	৫৲
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, নওগাঁ	৩৸/০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, শিলং	২৫৲
জনৈক বন্ধু, সাখরকাড়ি	১০০
শ্রীত্রিলোকচাঁদ ওয়াজির, উধামপুর	১৫৲
ক্ষুদ্র সংগ্রহ	৸০
শ্রীগোপীনাথ ঝা, নবা	২৫৲
রাজা গিরিশচন্দ্র, উচ্চ ইং বিদ্যালয়, শ্রীহট্ট	১২/০
রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল	৫৲
শ্রীরামেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আরা	১১৲
শ্রীবাসন্তীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপপুর	১০৲
শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীপুর	১৲
এইচ, ডি, বসু, কাথা	২৫৲
শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী, গৌরীপুর	১০
হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণ, মেদিনীপুর	৩৶০
মাঃ বি, পি, বিশ্বাস, নবাবগঞ্জ	২০৲
সুরুল গ্রামের অধিবাসীগণ	৩৫৸/০
এইচ, ডি, ফুলপুলে, বি, এ, পুণা	১০০৲
শ্রীহরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈনীতাল	৫৲
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপুর	১৲
শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়, কঠিয়াছি	২।০
মাঃ শ্রীবিপিনবিহারী দাস, মাথুর	১০৲
শ্রীশরচ্চন্দ্র মণ্ডল, গোয়াবাগান	১৲
শ্রীমতী চারুশীলা দেবী, কলিকাতা	১৲
বি, পাল চৌধুরী, মহেশগঞ্জ	৫৲
আলাগিরিস্বামি পিলে, সেসন	১৲
আর্য্য বীমা কোং, শিলচর	৬।৫০
শ্রীমতী স্বর্ণলতা গুহ, প্রোম	১১৲
এ, কে, রায়, কালোহা	১৶০
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দাসী, লক্ষ্ণৌ	১০০০৲
পি, সি, কর, আলমোড়া	৬৲
এ, ডি, আয়ার, নান্দিয়াল	১০৲
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসমিতি, রেঙ্গুন	২০
শ্রীমতী পার্ব্বতী বাই, লকসমন	৫০
শ্রীকেদারেশ্বর কার্নাল, ত্রিচুলা	৴
ভক্ত	১
শ্রীসুশীলকুমার সরকার, সম্বলপুর	২৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এলাহাবাদ	২৲
শ্রীমানগোবিন্দ চৌধুরী, হবিগঞ্জ	১৶০
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাইপাড়া	২৲
নিবেদিতা পাঠশালা, রাঁচি	২৲
শ্রীভুজঙ্গ ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, যাযজাবাদ	৫৲
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে, বেলিয়াঘাটা	১০৲
শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার, কলিকাতা	৫৲
শ্রীসংগ্রামেশ্বর সিংহ, কেচকাপুর	৮৶০
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, চমাইনপুর	১৫৲
শ্রীনেপালচন্দ্র গুপ্ত, জামাডোবা	৫৲
জি, কোদণ্ডরাম আয়ার, সাক্ষীগোপাল	১৲

১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত উদ্বোধন আফিসে প্রাপ্ত।

মাঃ এ, কে, বসু, চট্টগ্রাম	২২।০
বার লাইব্রেরী, আলিপুর	৪৬৲
শ্রীহেমেন্দ্র ঘোষ, মারঘেরিটা, আসাম	১৲
পি, কে, চক্রবর্ত্তী, বরজুলি, আসাম	।০

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু মল্লিক, ১ উমেশ দত্তের লেন, কলিকাতা ১০৲

শেষাণ ঐ ১০৲

শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র বসু, ঐ ২৲

শ্রীরাখালদাস দত্ত, ঐ ১৲

মাঃ রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ৩০৲

জেটি ষ্টাফ, চট্টগ্রাম ৬৷৹

শ্রীঅধরচন্দ্র সাহা, কামারজানি, রঙ্গপুর ১৲

মাঃ শ্রীসতীন্দ্রনাথ মিত্র, বাস্তকুব, ৫৮নং বিডন-ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩০৲

মাঃ শ্রীরামগোপাল চক্রবর্ত্তী, কমলগঞ্জ, শ্রীহট্ট ৫৲

শ্রীহরিদাস মল্লিক, ১৫নং মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫৲

বার লাইব্রেরী, আলিপুর ১৯৲

মাঃ রামকৃষ্ণমিশন, মিরাট ৩০৲

কে, জি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ, ইব্রাহিমপুর, ত্রিপুরা ১০৲

মাঃ শ্রীরাধারমণ সেন, গোবরপুর ৬০৲

মণি মল্লিকের কন্যা, ৩৬।৪নং বেনেটোলা কলিকাতা ২৫৲

মাঃ রামকৃষ্ণমিশন, মিরাট ৭০৲

মাঃ সম্পাদক বর্দ্ধমান বিভাগ বন্যামোচন ভাণ্ডার ১৮নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০৲

ঐ ঐ ২য় দফে ২০০০৲

শ্রীপুলিনানন্দ বসাক, ১২৫।৪নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১০৲

মাঃ কার্য্যাধ্যক্ষ, বেঙ্গলি, কলিকাতা ২০০৲

কুমার রাধাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, ৮৪নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা ১০০৲

মাঃ রামকৃষ্ণমিশন, মিরাট ৫০৲

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বাঁকুড়া ৪৷৶১০

সীতারাম ব্রহ্মচারী ভাণ্ডার, হোদলনারায়ণপুর ২০৲

অনেক বন্ধু, কলিকাতা ৫৲

শ্রীরামানন্দ চক্রবর্ত্তী, ধিতারা, বরাকপুর ৫৲

ব্যাঙ্ক অফিস ষ্টাফ, রাজবাড়ী ৫৲

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কার্য্যালয়, কলিকাতা ১০৲

সনাতন ধর্ম্মসাধিনী সভা, নিমতা ৭৲

কবিরাজ ২৫৲

মাঃ ডাক্তার পি, সি, রায়, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা ৬৪৲

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুহ, প্লিডার, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩৲

বার লাইব্রেরী, আলিপুর ৩৮৷৹

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ১৲

শ্রীমতী উৎপলকুমারী দেবী, পুরী ২০৲

মাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ, বরাদিয়া, ত্রিপুরা ৪৷৶৹

শ্রীমোহিনীমোহন হাজরা, করিয়া এষ্টেট, বৈকুণ্ঠপুর, সি, পি ৫৲

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, ১৫৮নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ১২৲

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দত্ত, ৮৪নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩৷৶৹

বি, এন্, রেলওয়ের কর্ম্মচারিবৃন্দ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, কলিকাতা ৫৲

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কার্য্যালয়, কলিকাতা ১০৲

বিষ্ণুপুর উচ্চ ইং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ,
বিষ্ণুপুর ১৩৲

মাঃ সম্পাদক, বর্দ্ধমান বিভাগ বন্যামোচনী ভাণ্ডার, ১৮নং বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্ট্রীট ১০০০৲

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার দত্ত, মির্জ্জাপুর আটোয়ারি,
দিনাজপুর ৫৲

জেমো এন, এন, মধ্য ইং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ,
কান্দি, মুর্শিদাবাদ ১০৲

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৪নং ভৈরব বিশ্বাসের লেন,
কলিকাতা ।০

আর, ডি, মুখার্জি, মাঙ্গলাস চা বাগান,
শৈলীহাট, জলপাইগুড়ী ১৫৲

মাঃ রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট ২৫৲

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা ষ্টেট ৬৲১৫

মাঃ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঢাকা ৭৫।, ১৫

বঙ্গ বাহাদুর করোনেসান স্কুলের ছাত্রবৃন্দ,
জামতাড়া ৬৪৲

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ, সম্পাদক,
রিলিফ কমিটি, ইটিলি ৩৮৲

মাঃ রামকৃষ্ণমিশন, মিরাট ২৫৲

বেঙ্গল, ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেশন আফিসের সহকারী কর্ম্মচারিগণ,
কলিকাতা ১৪৲

শ্রীভুপেন্দ্রকুমার বসু, ৩৭নং শিকদার
বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা ১০৲

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চাঁদপুর, ত্রিপুরা ১১৶০

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী, রাঁচি ৫৲

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কোং, ৪৫নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১০৲

শ্রীবিনোদবিহারী মণ্ডল, হোদলনারায়ণপুর,
বাঁকুড়া ১০১।০

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকিল, বাঁকুড়া ৪০৲

শ্রীদেবশঙ্কর মিত্র, ১০নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ২০৲

শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, ফরিদপুর কোলিয়ারি,
বর্দ্ধমান ৭৸০

শ্রীশীমন্তকুমার সেন, চন্দ্রগ্রাম ৩।০

জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৫৲

শ্রীচন্দ্রচন্দ্র বসু ৫৲

জনৈক বন্ধু ১০০০৲

বিষ্ণুপুর স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, বিষ্ণুপুর ৭৲

মাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল, কলিকাতা ১৫

১৬ই অক্টোবর হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত।

উদ্বোধন আফিসে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির তালিকা :—

শ্রীদ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
১বস্তা পুরাতন কাপড়।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, ১৫৮নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
চাউল——১ মণ
দার্জ্জিলিং কুইনাইন——১পাইট,
হড্‌স্ কুইনাইন——১ শিশি
দার্জ্জিলিং কুইনাইন——১টিন
হোমিয়োপ্যাথিক কলেরা বাক্স——১টি
স্পিরিট ক্যাম্ফর——১ শিশি
ড্রপার——১
চাউল——১মণ

হোমিয়োপ্যাথিক পুস্তক—— ১

মাং জি, সি, বসু, অধ্যক্ষ বঙ্গবাসী কলেজ,

কলিকাতা।

বিলাতি দুগ্ধ ৬ টিন।

জনৈক বন্ধু—চাউল ৬মণ।

মাং কার্য্যাধ্যক্ষ, বেঙ্গলি, কলিকাতা

৬ বোতল বিজয়সুধা।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জি, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বাঁকুড়া

চাউল———১২॥ মণ

ডাল———৬/০ মণ

লবণ———॥২/ সের

নূতন কাপড় ——২০ থানা

থান কাপড়——৪ থানা

পুরাতন কাপড়——১২০ থানা

থলে——[illegible]

সীতারাম ব্রহ্মচারী ভাণ্ডার,

হোদল নারায়ণপুর, বাঁকুড়া

নূতন কাপড়——২৫ থানা

পুরাতন কাপড়—৩৯ থানা

লবণ————/৫ সের।

রামকৃষ্ণপুর সাহায্য ভাণ্ডার

১ বস্তা পুরাতন কাপড়।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, আইনডাঙ্গা, হুগলি

চাউল—২মণ, কলেরা বাক্স—১, দার্জ্জিলিং কুইনাইন—১পাইণ্ট, স্পিরিট কাম্ফর—১ শিশি, ড্রপার—১, হোমিওপ্যাথিক পুস্তক—১, থলে—১।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং——

এরারুট - ৩ টিন, রবিন্‌সন্ বার্লি – ১ টিন, বিলাতি দুগ্ধ- ৬ টিন।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ওল্ড ক্লাপটি, বড় বাজার,—৬৯ প্রকার হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধ, সুগার অব মিল্‌ক্ প্রভৃতি সমেত একটী বাক্স।

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ, ইটাল রিলিফ কমিটীর সম্পাদক - নূতন কাপড় ৫০ খানা।

রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল– ১ বস্তা পুরাতন কাপড়।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, ১৫৮ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—সিনকোণা—১ টিন চাউল—৩ মণ, স্পিরিট ক্যাম্ফর - ১ শিশি, দার্জ্জিলিং কুইনাইন—২ টিন, হোমিওপ্যাথিক বাক্স—১।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকিল, বাঁকুড়া

দড়ি—১০ মণ।৩ সের

পেরেক- ১ মণ

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল, কলিকাতা

চাউল– ৪ মণ

মিশ্রী—১ কুঁদা

কুইনাইন- ২টিন

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ– ৪৮ শিশি

হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা ১ খান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের বেদান্ত সাধন।

(স্বামী সারদানন্দ)

অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস কাল ধরিয়া যে অমানুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার ফলে তাঁহার সুদৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযু[illegible], এবং শ্রীযুত মথুর তাঁহাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্য [illegible]ৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শ[illegible] [illegible]পে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধ বিবর্জ্জিত মন এখন কি যে অপূর্ব্ব শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত তাহা বলিবার নহে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায়* উহা শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়া দূরে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে এককালে উপনীত হইত, এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্য আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিত! সুতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে, উহার সামান্যমাত্রই উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে, ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাঁহার মনকে উচ্চ-ভাবভূমি হইতে নামাইয়া শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, এই কালেই আবার তাঁহার নিকটে বেদান্তমার্গ-বিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমহংসসকলের আগমন হইয়াছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়—৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়া থাকিত।* এইরূপ বিচারকালে তাঁহারা যখন কোন বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুর বলিতেন, তাঁহাকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতর সাধারণের ন্যায় ব্যাধির প্রকোপে নিরন্তর মুহ্যমান হইয়া থাকিলে কঠোর দার্শনিক বিচারে ঐরূপে প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, নির্ব্বিকল্প ভূমিতে নিরন্তর অবস্থানকালের শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, যথা, ভাবমুখে অবস্থান করিবার জন্য তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন। 'দর্শন' বলিয়া ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও উহা যে তাঁহার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির কথা ইহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কারণ, পূর্ব্ব দুইবারের ন্যায় ঠাকুর এই কালে কোন দৃষ্ট মূর্ত্তির মুখে ঐ কথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তুরীয়, অদ্বৈতভাবে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান করিবার কালে যখন তাঁহার মন কথঞ্চিৎ পৃথক্ হইয়া কখন কখন আপনাকে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের, শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল তখনই উহা বিরাট ব্রহ্মের বিরাট মনে উত্থিত ঐরূপ ভাব বা ইচ্ছার সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল।† সে যাহা হউক, পরে ঐ উপলব্ধি হইতে তাঁহার নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা যে, তাঁহার সম্মুখে সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল এ কথা সামান্য চিন্তার ফলেই আমরা বুঝিতে পারিব। কিন্তু ঐ কথা বুঝিতে হইলে শাস্ত্রের আর একটী কথা আমাদিগকে এখানে স্মরণ করিতে হইবে।

শাস্ত্র বলেন, অদ্বৈতভাবসহায়ে জ্ঞানস্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পূর্ব্বেই সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অথবা, ঐ ভাবের পরিণামে তাঁহার স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি যে ভাবে, যথায়, যতবার শরীর পরিগ্রহ

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়— ৪৮—৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩য় অধ্যায়—৯৯ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়াছিলেন এবং ঐ জন্মসকলে যাহা কিছু সুকৃত দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকে। ফলে, সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা এবং রূপরসাদি ভোগসুখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বারম্বার একই ভাবে জন্মপরিগ্রহের নিষ্ফলতা সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং প্রাণ সর্ব্ববিধ বাসনা হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়মান হয়।

আবার উপনিষদ্ বলেন, ঐরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এবং দেব, পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় তখনই তাঁহার মন সমাধিবলে ঐ সকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পুরুষে নানাবিধ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যের উদয় হইয়া থাকে। আবার, পঞ্চদশীকার শায়ন মাধব ঐরূপ পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্য্যলাভ উভয় কথার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসকল লাভ করিলেও বাসনা না থাকায় তাঁহারা ঐ সকল শক্তি নিজ ভোগসুখ লাভের জন্য কখনও প্রয়োগ করেন না, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে আধিকারিক* পুরুষদিগকে কখন কখন বহুজনহিতায় ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ করিতে দেখা গিয়া থাকে। তিনি বলেন, সে জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ সংসারে যে অবস্থায় থাকিতে থাকিতে জ্ঞানলাভ করেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও তদবস্থাতেই কালাতিপাত করেন, সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় কথা সকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের অনুশীলনে তাঁহার এই কালের বিচিত্র অনুভূতিসকল সম্যক্ না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে, তিনি ভগবৎ-পাদপদ্মে অন্তরের সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাসনা পরি-

* লোককল্যাণ সাধনের জন্য যাঁহারা বিশেষ অধিকার বা শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

শূন্য হইয়াছিলেন বলিয়াই অত স্বল্পকালে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্ব্বিকল্পভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুঝা যায় যে, তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াই এই কালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি 'শ্রীরাম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্ত্তমান কালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুঝা যায় যে, লোককল্যাণ সাধনের জন্য পরজীবনে তাঁহাতে বিচিত্র বিভূতি-সকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা কখনও তাঁহাকে আপন শরীরমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঐ সকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। বুঝা যায়, কেন তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন।

অতএব শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার বিচিত্র ইচ্ছায় ভাবমুখে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর বুঝিতে পারিলেন যে, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগব লীলা প্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে দেহ রক্ষা করিতে হইবে এবং নিত্যকাল ব্রহ্মে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। পরে, জাতিস্মরত্বসহায়ে বুঝিতে পারিলেন তিনি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাববান্ আধিকারিক অবতার পুরুষ, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া লোককল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহার আগমন ও তপস্যাদিসাধন। বুঝিতে পারিলেন, ঐরূপ হইলেও শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহার উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্যই এবার তাঁহাকে বাহ্যৈশ্বর্য্যের আড়ম্বরপরিশূন্য করিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে নিরক্ষর করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। বুঝিলেন, শ্রীশ্রীজগন্মাতার এ লীলারহস্য তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকেই ধরিতে বুঝিতে সমর্থ হইবে এবং ইতরসাধারণে ঐ কথা বুঝিতে আরম্ভ করিলেই মাতা নিজ সন্তানকে আপন অঙ্গে মিলিত করিয়া লইবেন। কিন্তু তাঁহার শরীরমনের দ্বারা যে প্রসুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি জাগরিত হইবে তাহা সর্ব্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া

তাঁহার দেহরক্ষার পরে বহুকাল পর্য্যন্ত লোককল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে।

ঐরূপে অদ্বৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে পুনরায় ভাবরাজ্যে অবরোহণ করিয়া ঠাকুর নিজ জীবনের ভূতভবিষ্যৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উপলব্ধিসকল তাঁহাতে যে সহসা একই দিনে যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। কিন্তু অদ্বৈতভূমি হইতে তাঁহার ভাবভূমিতে অবরোহণের পরে বৎসরকালের মধ্যেই তিনি ঐ সকল কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের অনুমান। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঐ কালে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পর আবরণ উঠাইয়া দিনের পর দিন তাঁহাকে ঐ সকল কথা একে একে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সাধনকালের প্রারম্ভে ঠাকুর যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা আমি কি করিব, তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি তাহাই শিখিব'—তাহা এই কালে পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ণ হইয়াছিল।

নির্ব্বিকল্প, অদ্বৈত ভাব-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া আর একটী বিষয়ও ঠাকুরের এই কালে উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, এই অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইওয়াই সর্ব্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, ভারতে প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনেই তিনি ইতিপূর্ব্বে সাধন করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে এই ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা কেহ উপস্থিত করিলে সেই জন্যই তিনি আমাদিগকে বারম্বার বলিতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা, ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্ব্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি, সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত, তত পথ।'

অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন ঐরূপে অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল এবং ঈশ্বরলাভকেই যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান করে ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই উহা অপূর্ব্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐ উদারতা এবং ঐ সহানুভূতি যে

তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি, এবং পূর্ব্ব যুগের কোন সাধকাগ্রণীই যে ইতিপূর্ব্বে পূর্ণভাবে তল্লাভে সমর্থ হন নাই, এ কথা প্রথমেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থসকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়াই আমাদিগের ধারণা; এবং এ কথাও সত্য যে, এখন হইতে তিনি যখন যেখানে ধর্ম্মের একদেশী ভাব অবলোকন করিতেন সেখানেই তখন প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার-ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা এই কালের একটী ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরেই ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জন্য কঠিন আমাশয়রোগে আক্রান্ত হয়। ঐ ব্যাধির হস্ত হইতে তিনি মুক্ত হইবার পরেই উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। ঘটনাটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলেন, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইস্‌লাম ধর্ম্মের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্ম্মপিপাসু গোবিন্দ ইস্‌লামের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে, কোরাণ পাঠ এবং তদুক্ত প্রণালীতে সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দ বিবাহিত ছিলেন কি না তাহাও বলিতে পারি না, কিন্তু প্রেমিক ছিলেন, এবং বোধ হয়, ইস্‌লামের সুফি সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রেমে ঈশ্বরের উপাসনার পথই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ, মুসলমান দরবেশদিগের মতই তিনি এখন ঈশ্বরপ্রেমসাধনে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন।

যেরূপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং সাধনানুকূল বুঝিয়া পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসন বিস্তীর্ণ করিয়া কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীতে, তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকীরগণেরও সমাদর ছিল, এবং কালিবাটির আতিথ্য উভয় দলের উপরেই সমভাবে বর্ষিত হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে গোবিন্দের ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না বলিয়াই অনুমিত হয়, এবং ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া তিনি সানন্দে দিন যাপন করিতে থাকেন।

প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন, এবং তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। শুধু তাহাই নহে, গোবিন্দের সহিত আলাপের ফলে ঠাকুরের মন ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিও আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও ত ঈশ্বর লাভের এক পথ, অনন্তলীলাময়ী মা এপথ দিয়াও ত কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন; এ পথ দিয়া কিরূপে তিনি তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন তাহা দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া ঐভাবে সাধনে নিযুক্ত হইব।'

যে চিন্তা, সেই কায। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইস্‌লাম ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা' মন্ত্র জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম, এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুর দেব দেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্য্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐ রূপে ঐ ভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হয় এবং ঐ কালের মধ্যেই সাধনফল সম্যক্ হস্তগত করি।" শুনিয়াছি, ঠাকুর এইকালে প্রথমেই এক দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রবরের দর্শন লাভ করেন, এবং পরে, সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি পূর্ব্বক তুরীয় নির্গুণব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।

হৃদয় বলেন, মুসলমান ধর্ম্ম সাধনের সময় ঠাকুর, মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরানাথের সানুনয় অনুরোধই তখন তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বালকস্বভাব ঠাকুরের ঐরূপ ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরস্ত হইবেন না বলিয়া মথুর ঐ সময়ে এক মুসলমান রস্থইয়া আনাইয়া তাহার নির্দ্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানি খানা রন্ধন করাইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে উহা খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্ম্ম সাধনের সময় ঠাকুর কালিবাটির অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরানাথের কুঠিতেই থাকিতেন।

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে, ভারতেব হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্ব্বত ব্যবধান রহিয়াছে—পবস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম্মবিশ্বাস ও কার্য্যকলাপ এতকাল একত্র বাসেও পরস্পবের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।' ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরে আলিঙ্গন কবিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্ম্ম সাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল?

নির্ব্বিকল্প ভূমি হইতে অবরোহণ করিলেও দ্বৈতভূমিব সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া ঠাকুরের অদ্বৈতস্মৃতি অনেক সময় সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাহাকে তুরীয়ভাবে লীন করিত। সঙ্কল্প না করিলেও সামান্য মাত্র উদ্দীপনায় স্বতঃই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি, অতএব সঙ্কল্প করিবামাত্র তিনি যে ঐ ভূমিতে এখন আরোহণে সমর্থ ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য। অদ্বৈত-ভাব যে, তাঁহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল তাহা ঐ সকল সামান্য ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এবং বুঝা যায়, ঐ ভাব তাঁহার হৃদয়ে

যেমন দুরবগাহ তেমনই দূরপ্রচারী ছিল। ঠাকুরের জীবন হইতে ঐ ভাবের পরিচায়ক কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় মালিদিগের তরিতরকারি বপনের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঘেসেড়াদিগকে ঐ সময়ে ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। একজন বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন ঐরূপে বিনামূল্যে ঘাস লইবার অনুমতি পাইয়া সানন্দে ঘাস কাটিতেছিল এবং পরে মোট বাঁধিয়া উহা বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, ঐ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু ঐ বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বৃহৎ বোঝাটী মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নানারূপে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নির্বুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান! 'হে রাম, তোমার বিচিত্র লীলা!'—বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন!

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন তাঁহার বাসগৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটি পতঙ্গ (ফড়িং) ঐ গৃহে উড়িয়া আসিল। ঠাকুর দেখিলেন, উহার গুহ্যদেশে একটী লম্বা কাটি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কোন দুষ্ট বালকে ঐরূপ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 'হে রাম, তুমি আপনার দুর্দ্দশা আপনি করিয়াছ' বলিয়া হাস্যের রোল উঠাইলেন!

কালীবাটীর উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্ব্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর একদিন উহা ভাবাবিষ্ট হইয়া দেখিতেছেন এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি উহার উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। ঠাকুর উহাতে নিজ বক্ষের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি

আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার অনুভব হয় ঐ কালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম।'

কালীবাটীর চাঁদনি-সমামুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দনে কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমন পূর্ব্বক দেখিল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারম্বার বলিতে লাগিল, মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই। পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে ঘটনা শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর। ঘটনাটী শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক ঘটনার* উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে আমরা নিরস্ত হইলাম এবং ঠাকুরের জীবনে অতঃপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

[১৯০০ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিসে প্রদত্ত বক্তৃতা।]

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, আবার উহা পড়িয়া গেল। আবার আর এক তরঙ্গ উঠিল—হয় ত উহা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর—আবার উহার পতন

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়—৭৪, ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

হইল—আবার এইরূপে উঠিল। এইরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও আমরা এইরূপ উত্থানপতন দেখিয়া থাকি আর সাধারণতঃ আমরা উত্থানটার দিকেই দৃষ্টি করি—পতনটার দিকে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু সংসারে এই উভয়েরই সার্থকতা আছে—উভয়ের কোনটারই মূল্য কম নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রীতিই এই। কি চিন্তাজগতে, কি আমাদের পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—সর্ব্বত্রই এই ক্রমগতি - সর্ব্বত্রই উত্থানপতন চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উচ্চতম ব্যাপারগুলি - উদার আদর্শসমূহ সময়ে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আবার উহা ডুবিয়া যায়, লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়—যেন ঐ অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য, উহাদিগকে রোমন্থন করিবার জন্য উহা কিছুকালের মত অদৃশ্য হয়, যেন ঐ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ খাওয়াইবার জন্য, উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্য, পুনরায় উঠিবার—পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে উঠিবার নিমিত্ত বলসঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল উহা বিলুপ্তপ্রায় বোধ হয়।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও চিরকালই এইরূপ উত্থানপতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে মহাত্মার—যে ঈশ্বরাদেশবাহকের জীবনচরিত আমরা অদ্য অপরাহ্নে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনিও স্বজাতির ইতিহাসের এমন এক যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাকে আমরা নিশ্চিতই মহাপতনের যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ ও কার্য্যকলাপের যে বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে ইহার অল্পমাত্র আভাস প্রাপ্ত হই। বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ বলিলাম—কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে কথিত এই বাক্য সম্পূর্ণ সত্য যে, তাঁহার সমুদয় উক্তি ও কার্য্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে সমগ্র জগৎ তাহাতে পূর্ণ হইয়া যাইত। আর তাঁহার তিন বর্ষ ধর্ম্মপ্রচারের কালের মধ্যে যেন

কত যুগের ঘটনা, কত যুগের ব্যাপার একত্র সজ্ঘটিত হইয়াছে—সেগুলিকে প্রকাশ করিতে এই উনবিংশতি শতাব্দী লাগিয়াছে, আর কে জানে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে আর কতদিন লাগিবে? আপনার আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ অতি ক্ষুদ্র শক্তির আধাব মাত্র। কয়েক মুহূর্ত্ত, কয়েক ঘণ্টা, খুব জোর কয়েক বর্ষ আমাদের সমুদয় শক্তি-বিকাশের পক্ষে—উহার সম্পূর্ণ প্রসারের পক্ষে—পর্য্যাপ্ত। তার পর আর আমাদের কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাশক্তিধর পুরুষের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত শত শতাব্দী, শত শত যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি জগতে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গেলেন, এখনও তাহার প্রসারকার্য্যের বিরাম নাই, এখনও উহা পূর্ণভাবে ব্যয়িত হয় নাই। যতই যুগের পর যুগপ্রবাহ চলিয়াছে, ততই উহাও নব বলে বলীয়ান হইতেছে।

এক্ষণে দেখুন, যীশুখ্রীষ্টের জীবনে যাহা দেখিতে পান, তাহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় প্রাচীন ভাবের সমষ্টি স্বরূপ। ধরিতে গেলে একভাবে সকল ব্যক্তির জীবন, সকল ব্যক্তির চরিত্রই অতীত ভাবসমূহের ফল-স্বরূপ। সমগ্র জাতীয় জীবনের এই অতীত ভাবসমূহ—বংশানুক্রমিক সঞ্চরণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ, শিক্ষা এবং নিজেব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতব আসিয়া থাকে। সুতবাং এক-ভাবে প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরই সমগ্র পৃথিবীর, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের—সমুদয় অতীত সম্পত্তি রহিয়াছে বলিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যেরূপ, তাহা সেই অনন্ত অতীতের হস্ত নির্ম্মিত কার্য্যস্বরূপ, ফলস্বরূপ বই আর কি? আমবা অনন্ত ঘটনাপ্রবাহে অনিবার্য্যরূপে পুরোভাগে অগ্রসর ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে অসমর্থ ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয় ব্যতীত আর কি? প্রভেদ এই—আপনি আমি অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদস্বরূপ মাত্র। কিন্তু জাগতিক ঘটনানিচয়রূপ মহাসমুদ্রে কতকগুলি প্রবল তরঙ্গ থাকেই। আপনাতে আমাতে জাতীয় জীবনের অতীত ভাব অতি অল্পমাত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে; কিন্তু এমন অনেক শক্তিমান্ পুরুষও আছেন, যাঁহারা যেন প্রায় সমগ্র অতীতের সাকার বিগ্রহ স্বরূপ ও

ভবিষ্যতের দিকেও সদা প্রসারিতকর। সমগ্র মানবজাতি যে অনন্ত উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইঁহারা যেন সেই পথের পথনির্দ্দেশক স্তম্ভ স্বরূপ। বাস্তবিক, ইঁহারা এত বড় যে, ইঁহাদের ছায়ায় যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে আর ইঁহারা অনাদি অনন্তকাল অবিনাশিভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। এই মহাপুরুষ যে বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি ঈশ্বরতনয়ের ভিতর দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কখন দর্শন করে নাই", এ কথা অতি সত্য। ঈশ্বরতনয়ে ব্যতীত ঈশ্বরকে আমরা আর কোথায় দেখিব? ইহা খুব সত্য যে, আপনাতে আমাতে, আমাদের মধ্যে অতি দীন হীন ব্যক্তিতে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিদ্যমান, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন আলোকের পরমাণু সকল সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বত্র স্পন্দনশীল হইলেও উহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিপথে আনিতে হইলে প্রদীপ জ্বালিবার প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সেই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর—জগতের সুমহান্ দীপাবলিস্বরূপ এই সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষে—এই সকল নরদেবে—ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ এই সকল অবতারে প্রতিবিম্বিত না হইলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না।

আমরা সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল মহান্ জ্ঞানজ্যোতিঃসম্পন্ন ভগবানের অগ্রদূতগণের একজনের চরিত্রের সহিত আপনার ঈশ্বরসম্বন্ধীয় উচ্চতম ধারণার তুলনা করুন দেখি। দেখিবেন, আপনার কল্পিত ঈশ্বর প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ পুরুষ হইতে অনেকাংশে হীনতর, অবতারের, ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা হইতে বহু বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। এই সকল সাকারবিগ্রহ-ধারী পুরুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের মহজ্জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, আপনারা তাহা হইতে ঈশ্বরের উচ্চতর ধারণা করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা কি অন্যায় কার্য্য? এই নরদেবগণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া

তাঁহাদিগকে জগতের মধ্যে ঈশ্বরের একমাত্র সাকারবিগ্রহস্বরূপে উপাসনা করা কি পাপ? যদি তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের সর্ব্ববিধ-ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা বা কল্পনা হইতে উচ্চতর হন, তবে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দোষ কি? ইহাতে যে শুধু দোষ নাই, তাহা নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা কেবল এই ভাবেই সম্ভবপর হইতে পারে। আপনারা যতই চেষ্টা করুন না—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করুন বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়ে মন দিয়াই চেষ্টা করুন, যতদিন আপনারা মানবজগতের মধ্যে নরদেহে অবস্থিত, ততদিন আপনাদের উপলব্ধ সমগ্র জগৎই নরভাবাপন্ন, আপনাদের ধর্ম্মও মানবভাবে ভাবিত, আপনাদের ঈশ্বরও নরভাবাপন্ন। এরূপ না হইয়াই যাইতে পারে না। কে এমন বাতুল আছেন যে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ-উপলব্ধ বস্তুকে গ্রহণ করিয়া এমন বস্তুকে ত্যাগ না করিবেন, যাহা কেবল কল্পনাগ্রাহ্য ভাব-বিশেষ মাত্র, যাহাকে তিনি ধরিতে ছুঁইতে পারেন না এবং স্থূল অবলম্বনের সহায়তা ব্যতীত যাহার নিকট অগ্রসর হওয়াই দুরূহ? সেই কারণে এই সকল ঈশ্বরাবতার সকল যুগে, সকল দেশেই পূজিত হইয়াছেন।

আমরা এক্ষণে য়াহুদীদিগের অবতার খ্রীষ্টের জীবনচরিতের একটু আধটু আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে একটী তরঙ্গের উত্থানের পর ও দ্বিতীয় তরঙ্গ উত্থানের পূর্ব্বে তরঙ্গের যে পতনাবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, খ্রীষ্টের জন্মকালে য়াহুদীদের সেই অবস্থা ছিল। উহাকে রক্ষণশীলতার অবস্থা বলিতে পারা যায়—ঐ অবস্থায় মানবাত্মা যেন চলিতে চলিতে কিছুকালের জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—সে এতদিন ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিতেই যেন ব্যগ্র। এ অবস্থায় জীবনের সার্ব্বভৌমিক ও মহান্ সমস্যাসমূহের দিকে মন না গিয়া খুঁটিনাটির দিকেই মনোযোগ অধিক থাকে; ঐ অবস্থায় যেন তরণী অগ্রসর না হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে—উহাতে ক্রিয়াশীলতা অপেক্ষা অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হউক—এই ভাবে সহ্য করিয়া যাওয়ার ভাবই অধিক বিদ্যমান। এটী লক্ষ্য

করিবেন, আমি এই অবস্থার নিন্দা করিতেছিনা, আমাদের উহার উপর দোষারোপ করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কারণ, যদি এই পতনাবস্থা না ঘটিত, তবে নাজরথীয় যীশুতে যে পরবর্ত্তী উত্থান সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব হইত। ফারিসি ও সাদিউসিগণ* হয়ত কপট ছিলেন, তাঁহারা এমন সকল বিষয় হয়ত করিতেন, যাহা তাঁহাদের করা উচিত ছিল না, হইতে পারে তাঁহারা ঘোর ধর্ম্মধ্বজী ও ভণ্ড ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপই থাকুন না কেন, যীশুখ্রীষ্টরূপ কার্য্য বা ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে তাঁহারাই বীজ বা কারণস্বরূপ। যে শক্তিবেগ একদিকে ফারিসি ও সাদিউসিরূপে অভ্যুদিত হইয়াছিল, তাহাই অপর দিকে মহামনীষী নাজরথীয় যীশুরূপে প্রাদুর্ভূত হয়।

অনেক সময় আমরা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠান, ধর্ম্মের অত খুঁটি-নাটির উপর নজরকে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিই বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেই ধর্ম্মজীবনের শক্তি অন্তর্নিহিত। অনেক সময় আমরা অত্যগ্রসর হইতে যাইয়া ধর্ম্মজীবনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। দেখাও যায়, সাধারণতঃ উদার পুরুষ হইতে গোঁড়াদের মনের তেজ বেশী। সুতরাং গোঁড়াদের ভিতরও একটী মহৎ গুণ আছে—তাহাদের ভিতর যেন প্রবল শক্তিরাশি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধে যেমন, সমগ্র জাতিসম্বন্ধেও তদ্রূপ—জাতির ভিতরও ঐরূপে শক্তি সংগৃহীত হইয়া সঞ্চিত থাকে। চতুর্দ্দিকে বাহ্য শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত—রোমকদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এক কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ, চিন্তাজগতে গ্রীক্ ভাবসমূহের দ্বারা এবং পারস্য, ভারত ও আলেক্জান্দ্রিয়া হইতে আগত ভাবতরঙ্গরাজির ক্রমাগত আঘাতে এক নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে বিতাড়িত হইয়া—এইরূপে চতুর্দ্দিকে দৈহিক,

* Pharisee—যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক য়াহুদীদের এক ধর্ম্মসম্প্রদায়—ইঁহারা ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্যবিধি অনুষ্ঠানাদি পালনেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। Sadducee—ঐ সময়ের এক য়াহুদী সম্প্রদায়—ইঁহারা অভিজাত-বংশীয় ও সন্দেহবাদী ছিলেন।

মানসিক, নৈতিক—সর্ব্ববিধ শক্তিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই য়াহুদীজাতি স্বাভাবিক প্রবল স্থিতিশীল শক্তিতে দণ্ডায়মান ছিল—ইহাদের বংশধরগণ আজও এই শক্তি হারায় নাই। আর উক্ত জাতি তাহার সমগ্র শক্তি জেরুজালেম ও য়াহুদীয় ধর্ম্মের উপর কেন্দ্রীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর সকল শক্তিই একবার সঞ্চিত হইলে যেমন অধিকক্ষণ একস্থানে থাকিতে পারে না—উহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া আপনাকে শেষ করে, ইহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহাকে দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুদূর ভবিষ্যৎযুগে প্রসারিত হইবে বলিয়া উহাকে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না। য়াহুদী জাতির অভ্যন্তরে অবস্থিত এই সমষ্টীভূত শক্তি পরবর্ত্তী যুগে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত আসিয়া মিলিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সৃজন করিল। এইরূপে ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সম্মিলনে বিপুলকায়া প্রবল তরঙ্গশালিনী মহানদীর উৎপত্তি। ইহার প্রবল তরঙ্গের শুভ্র শীর্ষদেশে নাজরথীয় যীশু সমাসীন রহিয়াছেন। এইরূপে সকল মহাপুরুষই তাঁহাদের সমসাময়িক অবস্থাচক্রের ফলস্বরূপ, তাঁহাদের নিজ জাতির অতীতের ফলস্বরূপ, তিনি আবার স্বয়ং ভবিষ্যৎযুগের স্রষ্টা। অতীত কারণসমষ্টির ফল-স্বরূপ কার্য্যাবলি আবার ভাবী কার্য্যের কারণস্বরূপ হয়। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষসম্বন্ধেও একথা খাটে। তাঁহার নিজ জাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম, ঐ জাতি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শত শত যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহাই তাঁহাতে সাকার বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিল। আর তিনি স্বয়ং ভবিষ্যতের পক্ষে মহাশক্তির আধার স্বরূপ—শুধু তাঁহার নিজ জাতির পক্ষে নহে, জগতের অন্যান্য অসংখ্য জাতির পক্ষেও তাঁহার জীবনের প্রেরণা মহাশক্তির বিকাশ করিয়াছে।

আর একটী বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ

নাজারথীয় মহাপুরুষের বর্ণনা আমি প্রাচ্যদেশীয়গণের দৃষ্টি হইতে করিব। আপনারা ইহা অনেক সময়েই ভুলিয়া যান যে, তিনি স্বয়ং একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। তাঁহাকে আপনারা নীলনয়ন ও পীতকেশ-রূপে অঙ্কন ও বর্ণনার যতই চেষ্টা করুন না, তথাপি তিনি যে একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাইবেলগ্রন্থে যে সকল উপমা ও রূপকের প্রয়োগ আছে, উহাতে যে সকল দৃশ্য ও স্থানের বর্ণনা আছে, উহার কবিত্ব, উহাতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের ভাবভঙ্গী ও সন্নিবেশ এবং উহাতে বর্ণিত প্রতীক ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি —এই সমুদয়ই প্রাচ্যভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে—উহাতে উজ্জ্বল আকাশ, উত্তাপ, প্রখর রবি এবং তৃষ্ণার্ত্ত নরনারী ও জীবকুলের বর্ণনা— মেষপাল, কৃষককুল ও কৃষিকার্য্যের বর্ণনা—পন্‌চাক্কি, ঘটীযন্ত্র, পন্‌চাক্কি সংলগ্ন সরোবর ও ঘরট্টের (পিষিবার জাতা) বর্ণনা— এই সকলগুলিই এখনও এশিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এশিয়া চিরদিনই জগৎকে ধর্ম্মের বাণী শুনাইয়াছে—ইউরোপ চিরদিনই রাজনীতির বাণী ঘোষণা করিয়াছে। নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। ইউরোপের ঐ বাণী আবার প্রাচীন গ্রীসের প্রতিধ্বনিমাত্র। নিজ সমাজই গ্রীকদের সর্ব্বস্ব ছিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল সমাজই তাহাদের চক্ষে বর্ব্বর—তাহাদের মতে গ্রীক ব্যতীত আর কাহারও জগতে থাকিবার অধিকার নাই। তাহাদের মতে গ্রীকেরা যাহা করে, তাহাই ঠিক, জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটীই ঠিক নহে—সুতরাং তাহাকে জগতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাদের সহানুভূতি, মানব-জাতিতেই একান্ত সীমাবদ্ধ সুতরাং উহা একান্ত স্বাভাবিক, আর সেই কারণেই গ্রীক সভ্যতা নানারূপ কলাকৌশলময়। গ্রীক মন সম্পূর্ণ-রূপে ইহলোক লইয়াই ব্যাপৃত, সে এই জগতের বাহিরের কোন বিষয় স্বপ্নেও ভাবিতে চায় না। এমন কি, উহাদের কবিতা পর্য্যন্ত এই ব্যবহারিক জগৎকে লইয়া। উহাদের দেবদেবীগুলির কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, তাঁহারা মানুষ, সম্পূর্ণরূপে মানব-

প্রকৃতিবিশিষ্ট, সাধারণ মানব যেমন সুখে দুঃখে, হৃদয়ের নানা আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়েন, ইহারাও প্রায় তদ্রূপ। ইহারা সৌন্দর্য্য ভালবাসে বটে, কিন্তু এটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, উহা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে—বাহ্যজগতের শৈলরাশি, হিমানী ও কুসুমরাশির সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে—উহা বাহ্য অবয়বের বাহ্য আকৃতির সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে। গ্রীকেরা নবনারীর মুখের, অধিকাংশ সময়ে নরনারীর আকৃতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইত। আর এই গ্রীকগণই পরবর্ত্তী যুগের ইউরোপের শিক্ষাগুরু বলিয়া ইউরোপ গ্রীসের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

এশিয়ায় আবার অন্যপ্রকৃতি লোকের আবাস। উক্ত প্রকাণ্ড মহাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন—কোথাও শৈলমালার চূড়াগুলি অভ্র ভেদ করিয়া নীল গগনচন্দ্রাতপকে যেন প্রায় স্পর্শ করিতেছে, কোথাও প্রকাণ্ড মরুভূমিসমূহ ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে—যেখানে একবিন্দু জল পাইবার সম্ভাবনা নাই, একটী তৃণও যথায় উৎপন্ন হয় না, কোথাও নিবিড় অরণ্যানী বিরাজমান—উহাও ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে—যেন ফুরাইবার নাম নাই, আবার কোথাও বা বিপুলকায়া স্রোতস্বতীসমূহ প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির এই সকল মহিমাময় দৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচ্যদেশবাসীর সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভালবাসা এক সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হইল। উহা বহির্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইল। তথায়ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগের অদম্য তৃষ্ণা, প্রকৃতির উপর আধিপত্যের তীব্র পিপাসা বিদ্যমান—তথায়ও উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান—গ্রীকেরা যেমন অপরজাতি-সমূহকে বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, তথায়ও সেই ভেদবুদ্ধি, সেই ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু তথায় জাতীয় ভাবের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত। এশিয়ায় আজও জন্ম, বর্ণ বা ভাষা লইয়া জাতি সংগঠিত হয় না। তথায় একধর্ম্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় বৌদ্ধ

মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় হিন্দু মিলিয়া এক জাতি। এক জন বৌদ্ধ চীনদেশবাসী, এবং অপর একজন পারস্যদেশবাসীই হউক না কেন, যেহেতু উভয়ে একধর্ম্মাবলম্বী, সেই হেতু তাহারা পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তথায় ধর্ম্মই মানবজাতির পরস্পরের বন্ধনস্বরূপ, উহাই মানবের সম্মিলনভূমি। আর ঐ পূর্ব্বোক্ত কারণেই প্রাচ্যদেশীয়গণ পরোক্ষপ্রিয়—তাহারা জন্ম হইতেই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্নজগতে থাকিতেই ভালবাসে। জলপ্রপাতের মধুর তরতর পতন শব্দ, বিহগকুলের কাকলি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি সমগ্র জগতের সৌন্দর্য্য যে পরম মনোরম ও উপভোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচ্য মনের পক্ষে উহাই পর্য্যাপ্ত নহে—উহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়। সে বর্ত্তমানের—ইহ জগতের—গণ্ডী ভেদ করিয়া তাহার অতীত প্রদেশে যাইতে চায়। বর্ত্তমান—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান—জগৎ তাহার পক্ষে যেন কিছুই নয়। প্রাচ্য ভূভাগ যুগযুগান্তর ধরিয়া সমগ্র মানবজাতির শৈশবশয্যাস্বরূপ রহিয়াছে—তথায় ভাগ্যচক্রের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় এক রাজ্যের পর অপর রাজ্যের অভ্যুদয়, এক সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া অপর সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, মানবীয় ঐশ্বর্য্যবৈভব, গৌরব, শক্তি—সবই এখানে গড়াগড়ি যাইতেছে—যেন বিদ্যা, ঐশ্বর্য্যবৈভব, সাম্রাজ্য—সমুদয়ের সমাধিভূমি—ইহাই প্রাচ্যভূমির পরিচয়। সুতরাং প্রাচ্যদেশীয়গণ যে এই জগতের সমুদয় পদার্থকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাবতঃই এমন কিছু বস্তু দর্শন করিতে চান, যাহা অপরিণামী, অবিনাশী, এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য, আনন্দময় ও অমর—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষগণ এই আদর্শের বিষয় ঘোষণা করিতে কখন ক্লান্তিবোধ করেন না। আর জগতের সকল অবতার ও মহাপুরুষগণের উদ্ভবস্থান সম্বন্ধেও আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, ইঁহাদের সকলেই প্রাচ্যদেশীয়, কেহই অন্য দেশের লোক নহেন।

আমরা আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের প্রথম মূলমন্ত্রই এই দেখিতে

পাই যে, এ জীবন কিছুই নহে, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আরও কিছু আছে, আর তিনি ঐ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জীবনে পরিণত করিয়া তিনি যে যথার্থ প্রাচ্য দেশের সন্তান, তাহাব পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের লোক আপনারা আপনাদের নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে, রাষ্ট্রনৈতিকবিভাগের পবিচালনে ও তথাবিধ অন্যান্য ব্যাপারে আপনাদের কৃতকর্ম্মতার পরিচয় দিয়াছেন। হয়ত প্রাচ্যদেশীয়-গণ ওসকল বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে পাবেন নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে সফল—তাঁহারা ধর্ম্মকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন—কার্য্যে পরিণত কবিয়াছেন। তিনি যদি কোন দর্শন প্রচার করেন, তবে দেখিবেন, কাল শত শত লোক আসিয়া প্রাণপণে নিজেদেব জীবনে উহা উপলব্ধি কবিবাব চেষ্টা কবিবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচার কবেন যে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাতেই মুক্তি হইবে, তিনি তখনই এমন পাঁচশত অনুবর্ত্তী পাইবেন, যাহারা এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত হইবে। আপনারা ইহাকে উপহাসাস্পদ কথা বলিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন, ইহাব পশ্চাতে তাহাদেব জীবনের মূলমন্ত্র বিদ্যমান—তাহারা যে ধর্ম্মকে কেবল বিচাবের বস্তু না ভাবিয়া উহা জীবনে উপলব্ধি করিবার—কার্য্যে পবিণত করিবার—চেষ্টা করে, ইহাতে তাহাব আভাস ও পরিচয় পাওযা যায়। পাশ্চাত্য দেশে মুক্তিব যে সকল বিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তিব ব্যায়াম মাত্র, উহাদিগকে কোনকালে কার্য্যে পরিণত কবিবাব চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যে প্রচাবক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে পবিগণিত হইয়া থাকেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ, এই নাজাবথীয় যীশু প্রকৃত পক্ষেই প্রাচ্যদেশীয়দের ভাবে সম্পূর্ণ ভাবিত ছিলেন। তাঁহার এই নশ্বর জগৎ ও তাহার নশ্বর ঐশ্বর্য্যে আদৌ আস্থা ছিল না। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ শাস্ত্রীয় বাক্যেব টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার (এত টানাটানি কবা হয় যে, আর টানিয়া বাড়ান চলে না—শাস্ত্র বাক্যগুলি ত আর ইণ্ডিয়া-রবার নহে যে,

যত ইচ্ছা টানিয়া বাড়ান যাইবে, আর উহারও একটা সীমা আছে)—কোন প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মকে বর্ত্তমানকালের ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্বতার সহায়ক-স্বরূপ করিয়া লওয়া কখনই উচিত নহে। এটী বেশ বুঝিবেন যে, আমাদিগকে সরল ও অকপট হইতে হইবে। যদি আমাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার শক্তি না থাকে, তবে আমরা যেন আমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া লই, কিন্তু আদর্শকে যেন কখন খাটো না করি—কেহ যেন আদর্শটীকেই একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ খ্রীষ্টের জীবনের যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসে। ইহাদের বর্ণনা হইতে তিনি যে কি ছিলেন, কি না ছিলেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ তাঁহাকে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে একজন সেনাপতি বলিয়া, অপর একজন স্বদেশহিতৈষী য়াহুদী, অপরে বা তাঁহাকে অন্যরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেল গ্রন্থে কি এমন কোন কথা আছে, যাহাতে আমাদের উক্তাবধ সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য ও ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে? একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যের জীবনের ও উপদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠভাষ্য তাঁহার নিজের জীবন। এক্ষণে যীশু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শুনুন। "শৃগালেরও একটা গর্ত্ত থাকে, আকাশচারী বিহঙ্গগণেরও নীড় আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থান নাই।" যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং এইরূপ ত্যাগী ও বৈরাগ্যবান ছিলেন, আর তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা এই যে, এই ত্যাগ বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র পথ—তিনি মুক্তির আর কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। আমরা যেন দন্তে তৃণ লইয়া বিনীতভাবে স্বীকার করি যে, আমাদের এইরূপ ত্যাগ বৈরাগ্যের শক্তি নাই। আমাদের এখনও 'আমি' ও 'আমার' উপর ঘোর আসক্তি বর্ত্তমান। আমরা ধন ঐশ্বর্য্য বিষয়—এই সব চাই। আমাদিগকে ধিক্—আমরা যেন আমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করি, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে অন্যরূপে বর্ণনা করিয়া মানবজাতির এই মহান্ আচার্য্যকে লোক চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা কোন

ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার পারিবারিক বন্ধন কিছু ছিল না। আপনারা কি মনে করেন, এই ব্যক্তির ভিতর কোন সাংসারিক ভাব ছিল? আপনারা কি ভাবেন, এই জ্ঞানজ্যোতির পরম আধারস্বরূপ, এই অমানব স্বয়ং ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন পশুজাতির সমধর্ম্মী হইবার জন্য? তথাপি লোকে তাঁহার উপদেশ বলিয়া যা তা প্রচার করিয়া থাকে। তাঁহার স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল না—তিনি আপনাকে লিঙ্গোপাধিরহিত আত্মা বলিয়া জানিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি শুদ্ধ আত্মস্বরূপ—কেবল দেহে অবস্থিত হইয়া মানবজাতির কল্যাণের জন্য দেহকে পরিচালন করিতেছেন মাত্র—দেহের সঙ্গে তাঁহার শুধু ঐটুকুমাত্র সম্পর্ক ছিল। আত্মাতে কোনরূপ লিঙ্গভেদ নাই। বিদেহ আত্মার সহিত পাশব ভাবের কোন সম্বন্ধ নাই—দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অবশ্য এইরূপ ত্যাগের ভাব হইতে আমরা এখন বহুদূরে অবস্থিত হইতে পারি, হইলামই বা—কিন্তু আমাদের আদর্শটীকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা যেন স্পষ্ট স্বীকার করি যে, ত্যাগই আমাদের আদর্শ, কিন্তু আমরা ঐ আদর্শের নিকট পঁহুছিতে এখনও অক্ষম।

তিনি যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মস্বরূপ—এই তত্ত্ব উপলব্ধি ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন কার্য্য ছিল না, আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মস্বরূপ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, কিন্তু তিনি তাঁহার অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টিসহায়ে বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নরনারী, সে য়াহুদী হউক বা অন্য জাতিই হউক, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু—সকলেই তাঁহারই ন্যায় সেই এক অবিনাশী আত্মস্বরূপ বই আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র জীবনে এই একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে তাহাদের আপন আপন যথার্থ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "তোমরা দীনহীন, এই কুসংস্কারময় স্বপ্ন ছাড়িয়া দাও। মনে করিও না যে, অপরে তোমাদের উপর বলপূর্ব্বক দাসবৎ অত্যাচার করিতেছে, তোমাদিগকে দাসবৎ পদদলিত করিতেছে—কারণ

তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে যাহার উপর কোন অত্যাচার করা চলে না, যাহাকে পদদলিত করা যায় না, যাহাকে কোন মতে বিনাশ করিতে বা কোনরূপ কষ্ট দিতে পারা যায় না।" আপনারা সকলেই ঈশ্বরতনয়, সকলেই অমর আত্মস্বরূপ। তিনি এই মহাবাণী জগতে ঘোষণা করিয়াছেন—"জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অভ্যন্তরেই অবস্থিত।" —"আমি ও আমার পিতা অভেদ।" নাজারথীয় যীশু এই সব কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই সংসারের কথা বা এই দেহের বিষয় কখনও বলেন নাই। জগতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না—এইটুকু মাত্র সম্পর্ক ছিল যে, উহাকে ধরিয়া তিনি সম্মুখে খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিবেন—আর ক্রমাগত উহাকে অগ্রসর করিতে থাকিবেন, যতদিন না সমগ্র জগৎ সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের নিকট পঁহুছিতেছে, যতদিন না প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে, যতদিন না দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত হইতেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

কাশীতে শঙ্কর।

(৪)

কাশীধামে শঙ্কর মণিকর্ণিকার নিকট গঙ্গাতীরেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে মণিকর্ণিকায় স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া, অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতেন এবং তৎপরে এক একদিন এক এক দিকের দেবদর্শনে বহির্গত হইতেন। এইরূপে দেবদর্শন করিয়া প্রায় দ্বিপ্রহরে শঙ্কর স্বস্থানে ফিরিতেন এবং মধ্যাহ্ন স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ভিক্ষার জন্য শঙ্কর বা তাঁহার শিষ্যগণের কোন চিন্তাই হইত না, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার পুরোহিতগণ নিত্যই তাঁহাদের অন্ন যোগাইতেন দেখিয়া অপরাপর মন্দিরের পুরোহিতগণও সন্ন্যাসীদিগের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। সুতরাং শঙ্কর বা তাঁহার শিষ্যবর্গের কেহই কোনও অসুবিধা অনুভব করিতেন

না। এমন কি অনেক লোক অন্নের জন্য ভণ্ডামি করিয়া শঙ্করের শিষ্যগণের শরণ গ্রহণ করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে শঙ্কর শিষ্যগণকে লইয়া নিত্যই শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় দেখিলেই তিনি পুনরায় স্নানাদি সন্ধ্যাকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ধ্যাননিরত হইতেন। শিষ্যগণ এসময় সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। এসময় শঙ্কর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না।

এই সময় কাশীধামে বৌদ্ধ ও কাপালিক সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব অধিক ছিল। লোকে সন্ন্যাসী বলিতে ইহাদিগকেই বুঝিত। এক্ষণে শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণকে দেখিয়া লোকে বুঝিল ইহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহারা ইঁহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিত। প্রায়ই ইঁহাদের আচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিত। কাশীবাসী এরূপ প্রশ্ন করিলেই শঙ্কর তাহাদিগকে যত্নসহকারে বেদোক্ত সন্ন্যাস পথটী বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু ইহাতে একদিকে কতকগুলি লোকের কৌতূহল যেমন দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, অন্যদিকে বৌদ্ধ ও কাপালিক সন্ন্যাসীগণেরও তদ্রূপ ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইতে লাগিল। কিন্তু এসময় বৈদিক মতের অভ্যুদয়কাল, ভট্ট কুমারিল সমগ্র ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন, সুতরাং কাশীধামে আসিয়া শঙ্করকে বুদ্ধের ন্যায় অগ্নিপরীক্ষা দিতে হইল না। সাধারণে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতে লাগিল। নবনৃপতি যেরূপ সকলের সহানুভূতি অর্জ্জন করে বৈদিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভাগ্যেও তদ্রূপ ঘটিল।

এইরূপে শঙ্কর কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ বৃক্ষমূলে শঙ্করকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া কাশীবাসীর কৌতূহল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইল। তাহারা দলে দলে শঙ্করের উপদেশ শুনিতে আসিত। শাস্ত্রব্যাখ্যা শেষ হইলে নানালোকে চারিদিক হইতে শঙ্করকে নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিত। এবং শঙ্করের উপদেশপূর্ণ দুই একটী কথাতেই তাহারা ছিন্নসংশয় হইয়া যাইত। তাহারা যাহা জানিতে চাহিত তাহা অপেক্ষা যেন কত বেশী কথা শুনিতে পাইত,

হৃদয়ের সব অজ্ঞাত অন্ধকার দূর হইত, এবং তাহারা কত নূতন আলোক দেখিতে পাইত। অনেকে হয়ত গৃহ হইতেই কত প্রশ্ন স্থির করিয়া আসিত, কোন্ প্রশ্নের পর কোন্ প্রশ্ন করিতে হইবে ভাবিয়া ঠিক করিয়া আসিত, কিন্তু হয়ত আচার্য্যের মুখকমলের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই সব ভুলিয়া যাইত, অথবা প্রশ্নের সমাধান স্বতঃই হৃদয় মধ্যে উদয় হইত।

দিনের পর দিন শঙ্করের উপদেশ শুনিতে কাশীবাসীর আগ্রহ যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শঙ্করের হৃদয়েও উৎসাহ ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দেবদর্শনব্যপদেশে কাশী পরিক্রমণ বন্ধ হইয়া আসিল। নিত্যকর্ম্ম সমাপনের পর যেটুকু সময় থাকে তাহা সমাগত ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দিতেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। লোক-সমাগমের যেমন বিরাম নাই তাঁহার উপদেশেরও তদ্রূপ বিরাম নাই। লোকের শুনিবার ইচ্ছা যেমন প্রবল হইতে লাগিল শঙ্করের উপদেশ দিবার ইচ্ছাও তদ্রূপ প্রবল হইতে লাগিল। একদিন উপদেশ দিতে দিতে শঙ্করের হৃদয়ে কি যেন একটা ভাবের বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল, যোগীজনোচিত সংযমের বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া গেল, কথোপকথনের ভাষা ভাসিয়া গেল, শ্রোতৃবৃন্দের প্রশ্নানুরূপ উত্তর দিবার রীতি উল্লঙ্ঘিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে ছন্দোবন্ধে বলিতে লাগিলেন,—

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥১॥

রে মূঢ়! ধনাগমের তৃষ্ণা ত্যাগ কর, শরীরে, বুদ্ধিতে এবং মনে উহার প্রতি বিতৃষ্ণভাব প্রদর্শন কর। তুমি নিজ কর্ম্মফলে যাহা লাভ করিতে পার, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও ॥ ১॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত-
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ॥

কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসারের ব্যাপার অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? হে ভ্রাতঃ। এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর। ॥২॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥৩॥

ধনজনযৌবনগর্ব্ব পরিত্যাগ কর। কাল নিমেষ মধ্যে এই সমুদয় হরণ করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মপদ বিদিত হইয়া তাহাতে আশু প্রবেশ করিতে যত্নবান হও ॥৩॥

নলিনীদলগতজলমতিতরলম্,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥৪॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতীব চঞ্চল। ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গই কেবল সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকা স্বরূপ ॥৪॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥৫॥

যখন জন্ম গ্রহণ হইল, তখনই তাহার মরণ পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে এবং মৃত্যুর পশ্চাৎ পুনর্ব্বার জননী জঠরে প্রবেশ করিতে হইবে। সংসারে এই অতি স্পষ্ট দোষ দৃষ্ট হইতেছে, অতএব হে মানব! তোমার ইহাতে সন্তোষের বিষয় কি আছে? ॥৫॥

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ,
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥৬॥

দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, সন্ধ্যা গত হইতেছে, প্রাতঃকাল আবার উপস্থিত হইতেছে, শিশির এবং বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সকলের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, জীবের পরমায়ু দিন দিন গত হইতেছে, তথাপি আশা বায়ুর কিছুতেই বিরাম হইতেছে না ॥৬॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডম্,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥৭॥

শরীর জীর্ণ হইয়াছে, শিরোদেশ পলিত হইয়া পড়িতেছে, মুখবিবর দন্তবিহীন হইয়া যাইতেছে, হস্তধৃত যষ্টিখানা হস্তের অবসন্নতা প্রযুক্ত কম্পিত এবং স্খলিত হইতেছে। তথাপি লোক আশাভাণ্ড পরিত্যাগ করিতেছে না ॥৭॥

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥৮॥

দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে কিম্বা তরুতলে অবস্থিতি, ভূমিতলে শয্যা কিংবা মৃগচর্ম্ম পরিধান ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ এবং ভোগ সুখ পরিত্যাগ— এ প্রকার বৈরাগ্য কাহার প্রীতি উৎপাদন না করে? ৮॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥৯॥

শত্রু, মিত্র, পুত্র এবং বন্ধু, ইহাদিগের সকলেরই প্রতি সমান যত্ন করিবে, বিগ্রহ এবং সন্ধি উভয়েই সমান যত্ন করিবে,

যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা কর, তবে সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্টি করিবে ॥৯॥

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥১০॥

অষ্টকুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্রদেব, তুমি, আমি, এই লোক কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, অতএব কি জন্য শোক করিতেছ? ১০॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু-
র্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং,
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥১১॥

তোমাতে, আমাতে এবং অন্যত্র, সকল বস্তুতেই একমাত্র বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি কি জন্য কোপ করিতেছ? সর্ব্বভূতের আত্মাই তোমাতে দর্শন করিবে সর্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে ॥১১॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ১২॥

বালক ক্রীড়াতেই আসক্ত হইয়া দিনযাপন করিতেছে, তরুণ বয়স্ক তরুণীতে অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধ কেবল চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া দিন যাপন করিতেছে, কিন্তু কেহই কোন সময়ে পরব্রহ্মে মন স্থির করিতেছে না ॥১২॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥১৩॥

অর্থকেই নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই। কেন না ধনবানদিগের পুত্র হইতেও ভীতি সঞ্চার হইতে দেখা যায়। এই নীতি সর্ব্বস্থলেই কথিত হইয়া থাকে। ১৩॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত-
স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥১৪॥

যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম থাকিবে, ততদিন নিজ পরিবার তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। অনন্তর তোমার শরীর জরাজীর্ণ হইলে যখন উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে, তখন গৃহে তোমার সংবাদ পর্য্যন্ত কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না ॥১৪॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া-
স্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥১৫॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে, আত্মা কে এই ভাবে অনুসন্ধান করিবে। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় লোকেরাই নরকে নিমগ্ন হইয়া পচ্যমান হয়।

দুই একটী শ্লোক উচ্চারিত হইতে হইতেই শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। অদূরবর্ত্তী ও দূরস্থ ব্যক্তিগণ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল, আজিকার দৃশ্য এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, আজিকার উপদেশ এক অপূর্ব্ব উপদেশ। সকলের শরীর রোমাঞ্চিত; কাহারও বা নয়নপ্রান্তে জল আসিল, কাহারও বা শরীর কাষ্ঠপ্রায় হইয়া গেল। ক্রমে শ্লোক শেষ হইল, শঙ্কর নিস্তব্ধ হইলেন, কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ নিস্পন্দই রহিল। শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ বড়ই বিচিত্র, শরীর নিস্পন্দ হইলে মন বর্দ্ধিত বেগে কর্ম্ম করিতে থাকে। নিস্পন্দ শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ ভাবিল,

আর গৃহে যাইব না, এখানেই আজ ইহার নিকটেই সন্ন্যাস লই, কেহ ভাবিল জনতা ঠেলিয়া একবার বালকের চরণে মস্তক লুটাইয়া ধন্য হই, কেহ ভাবিল আহা। এ ব্যক্তি কে? একি সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের প্রতিমূর্ত্তি? কেহ ভাবিল, আজ সন্ন্যাসীকে গৃহে লইয়া গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করাইতে পারিলে ধন্য হইব। যার যেমন প্রকৃতি সে তদনুসারে সন্ন্যাসিগণের সেবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল, শঙ্কর আসন ত্যাগ করিলেন, তাহা দেখিয়া সেদিনকার পরিষৎ ভঙ্গ হইল।

একদিন দ্বিপ্রহরে সশিষ্য শঙ্কর দেবদর্শন করিয়া গঙ্গাতীরে ফিরিতেছেন। এমন সময় এক সুকুমারকায় যুবক সহসা শঙ্করের পদতলে পতিত হইল। শঙ্কর চমকিত হইয়া নারায়ণ বলিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। শিষ্যগণও কৌতূহলবশে ধীরে ধীরে শঙ্কর ও যুবককে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্কর যুবকের মস্তক স্পর্শ করিয়া তাহাকে উঠাইলেন, যুবক নতজানু হইয়া করজোড়ে করুণভাবে শঙ্করের মুখকমলের প্রতি চাহিয়া রহিল। শঙ্কর যুবকের দারিদ্রবেশ এবং একাগ্রতাপূর্ণ পবিত্র মুখশ্রী দেখিয়া একটু যেন বিস্মিত হইলেন। তিনি যুবককে ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "কে তুমি? কি জন্য তোমাকে এত কাতর দেখিতেছি?"

যুবক শঙ্করের সুমধুর সম্ভাষণে যেন গলিয়া গেল, বাষ্পবারি তাহার নয়নযুগলকে আকুল করিল, সে তখন তদবস্থাতেই বলিতে লাগিল, "ভগবন্। আমার নাম সনন্দন, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমি অতি অভাজন, আপনার চরণে শরণ গ্রহণের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছি।"

যুবকের এতাদৃশ দৃঢ়তাসূচক বাক্য শুনিয়া শঙ্করের হৃদয়ে আনন্দ ও বিস্ময় যুগপৎ উদিত হইল। তিনি তখন আর কিছু না বলিয়া যুবকের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন "বৎস, আমাদের সঙ্গে আইস। অনতিদূরে গঙ্গাতীরে আমরা অবস্থান করিতেছি, তথায় তোমার সব কথা শুনিব।"

যুবক শঙ্করচরণে প্রণিপাত করিল এবং সশিষ্য শঙ্করের অনুসরণ করিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে সন্ন্যাসীর দল মণিকর্ণিকা সন্নিকটস্থ বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর আসনগ্রহণ করিলে যুবক শঙ্করের পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইল। শঙ্কর যুবকের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন অনেকক্ষণ কোনও কথাই বলিলেন না। যুবক আনতদৃষ্টি, করযোড়ে আসীন।

কিয়ৎক্ষণপরে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস তুমি কি চাও? আমার নিকট শরণ গ্রহণের উদ্দেশ্য কি?"

যুবক বলিল "ভগবন্। আমি বিষম সন্দেহানলে দগ্ধ হইতেছি। নিত্য বস্তু কি? অনিত্য বস্তুই কি? এজগৎই বা কি? কিরূপে নিত্য বস্তু লাভ হইতে পারে? আমি ইহার কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না। কেহ যে আমায় এ সমুদয় বলিয়া দিবে এমন কাহাকেও আমি এপর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। আমি আমার জন্মভূমি দ্রাবিড় দেশ হইতে এতদূর আসিয়াছি, কিন্তু কেহই আমার কলুষ অপনয়নে সক্ষম হইলেন না। ভবিষ্যচ্চিন্তায় আমার চিত্ত অনুদিন জর্জ্জরীভূত হইতেছে। কিন্তু হায়! ইহার কোন সুযোগই দেখিতেছি না। কত সাধু মহাত্মার নিকট গমন করিলাম, সাধুজনের মুখনিঃসৃত বহুবিধ বিচিত্র তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলাম, তথাপি আমার হৃদয়জ্বালা নিবারিত হয় নাই। বরং তাহাতে সন্দেহানলে আহুতি পড়িয়াছে মাত্র। ভগবন্! আপনি আমার নয়নপথে পতিত হইবামাত্র আমায় অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিল "এই সেই—ইঁহাকে আশ্রয় কর, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" মহাত্মন্, তাই আমি আজ আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম। আমি দাবদগ্ধ মৃগের ন্যায় সংসারগহনে বিচরণ করিতেছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন," বলিতে বলিতে যুবক কাঁদিয়া ফেলিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। আর কিছুই বলিতে পারিল না।

যুবকের অবস্থা দেখিয়া শঙ্করের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি পরম বন্ধুর ন্যায় বলিলেন "বৎস। অধীর হইও না, চিত্ত স্থির কর, তোমার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হইবে। তুমি মহাভাগ্যবান, যেহেতু তুমি এই সুকুমার বয়সে সমুদয় ভোগসুখ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ব্রহ্মস্বরূপলাভের জন্য

এত ব্যাকুল হইয়াছ। ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? তোমার কথা শুনিয়া আমি পরম প্রীত হইলাম। যদি ইচ্ছা হয় তুমি অদ্য হইতেই আমার নিকট অবস্থান করিতে পার।'

যোগীবরের আদেশ পাইয়া সনন্দন আনন্দে শঙ্করের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এই সময় সনন্দনের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় লইতেন ও তাঁহার আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিতেন, কারণ অপাত্রে বিদ্যাদান শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ইহাতে গুরু শিষ্য উভয়েরই অকল্যাণ হয়। কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরই তিনি দেখিলেন সনন্দন উচ্চাধিকার-সম্পন্ন, কারণ সনন্দন বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, পুরাণ সমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং স্বভাবতঃই সাধন সম্পন্ন।

অনন্তর এক শুভদিন দেখিয়া শঙ্কর তাঁহাকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সনন্দনও শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিয়া মুণ্ডিতমস্তক ও দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইলেন। শুভ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। সনন্দনের দেহকান্তি যেন গলিত হেমবর্ণে পরিণত হইল। তাঁহার নবজীবন সঞ্চার হইল। দীক্ষালাভ করিবার পর হইতেই সনন্দনের গুরুভক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, তিনি কায়মনোবাক্যে অধিকতর যত্নসহকারে গুরুদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। শঙ্করও তাঁহাকে বেদান্তরহস্য প্রদান করিতে লাগিলেন। দীক্ষাপ্রদানের পর শঙ্কর সনন্দনকে যে প্রথম উপদেশটী দেন তাহা এই,—

ওঁ তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধি-
বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা।
পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং,
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ১ ॥

তপ ও যজ্ঞদানাদি দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি ও রাজপদ ইত্যাদিকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া আসক্তি হীন হইয়া সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্বরূপ-তত্ত্বপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই নিত্য পর ব্রহ্ম আমি ॥ ১ ॥

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং
সমারাধ্য ভক্ত্যা বিচার্য্য স্বরূপম্।

যদাপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধ্যাস্য বিদ্বান্,
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ২ ॥

ভক্তিপূর্ব্বক দয়ালু, প্রশান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আরাধনা, স্বরূপ বিচার এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি যে স্বরূপ তত্ত্বপদ প্রাপ্ত হন, সেই নিত্য পরব্রহ্ম আমি ॥ ২ ॥

যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং,
নিরস্তপ্রপঞ্চং পরিচ্ছেদশূন্যম্।
অহং ব্রহ্মবৃত্ত্যৈকগম্যং তুরীয়ং,
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৩ ॥

যিনি আনন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ—যাঁহার অংশ কল্পনা করা যায় না, যাঁহাকে জগৎ প্রপঞ্চ স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার অতীত এবং 'আমি ব্রহ্ম' এই একমাত্র তত্ত্ববৃত্তি দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই নিত্য পরব্রহ্ম আমি ॥ ৩ ॥

যদজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তং,
বিনষ্টঞ্চ সদ্যো যদাত্মপ্রবোধে।
মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তং,
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৪ ॥

যে আত্মজ্ঞানাভাবে সমস্ত জগতের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় এবং যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, সেই আত্ম-জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ, মুক্ত, মন ও বাক্যের অতীত, নিত্য পরব্রহ্ম আমি ॥ ৪ ॥

নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যৈঃ,
সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পূর্ণম্।
অবস্থাত্রয়াতীতমদ্বৈতমেকং,
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৫ ॥

'ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে' এইরূপ উপনিষদুক্ত নিষেধ নির্দ্ধারণ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ নির্দ্ধারণকারী সমাধিমগ্ন ঋষিদিগের প্রজ্ঞায় যিনি পূর্ণ-রূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি এক, অদ্বিতীয়, এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত, সেই নিত্য পরব্রহ্ম আমি ॥ ৫ ॥

যদানন্দলেশৈঃ সমানন্দি বিশ্বং,
যদাভাতি সত্ত্বে তদাভাতি সর্ব্বম্।
যদালোচনে রূপমন্যৎ সমস্তং,
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৬ ॥

যাঁহার আনন্দকণামাত্রে সমস্ত বিশ্ব আনন্দময়, যাঁহার সত্তায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা প্রতীয়মান, এবং যাঁহার "বহু হইব" ইত্যাদি আলোচনা হইতে অন্য সমস্ত রূপের আবির্ভাব, সেই নিত্য পরব্রহ্ম আমি ॥ ৬ ॥

অনন্তং বিভুং সর্ব্বযোনিং নিরীহং,
শিবসঙ্গহীনং যদোঙ্কারগম্যম্।
নিরাকারমত্যুজ্জ্বলং মৃত্যুহীনং,
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৭ ॥

যিনি অনন্ত, বিভু এবং সর্ব্বযোনি অথচ সর্ব্বচেষ্টারহিত শিব, নিঃসঙ্গ আর যিনি ওঙ্কার (প্রণব) গম্য, নিরাকার, অতিশয় উজ্জ্বল ও মৃত্যু-হীন, সেই নিত্য পরব্রহ্ম আমি। ৭ ॥

যদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ স্যা
দবিদ্যাবিলাসঃ সমস্তপ্রপঞ্চঃ।
তদা ন স্ফুরত্যদ্ভুতং যন্নিমিত্তং,
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৮ ॥

আনন্দ সাগরে সিদ্ধপুরুষগণ নিমগ্ন হইলে যাঁহার প্রভায় এই অদ্ভুত অবিদ্যা বিলাস প্রপঞ্চ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না, সেই নিত্য পরব্রহ্ম আমি। ৮ ॥

স্বরূপানুসন্ধানরূপস্তুরীয়ঃ
পঠেদাদরাদ্ভক্তিভাবো মনুষ্যঃ।
শৃণোতি বা নিত্যং মদ্যুক্তচিত্তো,
ভবেদ্বিষ্ণুরত্রৈব বেদপ্রমাণাৎ।
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৯ ॥

স্বরূপ অনুসন্ধানে যিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থাবস্থা-প্রাপ্ত তিনি, আর যে মনুষ্য সাদরে ও ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন এবং নিত্য বিষ্ণু-রত-

চিত্তে শ্রবণ করেন, তিনিও বিষ্ণুস্বরূপ হন, ইহা বেদের প্রমাণ, আমিই সেই নিত্য পরব্রহ্ম স্বরূপ ॥ ৯ ॥

বলরাম ও বলরামী সম্প্রদায়।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস)

ভারতে নানা প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশ এতগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বক্ষে ধারণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সকলেই এক মুক্তির উদ্দেশ্যে চালিত। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি এত ক্ষুদ্র যে অনেকেই তাহাদের নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন, কিন্তু উহাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, লোকের রুচি বিভিন্ন, এবং উহাদের মধ্যেও মনুষ্যত্বসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। বঙ্গদেশে যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটীর পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামে মালোপাড়ায় বলরামের জন্ম হয়। বলরামের জন্ম বৎসর ঠিক করা কঠিন, তবে যতদূর জানা যায় তাহাতে বোধ হয় ১১৯২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলরাম জাতিতে হাড়ী ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরী সর্দ্দার ও পিতামহের নাম তারানি সর্দ্দার। সর্দ্দারবংশের সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্বে স্বচ্ছল ছিল। শুনা যায়, ইঁহার পিতামহ লেখাপড়া জানিতেন এবং পরম ভক্তিমান ছিলেন। ইঁহাদের বাটীতে দোল দুর্গোৎসবাদি হইত। এখনও দেখা যায়, পল্লীগ্রামে ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ না করিলেও হাড়ী মুচি প্রভৃতি জাতির মধ্যে যথেষ্ট ধর্ম্মভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনা যায়, বলরামের পিতামহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাঁহার বংশে কোন

মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। কালক্রমে গৌরী সর্দ্দারের অনেকগুলি পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করার পর সর্ব্বশেষে বলরামচন্দ্রের জন্ম হয়।

প্রবাদ আছে যে বলরাম যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মাথায় চুল, মুখে দাড়ি ও কয়েকটী দন্ত ছিল। আমরা অনেক বালককেই মাতৃগর্ভ হইতে দন্তযুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু দাড়ি কখনও দেখি নাই। বলরামের শিষ্যগণের নিকট বলরাম সম্বন্ধে উক্ত প্রবাদ শুনা যায়। এখনও আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে দন্তযুক্ত বালক বংশের অমঙ্গলের কারণ হয়। এইরূপ কোন বালক জন্মগ্রহণ করিলে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অপরের নিকট তাহা ব্যক্ত করে না। বলরামের পিতামহের বাটীতে জনৈক কায়স্থ ভদ্রসন্তান কর্ম্ম করিতেন। ঐ ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বালকের জন্মলগ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এ পুত্রের দ্বারা সাংসারিক উন্নতি ত হইবেই না পরন্তু সংসারের ক্ষতি হইতে পারে। সেই জন্য ইঁহার পিতামাতা ইঁহার বিশেষ যত্ন লইতেন না। শুনা যায়, ইঁহার জন্মের কিছুদিন পর ইঁহাকে কোন জঙ্গলে নিক্ষেপ করা হয়। সেই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাটিকাবাড়ী নামক গ্রাম হইতে তাঁহার মাসীমা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যান। যে কয়দিন তাঁহাকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল সে কয়দিন কোন বন্য জন্তু তাঁহার ক্ষতি করে নাই। সেই সময় সমস্ত মেহেরপুর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জঙ্গলে ফেলিয়া রাখার কথাটা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কারণ পুত্র সংসারের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইলেও কোন পিতা-মাতা পুত্রকে জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিতে পারেন না। তবে এরূপ হইতে পারে যে, পরিজনবর্গের বলরামের প্রতি স্নেহশৈথিল্য দর্শন করিয়া ইঁহার মাসী ইঁহাকে লইয়া যাইয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। অবশেষে বলরামের পিতা পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত আবার বলরামকে স্বগৃহে আনয়ন করেন। তারপর বলরাম যত বড় হইতে লাগিলেন তাঁর চুল ও দাড়ি ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। বলরামের বাটীর নিকট কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তন্মধ্যে অধিকারীদের বাটীতে কোন বিগ্রহের

নিত্যপূজাদি হইত। একদিন বলরাম গোলোক নামক জনৈক অধিকারী সন্তানকে নাম ধরিয়া ডাকাতে তিনি বিরক্ত হইলেন। সামান্য হাড়ীর ছেলে তাঁহাকে গোলোক বলিয়া ডাকিবে ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। গোলোক অধিকারী মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোর দাদারা আমাকে কত সম্মান করে ও অধিকারী মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে, আর তুই কিনা আমাকে গোলোক বলিয়া ডাকিতেছিস্!"

ইহাতে বলরাম উত্তর করিলেন "ঠাকুর আজও রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইতে পার নাই। তুমি যে বিষ্ণুকে সর্ব্বদা নাম ধরিয়া ডাক তিনি কি তাহাতে বিরক্ত হইয়া তোমাকে মারিতে আসেন? তুমি এখনও মান-অপমান-জ্ঞানশূন্য হইতে পার নাই, কি করিয়া ভগবানের কৃপা পাইবে?" সেই অবধি গোলোকের বিশ্বাস হইল যে এই বালক সামান্য নহে।

বাল্যকাল হইতেই বলরাম অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। পূজার সময় বলরামদের বাটীতে মহিষ বলি হইত। মহিষ বলি দেখিয়া বলরামের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, বলরাম তাঁহার পিতা এবং পিতামহকে মহিষ বলি হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বালকের কথা শুনিলেন না। শুনা যায়, তদবধি বলরামদের বংশ ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিল।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বলরাম অত্যন্ত শক্তিমান ও সুপুরুষ হইয়া উঠিলেন। শুনা যায়, সে সময় অশিক্ষিত জাতিদিগের মধ্যে বলশালী যুবক দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট কনেষ্টবলের চাকরীতে ভর্ত্তি করিতেন। বলরামের পিতা ও পিতামহ বলরামকে পুলিশ বিভাগে চাকরী করিতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সেইজন্য মেহেরপুরের তদানীন্তন সুবিখ্যাত জমিদার মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া আসেন। কেহ কেহ বলেন বলরাম তাঁহাদের বাটীতে চাকরী করিতেন, কিন্তু বলরামী সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ সেই মত সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে, বলরাম কখনও কাহারও বাটীতে চাকরী করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, মল্লিক বাবুদের বাটীতে আনন্দবিহারী

নামক যে বিগ্রহ আছেন, উহার স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে বলরাম যথেষ্ট লাঞ্ছিত হন। ইহার পর হইতে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। আবার ইহাও শুনা যায় যে, মল্লিক বাবুদের মধ্যে জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ জমিদার ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহার মৃত্যুর পর হইতেই বলরামের তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণ কয়টীর মধ্যে যে কোন কারণেই হউক বলরামের সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মে। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। মেহেরপুরের নিকট আমদহ গ্রামে চৌধুরী রাজাদের ধ্বংশাবশিষ্ট গৃহ সেই সময় ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে পরিবৃত ছিল। শুনা যায়, বলরাম সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং এক বৎসর অবস্থানের পর আবার লোকসমাজে উপস্থিত হইলেন। এবার তিনি পুনরায় স্বীয় বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বোধ হয় বলরাম লোকালয় ত্যাগ করিয়া ফলমূলাদি আহারপূর্ব্বক কঠোর সাধন ভজন করিয়া কিছু ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং এবারে দুই একটী করিয়া তাঁহার বহু শিষ্য জুটিতে লাগিল। এই সময়ে বলরাম শিষ্যগণকে কিছুদিনের জন্য বিদায় দিয়া কাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি হিন্দুতীর্থ সকল ভ্রমণ করিয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসেন এবং নিজের বসত বাটীতে কিছুকাল ধরিয়া বাস করেন। ঐ সময় তাঁহার শিষ্যবর্গ একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার বাটীতে যাতায়াত করিতেন। ক্রমশঃ বলরামের শিষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং বলরাম আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। ভৈরব নদের তীরে আজকাল যেখানে মেহের-পুরের থানা তাহার নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে তিনি স্বশিষ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তখন গৃহাদি ছিল না, বৃক্ষতলেই স্বশিষ্যে সাধন-ভজন চলিতে লাগিল। ঐ স্থানটী মেহেরপুরের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পিতা, বলরামের এইরূপ ঐকান্তিক ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাঁহাদিগের বসবাসের জন্য দান করিয়াছিলেন। সেই সময় মিউনিসিপালিটি ইহাদের আখড়ায় উপর কর ধার্য্য করেন, কিন্তু বলরাম বলিলেন, "আমরা ফকির মানুষ, ট্যাক্স দিয়া কিছুতেই আমরা বাস

করিতে পারিব না।” ইহার জন্ত স্বশিষ্য বলরামকে গাছতলায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অনেকদিন বাস করিতে হইয়াছিল, কারণ মিউনিসি-পালিটী তাঁহাদের যাহা কিছু থাকিত ডিক্রী করিয়া লইয়া যাইত। তাঁহাদের রৌদ্র, বৃষ্টি, অনাহার, অনিদ্রাতেও অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্ট সত্ত্বেও ইহাদের কর না দিবার সঙ্কল্প শিথিল হয় নাই। দুই তিনবার ইহাদের দ্রব্যাদি নিলাম হইয়াছিল। পরিশেষে ইহাদের অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষগণ ধর্ম্মস্থান বলিয়া ইহাদের আখড়ার কর উঠাইয়া দিলেন। আজকাল তথায় কয়েকখানি চালা ঘর ও তিনটী পাকা ঘর। মধ্যে হল ঘরে, বলরামের জীবদ্দশায় নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিস সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। যে স্থানে বলরাম দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থানে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম “গোপ্তার ঘর”। উহার ভিতর একটী বেদী আছে। বলরামের শিষ্যেরা ঐ স্থানটীকে অতি পবিত্র মনে করেন। আজকাল তিনজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক এই মঠে বাস করেন।

বলরামী ধর্ম্মমতের সাধনপদ্ধতি জানা কঠিন, কারণ ইঁহারা ইঁহাদের সাধন পদ্ধতি কাহাকেও বলেন না। ইঁহারা সর্ব্বদা বলরাম নাম জপ করিয়া থাকেন। বলরাম যখন কোন স্থানে যাইতেন তাঁহার অনেক শিষ্য এবং শিষ্যা প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন—

“কাহাকেও হিংসা করিও না। অপকার করিলে তাহার উপকার করিবে। নির্য্যাতন সত্ত্বেও স্বীয় ধর্ম্মমত ত্যাগ করিবে না।”

“মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরকে ভয় করিবে। তবে মানুষকে ঘৃণা করিও না, সর্ব্বদা সকলকে প্রেমের চক্ষে দেখিবে। লোকে বিপদে পড়িলেই তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে।”

‘একস্থানেই বিভিন্নজাতির অন্ন রাখিলে যখন আমরা কোন্ জাতির কোন্ অন্ন তাহা ঠিক করিতে পারি না তখন জাতিভেদ প্রথার কোন ভিত্তি নাই।”

শিষ্যগণকে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহারা যখন সংসারের সমস্ত ভোগ্যবস্তুত্যাগে অসমর্থ তখন কেবল পূর্ব্বোক্তরূপ নৈতিক উপদেশগুলি

পালন করতঃ বলরামের নাম স্মরণ, চিন্তা ও ধ্যান করিলে তাহারা মুক্তি পাইবে, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "ত্যাগই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক।

লোকে তখন তাঁহাকে 'দরবেশ' বা 'সাঁই গোঁসাই' বলিত। বলরামের শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করেন, এবং বলরাম নিজেও সময়ে সময়ে সেইরূপ আত্ম-পরিচয় দিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বেই বলরাম কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাকে শীঘ্রই ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং শিষ্যগণকেও তিনি এ বিষয় জানাইয়াছিলেন। এই কথা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেহেরপুরের লোক পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, বলরাম শীঘ্র দেহত্যাগ করিবেন। দলে দলে লোক বলরামের আখড়ায় আসিয়া তাঁহার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ সুস্থ ও সবল ছিল। ১২৫৭ সালে ৩০শে অগ্রহায়ণ তারিখে বলরাম শিষ্য-গণকে নিকটে ডাকিলেন এবং তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিতে বলিলেন। তার পর তাঁহাদিগকে অন্ন পাক করিতে আদেশ করিলেন। অন্ন প্রস্তুত হইলে নিজে গ্রহণ করিয়া শিষ্যাদিগকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন, এবং সেইদিন তিনি দেহত্যাগ করিবেন, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। শিষ্যগণ কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার অদর্শনে তাঁহাদের কি দশা হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার ভুক্তাবশিষ্ট অন্নে কিছু কিছু অন্ন যোগ করিয়া স্নানের পর প্রত্যহ অল্প অল্প প্রসাদ পাইবে, এবং অদ্য যে জলে স্নান করিলাম তাহা চরণামৃতরূপে ব্যবহার করিবে।" (তাঁহার শিষ্যেরা অদ্যাবধি তাঁহাদের গুরুর আদেশ পালন করিতেছে।) অল্পক্ষণ পরে কয়েকবার বমি হইল, এবং বলরাম ইহলোক ত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগের পর বলরামের দেহ প্রায় এক মাইল দূরে ভৈরবের তীরে সমাহিত করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ আখড়ার নিকট যে শ্মশান ঘাট ছিল উহা ইষ্টক দ্বারা বাঁধাইয়াছেন।

বলরামের ন্যায় ইহার অধিকাংশ শিষ্যগণ লেখাপড়া জানেন না। কিন্তু ইহারা এরূপ তার্কিক যে ইহাদিগকে কিছুতেই তর্কে পরাভূত

করিতে পারা যায় না। ইঁহারা হারিয়াও হারেন না। যদি কেহ বলেন তোমাদের গুরু হাড়ী ছিলেন, তাঁহারা তাহার উত্তরে বলেন যে বাস্তবিকই আমাদের গুরু হাড়ী ছিলেন, কিন্তু যে হাড়ী জাতি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের গুরু সে হাড়ী ছিলেন না। মনুষ্যমাত্রেই হাড়ী, কারণ, যাহার হাড় আছে সেই হাড়ী। ব্রহ্মা নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোক ইঁহার প্রধান শিষ্যা, ও তনু তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। বলরামের মৃত্যুর পর ব্রহ্মা অনেক দিন মঠের কার্য্য চালাইয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যসংখ্যা অনেক, প্রায় সকল জেলায় এই সম্প্রদায়ের দুই একটী করিয়া শিষ্য আছে, উহাদের মধ্যে নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, রাজসাহী, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও পাবনা জেলায় অধিক সংখ্যক শিষ্য আছে। তাঁহার দূরস্থ শিষ্যেরা মেহেরপুর উদ্দেশ্যে প্রত্যহ প্রণাম করিয়া থাকেন। গৃহত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, কিন্তু গৃহস্থ শিষ্যেরা যতক্ষণ এই মঠের ভিতর থাকেন ততক্ষণ তাঁহারা জাতিভেদ মানেন না। মঠের বাহির হইয়া আবার জাতিভেদ প্রথা মানিয়া চলেন। শিষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতিই দেখা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুব কম। অনেকে আবার কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের জন্য মানসিক করিয়া ইঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের শিষ্যদের মধ্যে অনেক সচ্চরিত্র ও সংযমী পুরুষ দেখা যায়। ইঁহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় ভিক্ষা করেন এবং 'জয় বলরামচন্দ্রের জয়' বলিয়া ভিক্ষা চান। স্থানীয় লোকে ইঁহাদিগকে দরবেশ বলিয়া থাকে এবং ইঁহাদের আশ্রমকে দরবেশের আখড়া বলিয়া থাকে।

কার্ত্তিক মাসে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতে মহোৎসব হয়। চৈত্র মাসের প্রথম একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতেও মহোৎসব হয়। এই ত্রয়োদশীর দিন বলরামের দোল হয়। যে স্থানে বলরাম শয়ন করিতেন সেই স্থানটী আবীর পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা সুশোভিত করা হয়। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে আর একটী তিনদিনব্যাপী উৎসব হয়। ঐ সময় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব ও আগন্তুককে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়ান হয়। এই মহোৎসব-উপলক্ষে ইঁহাদের এত অধিক পরিমাণে চাউল, ঘৃত ময়দা প্রভৃতি দেশ

বিদেশ হইতে আমদানি হয় যে, মহোৎসবের পর ইঁহাদের আশ্রমে অনেক জিনিস মজুত থাকে। মহোৎসবের সময় বলরামের শিষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি রাঁধিতে জানেন তাঁহাকে রাঁধিতে দেওয়া হয় এবং সে সময়ে উঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ থাকে না। উৎসবের কয় দিন প্রায় সমস্ত সময় খোল করতাল বাজিতে থাকে এবং বলরামের গুণানুকীর্ত্তন হয়। শিষ্যগণের মধ্যে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। বলরাম জীবিত অবস্থায় দোলমঞ্চে দুলিতেন। মেহেরপুরে আমাদের পাঠদ্দশায় একবার বলরামের মঠের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে একরূপ আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম; কারণ অশিক্ষিত বলরামী শিষ্যবর্গ গুরুর প্রতি যে এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। কোনবার আটশত, কোনবার বা হাজার লোক উৎসবে যোগদান করে; কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে উৎসবের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কম হইতেছে।

আমরা বলরাম সম্বন্ধে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি সময়ে সময়ে নিরঙ্কুশের মত কার্য্য করিতেন। একদিন স্নান করিবার সময় তিনি দেখিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে জলদান করিতেছেন। বলরামও তাঁহার অনুকরণে নদীসৈকতে জল সেচন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কৌতূহলী হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর করিলেন, আমি ধান্যক্ষেত্রে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন, এখানে তোমার ধান্যক্ষেত্র কোথায়? তাহাতে বলরাম উত্তর করিলেন, 'আপনি যে পিতৃ-পুরুষকে জল দিতেছেন তাঁহারাই বা এখানে কোথায়? যদি নদীতে জল দিলে পিতৃপুরুষের নিকট পৌঁছে, তবে এখানে জল সেচন করিলে ধান্য-ক্ষেত্রে পৌঁছিবে না কেন?'

তাঁহার জীবনে অলৌকিক ঘটনারও অভাব নাই। একদিন কোন গ্রামে বলরাম জনৈক সূত্রধরের বাটীতে জল চাহিয়াছিলেন। সে বলিল, 'আমি ছুতার, তোমাকে জল দিতে পারিব না।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'জল ত ছুতার নহে, তুই জল দে।' সূত্রধর বারম্বার

পীড়াপীড়িসত্ত্বেও জল দিতে অস্বীকার করিলে, তাহার ঘরে যে জলের কলসী ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং সমস্ত ঘর ভাসাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। সূত্রধর বলরামকে মহাপুরুষ বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এইরূপ আরও আছে।

বলরামের ধর্ম্মমতের সহিত আমরা একমত না হইতে পারি। তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলি আমরা বিশ্বাস না করিতে পারি, কিন্তু বলরাম নিরক্ষর এবং হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত জাতিভুক্ত হইলেও তাঁহার জলন্ত ত্যাগ, ও নীতিগর্ভ উপদেশাবলি এবং তাহার শিষ্যবর্গের অদ্ভুত গুরুভক্তি সকলের গ্রহণীয়। বহুদিন হইল তাঁহার পবিত্র আত্মা অমরধামে প্রস্থান করিয়াছে কিন্তু আজিও তাঁহার স্মৃতি এতদ্দেশীয় হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে।

কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজই আমাদের যাত্রা করিতে হইবে। আমরা এখনও কুলি পাই নাই। পাণ্ডা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কুলি না পাওয়াতে স্থির করিয়াছিল যে, হৃষীকেশে যাইয়া কুলি করিয়া দিবে। এই হেতু ঠিক হইল যে, হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ রোড পর্য্যন্ত রেলে যাইয়া অবশিষ্ট ৮ মাইল পদব্রজে যাইব এবং একখানি এক্কা আমাদের মালপত্রাদি লইয়া যাইবে। ট্রেণ রাত্রি ৩৷৷০ টায় ছাড়িবে। তখন যাওয়া বড় কষ্টকর হইবে ভাবিয়া আমরা এই মোক্ষদায়ী তীর্থরাজকে প্রণাম করিয়া রাত্রি ১০টার সময় বাহির হইলাম এবং ট্রেণের অপেক্ষায় ষ্টেশনে শুইয়া রহিলাম। স্থির ছিল যে, কেশবানন্দজীর একটী ব্রহ্মচারী শিষ্য (আমরা তাঁহাকে বাবাজী বলিতাম) ও একটী ব্রহ্মচারিণী শিষ্যা আমাদের সহিত ৺কেদার বদরী দর্শনে যাইবেন। তাঁহারা যথাসময়ে ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা হৃষীকেশ রোড

ষ্টেশনে পৌছিলাম। এইবার আমরা দেরাদুন জেলায় প্রবেশ করিলাম এবং অদ্য হইতে আমাদের পদব্রজে ভ্রমণ আরম্ভ হইল। এখান হইতে হৃষীকেশ প্রায় ৮ মাইল, এই পথ অতিক্রম করিতে আমাদের ৩ ঘণ্টা লাগিল। আসিবার সময় সত্যনারায়ণ নামে একটী চটী পার হই। এখানে যাত্রীদিগকে অরন্ধিত ভোজ্য দান করা হয়। পথটী বেশ মনোরম, বনমধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুই পার্শ্বের বনরাজি নানাবিধ বিহঙ্গকুলের সুস্বরে প্রতিধ্বনিত। হৃষীকেশে আমরা কালীকম্‌লী-ওয়ালার সুবৃহৎ ধর্ম্মশালার আশ্রয় গ্রহণ করি। ধর্ম্মশালার বিরাট দানযজ্ঞের ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। শত শত সন্ন্যাসীগণকে প্রত্যহ রন্ধিত ভোজ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। দাল, রুটী, ভাত, অথবা যিনি নিজে রাঁধিয়া খাইবেন, তাঁহাকে চাল বা আটা, দাল, ঘৃত, চিনি, গুড়, লবণ ও মসলাদি অতি শ্রদ্ধার সহিত দেওয়া হয়। বিতরণের সময় ধর্ম্মশালাকে যেন মা অন্নপূর্ণার মন্দির বলিয়া বোধ হয়। অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয় এইরূপেই করিতে হয়। কলিকাতার কতকগুলি ধনী মাব-বাড়ী দ্বারা ইহা পরিচালিত। এইজন্য ইহাকে পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালা কহে। কেদারবদরীর পথে ১০।১২ মাইল অন্তর ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা আছে। সর্ব্বস্থানেই নিঃসম্বল যাত্রীগণকে সিধা দেওয়া হয়। এইস্থান হইতে একখানি চিরকুট লইয়া যাইলেই প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় সিধা পাওয়া যায়। পথে অনেক যাত্রীই নানা কারণে উদরাময় রোগে ভুগিয়া থাকে। এইজন্য এই ধর্ম্মশালা হইতে বিনামূল্যে ঔষধ লইয়া যাইবার জন্য সকলকে বিজ্ঞাপন দ্বারা অনুরোধ করা আছে। আমরা অনেকগুলি ঔষধ চাহিয়া লইয়াছিলাম এবং তদ্দ্বারা আমাদের ও অন্যান্য কতিপয় যাত্রীর অনেক উপকার হইয়াছিল। পাঞ্জাবী ক্ষেত্র নামে পাঞ্জাবীগণ-পরিচালিত একটী ধর্ম্মশালা আছে; তথায়ও বিস্তর সাধুগণকে ভোজ্যাদি দান করা হয়। এই দুইটী ব্যতীত আরও দুই একটী ধর্ম্মশালা আছে, সেগুলিতেও সাধুগণকে ভোজ্য দেওয়া হয়। এখানকার অন্নসত্র ও সদাব্রত বৎসরের কোন সময়েই বন্ধ না থাকায় অনেক সাধু এখানে সম্বৎসর বাস করেন। হৃষীকেশের প্রধান দর্শনীয় ভরতজীর মন্দির। তাহার দক্ষিণ ভাগে

কিয়দ্দূরে রামকুণ্ড নামক একটী কুণ্ড ও তাহার পার্শ্বে শ্রীরামচন্দ্রের একটী মন্দির আছে। এখানকার গঙ্গার দৃশ্য বড় সুন্দর। হরিদ্বারের মত এখানেও স্বচ্ছন্দচারী মীনগণের নিঃশঙ্ক আহারগ্রহণ দেখিবার জিনিস। কয়েকটী আটার গুলি ফেলিবামাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসিয়া জল তোলপাড করিয়া তোলে। এখানে খাদ্য দ্রব্যাদি মহার্ঘ নহে।

মধ্যাহ্ন কালে আমাদের পরিচিত একটী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি অল্পদিন পূর্ব্বে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া হৃষীকেশ হইতে ২ মাইল দূরে গঙ্গার অপর পারে তপস্যার্থ বাস করিতেছিলেন। তাঁহার উপদেশমত আমাদের জিনিসপত্রের বোঝা কিঞ্চিৎ কমাইয়া লইলাম। অতঃপর লছমন ঝোলার দিকে অগ্রসর হইলাম। এখানে পথে সাধারণতঃ কিকি আবশ্যক হয় তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দুইটী সুতার গেঞ্জি, দুইটী সুতার কোট, একটী ভাল ফ্লানেলের সার্ট বা কোট, দু জোড়া মোড়া, তিন চার খানি কাপড, কাপড়গুলি পাতলা হইলে ভাল হয়, নতুবা শুকান বা সাবান দিয়া পরিষ্কার করা বড় কষ্টকর হয়। একখানি গায়ে দিবার কম্বল এবং একখানি পাতিবার কম্বল, একটী বালিস, আন্দাজ দেড়গজ অয়েল ক্লথ, (বৃষ্টির সময় মোটগুলি চাপা দিবার জন্য), এক জোড়া বেশ মজবুত জুতা।—অনেকের ধারণা দড়ির তলাবিশিষ্ট জুতা বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু সে ধারণা একেবারে ভুল, কারণ ইহা আট দশ দিনের বেশী স্থায়ী হয় না।—দুই তিন খানি ভাল কাপড় কাচিবার সাবান, একখানি ছুরি, একটী ছাতা, একগাছি লাঠি, ও একটী লণ্ঠন, পাহাড় অঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রই দিনের বেলায় মাছিতে অত্যন্ত জ্বালাতন করে, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকা যায় না; তজ্জন্য একখানি পাখা সঙ্গে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অবশ্য রাত্রিতে মশকের কোন উপদ্রব থাকে না। আবশ্যকমত সেলাইয়ের জন্য সূচ ও সূতা সঙ্গে রাখা ভাল। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে এইগুলি লওয়া আবশ্যক, যথা—সুজি (জল খাবারের জন্য), রাঁধিবার গুঁড়ান মসলা, (কারণ ও অঞ্চলে লঙ্কা ভিন্ন অন্য মসলা

বড় একটা পাওয়া যায় না), মুখশুদ্ধির মসলা, তেঁতুল বা অন্য কোন টক, তেজপাত ও গরম মসলা। একটী Camphor এবং খানিকটা Eucalyptus oil সঙ্গে রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন না করিলে পথে কষ্ট পাইতে হয়, যথা :—(১) *দোকানের প্রস্তুত খাদ্যাদি যথা সম্ভব বর্জ্জন করিবে, যদ্যপি খাইতে* বাধ্য হইতে হয়, তবে টাটকা প্রস্তুত করাইয়া লইবে. (২) হিম জলে স্নান করিবে না, (৩) ক্লান্তি দূর না করিয়া বা ছোট ঝরণার জল কখনও খাইবে না, (৪) খালি পেটে অধিক দূর চলিবে না, (৫) সর্ব্বদা অঙ্গ আবৃত রাখিবে, (৬) নদীর জল না থিতাইয়া খাইবে না, (৭) অন্ততঃ একবেলা রুটী খাইবে।

কিছুদূর আসিয়া শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত কৈলাস মঠ দেখিলাম। মঠটী বেশ বড়। ইহার ভিতর তিন চারখানি বাড়ী এবং সেগুলিতে অনেকগুলি সাধু বাস করিতেছেন দেখিলাম। ইঁহারা বেশ শান্ত ও বিদ্যানুরাগী।

কৈলাস মঠের কিছুদূরে গঙ্গাসৈকতে ঝাড়িনামক সন্ন্যাসী-বসতি। বহুসংখ্যক সাধু এইখানে ঝুপড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সাধন ভজন করেন। সময়ে সময়ে এই স্থানে বহুযাত্রীর সমাগম হয়, এবং অনেকে সাধুগণকে অর্থ ও ভাণ্ডারা দিয়া থাকে। কোন দাতা যদি আসিয়া দেখেন যে সাধুর ঝুপড়ীর দরজা বন্ধ আছে তবে তাঁহাকে না ডাকিয়া তাঁহার দরজার সম্মুখে বাদাম, মিছরী, ভোজ্য ও অর্থাদি রাখিয়া চলিয়া যান। বাস্তবিক এখানকার দান একটা দেখিবার জিনিস।

কৈলাশ মঠ হইতে অগ্রসর হইয়া আমরা মাল ওজন করিবার ঘাটীতে আসিলাম। মাল ওজন করা হইলে আমরা এক এক খানি চুক্তি পত্র পাইলাম। তৎপরে কুলিদ্বয়কে বাবাজী ও ব্রহ্মচারিণীর সহিত লছমন-ঝোলায় পাঠাইয়া দিলাম। লছমনঝোলায় যাইতে হইলে একটী ঝোলা বা পুল যোগে গঙ্গাপার হইতে হয়। ইহা কাষ্ঠ ও লোহার দড়ার দ্বারা নির্ম্মিত। কেদারবদরীর পথে সর্ব্বত্রই নদী পারের জন্য এইরূপ পুল প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাচীন কালের দড়ীর ঝোলা এ রাস্তায়

এখন আর কোনও স্থানেই নাই। তবে এ গ্রাম হইতে ও গ্রামে যাইবার জন্য স্থানে স্থানে এখনও এই বিপজ্জনক ঝোলার ব্যবহার আছে। আমরা আমাদের বন্ধু ব্রহ্মচারীর সহিত নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া লছমনঝোলার নিকটস্থ তাঁহার আশ্রমে আসিলাম।

বন্ধু ব্রহ্মচারী তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থানটী আমাদের দেখাইলেন। গঙ্গার তটে একটী উচ্চ সমতল ভূমির উপর ৬০।৭০ খানি এক এক জনের থাকিবার মত ছোট ছোট ঘর আছে। একখানি ঘর অপরটী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। এইগুলিতে তপস্বীগণ থাকেন। দেখিলাম বৈকাল বেলায় ইহাদের অনেকেই গঙ্গাসৈকতে এক একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া পরমরমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে-ছেন, অথবা শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন। স্থানটী বাস্তবিক সাধনের উপযুক্ত বটে। সাধুকে আহারের জন্য ভাবিতে হয় না। অদূরে একটী ক্ষেত্র (অন্নসত্র) আছে; তাহার মহান্তের নাম স্বামী আত্ম-প্রকাশ। তিনিই নানাস্থানের ভক্ত ধনীগণের সাহায্যে এই ঘরগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং বেলা ১০।১১ টার সময় প্রত্যহ এই স্থানবাসী তপস্বীগণকে দাল, রুটী, তরকারী প্রভৃতি বিতরণ করেন। যাহা হউক, আমরা ব্রহ্মচারী বন্ধুর আশ্রমে আসিলে তিনি বেলের সরবৎ দিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র কতকগুলি কিশোর তপোনুরক্ত ব্রহ্মচারী আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাদের বৈরাগ্যপূর্ণ এবং শান্ত মুখশ্রী দেখিয়া মনে যুগপৎ হর্ষবিষাদের উদয় হইয়াছিল। হর্ষ তাঁহাদের পুণ্যদর্শনে, এবং বিষাদ তাঁহাদের এবং আমাদের ব্যবধান ভাবিয়া। এক এক বার মনে হইতেছিল যে আর কেদার বদরী না যাইয়া ছুটীর কয়দিন এইস্থানে ইঁহাদের সহিত কাটাইয়া দিই। পরে ব্রহ্মচারী বন্ধু ও অপর দু একটী ব্রহ্মচারী আমাদিগকে, স্বামী আত্মপ্রকাশের অন্নসত্র দেখাইতে লইয়া চলিলেন। স্বামিজী আমাদের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং আমাদিগকে তাঁহার নিকট আহারাদি করিতে ও গঙ্গার তীরে তাঁহার একটী দ্বিতল বাটীতে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ

করিলেন। আমরা আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না। সাধুসেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ তাঁহাকে দিয়া গঙ্গাতীরে সান্ধ্যক্রিয়াদি সমাপন করিলাম এবং তৎপরে নিরুপিত কুটীরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, স্বামিজী ভৃত্য দ্বারা রুটী তরকারী দুধ প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং শয্যা প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন। সকলে একত্র আহারে বসিলাম, পরে ব্রহ্মচারীগণ তাঁহাদের আপন আপন কুটীরে চলিয়া গেলেন এবং আমরাও শয়ন করিলাম।

২৪শে শনিবার প্রাতে উঠিয়াই নারায়ণের নাম কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মচারী বন্ধুর আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পরে লছমনঝোলার দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে যাইয়া বাবাজী ও ব্রহ্মচারিণীর সহিত পুনর্মিলিত হইলাম। লক্ষ্মণঝোলার পোলের নিকট একটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে রাম সীতা ও লক্ষ্মণমূর্ত্তি বিরাজিত। এই আয়াসসাধ্য তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিয়া আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তদনুসারে পদব্রজে ভ্রমণকারীর নিম্নলিখিত দুই একটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। গৃহস্থগণের একক না যাইয়া তিন চার জন একসঙ্গে যাওয়া উচিত। ইঁহারা সকলে এক পরিবারস্থ বা অন্তরঙ্গ হইলেই ভাল হয়। কেবলমাত্র মৌখিক বন্ধুত্ব হইলে অনেক অসুবিধা ঘটা সম্ভব। প্রত্যহ ভোর ৪ টার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবে এবং ৫টার মধ্যেই চলা আরম্ভ করিবে। যদি দুই বেলা পথ চলিবার ইচ্ছা থাকে তবে বেলা ৯টার মধ্যে, নতুবা ১০টা, ১০॥০ টার মধ্যে কোন চটী গ্রহণ করিবে। কুলীকে ৪॥০ টার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিবে। কারণ তাহাকে থামিয়া থামিয়া ও আস্তে আস্তে যাইতে হয়। তাহাকে অনেক আগে ছাড়িয়া দিলেও অনেক পরে চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অধিক রৌদ্রের সময় কখন চলিবে না। বৈকালে বেলা ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত চলিয়াই চটী ধরিবে। সন্ধ্যা হইয়া গেলে চটীতে স্থান পাওয়া বড় দুরুহ। কদাচ অনাবৃত অঙ্গে শয়ন করিবে না। নিজেরা রন্ধনে নিপুণ না হইলে সঙ্গে পাচক লইবে। যদি পাচক লওয়া সুবিধাজনক না হয় তবে কুলী ঠিক করিবার সময় ব্রাহ্মণ ও রন্ধননিপুণ

কুলী বাছিয়া লইবে। এই প্রকার কুলী এই পথে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে তাহাকে খাইতে দিতে হয়।

আজ আমরা ডেরাডুন জেলা ত্যাগ করিয়া গাড়োয়াল জেলায় প্রবেশ করিলাম। উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশ তীর্থ এই জেলায় অবস্থিত। গঙ্গোত্রী (১০,৩১৯ ফিট উচ্চ) এবং যমুনোত্রী (১০,৮০০ ফিট উচ্চ) দেশীয় গাড়োয়ালে অবস্থিত। এই জেলায় হস্তী, চিতাবাঘ, বন্য কুকুর, ভল্লুক, বানর প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্তু আছে; তবে ভল্লুক ভিন্ন অন্য কোন জন্তুর দ্বারা যাত্রীগণের কিছু ক্ষতি হয় না। ইহারা প্রায় বর্ষাকালেই বাহির হয়। বনমধ্যে নানা শ্রেণীর পক্ষী ও হরিণ এবং তুষার প্রদেশে চমরী গো দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতে তিন চার প্রকার মৎস্য আছে এবং এখানেও ছিপ দ্বারা লোকে সেগুলিকে ধরিয়া থাকে। গম, চাল, ভুট্টা, মুসুর, মুগ, তিল, আলু, যব, পেঁয়াজ, প্রভৃতির চাষ হয়। চাষের জমিগুলি দূর হইতে পর্ব্বত-গাত্রে যেন সোপানশ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হয়।

আমরা গঙ্গাকে বামে রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। পথ পর্ব্বত-গাত্রে সংলগ্ন, এক হইতে চার হাত পর্য্যন্ত প্রশস্ত। পথের এক পার্শ্বে দুরারোহ পর্ব্বত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান এবং অপর দিকে গভীর খাদ বা খড্। খডের মধ্য দিয়া নির্ঝরিণী প্রবাহিতা। বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ চলা উচিত, কারণ সময়ে সময়ে যাত্রীগণ অসাবধানতার সহিত পথ চলিয়া খডে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে। পরেশনাথ, চন্দ্রনাথ, ত্রিকূট, কামরূপ, ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বত শ্রেণীতে উঠিয়াছি বটে, কিন্তু সে সব পথ এই প্রকারের নহে। আজ আমার চক্ষে প্রকৃতি অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিচ্ছদে পরিহিতা। আর সেই দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল পুষ্করিণীবহুল সমতল ক্ষেত্র নাই। এখন উভয় পার্শ্বে এবং সম্মুখে উত্তুঙ্গ শৈলমালা নীরব নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান; কোথাও জনমানবের কোলাহল নাই। যেন এক মহান্ শান্তিপূর্ণ রাজত্বে উপস্থিত হইয়াছি। দু একটী বিহঙ্গের সুললিত কাকলি প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে মাত্র। এই অভিনব দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে বেলা ৯॥০ টার মধ্যে ৮ মাইল দূরে মোহন চটীতে

আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই পথের সর্ব্বত্রই ৩।৪ মাইল অন্তর চটী পাওয়া যায়। কিন্তু সকলগুলিই যে রাত্রিবাসযোগ্য তাহা নহে। চটীগুলির অধিকাংশই আমাদের খোলার ঘরের মত। চাল পাতার, এবং খড়ের, অথবা অপরিষ্কার মোটা মোটা পাথরের টালির, এবং কতকগুলির দুইধার খোলা। হিম হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষার উপায় নাই। তবে জানিয়া রাখা উচিত যে এখানকার হিম আমাদের দেশের হিমের মত অস্বাস্থ্যকর নহে। যদি কেহ এখানে কোন অনাবৃত স্থানে আপাদমস্তক কম্বলে আবৃত করিয়া নিদ্রা যান, তাঁহার কোন অসুখ করিবে না বা তাঁহার গাত্রবস্ত্র ভিজিয়া যাইবে না। প্রত্যেক চটীতেই অন্ততঃ ৪।৫টী করিয়া মুদীর দোকান এবং যাত্রীগণের জন্য ৪।৫টী চালা থাকে। দোকানে চাল, দাল, ঘৃত, আলু, আটা, করকচ লবণ, লঙ্কা, চিনি, কাষ্ঠ, প্রভৃতি পাওয়া যায়। ভাল ভাল চটীগুলিতে অনেক দোকান ও চালা থাকে এবং রন্ধনের মসলা, কেরোসিন তৈল, সরিষার তৈল, দিয়াশালাই, ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। দুগ্ধ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। আলু ব্যতীত, তরকারীর মধ্যে কুমড়া ও পেঁয়াজ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। মুদীগণ উক্ত চালাগুলির স্বত্বাধিকারী। চালার কোন ভাড়া নাই, কেবলমাত্র আহার্য্য দ্রব্যাদি চালার স্বত্বাধিকারীর নিকট কিনিলেই হইল। রন্ধনের আবশ্যকীয় তৈজসপত্রাদি মুদী বিনা ভাড়ায় সরবরাহ করিয়া থাকে। তবে ঘটী ও থালা সঙ্গে লওয়া উচিত। একটী রুটী বেলিবার বেলুনও সঙ্গে লওয়া উচিত। আমরা সাধারণতঃ প্রাতে দাল ভাত, খিচুড়ী ইত্যাদি এবং রাত্রে রুটী তরকারী, দুগ্ধ ইত্যাদি খাইতাম।

মোহন চটীতে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর বেলা ৫।৹ টার সময় বহির্গত হইয়া ৩ মাইল দূরে বিজনী চটিতে আসিয়া রাত্রি যাপন করি। রন্ধনকার্য্য হইতে আমাদের এক প্রকার নিষ্কৃতি ছিল। বাবাজী ও পাণ্ডার গোমস্তা উভয়ে মিলিয়া যাহা হয় করিতেন, আমরা নামমাত্র সাহায্য করিতাম। পথ চলার পর রাঁধা-বাড়া যে কি কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। প্রাতে ও বৈকালের জলখাবারের জন্য

আমরা বিস্কুট, সুজির নাড়ু ও মিছরী লইয়া ছিলাম। এই সকল ফুরাইয়া যাইলে গরম দুগ্ধ জলখাবারের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

২৫শে মে প্রাতঃকাল ৯ টার মধ্যে ৯ মাইল অতিক্রম করিয়া মহাদেব চটীতে উপস্থিত হই। ব্রহ্মনখোলার অনতিদূরেই গঙ্গা আমাদের ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ আবার আমাদের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। ক্রমশঃ পর্ব্বতগুলি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া আসিতেছে, আর সুর-তরঙ্গিণী তাহাদের মধ্য দিয়া কখন নীরব মন্থর গতিতে, কখনও বা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে ক্ষিপ্র গতিতে ধাবমানা। গঙ্গার জল কি শীতলস্পর্শ এবং সুস্বাদু! পাহাড়ীরা গঙ্গার জলকে "মায়ীকা দুধ" বলে। বাস্তবিক এই উক্তি আমাদের একবিন্দুও অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় নাই। বৈকাল বেলা আরও ৩ মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছিলাম। অদ্য আমাদের পথ অত্যন্ত বন্ধুর ছিল। চড়াই উৎরাই করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইয়াছিলাম। পদদ্বয়ে দারুণ ব্যথা হইয়াছিল। এই ব্যথা সারিতে ৩।৪ দিন লাগে, এবং আমাদের পরবর্ত্তী দুই দিনের গতিও অনেক মন্দ হইয়াছিল।

২৬ শে মে, সোমবার ৬ মাইল পথ চলিয়া ব্যাসঘাট চটীতে আগমন করি। এই স্থানে মহামুনি ব্যাস তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একটী মন্দির আছে। পূর্ব্বদিনের ক্লান্তিবশতঃ আজ এই স্থানেই রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা হইল। বৈকালে আমার একটু জ্বর বোধ হওয়ায় রাত্রিতে কেবলমাত্র একটু মিছরী খাইয়াই শুইয়া রহিলাম। পরদিবস প্রত্যূষে আমার সতীর্থগণ দেবপ্রয়াগ যাত্রা করিলেন। আমি দুর্ব্বল থাকায় তাঁহাদের সহিত পদব্রজে যাইতে ভরসা করিলাম না। স্থির করিলাম সূর্য্যোদয় হইলে ঘোড়ায় বা ঝাঁপানে যাইব। সকাল হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে এদিক ওদিক বেড়াইয়া দেখিলাম, কোথাও ঘোড়া বা ঝাঁপান নাই। আমাদের মুদারা দুই ভাইয়ে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পাইল না; বলিল একটু বেলা হইলে পাওয়া যাইবে। তাহারা একটু দুধ গরম করিয়া দিল, তাহাই খাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে এক বিষম হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। নিকটস্থ

ধর্ম্মশালার এক নেপালী প্রতিহারী কোন কারণে একটী কুলীকে আঘাত করিবার জন্য একখণ্ড প্রস্তর তৎপ্রতি নিক্ষেপ করে। তাহা কুলীকে না লাগিয়া স্থানীয় হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডারকে ভীষণভাবে আহত করে। তখন বেলা ৮॥০ টা। আমি আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া দুর্ব্বলের বল শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া পদব্রজেই বাহির হইলাম। এই স্থানে বলিয়া রাখি যে ব্যাসঘাট চটীতে কেহ যেন না থাকেন। উহা অস্বাস্থ্যকর। কলিকাতায় আসিয়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারীদিগের নিকট ইহা শুনিলাম। যাহা হউক ৩ মাইল চলিয়া একটী টাট্টু পাইলাম, রৌদ্রের জন্য ছাতি মাথায় দিয়াই ঘোড়ায় চড়িলাম। অল্পদূর আসিয়া এক দিকের রেকাবের উপর একটু বেশী ভর দিবামাত্র, জিন তেমন কসা না থাকায়, ছাতা শুদ্ধ পড়িয়া গেলাম। খড়ের দিকে পড়ি নাই, তাহা হইলে আজই ভবলীলা সমাপন হইত। শরীরে কোনও আঘাত লাগে নাই, কিন্তু ছাতাটী ভাঙ্গিয়া গেল। ঘোড়া চড়িতে আর ইচ্ছা না থাকিলেও দুর্ব্বলতার জন্য বাধ্য হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলাম এবং প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দেবপ্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। সঙ্গম স্থলটী দেশীয় গাড়োয়ালের অন্তর্গত। এই স্থানে মুণ্ডন, স্নান এবং শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। সঙ্গমের উপর রামসীতার একটী মন্দির আছে। অলকানন্দা গাড়োয়াল জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, পূর্ব্ব-পারে ইংরাজাধিকৃত গাড়োয়াল এবং পশ্চিম পারে দেশীয় গাড়োয়াল। সঙ্গমের নিকট গঙ্গার কল্লোল এমন ভীষণ যে তটের উপর বসিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিলে কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। স্রোতের বেগ এত অধিক যে, তটস্থ পর্ব্বতাঘাত জনিত জলকণা সকল ৭।৮ হাত উচ্চে উত্থিত হইতেছে। মায়ের সেই রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রাণে এক আতঙ্কের সঞ্চার হয়। এই বেগ যে ঐরাবতের অসহ্য হইয়াছিল তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। সকল স্থান অপেক্ষা এই স্থানে মৎস্য বেশী বলিয়া বোধ হইল। খাবার দিতে গেলে আঙ্গুল পর্য্যন্ত গিলিয়া ফেলে,

আদৌ ভয় করে না। স্নান করিতে গেলে ঝাপটা মারে। গঙ্গার উপর প্রাচীন কালের ন্যায় একটা দড়ির ঝোলা আছে; সাবধানে পার হইতে হয়; একটু বাতাস আসিলেই দুলিতে থাকে। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর যাত্রীগণকে ইহা পার হইতে হয়। কেদারবদরীর যাত্রীগণকে গঙ্গার ধার ত্যাগ করিয়া অলকানন্দার অনুসরণ করিতে হয়। দেবপ্রয়াগ গ্রামখানিকে দূর হইতে যেন একখানি ছবির ন্যায় বোধ হয়। বদরীর পাণ্ডাগণ এইখানে বাস করে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০০। এখানে বাজার, ডাকঘর, থানা প্রভৃতি আছে।

২৮ শে মে, বুধবার ১১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রামপুর চটীতে মধ্যাহ্ন যাপন করি। বৈকালে ৫ মাইল চলিয়া সন্ধ্যার সময় বিশ্বকেদার নামক চটীতে উপস্থিত হই। দেখিলাম চটীটী যাত্রীতে পরিপূর্ণ, অধিকন্তু শতাধিক যাত্রী স্থানাভাবে খোলা মাঠেই পড়িয়া আছে। কোন উপায় না থাকায় ৩ মাইল দূরে শ্রীনগরে যাওয়াই স্থির হইল। দুইটী লণ্ঠন জ্বালিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। পথ মাঠের উপর দিয়া গিয়াছে, বেশ পরিষ্কার; চক্ষু বুজিয়া যাওয়া যায়। রাত্রি ৯টার পর শ্রীনগরে পৌঁছাই। দোকান পাট তখন বন্ধ হইতেছে এবং গ্রামবাসী ও যাত্রীগণ সকলে নিদ্রিত। অত রাত্রে বাসা পাওয়া অতি কঠিন। আমরা কম্লীওয়ালার ধর্ম্মশালার বারাণ্ডার নীচে একটু উঁচু রকের উপর শুইয়া কোনরূপে রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। প্রাতঃকালে যাত্রী সকল চলিয়া যাইলে আমরা উপর তলায় যাইয়া একটী ঘর ও বারান্দা অধিকার করিলাম। স্নানাদি করিয়া কিছুক্ষণের জন্য নগর দর্শনে বাহির হইলাম। শ্রীনগর অলকানন্দার তীরে একটী বিশাল উপত্যকার উপর অধিষ্ঠিত। ইহা বৃটিশ্ গাড়োয়ালের একটী প্রধান নগর। ইহার উচ্চতা ১,৭৪৩ ফিট এবং লোকসংখ্যা ২,০০০এর অধিক। শ্রীনগর ভিন্ন এই জেলায় আরও ২টী সহর আছে, যথা:— ল্যান্সডাউন এবং কোটদ্বারা। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে শ্রীনগর টিহিরি রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান সহরের নিকটেই হিন্দুরাজগণের প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পাথর-বাঁধান পথ আছে। পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্যের দোকান আছে। আমাদের ভাঙ্গা ছাতাগুলি ও ছেঁড়া জুতাগুলি মেরামত করিয়া লওয়া হইল। কয়েক যোড়া নূতন জুতাও কিনিয়া লইলাম। পথে অন্য কোথাও জুতার দোকান বা ছাতা মেরামতের কারখানা নাই। এখানে সরকারী হাঁসপাতাল, স্কুল, পুলিস হেড্ কোয়ার্টার্স্ প্রভৃতি আছে। শ্রীনগরে সাজা পান কিনিতে পাওয়া যায়; এক পয়সায় ১ খিলি। এখানকার কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বা মঠ খুব প্রাচীন কালের। মঠটীর যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। বর্ত্তমান শ্রীনগর ১৮৯৪ সালের পর নির্ম্মিত। পুরাতন সহর ঐ সালে ঘোনা হ্রদের জলপ্লাবনে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানকার অধিবাসীগণ বেশ সরল ও সভ্য বলিয়া বোধ হইল। গাড়োয়ালবাসীগণের মধ্যে বড়লোক তেমন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, আর আছে বলিয়াও বোধ হইল না। ইহারা সাধারণতঃ চারি বর্ণে বিভক্ত, যথাঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বেণিয়া ও অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণগণ বলে, তাহারা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। হয়ত ইহারা প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ হইতে এ স্থানে আসিয়াছিল। এখানে বিবাহে পণ প্রথা প্রচলিত। চাষবাসের অধিকাংশ কার্য্য স্ত্রীলোকেরা করে, এবং পুরুষেরা পনচক্কী (water-mill) দ্বারা আটা, রেশম ভাঙ্গে এবং ব্যবসা বা কুলিগিরি করে। গাড়োয়ালের দক্ষিণাংশের অধিবাসিগণের পোষাক উত্তরাংশের অধিবাসিগণের পোষাক হইতে অনেক ভিন্ন। দক্ষিণাংশবাসিগণ সুতার কাপড় জামা পরে। উত্তর-প্রদেশীয়গণ কম্বলের জামা ও পায়জামা পরে, এবং অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার। বোধ হয় অতিরিক্ত শীতই তাহার কারণ। স্ত্রীলোকদের রং সাধারণতঃ ফর্সা। ইহারা সর্ব্বদা জামা পরিয়া থাকে; ইহাদের প্রধান অলঙ্কার নথ। সূচ, সুতা ও টিপ ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। তীর্থ-যাত্রীগণের নিকট এই সব চাহিতে আইসে এবং পাইলে বড় খুসী হয়। অনেক যাত্রী বিতরণের জন্য দেশ হইতে এই সব লইয়া আসে। পাহাড়ীরা বেশ শান্ত শিষ্ট ও বিশ্বাসপরায়ণ। ইহাদের মধ্যে দীর্ঘকায়

লোক নাই বলিলেই হয়। গম ইহাদের প্রধান খাদ্য। গাড়োয়াল জেলায় ধোপা বা নাপিত দেখিতে পাই নাই। চুল ও দাড়ি কাটার অভাবে ইহাদের অনেককে আমার মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত। কিন্তু বাস্তবিক দু একটী ভিন্ন মুসলমান আমাদের নজরে পড়ে নাই। ইহাদের মধ্যে বিদ্যার প্রচার নাই বলিলেই হয়। লছমনঝোলা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত পথটুকুর মধ্যে বিচ্ছুর প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আজ আমাদের মধ্যে এক জনের গায়ে চাল হইতে একটা বিচ্ছু পড়িয়াছিল, কিন্তু কামড়ায় নাই।

এখানকার পুলিসের দারোগা শ্রীযুত জয়কিষণ যোশীর সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল। তিনি আলমোড়া নিবাসী এবং অতি অমায়িক লোক। কথায় কথায় জানা গেল, তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। তিনি আমাদের খুব খাতির যত্ন করিয়াছিলেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার কেদার বদরী দর্শনে গিয়াছিলেন। তখন পথ কি দুর্গম এবং কত হিংস্রজন্তুপূর্ণ ছিল তাহা আমাদের গল্প করিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি একটা ভল্লুক দ্বারা আক্রান্ত হন এবং অতি সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান। তিনি বদরিকাশ্রমে তাঁহার প্রত্যক্ষ এক আজগুবি ঘটনার বিবৃতি করেন। বদরিকাশ্রমের অদূরে ব্যাসগুহায় জ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামে এক সাধু তপস্যা করিতেন। এক ব্যক্তি সস্ত্রীক বদরী দর্শনে আসিয়া জয়কিষণ বাবুর বাসায় থাকেন। একদিন প্রাতে তিনি একাকী ব্যাসগুহা দেখিতে যান এবং জ্ঞানানন্দ স্বামীর উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি আর গৃহে ফিরিতে অনিচ্ছুক হইয়া কোন প্রকারে তাঁহার স্ত্রীর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়া পাঠান। পত্নী সংবাদ পাইয়া কাতরভাবে জয়কিষণ বাবুকে তাঁহার স্বামীকে ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জয়কিষণ বাবু ব্যাসগুহায় যাইয়া সেই ব্যক্তিকে অনেক বুঝাইলেন ও কাকুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি সাধুকে উক্ত স্ত্রীর কাতর ক্রন্দন জানাইয়া তাঁহার স্বামিকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা করিতে অনুরোধ

করিলেন। সাধু বলিলেন, "উঁহাকে বুঝাও, নিজের ইচ্ছায় আসিয়াছেন আবার নিজের ইচ্ছায় চলিয়া যাইবেন।" তিনি উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আমি অনেক বুঝাইয়াছি, উনি কর্ণপাত করেন না; আপনার দর্শনেই উঁহার বৈরাগ্যের সঞ্চার,আপনারআজ্ঞা ব্যতীত তাহা ছুটিবে না।" শুনিয়া সাধু ঈষৎ হাস্ত করিলেন, এবং, যোশীজী বলিলেন, সেই ব্যক্তির মনও সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তিনি বলিলেন "চলুন,আমি যাইতেছি"; এই বলিয়া সাধুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিনা ওজরে ফিরিয়া আসিলেন।

৩০শে মে শুক্রবার ১১ মাইল চলিয়া থাঁকরা চটীতে উপস্থিত হই। এখানে আসিতে একটা চড়াই পার হইতে হয়; কিন্তু পার্ব্বত্য পথে অনেকটা অভ্যস্ত হওয়ায় আর বড় কষ্ট হয় নাই। এই স্থানে দেখি একটী পাঞ্জাবী ধনী সদাগরপুত্র কেদার বদরী দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। তিনি পথে যত সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আসিতেছেন বা যাইতেছেন তাঁহাদিগকে একটী করিয়া সিকি ভিক্ষা দিতেছেন। এ প্রদেশে এত সাধু সন্ন্যাসীর আগমন যে তাহাদের প্রত্যেককে ৪ আনা করিয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। বৈকালে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া আমাদের বড় উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। কারণ আমরা বাসার ধারের দিকে ছিলাম, জলের ঝাপটা আসিতে থাকায় আমরা ছাতা আড়াল দিয়া রহিলাম। বৃষ্টির জন্য রাত্রে খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। পাহাড়ে এইরূপই হইয়া থাকে। আজ এইখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে ৮ মাইল দূরে রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হই। আমাদের পথে পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে ইহা দ্বিতীয়। সমুদ্রের সমতল হইতে ইহার উচ্চতা ২,৩০০ ফিট। এইখানে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম। শুভ্রবরণা অলকানন্দা উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিতা আর নীলকায়া মন্দাকিনী অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরের মধ্য দিয়া দিগন্ত শ্রুত গর্জ্জনে উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে তীব্রবেগে অবতরণপরায়ণা। এই পবিত্র মিলন বাস্তবিকই প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। সঙ্গমের উপর রুদ্রনাথের মন্দির আছে। দেবর্ষি নারদ সদাশিবের দর্শনাভিলাষে এই স্থানে তপস্যা করেন। সঙ্গমে স্নান ও তর্পণাদি করিলাম। আজ

একাদশী থাকায় আর রন্ধনাদি করা হয় নাই। দোকান হইতে কিছু কিনিয়া খাওয়া গেল। আমরা কখনও, কিছুপূর্ব্বে ভাজা হইয়াছে এইরূপ পুরী বা পোড়া ঘৃতে ভাজা পুরী খাইতাম না। সাধারণ দরের উপর ৵০ অধিক দিয়া নূতন ঘৃতে ভাজাইয়া লইতাম। এখানে জিনিস-পত্র বেশ সুস্থা এবং বেগুন শাক প্রভৃতি আনাজ পাওয়া যায়। সদাব্রত ফণ্ড দ্বারা চালিত একটী ছোট দাতব্য ঔষধালয় আছে। কেদার বদরীর পথের দাতব্য ঔষধালয়ের কম্পাউণ্ডারগুলি অতি ভদ্রলোক। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদার ও বদরীর পথ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কেদারের পথ মন্দাকিনীর ধার দিয়া এবং বদরীর পথ অলকানন্দার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাফের লাইন হরিদ্বার হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া বদরীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। বৈকালে ৫ মাইল অগ্রগামী হইয়া ছতৌলি চটীতে রাত্রি যাপন করি। এখানকার মন্দাকিনীতট অতি প্রীতিপ্রদ। তটের প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর বসিয়া জপধ্যান বা গল্প করিতে করিতে প্রকৃতির শোভাসন্দর্শন অতি উপাদেয়।

পরদিন প্রাতে ৬ মাইল মাত্র যাইয়া অগস্ত্যমুনি চটীতে মধ্যাহ্ন যাপন করি। অগস্ত্যমুনি এখানে তপস্যা করায় স্থানটীর নাম এইরূপ হইয়াছে। এখানে কতকগুলি মন্দির আছে। চটীটী মন্দ নহে; অনেক যাত্রী থাকিবার স্থান আছে। গ্রামখানি একটী সুন্দর উপত্যকার উপর স্থাপিত। চটীর সম্মুখে একটী বিস্তৃত সুন্দর সমতল ক্ষেত্র আছে। এই স্থানে একটী মঠবাড়ী নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন হইতেছে। এখানে আহার্য্যদ্রব্যাদিও মহার্ঘ নহে। বৈকালে ৫ মাইল অগ্রসর হইয়া চন্দ্রাপুরী নামক চটীতে রাত্রি বাস করি। বাসাটী মন্দাকিনীর উপরেই ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদীতীরে বেড়াইতে গেলাম। অনতি-বিলম্বেই হরিপাদসম্ভূতা সুরগঙ্গার গভীর কল্লোল ও উদ্দাম নৃত্য আমাকে আত্মহারা করিল। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখিতে লাগিলাম। স্থানটী ত্যাগ করিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্ধকার হইয়া যাওয়ায় বাসায় ফিরিতে বাধ্য হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শোকসংবাদ।

ইহজীবনের নশ্বরতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া গত চারিমাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবারভুক্ত আমাদিগের তিনটী পরম বন্ধু শ্রীগুরু-পদান্তে মিলিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রাবণের মধ্যভাগে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয়ের অদর্শনজনিত সন্তাপ আমাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইয়াছে। সৌহার্দ্দ-সরলতা-পূর্ণ তাঁহার আনন্দময় মূর্ত্তিলেখ স্মৃতিপটে কিঞ্চিন্মাত্র মলিন হইতে না হইতে বিগত ১৪ই কার্ত্তিক স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদাশ্রিত পরোপকারী, দানশীল, উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আবার, কার্ত্তিক-সংক্রান্তি দিবসে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্যাগ্রণী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আত্মীয় পরিবারবর্গকে মুহ্যমান করিয়া ইহসংসার হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

সন্ন্যাসপ্রবণ অন্তর লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবিপাকে যাঁহা-দিগকে সংসার করিতে হয়, গার্হস্থজীবনে তাঁহারা কখনও সুখলাভে সমর্থ হন না। ঈশ্বরের অচিন্ত্য ইচ্ছায় শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রকে তাহাই করিতে হইয়াছিল এবং ফলও তজ্জন্য তদনুরূপ হইয়াছিল। সমগ্র চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিরন্তর অবস্থান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আজীবন তিনি যেন সকলের নিকট অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন. এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব তদীয় ভক্তসঙ্ঘে তাঁহাকে কতদূর উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন তাহা কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ, নিরভিমান পূর্ণচন্দ্র ঐরূপে আজীবন আত্মপরিচয় গোপন করিয়া আপনাকে হীনের হীন নগণ্য সংসারী মাত্র বলিয়া পরিচিত করিলেও কিন্তু আমরা জানি আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহার কতদূর উচ্চাধিকার ছিল। ঠাকুর বলিতেন, 'পূর্ণ বিষ্ণু-অংশ; স্বামী বিবেকা-নন্দের কথা ছাড়িয়া দিলে পূর্ণের ন্যায় বড় আধার (ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিবার অধিকারী) বিরল দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ণ নিত্যমুক্তের থাক্ (শ্রেণী),

পূর্ণ অল্প বয়সে দেহ রক্ষা করিবে, তাহা না হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিবে।' ঠাকুরের শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীই কি এখন এই-রূপে সিদ্ধ হইল ?

পূর্ণচন্দ্র সরকার বাহাদুরের ফিনান্স বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন; সে জন্য বৎসরের অর্দ্ধেক সময় তাঁহাকে সিমলা শৈলে থাকিতে হইত, শুনিয়াছি, প্রতিদিন অবসরকালে তিনি দূরে নির্জ্জন গিরিব্রজে গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। অভিমান অহংকার রহিত পূর্ণচন্দ্রের বিনয় নম্রতায় সকলেই বশীভূত হইত; কিন্তু তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ না হইলে সাধক পূর্ণকে কেহ বুঝিতে পারিত না; বুঝিত না— ঈশ্বরপ্রেমের ফল্গুপ্রবাহ কতদূর প্রবলবেগে তাঁহার অন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত থাকিত।

ভারতরাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের কর্ম্ম-স্থলও তথায় চলিয়া যায়। কলিকাতায় দীর্ঘকাল আসিতে পারিবেন না ভাবিয়া পূর্ণচন্দ্র ঐ সময়ে আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। দিল্লীতে অবস্থান করিবার কাল হইতে তাঁহার জ্বর হইতে থাকে এবং সিমলা শৈলের বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ বায়ু সেবনেও সেই জ্বরের হ্রাস না হইয়া দিন দিন উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বোধ হয় এখন হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার ঐ ব্যাধি আরোগ্য হইবার নহে। কারণ, শুনিয়াছি, স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে চিন্তিতা দেখিয়া তিনি ঐকালে একদিন বলিয়াছিলেন—'আমরা কি সংসারের অন্যান্য লোকের ন্যায় ?—আমরা যে সর্ব্বতোভাবে ঠাকুরের; আমার জন্মিবার পূর্ব্বে যিনি তোমাদের আহার দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, আমার মৃত্যু হইলে তিনিই তোমাদিগকে দেখিবেন, রক্ষা করিবেন।'

সিমলা হইতে কলিকাতায় তাঁহাকে চিকিৎসার্থ আনয়ন করা হয় এবং চরম শান্তি লাভের পূর্ব্বে এখানেই তিনি প্রায় ছয় মাস কাল রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপে দীর্ঘকাল শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তাঁহার মন একক্ষণের জন্য চিন্তিত বা অবসন্ন হয় নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পূর্ণচন্দ্র নিরন্তর

প্রসন্ন মনে প্রফুল্ল বদনে অবস্থান করিতেন এবং বলিতেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমার শয্যাপার্শ্বে সর্ব্বক্ষণ বসিয়া রহিয়াছেন।' অত্যধিক দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহাকে যখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে দেওয়া হইত না, তখন, একদিন রাত্রিকালে সমীপস্থ সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনি নিজ প্রয়োজনের জন্য কাহাকেও ডাকিতে কুণ্ঠিত হয়েন এবং স্বয়ং উঠিবামাত্র পড়িয়া যান। পতন শব্দে জাগরিত হইয়া সকলে শশব্যস্তে তাঁহাকে উঠাইয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করাইয়া দেন এবং 'কোথায় লাগিয়াছে' পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। পূর্ণ বাবু তাহাতে উত্তর করিয়াছিলেন, 'লাগিবে কেন? আমি যে ঠাকুরের ক্রোড়ের উপরে পড়িয়া গিয়াছিলাম।'

অন্তিমকালেও পূর্ণ বাবুর কিছুমাত্র যাতনা যে উপলব্ধি হয় নাই, একথা বুঝিতে পারা যায়। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় চিকিৎসক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া যান, তাহার শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। চিকিৎসক চলিয়া যাইবামাত্র তাঁহার আত্মীয়বর্গ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন তিনি যেন সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা নিকটেই কিছু দূরে উপবিষ্ট থাকেন। ঐ ঘটনার প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বাদে চিকিৎসক পুনরায় আসিয়া বলেন, পূর্ণচন্দ্রের প্রাণবায়ু বহুক্ষণ শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সমালোচনা।

গিরিশচন্দ্র (গিরিশ-গীতাবলীর পরিশিষ্ট)—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ২২৩ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে গিরিশবাবুর অবশিষ্ট গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ২য় খণ্ডে গিরিশচন্দ্রের জীবনীর শেষাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, ৩য় খণ্ডে গিরিশ-প্রসঙ্গ নামে কবিবরের জীবনের

কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "আলোচনা" করা হইয়াছে, এবং ৪র্থ খণ্ডে গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর কাল নিরূপিত হইয়াছে। লেখক গিরিশচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহার লিখিত গিরিশজীবনী এবং গিরিশ-প্রসঙ্গ বঙ্গসাহিত্যের প্রেমিকমাত্রেরই পড়িবার সামগ্রী বাস্তবিকই, গিরিশ-প্রসঙ্গ পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। অভিনেতা হিসাবে গিরিশবাবুর কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল, বিভিন্ন ভাবাবেশে মানবের আকৃতি কিরূপ বিভিন্নভাব ধারণ করে প্রতিভাবান্ গিরিশচন্দ্র তাহা অনুকরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই চিত্র কয়খানি অভিনেতৃগণের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পুস্তকখানির সব ভাল, তবে ইহাতে কতকগুলি অনাবশ্যক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, আশা করি সেগুলিকে দ্বিতীয় সংস্করণে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিতে পাইব।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

আগামী ৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, রবিবার, বেলুড় ও তাহার শাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীস্বামিজীর দ্বিপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি পূজা ও পরবর্ত্তী রবিবার, অর্থাৎ ১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, তদুপলক্ষে মহোৎসব ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হইবে। পাঠকবর্গের উক্ত উৎসবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বন্যাকার্য্যের সেবকগণের অক্টোবর মাসের শেষভাগের কার্য্যবিবরণী পাঠে জানা যায় যে গত মাসে তাঁহারা বড়বড়িয়া কেন্দ্রে আলুকরণবর ও বাহাদুরপুর গ্রামে দুইটী শাখা কেন্দ্র, এবং ভগবানপুরে খগা নামে একটী শাখা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। বড়বড়িয়া কেন্দ্র হইতে ১৪টী গ্রামের ২৫১ জন ব্যক্তিকে, আলুকরণবর হইতে ৮টী গ্রামের ১৩৫ জনকে, বাহাদুরপুর হইতে ৭টী গ্রামের ১৩৪ জনকে, ইক্ষুপত্রিকা হইতে ১৪টী গ্রামের ২৫১ জনকে, ভগবানপুর হইতে ৩৭টী গ্রামের ৭৯২ জনকে এবং খগা হইতে ১১টী গ্রামের ১৮৯ জনকে খাদ্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে।

ইহা বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে যে পরস্পর সহকারিতায় কার্য্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে আমাদের ভগবানপুর কেন্দ্রস্থ সেবকগণের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। এই প্রকার সহকারিতার সুবিধার জন্য প্রত্যেক থানা কতকগুলি সার্কেলে

বিভক্ত হইতেছে, প্রতি সার্কেলে আবার ভিন্ন ভিন্ন সেবকমণ্ডলের অধীনে থাকিবে। এইরূপ কতকগুলি সার্কেল আবার একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে, যাহাতে তাঁহার নিকট ভিন্ন ভিন্ন সার্কেলের সেবকগণ সদাসর্ব্বদা পরামর্শ এবং সহানুভূতি পাইতে পারেন। মেদিনীপুরের কলেক্টর সাহেব কর্তৃক আমাদের ভগবানপুরস্থ সেবকগণের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবপত্রে কতকটা এইভাবের কার্য্যপ্রণালীর উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে যথাকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মিশন ভগবানপুরে একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন, এবং আগামী সংখ্যায় আমরা সাধারণের নিকট এই নূতন বন্দোবস্তের বিবরণ উপস্থিত করিতে পারিব, এরূপ আশা করা যায়।

তমলুক মহকুমার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। নারাণদাঁড়ি কেন্দ্র হইতে ৪৫টী গ্রামের ১,২৩৩ জন লোককে এবং চণ্ডীপুর হইতে ৪৬টী গ্রামের ১,৫৭১ জনকে প্রত্যহ চাউল দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আবাদের উপযোগী স্থানসমূহে বোরো ধানের বীজও দেওয়া হইতেছে।

যে সমুদয় রোগী চিকিৎসার জন্য আমাদের বন্যাকার্য্যের কেন্দ্র গুলিতে আসিতেছিল তাহাদের চিকিৎসার জন্য গত ১১ই অক্টোবর হইতে নারাণদাঁড়ি কেন্দ্রে চিকিৎসার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। ভগবানপুরেও চিকিৎসার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তবে উহার বিবরণী এখনও পাওয়া যায় নাই। আমরা এখানে সাধারণের অবগতির জন্য উল্লেখ করিতেছি যে আমাদের সেবকগণ বন্যাকার্য্যের প্রারম্ভ হইতেই যেখানে যেখানে সম্ভব হইয়াছে অল্প স্বল্প ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। এখন নিয়মিতরূপে চিকিৎসাকার্য্য আরম্ভ হওয়ায় খুব বেশী বেশী ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা আমাদিগকে প্রথম হইতেই ঔষধাদি সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগের সকলকেই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ইকনমিক ফার্ম্মেসী, এবং মেসার্স লাহিড়ী এণ্ড কোং—ইঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নারাণদাঁড়ির চিকিৎসাবিবরণে প্রকাশ যে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১৪৫২ জন চিকিৎসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৫৫ জন ম্যালেরিয়া, ১১১ জন debility, ৭২ জন উদরাময়, এবং ৯১ জন বাতরোগগ্রস্ত এবং বাকী ৮২৩ জন অন্যান্য বহুবিধ রোগে আক্রান্ত ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ১,০৮৫ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এবং ৩৬০ জন সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, নারাণদাঁড়িতে ৬ জনের কলেরা হইয়াছিল, আনন্দের বিষয় তাহারা সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার হোদলনারায়ণপুর কেন্দ্রের কার্য্য অক্টোবর মাসের শেষভাগে সমাপ্ত হইয়া বন্ধ হইয়াছে। উহার বিস্তারিত বিবরণ বন্যাকার্য্যের সাধারণ বিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে। আমরা এই স্থানের ভীষণ বন্যায় ৫৯ জনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছি।

উপসংহারে, আমরা আপনাদের সহানুভূতি, উৎসাহ এবং নিঃস্বার্থদান ব্যতীত এ কার্য্য কিছুতেই এতদিন চালাইতে পারিতাম না, সেই সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এই মহদনুষ্ঠানের জন্য পুনরায় ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইতেছি। নিঃস্ব, বুভুক্ষু এবং নিরাশ্রয় নারায়ণগণের সাহায্যের জন্য যিনি যাহা দান করিবেন সাদরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় গৃহীত হইবে—

১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ, হাওড়া।

অথবা

(২) ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

বিগত আগষ্ট মাসে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী টিহিরি সহরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়া সহরটীকে যার পর নাই শ্রীভ্রষ্ট করে। উত্তরকাশী হইতে প্রত্যাগমনকালে স্বামী করুণানন্দ এই সংবাদ পাইয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে তথায় কলেরার প্রকোপ নিবারণ কল্পে স্থানীয় অধিবাসিগণের সাহায্যে disinfection কার্য্য সুরু করেন, এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বয়ং বিসূচিকাক্রান্ত রোগীদের সেবা করিয়া অধিবাসিগণের আতঙ্ক দূর ও প্রভূতকল্যাণ সাধন করেন। তাঁহার disinfection কার্য্যের ফলে উক্ত রোগ আর বৃদ্ধি পায় নাই, এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষারও যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছিল। স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণও তাঁহার এই নিষ্কাম কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরীতে বেদান্ত সোসাইটীভবনে এবার ৺দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ পূজা ভক্তির পূজা, এবং স্বামী বোধানন্দ উক্ত দিনত্রয় চণ্ডীপাঠ, আরাত্রিক ও পুষ্পপত্রাদি দ্বারা মহামায়ার অর্চনা করিয়াছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় ভজনগান ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল, এবং হিন্দুছাত্রগণ একদিন প্রসাদ পাইয়াছিলেন। রজঃশক্তির লীলাক্ষেত্র আমেরিকা খণ্ডে শ্রীশ্রীজগদম্বার আবাহন ও পূজা এই প্রথম। আশা করি এই পুণ্য আনন্দোৎসব আমেরিকাবাসী ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হইবে।

রামকৃষ্ণমিশন বন্যাকার্য্যে প্রাপ্তিস্বীকার।

১লা হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে প্রাপ্ত

মেঝদিদি, চিকা পিটি হাউস, আলমোড়া ১০৲
মাষ্টার শম্ভু ঘোষ, ঐ ১৲
ওয়াই, এ, ধরমসি, পুণা ১০৲
ডি, কে, নাট, মালভান ৫৲
শ্রীচন্দ্রকুমার মজুমদার, শিলং ১৲
রামকৃষ্ণ সেবকসমিতি, রেঙ্গুন ৫৲
শ্রীমতী ক্ষীরদাসুন্দরী দেবী, মজঃফরপুর ১৲
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ভাটপাড়া ৩৲
বর্ম্মা রেলওয়ে অডিট অফিস
মাঃ ডি, এন শর্ম্মা, রেঙ্গুন ৬১৷৷০
বাঙ্গালী বন্যামোচন সমিতি, ঐ ২৫০৲
শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মুঠিগঞ্জ মঠ, এলাহাবাদ ২৲
শ্রীদুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য, সেরেস্তাদার, এফ, এম, এস ৫৲
শ্রীনিক বেয়ারা, আলমোড়া ১৲

১লা হইতে ১৫ নবেম্বর পর্য্যন্ত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

বয়ন বিদ্যালয়, কোয়ালপাড়া ২৲
শ্রীরাখালদাস মণ্ডল, ঐ ১৲
মাঃ শ্রীমতী অমলাবালা দেবী, রাঁচি ২৲
শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, উকিল, জজকোর্ট, আলিপুর ৫৲
রাজ ষ্টেট, মহিষাদল ১৮৲
বিষ্ণুপুর উচ্চ ইং বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মাঃ শ্রীঅবনিনাথ ঘোষ ৫৲
মাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কার্য্যালয়, কলিকাতা ৫৲
শ্রীভূতনাথ ঘোষ, ৫৭ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৲
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত, ১২০ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫৲
রামকৃষ্ণ বেনেভোলেন্ট সোসাইটি, গোরখপুর ৯৲

* গত সংখ্যার ৭১৯ পৃষ্ঠায় ১৬-১৮ লাইনে

ভ্রমক্রমে এইরূপ ছাপা হইয়াছে :—		ইহার পরিবর্ত্তে এইরূপ হইবে :—	
মাঃ শ্রীশশধর মিত্র, মেকলিগঞ্জ	৪৫৲	মাঃ শ্রীশশধর মিত্র, মেকলিগঞ্জ	৪৫৷০
মাঃ শ্রীআনন্দচন্দ্র চৌধুরী, গৌরীপুর	২৫৲	মাঃ শ্রীঅন্নদাচরণ চৌধুরী, গৌরীপুর	১২৶
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রবল্লভ ঘোষ, বলরামপুর	৫০৲	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রভূষণ ঘোষ, বলরামপুর	২৫৲
		মেসারস্ ম্যাকলাউড এণ্ড কোং কর্ম্মচারীগণ, কলিকাতা	৫০৲

১লা হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির তালিকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, ১৫৮ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। চাউল—১৷৷৵ মণ, সাগু—৵৫ সের, মিশ্রি—১ কুঁদা।

মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোং, শোভাবাজার, কলিকাতা। হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধ—২২ প্রকার।

মেসার্স লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৮ নং প্রতাপ চাটার্জ্জির লেন, কলিকাতা। ইলেক্ট্রো হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধের ৪টী টিউব।

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, ১৫৮ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। চাউল—৩৵ মণ, হোমিয়োপাথিক ঔষধ ৩১ প্রকার চাউল—১৷৵ মণ।